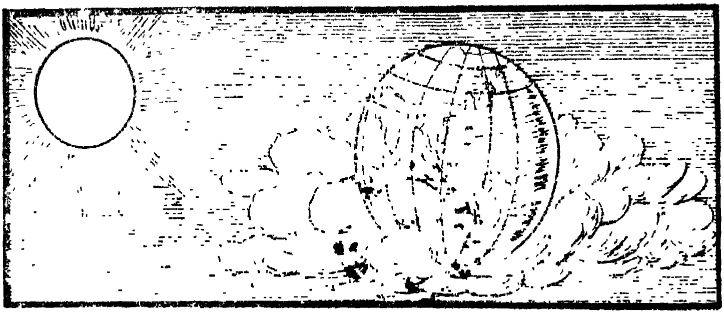
শিশু-ভারতী

[ছেলেদের বিশ্বকোষ]

সম্পাদক—শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

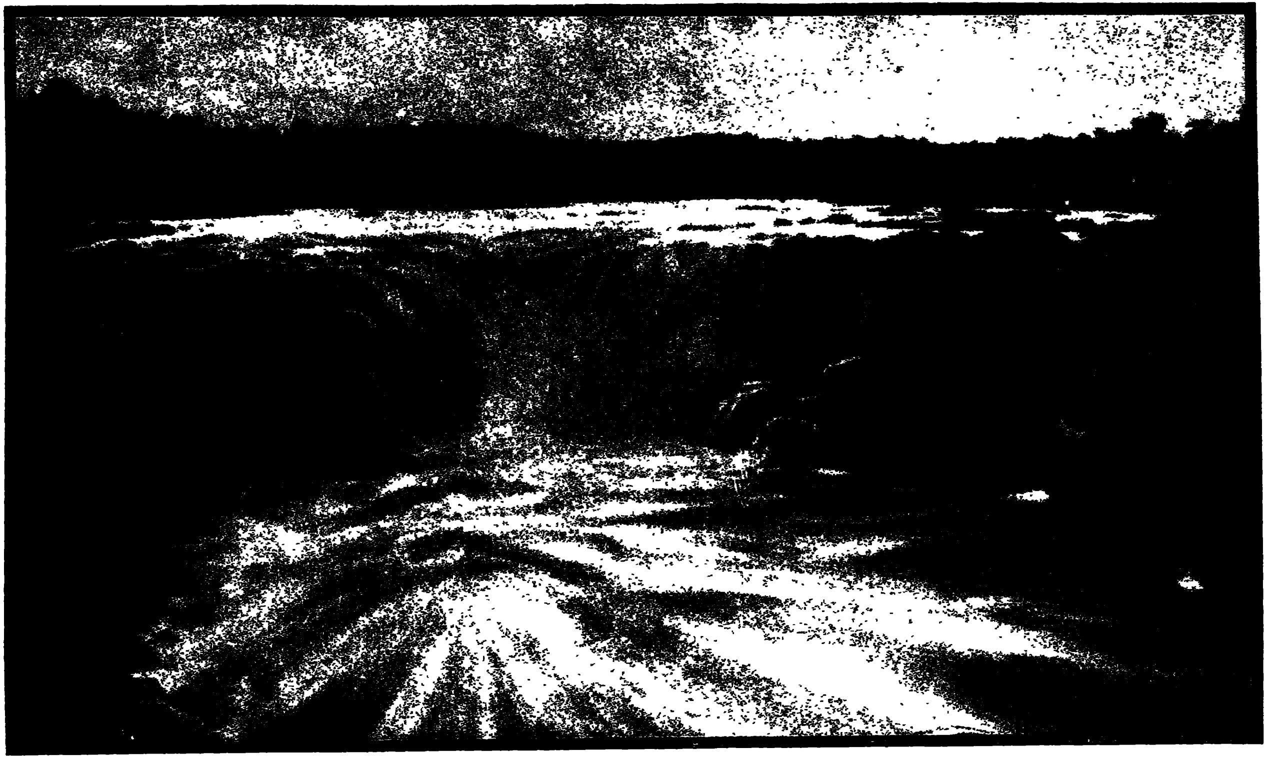
বিষয়-বিভাগ

ষষ্ঠ খণ্ড, ২৬ হইতে ৩০ সংখ্যা পৃষ্ঠা ২০০১ হইতে ২৪০০



[illegible] সূচীপত্র (Index) দেওয়া হইল।

ষষ্ঠ খণ্ডের সূচীপত্র



নর্ম্মদা জল-প্রপাত—মর্ম্মর শৈল



"আলো"কে তরঙ্গ বলি কেন ?

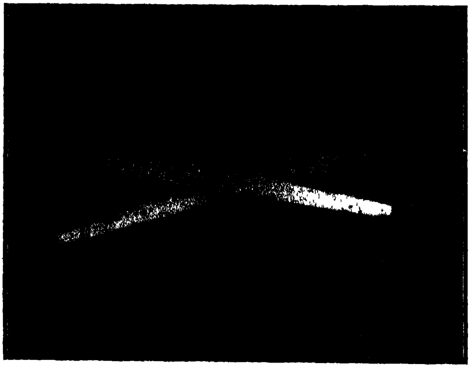
১৮১৯ পৃষ্ঠার পর

যে সব বৈজ্ঞানিকেরা আলো-কে একটা তরঙ্গের ব্যাপার বলিয়া প্রমাণিত করিয়াছিলেন গতবারে তাঁহাদের পরিচয় তোমাদের দিয়াছি। এইবার তাঁহাদের সিদ্ধান্তটিকে যথাসম্ভব পরিষ্কার করিয়া বলিতেছি।

"বস্তু" আর "তরঙ্গের" মধ্যে একটি প্রধান ভেদ আছে। এই ভেদের বিষয়ে তোমাদের কাছে পূর্ব্বেও সামান্য আভাষ মাত্র দিয়াছি। এখন তাহাকেই সম্ভবমত বিস্তার করিয়া বলিব। অতি প্রাচীনকাল হইতেই মানুষ একটা কথা শিখিয়াছে। কথাটি খুবই সরল, বলিলেই তোমরা তাহা বুঝিতে পারিবে। কথাটি এই—"একই সময়ে একই যায়গায় দুইটি বা দুইয়ের বেশি "বস্তু" থাকিতে পারে না।" মার্ব্বেল খেলিতে খেলিতে যদি হঠাৎ দেখিতে পাও যে তোমার গুলিটা অন্য গুলিটার গায়ে চটাং করিয়া ঠোক্কর লাগাইয়া এধার ওধার ছিটকাইয়া গেল না, বরং তাহার সঙ্গে মিশিয়া গিয়া একটা বেশ বড় মার্ব্বেলের গুলি হইয়া গেল তখন সে অবস্থায় কি করিবে এ সমস্যা পরীক্ষা পাশের চেয়েও হয়ত গুরুতর মনে হইবে। বোধহয় মার্ব্বেলের গুলিটাকে ভূতে পাইয়াছে মনে করিয়া যেদিকে দু'চোখ যায় চোখ বুজিয়া দৌড় দিবে। কিন্তু তোমরা সকলেই জান যে এরূপ কখনও হয় না, এবং হইতেও পারে না। কেন হয় না তাহার কারণ—ওই গুলি দুইটা মূলতঃ পদার্থময় বা বস্তু দিয়া তৈয়ারী। অতএব বস্তুর একটা প্রধান ধর্ম্ম এই যে তাহাদের একই সময়ে একই স্থানে দুইটা একত্র হইয়া থাকিতে পারে না।

কিন্তু যাহা বস্তু নয় তাহাদের এইরূপ ভাবে আচরণ করিতে কোনও বাধ্য বাধকতা নাই। মার্ব্বেলের গুলিটা তোমার পাশ দিয়া গড়াইয়া যাইতেছে। গুলিটার মধ্যে একটা বেগ আছে বলিয়াই তাহা এইরূপ ভাবে গড়াইয়া চলিতে পারিয়াছে। তুমি ঠোকা দিয়া তাহাতে আরও একটু বেগ দিয়া দাও। গুলিটার নিজের বেগ ও তোমার দেওয়া বেগ এই দুইটা একই সময়ে গুলিটার মধ্যে একত্র হইতে একটুও অসুবিধা হয় না। ফলে গুলিটা আরও জোরে গড়াইতে লাগিল। আরও একটা উদাহরণ দিতেছি। পুকুরের জলে তোমরা কয়েকজন স্নানের জন্য নামিলে। খেলাচ্ছলে হাত দিয়া জলে ঢেউ তুলিতে লাগিলে।

তোমাদের প্রত্যেকেরই তোলা ঢেউ জলের উপর একই সময়ে সমানভাবে বর্ত্তমান থাকে। একজনকার ঢেউ সরিয়া গিয়া তবে অন্যের ঢেউ সে স্থান অধিকার করিবে ইহার আবশ্যক হয় না। আরও একটা উদাহরণ দিতেছি। আকাশে একটা জোর বিজলী বাতির আলো ফেলো। তারপর অন্য একটা বাতি হইতে আর একটা আলো



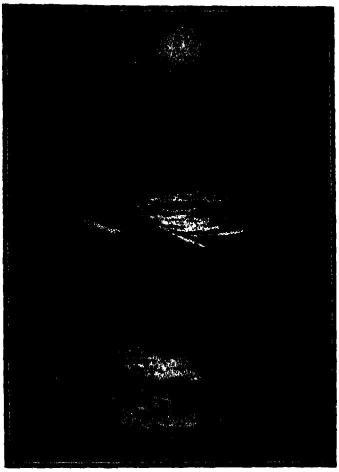
চিত্র—১

তাহাকে অতিক্রম করিয়া যাইতে দাও। আলোর রেখা দুইটা (চিত্র-১) এক যায়গায় একই সময়ে পরিষ্কার মিশিয়া গিয়া আবার নিজের পথে চলিয়া যায়। গতির বেগ, জলের ঢেউ এবং আলো ইহাদের একটাও মূলতঃ "বস্তু" নয় এবং সেই কারণেই ইহাদের যখন ইচ্ছা অনায়াসে একত্রিত হইয়া যাইতে একটুও অসুবিধা হয় না।

গতিবেগ কি উপায়ে একত্রিত হয় সে সম্বন্ধে মানুষের খুব স্পষ্ট ধারণা এখনও হয় নাই। কিন্তু দুইটা তরঙ্গ কিভাবে একত্রিত হয় তাহা আমরা জানি। আর দেখা গিয়াছে যে তরঙ্গ একত্রিত হইয়া যে ভাবে আচরণ করে আলোও ঠিক সেই ভাবেই আচরণ করিয়া থাকে; অর্থাৎ এই একত্রিত হইবার উপায়টি এই দুইটি আপাতঃ বিভিন্ন ব্যাপারের মধ্যে একই ভাবে কার্য্য করিয়া থাকে। সেইজন্য দুইটি তরঙ্গ কিভাবে একত্রিত হয় এবং একত্রিত হইলে কি ব্যাপার সংঘটিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায় তাহাই প্রথমে তোমাদের বলিব।

একটা ঢেউকে যদি ভাল করিয়া দেখা যায় তাহা হইলে তাহাতে কতকগুলি গুণ দেখিতে পাইবে। তাহাদের একটি হইল এই যে ঢেউএর এক শির হইতে অন্য শিরের যে দূরত্ব তা সব সময়েই সমান থাকে। ইহা হইতেই ঢেউটা কত লম্বা তা বুঝিতে পারা যায়। বৈজ্ঞানিকেরা ইহারই নাম দিয়াছেন "তরঙ্গান্তর" বা Wave-length। তাহারপর ঢেউতে আর একটা জিনিষ আছে। তাহা হইল ঢেউটা কত উচু। ঢেউ যত উচু হয় তার জোরও তত হয়। যদি দুইগুণ উচু হয় তবে জোর হয় চারগুণ। সমুদ্রে স্নান করিবার সময় এ কথার প্রমাণ তোমরা অনায়াসেই পাইয়া থাক। সেখানে যে ঢেউটা যত উচু হইয়া আসে তাহার জোরও তত বেশি মনে হয়। ঝড়ের মধ্যে সমুদ্রের ঢেউ দুইগুণ হইয়া উঠিলে পাকা মাঝিরা চতুর্গুণ ভয়ের কারণ দেখে। সাধারণতঃ যে ঢেউ যত উচু হয় তাকে তত বড় ঢেউ বলে। আমরা কিন্তু বড় ঢেউ বলিতে অন্য আর একটা ব্যাপারকে বুঝিব। ঢেউএর একটা মাথা বা শীর্ষ হইতে ঠিক পরের কিম্বা আগের মাথাটার দূরত্ব, অর্থাৎ ঢেউয়ের "তরঙ্গান্তর", যাহার বেশি হইবে তাহাকেই আমরা বৃহত্তর ঢেউ বলিব।

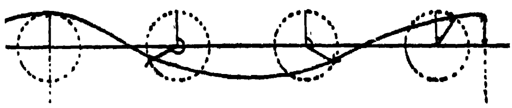
অর্থাৎ ঢেউএর তরঙ্গান্তরের বড় বা ছোট দিয়া ঢেউএর বড় বা ছোট হওয়া আমরা নির্দ্দেশ করিব। আর তাহার উচ্চতার কম কিম্বা বেশি হওয়ার দিক্ দিয়া তাহাতে কতজোর আছে তাহা নির্দ্দেশ করিব। তৃতীয় জিনিষ হইল ঢেউয়ের "মুখ"। ইহা বোঝান



চিত্র—২

একটু কঠিন হইবে। মনে কর, সমুদ্রের একটা ঢেউ তোমার দিকে আগাইয়া আসিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে জলটা ক্রমাগত উঠিতেছে এবং পড়িতেছে। কখনও সে কোনও একটা সময়ে আমরা জানিতে চাই যে এই বিশেষ যায়গায় জলের অবস্থাটা কি ভাবে রহিয়াছে তবে আমাদের বলিতে হইবে যে ইহা এতটা উঠিয়াছে কি এতটা নামিয়াছে বা সম্পূর্ণ উঠিয়া গিয়াছে ইত্যাদি। ঢেউএর এই ব্যাপারটাকেই আমরা এক কথায় বলিয়া থাকি যে এ সময়ে ঢেউএর মুখ কোথায় রহিয়াছে। অতএব কোনও সময়ে ঢেউএর কথা বর্ণনা করিবার সময় যদি বলা যায় (চিত্র ৩) তখন তার মুখটা কোথায়, ঢেউটা কত উঁচু আর তার তরঙ্গান্তর কত তবে সে ঢেউ সম্বন্ধে মোটামুটি ভাবে সবই জানা হইয়া যায়।

এ ছাড়া ঢেউএর আরও দুটি গুণ আছে। মনে কর জলের উপর দিয়া অনবরত ঢেউ চলিয়া যাইতেছে। জলের উপর একটা ছোট পাতা ভাসিতেছে। যে কয়টা ঢেউ সেই পাতাটার কাছ দিয়া চলিয়া যাইবে পাতাটা ততবার কাঁপিতে থাকিবে। মনে কর এক মিনিটে ২০টা ঢেউ সেই পাতাটাকে ২০ বার কাঁপাইয়া গেল, তার মানে এই যে এক মিনিট সময়ের মধ্যে ওই জায়গাটা দিয়া ২০টা ঢেউ চলিয়া গেল। অর্থাৎ পাতাটা কাঁপিবার সংখ্যা দিয়া এক মিনিটের ঢেউয়ের সংখ্যা আমরা পাই। এই "কম্পন সংখ্যাটা" ঢেউএর



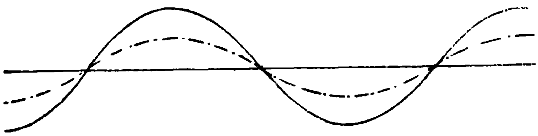
চিত্র—৩

একেবারে ঢেউএর শিখরে পৌঁছিতেছে, কখনও মাঝামাঝি রহিতেছে পর মুহূর্ত্তে তলাইয়া যাইতেছে। অতএব যদি সম্পর্কে একটি অতিশয় প্রয়োজনীয় তথ্য, কারণ ইহাকে লইয়া আমরা ঢেউয়ের "গতি" বাহির করিতে পারি।

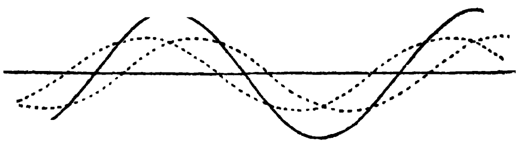
ঢেউয়ের কম্পন সংখ্যা যদি ২০ হয় তবে একমিনিটে এক স্থান দিয়া ২০টা ঢেউ চলিয়া যাইতেছে বুঝিতে হইবে। এক একটা ঢেউ যদি দুই গজ লম্বা হয় অর্থাৎ ঢেউয়ের "তরঙ্গান্তর" যদি দুই গজের হয় তাহা হইলে এক মিনিটে প্রথম ঢেউটা কতটা চলিয়া গিয়াছে তাহা আমরা অনায়াসে বাহির করিতে পারি। প্রথম ঢেউটা তখন ২০টা ঢেউ দূরে সরিয়া গিয়াছে—এবং এক একটা ঢেউ যদি দুই গজ করিয়া হয় তবে প্রথম ঢেউটা ২০×২ অর্থাৎ ৪০ গজ দূরে চলিয়া গিয়াছে। অতএব ঢেউএর চলিয়া যাইবার গতি হইল ১ মিনিটে ৪০ গজ "২০" হইল ঢেউয়ের কম্পন সংখ্যা এবং ২ গজ হইল তাহার তরঙ্গান্তর। এই দুইটাকে অর্থাৎ "কম্পন-সংখ্যা" দিয়া "তরঙ্গান্তর"কে পূরণ দিলেই ঢেউয়ের "গতি" তুমি পাইয়া গেলে।

অতএব ঢেউয়ের মধ্যে পাঁচটা বিষয় আছে। তাহা এই—তরঙ্গান্তর, উচ্চতা, মুখ, কম্পন-সংখ্যা এবং গতি। ঢেউয়ের কথা বলিবার সময় আমরা অনবরত এই পাঁচটা বিষয়ের কথা বলিব।

এইবার আমরা দুইটা ঢেউকে একত্র করিয়া দেখিব কি ব্যাপার দাঁড়ায়। বুঝিতে সোজা হইবে বলিয়া আমরা দুইটা একই রকমের ঢেউ লইয়া একত্র করিতে চেষ্টা করিব। ছবিতে (চিত্র—৪) ঢেউ দুইটা একই সময়ে একই স্থান হইতে চলিতে আরম্ভ করিতেছে। একটা ঢেউ বিন্দু চিহ্ন দিয়া দেখান হইতেছে, এবং অন্যটাকে ভগ্নরেখা দ্বারা দেখান হইয়াছে। দুইটা মিলিয়া যে ঢেউটি হইল তাহাকে অভগ্ন রেখাটি দিয়া দেখান হইয়াছে। ছবিটি দেখিলে বুঝিবে যে প্রথম দুইটি ঢেউয়ের উচ্চতা (amplitude) কে প্রত্যেক স্থানে যোগ করিয়া তবে একত্রিত হওয়া ঢেউটি গড়িয়া উঠিয়াছে। তৃতীয় ঢেউটি সেইজন্য প্রথম দুইটি অপেক্ষা দুইগুণ উচু হইয়াছে। এই একত্রিত হওয়া ঢেউটির উচ্চতা শুধু দুইগুণ হইয়াছে, কিন্তু তাহার তরঙ্গান্তর এবং তরঙ্গমুখ (phase) কিছু বদলায় নাই। যদি প্রথম ঢেউ দুইটী একই সময়ে না চলিয়া একটি অপরটির কিছু পরে চলিত তবে একত্রিত হওয়া ঢেউটির উচ্চতা এবং তরঙ্গমুখ (phase) প্রথম দুইটী অপেক্ষা স্বতন্ত্র হইয়া যাইত। (চিত্র—৫) ইহা দেখান হইয়াছে। চিত্রটির মধ্যে অভগ্ন রেখাটি সম্মিলিত



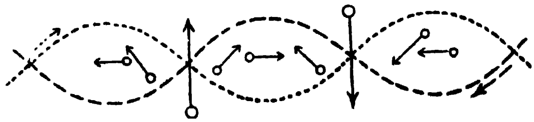
চিত্র—৪



চিত্র—৫

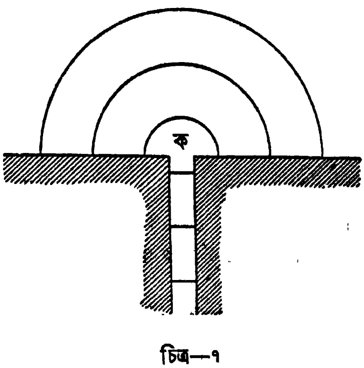
তরঙ্গটিকে নির্দ্দেশ করিতেছে ইহাও অবশ্য প্রথম দুইটি ঢেউএর উচ্চতা গুলি প্রত্যেক স্থানে যোগ করিয়া তবে তৈয়ারী হইয়াছে। এখন যদি একটি ঢেউ অন্য ঢেউএর এতটুকু পিছনে পিছনে চলিতে থাকে যে সম্মুখের ঢেউটী সর্ব্বদা তাহার আধখানা ঢেউ আগাইয়া রাখে তাহা হইলে একটী অদ্ভুত ব্যাপার হয়। দুইটি ঢেউয়ের উচ্চতাগুলি প্রত্যেক স্থানে যোগ করিলে যে ঢেউ জন্মায় তাহার কোনই উচ্চতা থাকে না। অর্থাৎ একটা ঢেউ অন্যটির মধ্যে মিশিয়া যায়। এক্ষেত্রে ঢেউ দেখিতে পাওয়া যায় না অথচ ঢেউ চলিতে থাকে। মজা দেখ—দুইটা ঢেউ পরস্পারের সহিত মিশিয়া ঢেউয়ের অস্তিত্ব গোপন করিয়া লইল। দুইটা মার্ব্বেলের গুলি মিশিয়া গিয়া একটা বড় মার্ব্বেলের গুলি তৈয়ারী হওয়া কল্পনা করা হয়ত অসম্ভব হইবে না, কিন্তু মিশিয়া গিয়া সে স্থানে কিছুই থাকিবে না, শূন্য হইয়া যাইবে ইহা অতিশয় কঠিন কল্পনা। যাহা বস্তু বা পদার্থে সম্ভব নহে তরঙ্গের বেলা তাহা অনায়াসে সর্ব্বসময়েই হইয়া থাকে। অতএব দুইটা আলো-কে মিশাইয়া যদি সেইস্থান আলোহীন হইয়া পড়ে তবে "আলো"কে বস্তুমূলক বলা আর চলে না, বরং তরঙ্গই বলিতে হয়।

তরঙ্গের একত্রিত হইবার আর একটা উদাহরণ (চিত্র—৬) হইতে পাওয়া যাইবে। এখানেও দুইটি একই রকমের তরঙ্গ লইয়া একত্রিত করা গিয়াছে। একই রকম বলিবার অর্থ এই যে ইহাদের তরঙ্গান্তর (Wave-length) ও উচ্চতা (amplitude) একই রকম। প্রভেদের মধ্যে ইহাই যে দুইটা বিপরীত দিক হইতে আসিতেছে। এইরকম দুইটি তরঙ্গ একত্রিত হইলেও একটি অদ্ভুত ব্যাপার লক্ষিত হয়। সম্মিলিত তরঙ্গটি যেন গতিহীন ঢেউএর আকার ধারণ করে। যে যায়গায় তরঙ্গ উত্থিত হইতেছে তাহার স্থানে স্থানে একেবারে স্থির থাকে এবং স্থানে স্থানে খুব কম্পন হইতে থাকে। মনে হয় তরঙ্গটি যেন কোনও কারণে গতিহীন স্তব্ধ হইয়া পড়িয়াছে। পূর্ব্বে একরকম ঢেউএর দৃষ্টান্ত দিয়াছিলাম যাহাতে তরঙ্গ ছিল না অথচ গতি ছিল ইহা তাহার বিপরীত—ইহাতে তরঙ্গ সম্পূর্ণভাবে বর্ত্তমান থাকে অথচ তরঙ্গের গতি বাহিরের দৃষ্টিতে বিলুপ্ত হইয়া যায়।



চিত্র—৬

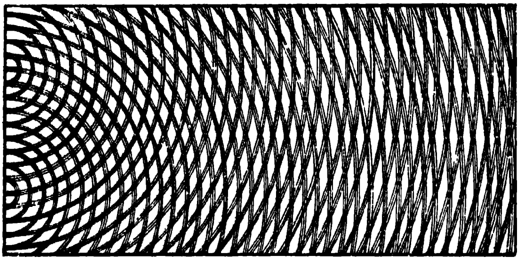
তরঙ্গ সম্মিলিত হওয়ার এই উদাহরণগুলি এইজন্য এত-বিস্তারিত ভাবে তোমাদের



চিত্র—৭

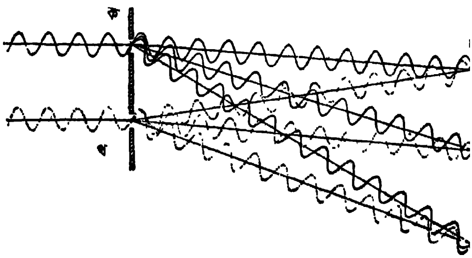
বলিতেছি যে এইগুলি ব্যবহার করিয়াই

আলোও যে তরঙ্গেরই ব্যাপার তাহা প্রমাণিত হইয়াছিল। হুইগেন্স বলিতেন যদি আলো তরঙ্গ না হইয়া ধনু হইতে নিক্ষিপ্ত তীরের মত বস্তুময় কিছু হইত তাহা হইলে যখন প্রণালীতে যে জল আছে তাহাতে ঢেউ উঠিয়া হ্রদের দিকে চলিতে লাগিল। ঢেউ গুলি জলাশয়ে পৌঁছিয়াই বৃত্তাকার হইয়া জলের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। (চিত্র—৭) দুইটি



চিত্র – ৮

আলোর দুইটী রশ্মি একত্রিত করা হয় তখন তাহাদের মধ্যে ঠোকাঠুকী নিশ্চয়ই হওয়া উচিত এবং সম্মিলিত স্থান হইতে আলোর চতুর্দ্দিক ছড়াইয়া পড়া উচিত। কিন্তু তরঙ্গের সম্মিলিত হওয়ার ব্যাপার আলোতে প্রণালীর মুখ দিয়াই এইভাবে একই রকমের ঢেউ ছড়াইয়া পড়িতে লাগিল। (চিত্র—৮) এইবার দেখা যাক হ্রদের জলে এই দুইটি ঢেউ মিশিয়া কি আকার ধারণ করে। হ্রদের প্রত্যেক স্থানেই দুইটি মুখ হইতে



চিত্র —৯

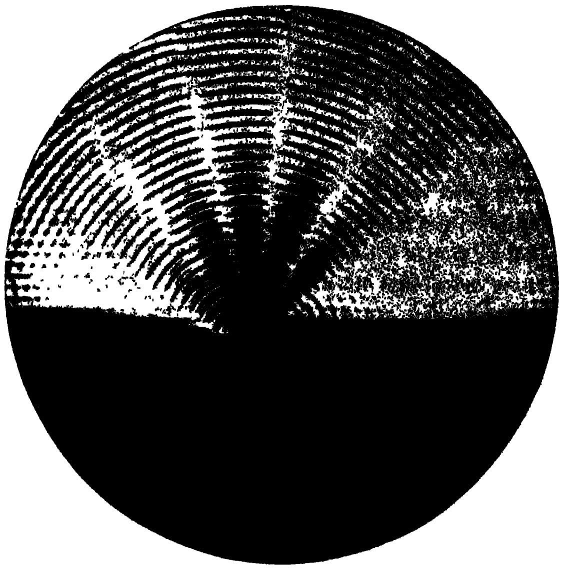
আরোপ করিলে এইরূপ সম্মিলিত স্থান হইতে আলোর চতুর্দ্দিকে ছড়াইয়া পড়িবার আবশ্যক হয় না।

মনে কর একটি খুব বড় জলাশয়ে ছোট ছোট দুইটী প্রণালী দিয়া জল আনিবার ব্যবস্থা আছে। এই ছোট দুইটী আগত দুইটী ঢেউএর উচ্চতা এক সঙ্গে যোগ করিলেই তাহা পাওয়া যাইবে। (চিত্র—৯) চিত্রের মধ্যে এই ব্যাপারটা কিরূপে হইবে আর এক ভাবে তাহা দেখান হইয়াছে। ক এবং খ হইল দুইটী প্রাণালীর মুখ। একটিতে বিন্দু চিহ্নিত ঢেউ বাহির হইতেছে, অন্যটিতে

রেখা চিহ্নিত ঢেউ বাহির হইতেছে। হ্রদের মধ্যে প ফ ভ এই রেখাটির উপর তরঙ্গ দুইটী মিলিত হইয়া কি আচরণ করিবে তাহাই দেখা যাক্। প স্থানটি ক এবং খ হইতে সমদূরে আছে। এইখানে তরঙ্গ দুইটি একই মুখে সম্মিলিত হইয়া একটি বৃহত্তর তরঙ্গের সৃষ্টি করিবে। অন্য একটি স্থান ফ—এখানে আমরা দেখিতেছি যে তরঙ্গদুইটি বিপরীত মুখে মিলিতেছে। অতএব তাহারা পরস্পরকে বিনাশ করিয়া ফেলিবে সুতরাং সেখানকার জল স্থিরভাবেই রহিবে। মাপিলে দেখিতে পাইবে যে খ হইতে ফ-এর দূরত্ব ক হইতে ফ-এর দূরত্বের ঠিক অর্দ্ধ তরঙ্গান্তর কম। ভ-তে আবার দুইটা তরঙ্গই একই মুখে সম্মিলিত হইতেছে। এখানে আবার হ্রদের জল দুইটি তরঙ্গের সম্মিলনে দুইগুণ উঁচু হইয়া এবং চারগুণ জোরে আলোড়িত হইতে থাকিবে। সব মিলাইয়া সমস্ত হ্রদের জলটা ব্যাপিয়া কতকগুলি রেখায় জলটা একটুও নড়িবে না এবং সেই রেখাগুলির মাঝে মাঝে যে জল থাকিবে তাহা চারগুণ শক্তিতে আলোড়িত হইতে থাকিবে। (চিত্র—১০) ছবিতে ইহা দেখিতে পাইবে।

জলের উপর দুইটী তরঙ্গ সম্মিলিত হইলে যে চমৎকার ব্যাপারটি সংঘটিত হইতে দেখিতে পাওয়া যায়, যেখানে যেরূপ তরঙ্গই হউক না কেন ওই ভাবে

[তরঙ্গ একত্রিত হইলে কি ভাবে তাহারা পরস্পরকে গোপন করিয়া ফেলে তাহা এই ছবিটিতে খুব স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারা যাইবে। একটি পাত্রে খানিকটা পারদ রাখিয়া সেই পারদকে দুই ভাগেভাগ করিয়া একটি অন্তরাল রাখা হইয়াছে। এই অন্তরালের মধ্যে দুইটি ছোট ছিদ্র করা হইয়াছে। এই বিভাজিত পারদের এক-দিকে তরঙ্গ তুলিলে সেই তরঙ্গ অন্তরালটির ছিদ্র দিয়া অন্যদিকে প্রসারিত হয়। ছিদ্র দুইটি ভেদ করিয়া আগত তরঙ্গদুইটি পরস্পরের সঙ্গে একত্রিত হইয়া পারদের স্থানে স্থানে যুক্ত তরঙ্গ সৃষ্টি করে এবং স্থানে স্থানে তাহাকে একেবারে স্থির করিয়া রাখে। এই ব্যাপারটিই ছবিতে দেখান হইয়াছে। ছবিটির উপরিভাগে সাদা রেখাবৃত স্থানগুলিতে যদিও তরঙ্গ বর্ত্তমান তথাপি সেখানকার পারদ স্থিরভাবেই রহিয়াছে।]



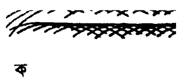
চিত্র—১০

একত্রিত হইলে একইরূপ ব্যাপার দেখা যাইবে। কিন্তু আলোর বেলা আমরা সাধারণতঃ সেরূপ দেখিতে পাই না। তাহার প্রধান কারণ এই যে, যে—আলো আমরা দেখিতে পাই, তাহা যে-তরঙ্গ দিয়া তৈয়ারী তাহার তরঙ্গান্তর খুবই কম। এত ছোট যে এক ইঞ্চি স্থানের মধ্যে এই আলোর প্রায় ৫০,০০০ তরঙ্গ থাকিতে পারে। সেইজন্যই আলোক তরঙ্গের সম্মিলিত হওয়া দেখিতে হইলে যে প্রণালী বা ছিদ্র দিয়া আলো-কে ঢুকিতে দিতে হইবে তাহা খুবই সূক্ষ্ম হওয়া দরকার। তখন দেখিতে পাইবে যে আলো ছিদ্রটি দিয়া রেখাকারে বাহির হইতেছে না, বরং জলের প্রণালী দিয়া বাহির হইয়া হ্রদের মধ্যে ঢেউগুলি যেমন বৃত্তাকার হইয়া সবদিকে ছড়াইয়াছিল আলোও ছিদ্র দিয়া বাহির হইয়া ঘরের সব দিকেই ছড়াইয়া পড়িতেছে। খুব কাছাকাছি দুইটা একইরূপ ছিদ্র কর। এই ছিদ্র দুইটি দিয়া কোনও একরঙা আলো যাইতে দাও। তখন দেখিতে পাইবে যে ছিদ্র দুইটি দিয়া আলো বাহির হইয়া যেখানে যেখানে সম্মিলিত হইতেছে সেখানটা সমান ভাবে আলোকিত হইতেছে না, বরং অন্ধকার রেখার দ্বারা চিহ্নিত হইয়া গিয়াছে। এইবার বুঝিতে পারিতেছ যে, আলো মূলতঃ ঢেউ বলিয়াই, সে যেখানে যেখানে বিপরীত মুখে আসিয়া মিলিত হইয়াছে সেই সেই স্থানে একটী ছিদ্র হইতে আগত আলোর ঢেউ অন্যটির ঢেউটিকে বিলুপ্ত করিয়া ফেলিতেছে। এইরূপে সেই স্থানটি আলোকহীন হইয়া উঠিতেছে এই অতি সুন্দর পরীক্ষাটি ১৮০১ খৃষ্টাব্দে টমাস ইয়ং নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন। পরীক্ষাটি কত কঠিন তাহা নীচের কথাগুলি পড়িলেই বুঝিতে পারিবে। ইয়ং সাহেব পাশাপাশি যে দুইটি ছিদ্র রাখিয়াছিলেন তাহাদের পরস্পরের দূরত্ব ছিল ১।২০ ইঞ্চি। যে পর্দাটির উপর আলোর ঢেউ আসিয়া পড়িয়া একটি অন্যকে বিলুপ্ত করিয়া আঁধার রেখার সৃষ্টি দেখাইয়াছিল তাহা ছিদ্র দুইটি হইতে এক গজ পিছনে ছিল। এবং পর্দার উপরের আঁধার রেখাগুলি পরস্পরের ১।১০ ইঞ্চি দূরে দূরে তৈরী হইয়াছিল। ইয়ং এই পরীক্ষাটি নিষ্পন্ন করিয়াছিলেন অতি সামান্য উপকরণ লইয়া। কিন্তু খুব প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড অদ্ভুত সব যন্ত্রপাতি ব্যবহার করিয়াও ইহার মত আশ্চর্য্য একটি পরীক্ষা পদার্থ বিজ্ঞানের ইতিহাসে খুব বেশি কেহ দেখাইতে পারে নাই।

তরঙ্গ পরস্পরে একত্রিত হইলে কি হয় তাহা তোমরা কতকটা জানিলে। এইবার তরঙ্গ সম্পর্কে আর একটি ব্যাপার তোমাদের বলিব। মনে কর অনেকগুলি তরঙ্গ পাশাপাশি থাকিয়া পরস্পরের সাহায্যে আগাইয়া যাইতেছে। এই অবস্থায় মাঝের দিকে যে তরঙ্গগুলি আছে তাহার দুই পার্শ্বের তরঙ্গের সাহায্য সম্পূর্ণ ভাবেই পাইতেছে। কিন্তু যে তরঙ্গটি একেবারে প্রান্তভাগে রহিয়াছে তাহার সাহায্যের জন্য তাহার একদিকে কোন তরঙ্গই বর্ত্তমান নাই। এই অবস্থায় এই শেষের তরঙ্গ কয়টি নানারূপ অশাস্ত্রীয় আচরণ করিয়া নিজেদের তরঙ্গত্বের প্রকৃতিটিকে লোক চক্ষুতে ধরাইয়া দেয়।

প্রথম কথা, এইরূপ প্রান্তের তরঙ্গ আমরা কোথায় পাই। উত্তর খুবই সরল। জানালা দিয়া ঘরে আলো আসিতেছে। আলোর পথে কোনও বস্তু ধরিয়া রাখ। বস্তুটা কতকগুলি আলোর তরঙ্গকে আগাইয়া আসিতে বাধা দিবে। অতএব এই বাধার কিনারার নিকট দিয়া

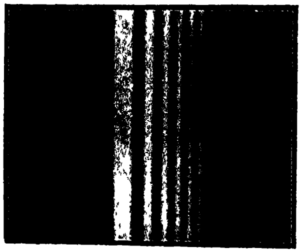
যে তরঙ্গগুলি চলিয়া আসিবে তাহার এক পাশের অবস্থা অন্য পাশের অবস্থার মত থাকিবে না। তাহার একপাশে থাকিবে আলোর তরঙ্গ এবং অন্যপাশে থাকিবে একটা কঠিন বস্তু। এই তরঙ্গগুলি বস্তুটার ছায়ার কিনারাতে নানারকমের অদ্ভুদ ব্যাপার সৃষ্টি করে এবং ছায়াকে পরিষ্কার হইয়া উঠিতে দেয় না। যদি আলো কণা দিয়া তৈয়ারী হইত তাহা হইলে ছায়ার ধার এইরূপ অপরিষ্কার হইত না। আলো যে খুব পরিষ্কার ছায়া তৈরী করিতে পারে না তাহা ইয়ংএর ও বহু পূর্ব্বে (১৬৬৫ খৃষ্টাব্দে) গ্রীমাল্ডি (Grimaldi) নামে একজন



চিত্র—১১

বৈজ্ঞানিক দেখাইয়াছিলেন। অবশ্য ব্যাপারটির সঠিক ব্যাখ্যা দিয়াছিলেন Augustus Jean Fresnel। ইঁহার কাহিনী তোমরা পূর্ব্বেই শুনিয়াছ।

এইবার ছায়ার ধারে কি ব্যাপার হয় তাহাই বলিতেছি। তরঙ্গগুলিকে যে বস্তুটি বাধা দিতেছে (চিত্র—১১) চিত্রটিতে ক দিয়া তাহার একটি কিনারা দেখান হইতেছে। ক হইতে দূরে থাকিয়া যে তরঙ্গগুলি যায় তাহারা পূর্ব্বের মত সোজা হইয়া চলিয়া যাইতে পারে। কি ভাবে তাহারা পরস্পরের সাহায্যে চলিতে থাকে তাহা ছবিতে দেখান হইয়াছে। কিন্তু ক-এর খুব নিকট দিয়া যে তরঙ্গগুলি যাইতেছে তাহাদের একধারে তরঙ্গের সংখ্যা একেবারে কমিয়া গিয়াছে। এইজন্য তাহারা পরস্পরকে সোজাভাবে অগ্রসর হইতে দিবার পরিবর্ত্তে নিজেদের



চিত্র—১২

মধ্যে কাটাকাটি বাধাইয়া বসে। ফলে দাঁড়ায় যে ক গ এইদিকে বস্তুটার পরিষ্কার ছায়া পড়িতে পারে না। ছায়াটার মধ্যে খানিকটা আলো ঢুকিয়া পড়ে এবং তাহার পরে কতকটা স্থান ব্যাপিয়া চিরুণীর দাঁতের মত করিয়া আলো এবং অন্ধকারের রেখা দেখিতে পাওয়া যায়। ১২—নং চিত্র



চিত্র—১৩

দেখিলে তোমরা ব্যাপারটা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারিবে। এই কারণে আমরা নানা-রকম ছায়া তৈরী হইবার চিত্র (চিত্র ১৩, ১৪, ১৫,১৬) দিলাম। ইংরাজীতে এইব্যাপারটিকে

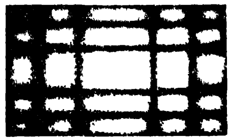
diffraction বলে। Diffraction এর বাংলা তর্জ্জমা করিলে "ভাঙা তরঙ্গের কীর্ত্তি" এই অর্থ দাঁড়ায়।

আলো-কে তরঙ্গ বলার পক্ষে সব চেয়ে বড় অন্তরায় আমাদের চোখে আলোর রশ্মি হইয়া অগ্রসর হওয়া। আলোক-রশ্মিও যে মূলতঃ তরঙ্গ দিয়া তৈরী তাহা diffraction এর ব্যাপারেই আমাদের ধরাইয়া দেয়। ঘরের জানালায় একটি ছোট ছিদ্র দিয়া রৌদ্র প্রবেশ করিতেছে। ছিদ্রটি দিয়া যে আলো ঘরে ঢুকিতেছে। তাহা হইতে আলো যে রশ্মি আকারে সরল রেখায় যাইতেছে তাহা আমাদের বুঝিতে একটুও কষ্ট হয় না। তা ছাড়া রশ্মি-টির ধারগুলা যথেষ্ট স্পষ্ট ও পরিষ্কার বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নিরীক্ষণ করিয়া দেখিলে যতটা পরিষ্কার এবং সুস্পষ্ট প্রথমে দেখায় তাহা আর পাওয়া যায় না। ইহার কারণ এই যে সূর্য্য নিজে একটা বড় বস্তু এবং সূর্য্যরশ্মির প্রত্যেক অংশ দিয়া আলোটা তৈয়ারী হইয়াছে বলিয়া আলোর ধারগুলা আমরা যতটা আশা করি তত পরিষ্কার হইয়া



চিত্র—১৪

উঠে না। ধারগুলাকে আরও সুস্পষ্ট ও পরিষ্কার করিতে হইলে প্রথম ছিদ্রটার সামনে আরও একটা ছিদ্র এমন ভাবে রাখিতে হইবে যাহাতে ঘরের মধ্যে যে আলো প্রবেশ লাভ করিতেছে তাহা যেন দুইটা ছিদ্র ভেদ করিয়া তবে আসিতে পারে। এইরূপ করিলে সূর্য্য শরীরের সামান্য অংশ দিয়াই আলো পাওয়া যাইবে এবং সঙ্গে সঙ্গে ঘরের ভিতরে যে আলো ঢুকিতেছে তাহার কিনারা আরও সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। এইভাবে পরিষ্কার রেখা-কার আলো পাইবার পর আমাদের এইরূপ মনে হওয়া কিছুই বিচিত্র নয় যে আমরা সত্যকারের আলোর রশ্মি পাইয়াছি।



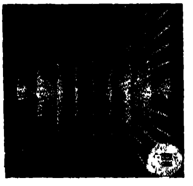
চিত্র—১৫

একটি ছোট চতুষ্কোণ ছিদ্রের মধ্যে আলো ঢুকিয়া এইরূপ আলো ও ছায়ার প্যাটার্ণ তৈয়ারী করিয়াছে। চিত্রটির নীচে, ডানদিকের কোণে এই চতুষ্কোণ ছিদ্রটি দেখান হইয়াছে।

এইভাবে যে আলোটিকে ছিদ্র ভেদ হইয়া ঘরের ভিতরে আমরা পাইলাম তাহা অবশ্য অনেকগুলি আলোর রশ্মি একত্র হইয়া তবে তৈয়ারী হইয়াছে। এই রশ্মি সমষ্টি হইতে একটিমাত্র আলোক-রশ্মি আমরা এইবার আলাদা করিয়া লইবার চেষ্টা করিব। কি উপায়ে তাহা হইতে পারে তাহা অবশ্য খুবই স্পষ্ট। ছিদ্র দুই-টিকে ছোট করিয়া দাও। বেশ, তাহাই করা গেল, এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোক রশ্মিটিও সরু হইয়া উঠিল। অর্থাৎ মূল রশ্মি হইতে অনেকগুলি রশ্মি কমিয়া গেল। এইবার ছিদ্রদুইটিকে আরোও ছোট করিয়া দাও। রশ্মির সংখ্যাও সঙ্গে সঙ্গে আরও কমিয়া যাইবে। তোমরা এইবার ভাবিতেছ যে ছিদ্র দুইটির আয়তন কম করিতে করিতে অবশেষে এমন অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিবে যখন তাহারা একটিমাত্র রশ্মিকেই

গলিয়া যাইতে দিবে এবং বাকিগুলা আটকাইয়া যাইবে। কিন্তু আসল ব্যাপার তাহার ধার দিয়াও যায় না। প্রথম প্রথম অবশ্য ছিদ্রের আয়তন কমার সঙ্গে সঙ্গে রশ্মির আয়তনও কমিবে কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এমন এক অবস্থায় আসিয়া পৌঁছিবে যখন তাহা আর কমিবে না। এইবার যদি ছিদ্রটিকে ক্ষুদ্রতর করিতে যাও ঘরের মধ্যে আলোকের রেখাটি আরোও সরু হইবার পরিবর্ত্তে মোটা হইতে আরম্ভ হইবে। এবং শেষ পর্য্যন্ত যখন ছিদ্রটি অতিশয় ক্ষুদ্র হইয়া যাইবে তখন হয়ত সারা ঘরেই আলো ছড়াইয়া পড়িবে। আমরা একটী মাত্র আলোকরশ্মি পাইবার চেষ্টা করিতেছিলাম, কিন্তু সে চেষ্টার ফল এই হইল যে আমরা আলোকের রশ্মিত্বকেই হারাইয়া ফেলিলাম।

প্রকৃত কথা বলিতে আলোকের রশ্মি বলিয়া কোনও কিছু নাই বরং সেইজন্যই একটিমাত্র রশ্মিকে আলাদা করিয়া পাইবার চেষ্টা করিতে যাইয়া আমাদের বিফল হইতে হইয়াছিল। অনেকগুলা ঢেউ যখন পরস্পরের সাহায্যে একদিকে চলিতে থাকে তখন তাহাদের প্রান্তের ঢেউগুলা আলো এবং অন্ধকার যে যায়গায় আসিয়া একত্রে মিলিয়াছে সেখানে diffraction রেখা তৈয়ারী করে ইহা তোমরা একটু আগে দেখিয়াছ। সংখ্যায় অল্প বলিয়া এই প্রান্তস্থিত ঢেউগুলির জোর ভিতরের মূল ঢেউগুলির তুলনায় অনেক অল্প হয়। এই জন্য সাধারণতঃ আমাদের কাছে আলোর diffraction স্পষ্ট হইয়া ওঠে না। এই অবস্থায় আলোকে আমরা একদিকেই চলিয়া যাইতে দেখি আর সেইজন্য তাহা আমাদের রশ্মি বলিয়া ভ্রম হয়। কিন্তু ভিতরের ঢেউএর সংখ্যা অল্প হইয়া গেলে প্রান্তের diffractionটা প্রধান হইয়া উঠে। এই অবস্থায় আলোর ঢেউএর সম্মুখে সোজা চলিয়া যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে diffractionএর জন্য তাহার সীমার বাহিরে ছড়াইয়া পড়াটাও আমাদের কাছে প্রকাশ হইয়া উঠে। অবশেষে মূল ঢেউ গুলির সংখ্যা যখন একেবারে কমিয়া যায় তখন diffractionটাই প্রধান হইয়া পড়ে! এখন আলোকের রশ্মিত্ব একেবারে লুকাইয়া যায় আর সমস্ত ঘরটাতেই যে আলোকের ঢেউ বর্ত্তমান রহিয়াছে তাহা আমাদের কাছে সম্পূর্ণ স্পষ্ট হইয়া উঠে। আলো মূলতঃ তরঙ্গ না হইলে তাহার এই ভাবে নিজের সীমার বাহিরে ছড়াইয়া পড়ার সাধ্য ছিল না।



চিত্র—১৬

ঠিক কি অবস্থাতে এই diffraction-এর জন্য ছড়াইয়া পড়া ঢেউগুলি মূল ঢেউগুলির উপর প্রাধান্যলাভ করে তাহা স্থির হয় ছিদ্রটির আয়তন ও ঢেউগুলির তরঙ্গান্তরের দ্বারা। যখন ছিদ্রটির আয়তন ঢেউগুলির তরঙ্গান্তর হইতে অনেক বড় হয় তখন তাহার ভিতর দিয়া যে আলো ভেদ হইয়া যায় তাহা রশ্মির আকার পায়। এ সময় সাধারণ দৃষ্টিতে আলোর সীমারেখা মোটামুটি ভাবে পরিষ্কার থাকিতেই দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু যখন ছিদ্রটির আয়তন আলোর ঢেউগুলির তরঙ্গান্তরের পর্য্যায় আসিয়া পৌঁছায় তখন এই সীমারেখাটি অস্পষ্ট হইয়া উঠে। যখন ছিদ্রটী তরঙ্গান্তরের সমান আয়তনের

হয় তখন আলো প্রায় ৩০ ডিগ্রীতে ছড়াইয়া যায়, এবং যখন ছিদ্রটী অর্দ্ধ তরঙ্গান্তরের আয়তন পায় তখন আলো সবদিকেই প্রায় সমানভাবেই ছড়াইয়া যায়। এই অবস্থায় আলোকে রশ্মি বলিয়া অভিহিত করার কোনই সার্থকতা থাকে না।

Diffractionএর এই ব্যাপারগুলি হইতে অমরা একটা কথা স্পষ্ট করিয়া বুঝিতে পারি। আলো যে-বস্তুর দ্বারা বাধা প্রাপ্ত হইয়া ছায়া তৈয়ারী করে তাহার আয়তন যদি আলোর ঢেউএর একই পর্য্যায়ে হয় তবে সে অবস্থায় আলোর তরঙ্গত্ব প্রকাশ হইয়া পড়ে। বাধা অথবা ছিদ্র বড় হইলে এই ব্যাপারটী তখন স্পষ্ট হয় না। পূর্ব্বকালের বৈজ্ঞানিকগণ এই বিষয়টী পরিষ্কার ভাবে বুঝিতেন না বলিয়া তাঁহারা আলো যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কণা দিয়া তৈয়ারী এই কথা বলিতেন। আজকাল কিন্তু শুধু আলোকেই যে তরঙ্গমূলক বা কম্পনমূলক বলা হয় তাহাই নহে। এই পৃথিবীতে যে-কোনও বস্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় পাওয়া যায় তাহারা সবই তরঙ্গময় এবং ইহা প্রমাণিত হইয়াছে উল্লিখিত diffractionএর পরীক্ষা দ্বারা। এ ক্ষেত্রেও অতিশয় সূক্ষ্ম বাধা বৈজ্ঞানিকেরা যখন তৈরী করিতে পারিলেন তখনই সাধারণ বস্তুও যে তরঙ্গমূলক তাহা ধরা পড়িয়াছে।

অতএব পৃথিবীতে কঠিন বস্তু বলিয়া কিছুই নাই। সবই তরঙ্গময়। এই তরঙ্গের অবস্থা ভেদে তাহাকে আমরা বস্তু বলি এবং অন্য সময়ে তাহাকে আমরা তরঙ্গ বলিয়া থাকি। আলোও এইভাবে আমাদের অভিজ্ঞতায় প্রথম দৃষ্টিতে বস্তু কণার মত হইয়া রশ্মি আকারে প্রকাশ পায়, কিন্তু অবশেষে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পরীক্ষা ও গবেষণায় মানুষের ততোধিক সূক্ষ্মদৃষ্টির নিকট নিজের তরঙ্গত্ব আর গোপন রাখিতে পারে না।



বাংলাদেশের রূপকথা

বড় —না বুদ্ধি বড় ?

১৯৭৩ পৃষ্ঠার পর

দুই বন্ধু—বন্ধু নয়ত যেন মাণিক-জোড় পাখী। একজন রাজার ছেলে আর একজন মন্ত্রীর পুত্র।

এই এতটুকু বয়েস থেকে—তারা এক সঙ্গে খেতো—এক সঙ্গে খেলা করত এবং একই সঙ্গে ঘুমুত।

একদিন তারা দুটি বন্ধুতে মিলে গল্প করছে—রাজপুত্র মন্ত্রীপুত্রকে জিজ্ঞেস করলে—আচ্ছা বন্ধু, বিদ্যা বড় না বুদ্ধি বড় ?

মন্ত্রীপুত্র তৎক্ষণাৎ জবাব দিলে নিশ্চয়ই বুদ্ধি।

রাজপুত্র মাথা নেড়ে বল্লেন, না বন্ধু আমি তোমার সঙ্গে একমত হ'তে পাচ্ছিনে।

এই নিয়ে দুইজনে মহা তর্ক-বিতর্ক। কিন্তু তাতে কেউ কাউকে দলে টান্‌তে পারলেন না।

শেষকালে স্থির হল—যুক্তিতে এর কোনো মীমাংসা হবে না। একটি দিন দেখে দুইজনে দুইদিকে রওনা হবেন—তারপর কিছুদিন বাদে ফিরে এসে নিজ নিজ অভিজ্ঞতা ব্যক্ত করবেন।

সেই অনুসারে—একটা শুভদিন দেখে—উভয়ে উভয়ের কাছে বিদায় নিয়ে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে নিরুদ্দেশের পথে দুইজনে দুই দিকে রওনা হলেন।

রাজপুত্র চল্‌তে চল্‌তে বহুদেশ অতিক্রম করে এক বনের মধ্যে গিয়ে পড়লেন। সে বন ঘন অন্ধকারে ঢাকা। খানিক দূরে কি আছে তা দেখবার উপায় নেই।

ঐ ভাবে কিছুদূর চলবার পর রাজপুত্র ছোট্ট একটি কুঁড়ে ঘরের সামনে এসে উপস্থিত হলেন। উঁকি দিয়ে দেখলেন—তার ভেতর জটাজুটধারী এক সন্ন্যাসী বসে ধ্যান করছেন।



দুই জনে মহা তর্ক-বিতর্ক

রাজপুত্র কয়েকদিন ধরে সেইখানেই অবস্থান

করলেন—তারপর মুনির ধ্যান ভাঙ্‌লে—তিনি প্রাণপণে তার পরিচর্য্যা করে মুনিকে সন্তুষ্ট করলেন। তার সেবায় খুসী হ'য়ে মুনি তাকে একটি আংটি দান করে বল্লেন, রাজপুত্র তোমার ব্যবহারে আমি অত্যন্ত প্রীত হয়েছি, এই আংটীর কাছে তুমি যখন যা কামনা করবে তাই পাবে।

মুনির পদধূলি নিয়ে রাজপুত্র আবার পক্ষীরাজ ঘোটিছুড়দে য়ো লন।



দুই জনে দুইদিকে রওনা হলেন

তারপর বহুদেশ বহু নদ নদী-পাহাড়-পর্ব্বত অতিক্রম করে এক নতুন রাজার রাজ্যে গিয়ে পৌছুলেন।

সেখানে গিয়ে রাজপুত্র শুন্‌লেন যে সে দেশের রাজকন্যা হচ্ছেন পৃথিবীর সর্ব্বশ্রেষ্ঠা সুন্দরী।

সেই রাজকন্যার পণ যে একমাস ধরে প্রত্যহ তাঁর প্রার্থিত জিনিষ দিতে পারবেন, তিনি তাঁকেই পতিত্বে বরণ করবেন। কিন্তু কেউ যদি এই কাজে ব্রতী হ'য়ে শেষ পর্য্যন্ত অপারগ হন—তাকে রাজকন্যার ক্রীতদাস হয়ে তাঁর স্নানের জল সরবরাহ করতে হ'বে।

রাজপুত্রের কাছে মুনির আংটি ছিল কাজেই তাঁর ভয় পাবার কারণ ছিল না।

শোনা গেল ইতিমধ্যে বহু রাজপুত্র রাজকন্যাকে বিয়ে করতে এসে আজীবন ক্রীতদাস হয়ে আছেন।

রাজপুত্র গিয়ে রাজার মালিনীর অতিথি হ'লেন এবং তাঁকে দিয়ে রাজকন্যাকে খবর পাঠালেন যে পরদিন থেকে তিনি তাঁর কামনা রাজপুত্রকে জানাবেন।

পরদিন সকাল বেলা রাজকন্যার দু'টি দাসী এসে জানালেন যে রাজকন্যা দু' জোড়া মণি-মুক্তা খচিত বালা চান।

রাজপুত্র এই কথা শুনে তাঁর ঘরে গিয়ে মুনির দেওয়া আংটি বের করে বললেন, আংটী, তুমি কার?

আংটি জবাব দিলে, আগে ছিলাম মুনির এখন তোমার। রাজপুত্র বল্লেন, তা হলে আমায় দু' জোড়া মণি-মুক্তা-খচিত বালা দাও।

চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তে তা এসে রাজপুত্রের সাম্‌নে হাজির হল।

রাজপুত্র বালা জোড়া দাসীদের হাতে দিয়ে তাদের বিদায় করে দিলেন। বালা দেখে রাজকন্যা একেবারে অবাক হ'য়ে গেলেন। তিনি কিছুতেই বুঝ্‌তে পারলেন না এত দামী গহনা রাজপুত্র পেলেন কোথায়!

পরদিন রাজকন্যা চারজন দাসী দিয়ে বলে পাঠালেন আগের মতো চার জোড়া বালা চাই—আর সেই সঙ্গে চাই চারটি বড় পদ্মরাগ মণি।

রাজপুত্র যথারীতি তাও পাঠিয়ে দিলেন।



মুনির পদধূলি নিলেন

গহনা পেয়ে রাজকুমারী খুশী হলেন বটে কিন্তু তাঁর কৌতূহল হল তার চাইতে আরো বেশি।

পরদিন রাজকন্যা পাঠালেন ষোলজন দাসী। তাদের দাবী ষোলটি হাতী, ষোলটি ঘোড়া এবং সেই সঙ্গে ষোল থালা ভর্ত্তী পদ্মরাগ মণি। রাজপুত্রের তা' জোগান দিতে এতটুকু বিলম্ব হলনা।

রাজকন্যা কিছুতেই ভেবে পেলেন না যে কি করে এটা সম্ভবপর হল। তিনি দেখ্‌লেন—এর প্রত্যেকটি রত্ন সাতরাজার ধন মাণিক। কিন্তু রাজপুত্র এত সহজে কি করে তা জোগাড় করলেন?

এইভাবে দিনের পর দিন এগিয়ে চল্লো। মাস শেষ হতে তখন আর কয়েকটি দিন মাত্র আছে। রাজকন্যা উতলা হয়ে উঠ্‌লেন। শেষকালে এক দিন তিনি মালিনীকে ডেকে পাঠিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, হ্যাঁগা মালিনী, রাজপুত্র এত জিনিষ পায় কোত্থেকে বল্‌তে পারো?

মালিনী বল্লে, আমি ত' কিছু জানিনে রাজকুমারী। রাজকন্যা বল্লে, তুমি যদি জেনে দিতে পারো কোত্থেকে রাজপুত্তুর এই সব পায়—তা' হলে তুমি যা চাইবে আমি তোমাকে তাই দেবো।

মালিনী তখন হেলতে দুলতে বাড়ী ফিরে এলো তারপর একসময় সুযোগ বুঝে রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করলে,—এত জিনিষ তুমি পাও কোত্থেকে বল্‌তে পারো?

রাজপুত্র বল্লে তা' জেনে তুমি কি করবে মালিনী মাসী? মালিনী অভিমান করে বল্লে, তোমায় আমি নিজের ছেলের মতো দেখি—আমার বাড়িতে তোমায় ঠাঁই দিয়েছি—তুমি আমায় ডাকো মাসী—তবু তুমি আমার কাছে গোপন করবে?

রাজপুত্র তখন সরল মনে আংটির সব কাহিনী মালিনীকে খুলে বল্লেন।

মালিনীর তখন আনন্দ দেখে কে! তক্ষুনি সে ছুটে গিয়ে রাজকন্যাকে সব বলে দিয়ে প্রচুর পুরস্কার নিয়ে ঘরে ফিরে এলো। এর পরের দিনের কথা। তখনও মাস শেষ হতে একটি দিন বাকী আছে।

রাজকন্যা সেদিন একটিমাত্র দাসী পাঠালেন। কিন্তু সে এসে চাইলে মুনির দেওয়া সেই আংটি। রাজপুত্র দাসীর হাতে আংটি দিয়ে দিলেন। আর মনে মনে বুঝ্‌তে পারলেন—এ সমস্তই মালিনীর কাণ্ড।

* * * *

পরদিন সকাল বেলা রাজকন্যা মাত্র একশো টাকা চেয়ে পাঠালেন। সেই দিনই মাসের শেষ দিন কিন্তু আংটি হারিয়ে রাজপুত্র আজ পথের ভিখারি। তিনি তাও দিতে পারলেন না।

রাজকন্যার দাসী শুধু হাতে ফিরে আস্‌তেই—রাজার পেয়াদা গিয়ে রাজপুত্রকে বেঁধে নিয়ে এলো। তাঁর চোখের জল ফেলা বৃথাই হল—রাজপুত্র রাজকন্যার ক্রীতদাস হলেন।

৩

এদিকে মন্ত্রীপুত্র—বহুদেশ অতিক্রম করে এক রাজার রাজধানীতে গিয়ে উপস্থিত হয়ে এক ব্রাহ্মণের বাড়ী অতিথি হলেন। ব্রাহ্মণের সংসারে ব্রাহ্মণ নিজে—তাঁর গৃহিনী, পুত্র এবং নব বিবাহিত পুত্রবধূ। সকলেই অতিথিকে পরম সমাদরে গ্রহণ করলেন।

কিছুক্ষণ বাদেই মন্ত্রীপুত্র পাশের ঘরে ক্রন্দনধ্বনি শুনতে পেলেন। ব্রাহ্মণ বল্‌ছেন, তোমরা থাকো আমি যাই—ছেলে বল্লে, আমি বেঁচে থাক্‌তে আপনি যাবেন কেন? ছেলের বৌ বল্লে, আমি যাই—আমি ত' অন্য ঘরের মেয়ে—। তুমি না হয় পরে একটা বিয়ে করে নিও।

বুড়ো বামুন—এই সব কথা শুনে শুধু কাঁদেন। মন্ত্রীপুত্র এই সব শুনে—ব্রাহ্মণকে ডেকে জিজ্ঞেস করে জান্‌তে পারলেন, এক রাক্ষসী এই রাজ্য একেবারে ধ্বংস কচ্ছিল দেখে—দেশের রাজা তার সঙ্গে চুক্তি করেছেন—তার প্রজাদের মধ্যে প্রত্যহ এক এক পরিবার থেকে একজন করে লোক রাক্ষসীর খাওয়ার জন্য পাঠাবে আর সেই অনুসারে রাক্ষসী আর কোন উপদ্রব করবে না। আজ ব্রাহ্মণপরিবারের লোক পাঠাবার পালা। তাই কে যাবে সেই নিয়ে নিজেদের মধ্যে কথা কাটাকাটি—আর কান্নাকাটি চলছে।

মন্ত্রীপুত্র বল্লেন, আপনাদের কাউকে যেতে হ'বে না—যাবো আমি।

ব্রাহ্মণ তাতে শিউরে উঠে বল্লেন, অতিথিকে পাঠাবো? তা হলে নরকেও আমাদের স্থান হ'বে না।

মন্ত্রীপুত্র বল্লেন, আপনাদের কোন ভয় নেই—আমাকে কয়েকটি জিনিষ দিতে হবে। একটি মোটা লম্বা দড়ি, এক হাঁড়ি চুণ, গোটা কয়েক খোন্তা, একমালসা আগুন, আর দুটো চোখা লোহার ডাণ্ডা।

ব্রাহ্মণ পরিবারের সকলকে ভালো করে বুঝিয়ে এইসব জিনিষ পত্র নিয়ে মন্ত্রীপুত্র রাক্ষসীর উদ্দেশে রওনা হলেন।

রাক্ষসীর ঘরে ঢুকে প্রথমেই তিনি দরজা বন্ধ করে দিলেন। তারপর সেই দু'টো লোহার ডাণ্ডা আগুনে দিলেন গরম হ'তে।

রাক্ষসী সন্ধ্যাবেলা ফিরে এসে দেখ্‌লে—কে যেন তার ঘরে গিয়ে দরজা বন্ধ করে দিয়েছে।

বিকট সুরে জিজ্ঞেস করলে—ঘরের ভেতর কে?

তার চাইতে বিশ্রী গলায় ঘরের ভেতর থেকে মন্ত্রী পুত্র উত্তর দিলে, তুই কে?

রাক্ষসী বল্লে, আমি রাক্ষসী—

কর্কশ কণ্ঠে মন্ত্রীপুত্র বল্লে, আমি খোক্কস—তোর যম।

রাক্ষসী জীবনে কখনো—খোক্কসের নামও শোনেনি—তাকে দেখেও নি। তবুও ঘরের মায়া কে সহজে ছাড়ে?

জিজ্ঞেস করলে, তুই এখানে কি চাস?

গলাটা আরো ভারী করে মন্ত্রীপুত্র জবাব দিলেন তুই এখানে কি চাস্?

রাক্ষসী একটু ভয় পেয়ে গেল।

তবু আস্তে আস্তে বল্লে, আমি কখনো খোক্কস দেখিনি, আচ্ছা দেখি কেমন তোর চুল—



জিবটা কেটে নিলেন

মন্ত্রীপুত্র—জান্‌লার ভেতর দিয়ে প্রকাণ্ড দড়িটা ফেলে দিলেন। রাক্ষসী মনে মনে ভাবলে যার চুল এমন সে না জানি কি ভীষণ জানোয়ার। তবু বুকে সাহস এনে বল্লে, আচ্ছা দেখি তোর হাতের নখ্?

মন্ত্রীপুত্র তৈরী হয়েছিলেন, গোটা কয়েক খোন্তা জান্‌লা গলিয়ে ফেলে দিলেন।

তিন হাত পেছিয়ে গেল। তার পর আস্তে আস্তে বল্‌লে, আচ্ছা খোক্কস, দেখি তোর থুথু কেমন?

মন্ত্রীপুত্র এক হাড়ি চুণ ছুড়ে ফেলে দিলেন। ভয়ে কাঁপতে কাঁপতে রাক্ষসী বল্লে, সত্যি বল্‌ছি খোক্কস, আমি এখান থেকে চলে যাবো—আর আসবো না তবে যাবার আগে তোর চোখ কেমন একবার দেখ্‌তে চাই—

মন্ত্রীপুত্র ভারী গলায় বল্লে, তবে আয় জান্‌লার কাছে! এতক্ষণ ধরে লোহার শিখ দু'টো গরম হয়েছিল—তাই দিলেন রাক্ষসীর দুই চোখের ভেতর চালিয়ে।

একটা ভীষণ চীৎকার করে—রাক্ষসী ঐখানেই পড়ে একেবারে মরে গেল।

মন্ত্রীপুত্র তখন রাক্ষসীর জিবটা কেটে নিয়ে নিশ্চিন্ত মনে ঘরে গিয়ে ঘুমিয়ে রইলেন।

সকালবেলা সেইদেশের লোকেরা দেখ্‌লে—রাক্ষসী মরে পড়ে আছে। তখন সকলেই রাক্ষসীর দেহের এক একটা অংশ কেটে নিয়ে রাজবাড়ীতে গিয়ে হাজির হল। কেননা—রাজা করে ছিলেন যে রাক্ষসীকে মারতে পারবে—সে অর্দ্ধেক রাজত্ব আর রাজকন্যা লাভ করবে।

সকলেই বলে,—সেই রাক্ষসীকে হত্যা করেছে। রাজা পড়লেন—মহা মুস্কিলে। মন্ত্রীর পরামর্শ জিজ্ঞেস্ করতে তিনি বল্লেন, কাল যার পালা গেছে তাকে খবরদেওয়া হোক্।

তখন সেই ব্রাহ্মণ কাঁপ্‌তে কাঁপ্‌তে এসে উপস্থিত হ'ল। তার কাছে সমস্ত ব্যাপারটা জেনে নিয়ে রাজা আর মন্ত্রী রাক্ষসীর বাড়ি গিয়ে হাজির হলেন। সেখানে গিয়ে দেখ্‌লেন—রাক্ষসী মরে পড়ে

আছে—আর ঘরের ভিতর মন্ত্রীপুত্র ঘুমুচ্ছেন। তাকে ডেকে তুলে—সব কথা জানতে পেরে রাজা খুব খুসী হলেন। মন্ত্রীপুত্র রাক্ষসীর জিব দেখিয়ে প্রমাণ করলেন যে তিনি রাক্ষসীকে মেরেছেন।

তখন মহা ধূমধাম করে রাজা তাঁর একমাত্র মেয়ের সঙ্গে মন্ত্রীপুত্রের বিয়ে দিলেন, আর দিলেন সেই সঙ্গে অর্দ্ধরাজ্য যৌতুক।

৪

রাজার ছেলে ছিলনা বলে—স্থির হল—যে তাঁর মৃত্যুর পর মন্ত্রীপুত্রই সিংহাসন লাভ করবেন।

রাজকন্যার সঙ্গে কয়েকদিন সুখে কাটাবার পর—বন্ধুর জন্য মন্ত্রীপুত্রের মন বড় ব্যাকুল হ'য়ে উঠ্‌ল।

তিনি সব সময় বিমর্ষ হ'য়ে আপন মনে কি যেন চিন্তা করতেন। একদিন রাজকন্যা তাই দেখতে পেয়ে তার কারণ জিজ্ঞাসা করলেন।

রাজপুত্র প্রথমটা কিছুই বলবেন না, শেষকালে রাজকন্যার পীড়াপীড়িতে জানালেন, বুড়া মা বাপের আর বিশেষ করে তাঁর রাজপুত্র বন্ধুর জন্য মন ভয়ানক ব্যাকুল হয়েছে, তিনি শীঘ্রই তাঁর অনুসন্ধানে যাবেন।

রাজকুমারী মন্ত্রীপুত্রের সঙ্গে যেতে চাইলেন, রাজা শ্বশুর তাকে কত বোঝালেন, কিন্তু তিনি তাদের বুঝিয়ে বল্লেন, বন্ধুর খবর সংগ্রহ করে তিনি আবার ফিরে এসে তার স্ত্রীকে নিয়ে নিজের দেশে যাবেন।

শ্বশুরের পায়ের ধূলা নিয়ে মন্ত্রীপুত্র ঘোড়ার উপর উঠে বসলেন। দেশের পর দেশ রাজ্যের পর রাজ্য অতিক্রম করে—তিনি এক গভীর অরণ্যের মধ্যে এসে উপস্থিত হলেন। চলতে চলতে সন্ধ্যা হয়ে এলো। প্রাণ বাঁচাবার জন্য সে রাত্রির মতো তিনি এক গাছের গুড়ির সঙ্গে ঘোড়া বেঁধে নিজে গাছের উপরে উঠে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

গভীর রাত্রে একটা অস্বাভাবিক শব্দ শুনে তাঁর ঘুম ভেঙ্গে গেল। মনে হ'ল যেন প্রলয়ের ঝড় এসে উপস্থিত হল। এক্ষুণি সমস্ত গাছ যেন সেই ঝড়ের মুখে ধরাশায়ী হবে।

খানিক বাদেই মন্ত্রীপুত্র অবাক হ'য়ে দেখলেন এক ভীষণ দর্শন রাক্ষস সেইখানে এসে উপস্থিত হ'ল। মন্ত্রীর ছেলে ভয়ে গাছের ঘন পাতার ভেতর লুকোলেন। রাক্ষসটা খানিকক্ষণ সেই গাছের তলায় বসে বিশ্রাম করলে, তারপর উঠে দাঁড়িয়ে মাটির উপর পা দিয়ে দু'বার আঘাত করতেই সেইখান থেকে একটা প্রকাণ্ড পাথর সরে গেল এবং সুরঙ্গ পথ দেখা গেল।

মন্ত্রীপুত্র অবাক্ হয়ে রাক্ষসের কাণ্ড দেখতে লাগলেন। রাক্ষস সেই সুরঙ্গ পথের ভেতর নেমে গেল। খানিকক্ষণ বাদেই একটা বানর নিয়ে সে আবার ফিরে এলো। তার পর করলে কি? যে গাছের উপর মন্ত্রীপুত্র লুকিয়েছিলেন—সেই গাছের কতকগুলো পাতা নিয়ে একটা কুয়াথেকে খানিকটা জল তুলে পাতা গুলো জলের মধ্যে ফেলে—সেই জল বানরের গায়ে ঢেলে দিলে—অবাককাণ্ড!

দেখ্‌তে দেখ্‌তে বানরটা হ'য়ে গেল—এক পরমা সুন্দরী মেয়ে। তাকে নিয়ে রাক্ষস আবার সুরঙ্গ পথে চলে গেল। ভোরের একটু আগে—রাক্ষস মেয়েটিকে নিয়ে আবার ফিরে এলো। তখন সে আর একটা গাছের পাতা জলে ফেলে মেয়েটির গায়ে ঢেলে দিলে। পরমূহুর্ত্তেই সে আগেকার মতো বানর হ'য়ে গেল।

রাক্ষস তখন বানরটিকে ভেতরে রেখে এসে—সুরঙ্গের মুখটা পাথর চাপা দিয়ে কোথায় নিরুদ্দেশ হ'য়ে গেল।

সূর্য্যোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে মন্ত্রীপুত্র গাছ থেকে নেমে পড়লেন। তারপর রাক্ষস যে যে ব্যাপার করে সুরঙ্গের ভেতর ঢুকেছিল—তিনিও সেই উপায়ে সেইখানে প্রবেশ করলেন।

ভেতরে ঢুকে—তিনি একেবারে থ' হয়ে গেলেন। মাটির তলায়—প্রকাণ্ড রমরমে গম্-গমে—এক রাজপুরী। কিন্তু তাতে জনমানব নেই। এক জায়গায় গিয়ে দেখ্‌লেন সেই বানরটা একটা ঘরের ভেতর শিকলে বাঁধা অবস্থায় আছে।

তিনি উপরে উঠে গাছের পাতা আর জল নিয়ে এসে বানরের গায় ছিটিয়ে দিতেই বানর হ'য়ে গেল অপরূপ রাজকন্যা।

প্রথমে সেই রাজকন্যা ভারী ভয় পেয়ে গেল। তারপর মানুষ দেখে একটু সাহস পেয়ে বললে· তুমি এখানে কি করে

সে কথা তোমায় আমি পরে বলব। তুমি তোমার নিজের কাহিনী আমায় বল।

রাজকন্যা চোখের জল ফেলে বল্লেন, আমার বাবা ছিলেন এই দেশের রাজা। এক রাক্ষস তাঁর সমস্ত রাজ্য ছারখার করে দিলে। শুধু—বাঁচিয়ে রাখলে আমাকে।

বাবার সেই বিশাল রাজ্য এখন বন হ'য়ে গেছে!

রাক্ষসটা আমাকে বানর করে এইখানে বন্দী করে রেখেছে। মন্ত্রীপুত্র জিজ্ঞেস করলে, কিন্তু রাক্ষস তোমায় মারলেনা কেন?

রাজকন্যা জবাব দিলে—সে আমাকে বিবাহ করতে চায়। তাই রোজ রাত্রিতে এসে আমায় মানুষ করে, আবার যাবার সময় বানর করে রাখে। আমি কিছুতেই তার কথায় রাজী হইনে। শেষে বাধ্য হয়ে তাহাকে ভুলাবার জন্য আমার একটা ব্রত আছে বলেছি। সেই ব্রত এক বছর ধরে চলবে। ব্রত শেষ হ'য়ে গেলে তাকেই আমি বিয়ে করবো।

একবছর শেষ হ'তে আর কয়েকটি দিন মাত্র বাকি! আমার কপালে যে কি আছে ভগবান জানেন।



শিকলে বেঁধে ফেল্লে

এই বলে রাজকন্যা আবার কাঁদতে লাগলো। মন্ত্রীপুত্র তাকে শান্ত করে বল্লেন রাজকুমারী তোমার কোনো ভয় নেই—রাক্ষসকে আমি বধ করবো।

তারা দু'জনে—গন্ধর্ব্ব মতে বিয়ে করলেন, তারপর মহা আনন্দে একসঙ্গে বসে খাওয়া দাওয়া শেষ করলেন।

সন্ধ্যার মুখে রাজকন্যা মন্ত্রীপুত্রকে বল্লে, তোমার আর এখন এখানে থাকা উচিত নয়—পুরীর পেছন দিকে—শিবকুণ্ড আছে—তারি ফুলের ভেতর তুমি গিয়ে লুকিয়ে থাকো।

মন্ত্রীপুত্র জিজ্ঞেস্ করলেন, রাক্ষস ঘুময় কখন?

রাজকন্যা বল্লে, প্রথমে এসেই—আমার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প করে তারপর গিয়ে ঘুমোয়।

এই সব জেনে নিয়ে রাজকুমারীকে আবার বানরে পরিণত করে—মন্ত্রীপুত্র গিয়ে শিবকুণ্ডের ভেতর লুকিয়ে রইলেন। গভীর রাত্রে রাক্ষস এসে বানরকে রাজকুমারী করলে—তারপর তার সঙ্গে খানিকক্ষণ গল্প-সল্প করে—ঘুমিয়ে পড়ল।

রাজকুমারী তখন—মন্ত্রীপুত্রকে সঙ্কেত করে ডাক্লে। মন্ত্রীপুত্র এসে গাছের পাতা আর জল সংগ্রহ করে—রাক্ষসের গায়ে ঢেলে দিলেন। দেখতে দেখতে রাক্ষস হ'য়ে গেল বানর!

মন্ত্রীপুত্র তক্ষুণি তাকে শিকলে বেঁধে এক খাঁচার ভেতর বন্দী করে ফেল্লে।

তখন তাদের আনন্দ দেখে কে। দু'জনে হাত ধরাধরি করে সুরঙ্গ পথ বেয়ে—উপরে উঠে পক্ষীরাজের পিঠে চড়ে আবার নিরুদ্দেশ যাত্রায় রওনা হলেন।

বহু দেশ অতিক্রম করে—তাঁরা আর এক রাজার রাজ্যে গিয়ে উপনীত হ'লেন। সে দেশ রাজকুমারীর এত ভাল লাগ্‌ল যে তাঁরা স্থির করলেন—এইখানে কিছুদিন কাটাবেন।

মন্ত্রীপুত্র কিন্তু একেবারে নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে ছিলেন না। তিনি সব সময়ই তাঁর হারানো বন্ধুকে খুঁজে বেড়াতেন।

৫

একদিন তিনি অবাক হয়ে দেখলেন—একজন যুবক—বাঁশের বাঁকে করে—স্নানের জল নিয়ে যাচ্ছে তার চেহারা ঠিক মুটে মজুরের মতো নয়। আরো কাছে যেতে বুঝলেন—এ তাঁর রাজপুত্র বন্ধু ছাড়া আর কেউ নয়!

কিন্তু তাঁর দেহের সৌন্দর্য্য একেবারে নষ্ট হয়ে গেছে!

মন্ত্রীপুত্র বল্লেন, বন্ধু, আমায় চিন্‌তে পারো?—কিন্তু তোমার এ দশা কি করে হ'ল?

এতদিন বাদে—মন্ত্রীপুত্রকে দেখে রাজপুত্র আর চোখের জল ধরে রাখতে পারলেন না। বন্ধুকে সব কথা আগাগোড়া তিনি খুলে বল্লেন।

সমস্ত কথা শুনে মন্ত্রীপুত্রও চোখের জল ফেল্‌তে লাগ্‌লেন।



বাঁশের বাঁকে করে জল নিয়ে যাচ্ছে

তারপর বল্লেন, বন্ধু তুমি হতাশ হয়োনা। আমি তোমাকে মুক্ত করবো। এখন সত্যি করে বল দেখি—এই জলে কি রাজকুমারী স্নান করে?

রাজপুত্র মাথা নেড়ে জানালেন—হ্যাঁ। তারপর বল্লেন, আর কয়েকদিন এইভাবে কাটালে আমি সত্যি আর বাঁচ্‌বো না।

মন্ত্রীপুত্র তাকে সান্ত্বনা দিয়ে বল্লেন, কোন ভয় নেই, কাল তুমি যখন জল নিয়ে যাবে—আমি তোমার সঙ্গে দেখা করবো।

এই বলে তিনি তাঁর পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চেপে সেই গভীর বনে উপস্থিত হ'লেন। তারপর সেই দুটো গাছের পাতা আর কূয়োর জল নিয়ে—আবার ফিরে এসে—পরদিন যথাসময়ে রাজপুত্রের সঙ্গে দেখা করলেন।

তারপর তাঁকে প্রথম গাছের কয়েকটা পাতা এবং কূয়োর জল দিয়ে বল্লেন, রাজকুমারী যখন স্নান করবে—তখন কোনো জায়গায় লুকিয়ে থেকে—এই পাতা আর জল তার গায়ে ঢেলে দেবে। পরে কি করতে হবে—আমি বলে দেবো।

কথামত রাজপুত্র—রাজকুমারীর গায়ে জল ঢেলে দিতেই সে একটা বানর হয়ে লাফালাফি সুরু করে দিলে। রাজা এই খবর পেয়ে রাজ্যের সমস্ত চিকিৎসকগণকে ডেকে আন্‌লেন। কিন্তু কেউ রাজকুমারীকে ভালো করতে পারলে না।

অবশেষে রাজা ঘোষণা করে দিলেন—যে রাজকুমারীর অসুখ আরাম করে দিতে পারবে—তাকে সেই রাজকন্যার সঙ্গে বিয়ে দেওয়া হ'বে—আর যৌতুক স্বরূপ দেওয়া হ'বে অর্দ্ধেক রাজত্ব।

ইতিমধ্যে রাজপুত্র গিয়ে মন্ত্রীপুত্রকে সব খবর দিয়েছেন। তিনি বল্লেন, রাজাকে গিয়ে বল যে—রাজকুমারীকে তুমি ভাল করে দিতে পারবে।

রাজপুত্র আঁৎকে উঠে বল্লেন, সে কি বন্ধু? আমি কি করে তাকে ভাল করবো?

মন্ত্রীপুত্র বল্লে, সে ভার আমার। তুমি গিয়ে আগে রাজার অনুমতি নাও।

রাজা তার কথা শুনে বল্লেন, তুমি কে?

রাজপুত্র জবাব দিলেন, আমি রাজকুমারীর একজন বন্দী। রাজা আনন্দে তাঁকে অনুমতি দিলেন।

রাজার অনুমতি লাভ করে—রাজপুত্র তাঁর বন্ধুর কাছে ফিরে আস্‌তে—মন্ত্রীপুত্র তাকে—দ্বিতীয় গাছের পাতা ও কূয়োর জল দিয়ে কি করে তাকে আবার মানবী করতে হবে—সব শিখিয়ে দিলেন।

রাজপুত্র তখন রাজাকে গিয়ে বল্লেন, একটা নিভৃত কক্ষে আমি বানরটিকে চাই। রাজার আদেশে ক্রীতদাসগণ বানরটাকে বহু কষ্টে একটা ঘরের ভেতর এনে শিক্‌লি দিয়ে বেঁধে ফেল্লে।

তখন তাকে—পুনরায় রাজকুমারীতে রূপান্তরিত করতে রাজপুত্রের এতটুকু বেগ পেতে হলনা।

সু-খবর পেয়ে রাজা ছুটে এলেন—অমাত্যগণ ছুটে এলেন—রাজ্যে যেন একটা আনন্দের সাড়া পড়ে গেল। একটা শুভদিন দেখে রাজা তখন রাজকন্যার সঙ্গে রাজপুত্রের বিয়ে দিলেন।

কিছুদিন—খুব আমোদ-প্রমোদে কাটাবার পর রাজপুত্র নববধূকে নিয়ে দেশে ফিরে যেতে চাইলেন।

এদিকে মন্ত্রীপুত্র বন্ধুকে উদ্ধার করে—পূর্ব্ব প্রতিশ্রুতি মত তাঁর প্রথমা পত্নীকে আন্‌তে চলে গেলেন। কয়েক দিনের মধ্যে দলবল নিয়ে তিনিও এসে পৌছুলেন।

তখন দুই বন্ধু স-স্ত্রীক স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করলেন। তাদের অভ্যর্থনার জন্য যে সমারোহ হ'ল—বুঝি তার আর তুলনা নেই।

* * * *

এর কিছুদিন বাদে—একদিন দুই বন্ধুতে বসে গল্প কচ্ছেন। হঠাৎ মন্ত্রীপুত্র রাজপুত্রকে জিজ্ঞেস করলেন—কি বন্ধু, **বিদ্যা বড়—না বুদ্ধি বড়?**

রাজপুত্র বন্ধুর কথার কোনো জবাব দিতে পারলেন না।



রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত

১৮৫১ পৃষ্ঠার পর

আমাদের দেশে অনেক বই লেখা হইয়াছে, আজকাল কত লোকে কত লিখিতেছেন, কেহ দেশ-বিদেশের কথা, কেহ নিজের মনের কথা, কেহ বা ইতিহাসের কাহিনী আমাদিগকে শুনাইতেছেন ; আমরা ছেলেবেলায় তাহা পড়িয়া শিখি, বড় হইয়া তাহাতেই আনন্দ পাই, লেখকদের মান্য করি, মনে করি তাঁহারা আমাদের শিক্ষক, আমরা তাঁহাদের ভাবনা ভাবি, তাঁহারা যাহা ভাল বলিয়া আমাদের সামনে ধরিয়াছেন তাহার অনুসরণ করি।

আমাদের তিনখানি পুরাণো বড় বই আছে, যাহা হইতে আমরা সারাজীবন শিখিতে পারি এবং যাহাদের উপাখ্যানে আমরা চিরকাল আনন্দ পাইয়া আসিতেছি। এই বইগুলি সংস্কৃত ভাষায় লেখা, বাংলা করিতে গিয়া আমাদের বাঙ্গালী লেখকেরা অনেক অদল-বদল করিয়াছেন, হয়তো কোনও জায়গা বাদ দিয়াছেন, আবার নূতন খানিকটা হয়তো জুড়িয়া দিয়াছেন। এক ভাষা হইতে অন্য ভাষায় লেখার নাম অনুবাদ করা ; সকল দেশেই অনুবাদসাহিত্য সাহিত্যের এক প্রধান অংশ। এক দেশের ভাল বই অন্য দেশের লোকেরা সাধারণতঃ অনুবাদের সাহায্যেই পড়িতে পায়। সংস্কৃত ভাষায় যাঁহারা কবিতা লিখিয়াছেন তাঁহাদের মধ্যে কালিদাস সব চেয়ে বড় কবি ; কিন্তু সংস্কৃত ভাষায়ই যদি তাঁহার লেখা বদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে দেশ-বিদেশের সকল লোকে তাঁহার লেখা পড়িয়া আনন্দ পাইতে পারিত না,—তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিত। তাই ইংরাজীতে, বাংলায়, ভারতের অন্যান্য ভাষায়, তাঁহার কবিতা ও নাটক অনুবাদ করিয়া বিভিন্ন দেশের লোকে রসাস্বাদ করিতেছে। রবীন্দ্রনাথের কবিতা, উপন্যাস ও গল্প যদি বাংলায়ই বদ্ধ থাকিত, তাহা হইলে বাহিরের লোককে প্রথমে বাংলা শিখিয়া তবে তাঁহার কাব্য ও উপন্যাস পড়িতে হইত, তাহা অবশ্য মোটের উপর ভাল কিন্তু সকলের পক্ষে সম্ভব নহে, সুতরাং অনেকেই তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিত। পুরাণো বাংলায় এইরূপ অনুবাদ অনেক ছিল ; যে সকল বই সংস্কৃত ভাষা হইতে বাংলায় অনুবাদ করা হইয়াছিল এবং তাহার পর বাঙ্গালী পাঠকের নিকট সমাদর

পাইয়াছিল তাহাদের মধ্যে তিনটী উল্লেখযোগ্য, এবং সেই তিনটীর নাম—রামায়ণ, মহাভারত ও ভাগবত।

আমরা ছেলেবেলায় পড়ি কৃত্তিবাসের রামায়ণ। এই রামায়ণ যে কৃত্তিবাস রচনা করিযাছেন সে কথা ভণিতার মাঝে মাঝে আমাদিগকে মনে করাইয়া দেন। মকরাক্ষ রাক্ষস রামের সহিত যুদ্ধ করিয়া মারা পড়িল; বাস্, এক কাহিনী শেষ হইল,—সুতরাং লেখক এই বলিয়া শেষ করিলেন,—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের মধুর রচন।
লঙ্কাকাণ্ডে মকরাক্ষ হইল পতন॥

আবার শিবের কৈলাস নাড়িতে গিয়া রাবণের যে দুর্দ্দশা হইয়াছিল তাহা বলিয়া কবি শেষ করিলেন এই দিয়া—

কৃত্তিবাস পণ্ডিতের জন্ম শুভক্ষণে।
গাহিল উত্তরকাণ্ড গীত রামায়ণে॥

রামায়ণের মধ্যে শিক্ষা করিবার বিস্তর বিষয় আছে। আদর্শ পুত্র, আদর্শ স্ত্রী, আদর্শ অনুচর রামায়ণের মধ্যে দেখিতে পাই। দশাননের বিক্রম, ইন্দ্রজিতের তেজ, লক্ষ্মণের সংযম, রামের সত্যানুরাগ ও সহিষ্ণুতা মনের মধ্যে একটা দাগ রাখিয়া যায়। ভগবানের স্তবও কি সহজ, সুন্দর ভাষায় লেখা!

যার সনে কড়ি ছিল গেল পার হয়ে!
কড়ি বিনা পার করে তারে বলি নেয়ে॥
ধ্যান পূজা তন্ত্র মন্ত্র যার নাহি জ্ঞান।
তারে যদি পার কর তবেজানি রাম॥
যোগ যাগ তন্ত্র মন্ত্র যেই জন জানে।
তারে কি তরাবে রাম! তরে নিজগুণে॥
মোর সঙ্গে কড়ি নাই পার হব কিসে।
কর বা না কর পার কূলে আছি বসে।

* * * * *

আপনি যে ভাঙ্গ প্রভু! আপনি যে গড়।
সর্প হয়ে দংশ তুমি ওঝা হয়ে ঝাড়॥
সকলি তোমার লীলা সব তুমি পার।
হুকুমে হাকিম তুমি প্যায়দা হয়ে মার॥

যুদ্ধের কথা বলিতেও কবি সুপটু; দশমুণ্ড রাবণ দেখিতে বড় কম নহেন, আবার কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুনের ছিল এক সহস্র হস্ত; দুইয়ে যুদ্ধ আরম্ভ হইল, সে এক ভীষণ ব্যাপার। কার্ত্তবীর্য্যার্জ্জুন (বা শুধু অর্জ্জুন) সোনার গদা হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিলেন,—

গম্ভীর গর্জ্জনে আসে পর্ব্বত আকার।
গদাহাতে রাক্ষসেরে বলে মার মার॥
দুর্জ্জয় শরীর রাজা অতি ভয়ঙ্কর।
তিনশত যোজন যুড়িয়া পরিসর॥
ছয়শত যোজন শরীর দীর্ঘতর।
সহস্র হস্তেতে ধরে সহস্র ভূধর॥
দেখিয়া কুপিল সে প্রহস্ত মহাবল।
অর্জ্জুনের শিরে মারে লোহার মুদ্গর॥
পড়িল ঝঞ্চনা যেন মুষল চিকুর।
অর্জ্জুনের গদায় ঠেকিয়া হৈল চুর॥
অর্জ্জুন সহস্র হাতে গদা এক চাপে।
প্রহস্তের মাথায় মারিল মহাকোপে॥
মোহ গেল প্রহস্ত সে অত্যন্ত কাতর।
দেখিয়া কাতর তারে রোষে লঙ্কেশ্বর॥
কুড়ি হাতে অস্ত্র ফেলে রাক্ষস রাবণ।
সহস্র হস্তেতে লোফে অর্জ্জুন রাজন॥
দুই গিরি ঠেকাঠেকি শুনি ঠন্‌ঠনি।
ত্রিভুবনে জল-স্থল কম্পিত মেদিনী॥
উভয় হস্তীর যুদ্ধ দন্ত হানাহানি।
দুই সূর্য্য যুদ্ধ করে মনে হেন মানি॥
দুই সিংহ রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ।
দুই বীরে রণে যেন ছাড়ে সিংহনাদ॥
ইত্যাদি।

রামায়ণ গান হইত; শুধু রামায়ণ কেন, সব বই-ই তখনকার লোকে সুর করিয়া পড়িত। আমরা সে সুর হারাইয়াছি, বেসুরা ভাবেই পড়ি। প্রতি অধ্যায়ের আগে আবার একটু গান গাহিয়া লইত। এইসব গান সম্ভবতঃ হারাইয়া গিয়াছে। এক জায়গায় শুনিতে পাই,—রাবণের তৃতীয় দিন যুদ্ধে যাওয়ার কথা

আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে কবি গান গাহিয়া লইয়াছেন—

রাম যা কর নিজগুণে,
আমি ভজন সাধন জানিনে।
মিছে গেল দীনের দিন,
না হ'ল ভজন ঘেরিল শমনে॥
যা কর হে রামচন্দ্র জগৎ গোঁসাই!
আমার তোমা বিনে
ত্রিভুবনে কেহ নাই॥
মায়ানদীর তীরে আছি রাম!
তোমার চরণ ক'রে সার।
ও রাঙ্গা চরণতরণী ক'রে রাম
আমায় কর হে পার॥

কৃত্তিবাস চারশত বৎসরের পূর্ব্বে এ দেশে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি শ্রীচৈতন্যের পূর্ব্ববর্ত্তী ছিলেন বলিয়া মনে হয়, কারণ রামায়ণে কোথাও শ্রীচৈতন্যের নাম নাই। নবদ্বীপ জেলায় গঙ্গাতীরে ফুলিয়া গ্রামে তাঁহাদের বাড়ী ছিল; তিনি ভিন্ন গ্রামে গিয়া বিদ্যা শিক্ষা করেন এবং পণ্ডিত হইয়া গৌড়েশ্বরের সহিত দেখা করেন। তাঁহার বিদ্যার ও পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাইয়া গৌড়াধিপতি তাঁহাকে পুরস্কার প্রদান করেন। কৃত্তিবাসের পূর্ব্বপুরুষ পূর্ব্ববঙ্গে বাস করিতেন; কোনও কারণে দেশ ছাড়িয়া আসিয়া নবদ্বীপে গঙ্গাতীরে ফুলিয়ায় বাস করেন। কৃত্তিবাসের পূরা নাম, কৃত্তিবাস মুখোপাধ্যায়। রাজা তাঁহাকে রামায়ণ রচনা করিতে অনুরোধ করিলেন, তাঁহার অনুরোধে পিতামাতার আশীর্ব্বাদে গুরুর অনুগ্রহে কৃত্তিবাস এই সপ্তকাণ্ড রামায়ণ শেষ করেন; মুনিদের মধ্যে বাল্মীকি যেমন, কবিদের মধ্যে কৃত্তিবাসও তেমন; যুগ যুগ ধরিয়া বাঙ্গালী তাঁহার রামায়ণ পড়িয়া আনন্দ পাইতেছে।

কৃত্তিবাস ভিন্ন আরও অনেকে সংস্কৃত হইতে রামায়ণ অনুবাদ করিয়াছিলেন; তাঁহাদের অধিকাংশেরই খণ্ড খণ্ড অনুবাদ পাওয়া যায়, দুই এক জনের গোটা অনুবাদও পাওয়া যায়। এইরূপ একজন কবির নাম ছিল অদ্ভুতাচার্য্য। একজনের উপাধি ছিল কবিচন্দ্র; তিনি সেই নামেই প্রসিদ্ধ ছিলেন। দ্বিজ মধুকণ্ঠ রামায়ণ অতি সহজ কবিতায় লিখিয়া যান, কিন্তু তাঁহার পুঁথিখানি পাওয়া যায় না। আমাদের দেশে এক মহিলা কবি জন্মিয়াছিলেন, তাঁহার নাম চন্দ্রাবতী। তাঁহার পিতাও একজন বড় কবি ছিলেন; সংসারের অবস্থা তাঁহার ভাল ছিল না, কিন্তু তিনি মনের আনন্দে গান গাহিয়া বেড়াইতেন। চন্দ্রাবতী পাঠশালায় জয়চন্দ্র নামে এক ব্রাহ্মণের সঙ্গে পড়িতেন। দুইজনে বড় হইলে বিবাহের কথা হয়, পরে ভাঙ্গিয়া যায়; জয়চন্দ্র মুসলমান হইয়া এক মুসলমান কন্যাকে বিবাহ করেন, আর চন্দ্রাবতী চিরকুমারী থাকিয়া রামায়ণ লিখিতে বসেন। এখনও পূর্ব্ববঙ্গের অনেক গ্রামে চন্দ্রাবতীর গান লোকে গাহিয়া থাকে। কিন্তু কৃত্তিবাসের কীর্ত্তি এত বড় হইয়া দেখা দিয়াছিল যে আর সকলের কাব্য আমাদের চোখেই পড়ে না, আমরা তাঁহাদের কথা ভুলিয়া যাই, মনে রাখি শুধু কৃত্তিবাসের রামায়ণ। রামায়ণ মহাভারতের মূল্য আমাদের কাছে বড় কম নহে; আমাদের ধর্ম্ম, আমাদের নীতি, আমাদের ইতিহাস,—অর্থাৎ আমরা কি মানি, কি ভাবে চলি বা আমাদের চলা উচিত, আগে আমাদের দেশে কি ছিল,—এ সমস্ত কথাই আমরা ওই দুইখানি বই হইতে পাই,—কৃত্তিবাসের রামায়ণ আমাদের শাস্ত্র গ্রন্থ বলিলেও চলে। আর মহাভারত?

আমাদের দেশে গ্রামে এখনও দেখিতে পাওয়া যায়,—দুপুর বেলা কাজকর্ম্ম শেষ করিয়া দোকানী নিবিষ্টমনে পড়িতেছে—

মহাভারতের কথা অমৃতসমান।
কাশীরাম দাস কহে শুনে পুণ্যবান্॥

এই অমৃতসমান কথা সংস্কৃত ভাষায় লেখা হইয়াছিল; কুরুপাণ্ডবের যুদ্ধের কথা আমরা ছেলেবেলায়ই শিখিয়া থাকি। কুরুক্ষেত্রে ইঁহাদের মধ্যে ভীষণ যুদ্ধ হয়, সেই যুদ্ধে বহু লক্ষ লক্ষ লোক মারা পড়ে। কুড়ি বৎসর পূর্ব্বে ইউরোপে যে ভীষণ যুদ্ধ হয় তাহার তুলনা দিতে গেলে লোকে বলে,—বিংশ শতাব্দীর কুরুক্ষেত্র। কাশীরাম দাস কিন্তু মহাভারতের একমাত্র অনুবাদক ছিলেন না, আরও অনেকে মহাভারত অনুবাদ করেন। এই সকল অনুবাদক ঠিক প্রতি কথার অর্থ বসাইয়া যান নাই। অনেক জায়গায় বাড়াইয়াছেন, অনেক জায়গায় কমাইয়াছেন, ফলে তাঁহাদের কবিত্ব ও চিন্তাশক্তির পরিচয় অনুবাদ হইতেও পাইয়া থাকি। এইরূপ একজন অনুবাদকের শুধু উপাধি আমরা জানি, তিনি কবীন্দ্র বলিয়াই পরিচিত। অন্যান্য অনুবাদকের নাম সঞ্জয়, শ্রীকর নন্দী, সৃষ্টিধর সেন ইত্যাদি। ইঁহারা সকলেই কাশীরাম দাসের পূর্ব্ববর্ত্তী। মূল সংস্কৃত মহাভারত বাঙ্গলায় অনুবাদ করা হইয়াছে—এরূপ অনুবাদ একাধিক আছে। মহাভারতের গদ্যেও অনুবাদ আছে।

প্রায় তিনশত বৎসর পূর্ব্বে কাশীরাম দাস বর্দ্ধমান জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। কৃত্তিবাস মূল সংস্কৃত ছাড়িয়া অনেক জায়গায় নিজের মনমত কবিতা রচনা করিয়াছেন। কাশীরামও সেইরূপ মূল ছাড়িয়া নিজের পছন্দসই জিনিস বসাইয়াছেন,—অনেক জায়গায় তাহা সুন্দর হইয়াছে। কৃত্তিবাসের চেয়ে কাশীরাম মূলকে আরও বেশি ছাড়িয়াছেন। তাই কেহ কেহ বলেন, কাশীরাম নিজে সংস্কৃত ভাল জানিতেন না, অন্যের লেখা অনুবাদ পড়িয়া গান গাহিয়া মহাভারতের কথা লোকদিগকে শুনাইয়া, মহাভারত তাঁহার এমন আয়ত্ত হইয়াছিল যে তিনি বাঙ্গালায় মহাভারত রচনা করেন, উহা অনুবাদ নহে। অনুবাদের মধ্যে তাঁহার সংস্কৃত জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিত্বশক্তিও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। অর্জ্জুন যখন লক্ষ্যভেদ করিতে যাইতেছেন তখনকার বর্ণনা তাঁহার অতি সুন্দর, তখন অর্জ্জুন ছদ্মবেশে, ব্রাহ্মণের সাজে।

দেখ দ্বিজ মনসিজ জিনিয়া মূরতি।
পদ্ম-পত্র যুগ্ম-নেত্র পরশয়ে শ্রুতি॥
অনুপম তনু শ্যাম নীলোৎপল আভা।
মুখরুচি কত শুচি করিয়াছে শোভা॥
সিংহগ্রীব, বন্ধুজীব অধরের তুল।
খগরাজ পায় লাজ নাসিকা অতুল॥
দেখ চারু যুগ্ম ভুরু, ললাট প্রসর।
কি সানন্দ গতি মন্দ মত্ত করিবর॥
ভুজ-যুগ নিন্দে নাগে আজানুলম্বিত।
করিকর-যুগবর জানু সুবলিত॥
মহাবীর্য্য যেন সূর্য্য জলদে আবৃত।
অগ্নি-অংশু যেন পাংশুজালে আচ্ছাদিত॥
বিদ্ধিবেক লক্ষ্য এই লয় মোর মনে।
ইথে কি সংশয় আর কাশীদাস ভণে॥

কাশীরাম দাসের মহাভারতের মধ্যে জায়গায় জায়গায় অন্য কবিদের মহাভারতের সঙ্গে মিল দেখিতে পাওয়া যায়। তবু মোটের উপর কাশীরামের মহাভারতই এদেশে চলিয়াছে বেশি। তাহার অন্যতম কারণ হইতেছে, তাঁহার মহাভারতই প্রথম ছাপা হয়, এবং তাহা সম্পূর্ণ অবস্থায় পাওয়া যায়। তাছা ভিন্ন তিনি যেমন সংস্কৃত শাস্ত্রের অলঙ্কার প্রয়োগে, তেমনই লঘু শব্দের বিন্যাসে পটু ছিলেন। তাই মোটের উপর তাঁহার অনুবাদের সৌন্দর্য্যও বেশি। আমাদের দেশের অন্য এক কবি এইভাবে কাশীরাম দাসের প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন—

চন্দ্রচূড়-জটাজালে আছিলা যেমতি
জাহ্নবী, ভারত-রস ঋষি দ্বৈপায়ন,

সংস্কৃত-হ্রদে রাখিলা তেমতি ;—
তৃষ্ণায় আকুল বঙ্গ করিতে রোদন।
কঠোর গঙ্গায় পূজি ভগীরথ ব্রতী,
(সুধন্য তাপস ভবে, নর-কুল-ধন !)
সগর-বংশের যথা সাধিল মুকতি,
পবিত্রিলা আনি মায়ে, এ তিন ভুবন ;
সেইরূপ ভাষা-পথ খননি স্ববলে,
ভারত-রসের স্রোতঃ আনিয়াছ তুমি
জুড়াতে গৌড়ের তৃষা সে বিমল জলে !
নারিবে শোধিতে ধার কভু গৌড়ভূমি।
মহাভারতের কথা অমৃত-সমান।
হে কাশি, কবীশদলে তুমি পুণ্যবান্॥

রামায়ণ মহাভারতের পরেই ভাগবতের নাম করিতে হয়। রামায়ণে আছে রামের কথা, মহাভারতে আছে বিশেষ করিয়া কুরু-পাণ্ডবের কথা, আর ভাগবতে আছে কৃষ্ণের কথা। যে দেশে কৃষ্ণ কথাকেই সব চেয়ে বড় কথা বলিতে হয়, সেখানে ভাগবত যে বেশি রকম প্রচার হইবে তাহা বলাই বাহুল্য। সমস্তেরই হউক আর অংশেরই হউক, মূল সংস্কৃত রামায়ণ-মহাভারতের বহু অনুবাদ বাংলায় আছে ; ভাগবতেরও একাধিক অনুবাদ পাওয়া যায়। যাঁহারা এইসব অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম ভাগবতাচার্য্য ; আর একজনের নাম কবিচন্দ্র। কবিচন্দ্রের বইখানির নাম ভাগবতামৃত ; ভাগবত এত মধুর, এত মিষ্ট যে উহাকে অমৃতের সঙ্গে তুলনা করা হয় ; ভাগবতামৃতের অন্য নাম, গোবিন্দ মঙ্গল। কবিচন্দ্র সমস্ত ভাগবত অনুবাদ করেন নাই। ইহা সারসংগ্রহ মাত্র ; সমস্ত ভাগবত হইতে কয়েকটী শ্লোক লইয়া সাজাইয়া গুছাইয়া বাংলা অনুবাদ করিয়া দিয়াছেন। তিনি প্রায় ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে বাঁচিয়াছিলেন। ইহার মধ্যে অনেক উপদেশ আছে, অনেক উপদেশের গল্প আছে।

মূর্খের জীবন বৃথা শুনগো জননী।
যে দেশে বান্ধব নাই সেদিগ শূন্য জানি॥
যে গৃহেতে পুত্র নাহি সে গৃহ শূন্যময়।
সর্ব্বশূন্য দরিদ্রতা জানিহ নিশ্চয়॥

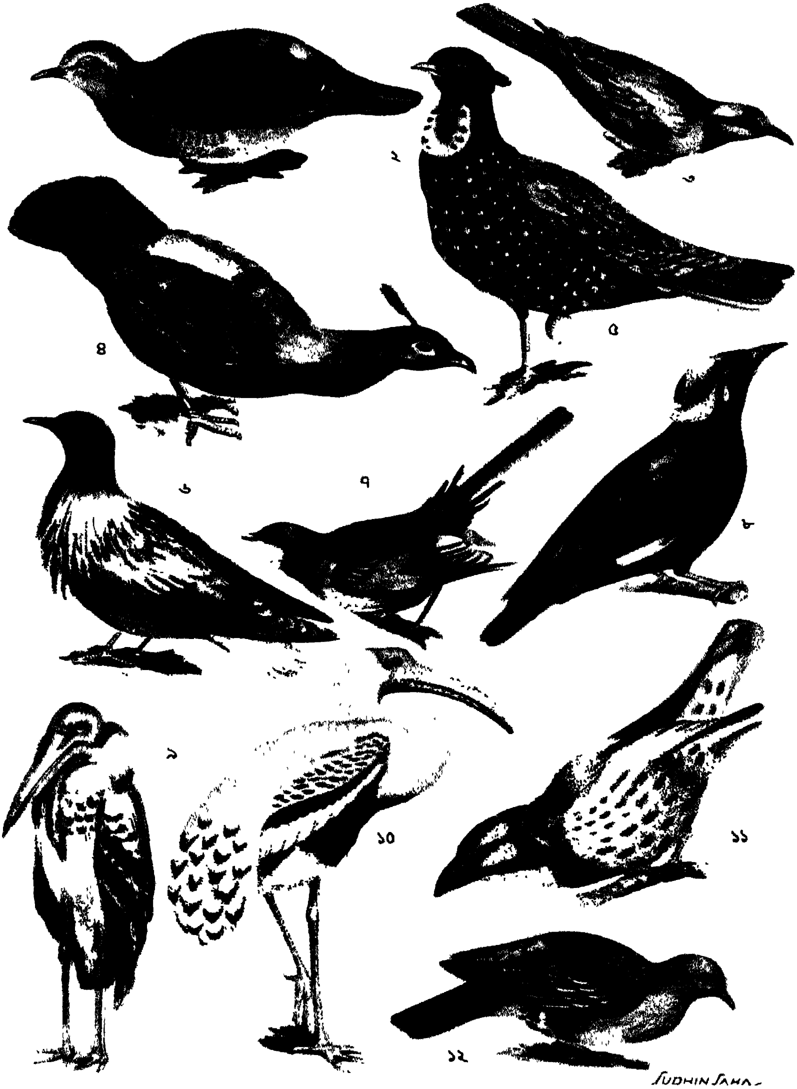
কৃষ্ণ অল্পবয়সে কত অসম্ভব সম্ভব করিয়াছিলেন, তাঁহার গোঠে মাঠে ধেনু চরান, রাখাল রাজা খেলা, বকাসুর বধ, কালীয়দমন, গোবর্দ্ধন ধারণ, রাসলীলা, কংসবধ, তাহার পর মথুরায় নানাভাবে শক্তিপ্রকাশ, দ্রৌপদীর লজ্জানিবারণ ইত্যাদি ব্যাপারের শেষে লীলাবসান,—এ সকলই "ভাগবতামৃত শ্রীশ্রীগোবিন্দমঙ্গলে" বর্ণনা করা হইয়াছে। শুধু বৈষ্ণব কেন, ভাগবতামৃত সকলেরই পাঠ্য, ইহার আখ্যান ভাগ যেমন সুন্দর, বর্ণনার ভঙ্গীও তেমনই সরল।

কবিচন্দ্র ছাড়া আরও অনেকে ভাগবতের অনুবাদ করিয়াছিলেন ; তাঁহাদের মধ্যে একজনের নাম করিয়াছি,—ভাগবতাচার্য্য। ভাগবতাচার্য্য অবশ্য নাম নহে, উপাধি ; আসল নাম রঘুনাথ। তাঁহার অনুবাদের নাম কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী, এবং তিনি প্রতিবার থামিবার সময় এই বলিয়া শেষ করিয়াছেন,

শ্রীভাগবত আচার্য্যের মধুরস বাণী।
একমনে শুন কৃষ্ণপ্রেমতরঙ্গিণী॥

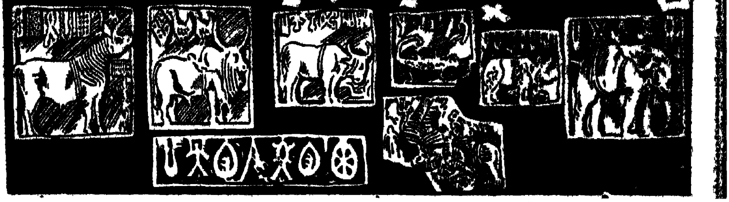
রামায়ণ মহাভারত ভাগবত সমগ্রভাবে অনুবাদ না করিয়াও উহাদের বিভিন্ন অংশ লইয়া নানা খণ্ড কাব্য লেখা হইত ; ভগবানে ভক্তির কথা, ভগবানের অনুগ্রহের কথা, দানবীরের সাহসের কথা,—এইসব তাহাতে থাকিত। কথকেরা রামায়ণ মহাভারত ভাগবতের আখ্যান লইয়া নিজেদের রচা গানে ও ছড়ায় এবং ব্যাখ্যায় তাহার ভাব ফুটাইয়া তুলিতেন, এবং আমাদের দেশের ছোট বড় সকলে, পণ্ডিত ও মূর্খ, স্ত্রী ও পুরুষ, ছেলে ও বৃদ্ধ, তাহা শুনিয়া আনন্দ পাইতেন। এখনও দেশে কথকঠাকুরের কথা শুনিতে পাওয়া যায়, তবে আগের মত নহে।

এসিয়ার পাখী



(২) সবুজ ঘুঘু, (৩) মালবারী বুলবুল, (৪) ঝুঁটিওয়ালা ময়ূর জাতীয় পাখী, (৫) হিমালয়ের মোয়াল, (৬) নিকোবার পারাবত, (৭) হলদে মিনিহেট্ট পাখী, (৮) পাহাড়ী ময়না, (৯) একজাতীয় হাড়গিলে, (১০) টান্টালাস পাখী (Tantalus), (১১) বাবেট্ট, (১২) একজাতীয় পায়রা।

প্রাচীন ভারতের মুদ্রাতত্ত্ব



মুদ্রার ওজন, ধাতু ও নির্ম্মাণ-প্রণালী

১৯৩৮ পৃষ্ঠার পর

বর্ত্তমান সময়ে ভারতবর্ষের প্রধান প্রচলিত মুদ্রার নাম টাকা। ইহা দ্বারা আমাদের দুইটা কার্য্য সাধিত হয়। টাকা পণ্যদ্রব্য বিনিময়ের সাহায্য করে এবং ওজনের মানরূপেও ব্যবহৃত হয়। এক টাকার ওজন এক তোলা; এইরূপে আশীটা টাকার বা আশী তোলায় এক সের এবং চল্লিশ সেরে এক মণ। আমরা যেমন আজ-কাল টাকার দ্বারা জিনিস ওজন করিয়া লই, অতীত কালেও মুদ্রা বিনিময় ও ওজন এই দুই কার্য্যের জন্যই ব্যবহৃত হইত। ইহার কারণ এই যে-মুদ্রা প্রচলিত হওয়ার পূর্ব্বে জিনিসপত্রের মূল্য স্বরূপ ধাতুদ্রব্য ওজন করিয়া দেওয়া হইত। যখন মুদ্রা প্রচলিত হইল, তখন মুদ্রাগুলি পূর্ব্বোক্ত প্রচলিত ওজনের সমান করিয়া তৈয়ার করা হইত। রাজারা নির্দ্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ডের উপর নিজ নিজ অঙ্কচিহ্ন, মূর্ত্তি বা নাম মুদ্রিত করিয়া কতটুকু ধাতু এবং তাহাতে কি পরিমাণ খাদ আছে জানাইয়া দিতেন এবং লোকেরা রাজচিহ্ন দেখিয়া ঐ মুদ্রাগুলি বিনিময়ের সময় গ্রহণ করিত এবং এইরূপে প্রতিবার ক্রয়-বিক্রয়ের সময় ধাতুখণ্ড ওজন করায় বা তাহাদের বিশুদ্ধতা পরীক্ষা করার দরকার হইত না। মুদ্রার প্রচলন হওয়ায় বাণিজ্যের যে বিশেষ সাহায্য হইয়াছিল, সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

অতি প্রাচীনকালে সোনা, রূপা প্রভৃতি মূল্যবান দ্রব্য ওজন করিবার একরূপ রীতি এবং তাম্র প্রভৃতি সাধারণ জিনিস ওজন করিবার জন্য অন্যরূপ তোল বা মাপ-প্রণালী ব্যবহৃত হইত। কিন্তু উভয় ওজনেরই প্রামাণিক মাপ বা মান ছিল রতি। কুঁচ গাছের একটা বীজের ওজন এক রতি ধরা হইত, এইরূপ ৩২ রতি ওজনের রৌপ্যখণ্ড দ্বারা একটা অঙ্কচিহ্নিত **পুরাণ** বা **ধরণ** নামীয় মুদ্রা প্রস্তুত হইত; কিন্তু অঙ্কচিহ্নিত তাম্রমুদ্রা বা **কার্ষাপণের** ওজন ছিল ৮০ রতি। অতি প্রাচীন কাল হইতে বিভিন্ন দ্রব্যের দুই প্রকার ওজন-প্রণালী চলিয়া আসিতেছিল; ইহাই এইরূপ রীতি প্রচলিত হওয়ার কারণ। রৌপ্য-মুদ্রাগুলি মূল্যবান দ্রব্যের ওজন রীতির আমলে আসিয়াছিল এবং সাধারণ দ্রব্যের ওজনের নিয়ম অনুসারে তাম্রমুদ্রাগুলির ওজন স্থির করা হইত। যদিও অঙ্কচিহ্নিত রৌপ্য ও তাম্রের ওজন পূর্ব্বোক্ত নিয়মে নির্দ্ধারণ করিয়া দেওয়া হইয়াছিল, তবু বাস্তবিক পক্ষে যে সকল অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রা বর্ত্তমান সময়ে আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ওজন নির্দ্ধারিত ওজন হইতে প্রায়ই অনেক কম। বহুদিন ব্যবহৃত হওয়ায় মুদ্রার ওজন হ্রাস পায়; অনেক সময়ে অসৎ লোকেরা মুদ্রাগুলি চাঁচিয়া অল্প অল্প ধাতু চুরি করে, আবার রাজারাও লাভ করিবার জন্য কম ওজনের মুদ্রা টাকশাল হইতে তৈয়ার করিয়া বাজারে চালাইয়া দিতেন। এই সকল নানাকারণে মুদ্রার ওজন নির্দ্ধারিত ওজন হইতে অনেক সময় কমই পাওয়া যায়।

কোন কোনও রাজ্যে কেবলমাত্র তাম্রমুদ্রাই প্রচলিত ছিল। তাহাদের প্রধান মুদ্রা ছিল **কার্ষাপণ**। আবার যে সকল রাজ্যে বা প্রদেশে

কেবল রৌপ্যমুদ্রা প্রচলিত ছিল, তাহাদের প্রধান মুদ্রার নাম **পুরাণ** বা **ধরণ**। কিন্তু মগধের ন্যায় প্রসিদ্ধ সাম্রাজ্য দুই প্রকার ধাতুর মুদ্রাই দেখা যায়। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র নামক গ্রন্থে ঐ সকল মুদ্রার নাম পাওয়া যায়। রৌপ্যমুদ্রাগুলির নাম ছিল **পণ**, **অর্দ্ধপণ** ও **পাদপণ**, যেমন আধুনিক **টাকা**, **আধুলি**, ও **সিকি**। বিভিন্ন তাম্রমুদ্রার নাম ছিল **মাষক**, **অর্দ্ধমাষক**, **কাকণিক** ও **অর্দ্ধকাকণিক**, আমাদের যেমন দুই আনি, চার আনি আছে সেইরূপ দ্বিমাষক ও চতুর্মাষকও প্রচলিত ছিল। ইহাতে স্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে মৌর্য্য সম্রাট্‌দের সময়ে দেশের আর্থিক অবস্থা এত উন্নত হইয়াছিল যে, ব্যবসায়-বাণিজ্যের জন্য রৌপ্য ও তাম্রের নানারূপ মুদ্রা প্রস্তুত করা দরকার হইয়া পড়িয়াছিল। সব সময়ে যে এইরূপ রীতিতে মুদ্রা প্রস্তুত হইত, তাহা নহে। পরবর্ত্তী কালে বহু মুদ্রা নির্দ্ধারিত ওজন হইতে কম বা বেশি ওজনের প্রস্তুত করা হইত এবং নামও বিভিন্ন ছিল। যেমন এখন নানাদেশে নানা ধাতুর বিভিন্ন ওজনের মুদ্রা প্রচলিত আছে, সেইরূপ এই বিশাল দেশের নানাপ্রদেশে বিভিন্ন যুগে নানাপ্রকার ওজনের নানারকম মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এখানে কেবলমাত্র একটা বিশেষ এবং অতি প্রাচীন রীতির আলোচনা করা হইল। তবে সর্ব্বপ্রকার ওজনেরই রতি ছিল প্রামাণিক ওজন বা মান। এমন কি এখনও ধাতুদ্রব্য ওজন করার সময়ে রতি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ছয় রতিতে এক আনা এবং ষোল আনার ওজন এক তোলা বা একটা টাকার সমান।

সুবর্ণই সম্ভবতঃ প্রাচীন প্রস্তরযুগে ইহার উজ্জ্বল হরিদ্রা বর্ণের জন্য প্রথম মানবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। সুবর্ণ শব্দটী, ইহার বর্ণ 'সু' অর্থাৎ সুন্দর বলিয়া প্রয়োগ করা হইয়া থাকে। ভারতবর্ষে এই ধাতুটী সহজ প্রাপ্য ছিল। সিন্ধু, হিরণ্যবাহ বা শোন, সুবর্ণরেখা প্রভৃতি নদীর বালুকার সঙ্গে স্বর্ণকণা মিশ্রিত পাওয়া যাইত। এখনও আসাম, পঞ্জাব এবং কাশ্মীরের কোন কোন নদীগর্ভে স্বর্ণকণা পাওয়া যায়। মানব সমাজে অলঙ্কারের আদর সব সময়েই আছে; প্রাচীনকালে বোধ হয় আরও বেশি ছিল। অতি প্রাচীন সভ্যতার কেন্দ্র মহেন্‌জোদাড়ো প্রভৃতি স্থানে সোনা, রূপা এবং তামার অলঙ্কার আবিষ্কৃত হইয়াছে, কিন্তু একটুকরাও লোহা পাওয়া যায় নাই। পরবর্ত্তী বৈদিকযুগেও পূর্ব্বোল্লিখিত ধাতুগুলির প্রচলন ছিল; লৌহ বৈদিক যুগের শেষ ভাগে আবিষ্কৃত হইয়া যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছিল। লৌহনির্ম্মিত অস্ত্রের সাহায্যে আর্য্যেরা অল্প সময়ের মধ্যেই ভারতে তাঁহাদের প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছিলেন।

ভারতবর্ষে সম্ভবতঃ তাম্রই সর্ব্বপ্রথম মুদ্রা নির্ম্মাণের জন্য ব্যবহৃত হইয়াছিল এবং ইরাণ ও অন্য কোন কোন প্রদেশে ও মালব প্রভৃতি জাতির মধ্যে পূর্ব্বাপর কেবলমাত্র অঙ্কচিহ্নিত তাম্র মুদ্রাই প্রচলিত ছিল। ইহার কারণ দারিদ্র্য বলিয়াই মনে হয়। কিন্তু কোন কোনও দেশ সমৃদ্ধিশালী হওয়ায় কেবলমাত্র তাম্রমুদ্রায় সন্তুষ্ট থাকিতে পারিল না। তাহারা তাম্রমুদ্রার সঙ্গে রৌপ্যমুদ্রাও ব্যবহার করিতে লাগিল। প্রাচীন তক্ষশিলা, মগধ প্রভৃতি রাজ্যে তাম্র ও রৌপ্য উভয় ধাতুর মুদ্রাই নির্ম্মিত হইত। কিন্তু এদেশে রৌপ্য অতি অল্পই পাওয়া যাইত, এইজন্য বিদেশ হইতে রৌপ্য আমদানি করিতে হইত। তৎকালে ভারতে সুবর্ণের আপেক্ষিক প্রাচুর্য্য ছিল বলিয়া উহা এদেশ হইতে রপ্তানি হইত; রৌপ্য পাশ্চাত্যদেশে অধিক পাওয়া যাইত, সুতরাং ভারতে রৌপ্যের অভাব পূরণ করিবার জন্য বিদেশ হইতে রৌপ্য আমদানি করিতে হইত।

খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীতে কুষণবংশীয় রাজাদের সময়ে এদেশে প্রথম স্বর্ণমুদ্রার প্রচলন হয়। কুষণ সম্রাটদের রাজত্বকালে স্বর্ণ এবং তাম্র মুদ্রার দ্বারা উত্তর ভারতে ব্যবসায় বাণিজ্যের কাজ চলিত। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য ধাতুর মুদ্রাও নির্ম্মিত হইতে থাকে। ইউথিডেমস্ (Euthydemos), এগাথক্লিস্ (Agathokles) ও পেণ্টালয়ন্ (Pantaleon) নামীয় ভারতীয় গ্রীকরাজাদের কোন কোনও মুদ্রায় নিকেল পাওয়া গিয়াছে এবং খুব সম্ভব মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক ক্ষুদ্রক ও মালব জাতীয় লোকেরাও এই ধাতুর সহিত পরিচিত ছিল। দাক্ষিণাত্যে অন্ধ্রবংশীয় রাজারা সীসার মুদ্রা বড় ভালবাসিতেন এবং তাঁহাদের

রাজ্যে ছোট ছোট সীসক মুদ্রার প্রচলন করিয়াছিলেন। এই সকল আন্ধ্র মুদ্রার কোনও সৌন্দর্য্য নাই; ইহা দেখিতে অতি কুৎসিত। কেবলমাত্র ঐতিহাসিক কারণে এইগুলির আদর। ভারতীয় গ্রীক রাজা ষ্ট্রেটো (Strato), পারদবংশীয় অজ (Azes), এবং যবার ক্ষত্রপ বা শাসনকর্ত্তা রঞ্জবুল উত্তর ভারতে সীসকমুদ্রা প্রচলন করেন। এই ধাতু ভারতে অতি অল্পই পাওয়া যাইত; কাজেই বিদেশ হইতে আমদানি করা হইত। পেরিপ্লাস্ (Periplus) নামক খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর একখানা গ্রন্থে ভারতীয় বন্দরগুলিতে সীসা আমদানি হইত বলিয়া উল্লেখ আছে এবং সুপ্রসিদ্ধ লেখক প্লীনি (Pliny) এই দেশের লোকেরা মূল্যবান পাথর ও মুক্তার পরিবর্ত্তে সীসা এবং পিতল ক্রয় করিতে লিখিয়া গিয়াছেন, এবং বোধ হয় আন্ধ্ররাজ্যে সীসকমুদ্রার প্রচলনই ইহার প্রধান কারণ।

অতি প্রাচীনকাল হইতেই মিশ্র ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এক এক মুদ্রায় দুই বা তিন রকমের ধাতু মিশ্রিত পাওয়া যায়। প্রথমতঃ একমাত্র বিশুদ্ধ ধাতু দ্বারা কোন মুদ্রা প্রস্তুত করা যায় না। শক্ত করিবার জন্য সোনা, রূপা বা তামার সহিত অন্য অন্য ধাতু টিন, সীসা, নিকেল প্রভৃতি খাদ দিতে হয়। অনেক সময়ে স্বাভাবিক অবস্থায় প্রাপ্ত মিশ্র ধাতুকে বিশুদ্ধ অবস্থায় আনিতে না পারিয়া ঐরূপ মিশ্র অবস্থাতেই তদ্বারা মুদ্রা তৈয়ার করা হইত। লোককে ঠকাইবার জন্য কোন কোনও সময়ে অধিক মূল্যের ধাতুর সহিত অল্প মূল্যের ধাতু মিশাইয়া দেওয়া যে না চলিত তাহা নহে। লিডিয়ার প্রাচীনতম মুদ্রা ইলেক্ট্রাম্ (Electrum) নামক স্বর্ণ মিশ্রিত ধাতু দ্বারা নির্ম্মিত হইত। আমাদের দেশে কাশ্মীরে খৃষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তামার সহিত অতি অল্প স্বর্ণ মিশ্রিত ইলেক্ট্রাম মুদ্রা প্রচলিত ছিল। এদেশে আরও তিন রকমের মিশ্র ধাতুর মুদ্রা দেখা যায়—পোটিন (Potin), বিলন (Billon) ও পিতল। পোটিন একটি অদ্ভুত মিশ্র ধাতু; ইহাতে তামা, সীসা, টিন এবং কিছু খাদ আছে। সব সময়ে সীসা এবং তামার ভাগ ঠিক থাকিত না—কোনও সময়ে তামা এবং কোনও সময়ে সীসা বেশি দেওয়া হইত। আন্ধ্ররাজারা পোটিন মুদ্রার পক্ষপাতী ছিলেন—কোলাপুর ও মালব প্রদেশে এই মিশ্র ধাতুর মুদ্রা প্রচলিত ছিল এবং মধ্য প্রদেশের চন্দ জিলায় কেবল মাত্র পোটিনের মুদ্রাই ব্যবহৃত হইত। বিলন আর একটি মিশ্র ধাতু; ইহাতে অল্প পরিমাণ রৌপ্যের সহিত অত্যন্ত অধিক খাদ দেওয়া হইত। তামা এবং দস্তা মিশাইয়া পিত্তল তৈয়ার করা হয় এবং তামা ও টিনের মিশ্র ধাতুকে কাঁসা বলে। এই সকল মিশ্রধাতুর মুদ্রাও বিভিন্ন যুগে নানা-প্রদেশে পাওয়া যায়। পিত্তলের বহুমুদ্রা অযোধ্যা, কৌশাম্বী, অবন্তী প্রভৃতি প্রাচীন স্থানে পাওয়া গিয়াছে।

এখন যেমন বিভিন্ন ধাতুর মুদ্রা একদেশে একই সময়ে প্রচলিত আছে; প্রাচীনকালেও প্রায় সেইরূপ ছিল। কিন্তু একটা বিষয় বিশেষভাবে লক্ষ্য করা দরকার। এখন যতটুকু রূপার বিনিময়ে নির্দ্দিষ্ট ওজনের স্বর্ণখণ্ড পাইয়া থাকি, প্রাচীনকালে তাহা অপেক্ষা অনেক কম রূপার পরিবর্ত্তে ততটুকু সোনা পাওয়া যাইত; অর্থাৎ স্বর্ণের তুলনায় বর্ত্তমান সময় হইতে রৌপ্যের মূল্য বেশি ছিল। সেইরূপ রৌপ্যের তুলনায় তাম্রের মূল্যও এখনকার সময় হইতে অধিক ছিল। কিন্তু ইহাও সর্ব্বদা মনে রাখিতে হইবে যে, বিভিন্ন ধাতুর হার বা আপেক্ষিক মূল্য কখনই স্থির থাকিতে পারে না। সময়ের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে মূল্য বৃদ্ধি বা হ্রাস হইতেই হইত। প্রাচীনকালেও এইরূপ বিভিন্ন ধাতুর মূল্যের তারতম্য হইত; তবে মোটামুটি এখনকার সহিত তুলনায় রৌপ্য এবং তাম্র অধিক দুষ্প্রাপ্য ছিল। সেইজন্যই মনে হয়, অতীত যুগে কড়ি প্রভৃতি নানা বিনিময়যন্ত্র অধিক প্রচলিত ছিল এবং এখনকার মত এত বেশি মুদ্রার প্রয়োজন ছিল না। আমেরিকা আবিষ্কারের পর হইতেই দিন দিন অধিক রৌপ্য উৎপন্ন হইতেছে এবং সেইজন্য ইহার আদরও কমিয়া যাইতেছে। অন্যান্য নানা কারণেও সুবর্ণের তুলনায় ক্রমেই রৌপ্যের দাম হ্রাস পাইতেছে।

আমাদের দেশের প্রাচীনতম মুদ্রার আকার এবং নির্ম্মাণ-প্রণালী প্রভৃতি বিষয়ে অন্যান্য প্রাচীন সভ্য জাতির মুদ্রা হইতে বিভিন্ন এবং এই মুদ্রা তদ্দেশের যে তোলরসন্দেহইতে উদ্ভূত; সুতরাং ইহাতে বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নাই যে, অতি প্রাচীন ভারতের মুদ্রাঙ্কন-পদ্ধতি এতদ্দেশজাত ও বৈদেশিক প্রভাবশূন্য। পরবর্ত্তীকালে বৈদেশিক পদ্ধতির

অনুকরণ দেখিতে পাওয়া যায়; কিন্তু অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রাগুলি সম্পূর্ণরূপে ভারতীয়। প্রতীচ্য জগতে সর্ব্বপ্রথম লিডিয়াদেশে আবিষ্কৃত হইয়াছিল; এই মুদ্রা ইলেকট্রাম (Electrum) বা রৌপ্যমিশ্রিত স্বর্ণপিণ্ড অথবা ছোট ছোট গোলাকার স্বর্ণ-খণ্ড মাত্র এবং ইহার অকৃত্রিমতার প্রমাণস্বরূপ এই সকল পিণ্ডাকৃতি মুদ্রার উপর অঙ্কচিহ্ন মুদ্রণ করিয়া দেওয়া হইত। এই সকল লিডিয় মুদ্রার অনুকরণে বা বিবর্ত্তনে প্রতীচ্য জগতের অন্যান্য দেশে মুদ্রা উদ্ভূত হইয়াছিল। কিন্তু ভারতীয় রীতি ইহা হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন। রৌপ্যখণ্ডকে হাতুড়ি দ্বারা একটা পাতলা পাতে পরিবর্ত্তিত করা হইত। তৎপর সেই রৌপ্য পাত হইতে প্রায় অর্দ্ধ ইঞ্চি সরু ফালি কাটিয়া লইয়া আনুমানিক ৩২ রতি ওজনের ছোট ছোট খণ্ডে বিভক্ত করা হইত। বিশুদ্ধি জ্ঞাপনের জন্য এই খণ্ডগুলির এক বা উভয় পার্শ্বে অঙ্কচিহ্ন মুদ্রিত থাকিত। এই মুদ্রা আকারে অতি অদ্ভুত ছিল; কচিৎ দুই চারিটা গোল বা চতুষ্কোণ ছিল কিন্তু অধিকাংশই ক্রমবিরুদ্ধ বা অসমরূপ। তাম্র মুদ্রাগুলি পুরু তাম্র শলাকা হইতে কাটিয়া লইয়া আনুমানিক ৮০ রতি ওজনের তৈয়ার করা হইত। তৎপর বেধনযন্ত্র বা ছেনিদ্বারা অঙ্কচিহ্নগুলি মুদ্রিত করিয়া দেওয়ার নিয়ম প্রচলিত ছিল। কিন্তু কোন কোনও সময়ে ছাঁচে ঢালিয়া দিয়াও এই সকল মুদ্রা তৈয়ার করা হইত। এই অঙ্কচিহ্নিত পোড়া মাটির একটা ছাঁচ মথুরার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। এই ছাঁচটা গোলাকার, ভিতর খোলা ও দুইভাগে বিভক্ত। ধাতু গলাইয়া ছিদ্রপথে ছাঁচের ভিতর ঢালিয়া দেওয়া হইত এবং মধ্যস্থ ধাতু শীতল হইয়া শক্ত হইলে ছাঁচটার দুই পিঠ খুলিয়া লওয়া হইত এবং তৈয়ারী মুদ্রাটা বাহির হইয়া পড়িত। এইরূপে একবারে দুই বা ততোধিক মুদ্রাও তৈয়ার করা যাইত। এই ঢালাই করার প্রথা পরবর্ত্তীকালে সম্ভবতঃ খৃষ্টপূর্ব্ব পঞ্চম শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছিল। ছাঁচগুলি পাথর, লোহা বা ব্রোঞ্জেও তৈয়ারি হইত। কৌশাম্বী, অযোধ্যা, মথুরা প্রভৃতি রাজ্যে খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দী পর্য্যন্ত ঢালাই করা মুদ্রার বিশেষ প্রচলন ছিল। কিন্তু তৎপূর্ব্বেই ভারতের উত্তরপশ্চিম-প্রদেশে বিদেশীয়দের অনুকরণে বর্ত্তমানকালের ন্যায় ছাপ দেওয়া (Die-struck) মুদ্রা ব্যবহৃত হইতে আরম্ভ হয়। খুব সম্ভবতঃ এই মুদ্রা সর্ব্বপ্রথমে তক্ষশিলায় প্রচলিত হইয়াছিল। এইগুলি কোন কোনও সময়ে চতুষ্কোণ হইলেও সাধারণতঃ গোলাকার এবং বিদেশীয় মুদ্রার ন্যায় ইহাতে লিপি (Legend) আছে। প্রথমে এই সকল মুদ্রার একদিকে মাত্র ছাপ অঙ্কিত থাকিত; পরে ক্রমে উভয় দিকেই ছাপ বা নক্সা মুদ্রিত হইত। নির্দ্দিষ্ট ওজনের ধাতুখণ্ডগুলিকে ছোট ছোট পাতে পরিবর্ত্তিত করিয়া, নানারূপ নমুনা ছাঁচ সহযোগে হাতুড়ি দ্বারা এক বা উভয়পৃষ্ঠে ছাপ দিয়া মোহরাঙ্কিত করিয়া দেওয়া হইত। যে সকল মুদ্রা অর্দ্ধদ্রব অবস্থায় ব্যবহৃত হইত, তাহাদের চতুর্দ্দিক উচ্চ হইয়া উঠিত। ভারতীয় গ্রীকরাজা পান্তলেব ও অগথুক্লেয়ের তাম্র মুদ্রা এইরূপ মুদ্রার অনুকরণে নির্ম্মিত। ক্রমে ক্রমে অন্যান্য মুদ্রানির্ম্মাণ রীতি অপ্রচলিত হইয়া পড়িল এবং দেশময় উভয় দিকে মোহরাঙ্কন-প্রথাই প্রবর্ত্তিত হইল। এই ছাঁচগুলি লৌহ, ইস্পাত, বর্ত্তলৌহ (Bronze) প্রভৃতি কঠিন পদার্থে নির্ম্মিত হইত। একটা ছাচ স্থূলার (Anvil) উপর লাগান থাকিত; ধাতুর পাতটা তাহার উপর রাখিয়া অন্য ছাঁচটা তদুপরি রক্ষিত হইত। পরে হাতুড়ি দ্বারা বারবার আঘাত করিয়া ধাতুখণ্ডের উভয় পৃষ্ঠেই খোদিত লিপি ও নমুনা মুদ্রিত করিয়া দেওয়া হইত।

মুদ্রা তৈয়ার করার সময় কিয়ৎপরিমাণ খাদের দরকার হয়। খাদ ব্যবহার না করিলে বিশুদ্ধ ধাতুর মুদ্রাগুলি বড়ই নরম হইয়া পড়ে এবং সহজেই বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হয়। কানিংহাম সাহেব প্রাচীন অঙ্কচিহ্নিত—১৭৩টা রৌপ্য মুদ্রা পরীক্ষা করিয়াছিলেন। এই মুদ্রাগুলিতে খাদের পরিমাণ শতকরা ১৩.৮ হইতে ২৪.৮ ভাগ পাওয়া গিয়াছিল কৌটিল্যের অর্থ-শাস্ত্র নামক গ্রন্থে একটা নির্দ্দিষ্ট নিয়ম পাওয়া যায়। তাঁহার মতে রৌপ্য মুদ্রায় ষোলভাগের পাঁচভাগ অর্থাৎ শতকরা ৩১.২৫ ভাগ এবং তাম্র মুদ্রায় চারিভাগের একভাগ বা শতকরা ২৫ ভাগ খাদ দেওয়া কর্ত্তব্য। যে সমস্ত পদার্থ খাদরূপে ব্যবহৃত হইত, তাহাও তিনি উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। রৌপ্য মুদ্রায় তাম্র, লৌহ, ত্রপু (টিন), সীস এবং অঞ্জন খাদ দেওয়া হইত এবং তন্মধ্যে তাম্রের ভাগই বেশি থাকিত। তাম্র মুদ্রায় অতি সামান্য রৌপ্য, অধিক পরিমাণে লৌহ বা অন্য ধাতু প্রয়োগ করার প্রথা প্রচলিত ছিল।

অনেক সময়ে রাজারা অন্যায়রূপে লাভ করিবার জন্য নিয়মাতিরিক্ত খাদ ব্যবহার করিতেন। ইহাতে জনসাধারণ ক্ষতিগ্রস্ত হইত। তাহারা উচিত মূল্য দিয়া যথোচিত পরিমিত ওজনের ধাতু পাইত না। অন্যান্য কারণেও খাদের ভাগ কম বেশি হইত; তাহার বিস্তৃত আলোচনা এখানে সম্ভব নয়।

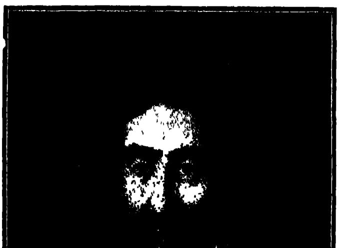
বর্ত্তমান সময়ে অসৎলোকেরা টাকা, পয়সা প্রভৃতি মুদ্রা জাল করিয়া অন্যায়রূপে লাভবান হইতে চেষ্টা করে। প্রাচীনকালেও যে এইরূপ লোকের অভাব ছিল না, তাহার প্রমাণ স্বরূপ বহু জাল মুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। খাদ বেশি দিয়া সরকারি মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রা জাল করা তখনকার দিনে খুবই সহজ ছিল। ছাঁচগুলি সহজেই নির্ম্মাণ করা যাইত এবং আজকালকার মত নানারূপ সূক্ষ্ম কলকব্জারও দরকার হইত না। এইজন্য সে সময়ে মুদ্রা জাল করা বিশেষ দণ্ডার্হ বলিয়া গণ্য হইত। আর এক উপায়ে মুদ্রাগুলি হইতে অল্প অল্প ধাতু চুরি হইত। টাকার চারিদিকে খাঁজ কাটা থাকে; চাচিয়া কিছু রূপা লইয়া গেলে দেখিবামাত্রই বুঝিতে পারা যায়। কিন্তু প্রাচীনকালে মুদ্রার এরূপ কোনও বেষ্টন না থাকায় চুরি করার বেশ সুবিধা হইত এবং অসৎলোকেরা মুদ্রা হইতে অল্প অল্প ধাতু চাঁচিয়া লইয়া যাইত। ওজন না করিলে কিছুতেই ইহা ধরা পড়িত না। আর একটা বেশ কৌশল ক্রমে চুরি করার প্রথাও বাহির হইয়া পড়িয়াছে। রৌপ্যমুদ্রার অনুকরণে একটা তাম্র মুদ্রা তৈয়ার করিয়া দ্রবীভূত তরল রৌপ্যের মধ্যে ডুবাইয়া লইলেই, তাহা অতি পাতলা এক পরত রৌপ্য দ্বারা আবৃত হইয়া যাইত এবং ঐ তাম্র মুদ্রা রৌপ্য মুদ্রা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যাইত। এই জুয়াচুরি ধরিবার একমাত্র উপায় কোন তীক্ষ্ণ অস্ত্রদ্বারা মুদ্রাগুলিকে আঘাত করিয়া ভিতরে কি ধাতু আছে তাহা পরীক্ষা করা। কোন কোন মুদ্রার উপর আঘাতের চিহ্ন পাওয়া যায়, এই চিহ্নগুলিকে বেণিয়ার দাগ (Shroff-mark) বলে।



ডনকুইকস্‌ট

[ডন্ কুইকসটের লেখক Migdel-de-Cervantes ১৫৮৭ খ্রীষ্টাব্দে স্পেন দেশের আলকালা (Alcala) নামক একটি ছোট সহরে জন্মগ্রহণ করেন। মহাকবি সেক্সপীয়রের জন্মের প্রায় সতের বৎসর পূর্ব্বে ইনি জন্মলাভ করিয়াছিলেন।

Migdel-de-Cervantes এর পিতা ছিলেন অস্ত্র চিকিৎসক। তাঁহার ইচ্ছা ছিল, পুত্রকে বিদ্বান ও সুপণ্ডিত করেন। কিন্তু সারভ্যানটিসের ঝোঁক পড়াশুনার দিকে বড় একটা ছিল না। তাঁহার ছেলেবেলা হইতেই দুঃসাহসিকতার কাজ করিতে, দেশ-বিদেশে বেড়াইতে এবং নানা দেশের লোকের স্বভাব-চরিত্র সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ করিবার আকাঙ্ক্ষা ছিল। সারভ্যানটিসের বয়স যখন মাত্র কুড়ি বৎসর, তখন তিনি স্পেনের রাজধানী ম্যাড্রিড (Madrid) সহরে যাইয়া সৈন্যদলে ভর্ত্তী হইয়া রোম নগরীতে যান। এই সময় হইতেই তাঁহার দুঃসাহসিকতার দিকে আরও ঝোঁক পড়ে।—তুর্কীরা যখন দক্ষিণ ইউরোপে অভিযান করেন, তখন সারভ্যানটিস্ "Marquesa" নামক রণপোতে নৌ-সৈনিক রূপে কার্য্য গ্রহণ করেন। এ ঘটনা ঘটে ১৫৭১ খ্রীষ্টাব্দে। খ্রীষ্টানদের নৌ-বহর যখন লেপাণ্টো (Lepanto)র কাছাকাছি আসে, তখন তাঁহার জ্বর হইয়াছিল। তাঁহার সঙ্গিগণ তাঁহাকে যুদ্ধে যোগদান করিতে বারণ করিলেও তিনি যুদ্ধে যোগদান এবং গুরুতর রূপে আহত হন। দুইটি গুলি তাঁহার বুকে লাগে এবং একটি গুলি তাঁহার হাতে লাগিয়াছিল। গুলির ঘায়ে তাঁহার ডান হাতখানা একেবারে অকর্ম্মণ্য হইয়া গিয়াছিল। এইরূপ ভাবে আহত হইয়াও তাঁহার যুদ্ধ করিবার আকাঙ্ক্ষা নিবৃত্ত হয় নাই। ১৫৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্যান্ত তিনি নানাযুদ্ধে লিপ্ত ছিলেন, অবশেষে তিনি স্পেনে ফিরিয়া আসিবার জন্য বিদায় পাইয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এমনি দুর্ভাগ্য যে বাড়ি ফিরিবার পথে তিনি ও তাঁহার সঙ্গিগণ ফরাসীদেশের দক্ষিণাংশে বারবারি জলদস্যুদের হাতে পড়েন এবং উত্তর আফ্রিকার অন্তর্গত এ্যাল-জেরিয়ায় মুরদের নিকট ক্রীতদাস-রূপে বিক্রীত হইয়াছিলেন।



সারভ্যানটিস

মুরদের কাছে তিনি পাঁচ বৎসরকাল বন্দী ছিলেন। সে সময়েও তিনি চুপ চাপ বসিয়া থাকিতেন না। মুক্তি লাভের জন্য নানারূপ চেষ্টা করিতেন। সারভ্যানটিস অসাধারণ সাহসী পুরুষ ছিলেন। কতবার যে পলায়ন করিতে চেষ্টা করিয়া ধরা পড়িয়াছেন, তাহার অবধি ছিল না। তাঁহাকে দুই হাজার কোড়া লাগাইবার ভয় দেখাইয়াও মুরেরা তাঁহার পলায়ন করিবার দুঃসাহসিকতার প্রবৃত্তি হইতে নিবৃত্ত করিতে পারেন নাই। মুরেরাও তাঁহার অসাধারণ সাহসিকতার প্রশংসা করিতেন। এমন কি স্বয়ং পাশা (শাসন কর্ত্তা) সারভ্যানটিসের দুঃসাহসিকতার সুখ্যাতি করিয়া তাঁহাকে রাজ সরকারে একটি কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন। অবশেষে ১৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে দুই হাজার ডকেট্স্ বা সেকালের ইউরোপে প্রচলিত মুদ্রার বিনিময়ে তিনি মুক্তিলাভ করেন।

বন্দীদশা হইতে মুক্তিলাভ করিয়া আসিয়া তিনি ম্যাড্রিড্

নগরীতে স্থায়ীভাবে বাস করিতে আরম্ভ করেন। এবং সাহিত্য-সেবা দ্বারা জীবিকা-অর্জ্জন করিবার সঙ্কল্প করিলেন, কিন্তু তেমন সফলতা লাভ করিতে না পারায় ১৫৮৭ খৃষ্টাব্দে সিভিল (Seville) নগরীতে যাইয়া যুদ্ধের সৈনিকদের রসদ যোগাইবার কার্য্য গ্রহণ করেন। এ সময়ে বিখ্যাত Spanish Armada ইংলণ্ড বিজয়ে অগ্রসর হইতেছিল। এ কার্য্যে তাঁহার কোনও লাভ হয় নাই, বরং ঋণগ্রস্ত হইয়া অতিশয় দুরবস্থায় পড়িয়াছিলেন। ঋণের জন্য তাঁহাকে দুইবার কারাগারে যাইতে হয়।

সারভানটিস্‌ যখন সিভিল নগরের কারাগারে অবরুদ্ধ ছিলেন, তখন তাঁহার মনে 'ডনকুইসট্‌' রচনা করিবার কল্পনা জাগরিত হয়। ১৬০৫ খৃষ্টাব্দে 'ডনকুইসট্‌' (Don-quixote) প্রকাশিত হইল। এই বইখানা প্রকাশিত হইবার সঙ্গে সঙ্গেই তাঁহার খ্যাতি চারিদিকে বিস্তৃত হইয়া পড়িল। সংস্করণের পর সংস্করণ মুদ্রিত হইতে লাগিল। সম্রাট হইতে আরম্ভ করিয়া সাধারণ মুদি-পসারি, দোকানদার, এমন কি সাধারণ লেখা-পড়া জানা লোকেরা পর্য্যন্ত ডনকুইক্‌সটের বীরত্ব কাহিনী পড়িয়া হাসির লহর তুলিতে আরম্ভ করিল।

ডনকুইক্‌সট্‌ প্রকাশিত হইবার পর আর তাঁহার কোনও অভাব অভিযোগ রহিল না। তিনি সর্ব্বত্র প্রসিদ্ধি লাভ করিলেন। ১৬১৬ খৃষ্টাব্দের ২৩শে এপ্রিল তারিখ সারভানটিসের মৃত্যু হইল। 'ডনকুইক্‌সট' লিখিয়াই তিনি অমর হইয়া গিয়াছেন। পৃথিবীর এমন কোন ভাষা নাই, যে ভাষায় ডনকুইক্‌সটের অনুবাদ না হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও এই গ্রন্থের কয়েকখানি অনুবাদ হইয়াছে।]

ডনকুইসটের দিগ্বিজয়ী বীর হওয়ার ইচ্ছা

সে বহুকাল আগের কথা। লা মাঞ্চা নামক এক গ্রামে অতি সেকেলে ধরণের এক ভদ্রলোক ছিলেন। লোকটির বয়স প্রায় পঞ্চাশের কাছাকাছি, আর জীর্ণশীর্ণ শরীরের উপর তাঁহার নৌকার মত লম্বা মুখখানি দেখিলে খুবই হাসি পাইত। এই লোকটির খুব ভোরে উঠা অভ্যাস ছিল আর শিকার করিতে তিনি বড়ই ভালবাসিতেন। লোকটির প্রকৃতি ছিল যেমন অদ্ভুত, তেমনিই তাঁহার শিকার করিবার জিনিষপত্র গুলিও কিছু অদ্ভুত ধরণের ছিল। পুরাতনের জন্য তাঁহার এমনই একটা টান ছিল যে, বন্দুক না লইয়া তিনি সেই পুরাকালের লোকদের মত বর্শা ও বল্লম লইয়াই শিকারে যাইতেন। তাঁহার একটা শিকারী কুকুর ছিল, আর এমনি রোগা হাড়-বারকরা একটা ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি শিকারে যাইতেন যে, ঘোড়াটার অবস্থা দেখিয়া সকলেরই বড় দয়া হইত। ঐ লোকটির নাম ছিল কুইক্‌সাডা বা কোয়েসাডা।



ডনকুইক্‌সটের ভেড়া শিকার

সারা বছর ধরিয়া এই ভদ্রলোকটির করিবার মত বিশেষ দরকারী কোনও কাজই থাকিত না। তবে যুদ্ধের এবং বীরত্বের কাহিনী পড়িতে তিনি এতই ভালবাসিতেন যে, সারা বছর কেবল সেই সব বই পড়িয়া তাঁহার সময় কাটিত। ক্রমশঃ তাঁহার বই পড়িবার সখ এমন বাড়িয়া উঠিল যে, তিনি শিকারে যাওয়া পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিলেন এবং বিঘার পর বিঘা জমি বিক্রয় করিয়া শুধু বই কিনিতে লাগিলেন। একবার বই পড়িতে বসিলে তিনি সব কিছু ভুলিয়া যাইতেন এবং যদি কোনও দিন সন্ধ্যার সময়ে পড়িতে বসিতেন ত কোথা দিয়া যে রাত কাবার হইয়া যাইত, তাহা তাঁহার খেয়ালই থাকিত না। আবার সকালে বই লইয়া বসিলে, নাওয়া-খাওয়া ভুলিয়া রাত্রি না হওয়া পর্য্যন্ত কেবল বইই পড়িতেন। এই রকম করিয়া অত্যন্ত বেশি পড়িয়া ও অল্প ঘুমাইয়া তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি লোপ পাইল। ব বই পড়িবার পর হইতে তাঁহার মনে হইত যে, তিনি একজন মস্ত বড় বীর হইয়া উঠিয়াছেন, এবং সেই গ্রামেরই একজন গির্জ্জার যাজক অথবা একটা নাপিতকে মস্ত বড়

বীর ঠাওরাইয়া মাঝে মাঝে তিনি তাহাদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার উপক্রম করিতেন। তাঁহার মন এত কল্পনাপ্রবণ হইয়া উঠিয়াছিল যে, তাঁহার মাথায় কেবল ঝগড়া-বিবাদ, যুদ্ধ বিগ্রহ ও খুন-জখমের চিন্তা কিল্‌বিল্‌ করিত।

তাঁহার বুদ্ধিশুদ্ধি এমনই লোপ পাইয়াছিল যে, একদিন তিনি স্থির করিয়া বসিলেন— বইয়ে-পড়া যোদ্ধাদের মত তিনিও একজন দিগ্বিজয়ী বীর হইবেন। আর যুদ্ধের সাজ পোষাক পরিয়া অস্ত্র-শস্ত্র হাতে করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া তিনি পৃথিবী ভ্রমণে বাহির হইবেন। তাঁহার কাজ হইবে দুষ্টের দমন ও শিষ্টের পালন। ইহাতে তাঁহার অক্ষয় কীর্ত্তি ও যশের কথা সমস্ত পৃথিবীর লোকেরা নিশ্চয়ই চিরকাল মনে রাখিবে!

দিগ্বিজয়ে বাহির হইবার জন্য তিনি এইবার যোগাড় যন্ত্র করিতে আরম্ভ করিয়া দিলেন। অনেক খুঁজিয়া পাতিয়া একটা পুরান সিন্দুকের ভিতর হইতে তাঁহার প্রপিতামহের পরণের একটা যুদ্ধসাজ ত কোন রকমে বাহির করিলেন। তারপর ঘোড়াটির অবস্থা দেখিবার জন্য তিনি গেলেন



ডন্‌কুইক্‌সট্‌

তাঁহার আস্তাবলে। দিগ্বিজয়ী হইবার আশায় তাঁহার মাথা এমনই ঘুরিয়া গিয়াছিল যে সেই হাড়-বারকরা ঘোড়াটিকে দেখিয়া তিনি উহাকে আলেক্‌জাণ্ডারের প্রিয় ঘোড়া বিউসেফেলাসের



একটা সরাইখানার সাম্‌নে গিয়া উপস্থিত হইলেন

চেয়েও সুন্দর ঘোড়া বলিয়া ঠাওরাইয়াছিলেন। এত ভাল ঘোড়ার ত একটা মানান-সই নাম চাই! সেইজন্য ঘণ্টা চারেক অনেক ভাবনা-চিন্তার পর সেই রোগা ঘোড়াটার নামকরণ করিলেন রোজিনাণ্টে। আর, এক সপ্তাহ দিনরাত ভাবিয়া নিজের নামকরণ করিলেন ডন্‌কুইক্‌সট্‌।

দিগ্বিজয়ী বীরের দীক্ষা

দিগ্বিজয়ী বীর হইতে হইলে ত দীক্ষার প্রয়োজন। সুতরাং এইবারে তাঁহার মস্ত ভাবনা উপস্থিত হইল যে, তাঁহাকে দীক্ষা দিবে কে।

তখন গ্রীষ্মকাল। একদিন সকালে তিনি তাঁহার ঘোড়া রোজিনাণ্টের পিঠে চড়িয়া বাড়ির খিড়কীর দরজা দিয়া মাঠের পথে বাহির হইয়া পড়িলেন এবং স্থির করিলেন যে, যত শীঘ্র সম্ভব তাঁহাকে দীক্ষা লইতেই হইবে।

প্রায় সন্ধ্যার সময়ে তিনি একটা সরাইখানার সাম্‌নে গিয়া উপস্থিত হইলেন। সরাইখানাটি দেখিয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌ ঠিক করিয়া লইলেন যে,

উহা নিশ্চয়ই কোন কেল্লা হইবে। সরাইখানার দরজায় দুইজন চাকরাণী বসিয়াছিল, তাহাদের দেখিয়া তিনি মনে করিলেন যে, উহারা নিশ্চয়ই ঐ কেল্লার কোনও সম্ভ্রান্ত সেনাপতির আত্মীয়া হইবেন। ঠিক সেই সময়ে নিকটেই একজন শূকর-পালক শিঙা ফুঁকিয়া তাহার শূকরগুলিকে মাঠ হইতে ফিরাইবার জন্য সঙ্কেত-ধ্বনি করিতেছিল। শিঙার সেই আওয়াজে তিনি কল্পনা করিলেন যে, উহা নিশ্চয়ই তাঁহার আসার খবর ঘোষণা করিতেছে। কারণ তিনি ত আর যে-সে-লোক নহেন! সেইজন্য খুব গর্ব্বের সঙ্গে বুক ফুলাইয়া তিনি দরজার কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন।

কিন্তু ঐ চাকরাণীদের সঙ্গে তিনি এত সম্ভ্রম এবং এমন অতিরঞ্জিত ভাষায় কথা বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যে, তাহাতে উহারা প্রথমটায় একেবারে অবাক হইয়া গিয়াছিল। ডনকুইক্‌সটের সেই-রকম অদ্ভুত যুদ্ধের সাজ পরা চেহারা দেখিয়াও তাহারা কিছু কম আশ্চর্য্য হয় নাই। তাঁহাকে দেখিয়াই তাহারা প্রথমে ছুটিয়া পালাইবার উপক্রম করিতেছিল, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত এমনই কৌতুক বোধ করিল যে, না পালাইয়া সেখানে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া হাসিয়া কুটি কুটি হইতেছিল। তাহাদের হাসির বহর দেখিয়া ডনকুইকসট্ তাহাদের ধমকাইয়া উঠিল। কিন্তু তাহাতে তাহাদের হাসি থামা দূরে থাক বরং হাসির মাত্রা আরও বাড়িয়া গেল। ডনকুইকসটের মত বীর পুরুষ কি আর ঐরূপ অবজ্ঞা ও উপহাসের একটা শোধ লইতে পারিত না! কিন্তু তাহাদের ভাগ্য ভাল যে, সরাইখানার মালিক হঠাৎ সেখানে আসিয়া পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য চাকরাণীরা সে যাত্রা রক্ষা পাইয়া গেল। সরাইখানার মালিকটি মধ্যস্থ হইয়া শান্তি ঘোষণা করিলেন এবং খুব সমাদরে ডনকুইক্‌সট্‌কে সরাইখানায় আশ্রয় লইবার জন্য নিমন্ত্রণ করিলেন।

মাথা-পাগ্‌লা ডনকুইক্‌সট্ সরাইখানার সেই মালিকটিকে কেল্লার প্রধান সেনা-পতি মনে করিয়া তাঁহাকে "স্যার্ ক্যাস্‌টালান্" বলিয়া সম্বোধন করিয়া বসিলেন। সরাইখানার মালিক তাঁহার এই রকম অদ্ভুত নামকরণে যেমন অবাক হইয়াছিলেন তেমনি কৌতুক বোধও করিয়াছিলেন।

সরাইখানায় সকলে যখন খাইবার জন্য টেবিলের চারিপাশে চেয়ার টানিয়া লইয়া বসিলেন তখন ডনকুইকসট্‌ও একখানা চেয়ারে বসিলেন। তারপর যুদ্ধ-কৌশল সম্বন্ধে অনেক কথা আবোল-তাবোল অনর্গল বকিয়া যাইতে লাগিলেন। কারণ তিনি ভাবিয়াছিলেন যে, কেল্লার ভিতরে কেল্লার লোকদের কাছে ছাড়া যুদ্ধ ও বীরত্বের কথার আলোচনা আর কোথাই বা হইতে পারে! তাঁহার কথাবার্ত্তায় সকলে হতবুদ্ধি ও নির্ব্বাক হইয়া মুখ চাওয়া-চাওয়ি করিতে লাগিল। তারপর হঠাৎ একবার কথা বলিবার উচ্ছ্বাস থামাইয়া ডনকুইকসট্ সরাইখানার মালিকটিকে চুপি চুপি বলিলেন, "আড়ালে আসিয়া আপনি আমার একটা কথা শুনিলে আমি বড় উপকৃত হইব।" সরাইখানার মালিক ব্যক্তি হইয়া তাঁহার পিছনে পিছনে বাহিরে গেলেন। ঘর হইতে বাহির হইয়া ডনকুইক্‌সট্ সোজা গিয়া হাজির হইলেন ঘোড়ার আস্তাবলে। কারণ অমন নিৰ্জ্জন জায়গা কি আর কোথাও আছে! সেইখানেই ত তিনি তাঁহার সকল কথা প্রাণ খুলিয়া বলিতে পারিবেন।

আস্তাবলে গিয়া ডনকুইক্‌সট্ সরাইখানার মালিকের সামনে হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িলেন এবং অতি বিনীতভাবে মিনতি করিলেন—"আমি দিগ্বিজয়ী বীর হইতে চাই। সেজন্য আমার দীক্ষা দরকার। আপনি হইতেছেন এই কেল্লার একজন সম্ভ্রান্ত সেনাপতি। সুতরাং আপনি আমাকে দীক্ষা দিন। আমি আপনাকে দেখিবামাত্র গুরু বলিয়া বরণ করিয়াছি।" সরাইখানার মালিকটি পূর্ব্বেই বুঝিয়াছিলেন যে, ঐ লোকটির মাথা খারাপ। সুতরাং আর বাক্যব্যয় না করিয়া তিনি ডনকুইক্‌সট্‌কে শিষ্য বলিয়া স্বীকার করিলেন এবং উপদেশ দিয়া দিলেন যে, ডনকুইক্‌সট্ যেন মাঝে মাঝে গুরুদক্ষিণা পাঠাইয়া দিয়া তাঁহার শিষ্যত্ব বজায় রাখেন। বীর হিসাবে দীক্ষা লইতে হইলে যে টাকা কড়ির দরকার হয় তাহা ডনকুইক্‌সটের জানা ছিল না। অন্ততঃ যুদ্ধ বিষয়ক কোনও বইয়ে তিনি ঐরূপ কোন কথা পড়েন নাই। সেইজন্য তিনি রিক্ত হস্তে বাড়ি হইতে বাহির হইয়াছিলেন। সরাইখানার মালিক ডনকুইক্‌সট্‌কে সাবধান করিয়া দিলেন যে, তিনি যেন আর কখনও টাকা-কড়ি সঙ্গে না লইয়া বাহির না হন।

সেই রাত্রে ডনকুইক্‌সট্ চাঁদের আলোয় তাঁহার

F. 5.

অস্ত্রশস্ত্র পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন এবং তারপরে তাঁহার বল্লমটা ঘোড়ার আস্তাবলের দরজার গায়ে ঠেস দিয়া রাখিয়া ঢাল এবং তলোয়ার হাতে লইয়া তাঁহার সেই কল্পিত কেল্লার সামনে পায়চারি করিয়া পাহারা দিতে লাগিলেন। ঐরূপ পাহারা দিবার কাজে তিনি নিজেই নিজেকে বহাল করিয়াছিলেন। সরাইখানার মালিক বা অন্য কেহ তাঁহাকে কোনও অনুরোধ করেন নাই। সরাই-খানার উপর হইতে তালপাতার সেপাইয়ের কাণ্ড কারখানা দেখিয়া সকলে বেশ একটু হাসিয়া লইতে লাগিলেন। ইতিমধ্যে ঘোড়ার আস্তাবল ধুইবার জন্য একজন ভিস্তি আস্তাবলের সামনে আসিয়া দেখিল যে, দরজার গায়ে ডনকুইক্‌সটের বল্লমটা দাঁড় করান রহিয়াছে। দরজা খুলিবার জন্য সে যেমন বল্লমটা ছুঁইয়াছে, অমনি ডনকুইকসট্ হুঙ্কার করিয়া তাহাকে বল্লমটা ছুঁইতে বারণ করিলেন। ভিস্তিটা তাঁহার কথায় কান দিল না এবং টান মারিয়া বল্লমটা একপাশে ফেলিয়া দিয়া দরজা খুলিতে লাগিল। ইহাতে ডনকুইক্‌সট্ মহাশয় ত রাগিয়া একেবারে আগুন। তিনি দৌড়াইয়া বল্লমটা কুড়াইয়া লইলেন এবং বল্লমের বাঁটের দিকটা দিয়া ভিস্তির মাথায় এমন এক ঘা কষাইয়া দিলেন যে, ভিস্তিটা উঠি পড়ি করিয়া দৌড়াইয়া তবে বাঁচিল, পরে আবার একটা ভিস্তি আসিয়াছিল, তাহারও ঐ একই দশা হইয়াছিল। ওদিকে ভিস্তিদের বস্তিতে ঐ ব্যাপার লইয়া ভীষণ সোরগোল পড়িয়া গেল। তাহারা দল বাঁধিয়া শোধ লইবার জন্য সরাইখানার দিকে আসিয়া উপস্থিত হইল, তারপর ক্ষেপা মৌমাছির ঝাঁক যেমন করিয়া লোকের উপর আসিয়া পড়ে, ঠিক তেমনি ভাবে ডন্‌কুইক্‌সটের উপর রাশি রাশি ইট আসিয়া পড়িতে লাগিল। সরাইখানার মালিক না থাকিলে ডন্‌কুইক্‌সট্ সে যাত্রা বাঁচিয়া ফিরিতেন কি না সন্দেহ। তিনি মধ্যস্থ হইয়া ঐ ঝগড়া মিটাইয়া দিলেন এবং সরাইখানার সামনে যাহাতে আর কোনও দাঙ্গা-হাঙ্গামা না হয় সেজন্য অনেক বুঝাইয়া-সুঝাইয়া ডনকুইকসট্‌কে সেখান হইতে বিদায় করিয়া তবে নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিলেন।

মনের সুখে শিস দিতে দিতে ডনকুইক্‌সট ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া এবারে রাস্তা চলিতেছিলেন। এমন সময় তিনি দেখিলেন যে, রাস্তার ধারে একজন চাষা একটা ছেলেকে খুব করিয়া পিটাইতেছে। উহা দেখিয়া তিনি তাহাকে মার থামাইতে বলিলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, কেন সে ছেলেটিকে মারিতেছিল। চাষাটা তাঁহার সাজ পোষাক, বল্লম ও ঢাল তলোয়ার ইত্যাদি দেখিয়া একটু ভয় পাইয়াছিল। সেইজন্য মার থামাইয়া বলিল যে, ছেলেটা রোজই ক্ষেতের কাজকর্ম্ম বড় ফাঁকি দেয়, তাই উহাকে শাস্তি দেওয়া হইতেছে। চাষার কথায় বাধা দিয়া ছেলেটা বলিয়া উঠিল, "ঐ চাষাটার কাছে আমার অনেক টাকা মাহিনা পাওনা আছে। যখনই আমি আমার পাওনা মাহিনা চাহি, তখনই আমার ভাগ্যে মার-ধোর জোটে।" ছেলেটির কথা শুনিয়া গুরু-গম্ভীর গলায় ডনকুইক্‌সট্ চাষাকে হুকুম করিলেন, সে যেন অবিলম্বে ছেলেটির মাহিনা দিয়া দেয়। ডনকুইক্‌সটের হুকুম শুনিয়া চাষাটা প্রতিজ্ঞা করিল, সে বাড়ী পৌঁছিয়াই ছেলেটার মাহিনা দিয়া দিবে। ছেলেটা কিন্তু বলিয়া উঠিল "মহাশয়, ও লোকটাকে মোটেই বিশ্বাস করিবেন না। বাড়ী পৌঁছিবার আগেই ও উহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যাইবে।" তখন ডনকুইক্‌সট চাষাটাকে শাসাইয়া বলিতে লাগিল, "দেখ আমি হইতেছি লামাঞ্চা গ্রামের নামকরা বীর ডনকুইক্‌সট্। সুতরাং আমার কাছে তুমি যে প্রতিজ্ঞা করিলে, তাহা মনে রাখিও, তাহা না হইলে মজাটা টের পাইবে। আমার কাছে কাহারও চালাকি খাটে না।" এই কথা কয়টি বলিয়া ডনকুইকসট্ ভাবিলেন যে, চাষাটার সাধ্য কি—তাঁহার মত একজন শক্তি-শালী লোকের আদেশ অমান্য করিয়া সে তাহার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া যাইবে। কিন্তু ডনকুইক্‌সট্ যেমনি ঘোড়া হাঁকাইয়া তাঁহার পিছন ফিরাইলেন, চাষা আবার ছেলেটিকে প্রহার করিতে আরম্ভ করিল।

এইবার রাস্তা চলিতে চলিতে ডনকুইক্‌সট্ দেখিলেন যে, একদল বণিক সেই রাস্তা দিয়া যাইতেছে। উহাদের দেখিয়া তাঁহার বীরত্ব জাগিয়া উঠিল। গম্ভীর গলায় তিনি তাহাদের দাঁড়াইবার জন্য হুকুম করিয়া বলিলেন, "তোমরা ডনকুইক্‌সট্‌কে দিগ্বিজয়ী বীর বলিয়া স্বীকার কর কি না?" ইহাতে বণিকেরা হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিয়া ডনকুইক্‌সটের কথার পুনরুক্তি

করিয়া তাঁহাকে ভেংচাইয়া উঠিল। ডন্‌কুইক্‌সটের মত বীর কি আর এতখানি অপমান সহ্য করিয়া শান্ত থাকিতে পারেন! এইজন্য উহাদের বেয়াদবির শাস্তি দেওয়ার জন্য তিনি তাহাদের দিকে ঘোড়া হাকাইলেন। কিন্তু যে ঘোড়া! সেটা খুব আস্তে আস্তে চলিতেছিল। সেইজন্য উহার পিঠে চড়-চাপড় পড়িতে লাগিল। কিন্তু ঘোড়াটার দৌড়ানো চুলোয় যাক, সেটা দৌড়াইবার চেষ্টা করিতে গিয়া এমন এক হোঁচট খাইল—ডন্‌কুইক্‌সট্‌ একেবারে কুপোকাৎ হইয়া ধপাস্ করিয়া মাটিতে পড়িলেন। ঘোড়ার উপর হইতে পড়িয়া তিনি উত্থান শক্তি রহিত হইয়া মাটিতেই শুইয়া রহিলেন। ইতিমধ্যে ঐ বণিকদের একজন চাকর আসিয়া ডন্‌কুইক্‌সটের হাত হইতে তাঁহার বল্লমটা কাড়িয়া লইয়া তাঁহার পাঁজরার উপর এমন এক ঘা কসাইয়া দিল যে, বল্লমের বাঁটটা মট্‌ করিয়া দুই টুকরা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল।

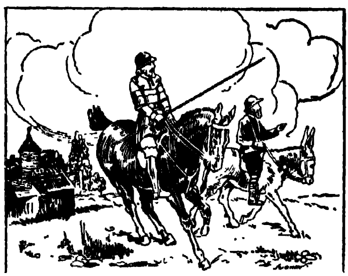
গা-হাত-পায়ের বেদনায় ডন্‌কুইক্‌সট্‌ ত সেখানেই পড়িয়া পড়িয়া গোঙাইতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে একজন গ্রাম্য লোক গাধার পিঠে ঘাসের বোঝা চাপাইয়া সেই পথ দিয়া যাইতেছিল। সে ডন্‌কুইক্‌সটের অবস্থা দেখিয়া দয়া করিয়া তাঁহাকে তুলিয়া সেই গাধার পিঠে চড়াইয়া তবে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়াছিল।

যে নাপিত ও গির্জ্জার যাজকের সহিত ডন্‌কুইক্‌সট্‌ "যুদ্ধং দেহি" বলিয়া যুদ্ধ করিতে চাহিয়াছিলেন, এইবার তাহারা ত তাঁহার হাড়গোড় ভাঙ্গা দ-এর মত চেহারা দেখিয়া খুব একচোট ঠাট্টা করিয়া লইল।

কিছুদিনের ভিতরেই ডন্‌কুইক্‌সট্‌ বেশ সুস্থ হইয়া উঠিলেন। কিন্তু আবার তাঁহার মাথায় ভূত চাপিল যে, দিগ্বিজয়ে বাহির হওয়া তাঁহার নিতান্ত প্রয়োজন। আর দেরী করা তাঁহার উচিত নহে। ডন্‌কুইক্‌সটের পরিবারের সকলে তাঁহাকে বারণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু তিনি মনে মনে ফন্দি আঁটিয়া রাখিলেন যে, শীঘ্রই তাঁহাকে আবার বাহির হইতে হইবে। এবারে কিন্তু সেই গ্রামের স্যাঙ্কো পাঞ্জা নামে একজন অতি সরল মজুরকে তিনি সঙ্গী করিয়া লইয়া যাইবেন বলিয়া স্থির করিলেন। স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে তিনি এই বলিয়া লোভ দেখাইলেন—যে-সাম্রাজ্য বা যে-দেশ তিনি সর্ব্ব প্রথমে জয় করিবেন, সেটি তিনি স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে উপহার দিবেন। ডন্‌কুইক্‌সট্‌ না-কি অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহের বইয়ে এইরূপ উপহারের কাহিনী পড়িয়াছিলেন। সেইজন্য এবারে এইরকম একটা উপহার দিবার কল্পনা করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় বারের জয়যাত্রা

একদিন গভীর রাত্রে কাহাকেও না জানাইয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌ তাঁহার বাড়ী হইতে বাহির হইয়া পড়িলেন। স্যাঙ্কো পাঞ্জাও সেই রাত্রে তাহার স্ত্রী বা ছেলেমেয়েদের না জানাইয়া পালাইয়া ডন্‌কুইক্‌সটের সঙ্গী হইল। ডন্‌কুইক্‌সট্‌ তাঁহার বিখ্যাত রোজিনান্টের পিঠে চড়িয়া আর স্যাঙ্কো তাহার গাধা ড্যাপ্‌লের পিঠে

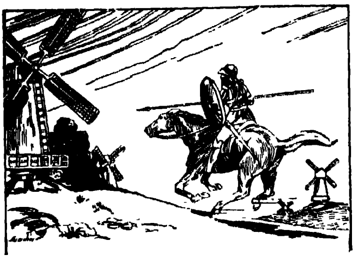


ডন্‌কুইক্‌সট্‌ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জার পলায়ন

চড়িয়া, অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া, দেশ ছাড়িয়া পালাইতে লাগিল। তাঁহারা দুইজনে উচ্ছ্বসিত হইয়া নানান্ কথা আলাপ করিয়া আকাশ-কুসুম রচনা করিতে করিতে পথ চলিতেছিলেন।

পথ চলিতে চলিতে ভোর হইয়া গেল এবং সূর্য্যের আলোতে পূব দিকের আকাশ নানান্ রঙে রঙীন হইয়া উঠিল। সকালবেলাকার আলোতে তাঁহারা দেখিলেন যে, মাঠের মধ্যে এক জায়গায় কয়েকটা উইণ্ড্‌ মিল্ (বায়ুচালিত কল) রহিয়াছে। প্রত্যেকটা উইণ্ড্‌মিলের চাকা বাতাসের ঠেলায় বন্ বন্ করিয়া ঘুরিতেছে। ডন্‌কুইক্‌সট্‌ সেগুলিকে দেখিয়া দৈত্য ও দানব বলিয়া স্থির করিয়া লইলেন এবং বল্লম বাগাইয়া উহাদের সহিত

যুদ্ধের জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। তাঁহার পাগলামি দেখিয়া স্যাঙ্কো তাঁহাকে থামাইবার জন্য অনেক চেষ্টা করিল—স্যাঙ্কো পাঞ্জা অনেক করিয়া তাঁহাকে বুঝাইল যে, সেগুলি দৈত্য বা দানব নহে, সেগুলি উইণ্ড্ মিল্। কিন্তু কে কার কথা শোনে। ডন্‌কুইক্‌সট্ তাঁহার সেই কল্পিত দৈত্য দানবদের জয় করিবেনই। ঘোড়ার পিঠে চড-চাপড় মারিয়া তিনি তাঁহার ঘোড়াটাকে সেই সব উইণ্ড্ মিলের কাছে ছুটাইয়া লইয়া গেলেন। তারপর



ডন্‌কুইক্‌সট্ উইণ্ড্ মিলের সহিত যুদ্ধ করিতে উদ্যত হইলেন

ফস্ করিয়া তিনি তাঁহার বল্লমটা একটা উইণ্ড্ মিলের চাকার মধ্যে ঢুকাইয়া দিলেন। আর যায় কোথায়! বাধিয়া-যাওয়া বল্লমটা ঘূর্ণীর সঙ্গে সঙ্গে এমনি জোরে শোঁ শোঁ করিয়া ঘুরিয়া গেল যে, সেখানকার বাতাস হঠাৎ একেবারে তোলপাড় করিয়া উঠিল। সেই দমকা বাতাসের ঠেলায় ডন্‌কুইক্‌সট্ ঘোড়াশুদ্ধ বিশহাত দূরে গিয়া ছিট্‌কাইয়া পড়িলেন। আর তাঁহার প্রিয় বল্লমটা মড়্‌মড়্ শব্দ করিয়া শতটুক্‌রা হইয়া ভাঙ্গিয়া গেল। স্যাঙ্কো পাঞ্জা দূরে ছিল। সে ত এ কাণ্ড দেখিয়া দৌড়াইয়া তাহার প্রভুর কাছে গিয়া উপস্থিত হইল। স্যাঙ্কোকে দেখিয়া গা-হাত-পা ঝাড়িয়া ডন্‌কুইক্‌সট্ বলিয়া উঠিলেন, "আমি যাহাতে জয়ী হইতে না পারি, সেই মৎলবে নিশ্চয়ই কোনও যাদুকর কৌশল করিয়া কতকগুলো দৈত্য ও দানবকে উইণ্ড্ মিল্ বানাইয়া রাখিয়াছে। উইণ্ড্ মিলের ছদ্মবেশ না ধরিয়া যদি উহারা সত্যকার দৈত্য ও দানব হইত, তাহা হইলে কি আর উহাদের রক্ষা থাকিত।"

তারপর আবার তাঁহারা পথ চলিতে আরম্ভ করিলেন এবং শীঘ্রই আবার তাঁহাদের সাহসের পরিচয় দিবার জন্য আর একটা সুবর্ণ সুযোগ আসিয়াছিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহারা দেখিলেন, রাস্তা দিয়া একখানা গাড়ী যাইতেছে। সেই গাড়ীর মধ্যে একটি স্ত্রীলোক বসিয়া আছে। আর সেই গাড়ীখানার আগে আগে দুইজন সন্ন্যাসী ঘোড়ায় চড়িয়া যাইতেছে এবং গাড়ীর পাশে ও আরও চারপাঁচজন লোক ঘোড়ার পিঠে চলিতেছে। ঐ লোকগুলি মেয়েটিকে তাহার স্বামীর কাছে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য লইয়া যাইতেছিল। ডন্‌কুইকসট্ ঘোড়া হাঁকাইয়া তাহাদের কাছে গিয়া উপস্থিত হইলেন এবং সেই সন্ন্যাসী দুটোকে বলিয়া উঠিলেন, "তবে রে ডাকাত ব্যাটারা! আমি থাকতে তোরা ঐ সুন্দরী রাজকুমারীটিকে বন্দী করিয়া লইয়া যাইবি? শীঘ্র রাজকুমারীকে মুক্তি দে।" সন্ন্যাসী দুটো ত ডন্‌কুইক্‌সটের হাতে ঢাল-তলোয়ার আর তাঁহার যুদ্ধসজ্জা দেখিয়া এমনি ভড়কাইয়া গেল যে, প্রাণের ভয়ে তাহারা উদ্ধশ্বাসে দৌড় দিল। ডন্‌কুইক্‌সট্ বুক ফুলাইয়া ঢাল-তলোয়ার বাগাইয়া তাহাদের পিছু পিছু কিছুদূর খুব তাড়া করিয়া গেলেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, তিনি তাহাদের ছুঁইতে পর্যন্ত পারিলেন না। ধরিতে পারিলে ডন্‌কুইক্‌সটের মত বীরের হাতে সন্ন্যাসীদুটোর যে কি শাস্তি মিলিত কে জানে!

ওদিকে ডন্‌কুইক্‌সটের অবর্তমানে স্যাঙ্কো পাঞ্জার যে দুর্দশা হইয়াছিল, তাহা আর বলিবার নয়। যে চার পাঁচজন চাকর ঐ গাড়ীখানার সঙ্গে ছিল, তাহারা বাঘের মত লাফাইয়া গিয়া স্যাঙ্কোর টুঁটি চাপিয়া গাধার পিঠ হইতে তাহাকে প্রথমে নামাইয়াছিল। তারপর খুব উত্তম-মধ্যম ঘা কয়েক মার দিয়া উহারা সেখান হইতে চলিয়া গিয়াছিল। মারের চোটে স্যাঙ্কো অসাড় মড়ার মত উত্থান-শক্তি রহিত হইয়া হাত-পা ছড়াইয়া মাটির উপর পড়িয়াছিল। ফিরিয়া আসিয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জার ঐ অবস্থা দেখিয়া ডন্‌কুইক্‌সটের ত চক্ষুস্থির! স্যাঙ্কোকে সান্ত্বনা দিয়া তিনি বলিলেন, "যাহারা তোমার এ দশা করিয়াছে, তাহাদের যদি আমি একবার হাতের মাথায় পাইতাম ত একেবারে খুন না করিয়া আমি জলগ্রহণ করিতাম না।" খানিক পরেই অবশ্য স্যাঙ্কো পাঞ্জা সুস্থ হইয়া

উঠিল। সে ভাবিল, "প্রভু ত এব্বারকার জয়ী হইলেন। যুদ্ধজয়ের ফলে কোনও পাওয়া ত দূরের কথা, মার খাইয়া আমি কি নাকালটাই না হইলাম।" দুইজনে সেই রাত্রিটা এক গভীর অরণ্যের মধ্যে কাটাইয়া দিলেন।



দুইজনে রাত্রিটা অরণ্যের মধ্যে কাটাইলেন

ইহার পরেই ডন্‌কুইক্‌সট্‌ একদল ঝাঁকা মুটের সহিত বীরত্ব দেখাইয়া লড়াই করিতে গিয়াছিলেন। সেবারে তিনি ভয়ানক আহত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিলেন। কোনও রকমে প্রাণে বাঁচিয়া ফিরিয়া আসিয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে একটা অজুহাত দিয়া বুঝাইয়া বলিলেন, "অতি সাধারণ লোকদের সঙ্গে যুদ্ধ করিয়াছিলাম বলিয়া এবারে আমি হারিয়াছি। উহারা যুদ্ধ-কৌশল জানেই বা কি? উহাদের মত আন্দাজে পিটাইলেই কি আর যুদ্ধ হয়।" এই কথা বলিয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌ স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে উপদেশ দিয়া দিলেন, সে যেন ভবিষ্যতে কখনও অতি সাধারণ লোকেদের সহিত লড়াই না করে। স্যাঙ্কো পাঞ্জা অতি নিরীহ প্রকৃতির লোক ছিল। কেহ তাহার অনিষ্ট বা অপমান করিলে ডন্‌কুইক্‌সটের মত তাহার রক্ত গরম হইয়া উঠিত না। তাহার উপর মারামারি করাটাকে সে বড় অপছন্দ করিত—কারণ বড় ভয় পাইত। সেইজন্য লড়াই করা সম্বন্ধে ডন্‌কুইক্‌সটের কোনও উপদেশ তাহার কানে গেল না।

সেবারে মুটেদের কাছে পিটুনি খাইয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌ এমনই আহত হইয়াছিলেন যে, নিজের ঘোড়াটার পিঠে উঠিবার শক্তিটুকু পর্যন্ত তাঁহার ছিল না। কাজেই স্যাঙ্কো পাঞ্জা কোনরকমে ঠেলিয়া ঠেলিয়া তাহার গাধার উপর তাঁহাকে উঠাইয়া দিল এবং নিজে প্রভুর ঘোড়ার পিঠে চড়িয়া আবার রওনা হইল। গাধার উপর ডন্‌কুইক্‌সট্‌ একরকম শুইয়া শুইয়াই যাইতে লাগিলেন, আর যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া গোঙাইতে লাগিলেন।

কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া তাঁহারা দূর হইতে একটা সরাইখানা দেখিতে পাইলেন। সরাইখানা দেখিয়াই ডন্‌কুইক্‌সট বলিয়া উঠিলেন, "বাঃ! চমৎকার একটা কেল্লা দেখা যাইতেছে ত! চল, আমরা ওখানে গিয়া অতিথি হই। ওখানে নিশ্চয় আমাদের ন্যায্য আদর যত্ন মিলিবে।" স্যাঙ্কো পাঞ্জা অনেক করিয়া দেখিয়া শুনিয়া কোথাও কোন কেল্লার চিহ্নটি পর্যন্ত দেখিতে পাইল না। পরে বুঝিল যে, যেটাকে তাহার প্রভু কেল্লা বলিয়া মনে করিতেছেন, সেটা একটা সরাইখানা। সেইজন্য সে তাহার প্রভুকে বলিল যে, তিনি একটা সরাইখানাকে কেল্লা বলিয়া ভুল করিতেছেন। কিন্তু স্যাঙ্কো পাঞ্জার কথায় ডন্‌কুইক্‌সট্‌ বিশ্বাস করিলেন না। তাঁহারা তর্ক করিতে করিতে একেবারে সরাইখানার দরজার সামনে গিয়া উপস্থিত হইলেন। ডন্‌কুইক্‌সটের অদ্ভুত চেহারা আর সাজ-পোষাক দেখিয়া একটা কুকুর ঘেউঘেউ করিয়া সরাইখানার ভিতর হইতে তাড়া করিয়া আসিল। সরাইখানার মালিক অনেক কষ্টে কুকুরটাকে ফিরাইয়া তবে বীর ডন্‌কুইক্‌সট্‌কে রক্ষা করিলেন। নহিলে সেবার হয়ত তিনি কুকুরের কামড় খাইয়াই মরিতেন।

ডন্‌কুইক্‌সট্‌ ঠিক করিলেন, সে রাত্রে তাঁহারা সেই সরাইখানাতেই থাকিবেন। সরাইখানার মালিক দিগ্বিজয়ী বীরটিকে, স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে আর একজন মুটেকে একখানা ঘরে থাকিতে দিলেন। রাত্রিতে সরাইখানার একজন চাকরাণী কি একটা কাজে সেই ঘরে ঢুকিয়াছিল। ডন্‌কুইক্‌সট্‌ ত উহাকে দেখিয়াই রাজকন্যা মনে করিলেন। তারপর উঠিয়া গিয়া তাহার হাত ধরিয়া উচ্ছ্বসিত হইয়া এমন আবোল-তাবোল বকিয়া চলিলেন যে, তাহাতে অতিষ্ঠ হইয়া সেই মুটেটা তাঁহাকে থামিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছিল। কিন্তু অনুরোধে যখন কোনও ফল হইল না, তখন ভীষণ মারামারি ও ধস্তাধ্বস্তি আরম্ভ হইয়া গেল। কি তুমুল লড়াই! ঘরের সব জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড হইয়া উল্টাইয়া পাল্টাইয়া পড়িতে লাগিল। তবু

তাহাদের যুদ্ধ আর থামে না। শেষকালে সরাইখানার অন্যান্য লোকজন আসিয়া বহু কষ্টে তাঁহাদের যুদ্ধ থামাইয়া দেখিল যে, মারের চোটে ডন্‌কুইক্‌সট্‌ আর স্যাঙ্কো পাঞ্জা দুজনেই প্রায় আধমরা হইয়া গিয়াছেন। আর কিছুক্ষণ লড়াই চলিলে তাঁহারা বাঁচিতেন কিনা সন্দেহ।

যাহা হউক, ডন্‌কুইক্‌সট্‌ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জা সে রাত্রে খুব ঘুমাইলেন এবং পরদিন সকালে ঘুম হইতে উঠিয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌ বুঝিলেন যে, সেটা সত্য সত্যই সরাইখানা—কেল্লা নয়। সেইজন্য আর এক মুহূর্ত্তও দেরী না করিয়া, পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া তাঁহারা রওনা হওয়ার জন্য প্রস্তুত হইলেন। সরাইখানার মালিক আসিয়া তাঁহাদের কাছ হইতে ঘরভাড়া চাহিলেন। তাহাতে ডন্‌কুইক্‌সট্‌ উত্তর দিলেন, "আমাদের মত সম্ভ্রান্ত সৈনিকেরা যে আপনার সরাইখানার মত একটা অতি সাধারণ আর হেয় জায়গায় বাস করিয়াছে, তাহাতে আপনি ধন্য হইয়াছেন এবং আপনার সরাইখানারও মান মর্য্যাদা বাড়িয়াছে। আবার টাকাকড়ি চাহেন কোন্ সাহসে?" এই কথা কয়টি বলিয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌ টপ্ করিয়া ঘোড়ায় চড়িয়া ঘোড়া হাঁকাইয়া চলিয়া গেলেন। স্যাঙ্কো পাঞ্জা কিন্তু তত সহজে রেহাই পায় নাই। একজনকে হঠাৎ ঐরকম ঘোড়ায় চড়িয়া পালাইতে দেখিয়া সরাইখানার মালিক খপ্ করিয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে ধরিয়া ফেলিলেন। তারপরে চারিজনে মিলিয়া একখানা কম্বলের চারকোণ টানটান করিয়া ধরিয়া তাহার উপরে স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে ফেলিয়া তাহাকে উপরে ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া এমনই নাচাইতে লাগিলেন যে, স্যাঙ্কো পাঞ্জার প্রাণ প্রায় ওষ্ঠাগত হইয়া আসিল। এইরূপে স্যাঙ্কোকে খুব খানিকটা অস্থির করিয়া তুলিয়া তাহার পরে তাঁহারা তাহাকে ছাড়িয়া দিলেন।

দূরে একটা দেয়ালের আড়াল হইতে ডন্‌কুইক্‌সট্‌ স্যাঙ্কোর ঐ শাস্তি দেখিয়াছিলেন। কিন্তু তাহাকে উদ্ধার করিয়া আনিবার মত ভরসা তাঁহার হয় নাই। সরাইখানা হইতে ছাড়া পাইয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জা যখন আবার ডন্‌কুইক্‌সটের পাশে গিয়া জুটিল, তখন তিনি এই বলিয়া তাহাকে সান্ত্বনা দিলেন—"নিশ্চয়ই কোনও যাদুকরের মায়ায় আমাদের এই রকম লাঞ্ছনা হইতেছে। তুমি ভয় পাইও না। শীঘ্রই আমি একটা দেশ জয় করিয়া তোমাকে সেখানকার রাজা করিয়া দিব।"

ডন্‌কুইক্‌সটের এমনই সৌভাগ্য যে, বীরত্ব প্রকাশ করিবার সুযোগ একটার পর একটা তাঁহার ঘটিতেই। সরাইখানা হইতে বাহির হইয়াই তিনি আবার এমন একটা সাহসের কাজে ঝাঁপ দিয়াছিলেন যে, তাহা শুনিলে গায়ে কাঁটা দিয়া উঠে। যাইতে যাইতে তাঁহারা দেখিলেন, অনেক দূরে ভীষণ ধূলা উড়িতেছে। রাশি রাশি ধূলা উড়া দেখিয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌ তখনই স্থির করিয়াছিলেন যে, সেখানে নিশ্চয়ই দুই দলে একটা ভয়ানক রকমের লড়াই চলিতেছে। সাহসে বুক বাঁধিয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌ সেইদিকে ঘোড়া ছুটাইয়া অগ্রসর হইতে লাগিলেন। পিছনে পিছনে স্যাঙ্কো পাঞ্জা তাঁহার অনুসরণ করিল। যেখান হইতে ধূলা উড়িতেছিল, সেখানে পৌঁছাইয়া তিনি দেখিলেন যে, সেখানে একপাল ভেড়া চরিতেছে। উহাদেরই পায়ের ঘষা লাগিয়া ঐরকম ধূলার মেঘের সৃষ্টি হইয়াছিল। কিন্তু দিগ্বিজয়ী যোদ্ধা ডন্‌কুইক্‌সটের রক্ত গরম হইয়া উঠিয়াছিল। কাজে কাজেই তিনি ভেড়াগুলোকে চিনিয়াও চিনিলেন না। খোঁচা মারিয়া মারিয়া তিনি অসংখ্য ভেড়া মারিয়া ফেলিতে লাগিলেন, আর ভাবিতে লাগিলেন যে, খুব চমৎকার যুদ্ধ হইতেছে ত। ব্যাপার দেখিয়া মেষপালকের ত একেবারে চক্ষুস্থির! তাঁহার সেই নৃশংস হত্যাকাণ্ড কখন থামিত কে জানে! কিন্তু মেষপালকটা দূর হইতে তাড়া করিয়া আসিতে লাগিল, আর অনবরত ইট ছুঁড়িয়া ছুঁড়িয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌কে এমনই অস্থির করিয়া তুলিল যে, তিনি কাবু হইয়া ধপাস্ করিয়া ঘোড়ার পিঠ হইতে মাটিতে পড়িয়া গেলেন। স্যাঙ্কো পাঞ্জা অনেকখানি পিছনে পড়িয়াছিল। প্রভু পড়িয়া যাওয়াতে সে দৌড়াইয়া আসিয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌কে মাটি হইতে তুলিয়া ধরিল এবং তাঁহার অবস্থা দেখিয়া কাঁদ কাঁদ হইয়া বলিল—"প্রভু, ইটের ঘায়ে আর ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া আপনার কশের সব কয়টি দাঁতই যে ভাঙ্গিয়া পড়িয়া গিয়াছে!— তারপর খানিক পরে ডন্‌কুইক্‌সট্‌ নিজেকে

সাম্লাইয়া লইলেন এবং কিছুমাত্র না দমিয়া আবার দিগ্বিজয়ে যাত্রা করিলেন।

খানিকদূর গিয়া ডন্কুইক্সট্ দেখিলেন একটা নাপিত বেশ বড় একটা পিতলের হাঁড়ি কিনিয়া উহা মাথায় করিয়া লইয়া যাইতেছে। উহা দেখিয়া তিনি কল্পনা করিয়া লইলেন—"ঐ ত ও লোকটা রাজার মাথার একটা মুকুট লইয়া যাইতেছে।" -ইহা ভাবিয়াই তিনি তলোয়ার হাতে নাপিতটার উপর গিয়া ঝাঁপাইয়া পড়িলেন। প্রাণের ভয়ে নাপিত ত তাহার হাঁড়ি ফেলিয়া দৌড় দিল। তখন ডন্কুইক্সট্ সেই হাঁড়িটাকে মুকুট মনে করিয়া তুলিয়া লইলেন এবং নিজের মাথার টুপিটা ফেলিয়া দিয়া হাঁড়িটা উল্টাইয়া নিজের মাথায় পড়িয়া ঘোড়ায় চড়িয়া রওনা হইলেন।

তারপর আবার পথে যাইতে যাইতে ডন্কুইক্সট্ দেখিলেন যে, কয়েকজন রাজকর্মচারী একদল ক্রীতদাসের হাত-পা বাঁধিয়া বন্দী করিয়া লইয়া যাইতেছে। উহা দেখিয়া তিনি ঠিক করিলেন যে, উহাদের দুঃখ-কষ্ট দূর করিতে হইবে। 'হৈ হৈ' রব করিয়া তিনি তাহাদের পিছনে পিছনে তাড়া করিলেন। রাজকর্মচারীরা পিছন ফিরিয়া ডন্কুইক্সটের হাতে ঢাল-তলোয়ার দেখিয়া ভাবিল, হয়ত বা কোনও ডাকাতের দল তাহাদের তাড়া করিয়া আসিতেছে। ঐ ভয়ে তাহারা ক্রীতদাসদের ফেলিয়াই সেখানে হইতে পালাইয়া গেল। তখন ডন্কুইক্সট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জা গিয়া ক্রীতদাসদের মুক্ত করিয়া দিল। তারপর কি যেন একটা কথা লইয়া সেই ক্রীতদাসদের সঙ্গে ডন্কুইক্সটের এমন বচসা লাগিয়া গিয়াছিল যে, তাহারা শেষকালে ক্ষেপিয়া গিয়া ডন্কুইক্সট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জা দুইজনকে বেশ ধা-কতক মার দিয়া সেখান হইতে সরিয়া পড়িয়াছিল।

এইবার ডন্কুইক্সট বড় হতাশ হইয়া পড়িয়া ভাবিলেন যে, বার বার এইরকম পরাজয় হইতে রক্ষা পাওয়ার জন্য তাঁহাকে কোনও পাহাড়ে গিয়া যাগ-যজ্ঞ করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে। তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই দিগ্বিজয়ে সফল হইতে পারিবেন—ইহা ঠিক করিয়া তিনি তাঁহার সমস্ত সাজপোষাক আর অস্ত্র-শস্ত্র ছাড়িয়া সন্ন্যাসীর বেশ পড়িলেন। তারপর স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে দেশে পাঠাইয়া দিলেন।

ডন্কুইক্সটের গ্রামের আত্মীয় বন্ধুরা স্যাঙ্কো পাঞ্জার মুখে ডন্কুইক্সটের সন্ধান পাইয়া ঠিক করিলেন যে, যেমন করিয়াই হউক ডন্কুইক্সটকে ফিরাইয়া আনিতে হইবে। তাঁহারা একদিন সেই পাহাড়ে গেলেন এবং ঘুমন্ত ডন্কুইক্সট্কে কৌশলে একটা লোহার খাঁচায় বন্দী করিয়া দেশে ফিরাইয়া আনিলেন।

স্যাঙ্কো পাঞ্জার ব্যারাটারিয়া-শাসন

দিগ্বিজয় দিগ্বিজয় করিয়া ডন্কুইক্সট্ এমনই ক্ষেপিয়া উঠিয়াছিলেন যে, চিরকাল তাঁহাকে লোহার খাঁচায় বন্দী করিয়া রাখিলে তবে ঠিক হইত। কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই ডন্কুইক্সটের আত্মীয়-স্বজনেরা দয়া করিয়া তাঁহাকে ছাড়িয়া দিয়াছিলেন। মুক্তি পাইয়াই ডন্কুইক্সটের মাথায় আবার দিগ্বিজয়ের ভূত চাপিল। আবার স্যাঙ্কোর সহিত লুকাইয়া লুকাইয়া তাঁহার যত সব উদ্ভট উদ্ভট পরামর্শ চলিতে লাগিল। স্যাঙ্কো পাঞ্জা জানিত যে, তাহার প্রভুটি একেবারে বদ্ধ-পাগল, কিন্তু তাহা সত্ত্বেও সে ডন্কুইক্সট্কে খুবই ভালবাসিত এবং বিশ্বাস করিত।

কোনও এক কৌতুকপ্রিয় রাজা ও রাণী ডন্কুইক্সট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জার অদ্ভুত অদ্ভুত সাহসের কথা ও লড়াইয়ের কথা লোকমুখে শুনিয়াছিলেন। তাহা শুনিয়া মজা দেখিবার জন্য তাঁহারা ডন্কুইক্সট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে তাঁহাদের কেল্লাতে নিমন্ত্রণ করিয়া পাঠাইলেন। এতদিনে ডন্কুইক্সট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জার আশা-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইতে চলিল। স্বয়ং রাজা ও রাণী আসিয়া প্রবল পরাক্রমশালী বীরের মতই সমাদর করিয়া ডন্কুইক্সট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে কেল্লার ভিতরে লইয়া গেলেন। একজন গণ্যমান্য সেনাপতিকে যতরকম সম্মান দেখানো হইয়া থাকে, সে সবই ইহাদের প্রতি দেখানো হইয়াছিল। কেবল রাজা ও রাণীর হুকুমে মাঝে মাঝে মজা করিবার জন্য সেই সমাদর আর অনুষ্ঠানে দু-একটা ত্রুটি-বিচ্যুতি হইল। ইহাতে উপস্থিত সব সৈন্য ও সেনাপতিরা এবং রাজা ও রাণী খুব কৌতুক বোধ করিলেন।

কিন্তু ডন্‌কুইক্‌সট্ বা স্যাঙ্কো তাহা বুঝিতে না পারিয়া বোকার মত ফ্যাল্‌ফ্যাল্ করিয়া এদিক-ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

রাজামশাই স্যাঙ্কো পাঞ্জার আকাঙ্ক্ষা জানিতেন। সেইজন্য তিনি তাহাকে ব্যারাটারিয়া নামক একটি দ্বীপের শাসনকর্ত্তা আর ডন্‌কুইকসটকে কেল্লার প্রধান সেনাপতি করিয়া দিলেন।

রাজামশাইয়ের কাছ হইতে বিদায় লইয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জা তাহার গাধা ড্যাপ্‌লের পিঠে চড়িয়া মহা ধুমধাম করিয়া সেই দ্বীপে গিয়া প্রবেশ করিল। দ্বীপের সব লোকেরা তাহাকে অভ্যর্থনা করিয়া রাজবাড়ীতে পৌছাইয়া দিল।

সেখানে পৌঁছিবার দিনেই স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে কয়েকটি বিবাদের চুলচেরা বিচার করিয়া দিবার জন্য বলা হইল। স্যাঙ্কো ত আর আইন-কানুন কিছুই জানিত না! কাজে কাজেই সে তাহার উপস্থিত বুদ্ধি খাটাইয়া এক একটা রায় দিয়া দিল। সেই বিচার শুনিয়া দ্বীপের লোকেরা স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে খুবই হাসি-ঠাট্টা করিয়াছিল।

কিন্তু ঠাট্টা-তামাসা বুঝিবার মত ক্ষমতা স্যাঙ্কোর ছিল না। সুতরাং সে পরম সন্তুষ্ট মনে বাড়ী ফিরিয়া গিয়া খাইতে বসিল। চমৎকার করিয়া সাজান প্রকাণ্ড একটা ঘরে তাহার খাবার জায়গা। সেখানে সে একা একাই খাইতেছিল। কেবল একজন ডাক্তার তাহার পাশে দাঁড়াইয়া তাহার খাওয়া লক্ষ্য করিতেছিলেন। স্যাঙ্কো পাঞ্জা দু-এক গ্রাস খাইতে-না-খাইতে সেই ডাক্তারটি তাঁহার হাতের ছোট্ট একটা লাঠি দিয়া তাহার থালার ছোঁয়াইলেন। অমনি একজন চাকর আসিয়া চট্ করিয়া তাহার থালাখানা সরাইয়া লইয়া গেল। ক্ষুধায় তখন স্যাঙ্কো পাঞ্জার পেটে আগুন জ্বলিতেছিল। সেইজন্য হঠাৎ ঐরকম ভাবে তাহার খাওয়ায় বাধা পড়াতে সে একেবারে রাগিয়া অগ্নিমূর্ত্তি ধরিয়া লাফাইয়া উঠিয়া জিজ্ঞাসা করিল, ব্যাপার কি? এরকম ভাবে আমাকে খাইতে না দেওয়ায় আপনার কি অধিকার আছে জানিতে পারি কি?" ডাক্তার একটু মুচ্‌কি হাসিয়া বলিলেন, "আপনি হইতেছেন এতবড় একটা দেশের শাসনকর্ত্তা।" আপনার স্বাস্থ্যের উপর হাজার হাজার লোকের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নির্ভর করিতেছে। সুতরাং আমরা ডাক্তারেরা সব সময়েই দেখিব, আপনি যেন বেশী খাইয়া অসুস্থ হইয়া না পড়েন।"—এই কথা বলিয়া ডাক্তারটি স্যাঙ্কোকে নমস্কার করিয়া হাসিয়া চলিয়া গেলেন। ওদিকে রাগে ও ক্ষুধায় স্যাঙ্কোর সমস্ত শরীর একেবারে জ্বলিয়া যাইতে লাগিল।

রোজ রোজই ডাক্তারেরা ঐভাবে স্যাঙ্কো পাঞ্জার খাওয়ায় বাধা দিতেন। এমন কি আধপেটা খাওয়া হইবার আগেই স্যাঙ্কোর সম্মুখ হইতে তাহার খাবার থালা সরিয়া যাইত। সহিয়া সহিয়া স্যাঙ্কো একদিন এমনই রাগিয়া উঠিল যে, সমস্ত ডাক্তারদের ডাকাইয়া সে বলিল, "দেশের সব ডাক্তারগুলোকে আমি একদিন এমন ঠেঙান ঠেঙাইব যে, উহাদের একজনকেও জীবিত রাখিব না। হয় তোমরা আমাকে খাইতে দাও, আর নয়ত তোমাদের সদাশয় রাজাকে জানাও, তাহার রাজ্য তিনি ফিরাইয়া লইতে পারেন।"

স্যাঙ্কো পাঞ্জা যখন ঐরকম আস্ফালন করিতেছে, তখন রাজার কাছ হইতে একখানা চিঠি আসিল। রাজা লিখিয়াছিলেন যে, একদল শত্রু শীঘ্রই ব্যারাটারিয়া দ্বীপটি আক্রমণ করিবে বলিয়া শাসাইয়াছে। সুতরাং স্যাঙ্কো পাঞ্জা যেন সৈন্য-সামন্ত প্রস্তত রাখিয়া সতর্ক থাকে।

খবর শুনিয়া ভয়ে স্যাঙ্কো পাঞ্জার পিলে চম্‌কাইয়া উঠিল। তখনকার মত ডাক্তারদের ধমকান শিকায় তুলিয়া স্যাঙ্কো সৈন্যদল দেখাশুনা করিতে চলিয়া গেল। শাসনকর্ত্তা হওয়া যে কতখানি বিরক্তিকর, স্যাঙ্কো পাঞ্জা অতি অল্পদিনের মধ্যেই তাহা বেশ হাড়েহাড়ে বুঝিতে পারিয়াছিল। সে প্রায়ই ভাবিত যে, পৃথিবীতে ইহার চেয়ে ঝঞ্ঝাটের কাজ বোধ হয় আর নাই। প্রতি পদে পদে রাজ্য-শাসনের খুঁটিনাটি ব্যাপারের মীমাংসার প্রয়োজন। আর সে সকলের সিদ্ধান্ত করিতে হইবে তাহাকে! বিচার-বিতর্কে একেবারে হয়রান হইয়া, আর না-খাইয়া না-খাইয়া কষ্ট পাইয়া সে একেবারে অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছিল। সেইজন্য সে একদিন দুঃখ করিয়া ডন্‌কুইক্‌সট্‌কে একখানা চিঠি লিখিয়া ফেলিল। চিঠিখানার মর্ম্ম এই—"আমার রাজা হওয়ার সখ মিটিয়াছে। শীঘ্র আমার রেহাই পাইবার ব্যবস্থা করিলে আমি বড় সুখী হইব।"



কেমন জব্দ ।

সেই দিনই গভীর রাত্রে বাড়ীর চাকর-বাকরেরা তাহার ঘুম ভাঙাইয়া জানাইল যে, শত্রুরা দেশের মধ্যে আসিয়া পড়িয়াছে। স্যাঙ্কো মহা বিরক্তির সঙ্গে বিছানা ছাড়িয়া যখন বাহিরে আসিল, তখন প্রজারা সকলে তাহাকে অনুরোধ করিল—"আপনিই নেতা হইয়া আমাদের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে চলুন।" ভয়ে স্যাঙ্কো পাঞ্জার জিব শুকাইয়া উঠিল এবং ঠক্ ঠক্ করিয়া তাহার হাত-পা কাঁপিতে লাগিল। যাহা হউক, কোনরকমে সামলাইয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জা অনেক কষ্টে বলিল যে, সেই রাজ্যের যুদ্ধের রসদ অথবা অস্ত্র-শস্ত্র যে কোথায় আছে তাহা তো তাহার জানা নাই। ইহাতে প্রজারা সকলে তাহাকে খুব উপহাস করিয়া ধমকাইয়া উঠিল। শেষকালে প্রজারাই কোথা হইতে মস্তবড় এক জোড়া ঢাল আর একটা বল্লম আনিয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে বলিল, "আমরাই আপনাকে যুদ্ধসাজ পরাইয়া দিতেছি।" ইহা বলিয়া স্যাঙ্কোর বুকে ও পিঠে সেই প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড ঢাল দুখানা খুব কষিয়া বাঁধিয়া দিল। ঢাল দুখানা তাহার গলা হইতে হাঁটুর নীচ পর্যন্ত ঝুলিয়া রহিল। ইহাতে স্যাঙ্কো পাঞ্জার অবস্থা বড় শোচনীয় হইয়া পড়িল। সে সটান সোজা হইয়া কাঠের পুতুলের মত দাঁড়াইয়া রহিল, এমন ভাবেই ঢালদুটা বাঁধা হইয়াছিল যে, তাহার নড়িবার চড়িবার শক্তিটুকু পর্যন্ত লোপ পাইল।

তারপর প্রজারা সকলে বলিল—"এইবার আপনি অগ্রসর হউন এবং আমাদের কি করিতে হইবে হুকুম দিন।" স্যাঙ্কো উত্তর দিল—"তোমরা অগ্রসর হও। কিন্তু আমি যে পা মুড়িতে না পারার জন্য এক পাও অগ্রসর হইতে পারিতেছি না। আমার ঢালের বাঁধনটা কিছু আঁট হইয়াছে।" স্যাঙ্কোর কথা শুনিয়া তাহারা সকলে 'হো হো' করিয়া হাসিয়া উঠিয়া বলিল, "আপনার এত ভয়! ভয়েতেই আপনার পা সটাং সোজা হইয়া আছে, ঢাল দুইটা বাঁধার জন্য নয়।"

এইরূপে অপমানিত হইয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জা চলিবার চেষ্টা করিতেই তাল সামলাইতে না পারিয়া মাটির উপরে মস্তবড় একটা কাছিমের মত ধপাস্ করিয়া পড়িয়া গেল। তারপর পড়িয়া কেবল হাত-পা ছুঁড়িয়া বৃথাই উঠিবার চেষ্টা করিতে লাগিল। হাঁটু মুড়িতে না পারিলে সে ওঠেই বা কেমন করিয়া।

ওদিকে অন্ধকারের মধ্যে প্রজারা সকলে নিজেরা নিজেরাই তাহাদের তলোয়ারে তলোয়ারে ঠোকাঠুকি করিয়া স্যাঙ্কোকে জানাইয়া দিল যে, সেখানে শত্রুরা আসিয়া পড়িয়াছে আর যুদ্ধ বাঁধিয়া গিয়াছে। তারপর প্রতি মুহূর্তে তাহারা স্যাঙ্কোকে মাড়াইয়া মাড়াইয়া তাহাকে এমনি কাবু করিয়া ফেলিল যে, স্যাঙ্কো সে যাত্রায় বাঁচিয়া ফিরিবার আশায় একেবারে জলাঞ্জলি দিয়া বসিল। যাহা হউক, সকাল হইতেই প্রজারা সকলে জয়ধ্বনি করিয়া বলিয়া উঠিল, "শত্রুরা হারিয়া গিয়াছে আর আমরাই জিতিয়াছি।" তারপর একটা কাছিমকে যেমন করিয়া মাটি হইতে টানিয়া তোলা হয়, ঠিক তেমনি করিয়া তাহারা স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে টানিয়া তুলিল এবং তাহার বাধন খুলিয়া তাহাকে ছাড়িয়া দিল।

অনাহারে, অনিদ্রায় এবং শত শত লোকের পায়ের চাপের তলায় সটাং লম্বা হইয়া পড়িয়া থাকায় তাহার প্রাণ একেবারে যায়-যায় হইয়াছিল। সুতরাং বাড়ী গিয়া স্যাঙ্কো পাঞ্জা তাহার শাসন-কর্তার বেশভূষা খুলিয়া ফেলিল। তারপর সে তাহার নিজের কাপড়-জামা পরিয়া আস্তাবলে গিয়া তাহার প্রিয় গাধার গলা জড়াইয়া ধরিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে অনেক আদর করিল এবং "সুখের চেয়ে আমার স্বস্তি ভাল"—এই কথা বলিয়া টপ করিয়া গাধার পিঠে চড়িয়া সে দেশ ছাড়িয়া পালাইয়া তবে হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিল।

ডনকুইক্‌সটের করুণ পরিণাম

ওদিকে রাজামহাশয়ের কেল্লায় ডন্‌কুইক্‌সট্‌ও পদে পদে জব্দ হইয়াছিলেন। তিনিও সেখানে স্ত্রী-পুরুষ সকলের কাছেই বোকা বনিয়া খুবই উপহাসাস্পদ হইয়া উঠিয়াছিলেন। ঠাট্টা-তামাসা আর সহ্য করিতে না পারিয়া তাঁহার প্রাণ 'ত্রাহি-ত্রাহি' ডাক ছাড়িতেছিল এবং প্রধান সেনাপতি হওয়ার চেয়ে সাধারণ ভাবে জীবন কাটানো যে কত সুখকর, তাহা তিনি তখন বেশ হাড়ে হাড়ে বুঝিতেছিলেন। সুতরাং স্যাঙ্কো পাঞ্জা আসিয়া

যখন ডনকুইক্সটের সহিত দেখা করিল, তখন দুজনেই স্বীকার করিলেন যে, রাজা হওয়া বা সেনাপতি হওয়া বড় ঝকমারি। ইহার চেয়ে তাঁহাদের পুরাতন ধরণের জীবনযাত্রা অনেক ভাল ছিল।

স্যাঙ্কো পাঞ্জা আর ডনকুইক্সট্ পদে পদে বিপদে পড়িয়া আর উপন্যাসের পাত্র হইয়া এতই ক্লান্ত ও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন যে, সেইদিনেই তাঁহারা রাজা ও রাণীর কাছে বিদায় চাহিলেন। রাজা ও রাণী উঁহাদের লইয়া খুব মজা করিয়া লইয়াছিলেন, সুতরাং তাঁহারা হাসিতে হাসিতে তাঁহাদের বিদায় দিলেন। কিন্তু কেল্লা হইতে বাহির হইবার সময়ে একজন সৈনিক শেষবারের মত একটা মজা করিবার ইচ্ছায় ডনকুইকসটের গায়ে পরিয়া ঝগড়া বাধাইল। তাহাতে ডনকুইক্সট্ তো একেবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়া ভাবিলেন—"কি! আমি সেনাপতি, আর আমাকে কিনা অপমান করিবে একটা সামান্য সৈনিক? দুজনে তুমুল যুদ্ধ বাধিয়া গেল। কিন্তু ডনকুইক্সট্ তাহার সহিত পারিবে কেমন করিয়া? যুদ্ধে হারিয়া ডনকুইক্সট্ ধূলায় গড়াগড়ি দিতে লাগিলেন। এইরকমে ভীষণভাবে অপমানিত হওয়ায় ডনকুইক্সটের সকল দর্প এক নিমেষেই চূর্ণ হইয়া গেল। তিনি ধূলা ঝাড়িয়া মাটি হইতে উঠিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন—"যোদ্ধা বীর হইয়া আমরা আর কাজ নাই। ইহার চেয়ে গরু-ভেড়ার রাখালি করিয়া বাকী জীবনটা কাটাইয়া দিব।" স্যাঙ্কো খুব উৎসাহের সঙ্গে তাঁহার কথায় সায় দিল। অপমান ও লাঞ্ছনায় জর্জ্জরিত হইয়া তাঁহারা দুজনে তাঁহাদের আগেকার অতি সাধারণ গ্রাম্য জীবনকে আবার বরণ করিয়া লইবার জন্য কেল্লা ছাড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলেন।

ডনকুইক্সট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জা তাঁহাদের গ্রামে প্রবেশ করিতেই গ্রামের যত ছোট ছোট ছেলে মেয়েরা তাঁহাদের ধূলাবালি মাখা, বিষণ্ণ আর রোগা অদ্ভুত চেহারা দেখিয়া হাততালি দিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল। তারপর ছেলেমেয়েরা তাঁহাদের ঘোড়া আর গাধাটাকে চারিদিকে এমনই ভীড় করিয়া জড় হইল যে, তাঁহাদের পক্ষে এক পা অগ্রসর হওয়া কঠিন হইয়া উঠিল।

ইহার মধ্যে ডনকুইক্সটের সেই পুরাতন বন্ধু নাপিত আর গির্জ্জার যাজক দুজনে সেখানে আসিয়া পড়িল। তাহারা ডনকুইক্সট্ ও স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে উদ্ধার করিয়া তারপর বাড়ী পৌঁছাইয়া দিল।

বাড়ী পৌঁছিবার পরদিনই ডনকুইক্সটের বেশ জ্বর হইল। একদিন প্রায় ছয় ঘণ্টা ধরিয়া ডনকুইক্সট্ এমন ঘুম ঘুমাইতে লাগিলেন যে, ডনকুইক্সটের আত্মীয়েরা ভাবিলেন, তিনি বুঝি মারাই গিয়াছেন। যখন তাঁহার ঘুম ভাঙ্গিল, তখন সকলে দেখিলেন, তিনি একজন বুদ্ধিমান লোকের মতই বেশ স্বাভাবিক ভাবে ভগবানের উপাসনা করিতে আরম্ভ করিয়াছেন। তাঁহাকে উপাসনা করিতে দেখিয়া তাঁহার ভগ্নী নিজেই জিজ্ঞাসা করিলেন—"হঠাৎ এরকম উপাসনার অর্থ কি?" ডনকুইক্সট্ উত্তর দিলেন—"কেবল কতকগুলো যুদ্ধ-বিগ্রহের বই পড়িয়া পড়িয়া এতদিন আমি আমার জ্ঞান-বুদ্ধি হারাইয়া পাগল হইয়াছিলাম। আজ আমি আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি ফিরিয়া পাইয়াছি। সেইজন্য ভগবানকে তাঁহার করুণার জন্য ধন্যবাদ জানাইতেছি। তাহার উপর, আমি হয়ত আর বাঁচিব না। সেইজন্য অন্তিম-কালে একবার ভগবানের নাম করিতেছি।" এই কথা বলিতে বলিতে ডনকুইক্সটের দুই চোখ জলে ভরিয়া গেল। তারপর ডনকুইক্সট্ তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, আমার সব বই পোড়াইয়া ফেল।" দাসী তাহার মনিবের কথা অনুসারে সমুদয় বইগুলি বাড়ির প্রাঙ্গণের ভিতর



ডনকুইক্সটের দাসী বই জড় করিতে লাগিল

জড় করিয়া তাহাতে আগুন ধরাইয়া দিল। দেখিতে দেখিতে ডনকুইক্সটের চোখের সম্মুখে তাঁহার প্রিয় পুস্তকগুলি ভস্মস্তূপে পরিণত হইল।

তখন সকলেই বুঝিতে পারিলেন যে, সত্য সত্যই ডনকুইক্সটের মস্তিষ্ক বিকৃত হইয়াছে, এবং সেইজন্যই নানারূপ খেয়ালে মাতিয়া যেমন তিনি নিজের জীবনকে বিপন্ন করিয়াছিলেন, তেমনি করিয়াছিলেন তাঁহার একান্ত অনুগত, সরল ও নির্ব্বোধ অনুচর স্যাঙ্কো পাঞ্জাকে।

ঘরে যতলোক ছিলেন সকলের কাছে ডন্‌কুইক্সট্ তাঁহার পাগলামির সকল কথা প্রকাশ করিতে কিছুমাত্র কুণ্ঠা বোধ করেন নাই। ডন্‌কুইক্সটের মৃত্যু আসন্ন মনে করিয়া একজন তাড়াতাড়ি স্যাঙ্কোকে ডাকিতে ছুটিল। স্যাঙ্কো আসিলে পর ডনকুইক্সট্ তাহার হাত ধরিয়া তাঁহার বুকের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "বন্ধু! আমার নির্বুদ্ধিতায় ও পাগলামির ফলে তোমাকে অনেক লাঞ্ছনা ও অপমান সহ্য করিতে হইয়াছে। আমাকে তুমি ক্ষমা করিয়ো।"

চোখের জলে দুইজনেরই বুক ভাসিয়া যাইতে লাগিল। অন্য যে সমস্ত লোক ডনকুইক্সট্‌কে দেখিতে আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের কাছেও ডনকুক্সট্ বলিলেন—"আমি অবশ্য একদিন পাগল ছিলাম। কিন্তু আজ আমি আমার বুদ্ধি-শুদ্ধি ফিরিয়া পাইয়াছি। এখন আমি আর লা মাঞ্চার ডনকুইক্সট্ নহি—আমি সেই বহুদিন আগেকার কুইক্সাডা বা কোয়েসাডা।" শেষ সময়ে ডনকুইকসটের সেই রকম সরলতা আর অনুতাপ দেখিয়া সকলেই বাস্তবিক খুব ব্যথিত হইয়াছিলেন। এমন একদিন ছিল, যখন ডনকুইক্সট্‌কে দেখিয়া তাঁহারা কত উপহাস করিয়া হাসিয়াছিলেন। কিন্তু সেদিন ডনকুইকসটের কথায় সকলের চোখ জলে ভাসিয়া গেল।

ডনকুইক্সটের এই অনুতাপের পর সকলেই তাঁহাকে ক্ষমা করিলেন এবং তাঁহার প্রতি সহানুভূতি প্রদর্শন করিলেন।

ইহার পরে ডনকুইক্সট্ আর কয়েকদিন মাত্র বাঁচিয়াছিলেন। কিন্তু যে কয়দিন তিনি বাঁচিয়াছিলেন, সে কয়দিন যুদ্ধ-বিগ্রহের বইয়ের কথা মনে পড়িলেই তিনি আতঙ্কে শিহরিয়া উঠিতেন এবং তাঁহার চোখে-মুখে করুণতার ছায়া ভাসিয়া উঠিত।



শান্তরক্ষিত, পদ্মনাভ ও কমলশীল

১৫৫৫ পৃষ্ঠার পর

দীপঙ্করের কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে (শিশু-ভারতী—১৫৫৪ পৃষ্ঠা)। শুধু দীপঙ্কর নহেন, বহু বাঙ্গালী খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দী এবং তৎপূর্ব্ব হইতে বৌদ্ধ ধর্ম্ম প্রচারের জন্য এসিয়ার সর্ব্বত্র জ্ঞানের দীপ-শিখা হস্তে যাতায়াত করিয়াছেন; তাঁহাদের সম্বন্ধে আমরা একরূপ কিছুই জানি না। অশোকের এক বিদ্রোহী মন্ত্রী নির্ব্বাসিত হইয়া চীন দেশে গিয়াছিলেন, তাঁহার নাম যক্ষ। সাতশত অনুচর সঙ্গে তিনি চীনের

যক্ষ

এক প্রান্তে উপনিবেশ স্থাপন করেন। তাঁহার পূর্ব্বেই বৌদ্ধ ধর্ম্ম চীনে প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, কিন্তু যক্ষের দ্বারা এই প্রচেষ্টার বিশেষ শ্রীবৃদ্ধি হয়। তদবধি ভারতের নানা স্থান হইতে, বিশেষ মগধ হইতে শত শত পণ্ডিত চীন, জাপান প্রভৃতি স্থলে অভিযান করেন এবং তথাকার দশ ভাগের নয় ভাগ লোককে বৌদ্ধধর্ম্মে দীক্ষিত করেন। ইঁহাদের মধ্যে বহু লোক বাঙ্গালী ছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে গৌড়বাসী শান্তরক্ষিত তিব্বত-রাজ খিসরঙ্গ দেউস্থান কর্ত্তৃক বহু মানের সহিত নিমন্ত্রিত হইয়া মগধ হইতে তিব্বতে গমন করেন। এই শান্তরক্ষিত নালন্দা বিহারের প্রধান আচার্য্য ছিলেন, সুতরাং ইনিও নগণ্য

শান্তরক্ষিত

ছিলেন না। ইনি তিব্বতের বনধর্ম্মকে পরাজিত করিয়া বৌদ্ধধর্ম্মকে রাজকীয় ধর্ম্মে পরিণত করেন। তথাকার লামা সম্প্রদায় ইঁহারই প্রবর্ত্তিত। তিব্বত-বাসীরা ইঁহাকে আচার্য্য বোধিসত্ত্ব উপাধি দ্বারা ইঁহার প্রতি সম্মান দেখাইয়া থাকেন। ইঁহার সঙ্গে পণ্ডিত পদ্মনাভ নামক একজন প্রধান আচার্য্য তিব্বতে গিয়াছিলেন। ইঁহারা তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্মের বীজ বপন করিয়া তাহা অঙ্কুরিত করিয়াছিলেন। তখন বৌদ্ধধর্ম্মের অনেক শাখা-প্রশাখা হইয়াছিল।

কমলশীল

চীন দেশীয় কয়েক জন পণ্ডিত ইঁহাদের মত খণ্ডন করিবার জন্য তিব্বতে আগমন করেন। বহু তর্ক-বিতর্ক হয় এবং ইঁহাদের আলোচনা দীর্ঘকাল চলিয়াছিল। অবশেষে গৌড়ীয় প্রধান

আচার্য্য কমলশীল—যাঁহার নাম ইতঃপূর্ব্বেই মগধ হইতে সর্ব্বত্র প্রচারিত হইয়াছিল—তিব্বতে আসিয়া চৈনিক বৌদ্ধ মত খণ্ডন করিয়া ভারতীয় ধর্ম্মের প্রাধান্য স্থাপন করেন।

খৃষ্টীয় নবম শতাব্দীতে তিব্বতরাজ রল্পচান বাঙ্গলা হইতে বহু বৌদ্ধ পণ্ডিত তাঁহার রাজধানীতে লইয়া গিয়াছিলেন। ইঁহারা অনেক সংস্কৃত বৌদ্ধগ্রন্থ তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন। ইঁহাদের মধ্যে শান্তরক্ষিত, পদ্মসম্ভব (উদয়ন-বাসী), দীপঙ্কর, তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র দানশ্রী, বিমলমিত্র, জিনমিত্র, মুক্তিমিত্র, সুগতশ্রী, দানশীল, সম্ভোগবজ্র, বিরোচন, মঞ্জুঘোষ প্রভৃতি।

ভারত ইতিহাসের এই যুগই আমাদের সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল। বাঙ্গালী বৌদ্ধগণ যবদ্বীপে যাইয়া তথায় শ্রাবক সম্প্রদায়ের যে উন্নতি করিয়াছিলেন, তাহা ভারতীয় ধর্ম্মের ইতিহাসে চিরস্মরণীয়। বাঙ্গালী চীন ও জাপানে যাইয়া ধর্ম্ম, স্থপতি, ভাস্কর্য্য ও চিত্রকলার নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়াছিলেন। জাপানের হুরিউজি মন্দিরের বৌদ্ধ পুরোহিতগণ শাস্ত্রগ্রন্থ লিখিবার সময় যে অক্ষর ব্যবহার করেন, তাহা জাপানী চিত্রাক্ষর নহে, তাহা পাল ও সেনরাজগণের সময়কার প্রাচীন বঙ্গাক্ষর। আমাদের দেশ এক হাজার বা বারশত বৎসর পূর্ব্বে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের দস্তুরমত আড্ডা ছিল। কিন্তু সে সম্বন্ধে আমরা একেবারে অজ্ঞ ও উদাসীন। এসিয়ার নানা স্থান হইতে যদি আমরা পুরাতত্ত্ব সন্ধান করি, তবে বাঙ্গালীর অতীত গৌরবের অনেক কথা আবিষ্কৃত হইতে পারে।

পণ্ডিত বীর্য্য সিংহ

বীর্য্য সিংহ বিক্রমশীলার মঠের একজন প্রসিদ্ধ পণ্ডিত ছিলেন। সেখানে তিনি কয়েকখানি সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থের তিব্বতীয় ভাষায় অনুবাদ করেন। যাহাতে সংস্কৃত ভাষায় লিখিত বৌদ্ধ গ্রন্থ-গুলি তিব্বতীয় বৌদ্ধদের মধ্যে প্রচারিত হয়, এই জন্যই তিনি ঐ গ্রন্থগুলির অনুবাদ করিয়াছিলেন।

তিনি যে সব বই তিব্বতীয়দের জন্য অনুবাদ করেন, তাহার মধ্যে "মার মনো নির্ঘাণকার নাম সংগীতি", "কায় বাক্-চিত্ত সুপ্রতিষ্ঠা নাম" প্রভৃতি প্রধান। এইরূপ অনুবাদে তিনি উপাধ্যায় দীপঙ্করের সাহায্য গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাহা হইলে আমরা অনুমান করিতে পারি যে, পণ্ডিত বীর্য্য সিংহের আবির্ভাবকাল ৯৮০-১০৫৩ খৃষ্টাব্দের মধ্যে পড়ে।

পণ্ডিত বীর্য্য সিংহ তিব্বতে গিয়াছিলেন কি না, তাহা আমরা বলিতে পারি না। যে বইগুলি বীর্য্য সিংহ বা অন্যান্য ভারতীয় ও তিব্বতীয় পণ্ডিতেরা তিব্বতী ভাষায় অনুবাদ করিয়াছিলেন, তাহার সংস্কৃত ভাষার লিখিত মূল গ্রন্থ প্রায়ই নষ্ট হইয়া গিয়াছে। যাহা কিছু বাকী আছে, তাহা তিব্বতীয় ভাষাতেই আছে। তিব্বতীয় ভাষায় অনূদিত গ্রন্থগুলি যদি সংস্কৃত বা বাঙ্গালা ভাষায় অনুবাদ করা যায়, তাহা হইলে বৌদ্ধ সংস্কৃত সাহিত্য যে কত বড় বিরাট ছিল, তাহা অনুভব করা যাইতে পারে।

আমাদের দেশ

কনিষ্কের পরবর্ত্তী কুষাণরাজগণ

১৯৫৫ পৃষ্ঠার পর

মহারাজ কনিষ্কের রাজ্যাভিষেকের প্রথম বর্ষ হইতে যে একটি নূতন অব্দের গণনা করা হয়, তাহাকে সাধারণতঃ কুষাণাব্দ নামে অভিহিত করা হয়। এই অব্দের ৩ হইতে ২৩ বর্ষ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে খোদিত লিপিসমূহে তাঁহার নাম পাওয়া যায়। অর্থাৎ তিনি যে অন্ততঃ ২৩ বৎসর পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনই সন্দেহ নাই। কুষাণাব্দের ২৩ বর্ষে উৎকীর্ণ মথুরার নিকটবর্ত্তী ইসাপুর নামক স্থানে আবিষ্কৃত একটি শিলাস্তম্ভের খোদিত লিপিতে বাসিষ্ক নামক একজন রাজার নামের উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়; হইতে পারে যে, ইনিই মহারাজ কনিষ্কের পর কুষাণ-সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। মথুরায় আবিষ্কৃত ২৮শ বর্ষে উৎকীর্ণ আর একখানি শিলালিপিতে কনিষ্কের নামের উল্লেখ ছিল। কনিষ্কের লিপি দুইটী হইতে প্রমাণ হয় যে, তাঁহার অধিকার পূর্ব্ব মালব ও মথুরায় ছিল। কিন্তু তাঁহার রাজ্যবিস্তৃতি কতদূর ছিল ও কনিষ্কের সহিত তাঁহার কি সম্পর্ক ছিল, কিছুই স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই।

ইহাও মনে করিবার হেতু আছে যে, মহারাজ কনিষ্কের জীবিত কালেই তিনি কুষাণ-সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। কেন বলিতেছি—অনেক দিন হইল আমাদের দেশের একজন মস্ত বড় পণ্ডিত ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে আরা নামক স্থানে একটি খরোষ্ঠী শিলালিপি দেখিতে পাইয়াছিলেন। ইহা কনিষ্ক নামে একজন রাজার ৪১শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ। অথচ তোমাদিগকে এই মাত্র বলিয়াছি যে, ২৪শ ও ২৮শ রাজ্যাঙ্কে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে বাসিষ্কের নামের উল্লেখ আছে। তাহা হয় কেমন করিয়া? আবার আরও সমস্যার বিষয় এই যে, কুষাণাব্দের ৩৩শ বর্ষ হইতে ৬০ বর্ষ কালের মধ্যে উৎকীর্ণ মথুরায় আবিষ্কৃত শিলালিপিতে হুবিষ্ক নামক আর একজন প্রসিদ্ধ কুষাণ-সম্রাটের নাম দেখিতে পাওয়া যায়। এই সমস্যার সমাধান পণ্ডিতেরা নানা রকমে করিয়া থাকেন, কোন কোন পণ্ডিতের মতে কনিষ্ক যখন মধ্য এসিয়ায় বিজয়াভিযানে ব্যাপৃত ছিলেন, সেই সময় পর পর তাঁহার পুত্রদ্বয় বাসিষ্ক ও হুবিষ্কের

উপর ভারতের রাজ্যভার অর্পিত হইয়াছিল। বাসিষ্ক কুষাণাব্দের ২৪শ বর্ষ হইতে ২৯শ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজ্যভার বহন করিয়াছিলেন। তাহার পর হুবিষ্ক ৩০শ বর্ষে সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলন। কনিষ্ক ৪১শ বর্ষের পূর্ব্বে কোনও সময়ে দেশ জয় করিয়া ফিরিয়া আসিয়া পুনরায় রাজ্যভার গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর হুবিষ্ক সাম্রাজ্যের একমাত্র অধিকারী হইয়া অন্ততঃ কুষাণাব্দের ৬০শ বর্ষ পর্য্যন্ত রাজত্ব করিয়াছিলেন। কেহ কেহ আবার এ মত সমীচীন বলিয়া গ্রহণ করেন না। তাঁহাদের মতে ৪১শ বর্ষে উৎকীর্ণ আরার লিপির কনিষ্ক দিগ্বিজয়ী বৌদ্ধ সম্রাট্ কনিষ্ক নহেন। তিনি কনিষ্ক নামধারী অপর কোনও রাজা। এই দ্বিতীয় কনিষ্কের পিতার নাম লিপি-অনুসারে বাঝেষ্প ছিল। বাঝেষ্প এবং বাসিষ্ক একই ব্যক্তির নাম। বাসিষ্কের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় কনিষ্ক পঞ্জাবের পশ্চিমাংশের অধিকার পাইয়াছিলেন ও হুবিষ্ক সাম্রাজ্যের অবশিষ্টাংশের রাজা হইয়াছিলেন। ৪০শ বর্ষের পূর্ব্বে হুবিষ্ক কেবল 'মহারাজ দেবপুত্র' উপাধি ধারণ করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলেন, পরে তিনি সমগ্র কুষাণ-সাম্রাজ্যের একচ্ছত্র সম্রাট্ হইয়া রাজাধিরাজ পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন।

মহারাজ হুবিষ্কের রাজ্যবিস্তৃতি কতদূর ছিল, তাহা নির্ণয় করা দুঃসাধ্য। তবে ইহা নিশ্চয় যে একসময়ে আফ্গানিস্থানে কাবুলের উত্তরে ওয়ার্ডাক নামক স্থানে একটি স্তূপের ধ্বংশবশেষের মধ্য হইতে একটি শরীর নিধান (অর্থাৎ বুদ্ধদেবের শরীরাবয়ব যুক্ত পাত্র বিশেষ) পাওয়া গিয়াছিল। উহার খোদিত লিপি হইতে জানা যায়—কুষাণাব্দের ৫১ বর্ষে হুবিষ্কের রাজ্যকালে শরীরনিধানটি স্তূপের মধ্যে স্থাপিত হইয়াছিল। ইহা হইতে স্পষ্টই প্রমাণ হইতেছে, আফ্গানিস্থানের উপর হুবিষ্কের সুদৃঢ় অধিকার ছিল। তাহা ছাড়া এই লিপিটি হইতে আফ্গানিস্থানে তৎকালীন ধার্ম্মিক অবস্থার বিষয়ও কিছু কিছু অবগত হওয়া যায়।

আফ্গানিস্থান ছাড়া মথুরায় হুবিষ্কের অনেক শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। অবশ্য মথুরা সে সময় কুষাণ রাজশক্তি ও আর্য্য-সভ্যতার বিশিষ্ট কেন্দ্র ছিল। ইহা ছাড়া কাশ্মীরেও হুবিষ্কের অধিকার ছিল। তিনি এইদেশে বারামূলা গিরিবর্ত্মের ঠিক অভ্যন্তরে হুষ্কপুর নামক একটি প্রসিদ্ধ নগর স্থাপন করিয়াছিলেন। এই নগরটি এখন উস্কুর নামক গ্রামে পরিণত হইয়াছে। মথুরার পূর্ব্বে হুবিষ্কের রাজ্য যে ঠিক কতদূর বিস্তৃত ছিল, তাহা বলা কঠিন। তবে হইতে পারে যে, তাঁহার রাজ্যের পূর্ব্ব সীমা গয়ায় ছিল।

হুবিষ্কের বহু সুবর্ণ ও তাম্রমুদ্রা আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই সমস্ত মুদ্রায় কনিষ্কের মুদ্রার ন্যায় হিন্দু, গ্রীক ও প্রাচীন ইরাণ দেশের দেব-দেবীর মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায়, যথা ইশ অর্থাৎ শিব, স্কন্দ ও তাঁহার পুত্র বিশাখ, মিথ্রো অর্থাৎ মিহির বা সূর্য্য, আতপ অর্থাৎ অগ্নি, মাহ অর্থাৎ চন্দ্র, এরকিল অর্থাৎ গ্রীক দেবতা হেরাক্লিজ। কিন্তু বুদ্ধের নাম নাই। হয়ত হুবিষ্কের বৌদ্ধধর্ম্মে অনুরাগ খুব প্রবল ছিল না। তিনি সর্ব্ব ধর্ম্মসমন্বয়ের পক্ষপাতী ছিলেন। ইহা তাঁহার মুদ্রা হইতেই স্পষ্ট জানা যায়। অবশ্য তিনি বৌদ্ধ মঠসকলের উন্নতির যন্ত যথেষ্ট সচেষ্ট ছিলেন, এবং স্বয়ং মথুরায় বহু অর্থ ব্যয়ে একটি সুদৃশ্য

মঠ বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকিবার জন্য নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন।

হুবিষ্কের পর বাসুদেব কুষাণ সাম্রাজ্যের অধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই সময় হইতে কুষাণ-সাম্রাজ্যের অবনতি আরম্ভ হইয়াছিল। অনুমান হয় যে, উত্তরাপথের পশ্চিমাংশ এবং আফ্‌গানিস্থান কুষাণরাজাদের হস্তচ্যুত হইয়াছিল। কুষাণাব্দের ৭৪ বর্ষ হইতে ৯৮ বর্ষ পর্য্যন্ত কালের মধ্যে উৎকীর্ণ মথুরায় আবিষ্কৃত শিলালিপিসমূহে বাসুদেবের নামে উল্লেখ দেখিতে পাওয়া যায়। বাসুদেব নিশ্চয়ই বৌদ্ধ ছিলেন, তাঁহার মুদ্রাসমূহে মহাদেবের মূর্ত্তি দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাঁহার পূর্ব্বপুরুষ বিমকদফিসের ন্যায় তিনি বোধ হয় শৈব ছিলেন।

বাসুদেবের মৃত্যু বা সিংহাসনচ্যুতির কিঞ্চিত কাল পরে কুষাণ-সাম্রাজ্য বোধ হয় বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। অন্ততঃ চারিটি খণ্ড রাজ্যের বিষয় জানা যায়। যথা 'তা-হিয়া' অর্থাৎ ক্ষুদ্র নদীর নিকটস্থ প্রদেশ, কিপিন বা কাপিশ দেশ, কাও-কু অর্থাৎ কাবুল, এবং তিরেন-চু অর্থাৎ ভারতবর্ষের উত্তর পশ্চিমাংশ। এই সকল দেশে ইউ-চি বংশীয় রাজগণের অধিকার ছিল। বাসুদেবের উত্তরাধীকারীর মধ্যে একজন কনিষ্ক নামধারী (তৃতীয় কনিষ্ক) ও আর একজন বাসুদেব নামধারী রাজা ছিলেন বলিয়া অনুমান করা হয়। যাহা হউক ভারতবর্ষে কুষাণ-রাজ্য খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে লুপ্ত হইয়াছিল। নাগবংশীয় রাজারা কুষাণরাজ্যকে ধ্বংস করিয়া নিজেদের রাজ্য প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই নাগদের বিষয় পরবর্ত্তী প্রবন্ধে বলিবার ইচ্ছা রহিল।

কুষাণরাজাদের যুগে ভারতীয় সভ্যতার যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। এই সময় সংস্কৃত সাহিত্যে কুষাণরাজাদের পৃষ্ঠপোষকতায় সমৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। অশ্বঘোষ, নাগার্জ্জুন ইত্যাদি বড় বড় সাহিত্য মহারথীরা নিজেদের রচনার দ্বারা সংস্কৃত সাহিত্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধন করিয়াছিলেন। আবার ধার্ম্মিক উন্নতির জন্যও এযুগ কম প্রসিদ্ধ নহে। ৬১ খৃষ্টাব্দে কশ্যপ মাতঙ্গ নামক বৌদ্ধ শ্রমণ চীন দেশে বৌদ্ধ ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন করিয়াছিলেন। মহাযান নামক বৌদ্ধধর্ম্মের শাখা বিশেষের বিকাশ কুষাণদের রাজ্যকালেই হইয়াছিল। তাহা ছাড়া শৈব ধর্ম্মেরও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছিল। কুষাণরাজাদের মধ্যে অনেকেই শিবের ভক্ত ছিলেন। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা স্মরণ রাখিবার যোগ্য হইতেছে ইহাই যে, কুষাণরাজাদের সময়েই আর্য্য সভ্যতা মধ্য এবং প্রাচ্য এসিয়ায় সুদৃঢ় ভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।



[১৯০০ পৃষ্ঠার পর]

বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্ নদেয় এল বান



দিনের আলো নিভে এল,
সূয্যি ডোবে ডোবে।
আকাশ ঘিরে মেঘ জুটেছে
চাঁদের লোভে লোভে ।
মেঘের উপর মেঘ করেছে,
রঙের উপর রঙ।
মন্দিরেতে কাঁশর ঘণ্টা
বাজ্‌ল ঠং ঠং।
ও-পারেতে বিষ্টি এল
ঝাপ্‌সা গাছ-পালা।
এ-পারেতে মেঘের মাথায়
একশো মাণিক জ্বালা।
বাদ্‌লা হাওয়ায় মনে পড়ে
ছেলে বেলার গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান।"



আকাশ জুড়ে মেঘের খেলা
কোথায় বা সীমানা,
দেশে দেশে খেলে বেড়ায়
কেউ করে না মানা।
কত নতুন ফুলের বনে
বিষ্টি দিয়ে যায়।
পলে পলে নতুন খেলা
কোথায় ভেবে পায়।
মেঘের খেলা দেখে কত
খেলা পড়ে মনে।
কতদিনের লুকোচুরি
কত ঘরের কোণে।
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
ছেলে বেলার গান -
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।"





মনে পড়ে ঘরটি আলো
মায়ের হাসিমুখ,
মনে পড়ে মেঘের ডাকে
গুরু গুরু বুক।
বিছানাটির একটি পাশে
ঘুমিয়ে আছে খোকা,
মায়ের পরে দৌরাত্মি, সে
না যায় লেখাজোকা।
ঘরেতে দুরন্ত ছেলে
করে দাপাদাপি,
বাইরেতে মেঘ ডেকে ওঠে
সৃষ্টি ওঠে কাঁপি'।
মনে পড়ে মায়ের মুখে
শুনেছিলাম গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর টুপুর
নদেয় এল বান।"



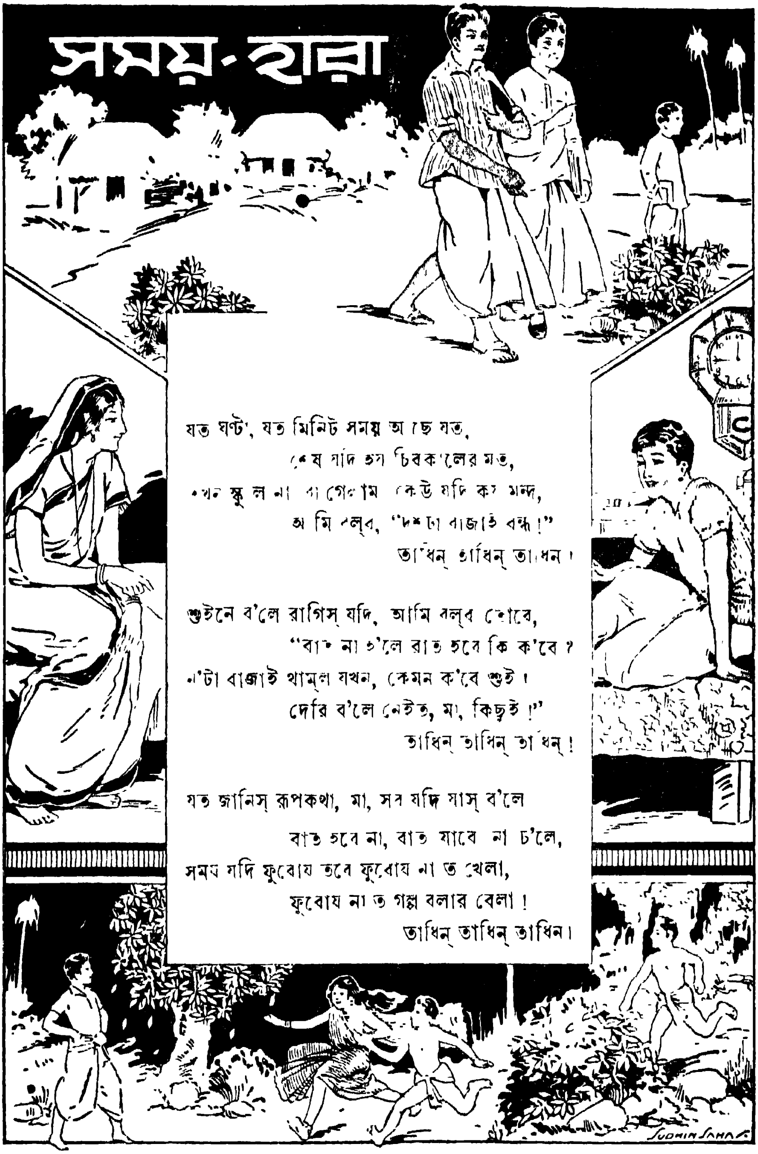


মনে পড়ে সুয়োরাণী
দুয়োরাণীর কথা
মনে পড়ে অভিমানী
কঙ্কাবতীর ব্যথা।
মনে পড়ে ঘরের কোণে
মিটি মিটি আলো,
চারিদিকে দেওয়ালেতে
ছায়া কালো কালো
বাইরে কেবল জলের শব্দ
ঝুপ্ ঝুপ্ ঝুপ্—
দস্যি ছেলে গল্প শোনে
একেবারে চুপ্
তারি সঙ্গে মনে পড়ে
মেঘ্‌লা দিনের গান-
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান।"

কবে বিষ্টি পড়েছিল,
বান এল সে কোথা
শিবঠাকুরের বিয়ে হল
কবেকার সে কথা।
সে দিনো কি এম্‌নিতর
মেঘের ঘটাখানা?
থেকে থেকে বিজুলি কি
দিতেছিল হানা?
তিন কন্যে বিয়ে করে
কি হল তার শেষে।
না জানি কোন্ নদীর ধারে,
না জানি কোন্ দে
কোন্ ছেলের ঘুম পাড়াতে
কে গাহিল গান—
"বিষ্টি পড়ে টাপুর্ টুপুর্
নদেয় এল বান।"





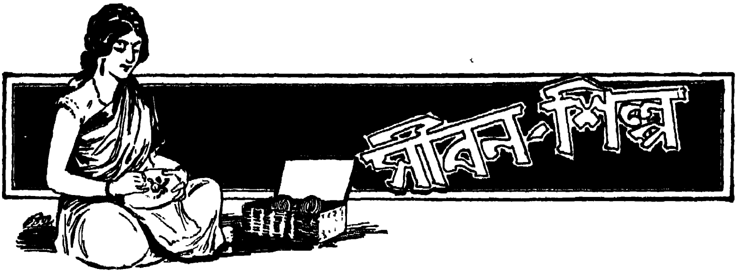


সময়-হারা

যত ঘণ্টা, যত মিনিট সময় আছে যত,
শেষ যদি হয় চিরকালের মত,
তখন স্কুলে নাই বা গেলাম কেউ যদি কয় মন্দ,
আমি বল্‌ব, "দশটা বাজাই বন্ধ!"
তাধিন্ তাধিন্ তাধিন।

শুইনে ব'লে রাগিস্ যদি, আমি বল্‌ব তোরে,
"রাত না হ'লে রাত হবে কি ক'রে?
ন'টা বাজাই থাম্‌ল যখন, কেমন ক'রে শুই।
দেরি ব'লে নেইত, মা, কিছুই!"
তাধিন্ তাধিন্ তাধিন্!

যত জানিস্ রূপকথা, মা, সব যদি যাস্ ব'লে
রাত হবে না, রাত যাবে না চ'লে,
সময় যদি ফুরোয় তবে ফুরোয় না ত খেলা,
ফুরোয় না ত গল্প বলার বেলা!
তাধিন্ তাধিন্ তাধিন।



সীবন-শিল্প

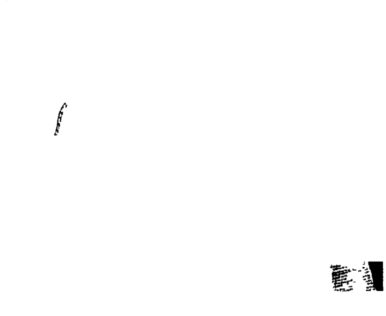
চুনট বা কুচান

১২৩৫ পৃষ্ঠার পর

যখন একখানা বড় কাপড়কে ছোট করিয়া লইতে হয়, তখন ঐ বহৎ কাপড়খানিকে কুঁচাইয়া রাখা প্রয়োজন। এই কুঁচান গিলা কিংবা সূতার দ্বারা হইতে পারে। যখন গিলা দ্বারা কাপড় কুঁচান আবশ্যক, তখন ডান হাতে গিলাটীকে ধরিয়া কাপড়খানি নীচে কোন মসৃণ স্থানে রাখ। পরে যে স্থান কুঁচাইতে হইবে, সেই যায়গায় গিলাটাকে একটু জোরে চাপিয়া ধরিয়া বাম হাতে কাপড়ের অপর কিনারা এমনভাবে চাপিয়া ধর, যেন যখন তুমি গিলাটাকে ঠেলিয়া দিবে, তখন সকল কাপড় সরিয়া না যায়। তারপর আস্তে আস্তে গিলাটীকে ঠেলিয়া সকল কাপড় গিলার নীচে লইয়া আইস। তবেই দেখিবে তোমার কাপড়খানি বেশ সুন্দর কুঁচান হইয়া গিয়াছে।

কিন্তু গিলার কুঁচান চিরস্থায়ী হয় না। যাহা চিরস্থায়ী করা প্রয়োজন, উহাকে সূতা বা ফিতা দ্বারা কুঁচাইয়া রাখা আবশ্যক। মনে করিয়া দেখ, তোমাদের ছোট ভাইবোনদের ইজারের কোমরের একটী দড়ী গলাইয়া লইয়াছ। যখন ইজার তাহাদিগকে পরাইয়া দাও, তখন ঐ দড়িটিকে টানিয়া কোমরের সমান করিয়া বাঁধিয়া দাও। কারণ ইজার খুব ঢিলা আছে। এই যে ছোট করিয়া দেওয়া হইল, ইহাই একপ্রকার কুঁচানর কাজ বা গ্যাদারিং (Gathering)।

সাধারণতঃ ছোট ফ্রক, পেনি, সেমিজের গলা ইত্যাদি নানা প্রকার জামার নানা স্থানে কাপড় কুঁচান থাকে। এই সকল কুঁচান কাজ করিতে হইলে কি নিয়মে করিবে, তাহাই বলিতেছি।

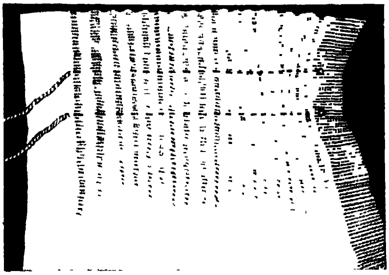


চুনট বা কুঁচান কাজ

যদি একখানা বড় কাপড় অপর একখণ্ড ছোট কাপড়ের সঙ্গে জুড়িতে হয়, তবে এই কুঁচান কাজের প্রয়োজন। এই প্রকার কুঁচাইবার যখনই প্রয়োজন হইবে, তখন কাপড়ের ভিতর দিয়া চিত্রের ন্যায় সূতা ভরিয়া দিয়া সূতা টানিয়া কাপড়খানিকে গুছাইয়া লইবে।

কাপড় কুঁচাইবার চিত্রটি দেখ, তবেই বুঝিতে পারিবে।

প্রথমতঃ সুতার একপ্রান্তে একটি গিরা দাও। পরে ঐ সুতাগাছকে সুঁচের সাহায্যে সাদা ভাবে

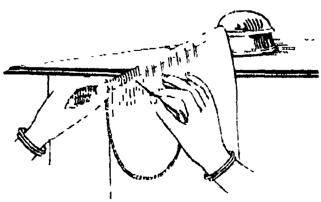


দুই সুতায় কুচান

কাপড়ের ভিতর দিয়া ভরিয়া দাও। ভরিয়া দিয়া সুতাগাছি টানিয়া লইয়া কাপড় কুঁচাইয়া ফেল।

চুনট বা কুঁচি আঁটা

এখন এই সকল কুঁচি কি করিয়া চিরস্থায়ী করা যায়, তাহাই বলিতেছি। সেই কাজটাই হইল Stroking gathers। ইহার চিত্রটী দেখ, তবেই ভাল করিয়া বুঝিবে।

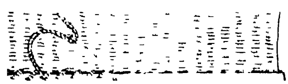


চুনট বা কুঁচি আঁটা

যখন কুঁচি দিবার কাজ করিবে, তখন এইটী বিশেষ লক্ষ্য রাখিবে যে, কুঁচি যেন সকল স্থানে সমান পড়ে। তাহা না হইলে কাজটী বড়ই কুৎসিৎ দেখাইবে।

এখন যে সুতাগাছি কাপড়ের ভিতরে ভরিয়া আনিয়াছ, সেই সুতাগাছি বামহাতে শক্ত করিয়া ধরিয়া একটী সুঁচের সাহায্যে কুঁচিগুলিকে সরাইয়া একত্রিত করিয়া লও। এখন এই চুনট বা কুঁচিগুলিকে একটি পটি দিয়া সেলাই কর। চিত্র দেখ।

যে কাপড়খানার সঙ্গে ঐ কুঁচান কাপড়কে জুড়িতে হইবে, তাহার সঙ্গে সেলাই কর। তৎপর ঐ সেলাইয়ের উপর একটী পটী (Band) লাগাও। কারণ যখনই কোন সাদা কাপড়ের সঙ্গে কুঁচান কাপড় জুড়িতে হইবে, তখন দুইটী কাপড় আলাদা থাকে। যাহাতে সেই দুইটী জোড়া মুখ দেখিতে



কুঁচান কাজে পটি পরান

না পাওয়া যায়, তাহার জন্য একটি চওড়া পটী বা Band জুড়িয়া দিতে হয়।

সেমিজ কাটা

ছোট মেয়েদের জামা কাটা শিক্ষা করিবার সময় প্রথম সহজ মাপগুলি শিক্ষা করিয়া লইতে হইবে। তবে সেমিজ জিনিষটা কাটা যেমন সহজ, ইহাকে সেলাই করাও তদ্রূপ সোজা।

সর্ব্ব প্রথমেই একটী টেপ্ (Tape) লও। এখন টেপের ইঞ্চিগুলি শিক্ষা কর। টেপটীকে হাতে করিয়া দেখ, উহার গায়ে ইংরাজীতে ১-২ লেখা আছে। এইগুলি ইঞ্চির দাগ।

এখনি সেমিজ কাটিতে যাইবার পূর্ব্বে কোনও মেয়ের একটী মাপ লইতে হইবে। তোমাদের ভিতরে কোন একটী মেয়েব মাপ লও। এখন কি কি মাপ, এবং তাহা কোন্ স্থান হইতে কোন্ পর্য্যন্ত লইবে বলিতেছি।. একটু মনোযোগ দিয়া শুনিয়া লও, তবেই হইবে।

ধর যেন মাপ হইল লম্বা, পুট, ছাতি, কোমর।
৪২ ৭॥ ৩৬ ৩২।

লম্বা—কাহারও ঠিক গলার স্থান হইতে পায়ের পাতার আধ হাত উপরে লও। এই লম্বা ৪২ ইঞ্চি।

পুট—পিছনের দুই বাহুর মধ্যবর্ত্তী স্থানটি পুট। ইহার অৰ্দ্ধভাগ ৭॥ ইঞ্চি।

ছাতি—বুকের চারি পাশ ঘুরাইয়া মাপিয়া লও। ইহা যেন ৩৬ ইঞ্চি।

কোমর—ছাতির ন্যায় কোমরেরও চারি পাশ ঘুরাইয়া মাপ লইলেই কোমরের মাপ হইল। ইহা যেন ৩২ ইঞ্চি।

প্রথম ১টী সেমিজ কাগজে কাটিলেই ভাল হয়। পরে আবশ্যক হইলে ঐ কাগজ কাপড়ের উপর বিছাইয়া কাটিবে।

এখন লম্বার মাপ হইতে তিন ইঞ্চি বড় ও চওড়ায় ছাতির মাপের সমান অর্থাৎ ৩৬ ইঞ্চি চওড়া দুই টুকরা কাপড় বা কাগজ লও। তবেই এখন দেখ মাপ লইয়া প্রথমেই কাপড়ের হিসাব দেখা আবশ্যক।

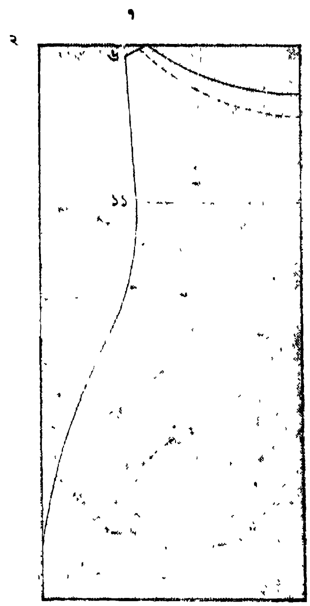
এইবার তোমরা বুঝিতে পারিলে যে, সেমিজ কাটিতে হইলে সকল সময়ই কাপড়ের পরিমাণ হইল লম্বার মাপ হইতে ৩ ইঞ্চি বড় ও চওড়ায় ছাতির মাপের সমান ২ টুক্‌রা কাপড়। সুতরাং তোমাদের সেমিজের এক একখানা কাপড় হইল লম্বা ৪২ + ৩ ইঞ্চি = ৪৫ ইঞ্চি। এবং চওড়া ছাতির মাপের সমান ৩৬ ইঞ্চি।

এখন এই ৪৫ ইঞ্চি লম্বা ও ৩৬ ইঞ্চি চওড়া কাপড় বা কাগজ দুইখানিকে চওড়ার অৰ্দ্ধেক ১৮ ইঞ্চি করিয়া ভাঁজ কর। এই ভাঁজ করা কাপড় বা কাগজ নীচে বিছাইয়া দেখ, চারিখানা ভাগ হইয়াছে। তৎপর ঐ ভাঁজ করা কাপড় কিংবা কাগজের উপর কি করিয়া চিত্রের ন্যায় দাগ কাটিবে বলিতেছি।

প্রথম ছাতির যে মাপ ৩৬ ইঞ্চি লেখা আছে, তাহার চারিভাগের এক ভাগে কত হয় হিসাব কর। হিসাব করিয়া দেখিলে যে, ৩৬ ইঞ্চির চারি ভাগের এক ভাগ হইল ৯ ইঞ্চি।

ধর যেন তোমাদের ভাঁজ করা কাপড় বা কাগজখানার চারিপাশে নম্বর দেওয়া আছে ১ ২ ৩ ৪। ১ হইতে ৪—লম্বার মাপ হইতে ৩ তিন ইঞ্চি বেশী, মোট ৪৫ ইঞ্চি ১ হইতে ২ ও ৪ হইতে ৩ ছাতির মাপ ৩৬ ইঞ্চির অৰ্দ্ধেক ১৮ ইঞ্চি।

এখন ১ হইতে ছাতির মাপ ৩৬এর চারি ভাগের এক ভাগ নয় ইঞ্চি যে হিসাব করিয়াছ, ঠিক



সেমিজ কাটিবার চিত্র

সেই নয় ইঞ্চি নীচে ৯ বসাও। ৯ হইতে ছাতির চারি ভাগের এক ভাগ নয়, আরও ২ ইঞ্চি বেশী অর্থাৎ এগার ইঞ্চি দূরে ১১ বসাও।

৫ হইতে ৬ হইল পুটের মাপ ৭॥ ইঞ্চির সমান। ১ হইতে ৫, ঠিক তিন ইঞ্চি নীচে বসাও।

এখন ১ হইতে ৭ ঠিক চিত্রের ন্যায় যোগ কর।

এখন ৫ হইতে ৭ ও ৬ হইতে ১১, ৩ ঠিক ঐ প্রকার রেখা টানিয়া যোগ করিলেই সেমিজের দাগ কাটা শেষ হইল। পরে একখানি ধারালো কাঁচি লইয়া ৩ হইতে ১১, ৬, এবং ৬ হইতে ৭ পর্য্যন্ত কাটিয়া ফেলিয়া উহাকে খুলিয়া বিছাও। এখন দেখ সেমিজের সামনের একখানা ও পিছনের একখানা—এই দুইখানা টুকরা একেবারেই কাটা হইয়া গেল। এই সময় তোমাদের গায়ে যে সেমিজ আছে তাহা দেখ, উহাতেও দুই টুকরা কাপড়ে সেমিজ তৈয়ারি আছে। উহার দুই পাশে বগলের নীচ হইতে শেষ পর্য্যন্ত সেলাই করিয়া পরে শেষের দিকে মুড়ি ভাঙ্গিয়া কলে সেলাই করা হইয়াছে।

পটী কাটিয়া গলায় আঁটিয়া দিয়া লও। তবেই দেখিবে যে, চাঁদ গলা সেমিজ হইল।

ছোট-বড় সকল সেমিজই এক নিয়মে কাটা হয়। সেমিজের গলা হয় 'ভি' গলা (V), স্কোয়ার গলা, চাঁদ গলা ও সাধারণ গলা। জ্যাকেট সেমিজগুলি একটু কাটা কষ্টকর।

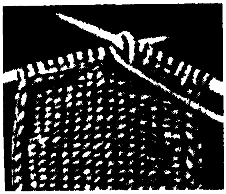
প্রথম প্রথম কাগজের উপর দাগ কাটিবে। পরে তোমাদের কাগজ কাটা দেখিয়া মাষ্টার মহাশয় যখন বলিবেন যে, কাগজ কাটা ঠিক হইয়াছে, তখন কাপড় কাটিতে পারিবে।

সকল জামার কাপড় জলে ধুইয়া শুকাইয়া তবে কাটিবে। কাপড় সকল সময়ই লম্বাভাবে কাটিবে—এই সব কথা মনে করিয়া রাখিও। এইবার চাঁদ গলা সেমিজ হইল।

কমফরটার বুনান

তোমরা পূর্ব্বেই সহজ বুনান কি প্রকারে হইয়া থাকে, তাহা শিক্ষা করিয়াছ, এবং কি প্রকারে একটী কাঁটায় কতকগুলি ঘর তুলিয়া অন্য কাঁটায় নিয়া যাইবে, তাহাও শিক্ষা করিয়াছ। এখন পূর্ব্বের ন্যায় এক কাঁটার ঘর বাড়াইয়া অন্য কাঁটায় লইবে। এই প্রকার করিলেই শেষে কমফরটার (comforter) তৈয়ারি হইবে। চিত্র দেখ, তবে সহজেই বুঝিবে।

তোমরা প্রথম কমফরটার (comforter) কত ইঞ্চি চওড়া করিবে স্থির কর। ধর যেন পাঁচ



কমফরটার বুনান চিত্র

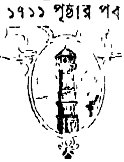
ইঞ্চি চওড়া একটা কমফরটার তৈয়ার করিতে হইবে। এখন প্রথম তোমাদের একটি কাঁটায় ৫ ইঞ্চি চওড়ায় যতগুলি ঘর ধরে, ঠিক ততগুলি ঘর তৈয়ার করিয়া লও। পরে ঐ ঘরগুলি এক এক করিয়া বাড়াইয়া একবার এ কাঁটায় লও, পরে আবার ঐ ঘরভরা কাঁটা বাম হাতে লইয়া ডান হাতের কাঁটাতে ঘর বাড়াইয়া তুলিয়া লও। এই প্রকার ক্রমান্বয় বুনিয়া গেলেই সহজ বুনটের comforter তৈয়ারি হইবে। এখন তোমাদের যত ইঞ্চি লম্বা করিবার ইচ্ছা, ততদূর পর্য্যন্ত বুনিয়া গেলেই লম্বা comforter তৈয়ারি হইল।



ভূ-বিজ্ঞান

শেষ-কথা

১৭১১ পৃষ্ঠার পর



ছোটবেলায় ভূগোলে পড়েছিলে যে, পৃথিবীর চার ভাগের তিন ভাগ জল, আর এক ভাগ স্থল। তারপর এখন এ কথাও শিখলে যে, এই জলে স্থলে অনবরত অদল-বদল আদান-প্রদান চলেছে। ধীরে ধীরে কত সমুদ্র ডাঙ্গা হয়ে যাচ্ছে, কত ডাঙ্গা সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে। পৃথিবীর জলজ শিলার স্তরগুলো সব গড়ে উঠেছিল সাগর গর্ভে। আবার তারা ঝড় বৃষ্টিতে ক্ষয়ে ক্ষয়ে চলে যাচ্ছে সেই সাগর গর্ভে। প্রাণী বল, উদ্ভিদ বল, সবেরই প্রথম সূত্রপাত হয়েছিল সমুদ্রের জলে। সেই আদিকালের জল-মণ্ডলের অতি ক্ষুদ্র জীবাণু আর অতি নগণ্য শ্যাওলাই হয়ে দাঁড়িয়েছে আজকের দিনের কীট-পতঙ্গ, পশু-পক্ষী, নর নারী ইত্যাদি প্রাণী, আর তাল-তমাল বট-অশ্বত্থাদি গাছ। কবি যে গেয়েছেন, "হে আদি-জননী সিন্ধু! বসুন্ধরা সন্তান তোমার, একমাত্র কন্যা তব কোলে," এ অতি সত্য কথা।

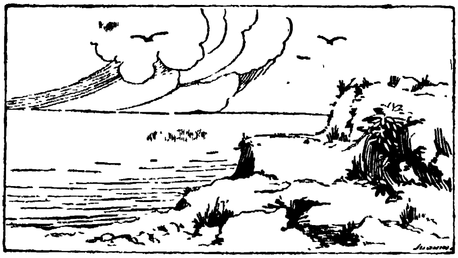
একটা জিনিষ তোমরা তোমাদের স্কুলের গ্লোব-এ নজর করেছ কি? মোটামুটি বলতে গেলে ভূমণ্ডলের মহাদেশগুলো সাজান রয়েছে উত্তর মেরুর চারদিকে। আর মহাসমুদ্রগুলো ঘিরে রয়েছে দক্ষিণ মেরুকে। গ্লোবটাকে আবার একটু তেরচা করে কেটে এমন দুই ভাগ করা যায় যে, একটা ভাগ হবে প্রায় সম্পূর্ণ জলময়। তার ভেতর স্থল! বলতে থাকবে শুধু অষ্ট্রেলিয়া দ্বীপ, আর দক্ষিণ আমেরিকার লেজটুকু। জলস্থলের এরকম অদ্ভুত পরিস্থিতির কোন কারণ ঠিক করা যায় না।

তবে একটা কথা মনে রেখো। বারিমণ্ডল বলে যে একটা সত্যি আলাদা মণ্ডল আছে, তা ত নয়। সমুদ্র মানে ত জলে ঢাকা স্থল বই আর কিছু নয়! নদীতে বান এলে তোমাদের গ্রামের চারদিকের মাঠ, ঘাট, পুকুর-গুলোর যে দশা হয়, সেই রকমই ব্যাপার।

আচ্ছা সমুদ্র কত গভীর তা আন্দাজ করতে পার? এক কথায় এ প্রশ্নের জবাব হয় না, কারণ জল সব জায়গায় সমান গভীর নয়। তবে তোমাদের মোটামুটি ধারণা একটা করে দিতে পারি। সারা পৃথিবীটা যদি রেঁদা মেরে সমান করে নাও, আর তার উপর বারিমণ্ডলের সব জলটা চারিয়ে দাও, ত সে জল হবে আট হাজার ফুট গভীর। কিন্তু মহাসাগরের তলাটা ত সমান নয়, ঠিক মহাদেশের মতই-উঁচু নীচু, অসমতল। তাই সমুদ্রের কোথাও খুব অল্প জল, কোথাও বা অথই জল। ঠিক বেলাভূমির লাগা খানিক দূর অবধি একটা তাকের মতন আছে। সেটাকে তোমরা মহাদেশের ভীত বলতে পার। সেটা যেন সেই মহাদেশেরই জলে ডোবা অংশ। তার পরে এল উঁচু-নীচু ঢেউ-খেলান জমী, যেটা হল

যথার্থ সমুদ্রতল। এই সমুদ্রতলের মাঝে মাঝে আবার খুব গভীর প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড গর্ত, ফাটল ইত্যাদি আছে। ডাঙ্গার উপর যেমন পাহাড়ের চূড়া, পর্ব্বত-শ্রেণী, উপত্যকা, মালভূমি আছে, জলের তলাতেও সেই রকম ব্যাপার কত রয়েছে। এমন এমন সব গহ্বর আছে, যার মধ্যে আমাদের গৌরী-শঙ্কর শৃঙ্গকেও অবাধে ডুবিয়ে দেওয়া যায়। শুধু কি তাই! সাগরগর্ভে গাছ পালা, বন-জঙ্গলেরও অপ্রতুল নেই। আর সেই বনজঙ্গলের ভিতরে বেড়ায় কত ভীষণ ভীষণ জন্তু-জানোয়ার, যারা ডাঙ্গার বাঘ-ভালুক সিংহের চেয়ে একটুও কম যায় না।

সমুদ্রমণ্ডলের জল যদি খানিকটা কোন ভৌতিক উপায়ে শুকিয়ে দেওয়া যায়, তাহলে কিনারা বরাবর যে তাক বা ডাঙ্গার ভিত আছে, সেটা বেরিয়ে পড়বে। কিন্তু মজা এই যে, তখনও সাগর-তটের সীমারেখা বিশেষ কিছু বদলাবে না। এখন যেখানটা সোজা আছে, সেখানটা সোজাই থাকবে। যেখানটায় যেমন বাঁক আছে, মোটামুটি তেমনই বাঁক থাকবে। তবে এক এক জায়গায় খুব মজা হবে। লঙ্কাদ্বীপ ভারতবর্ষের সঙ্গে জুড়ে যাবে। অষ্ট্রেলিয়া আর তার কাছাকাছি দ্বীপগুলো এক অখণ্ড মহাদেশ হয়ে যাবে। এটা হবে এই জন্য যে, ঐ সব জায়গায় সমুদ্রের খোল অত্যন্ত কম। পৃথিবীর নকশা ভাল করে দেখলে তোমাদের নজরে পড়বে যে, অনেক দেশে ডাঙ্গার পর্ব্বতশ্রেণী সমুদ্রের ভেতর দিয়ে একেবারে লম্বা হয়ে চলে গেছে। ফলে সেই সেই জায়গায় দেখতে পাবে যে, সারিসারি দ্বীপের মালা জলের ভেতর থেকে মাথা বের করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। ভারতবর্ষের পশ্চিম সীমা থেকে দূর আফ্রিকা পর্য্যন্ত এই রকম সারবন্দি ছোট ছোট দ্বীপ দেখতে পাওয়া যায়।

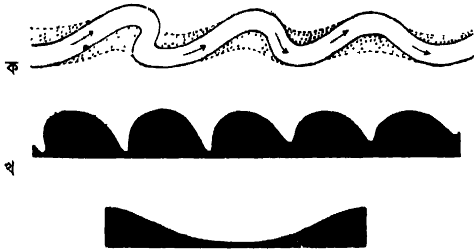


সমুদ্র ও বেলা ভূমি

সমুদ্রতলের গহ্বরগুলো সম্বন্ধে একটা কথা তোমাদের জানা উচিত। যেখানে কিনারার কাছে যত উঁচু পাহাড়, সেইখানেই তার লাগা সমুদ্রে তত অগাধ জল। ভারতের পশ্চিমঘাটের লাগা সমুদ্র খুব গভীর, কিন্তু বাংলা দেশের সমতটের লাগা সমুদ্রের জল খুব কম।

ভূ-তত্ত্বের কথা ভাল করে বুঝতে হলে বারি-মণ্ডলে ও বায়ুমণ্ডলের বিষয়েও কিছু কিছু জানা চাই। এর প্রথম কারণ এই—ঝড়, বৃষ্টি, তুষার-পাত, শিলাবৃষ্টি—এ সমস্তই বায়ুমণ্ডলের খেলা, আর প্রধানতঃ ঝড়-বৃষ্টির ফলেই ক্ষিতিমণ্ডলের উপর নদ-নদী, পাহাড়-পর্ব্বত, উপত্যকা-অধিত্যকাদি প্রকৃতিদেবীর কারুকার্য্য সব দেখা দিয়েছে। আগে তোমাদিগকে অনেকবার বলেছি যে, পৃথিবীর ডাঙ্গার ভাগটা অনবরত ক্ষয়ে যাচ্ছে। শুধু যে জলের তোড়ে ক্ষয়ে যাচ্ছে তা নয়, হাওয়া লেগে লেগেও খুব কঠিন গ্রানিট্ বা সল্ট শিলা পর্য্যন্ত পচে খসে পড়ছে। বায়ুমণ্ডলে যে কার্ব্বনিক এসিড, গ্যাস বা কয়লা-পোড়া ধোঁয়া আছে, সেই হচ্ছে এই ধ্বংসের কাজে হাওয়ার প্রধান সহায়। খসে পড়া, ধসে-পড়া এই সমস্ত পাথর মাটি আবার জলের তোড়ে বরফের চাপে ক্রমাগত নড়ে নড়ে উঁচু জায়গা থেকে নীচু জায়গায় চলে যাচ্ছে। সব চেয়ে নীচু জায়গা ত সমুদ্র। তাই ডাঙ্গা-ধোয়া যত কাঁকর-বালি-মাটি তার বেশীর ভাগ গিয়ে পড়ছে সমুদ্রের জলে। সমস্তটা কিন্তু অতদূর পৌঁছচ্ছে না। নদীর স্রোতের সঙ্গে মিশে সাগরের পানে যেতে যেতে অনেক ধুলো-বালি আবার নদীর দু-পাশে পলি মাটি হয়ে পড়ে থাকে। সেখানে থিতিয়ে পড়ে নূতন নূতন দেশের সৃষ্টি করে। তোমরা নক্সাতে গঙ্গা বা নাইল-এর মোহনাতে যে উর্ব্বর সমৃদ্ধ দেশ দেখতে পাও, তা এই পলি-মাটি দিয়েই গড়া। সমতল দেশ দিয়ে বয়ে যাবার সময়ে নদীর বাঁকে বাঁকে যে চড়া পড়ে, তার একটা

ছবি দিচ্ছি (ক)। তোমাদের মধ্যে যারা পাড়াগেঁয়ে ছেলেমেয়ে, তারা ত দেখেইছ যে, আমাদের বাংলা দেশে নদীর জলস্রোত কেমন করে সরে সরে যায়, আর নূতন নূতন জায়গায় চর পড়ে। এই জন্য



(ক) নদীর বাঁকের চড়া, (খ) বিস্তৃত উপত্যকা

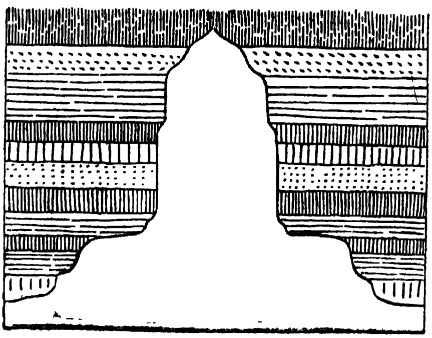
পলিমাটির দেশে ম্যাপ এর চেহারা ক্রমাগত বদলে বদলে যায়। ক্ষিতিমণ্ডলের ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারে নদীগুলো তিন রকম কাজ করে। প্রথমে ভাঙ্গে, তার পর সেই ভাঙ্গা চোরা পদার্থ বয়ে নিয়ে যায়, আর সব শেষে তার মোহনার কাছে নূতন দেশ গড়ে তোলে। নদী তার প্রথম বয়সে মাটিতে কি রকম সরু সরু খাড়া খাড়া পথ কেটে নেয়, আর ধীরে ধীরে সেই পথগুলো মিলে কি রকম বিস্তৃত উপত্যকা তৈরি হয়, তা দেখাবার জন্য একটা ছবি দিচ্ছি (খ)। এটা হয় এই জন্য যে, নদীও যেমন মাটি কেটে আপন পথ করে নিচ্ছে, বৃষ্টির জলও তেমনই বছরের পর বছর দুই পাড় ধুয়ে ধুয়ে ঢালু করে দিচ্ছে। কিন্তু যখন নদীর পাড় মাটির না হয়ে শক্ত পাথরের হয়, অর্থাৎ যখন কোন খরস্রোতা নদী পাহাড় পর্ব্বতের মাঝ দিয়ে বয়ে যায়, তখন কি হবে, বল দেখি? নদী স্রোতের জোরে পাথর কেটে নিজের রাস্তা করে নেবে বটে, কিন্তু বৃষ্টি তার দুই পাড় ধুয়ে ঢালু করে দিতে পারবে না। কেন না কঠিন পাথরকে ধুয়ে খেয়ে নিতে বৃষ্টির জলের অনেক হাজার বছর লাগে। তা হলে খরস্রোতা পাহাড়ে নদীর চেহারা কি রকম হবে? ইংরাজী V অক্ষরের মতন। দুধারে দেওয়ালের মত খাড়া পাহাড় আর মধ্যখান দিয়ে ভীম বেগে বয়ে চলেছে গভীর জলস্রোত। ঠিক এই জিনিষই দেখতে পাওয়া যায় জব্বলপুরের কাছে, যেখানে নর্ম্মদা নদী শ্বেতপাথরের পাহাড় কেটে প্রচণ্ড-বেগে বয়ে চলেছে। নদীর স্রোতে পাহাড়ের মাঝে যে সঙ্কীর্ণ গিরিপথ তৈরী করে নেয়, তার ইংরেজী নাম Gorge বা Ravine। পৃথিবীর মধ্যে বিখ্যাত Gorge উত্তর আমেরিকার Grand Canyon। কলোরাডো নদীর প্রখর স্রোত পর্ব্বত কেটে তিনশো মাইল লম্বা এই আশ্চর্য্য Canyon তৈরি করেছে। আমাদের দেশে সিন্ধু ও ব্রহ্মপুত্র নদ যেখানে হিমালয়ের পর্ব্বতশ্রেণী ভেদ করে ভারতবর্ষের মধ্যে ঢুকেছে, সেখানেও অতি সুন্দর সুন্দর Conyon আছে। তবে এই Canyonগুলি রয়েছে দুর্গম জায়গায়। হয়ত তোমাদের দেখার সুযোগ হবে না। কিন্তু তোমরা বাবা-মাকে ধরে একবার জব্বলপুরের নর্ম্মদা দেখে এসো। সেখানে যে শুধু গিরিসঙ্কট দেখবে, তা নয়। অতি চমৎকার এক জলপ্রপাতও দেখতে পাবে, যেখানে নর্ম্মদানদী গিরিপথ থেকে বেরিয়ে ভীষণ বেগে পাহাড়ের এক তাক থেকে বারো হাত নীচে আর এক তাকে পড়ছে। চারদিকের পাথর দুধের মত সাদা। বড় বড় জলপ্রপাত পৃথিবীতে অনেক আছে, কিন্তু



'গ্রাণ্ড কেনিয়ন্'—পৃথিবীর সর্ব্বাপেক্ষা বড় কেনিয়ন্

শ্বেত-পাথরের মাঝে এই নদী প্রপাতের যে আশ্চর্য্য সৌন্দর্য্য তা আর কোথাও দেখতে পাবে না। তোমাদের মধ্যে যারা গিবিডি বেড়াতে গেছ, তারা নিশ্চয়ই উসরী নদী দেখেছ। এই নদীর জলপ্রপাত ছোট হলেও বড় মনোরম। উসরীও অন্য পাহাড়ে নদীর মত পাথর কেটে আপন পথ করে নিয়েছে।

তোমরা মনে করো না যে, নদীর স্রোত কেবল ধুলো-বালিই বয়ে নিয়ে যেতে পারে। অনেক সময় বড় বড় পাথরের চাঙড়া বহুদূর অবধি গড়িয়ে গড়িয়ে নিয়ে চলে। চাঙড়াগুলো পরস্পরের সঙ্গে ধাক্কা লেগে ভেঙ্গে ছোট ছোট নুড়ি হয়ে যায়। ঘষে ঘষে ক্ষয়ে ক্ষয়ে সেই নুড়িগুলোর উপরটা যে কি সুন্দর পালিশ হয়, তা তোমরা নিশ্চয়ই দেখেছ। যারা হরিদ্বারের মতন যায়গায় বেড়াতে যায়, তারা কত বিচিত্র বর্ণের এই নুড়ি নিয়ে আসে।



'কেনিয়ন'

পুরাকালে বরফের যুগে যখন আমাদের পৃথিবীর অনেক অংশ বরফে ঢাকা থাকত, সর্ব্বত্র Glacier বা জমাট তুষারের নদী বইত। এখন সে রকম নদী দেখতে চাও ত খুব উঁচু পাহাড়ে চড়তে হবে। সে সুযোগ তোমাদের অনেকেরই হয়ত হবে না। তাই তুষার নদীর তোড়ে যে ভাঙ্গা-গড়া কাজ হয়ে গেছে বা আজও পর্ব্বত-শৃঙ্গে হচ্ছে, সে সম্বন্ধে এখানে কিছু বলব না। তবে মনে রেখো যে, আমাদের বসুমতী মূর্ত্তি গড়ার কাজে এরাও যথেষ্ট সাহায্য করেছে।

এইবার বায়ুমণ্ডলের কথা বলি, শোন। আগেই তোমাদিগকে বলেছি যে, হাওয়ার মধ্যে যে অক্সিজেন, কয়লা পোড়া ধোঁয়া ও জলের বাষ্প আছে, তারা ধীরে ধীরে অতি-বড় কঠিন শিলাকেও পচিয়ে ফেলতে পারে। কিন্তু শুধু তাই নয়। তুষার-স্রোত ও জল-স্রোতের মত বায়ু-স্রোতও ধুলো-বালির কণাকে বহুদূর পর্য্যন্ত বয়ে নিয়ে যেতে পারে। চীন দেশে ও আমাদের বেলুচিস্থানে এক এক যায়গায় দেখা যায় যে, চারিদিকের জমী Loess বলে এক রকম খুব মিহি ধূলিকণায় ঢাকা। পণ্ডিতেরা বলেন যে, এই ধূলিকণা অনেক দূর হতে ঝড়ে উড়ে এসে এসে পড়েছে। আমাদের দেশে পশ্চিমে আঁধি বা Dust Storm হয়, শুনেছ ত? হঠাৎ দূরে আকাশের এক কোণে একখানা প্রকাণ্ড কালো মেঘ দেখা যায়। মিনিট কয়েকের মধ্যে সেই কালো মেঘ চারিদিক অন্ধকার করে এসে পড়ে, ঘর-দোর, পথ-ঘাট বালিতে ঢেকে দিয়ে এগিয়ে চলে যায়। সে মেঘে এক ফোঁটা বৃষ্টিও নেই, কেবল ধুলো-বালি। হয়ত একশ ক্রোশ দূরের কোন মরুভূমি থেকে তুলে নিয়ে এসেছে সেই বালির রাশি। মরুভূমির বর্ণনা তোমরা নিশ্চয় অনেক পড়েছ। আমি তাই ও-বিষয়ে বেশী কিছু বলব না। তবে Dunes বলে যে সব বালির পাহাড় মরুদেশে দেখা যায়, সেগুলো সব ঝড়ের কীর্ত্তি। আজ এখানে পাহাড় রয়েছে, কাল ঝড়ের পর দেখা গেল সব জমীটা সাফ হয়ে গেছে, আর দুই ক্রোশ দূরে এক নূতন পাহাড় মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে।

তোমরা আগেই শিখেছ যে, ডাঙ্গা হতে ভাঙ্গা-চোরা বালি-কাঁকর অনবরত এসে সাগরের জলে থিতিয়ে পড়েছে। আর সাগর সেই বালি-কাঁকরকে আপন গর্ভে ধারণ করে নানা রকমের শিলা গড়ে তুলছে। কিন্তু পৃথিবীর ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপারে সমুদ্রের কাজ যে শুধু এইটুকু, তা নয়। নদী যে বালি-কাঁকর বয়ে এনে দেয়,

এসিয়ার পাখী



(১) বাবুই, (২) বন্য কপোত, (৩) একজাতীয় টিয়াপাখী, (৪) লাল কাঠঠোকরা, (৫) ভারতীয় ময়না, (৬) বন্য কুক্কুট, (৭) পাতি হাঁস, (৮) সাসা (Cissa), (৯) চিত্রিত কাদাখোঁচা, (১০) ব্লু-পাই (Blue-Pie), (১১) বন-মোরগ (Grouse)

তার অনেকটা সমুদ্রের ঢেউগুলো বেশ করে চারিয়ে বেলাভূমির উপর বিছিয়ে দেয়। আর



'জিয়ন-কেনিয়ন'

কাদা-মাটি শুদ্ধ খানিকটা জলের ভেতর বহুদূর পর্য্যন্ত টেনে নিয়ে যায়। যেখানে সমুদ্রতীরে খাড়া পাহাড় আছে, সেখানে আর এক ব্যাপার হয়। পাহাড়ের গায়ে দিবা-রাত্র অবিশ্রান্ত ঢেউ-গুলো আছড়ে আছড়ে পড়ার দরুণ ধীরে ধীরে পাথর ক্ষয়ে ক্ষয়ে গুহা, থাম, খিলান ইত্যাদির মতন কত রকম বিচিত্র পদার্থ গড়ে ওঠে।

এই রকম বিচিত্র কারুকার্য্য যে কেবল সমুদ্রের ধারে দেখা যায়, তা নয়। মহারাষ্ট্র দেশে মালভূমির উপর দেখেছি যে, কঠিন আগ্নেয় শিলার স্তূপের উপর যুগ-যুগান্তর ধরে ঝড়-বৃষ্টির ঝাপটা লেগে পাথরগুলো কত রকম অদ্ভুত মূর্ত্তি ধারণ করে। কোথাও বা মনে হয় দূরে পাহাড়ের মাথায় একটা প্রকাণ্ড হাতী বসে রয়েছে। কোথাও বা মনে হয় তিন-চার জন রাক্ষসের মত মানুষ পাহাড়ের চূড়ার উপর দাড়িয়ে তোমার দিকে তাকাচ্ছে।

জল-ঝড়ের তোড়ে বসুন্ধরার মূর্ত্তি আজও কি রকম বদলে বদলে যাচ্ছে, তা ত শিখলে। কিন্তু ভূগর্ভের আগুনের কথা ভুললে চলবে না। আগে তোমাদিগকে বলেছি যে, এই আগুনের পরিচয় আমরা পাই জ্বালামুখী পর্ব্বত, গরম জলের ঝরণা ও ভূমিকম্প হতে। জ্বালামুখী পাহাড় আজও আমাদের এই শান্তির যুগে মাঝে মাঝে পাগলা হয়ে ওঠে। ভূমিকম্প আজও থেকে থেকে চারদিক বিধ্বস্ত করে। কিন্তু ক্রমশঃ পৃথিবীর গোলক যত জুড়িয়ে আসছে, ক্ষিতিমণ্ডলের শক্ত খোসাটা যত পুরু হয়ে আসছে, ভূগর্ভের আগুনের তাণ্ডবও তত কমে আসছে। তবে এ রকম ত আর চিরদিন ছিল না! বসুমতীর প্রথম জীবনে, যখন তার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ আরও নরম ছিল, তখন এই আগুনের খেলা ভয়ানক ছিল। চতুর্দ্দিকে জীবন্ত জ্বলন্ত আগ্নেয়গিরি, আকাশ ধোঁয়াতে ধোঁয়াতে অন্ধকার, ক্রমাগত গুড় গুড় গুড়ুম করে হাজার হাজার তোপের মত আওয়াজ, মাঝে মাঝে ভীষণ ভূমিকম্প! সেই ভূমিকম্পের ফলে কোথাও হাজার হাজার মাইল জমি লাফিয়ে উঠে নূতন পর্ব্বত শ্রেণীর সৃষ্টি হচ্ছে, কোথাও বা বিস্তীর্ণ ভূমিখণ্ড নেমে পড়ে সমুদ্র হয়ে যাচ্ছে। যেখানে পর্ব্বত শ্রেণী মাথা তুলে দাঁড়াচ্ছে, তার লাগা জমীটা গভীর সমুদ্র হচ্ছে। কেন না, দাঁড়িপাল্লা



'ব্রাইস কেনিয়ন'

ঠিক থাকা চাই ত! আমাদের হিমাচল যখন উঠলেন, তার দক্ষিণের ভূ-ভাগটা নীচু হয়ে জলে ভরে গেল। কালের গতিতে আবার ধীরে ধীরে

পলি পড়ে সে সমুদ্র গেল হটে, আর গড়ে উঠল আমাদের আর্য্যাবর্ত্ত।

দাক্ষিণাত্যের ব্যাপার অন্য রকম। পূর্ব্বঘাট, পশ্চিমঘাট আর উত্তরে বিন্ধ্যগিরি, এর মাঝে যে তিন-কোণা মালভূমি আছে, তাকেই দাক্ষিণাত্য বলে। পুরাকালে বহু যুগ ধরে নানা গর্ত্ত-ফাটল দিয়ে ভূগর্ভের গলা পাথর বেরিয়ে এই মালভূমির সৃষ্টি হয়েছিল। গলা পাথর বেরিয়েছে আর চারিয়ে পড়েছে, বেরিয়েছে আর চারিয়ে পড়েছে, এইরকম বারবার হয়ে এই উঁচু সমতল প্রদেশ গড়ে উঠেছিল। কিন্তু যে রকমটী গড়ে উঠেছিল, তা ত রইল না! মালভূমির উপর বৃষ্টির জল পড়তে লাগল, আর সেই জল সাগরে পৌঁছে দেবার জন্য ছোট বড় অনেকগুলো নদীর পত্তন হল। নদীগুলো ক্রমশঃ সেই শক্ত মাটির উপর আপন আপন পথ কেটে নিতে লাগল। যেটা ছিল প্রায় সমতল মালভূমি, সেটা হয়ে গেল এক উঁচুনীচু ঢেউখেলান পাহাড়ে প্রদেশ। বিশেষ করে তার দুই কিনারা পূর্ব্ব ও পশ্চিম ঘাট ত জলের তোড়ে কেটে-কুটে এমন চিত্র-বিচিত্র হয়ে গেল যে, হঠাৎ তার চেহারা দেখলে আজ আর সহজে বোঝা যায় না—এ পর্ব্বত আগ্নেয় শিলা দিয়ে গঠিত। তবে দাক্ষিণাত্যে ঘুরে বেড়ালে একটা জিনিষ সহজেই তোমাদের নজরে আসবে। পাহাড়-গুলোর মাথা দেখবে প্রায়ই চ্যাপটা, টেবিলের উপরটার মতন। এ দৃশ্য হিমালয়ে দেখতে পাবে না।

আগের এক পরিচ্ছেদে তোমাদিগকে ছবি এঁকে বুঝিয়ে দিয়েছি, কি রকম করে ভূগর্ভের আগুনের ধাক্কায় পুরানো জলজ-শিলার স্তরগুলো এঁকে বেঁকে দুমড়ে যায়। এই রকমে দুমড়ে গিয়ে যখন একটা প্রদেশ মাথা চাড়া দিয়ে উঠে পড়ে, তাকে পণ্ডিতেরা নাম দিয়েছেন Fold পর্ব্বত। হিমালয় Fold পর্ব্বত, কিন্তু দক্ষিণের ঘাটগুলো নয়।

তা'হলে আর একবার অল্প কথায় আবৃত্তি করা যাক, তোমরা কি কি শিখলে। যখন পৃথিবীর প্রথম জন্ম হল, তখন সে তপ্ত গনগনে বাষ্পের গোলা। সে গোলা যেমন জুড়াতে লাগল, তার উপর একটা সর পড়তে থাকল। এই সর বা গাদলা জমে জমে, পুরু হয়ে হয়ে আমাদের আবাসভূমি এই ক্ষিতিমণ্ডল গড়ে উঠল। কিন্তু তরল অবস্থায় ভূমণ্ডলের উপরটা যে রকম সমান ছিল, তা ত রইল না। সর যত জমাট বাঁধতে লাগল, তত তার উপরটা কুঁচকে কুঁচকে অসমান এবড়ো-খেবড়ো হতে থাকল। এই রকম যে ঘটে, তা তোমরা কাদা কি পাঁক শুকোবার সময় নিশ্চয় দেখেছো। তা'হলে বুঝলে ত যে, কঠিন হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর খোলটা কোঁকড়ান কোঁকড়ান অসমতল হয়ে গেল। এর মধ্যে আর এক কাণ্ড হয়ে গেছে। পৃথিবীর দেহস্থ দুই গ্যাস—নাম হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন—মিলে জল বলে এক পদার্থের সৃষ্টি হয়েছে। এই জল একবার বাষ্প হয়ে আকাশে ওঠে, আবার বৃষ্টির রূপে মাটিতে পড়ে, আবার বাষ্প হয়ে উবে যায়, আবার বৃষ্টি হয়ে পড়ে' এইরকম বারবার হতে হতে নীচু জায়গা-গুলো জলে ভরে যেতে লাগল। এতদিনে পৃথিবীর বাইরের খোসাটা জুড়িয়ে গেছে। জল এখন আর পড়বামাত্র ফোঁস করে বাষ্প হয়ে উবে যায় না। তবু জলের একটা গুণ এই যে, যত ঠাণ্ডা হোক না কেন, জল ধীরে ধীরে শুকিয়ে যাবেই। কাজেই পৃথিবীতল জুড়িয়ে যাবার পরেও মেঘ বৃষ্টি কিছু বন্ধ হল না। বৃষ্টি সমানে পড়ছে যুগ-যুগান্তর ধরে, আর সেই বৃষ্টির জল সমুদ্রে গড়িয়ে যাবার চেষ্টায় হাজার হাজার নদ-নদী, হ্রদ-বিল সৃষ্টি হচ্ছে। ভূগর্ভের আগুনের ধাক্কাধাক্কি ক্রমশঃ অনেক কমে গেলেও কিছু বন্ধ হয়ে যায় নি। জলে আর আগুনে মিলে বসুন্ধরাকে আজও নিত্য কত নূতন সাজে সাজাচ্ছে।

আমার ভূতত্ত্বের গল্প শেষ হয়ে গেল। ভূমি-তলের আজকের অবস্থা তোমরা ভূগোল পড়ে শিখবে।

শুধু একটা কথা বাকী আছে। কথাটা সহজ নয়। আমি বেশী লিখলে তোমরা পড়বে না। পড়লে হয়ত বুঝতেও পারবে না। তবু কথাটা সংক্ষেপে তোমাদিগকে বোঝাতে চেষ্টা করা আমার কর্ত্তব্য। আচ্ছা, এই যে আমাদের জননী বসুন্ধরা, এঁর বয়স কত? প্রথমেই একটা ফুলবাগানের গল্প বলেছিলাম, মনে আছে? গোলাপ আর রজনীগন্ধা বাগানের বুড়ো মালীর বয়সের বিচার করতে গিয়ে স্থির করলে যে, মালী চিরদিনই ঐ রকম থুড়থুড়ে বুড়ো রয়েছে। আমরা সেই রকম

বলতে পারি যে মানুষের জীবনের তুলনায় পৃথিবীর বয়সের হিসাব হয় না। কিন্তু পণ্ডিতেরা ত তাই বলে চুপ করে থাকতে পারেন না! তাঁরা এ বিষয়ে অনেক জল্পনা-কল্পনা করেছেন। তার একটু-আধটু আভাস তোমাদিগকে দিচ্ছি। প্রাচীন ইহুদীরা বিশ্বাস করত যে, মানবজাতি যত দিনের পৃথিবীও তত দিনের। বাইবেলের প্রথম পরিচ্ছেদ Genesis পড়ে ত এই মনে হয়। খৃষ্টান ও মুসলমানদেরও বিশ্বাস এইরূপই। কিন্তু আমাদের প্রাচীন হিন্দু পণ্ডিতদের মতামত অন্য রকম ছিল। তাঁরা বলে গেছেন, সৃষ্টির বহু বহু যুগ পরে পৃথিবীতে মানুষের জন্ম হয়। আধুনিক বিজ্ঞানের বক্তব্য তাই। কাজেই ভূগর্ভের পুরানো পাথরের স্তরে যে সব কঙ্কাল পাওয়া গেছে, তার বয়স থেকে পৃথিবীর বয়স ঠিক হয় না। পূর্ব্বে এক ছক এঁকে দিয়েছিলাম, সেটা দেখলেই বুঝতে পারবে যে, বিজ্ঞানের চোখে মানুষ কতটা একেলে জীব।

নানা পণ্ডিত নানা শাস্ত্রের দিক থেকে পৃথিবীর বয়স স্থির করবার চেষ্টা করেছেন, কিন্তু দুঃখের বিষয় এই যে, এক পণ্ডিতের হিসাবের সঙ্গে অন্য পণ্ডিতের হিসাব মেলে না।

আজ অবধি যা জানা গেছে, তাতে মনে হয়, জলজ শিলার স্তরগুলো প্রায় সাত লক্ষ ফুট গভীর। নাইল নদীর মোহানায় দেখা গেছে যে, এক ফুট বালি পড়তে প্রায় পাঁচশো বছর সময় লাগে। এক ফুট পলি জমাট বেঁধে যে শিলা হয়, তার মাপ এক ফুটের চেয়ে ঢের কম। তা'হলে ত্রৈরাশিক কষে হিসাব কর, সাত লক্ষ ফুট শিলা গড়ে উঠতে কত বছর লেগেছে? হিসাবের ফল হয় সাড়ে সতের কোটি বছর।

আর এক রকম হিসাবের কথা শোন। সমুদ্রের জলে যে নুন আছে, সে নুন ত নদীগুলো ডাঙ্গা থেকে নিয়ে জোগাচ্ছে। পণ্ডিতেরা বলেন যে, সব নদ-নদী মিলে বছরে মোট সাড়ে পনের কোটি টন নুন সমুদ্রে ঢালছে, আর সবশুদ্ধ সমুদ্রে সাড়ে বারশো টন্ নুন আছে। তা'হলে আবার ত্রৈরাশিক কষ। ফল পাবে আট কোটি বছর। থেকে আর এক হিসাব করা হয়। উরেনিয়ম বলে এক ধাতু আছে, সে ধাতু ক্রমাগত ভেঙ্গে হিলিয়ম গ্যাস ও সীসে হয়ে যাচ্ছে। কতখানা উরেনিয়ম থেকে কতখানা সীসে কত বছরে তৈরি হয়, তা জানা আছে। কাজেই ভূ-গর্ভের স্তরে সীসে পাওয়া গেলে সেটা কত বছরের পুরানো তাও অঙ্ক কষে পাওয়া যায়। এই হিসাবের ফলে সব চেয়ে পুরানো শিলার বয়স দুশো কোটি বছর স্থির হয়েছে।

জ্যোতির্ব্বিদ পণ্ডিতের হিসাবের ফল আরও চমৎকার। তাঁরা মোটামুটি স্থির করেছেন যে, সূর্য্যমণ্ডলের বয়স আটশো কোটি হতে পনেরশো কোটি বছর। Jeans সাহেব ত বলেন, সূর্য্যমণ্ডলের সত্যি বয়স আরও অনেক বেশী—প্রায় আট লক্ষ কোটি বছর।

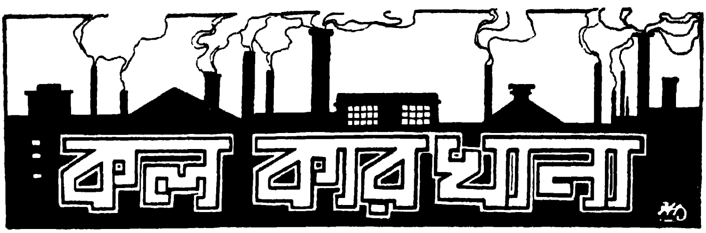
কাজেই বলতে হচ্ছে যে, আমাদের জননী বসুন্ধরার বয়স আজও স্থির হয় নি, স্থির হওয়ার সম্ভাবনাও খুব কম। তবে তিনি অতি প্রাচীন, এত প্রাচীন যে, সে সম্বন্ধে কোন স্পষ্ট ধারণাও হয় না।

এখন যদি তোমরা গোড়া হতে শেষ পর্য্যন্ত মিলিয়ে আর একবার বেশ মন দিয়ে ভূ-বিজ্ঞান পড, তা'হলে বুঝতে পারবে যে, আমি তোমাদের কাছে জননী বসুন্ধরার সৃষ্টি হতে আরম্ভ করে যা কিছু জানবার প্রয়োজন, তার প্রায় সব কথাই বলেছি।

অনেক দিন আগে আমাদের দেশের একজন কবি গেয়ে ছিলেন—

এই ভূমণ্ডল, দেখ কি সুখের স্থান,
সকল প্রকারে সুখ করিতেছে দান।

এ কথা কি সত্য নয়?—আমাদের খাওয়া-পরা, চলা-ফেরা, দেখা-শুনা, ঘর-বাড়ী, জিনিষ-পত্র, যা কিছু প্রয়োজন—সে সবই পাই জননী বসুন্ধরার কাছ হতে। কাজেই, যে মাটিকে আমরা পদতলে দলিত করে যাই, সে যে সত্য সত্যই মা—টি, তাতে বিন্দু মাত্রও সন্দেহ নাই। এই বসুন্ধরার বুকেই আমাদের জন্ম, আর এই মায়ের বুকেই আমাদের শেষ নিঃশ্বাস ফেলে অজানা দেশে চলে যেতে হয়।



ছাপার কথা

১৫৭ পৃষ্ঠার পর

'ছাপাখানার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে ছাপার অক্ষরের আবিষ্কার ও মুদ্রাযন্ত্রের কথা পূর্বেই বলা হইয়াছে। গুটেনবার্গের সময় যে কাঠের ছাপাকল ও সীসার অক্ষর ব্যবহৃত হইত, আধুনিক ছাপাকল ও অক্ষরের সঙ্গে তাহার অনেক প্রভেদ। তখনকার দিনের ছাপাও অনেক কষ্টসাধ্য ও সময় সাপেক্ষ ছিল। ছাপার কাগজ, কালী প্রভৃতি সরঞ্জামেরও উন্নতি সে সময়ে বিশেষ কিছুই হয় নাই। কিন্তু এতপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও গুটেনবার্গের ছাপা বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তক ছাপার পরিপাট্য হিসাবে বেশ ভালই হইয়াছিল। আজও গুটেনবার্গের ছাপা দু'চারটি বই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর প্রায় ৬০০ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে ছাপারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

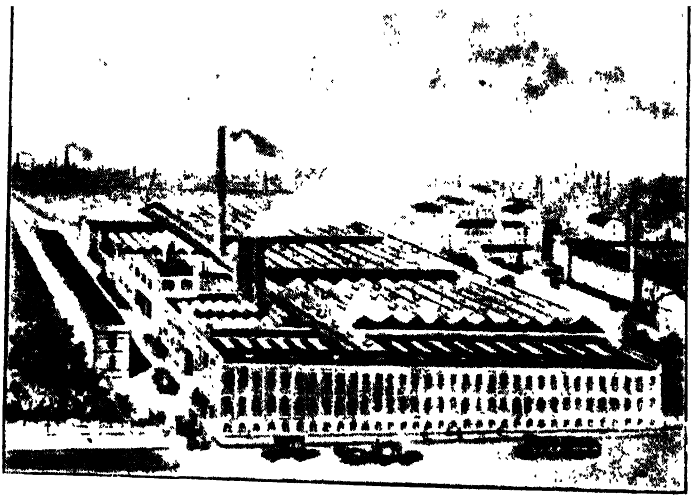
অক্ষর ঢালাইএর জন্য প্রথমে কোনও কল আবিষ্কৃত হয় নাই। ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতু হাতার সাহায্যে ঢালিয়া এক একটি অক্ষর ঢালাই করিতে হইত এবং প্রত্যেকটি অক্ষরকে ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইত। ধাতু গালাইবার উপযুক্ত পাত্রের অভাবে সকল সময় অক্ষরের 'পান' (temper) ঠিক থাকিত না—কখনও নরম হইয়া যাইত, কখনও ভঙ্গুর হইত। এইভাবে অক্ষর-ঢালাই করা কত সময়, পরিশ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্রমে অক্ষর ঢালাইএর কল আবিষ্কৃত হইল; ধাতু গলাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল; সীসার সহিত তামা, এণ্টিমনি (antimony) বিস্‌মাথ (bismuth) প্রভৃতি ধাতু মিশাইয়া অক্ষরকে বহুকাল স্থায়ী করার ব্যবস্থা হইল। প্রথমে ইস্পাতের উপর হাতে মূল অক্ষরটি কাটিয়া তাহা হইতে তামার ছাঁচ প্রস্তুত করা হইত। বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন আকারের প্রত্যেকটি অক্ষর এক একটি করিয়া হাতে কাটিতে হইত। আধুনিক প্রণালীতে প্রত্যেক প্রকারের অক্ষরের বড় আকারের এক একটি অক্ষর কাটিয়া, কলের সাহায্যে তাহা হইতে ইচ্ছামত ছোট মূল অক্ষর অল্প সময়ে এবং অল্প আয়াসে খোদাই করা হয়।

কাঠের ছাপা-কলের আবিষ্কারের অল্প কয়েক বৎসর পরেই লোহার কল প্রস্তুত হইল। এই শ্রেণীর কল (Hand-press বা হাত-কল) আজও আমাদের দেশে

দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 'চিলে' (Columbian) এবং 'এল্‌বিয়ন' (Albion) নামে পরিচিত। দুই তিন শত বৎসর এই শ্রেণীতে কল ব্যবহৃত হইবার পর কুনিগ নামে এক জার্ম্মাণ সাহেব বাষ্পচালিত ছাপা-কল আবিষ্কার করেন। কাঠের এবং লোহার হাত-কলে কালী-পেষাই, হরপে কালী-লাগান প্রভৃতি সকল কাজই হাতে করিতে হইত। এই শ্রেণীর ভালরূপে পেষাই করার ব্যবস্থা হইল এবং কল আরও দ্রুত চালাইবার ব্যবস্থা করা হইল। আধুনিক কলে কাগজ লাগানও কলের সাহায্যে হইয়া থাকে এবং ছাপাও দ্রুত (ঘণ্টায় ২।৩ হাজার বা ততোধিক) হয়।

গত শতাব্দীতে ছাপার কালী ও কাগজের অনেক উন্নতি হইয়াছে। হাত-কলে আগেকার দিনে কাগজ ভিজাইয়া ছাপিতে হইত।



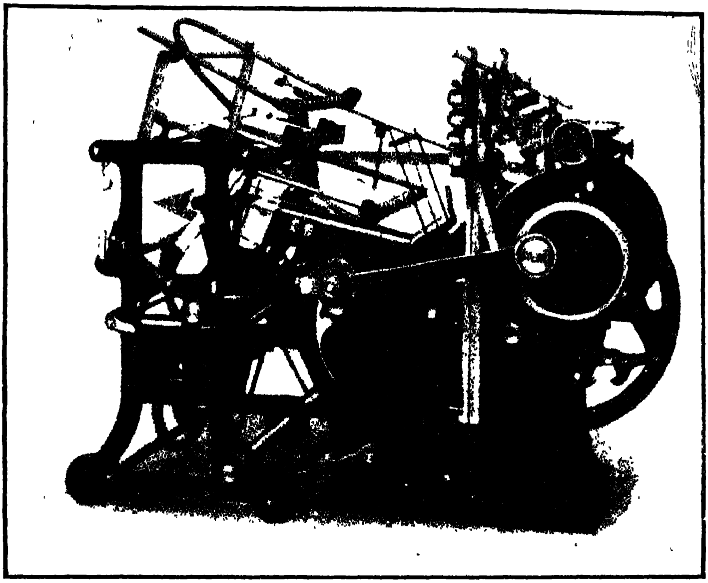
ছাপাখানার যন্ত্রপাতি তৈয়ারির কারখানা—জার্ম্মেণী

বাষ্পচালিত কলে কালী-পেষাই ও কালী লাগান কলের সাহায্যেই হয় এবং ইহার সাহায্যে বই, সংবাদপত্র, বড় বড় বিজ্ঞাপন, মূল্য-তালিকা প্রভৃতি বড় বড় কাগজে ছাপা জিনিষ খুব দ্রুত ছাপাও সম্ভবপর।

ক্রমে এই শ্রেণীর কলের আরও উন্নতি হইল। ছাপা কাগজ আপনা হইতে কলের সাহায্যে উঠাইয়া যথাস্থানে রাখা ও কালী এখন আর তাহার আবশ্যক নাই। বিভিন্ন প্রকারের ছাপার জন্য বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন রঙের কাগজ প্রস্তুত হইতেছে—স্বচ্ছ কাগজ, সোনালী ও রূপালী কাগজ, ঝিনুকের ন্যায় চক্‌চকে কাগজ, আগুনসহা (fire-proof) কাগজ, জল-সহা (water-proof) কাগজ, রামধনুর ন্যায় রং-খেলান কাগজ, থলির জন্য মজবুত কাগজ,

চামড়ার মত চেহারার কাগজ, কাপড়ের মত চেহারার কাগজ—আরও অনেক বিভিন্ন-প্রকারের কাগজ তৈয়ারি হইতেছে। বিভিন্ন-প্রকারে কাগজের উপর ছাপার জন্য বিশেষ কালীও প্রস্তুত করা হইতেছে। দ্রুত ছাপার জন্য যে সকল কালী তৈযারি হইতেছে, তাহা অতি শীঘ্র শুকাইয়া যায়।

সাহায্যে চালিত কল (Treadle machine) আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই শ্রেণীর কলের একশত বৎসরের মধ্যে এত উন্নতি হইয়াছে যে, আধুনিক কলের তুলনায় প্রথম পায়ে-চালিত কল নিতান্তই নিকৃষ্ট মনে হয়। আধুনিক কল আর পায়ে চালাইতে হয় না—ইহা বৈদ্যুতিক শক্তিতে চলে। এই



আপনা হইতে কাগজ ছাপা, কালী পেষাই ইত্যাদি এই মেসিনে হইয়া থাকে

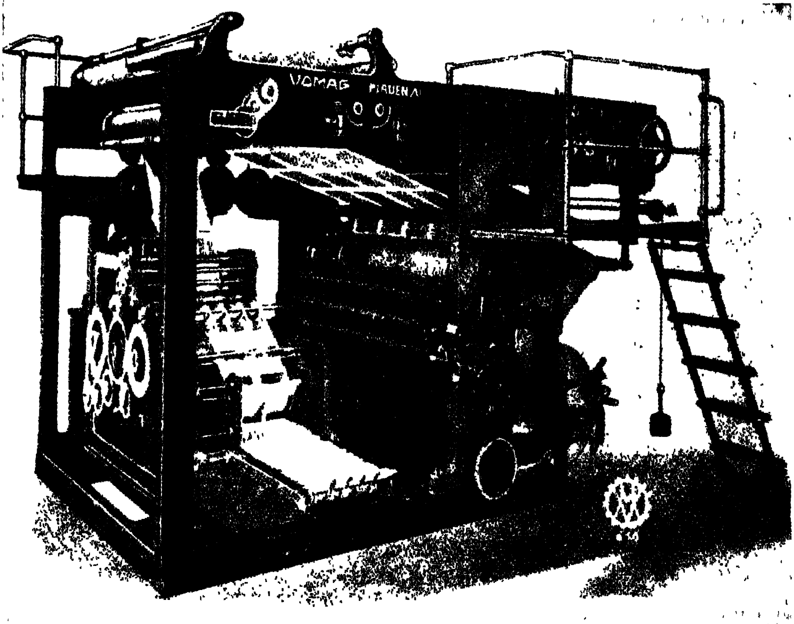
উনবিংশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে টেলিগ্রাফের সাহায্যে সংবাদ-প্রেরণের ব্যবস্থার উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে সংবাদ-পত্রেরও অনেক উন্নতি হইল। সংবাদ-পত্রের জন্য বৃহৎ ছাপা-কল তৈয়ারী হইল, যাহার সাহায্যে পত্রের প্রত্যেকটি কাগজের একেবারে দুই পিঠ ছাপা হইয়া যায়।

ছোট কাগজ ছাপার জন্য পায়ের সকল কলে ঘণ্টায় ২।৩ হাজার কাগজ ছাপা হয়, কাগজ লাগান, উঠান, কালী-পেষাই, ছাপার সংখ্যা গণনা করা—সবই কলের সাহায্যে হয়।

গত শতাব্দীর শেষভাগে সংবাদ-পত্রের প্রচার বৃদ্ধি পাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে 'রোটারি' (Rotary) ছাপা-কল নামে নূতন ধরণের কলও আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কলের

সাহায্যে কাগজের লম্বা থানের উপর সংবাদপত্রের সবগুলি পৃষ্ঠা একবারে ছাপা হইয়া কলের সাহায্যে থানের অংশ কাটা হইয়া ভাঁজ করা হইয়া যায়। এই শ্রেণীর আধুনিক কলে ঘণ্টায় ২৫।৩০ হাজার সংবাদ-পত্র ছাপা হওয়া সম্ভবপর।

সংবাদ তাড়াতাড়ি ছাপিয়া প্রকাশ করিতে হইলে ছাপার অক্ষরও খুব দ্রুত বসান আবশ্যক। সেজন্য অক্ষর সাজান-কল আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই কলে প্রত্যেকটি অক্ষয়ের কয়েকটি করিয়া ছাঁচ (ইংরাজীতে ইহাকে Matrix বলে) একটি

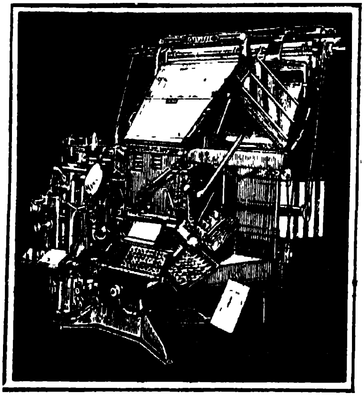


জার্ম্মেণীর তৈয়ারি সংবাদ-পত্র ছাপিবার রোটারী মেসিন

সংবাদ-পত্র ছাপার কথা বলিতে হইলে দুইটি জিনিষের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ করা দরকার—(১) অক্ষর বসান কল ((Linotype, Intertype, Monotype প্রভৃতি); (২) ষ্টিরিও (Stereo) বা সাজান অক্ষরের পৃষ্ঠার ছাঁচ লইয়া, সেই ছাঁচে গালান সীসা ঢালিয়া পূর্ণ পৃষ্ঠাটির অবিকল নকল লওয়ার প্রণালী।

বাক্সের (Magazine) মধ্যে বিভিন্ন কামরায় সাজান থাকে। 'টাইপরাইটার' যন্ত্রে যেরূপ কী-বোর্ড থাকে, এই যন্ত্রেও সেইরূপ অক্ষরের কী-বোর্ড আছে। এক একটি অক্ষরের চাবির সঙ্গে এক একটি অক্ষরের কামরার যোগ আছে। চাবি টিপিলেই একটি ছাঁচ কামরা হইতে বাহির হইয়া নীচে অক্ষর ঢালাইএর জায়গায়

যথাস্থানে বসিয়া যায়। পরপর কয়েকটি অক্ষর সাজাইয়া একটি লাইন ভরাট হইয়া গেলে পিছনের একটি পাত্র হইতে গলান সীসা একটি পিচ্‌কারী বা 'পাম্প্‌'-এর (Pump) সাহায্যে ঢালাই করা ছাঁচের মধ্যে ঢালিয়া দেওয়া হয় এবং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সম্পূর্ণ একটি লাইন ঢালাই হইয়া কল হইতে বাহির



ইন্‌টার টাইপ মেসিন

হইয়া আসে। তাহার পর কলের সাহায্যেই অক্ষরের ছাঁচগুলি যথাস্থানে ফিরিয়া যায়। এই ভাবে অতি দ্রুত অক্ষর সাজান হয়। বড় বড় সংবাদপত্রের আপিসে ১৫।২০টি করিয়া অক্ষর-ঢালাই কল থাকে। এই শ্রেণীর কলের নাম Linotype, Intertype ও Typograph। সম্প্রতি বাংলা অক্ষরের জন্য এই শ্রেণীর Linotype তৈয়ারি করা হইয়াছে। হিন্দী অক্ষরের কল কিছুকাল আগেই হইয়াছে।

'মনোটাইপ' (Monotype) নামে আর এক প্রকার কল আছে, তাহাতে প্রত্যেকটি অক্ষর আল্‌গা ঢালাই হয়। এই যন্ত্রের কী-বোর্ড ও ঢালাই-যন্ত্র স্বতন্ত্র। কী-বোর্ডের চাবি টিপিলে সরু লম্বা একটি কাগজের থানের উপর ছোট ছোট ছিদ্র হইতে থাকে। এই সকল ছিদ্র প্রত্যেকটি অক্ষরের জন্য এক একটি বিভিন্ন ধরণের। কাগজের থানে ছিদ্র করার কাজ শেষ হইয়া গেলে ঐ কাগজ খুলিয়া ঢালাই-কলের একটি বহু-ছিদ্র-যুক্ত চোঙার গায়ে লাগাইয়া দেওয়া হয়। চোঙার গায়ে বহু ছিদ্র আছে, তাহার প্রত্যেকটি এক একটি বিশেষ অক্ষরের জন্য। কাগজের একটি ছিদ্র চোঙার একটি ছিদ্রের সহিত মিলিলেই সেই ছিদ্র দিয়া বাতাস যায় এবং একটি পাম্পের সাহায্যে গলিত ধাতু অক্ষরের ছাঁচের মধ্যে গিয়া একটি অক্ষর ঢালাই হয়। এইভাবে চোঙা ঘুরিতে থাকে এবং অক্ষর ঢালাই হইতে থাকে। অক্ষরের ছাঁচগুলি একটি ছোট কামরায় চোঙার নীচে পর পর সাজান থাকে এবং চোঙা হইতে বাতাস গেলে এক একটি অক্ষরের ছাঁচ গালান ধাতুর পাম্পের ছিদ্রের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইতে থাকে এবং অক্ষর ঢালাই হইতে থাকে।

অক্ষর-বসান কলের সাহায্যে লাইনগুলি পরপর ঢালাই হইয়া গেলে, সেগুলির শিরোনামা (heading) বসাইয়া যথাস্থানে সাজাইয়া সংবাদপত্রের এক একটি পৃষ্ঠা প্রস্তুত করা হয়। ছবি দিবার আবশ্যক হইলে তাহার ব্লকও যথাস্থানে বসাইতে হয়। তাহার পর মোটা বোর্ডের মত একপ্রকার শক্ত কাগজ পৃষ্ঠাটির উপর রাখিয়া, কলের সাহায্যে চাপ দিয়া পৃষ্ঠার একটি ছাপ তোলা হয়। পৃষ্ঠার যে যে অংশগুলি নীচু, ছাঁচে সেই

বাংলা লাইনোটাইপের নমুনা

ছাপার কথা

'ছাপাখানার কথা' শীর্ষক প্রবন্ধে ছাপার অক্ষরের আবিষ্কার ও মুদ্রাযন্ত্রের কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। গুটেনবার্গের সময় যে কাঠের ছাপাকল ও সীসার অক্ষর ব্যবহৃত হইত, আধুনিক ছাপাকল ও অক্ষরের সঙ্গে তাহার অনেক প্রভেদ। তখনকার দিনের ছাপাও অনেক কষ্টসাধ্য ও সময়সাপেক্ষ ছিল। ছাপার কাগজ, কালী প্রভৃতি সরঞ্জামেরও উন্নতি সে সময়ে বিশেষ কিছুই হয় নাই। কিন্তু এতপ্রকার অসুবিধা সত্ত্বেও গুটেনবার্গের ছাপা বাইবেল ও অন্যান্য পুস্তক ছাপার পারিপাট্য হিসাবে বেশ ভালই হইয়াছিল। আজও গুটেনবার্গের ছাপা দু'চারটি বই দেখিতে পাওয়া যায়।

ইহার পর প্রায় ৬০০ বৎসর অতীত হইয়াছে এবং এই সময়ের মধ্যে ছাপারও যথেষ্ট উন্নতি হইয়াছে।

অক্ষর ঢালাইএর জন্য প্রথমে কোনও কল আবিষ্কৃত হয় নাই। ছাঁচের মধ্যে গলিত ধাতু হাতার সাহায্যে ঢালিয়া এক একটি অক্ষর ঢালাই করিতে হইত এবং প্রত্যেকটি অক্ষরকে ঘষিয়া পরিষ্কার করিতে হইত। ধাতু গলাইবার উপযুক্ত পাত্রের অভাবে সকল সময় অক্ষরের 'পান' (temper) ঠিক থাকিত না—কখনও নরম হইয়া যাইত, কখনও ভঙ্গুর হইত। এইভাবে অক্ষর-ঢালাই করা কত সময় পরিশ্রম ও ব্যয়সাপেক্ষ ছিল, তাহা সহজেই অনুমান করা যায়।

ক্রমে অক্ষর ঢালাইএর কল আবিষ্কৃত হইল, ধাতু গলাইবার উপযুক্ত ব্যবস্থা হইল, সীসার সহিত তামা, এন্টিমনি (antimony), বিসমাথ (bismuth) প্রভৃতি ধাতু মিশাইয়া অক্ষরকে বহুকাল স্থায়ী করার ব্যবস্থা হইল। প্রথমে ইস্পাতের উপর হাতে মূল অক্ষরটি কাটিয়া তাহা হইতে তামার ছাঁচ প্রস্তুত করা হইত। বিভিন্ন প্রকারের এবং বিভিন্ন আকারের প্রত্যেকটি অক্ষর এক একটি করিয়া হাতে কাটিতে হইত। আধুনিক প্রণালীতে প্রত্যেক প্রকারের অক্ষরের বড় আকারের এক একটি অক্ষর কাটিয়া, কলের সাহায্যে তাহা হইতে ইচ্ছামত ছোট মূল অক্ষর অল্প সময়ে এবং অল্প আয়াসে খোদাই করা হয়।

কাঠের ছাপা-কলের আবিষ্কারের অল্প কয়েক বৎসর পরেই লোহার কল প্রস্তুত হইল। এই শ্রেণীর কল (Hand-press বা হাত-কল) আজও আমাদের দেশে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা 'ঢিলে' (Columbian) এবং 'এলবিয়ন' (Albion) নামে পরিচিত। দুই তিন শত বৎসর আগে এই শ্রেণীর কল ব্যবহৃত হইবার পর কুনিগ নামে এক জার্ম্মাণ সাহেব বাষ্পচালিত ছাপা কল আবিষ্কার করেন। কাঠের এবং লোহার হাত-কলে কাজী পেষাই হবপে কালী-লাগান প্রভৃতি সকল কাজই হাতে করিতে হইত। এই শ্রেণীর বাষ্পচালিত কলে ইহার সাহায্যে বই, সংবাদপত্র, বড় বড় বিজ্ঞাপন, মূল্য-তালিকা প্রভৃতি বড় বড় কাগজে ছাপা জিনিষ খুব দ্রুত ছাপাও সম্ভবপর।

ক্রমে এই শ্রেণীর কলের আরও উন্নতি হইল। ছাপা কাগজ আপনা হইতে কলের সাহায্যে উঠাইয়া যথাস্থানে রাখা ও কালী ভালরূপে পেষাই করার ব্যবস্থা হইল এবং কল আরও দ্রুত চালাইবার ব্যবস্থা করা হইল। আধুনিক কলে কাগজ লাগানও কলের সাহায্যে হইয়া থাকে এবং ছাপাও দ্রুত (ঘণ্টায় ২।৩ হাজার বা ততোধিক) হয়।

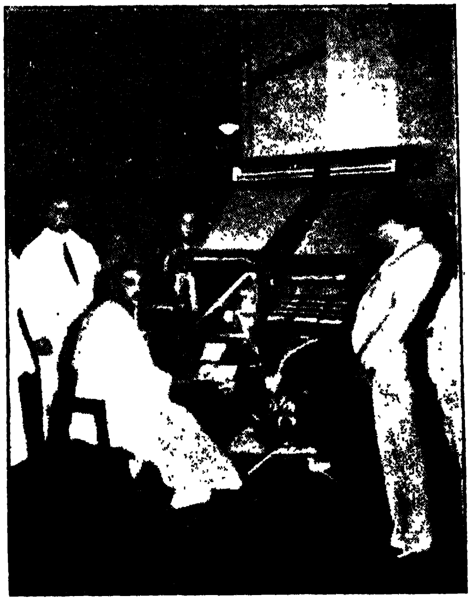
''আনন্দবাজার পত্রিকা'র সৌজন্যে

অংশ উচু; পৃষ্ঠার যে যে অংশ উচু ছাঁচে সেই অংশ নীচু। এই ছাঁচকে শুকাইয়া, একটি ঢালাই বাক্সের (Casting Box) মধ্যে রাখিয়া বাক্সের মধ্যে গলিত সীসা ঢালিয়া দেওয়া হয়। এই-ভাবে সংবাদপত্রের অক্ষর সাজান এক একটি পৃষ্ঠার অবিকল নকল উঠে, ইহাকে Stereotype বা Stereo বলে। ঢালাইএর সময় এই জিনিষটির আকার একটা সমতল চাদরের মত না হইয়া চোঙার আকারের (পূর্ণ বা অর্দ্ধ) করা হয়, কারণ ঐ ভাবে ঢালাই না করিলে আধুনিক সংবাদ-পত্রের কলে অত দ্রুত ছাপা সম্ভবপর হয় না।

পৃষ্ঠাগুলি ঢালাই হইয়া গেলে ছাপা কলের বড় বড় লোহার চোঙার উপর সেগুলি যথাস্থানে আঁটিয়া দেওয়া হয়। সংবাদপত্রের কাগজের এক পিঠে যতগুলি পৃষ্ঠা ছাপা হইবে, সেগুলি একটি চোঙ্গায় এবং অপর পিঠে যতগুলি পৃষ্ঠা ছাপা হইবে, সেগুলি অপর একটি চোঙায় আঁটা হয়। পৃষ্ঠার সংখ্যা বেশী হইলে এক এক পিঠের পৃষ্ঠা ছাপার জন্য দুই বা ততোধিক চোঙারও আবশ্যক হয় এবং কলও সেই পরিমাণে বড় হয়।

প্রত্যেকটি চোঙার সংঙ্গে সংলগ্ন কালী লাগাইবার যন্ত্র থাকে এবং অপর দিকে ঐ চোঙার সঙ্গে সংলগ্ন আরেকটি চোঙা থাকে, যাহার গায়ে ছাপার কাগজ জড়ান। এই কাগজ অত্যন্ত লম্বা (এক মাইল বা ততোধিক) থানের আকারে একটি রোলার বা চোঙার গায়ে জড়ান থাকে; তাহা হইতে খুলিয়া ছাপার চোঙার গায়ে জড়ান হয়।

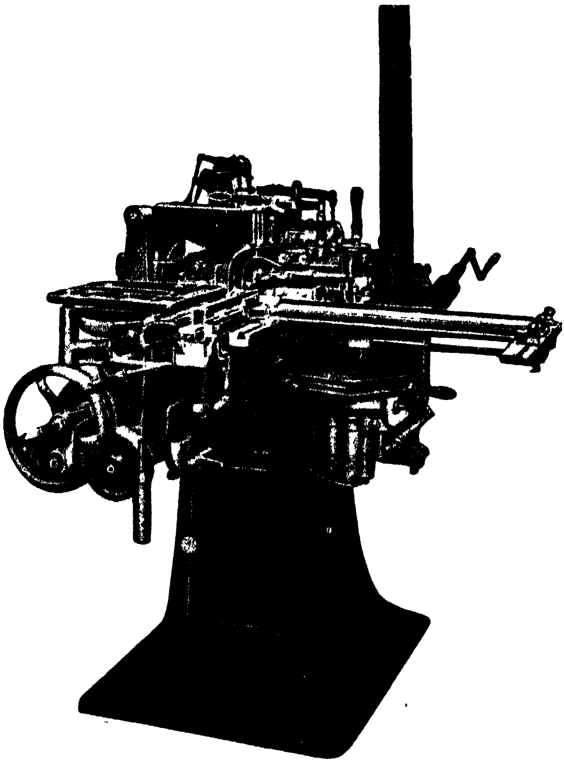
কল চলিতে আরম্ভ হইলে চোঙাগুলি ক্রমাগত ঘুরিতে থাকে। অক্ষরের গায়ে কালী মাখান হইয়া কাগজের উপর ছাপ পড়িতে থাকে এবং থানের কাগজ ক্রমাগত খুলিয়া গিয়া ছাপা হইতে থাকে (২০৭৪ পৃষ্ঠার ছবি দেখ)। কাগজের দুটি পিঠ ছাপা হইয়া গেলে কলের সাহায্যেই কাগজ কাটা হইয়া, ভাঁজ হইয়া, সম্পূর্ণ একটি সংবাদ-পত্র কল হইতে বাহির হইয়া আসে।



বাংলা লাইনোটাইপ মেসিন

আমেরিকার যুক্তরাজ্যে (U. S. A.) কোনও কোনও মাসিক ও সপ্তাহিক পত্রি-

কার এত বেশী সংখ্যা ছাপা হয় যে, তাহার জন্যও এই ধরণের 'রোটারী' কল ব্যবহার করা হয়। যে সকল পুস্তকের বা মূল্য-তালিকার খুব বেশী সংখ্যক ছাপার আবশ্যক হয়, তাহাও এই শ্রেণীর কলে অনেক সময় ছাপা হইয়া থাকে। ইহাতে কেবল যে ছাপা দ্রুত হয় তাহা নহে, কাগজের থান কাটা কাগজের 'তা' অপেক্ষা অনেক কম দামে কিনিতে পারা যায় এবং কলের সাহায্যে ছাপা কাগজ ভাঁজ হইয়া যাওয়ায় বইএর বাঁধাই খরচও কম পড়ে।



মনোটাইপ কাষ্টিং মেসিন

বিশেষ বিশেষ কাজের জন্য আজকাল নানাপ্রকার ছাপা-কল তৈয়ারি হইতেছে। এই প্রসঙ্গে পাঁচটির উল্লেখ করিব—

(১) রেলের টিকিট ছাপার কল—এই কলে ছোট কার্ডের উপর রেলের টিকিট ছাপা, নম্বর ছাপা, গণনা হইয়া ও ছোট ছোট বাণ্ডিল বাঁধা হইয়া কল হইতে বাহির হইয়া আসে। ট্রাম, বাস্ প্রভৃতির টিকিটও এই শ্রেণীর কলে ছাপা হয়।

(১) চালান, রসিদ, বিল প্রভৃতি অধিক সংখ্যায় ছাপার কল—যে সকল রসিদ, চালান প্রভৃতির লক্ষ লক্ষ ছাপা আবশ্যক হয়, তাহার জন্য ছোট 'রোটারী' কল তৈয়ারি করা হইয়াছে। এই কলের সাহায্যে এক বা ততোধিক রঙে কাগজ ছাপা, কাগজ কাটা, ছিঁড়িবার জন্য সারি সারি ছিদ্র করা (perforating), নম্বর বসান, গণনা করা, ছাপা কাগজের পিছনে একখানি করিয়া সাদা কাগজ ভরিয়া দেওয়া (নকল উঠাইবার জন্য)—সবই এক বারে হইয়া যায়। সিনেমা, খেলাধূলা, বাস্, ট্রাম, প্রভৃতির টিকিটও এই শ্রেণীর কলে ছাপা হয়। এই সকল টিকিট লম্বা থানের আকারে, অনেকগুলি পর পর ছাপা

থাকে, মধ্যে ছিঁড়িবার ছিদ্র থাকে (Perforation)। থানগুলি কুণ্ডলীর আকারে গুটান থাকে।

(৩) টিনের উপর ছাপার কল—এই সকল কলে দস্তার পাতের উপর ছাপার নক্সার 'প্লেট' প্রস্তুত করিয়া প্রথমে রবারের উপর ছাপা তোলা হয়, সেই ছাপা আবার টিনের উপর উঠান হয়। এই শ্রেণীর কলে কাপড়, রেশম প্রভৃতির উপরও ছাপা হয়। এই শ্রেণীর (অর্থাৎ রবারের উপর ছাপা উঠাইয়া তাহা হইতে টিন বা অন্য কিছুর উপর ছাপা উঠান) ছাপাকে 'অফ্‌সেট' ('Offset') ছাপা বলে।

(৪) কাপড়ের থানের উপর ছাপার কল—সংবাদ-পত্র ছাপার কলে যেমন কাগজের থান হইতে ছাপা হয়, এই কলেও সেইরূপ কাপড়ের থান হইতে ছাপা হয়। তামার একটি রোলার বা চোঙার গায়ে ছাপার নক্সাটি খোদাই করা থাকে। দুই, তিন বা ততোধিক রঙেও ছাপা হইতে পারে।

(৫) কাগজের থলি ছাপার কল—এই কলে কাগজের থলি তৈয়ারি হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে অতি অল্প খরচে থলির উপর ছাপা হইয়া যায়।

ছাপার কলের কথা কিছু বলা হইল, এখন ছাপার প্রণালীর কথাও কিছু বলা আবশ্যক।

মোটামুটি তিন প্রকার ছাপার প্রণালী আছে—

(১) খোদাই জিনিষের উচু অংশে

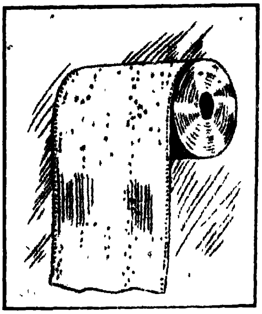


মনোটাইপ মেসিনের কী-বোর্ড

কালী লাগাইয়া ছাপা। ইহার ইংরাজী নাম Letterpress Printing। সাধারণ ছাপা (হরপ ও ব্লক হইতে)—যাহা আমরা সচরাচর দেখি এবং যাহার বিবরণ দিয়াছি, তাহা এই শ্রেণীর।

(২) খোদাই জিনিষের নীচু অংশ

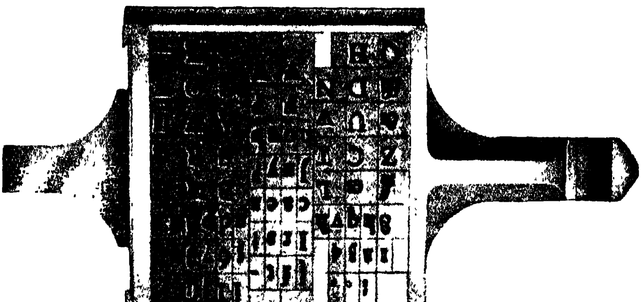
কালী লাগাইয়া ছাপা। ইহার ইংরাজী নাম Intaglio Printing। ধাতুর পাতের



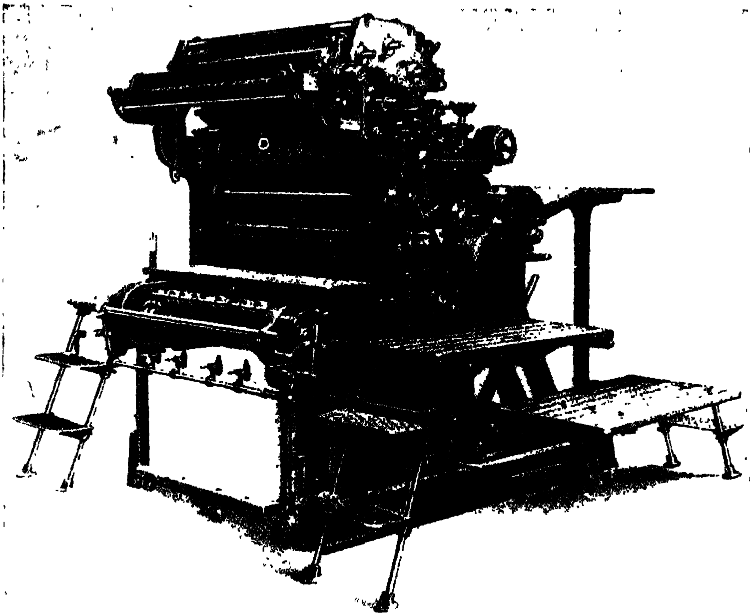
মনোটাইপ মেসিনে কাগজের উপর ছিদ্র হইবার ছবি

উপর ছাপার নক্সা নীচু খুদিয়া প্রথমে ছাপার প্লেট তৈয়ারি হয়। এই প্লেটে পাতলা কালী মাখাইয়া প্রথমে উপরের কালী চাঁচিয়া তুলিয়া ফেলা হয়—কেবল খোদাই অংশের ভিতরে কালী থাকে। তাহার পর চাপ দিয়া ছাপ তোলা হয়। Die, Copper-plate Photogravure, Etching প্রভৃতি এই প্রণালীর ছাপা।

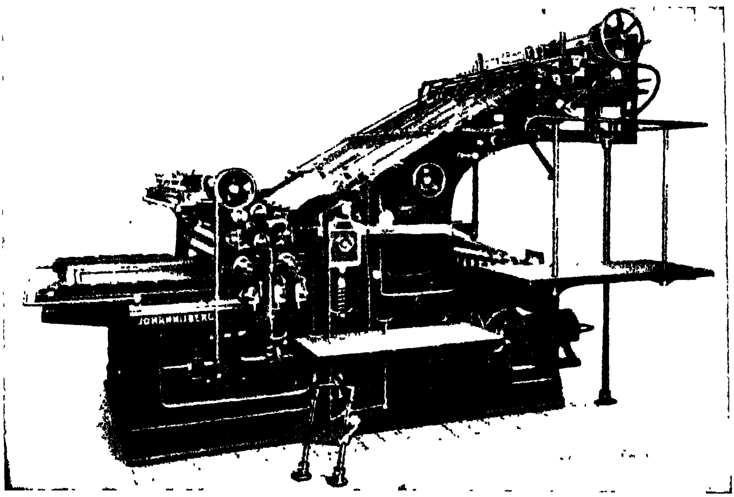
(৩) সমতল পাথরকে বা দস্তার চাদরকে এমন ভাবে প্রস্তুত করা হয় যে, তাহার উপর জল মাখাইলে কোন কোন অংশে জল লাগে এবং কোন কোন অংশে (যে যে অংশে ছবির নক্সাটি থাকে) জল লাগে না। ইহার উপর তেলা কালী মাখাইয়া একটি রোলার চালাইলে ভিজা জায়গায় কালী লাগিবে না (কারণ, 'তেলে জলে মিল খায় না'), কেবল শুক্‌না জায়গাগুলিতে কালী লাগিবে। তাহার পর কাগজের উপর সেই কালীর ছাপ উঠাইলেই হইল। এই ছাপাকে ইংরাজীতে Planographic Printing বলে। প্রথমে (অর্থাৎ শত বৎসর পূর্ব্বে যখন ইহা আবিষ্কৃত হয়) পাথর হইতেই ছাপা হইত বলিয়া ইহার নাম ছিল 'লিথোগ্রাফি' (Lithography) (Litho অর্থাৎ পাথর)। পরে দস্তা এবং এলুমিনিয়ম ধাতুর চাদর হইতে ছাপার প্রণালী আবিষ্কৃত হইলে ইহার নাম পরিবর্ত্তন করা হইল।



মনোটাইপ মেসিনে বড় বড় অক্ষর কম্পোজ করিবার ম্যাট্রিক্স-কেস

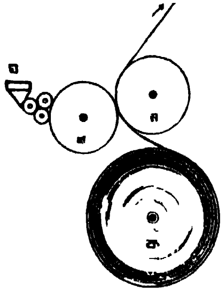


অফ্‌সেট (Offset) মেসিন



আপনা হইতে কাগজ ছাপা হইবার লেটার প্রেস প্রিন্টিং মেসিন

টিনের উপর ছাপার সম্পর্কে 'অফ্‌সেট' (Offset) ছাপার কথা উল্লেখ করিয়াছি, সে ছাপা Planographic Printing শ্রেণীর। সাধারণ ছাপার সঙ্গে প্রভেদ এই যে, একেবারে কাগজের উপর ছাপা



ক —কাগজের থানের চোঙা।
খ—অক্ষরের চোঙা।
গ—কাগজ ছাপার চোঙা।
ঘ—কালীর যন্ত্র।
(ছাপা কাগজ এবার ঠিক এইরূপ আর একটি যন্ত্রে যাইবে এবং কাগজের উল্টা পিঠ ছাপা হইবে।)

না উঠিয়া প্রথমে রবারের উপর উঠে, তাহা হইতে কাগজে বা টিনে উঠে। ছাপার কাগজ মসৃণ না হইলেও এই প্রণালীতে সূক্ষ্ম ছাপা খুব পরিষ্কার উঠে। ছাপাও খুব তাড়াতাড়ি হয়।

বাংলা লাইনোটাইপ মেসিনের কথা বলিয়াছি। ২০৬৯ পৃষ্ঠার ছবিতে দেখিতে পাইবে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্ চ্যান্সেলার শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয় উহার সাহায্যে অক্ষর যোজনা করিতেছেন। অপর পৃষ্ঠার একখানি ছবিতে কিরূপ ছাপা হয়—তাহার নমুনা দেখিতে পাইবে। এই প্রসঙ্গে বলা যাইতে পারে যে, শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার মহাশয় বাংলা লাইনোর উদ্ভাবক।

কি ও কেন

পৃথিবীর বয়স কত?

[ভূ-বিজ্ঞান পড়িয়া তোমরা অনেক কথা শিখিয়াছ। এখানে তোমাদের কাছে পৃথিবীর বয়স কত সে বিষয়ে বিস্তারিত ভাবে বলা হইল।]

১৯৮৩ পৃষ্ঠার পর

বৈজ্ঞানিকেরা বলেন- অনেক দিন, অনেক মাস, অনেক বৎসর আগে, এমন কি এত আগে যে, তখনও আমাদের দিন, মাস বা বৎসর বলে কিছুই ছিল না, একবার আকাশের মধ্যে একটা অদ্ভুত ব্যাপার ঘটেছিল। আকাশের তো সীমা নেই, ব্যাপারটা এতই অদ্ভুত যে, সেখানেও এমন ব্যাপার সচরাচর ঘটে না। কোটী কল্পেও একবার হয় কিনা সন্দেহ। কিন্তু একবার যে ঘটেছিল, তার প্রমাণ আছে। তার প্রমাণ তুমি, আমি, এই পৃথিবী, চাঁদ, মঙ্গল আর বৃহস্পতি। তা হয়েছিল বলেই শনি, বৃহস্পতি, মঙ্গল ইত্যাদি গ্রহ হয়েছে; আমাদের পৃথিবী হয়েছে; চাঁদ হয়েছে; পাহাড়, নদী এবং সমুদ্র হয়েছে; গাছ-পালা, পশু-পক্ষী, মানুষ হয়েছে; আমি হয়েছি এবং তুমি হয়েছ।

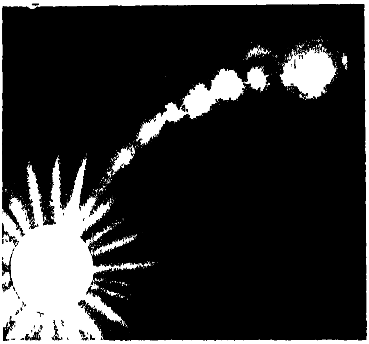
অদ্ভুত ব্যাপারটি এই—সূর্য্য আকাশের মধ্যে কোটী কোটী বছর ধরে আপন মনে একলা চলে বেড়াচ্ছিল। কিন্তু এমন করে একা চলে বেড়ান তার ভাগ্যে ছিল না। কোথা থেকে একটা প্রকাণ্ড নক্ষত্র তার খুব কাছে এস পড়ল। ফলে সূর্য্যের শরীরে খুব বড় জোয়ার দেখা দিল। এত বড় সে জোয়ার যে, তা কল্পনাতেও আসে না। দেখতে দেখতে সূর্য্যের শরীর থেকে কতকটা অংশ নক্ষত্রটার টানে ফুলে উঠে আকাশের মধ্যে বেড়িয়ে পড়ল [চিত্র ১]। আগন্তুক নক্ষত্রটা সামান্য পথ-ভ্রষ্ট হয়ে আবার আকাশের মধ্যে উধাও হয়ে কোথায় চলে গেল, কিন্তু সূর্য্যের কাছে তার আগমনের একটা চিহ্ন চিরকালের জন্য রয়ে গেল, যে অংশটা সূর্য্য থেকে বেরিয়ে এসেছিল, তা আকাশেই থেকে গিয়ে সূর্য্যের চতুর্দ্দিকে ঘুর-পাক খেতে লাগল। এবং ক্রমে ঠাণ্ডা হয়ে বুধ, পৃথিবী, মঙ্গল, বৃহস্পতি ইত্যাদি গ্রহের জন্ম দিল।

এখন সমস্যা এই—কতদিন আগে এই ব্যাপারটি ঘটেছিল।

এর উত্তরে এমন কোনও সঠিক হিসাব দেওয়া যায় না, যা থেকে বলা যেতে পারে যে, ঠিক এত বছর, এত মাস ও এত দিন আগে এই ব্যাপারটা ঘটেছিল। তবে অন্ততঃ এই এতটা সময়ের মধ্যে যে হয় নি, তা বলা যায়। মনে কর, তোমার বয়স তের বছর। অন্ততঃ তের বছরের মধ্যে যে হয়নি, এ কথা তুমিও বলতে একটু ভয় পাবে না। কিন্তু যাঁরা বৈজ্ঞানিক,

তাঁদের নানা রকমের যুক্তি আছে। তাঁরা তাঁদের সেই সব যুক্তি লাগিয়ে এর একটা হিসেব তৈরি করেছেন। কি ভাবে তাঁরা এই হিসেবটা করেছেন, সেই কথাটাই তোমাদের বলছি।

তাঁদের কথাটা কিন্তু খুবই সাধারণ। মনে কর, কোনও একদিন থেকে তুমি দুটো করে পয়সা তোমার বাক্সের মধ্যে রাখতে আরম্ভ করলে। প্রত্যহ দুটো করে পয়সা তোমার বাক্সে সঞ্চয় হতে থাকল। কিছু দিন পরে যদি তুমি জানতে চাও, কতদিন থেকে তুমি এই ভাবে পয়সা সঞ্চয় করছ, তবে তুমি কি করবে? কয়টা পয়সা জমেছে, গুণে দেখলেই তা তুমি জানতে পারবে। যে ক'টা পয়সা জমেছে, তার অর্দ্ধেক দিন থেকে তুমি



চিত্র ১

সঞ্চয় করতে আরম্ভ করেছ। বৈজ্ঞানিকদের যুক্তিটাও এ থেকে খুব অসাধারণ নয়। যুক্তিটার মর্ম্ম হল এই—সময়ের যে ব্যবধান তুমি জানতে চাও, তখনকার এমন কোনও একটা ব্যাপারের প্রতি লক্ষ্য কর, যা বর্ত্তমান সময় পর্য্যন্ত অব্যাহত ভাবে চলে এসে নিজের সমস্ত ক্রিয়া সঞ্চয় করে যাচ্ছে। এই ব্যাপারটা তোমার জানা সময়ের মধ্যে তার কতটা ক্রিয়া সঞ্চয় করে, তা ত তুমি নিজেই দেখে শুনে জেনে নিতে পার। তার পর সামান্য একটু অঙ্ক কষে বলে দেওয়া শক্ত হবে না যে, যদি এতটা ক্রিয়া সঞ্চিত হতে এত সময় লাগে, তবে সমস্তটা সঞ্চয় হতে কত সময় লাগবে? তুমি তোমার পয়সাগুলো গুণে দেখলে ২২টা হয়েছে। রোজ দুটো করে সঞ্চয় হয়। তা হলে কত দিনে ২২টা জমা হয়েছে? বাইশকে দুই দিয়ে ভাগ কর, রইল এগার। অতএব এগার দিন আগে থেকে তুমি পয়সা জমাচ্ছ।

এইবার পৃথিবীর বয়স বার করবার সময় এই যুক্তিটা কেমন ভাবে লাগান হয় তা দেখ। পৃথিবী উত্তপ্ত অবস্থা থেকে ঠাণ্ডা হয়ে উঠল। আকাশের বাষ্প জমে জল হয়ে পৃথিবীর পিঠের গর্ত্তগুলো ভরে ফেলে সমুদ্র তৈরি করল। সেই সমুদ্রের জল আবার মেঘ হয়ে উরে ডাঙ্গায় এসে বৃষ্টি হল, আর ডাঙ্গার উপরকার যা কিছু সমস্তই ধুয়ে নদীর মধ্য দিয়ে সমুদ্রে নিয়ে ফেলল। অনবরত এই ব্যাপার ক্রমাগত চলছে। কিন্তু এরই সঙ্গে আর একটা কাজ ক্রমাগত জমা হয়ে যাচ্ছে। নদীগুলো ডাঙ্গা হতে একটু একটু লবণ অনবরত ধুয়ে নিয়ে সমুদ্রে জমা করছে। লবণটা কিন্তু মেঘের সঙ্গে আকাশে বাষ্প হয়ে উরে যায় না। তা সমুদ্রের মধ্যে জমা হয়ে তার জলকে লবণাক্ত থেকে আরও লবণাক্ত করে তুলছে। জল আজ যতটা লবণাক্ত, কাল তা তত ছিল না। আবার আগামী কাল তা থেকে একটু বেশী হয়ে উঠবে। লবণ কতটা বেড়েছে, কি কমেছে, একদিনে কি দশ দিনে অবশ্য কিছু বোঝা যায় না। তবে এক বছর কিংবা দশ বছরে সমুদ্রের জলের মধ্যে লবণের পরিমাণের কতকটা পরিবর্ত্তন হয়, তা পাওয়া সম্ভব। প্রায় ২২৫ বছর আগে হ্যালী বলে একজন জ্যোতির্ব্বিদ সমুদ্রের জলের অনবরত লোনতা হয়ে ওঠা ব্যাপারটাকে লক্ষ্য করে বললেন যে, এ থেকে পৃথিবীর বয়স আন্দাজ করা সম্ভব। সেই প্রথম দিন থেকে আজ পর্য্যন্ত জল কতটা লোনতা হয়ে উঠেছে, তা সমুদ্রের জল নিয়ে পরীক্ষা করলেই পাওয়া যায়। তারপর প্রতি বৎসর কি পরিমাণে এই লোনতা হওয়া বেড়ে গেছে, তা হ্যালী সাহেব কতকটা আন্দাজ করলেন। তারপর কবে থেকে এইভাবে লোনতা হতে আরম্ভ হয়েছে, তা বার করা খুবই সোজা।

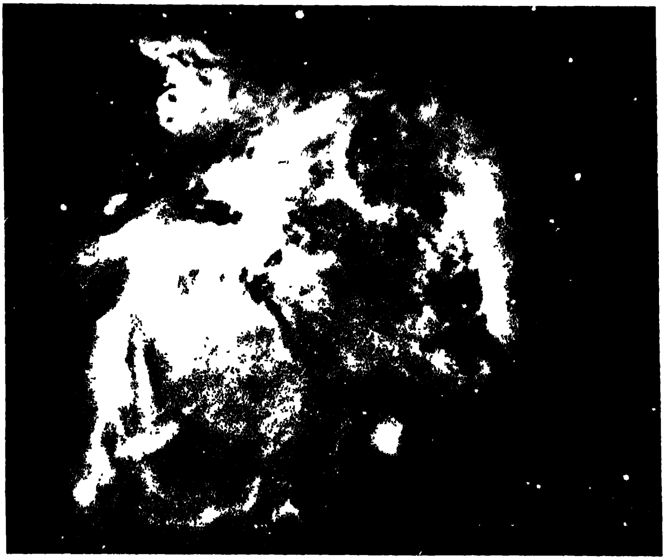
বৃষ্টির জল যেমন সামান্য সামান্য লবণ নিজের মধ্যে করে নিয়ে চলে যায়, তেমনি সে অনেক পরিমাণ মাটিও ভাসিয়ে নিয়ে আসে। বর্ষায় পর



কত রকম উপায়ে জল পার হচ্ছে

নদী যখন কমতে আরম্ভ করে, তখন সে কতটা পলি মাটি জমা করে যায়, তা তোমরা অনেকেই হয়ত লক্ষ্য করেছ। প্রতি বৎসর অনেক পরিমাণ মাটি পাহাড় থেকে, ভিতরের উচু জমী থেকে নদী ধুয়ে ধুয়ে নিয়ে যাচ্ছে, আর তার ফলে সমুদ্রের তলায় স্তরে স্তরে পলি মাটি জমা হয়ে যাচ্ছে। এই ভাবে সে কোন্ অজানা কালের গোড়ার দিক থেকে জমা হয়ে হয়ে এই স্তরগুলো খুব পুরু হয়ে উঠেছে। কোন্ যুগের স্তরটা কত পুরু হয়েছে কতদিনে মাটির স্তরটা এতটা পুরু হয়েছে, তা এইবার দেখা যাক।

প্রত্ন-তাত্ত্বিকেরা প্রাচীনকালের সব কীর্ত্তি মাটি খুঁড়ে খুঁড়ে বার করে থাকেন। সারনাথে ও তক্ষশিলাতে দুহাজার বছরের মাটির স্তর খোঁড়া হয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে চার হাজার বছরের পুরাণ জিনিষ বার করতে এমনিতর আরও পুরু স্তর খুঁড়তে হয়েছে। মিশরে (Egypt) দ্বিতীয় রামেশিস্ প্রায় তিন হাজার বছর পূর্ব্বে রাজত্ব করতেন। মেমফিস্-এ (Memphis) তার কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ মাটিখুঁড়ে পাওয়া গেছে। প্রায় সাত ফুট মাটির স্তর খোঁড়বার পর তবে রামেশিসের আমলের মাটির স্তর পাওয়া গিয়েছিল। অর্থাৎ মিশরে তিন হাজার বছরে সাত ফুট পুরু মাটি জমে উঠেছে। এই মাটির স্তর যুগ-যুগান্তরের চাপে যখন পাথরে পরিণত হয়, তখন আরও পাতলা হয়ে যায়। এক ফুট পুরু মাটির স্তর যখন পাথর



চিত্র—২

আর্থার হোমস্ (Arther Holms) বলে একজন ভূ-তত্ত্ববিদ্ (Geologist) তার হিসেব দিয়েছেন—

Cainozoic age	৭৩,০০০ ফুট
Mesozoic age	৯১,০০
Paleozoic age	১৮৫,০০
Pre-cambrian age	অন্ততঃ ১৮০,০০
সব এক সঙ্গে	অন্ততঃ ৫২৯,০০

F. 10—26

হয়, তখন কয়েক ইঞ্চিতে গিয়ে দাঁড়ায়। তাই সব দিক দেখে শুনে ভূবিজ্ঞান বিদ্‌রা বলেন—হাজার বছরে তিন ইঞ্চি থেকে এক ফুট পুরু পাথর তৈরি হবার মাল মশলা যোগাড় হয়। হাজার বছরে যদি এক ইঞ্চি পাথর হয়, তবে ৫২৯,০০০ ইঞ্চি পাথর তৈরি হতে প্রায় পঞ্চাশ কোটী বছর লেগেছে। আর যদি ধরা যায় যে, হাজার বছরে তিন ইঞ্চি পুরু পাথর জমবার উপযুক্ত মাটি জমা হয়, তবে ৫২৯,০০০ ফুট পাথর জমতে অন্ততঃপক্ষে ২০০ কোটি বছর লেগেছে। এ থেকে অন্ততঃ এই বলা যেতে পারে যে, পৃথিবীর জন্ম অন্ততঃপক্ষে ২০০ কোটী বছর আগে হয়েছিল।

এই ভাবে পৃথিবীর বয়স বার করতে গেলে একটা দোষ এসে পড়ে। কোটী কোটী বছর ধরে যে একই রকম ভাবে মাটির স্তর জমা হয়ে আসছে, এ কথা কে বলতে পারে? কখনও হয়ত খুব তাড়াতাড়ি মাটির স্তর জমা হয়েছে, তারপর অনেকদিন পর্যন্ত হয়ত কিছুই হয়নি। এই জন্যে ওপরকার হিসেবে ভুল হবার সম্ভাবনা। অতএব আমাদের এমন কোন একটা ব্যাপার লক্ষ্য করতে হবে, যা ঠিক সেই গোড়ার কাল থেকে এখনও পর্য্যন্ত সমান ভাবে চলে আসছে। এই পৃথিবীতে যা কিছু ঘটেছে, তা প্রতি যুগে সমান থাকে না। পৃথিবীর অবস্থার সঙ্গে সঙ্গে তারাও পরিবর্ত্তিত হয়। কিন্তু মানুষের জানা এমন একটি ব্যাপার আছে, পৃথিবীর অবস্থার উপর যার ক্রিয়া নির্ভর করে না, পৃথিবী যখন সবে জন্ম নিয়েছিল, তখন তা যেমন ভাবে কাজ করত, এখনও তা ঠিক তেমনি ভাবেই চলে আসছে। এই ব্যাপারটার কথাই তোমাদের এইবার বলছি।

তোমরা জান যে, যা কিছু জিনিষ তোমরা দেখতে পাও, তা সবই কতকগুলো অণু (atom) দিয়ে তৈরি। এই অণুদের মধ্যে সব থেকে হালকা যেটি, তার নাম আদ্রজান (hydrogen), তার পরেরটির নাম হল হিলিয়াম (helium), তৃতীয়টির নাম বেরিলিয়াম (berilium) ইত্যাদি। সকলের চেয়ে যেটি ভারী, সেটিকে বলে ইউরেনিয়াম (uranium)। আদ্রজান বা হিলিয়ামের মত হালকা অণুর সঙ্গে ইউরেনিয়ামের মত বেজায় ভারী অণুর একটা প্রভেদ আছে। আদ্রজান বা হিলিয়ামের খানিকটা যদি তুমি একটা শিশিতে পুরে রেখে দাও, আর অনেক দিন পরে তাকে যদি পরীক্ষা কর, তবে তুমি আদ্রজানের শিশিতে আদ্রজানই পাবে, আর হিলিয়ামের শিশিতে হিলিয়ামই পাবে। অর্থাৎ এদের যেমন অবস্থায় শিশিতে পুরেছিলে, এরা ঠিক তেমনই থাকবে। কিন্তু ইউরেনিয়ামকে যদি শিশিতে পুরে রাখ, আর অনেকদিন পরে তাকে যদি পরীক্ষা করতে যাও, তাহ'লে সেই শিশিতে একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখতে পাবে। সে শিশিতে ইউরেনিয়াম ছাড়া আরোও অনেকগুলো জিনিষ দেখতে পাবে। তুমি তো শুধু ইউরেনিয়ামেই পুরেছিলে, আর শিশিটারও বেশ ভাল ভাবে মুখ বন্ধ ছিল, অথচ তার মধ্যে অন্য নানারকম জিনিষ এলো কোথা থেকে? এল ওই ইউরেনিয়ামটা থেকেই। ইউরেনিয়ামটা আদ্রজান বা হিলিয়ামের মত শক্ত নয়। তার কণাগুলো অনবরত ভেঙে ভেঙে যায়, আর সঙ্গে সঙ্গে অনেক নতুন অণু তৈরি করে। এই যে নতুন অণু তৈরি হয়, তারাও কিন্তু আস্ত থাকে না, তারাও ইউরেনিয়ামেরই মত ভাঙতে ভাঙতে যায় এবং অবশেষে সীসায় (lead) পরিণত হয়। তারা যখন এইভাবে সীসা হয়, তখন তাদের ভেঙে যাওয়া থামে। এইভাবে ইউরেনিয়াম ক্রমাগত ভেঙ্গে গিয়ে সীসায় পরিণত হয়।

ইউরেনিয়ামের এইভাবে ভেঙ্গে গিয়ে সীসক (lead) হয়ে যাওয়া ব্যাপারটা পৃথিবীর উত্তপ্ত বা শীতল কোনও অবস্থার উপর নির্ভর করে না। খুব গরম অবস্থাতেও সে যেমন ভাঙ্গে, খুব ঠাণ্ডা অবস্থাতেও তার ভেঙ্গে যাওয়া ঠিক তেমনিই থাকে। চুম্বক বা বৈদ্যুতিক শক্তি কিছুই এই ভেঙ্গে যাওয়াকে থামান দূরে থাকুক, একটুও কমাতে কি বাড়াতে পারে নি। সেই প্রথম দিন থেকে একটু একটু করে ইউরেনিয়াম যে ভাবে ভেঙে আসছে, আজও সে ঠিক সেই ভাবেই ভেঙে চলেছে। পৃথিবীর জন্মাবার সময়ে কোনও যায়গায় যদি এক আউন্স ইউরেনিয়াম জমা হয়ে থাকে, তবে তা দশ কোটী বছর পরে '৯৮৫ আউন্স ইউরেনিয়ামে গিয়ে দাঁড়াবে, আর সঙ্গে সঙ্গে '০১৩ আউন্স সীসা পাওয়া যাবে। ১০০ কোটী বছর পরে ইউরেনিয়াম জমে গিয়ে হয়ে যাবে '৮৬৫ আউন্স, আর সীসা বেড়ে গিয়ে হবে '১১৬ আউন্স। ২০০ কোটী বছর পরে

ইউরেনিয়াম আরও কমে যাবে। তখন তা হয়ে দাঁড়াবে ·১৪৭ আউন্স আর বেড়ে গিয়ে হয়ে যাবে ২১৯ আউন্স। তাই যেখানেই ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, সেখানে সীসাও থাকে। আর এই ইউরেনিয়াম ও সীসা মেশান পাথরটাতে, কতটা ইউরেনিয়াম আর কতটা সীসা আছে বার করতে পারলেই, উপরে যেমন হিসেব করা হয়েছে, তেমনি করে বলে দেওয়া যাবে যে, কতদিন থেকে এই সীসক এই ইউরেনিয়ামের সঙ্গে জমা হতে আরম্ভ হয়েছে। যে সব পাথরে ইউরেনিয়াম পাওয়া যায়, তাকে রাসায়নিক বিশ্লেষণ করে তার মধ্যে ইউরেনিয়াম আর সীসার অনুপাত বার করলেই সেই পাথরটা কত দিনের বলা যেতে পারে। ভূতত্ত্ববিদেরা এমনি করেই বিভিন্ন যুগের পাথরের বয়স ঠিক করেন।

তোমরা বলতে পার যে, বাইরের সীসক (lead) গিয়ে ইউরেনিয়াম থেকে পাওয়া সীসার সঙ্গে মিশে তার পরিমাণ বাড়িয়ে দিতে পারে। তোমাদের আশঙ্কা অবশ্য খুবই ঠিক। কিন্তু সৌভাগ্যবশতঃ সাধারণ সীসা আর ইউরেনিয়াম থেকে যে সীসা উৎপন্ন হয়, তাদের মধ্যে সামান্য তফাৎ আছে। তাদের রঙ, তাদের সব রকমের রাসায়নিক কাজ ইত্যাদি এক হলেও একটা অপরটা থেকে সামান্য ভারী। সাধারণ সীসার ওজন যদি বলা হয় ২০৭, তবে ইউরেনিয়ামের সীসার ওজন হবে ২০৬। এই প্রভেদটুকুর জন্যেই পাথরের টুকরাটির মধ্যে ঠিক ইউরেনিয়ামের সীসা কতটা আছে, তা নির্ভুল ভাবে বলা যায়।

পৃথিবীর মধ্যে সব থেকে পুরাণ যে পাথর পাওয়া গেছে, তার বয়স এই ভাবে হিসেব করলে বের হয় ১৭০ কোটী বছর। তারপর পৃথিবীর বাইরে থেকে যে সব উল্কাখণ্ড পৃথিবীতে এসে পড়ে, তাদের এইভাবে পরীক্ষা করবার পর দেখা গিয়াছে, এদের কোন কোনটার বয়স ২৯০ কোটী বছর হওয়া সম্ভব। আজকাল ধরা হয়ে থাকে, উল্কা আর পৃথিবী একই সময়ে সৃষ্টি হয়েছে। তা'হলে পৃথিবীর বয়সও বলা যেতে পারে অন্ততঃ ২৯০ কোটী বছর।

এছাড়া আরও একটা উপায়ে পৃথিবীর বয়স আন্দাজ করা যেতে পারে। সূর্য্যের চারদিকে তার গ্রহরা একটা ঠিক নির্দ্দিষ্ট পথে ঘুরে বেড়ায়। এই পথ সাধারণতঃ গোল। কিন্তু ঠিক গোল নয়, একটু চেপ্টা। পথগুলোর এই চেপ্টা হওয়াটা সেই প্রথম দিনে যেমন ছিল, এখন ঠিক তেমন নেই। তা অল্প অল্প করে পরিবর্ত্তিত হয়। কি ভাবে পরিবর্ত্তিত হয়, তা জ্যোতির্ব্বিদেরা মোটামুটি জানেন। এই পথগুলোর বর্ত্তমান অবস্থায় আসতে কতদিন লাগতে পারে। হ্যারল্ড জেফ্রিস (Herold Jeffrys) বলে একজন জ্যোতির্ব্বিদ যে আন্দাজ করেছেন, তাই তোমাদের বলছি। বুধ গ্রহের চলবার পথ বর্ত্তমান অবস্থায় আসতে ১০০ কোটী থেকে ১০০০ কোটী বছর লাগতে পারে। তেমনি চাঁদের চলবার পথে যে পরিবর্ত্তন হয়, তা নিয়ে অঙ্ক কষে দেখলে পাওয়া যায় প্রায় ৪০ কোটী বছর।

এই সব বিচার-বিবেচনা করে বৈজ্ঞানিকেরা স্থির করেছেন যে, পৃথিবীর বয়স অন্ততঃপক্ষে ৩০০ কোটী বছর। কেমন করে পৃথিবীর জন্ম হয়েছিল, তা ২নং চিত্র দেখলেই তোমরা বুঝতে পারবে।

শ্বেত ভালুকেরা আইসল্যাণ্ডে কেমন করিয়া আসে?

মেরুদেশের শ্বেত ভালুকের কথা তোমরা জান, এবং পৃথিবীর উত্তর ও দক্ষিণ প্রান্তে বারমাস বরফে ঢাকা কন্‌কনে ঠাণ্ডা সুমেরু ও কুমেরু ভিন্ন যে অন্য কোথাও এই সকল ভালুক দেখিতে পাওয়া যায় না—এ কথাটাও বোধ করি তোমাদের অজানা নাই। কিন্তু আমি যদি বলি যে, এই দুই প্রদেশ ছাড়াও মাঝে মাঝে অন্য কোথাও শাদা ভালুক দেখিতে পাওয়া গিয়াছে, তাহা হইলে তোমরা বোধ হয় খুব অবাক্ হইয়া যাও, নয়?

কিন্তু বাস্তবিকই একদিন আইসল্যাণ্ডের কয়েকটী ছেলে সমুদ্রের ধারে বেড়াইতে বেড়াইতে দেখিতে পাইল যে, একটী শাদা ভালুক সেখানে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। তাহারা দেখিয়া অবাক্ হইয়া গেল। আর আশ্চর্য্য হইবার কথাও বটে, কেন না তোমরা সকলেই জান যে, আইসল্যাণ্ড দ্বীপটীর চারিদিকে বিশাল সমুদ্র ঘিরিয়া রহিয়াছে,

সুতরাং সেখানে মেরু দেশের শাদা ভালুক যে কিরূপে আসিল, তাহা সত্যই বিস্ময়কর।

সে যাহাই হোক্, তোমরাও বোধ হয় মহা



বরফের হিমচাপের উপর চড়িয়া ভালুক সমুদ্র-স্রোতে ভাসিয়া চলিয়াছে

সমস্যায় পড়িয়া গিয়াছ—"তাই তো এ কি করিয়া সম্ভব হইল। ভারি আশ্চর্য তো!"

কিন্তু আমি যদি তোমাদের ঘটনাটা ভাল করিয়া বুঝাইয়া বলি, তাহা হইলে সহজেই বুঝিতে পারিবে—শাদা ভালুক আইসল্যাণ্ডে কেমন করিয়া আসিল।

আচ্ছা, তোমরা সকলেই বোধ করি গ্রীন্‌ল্যাণ্ডের নাম শুনিয়াছ। ইহা সুমেরুর নিকটবর্ত্তী একটা স্থান।

সুতরাং আশা করি—অতি সহজেই বুঝিতে পারিতেছ, সেখানে কিরূপ ঠাণ্ডা পড়ে। এই অতিরিক্ত ঠাণ্ডার জন্য গ্রীনল্যাণ্ড প্রায় সমস্ত সময়েই বরফে ঢাকিয়া থাকে। সে যাহাই হোক, একদিন এই রকম জমাট বাঁধা হিম সমুদ্রের উপর কয়েকটা শাদা ভালুক খেলা করিতেছিল। তারপর সহসা সেই বরফের একটা হিমচাপ ঢেউয়ের আঘাতে



সমুদ্র বেষ্টিত আইসল্যাণ্ড-দ্বীপে ভালুকটা উপস্থিত হইয়াছে

বা অন্য কোন কারণে খসিয়া পড়িল এবং যে ভালুকগুলি তাহার উপর খেলিতেছিল, তাহার একটাকে লইয়া প্রকাণ্ড বরফের চাপটা সমুদ্র-স্রোতের প্রবল-টানে ভাসিতে ভাসিতে চলিল। কিন্তু সেখানকার সাগর-জল খুব ঠাণ্ডা, কাজেই বরফের চাপটা গলিয়া গেল না এবং শাদা ভালুকটা দিব্য আরামে তাহার উপর ভাসিয়া ভাসিয়া ক্রমে ক্রমে আইসল্যাণ্ড দ্বীপে আসিয়া পৌঁছিল। ভালুকটা যখন দেখিল যে, সে তীরের কাছে আসিয়াছে, তখন সে জলের উপর ঝাঁপাইয়া পড়িয়া কোনক্রমে আইসল্যাণ্ডের তীরে আসিয়া পৌঁছিল। আইসল্যাণ্ডবাসী ছেলের দল কিছুক্ষণ পরে সমুদ্র-তীরে এই শাদা ভালুকটাকে দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইয়া গেল।

এইরূপ ঘটনা আইসল্যাণ্ডে প্রায়ই ঘটে, এবং আইসল্যাণ্ডবাসীরা ইহাদের দেখিলেই মারিয়া ফেলে। কেননা, দলে ভারী হইয়া উঠিলে এই শাদা ভালুকের দল অধিবাসীদের ভয়ানক ক্ষতির কারণ হইতে পারে।

গাছেরা কিরূপ ভাবে বাড়ে ?

তোমরা বাগানে একটা বীজ পুঁতিলে উৎসুক হইয়া পড়, রোজই দেখিবার জন্য ব্যাকুল হও, কখন অঙ্কুর বাহির হইবে, এবং দিন দিন তাহা কতটা বাড়িয়া গিয়াছে। গাছের বাড় বাড়ন্ত (growth) অনেকটা নির্ভর করে জল-বায়ু ও মাটির উপর। পাহাড়ের কিনারাস্থিত গাছের চেয়ে অধিত্যকা বা উপত্যকাস্থ গাছের বৃদ্ধি অনেক বেশী।

আখরোট গাছ খুব দ্রুত বাড়ে। দীর্ঘ পত্র দেবদারু (long-leaf pine) চার পাঁচ বৎসরে পাঁচ ইঞ্চির বেশী বাড়ে না। ওক্ (oak) গাছের কাণ্ড কুড়ি বৎসরে মাত্র এক ফুট উঁচু হয়, আর আধ ফুটের বেশী তার বেড় হয় না। ইংলণ্ডের ইসেক্সের (Essex) অন্তর্গত উইমবুশ (Wimbush) নামক স্থানের একটা ওক্ গাছ তের বৎসরে উহার বেড় বাড়িয়াছিল মাত্র ৪॥ ইঞ্চি। আর একটি লার্চ (larch দেবদারু জাতীয় বৃক্ষ বিশেষ) গাছের বেড় সেই সময়ের মধ্যে বৃদ্ধি পাইয়াছিল ৩৩ ইঞ্চ। অন্যান্য ওক্ গাছের অপেক্ষা আট গুণ বাড়িয়াছিল। টাসমানিয়া (Tasmania) নির্যাস প্রদ বৃক্ষ (Gum tree) বীজ বপনের পর হইতে চারি বৎসরের মধ্যে বাড়ে চল্লিশ ফিট, এগার বৎসরে ৬০ ফিট।



দেশ-বিদেশের কথা

ব্রহ্মদেশ

১৮৮১ পৃষ্ঠার পর

ব্রহ্মদেশকে বিদেশী লোকেরা নাম দিয়াছেন সোনার দেশ (Shwe Pyi)।



সিউ-ডেগন প্যাগোডা—দক্ষিণাংশ



ব্রহ্মদেশীয়া মহিলা

চারিদিকের শোভা-সৌন্দর্য্য ও ঐশ্বর্য্য-মণ্ডিত প্যাগোডাগুলির জন্যই বোধ হয় এ-দেশের এ নাম হইয়াছে। দেশটি কিন্তু খুব ছোট-খাট নয়—ইন্দোচীন (Indo-China) উপ-

দ্বীপের ইহা পশ্চিমাংশ। পরিমাণ ফল হইবে ২৪০,০০০ বর্গ মাইল। ব্রহ্মদেশ এখন পর্য্যন্তও ভারত-সরকারের শাসনাধীন, শীঘ্রই উহা ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া স্বতন্ত্র প্রদেশে পরিণত হইবে। এ-দেশে অনেক ছোট ছোট রাজ্য আছে, সে সব রাজ্যগুলি ব্রিটিশ রাজপ্রতিনিধিদের উপদেশে দেশীয় রাজারা বা প্রধানেরা শাসন করেন।

ব্রহ্মদেশের সীমানার কথা শোন। সুদূর উত্তর সীমা-সম্বন্ধে তিব্বত ও চীনের মধ্যস্থিত সীমার সহিত ব্রহ্মদেশেরও এখন কোন মীমাংসা হয় নাই। তাহার সীমা-নির্দ্দেশের জন্য এক "ব্রহ্ম চীন সীমান্ত নির্দ্দেশ কমিশন" নিযুক্ত হইয়াছে। উত্তর-পশ্চিম সীমা হইতেছে আসাম, মণিপুর এবং লুশাই পর্ব্বতশ্রেণী; পশ্চিম সীমা বঙ্গোপ-সাগর; দক্ষিণ দিকে বঙ্গোপসাগর, মার্ত্তাবান সাগরশাখা (উপসাগর) এবং মালয় উপদ্বীপ। উত্তর-পূর্ব্ব এবং পূর্ব্ব সীমা হইতেছে য়ুনান্, চীন-শান্ এবং লাওরাজ্য, ফরাসী-ইন্দোচীন এবং শ্যাম দেশ। ইরাবতী নদীর উৎস হইতে ভিক্টোরিয়া পয়েন্ট (Victoria Point) পর্য্যন্ত দৈর্ঘ্য হইতেছে ১,২০০ মাইল। আর আকিয়াব (Akyab) হইতে মিকাঙ্গ (Mekang) পর্য্যন্ত ব্রহ্মদেশ প্রস্থে হইবে ৫০০ শত মাইল।

ব্রহ্মদেশের পশ্চিমে এবং দক্ষিণ দিকে সমুদ্রের নীল জল আনন্দে নৃত্য করে। কোন কোন যায়গায় পাহাড় একেবারে সমুদ্র হইতে খাড়া উঠিয়াছে, সেই পাহাড়গুলি নানা বৃক্ষ-লতা-গুল্মে পরিপূর্ণ। ঐ সব পাহাড়ের গায়ে নানা অসভ্য জাতীয় লোকের বাস। সমুদ্রের মধ্যে অনেকগুলি ছোট ছোট দ্বীপ আছে। তাহাদের মধ্যে শাপুরি (Shapuri) দ্বীপটি নাফ্ (Naaf) নদীর মোহানায় অবস্থিত। তাহা ছাড়া বরোঙ্গা (Baronga) দ্বীপপুঞ্জ, রামরি (Ramri), চেডুবা (Cheduba) বা মানায়ুঙ্গ (Manaung) প্রধান।

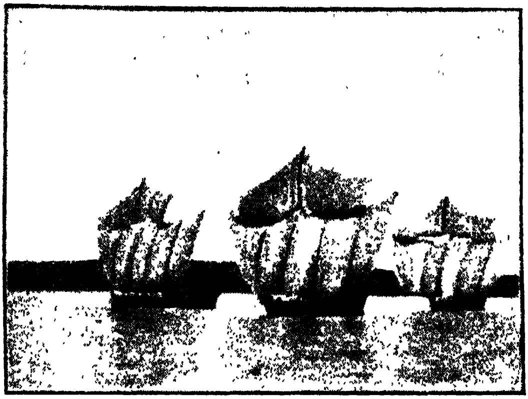


ইরাবতী নদীর বুকে সেগুন কাঠের ভেলা

ব্রহ্মদেশটি পাহাড়-পর্ব্বতে পরিপূর্ণ। সমুদ্র-তীরের অনেকটা স্থান জুড়িয়া সমতল ভূমি, সমতল ভূমির পশ্চাতে বন-জঙ্গলে ভরা পর্ব্বতশ্রেণী, সেই সব পাহাড়ের বুক হইতে অসংখ্য নদ-নদী আসিয়া সমুদ্রের জলে মিশিয়াছে। তীরের সমতল ভূমিতে ধানের চাষ। বর্ম্মীরা বলিতে পারেন— 'এমন ধানেব উপর ঢেউ খেলে যায় বাতাস কাহার দেশে!' মাঝে মাঝে বন্যার জল তীর ছাপাইয়া চলে। ধান, সেগুন কাঠ, পেরেফিন (মেটে তেল), এবং রুবি-পাথর এদেশে প্রচুর মিলে।

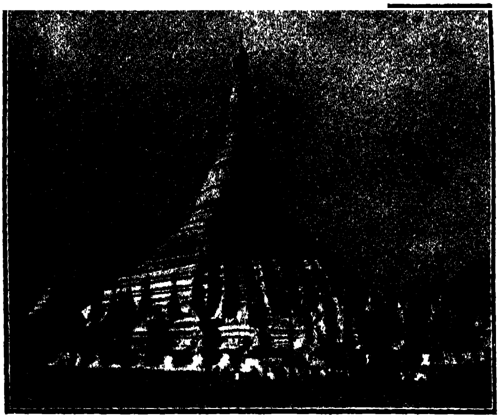
রেঙ্গুন সহর ব্রহ্মদেশের রাজধানী। সহরটি একেবারে আধুনিক। ইরাবতী

নদীর মোহানায় বলিয়া এই সহরের দৃশ্য অতি মনোহর পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে রেঙ্গুণের নাম কেই বা জানিত! এখন কিন্তু ভারত সাম্রাজ্যের মধ্যে সামুদ্রিক বন্দরের দিক দিয়া ইহা তৃতীয় স্থান অধিকার করিয়াছে। ইরাবতী নদীর ঘোলা জলের মধ্যে সেগুন কাঠের ভেলার উপর বাঁশের ছোট ঘর—আর নদীর বুকে ধান বোঝাই নৌকার সারি লোকের দৃষ্টি আকর্ষণ করে।



ধান বোঝাই নৌকা—ইরাবতী নদী

রেঙ্গুণের পথে আসিলেই চোখের উপর সিউ-ডেগন প্যাগোডা (Shwe-Dagon) বা স্বর্ণ প্যাগোডার বিরাট ও সুন্দর দৃশ্য ছবির মত দেখিতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুণ সহরটি খুব পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন; গাড়ী, ইলেট্রিক ট্রাম, মোটর ও বাইসাইকেলের অভাব নাই। গরুর গাড়ীর সংখ্যা সহরে খুব কম। মানুষেই গাড়ীতে মাল টানিয়া নেয়—এখন তো অসংখ্য মোটর লরি দেখিতে পাওয়া যায়। রেঙ্গুণের পথ-ঘাট, বাজার একেবারে তক্‌তকে ঝক্‌ঝকে।

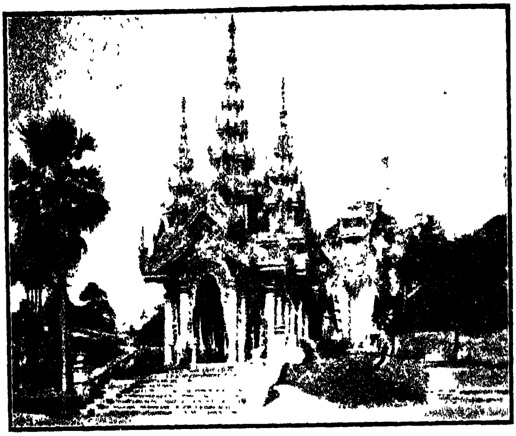


সিউ-ডেগন প্যাগোডা—রেঙ্গুণ

এখানের সিউ-ডেগন প্যাগোডা দেখিলে অতিশয় বিস্মিত হইতে হয়। আড়াই হাজার বৎসর পূর্ব্বে ভারতে যে ত্যাগী মহাপুরুষের জন্ম হইয়াছিল, সেই মহাপ্রাণ বুদ্ধদেবের কথা স্মরণে উদিত হয়, আর আপনিই ভারতবাসীর মন ভক্তিতে নত হয়।

সিউ-ডেগন প্যাগোডা একটি ছোট পাহাড় বা উচ্চ মাটির ঢিপির উপর অবস্থিত। এই মন্দিরটি নির্ম্মাণ-

সম্পর্কে অনেক কিংবদন্তী চলিয়া আসি-তেছে। একটির কথা বলিতেছি। সিদ্ধার্থ



সিউ-ডেগন প্যাগোডার দক্ষিণ দিকের প্রবেশ-দ্বার

যখন উরুবিল্ব গ্রামে (বুদ্ধগয়া) তপস্যা করিয়া সিদ্ধিলাভান্তে 'বুদ্ধ' নাম গ্রহণ করেন, তখন বাঙ্গালায় বড় দুর্ভিক্ষ হয়। সে সময়ে ব্রহ্মের দুই রাজপুত্র বা দুই সওদাগর পুত্র (ঠিক্ করিয়া তো আর বলা যাইবে না!) বাঙ্গালা-দেশে চাউল বিতরণ করিতে যান। গয়ায় বুদ্ধের সহিত তাঁহাদের দেখা হয়। বুদ্ধ তাঁহাদের সৎকার্য্যে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাদিগকে তাঁহার মস্তকের আটগাছি কেশ দেন, এবং তাঁহারা সেই কেশ এই প্যাগোডায় স্থাপন করেন। কিন্তু সেই সময়ে এই প্যাগোডা আকারে ক্ষুদ্র ছিল, পরে ব্রহ্মদেশের রাজারা এই প্যাগোডাকে বড় করিয়া নির্ম্মাণ করেন। প্যাগোডাতে চারিটি প্রবেশ-দ্বার আছে। প্রত্যেকটি হইতে সিঁড়ি বাহিয়া পাহাড়ের উপর উঠিতে হয়। এই সিঁড়ি খুব প্রশস্ত এবং বরাবর ছাদ দিয়া ঢাকা। সিঁড়ির উপর দুই ধারে দোকানের সারি। বুদ্ধদেবের সম্মুখে দিবার জন্য বর্ম্মাবাসীরা ফুল, বাতি, ধূপ-কাঠি ইত্যাদি বিক্রয় করে, এবং অন্যান্য দ্রব্যও, যেমন—ছবি, পুতুল, ইত্যাদি বিক্রয় করিয়া থাকে। খাবার জিনিষ, যেমন—ডিম, বিস্কুট,



বুদ্ধমূর্ত্তি ও পদচিহ্ন

ভাত-তরকারি—এ-সবও পথের ধারে বিক্রয় হয়, এ-দেশে জাতিভেদ নাই।

সিঁড়ি বাহিয়া কতকটা উঠিলে পর একটা গড় এবং গড়ের উপর কেল্লার মত পুল ও ফটক আছে। তাহার উপর আরও খানিকটা উঠিলে একটি শান বাঁধানো প্রকাণ্ড উচ্চস্থান চারিদিকে প্রাচীর বেষ্টিত দেখা যায়। তাহারই মধ্যস্থলে মন্দির বা ফায়া। মন্দিরটি খুব উঁচু, নীচের তলাটা খুব প্রশস্ত এবং অষ্ট-কোণ-বিশিষ্ট। ইহা ক্রমে সংকীর্ণ হইয়া একেবারে বিন্দুতে পরিণত হইয়াছে। মন্দিরের বাহিরের প্রায় সমুদয় ভাগটাই স্বর্ণমণ্ডিত। তাহার উপর সোনার ছাতা।



ফুঙ্গিরা রাজপথে ভিক্ষা করিতেছে

সকল মন্দিরের উপরেই এই রকম একটি ছাতা থাকে। সেই ছাতির গায়ে অসংখ্য সোনা রূপা ও অন্যান্য ধাতুর ঘণ্টা ঝুলিতে থাকে। বাতাসে তাহা দুলিতে দুলিতে বেশ



সুলে প্যাগোডার পথ—রেঙ্গুণ

সুন্দর শব্দ হয়। রাজা মিনগুন সিউ-ডেগন প্যাগোডার ছাতিটি দান করিয়াছিলেন। এই ছাতার মূল্য সত্তর-আশীলক্ষ টাকার কম হইবে না। মন্দিরটি নিরেট, ইহার ভিতরে কিছুই দেখিবার নাই। ইহার চারিদিকে অনেকগুলি কাঠের মন্দির। তোমরা কলিকাতায় ইডেন গার্ডেনেও প্রায় ঐরূপ একটি মন্দির দেখিতে পাইবে। চারিদিকের মন্দিরে বুদ্ধের ধ্যানী অবস্থার অসংখ্য মূর্ত্তি আছে। কোথাও বুদ্ধের অর্দ্ধ-শয়ান মূর্ত্তি, কোথাও তাঁহার পদচিহ্ন, কোন মূর্ত্তি শ্বেত প্রস্তরের, কোনটি সোনার পাতে

ঘোড়া, কোনটি পিতলের, কোনটি ইষ্টকের। এইসব মূর্ত্তিগুলি আবার নানা আকারের, কোনটি খুব বড়, কোনটি ছোট। এইসব মূর্ত্তির কাছে বসিয়া বর্ম্মীরা বাতি জ্বালিয়া দেয়, ফুল দেয়, চাল-কলাও দেয়, আর করযোড়ে বসিয়া মন্ত্র উচ্চারণ করে। কোন কোন মন্দিরে অনেকগুলি ছোট ঘণ্টা আছে। ঘণ্টাগুলি হরিণের শিঙ্গ দিয়া বাজান হয়। এই প্যাগোডায় একটি ঘণ্টা আছে, তাহার উচ্চতা ৮।৯ ফিট, বেড়ও তেমনি, ওজনে ১০০০ মণেরও বেশি। এই মন্দিরের কাছে বসিয়া বর্ম্মী ভিক্ষুরা বেহালা, করতাল



দাঁতওয়ালা হাতী বড় বড় কাঠ ভাসাইতেছে

এবং জলতরঙ্গের বাজনা বাজাইয়া গান করে। এই প্যাগোডার সৌন্দর্য্য ভালরূপ অনুভব করিতে হইলে প্রায় এক সপ্তাহ কালের আবশ্যক হয়। একজন ইংরাজ লেখক



বৌদ্ধ ধর্ম্ম-যাজক ও তাঁহার শিষ্যবর্গ

এই প্যাগোডার সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—"Every visitor to Rangoon visits the famous Golden Pagoda, a monument to the memory of Buddha. It is a vast column springing from a huge octagonal base a quarter of a mile round, and narrowing as it ascends until it becomes a dizzy trembling rod which a child could grasp in its hand. The summit of the Pagoda is higher than the cross on the top of St. Paul's Cathedral. From base to

summit it is covered with gold-leaf, and, as you may well imagine, it is a most impressive sight." (Britain Over Seas—page 221)

রেঙ্গুণ সহরের মধ্যে সুলে প্যাগোডা নামে আর একটি প্যাগোডা আছে। সি উ-ডেগন প্যাগোডার সহিত ইহার তুলনা হয় না। ব্রহ্মদেশে মন্দির ও প্যাগোডার অভাব নাই। যেদিকে যে অঞ্চলে বেড়াইতে যাও, সেখানেই প্যাগোডা দেখিতে পাইবে, কোনটি বড়, আবার কোনটি ছোট। এই সব প্যাগোডার চারিদিকে বৌদ্ধ ধর্ম্ম-যাজক বা ফুঙ্গিরা বাস করেন। তাঁহাদের মাথা নেড়া, আর হলদে রঙের কাপড় পরা।



রয়াল লেক্—রেঙ্গুণ

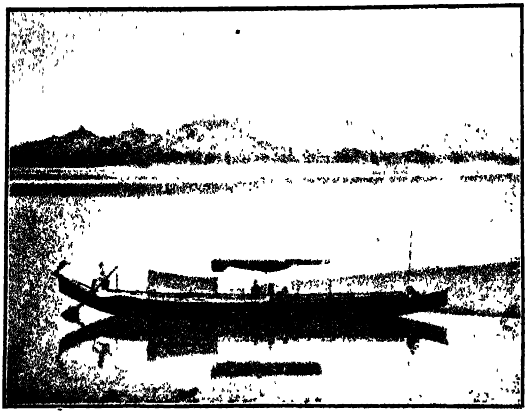


ইরাবতী নদীতে মেয়েরা স্নান করিতেছে

ফুঙ্গিরা পথে পথে ভিক্ষা করিয়া জীবিকা-নির্ব্বাহ করেন। তাঁহারা মঠে আবার বালকদিগকে শিক্ষাদান করেন। উহা অনেকটা আমাদের দেশের চতুষ্পাঠীর মত। শ্রমণ শিষ্যদিগকে বেশ মনোযোগের সহিত শিক্ষা দিয়া থাকেন। ব্রহ্মদেশের প্রত্যেক গ্রামেই বৌদ্ধ-শ্রমণেরা বাস করেন। এখানকার বালকেরা কিছুদিন মঠে থাকিয়া লেখা-পড়া শিখে। এইখানে তাহাদের চরিত্র গঠিত হয়।

তোমাদের কাছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, রেঙ্গুণ একটি শ্রেষ্ঠ সামুদ্রিক বন্দর। এখানে নানা দেশের বাণিজ্য-তরী আসে, যাত্রী-জাহাজ আসে। সেগুন কাঠের ব্যবসায়

এখানে বিশেষ প্রসিদ্ধ। এখানে সেগুন কাঠের ভেলা যেমন দেখিতে পাওয়া যায়,



ইরাবতী নদীর তীর—পাহাড়ের উপর প্যাগোডা

তেমনি দেখিতে পাইবে বড় বড় দাঁতওয়ালা হাতীরা ইরাবতীর জলে প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড সেগুন কাঠ ভাসাইয়া দিতেছে।

রেঙ্গুণ সহরে নানা জাতির লোকের বাস। এখানকার Royal Lake ও দেখিবার জিনিষ। নীলাভ জলের তরঙ্গ-লীলা, তীরের সবুজ তৃণমণ্ডিত মাঠ, আর দূরে সিউ-ডেগন প্যাগোডার মন্দির-চূড়াটি সহজেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে।

ভারতবর্ষে যেমন গঙ্গা, ব্রহ্মদেশে তেমনি ইরাবতী। ইংরাজীতে বলে Irrwaddy। এই নদীর দুই পাড়েই ব্রহ্মদেশের শিল্প ও বাণিজ্য প্রসার লাভ করিয়াছে। এই নদীর বুকে তরী বাহিয়া যদি তুমি বেড়াইতে যাও, হঠাৎ তোমার মনে হইবে, যেন নিম্ন বঙ্গের একটি পল্লীতে আসিয়াছ। তেমনি নদীর কোথাও উচু পাড়, কোথাও বা ঢালু তীর। কোথাও ঘন তরু-শ্রেণী, বাঁশ বন। বাঁশ বনের আড়াল দিয়া আঁকিয়া বাঁকিয়া গ্রামের সুন্দর পথখানি চলিয়া গিয়াছে। ক্রমে অগ্রসর হইতে থাক, দেখিবে কোথাও নদীর তীরে তীরে পাহাড়ের সারি চলিয়াছে। শ্যামল-শ্রী মণ্ডিত তাহাদের শিখরগুলির উপর শাদা শাদা প্যাগোডার



ব্রহ্মদেশের গ্রাম্য পথ

চূড়া সূর্য্য-কিরণে ঝক্ মক্ করিতেছে। এই ইরাবতী নদীর তীরেই ব্রহ্মদেশের

বড় বড় কল-কারখানা গড়িয়া উঠিয়াছে। কোথাও সেগুন কাঠের কারবার, কোথাও ধান ও চালের আড়ত, কোথাও বা হাট, ছোট ছোট বন্দর—সব কিছুই দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর পাড়ে উঠিয়া যদি কোন একটি গ্রামের মধ্যে যাও, তাহা হইলে তোমার চোখের সম্মুখে গ্রামের দৃশ্য কিরূপ ভাবে প্রতিভাত হইবে, তাহা ছবিতে দেখিতে পাইবে। গ্রামের মধ্য দিয়া পথ চলিয়াছে। দুইদিকে মাচার উপর খড়ো ঘর—দারিদ্র্যের চিহ্ন। সেই চিরপরিচিত গরুর গাড়ী। অপরিচ্ছন্ন পথ, দু'চারিটি নারিকেল গাছ মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে। গ্রামের লোকেরা কঠোর পরিশ্রম করিয়া জীবিকা-অর্জ্জন করে, পুরুষদের চেয়ে স্ত্রীলোকেরাই অধিক শ্রমশীলা। তাহারা ক্ষেতে কাজ করে, ধান ভানে, চাল ঝাড়ে, বাজার করে, চুরুট তৈয়ারী করে, কাপড়



ধান ভানে, চাল ঝাড়ে

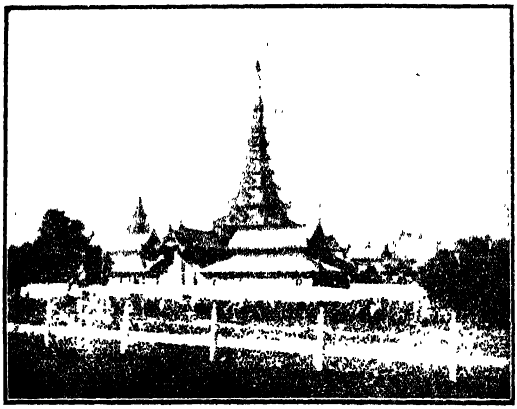
বুনে। তাহারা নিজেদের ব্যবহার্য্য লুঙ্গি, জামা নিজেরাই প্রস্তুত করে। পরপ্রত্যাশী তাহারা বড় একটা নয়। ব্রহ্ম-রমণীদের মত এইরূপ শ্রমশীলা মহিলা পৃথিবীর অন্যান্য দেশে বড় কম দেখা যায়।



ব্রহ্ম রমণীদের তাঁত বুনা

রেঙ্গুণের কথা বলিতে বলিতে ইরাবতী নদীর কথা ও ব্রহ্ম-দেশের গ্রাম্য জীবনের কথাও অনেকখানি বলিয়া ফেলিলাম। এখন 'রেঙ্গুণ' এই নামের উৎপত্তির ইতি-হাস বলিয়া অন্যান্য কথা বলিব। রেঙ্গুণ হইতেছে ব্রহ্মদেশের প্রবেশ-পথ, যেমন—কলোম্বো, পিনাঙ্গ, সিঙ্গাপুর, বোম্বে। নানা বিদেশী জাতিতে ভরপুর, বিদেশীর প্রভাবও বড় কম নয়। সে খুব

বেশি দিনের কথা নয়, রাজা আলোঙ্গপ্রা এই নগরটি জয় করেন, তখন ইহার নাম ছিল ডেগন (Dagon)। সেই ডেগন পরিবর্ত্তিত হইয়া হইল ইয়ান গুন (Yan Goon) বা বিজিত নগর (Victory Completed)। পরে যখন ইংরাজ জাতি এই অঞ্চল অধিকার করেন, তখন তাঁহারা আরাকানী দ্বি-ভাষীদের উচ্চারণ দোষে শুনিলেন রেঙ্গুণ (Rangoon)। রেঙ্গুণের অধিবাসীদের মধ্যে অধিকাংশই আরাকানী, ইহারা খাটি বর্ম্মী নহে।



ম্যাণ্ডেলের রাজ-প্রাসাদ

রেঙ্গুণের পরে ব্রহ্মদেশে দেখিবার মত স্থান হইতেছে মন্দালয় বা ম্যাণ্ডেলে (Mandalay)। রেঙ্গুণ হইতে যে রেলপথ ম্যাণ্ডেলে গিয়াছে, সেই পথের দুই ধারে দেখিতে পাইবে দিগন্ত প্রসারিত ধান্য ক্ষেত্র। প্রায় একশত মাইল পথ কেবল ধানের ক্ষেত। নীল আকাশের নীচে সবুজ ধানের ক্ষেতগুলির শোভা অতিশয় মনোহর। তাহার পর পাহাড়ের আরম্ভ। রেঙ্গুণ হইতে যত উত্তরে যাইবে, ততই পাহাড় দেখা যায়। এ দেশকে পাহাড়ের দেশ বলা যায়। মধ্যে মধ্যে বড় বড় নদী। নদীর উপর রেলের পুল। এ দিকে অনেক পাহাড়ের গায়েই ফায়া বা বৌদ্ধ মঠ আছে। আমাদের দেশের মত এ-দেশের চাষারাও পাগড়ির উপর টোকা পরিয়া ক্ষেত চাষ করে। কোমর হইতে হাঁটু পর্য্যন্ত উল্কি পরে।

ম্যাণ্ডেলে বেশ বড় সহর। এই সহরের চারি দিক বেড়িয়াই পাহাড়। এক দিকে ইরাবতী নদী। নদীর অপর পাড়ে পাহাড়। সহরের এক ধারে একটি ছোট পাহাড় আছে, তাহাকে লোকে ম্যাণ্ডেলে পাহাড় বলে। এখানে কতকগুলি ফায়াও আছে। এই পাহাড়টির উচ্চতা ৮০০।৯০০ ফিট হইবে। অনেকগুলি সিঁড়ি বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। এখানে বুদ্ধের বৃহৎ পদ-চিহ্নও আছে। পাহাড়ের উপরের এই ফায়াগুলিতে বুদ্ধের নানারূপ মূর্ত্তি আছে। তাহা ছাড়া জীব-জন্তুর মূর্ত্তিও আছে অনেক। এই পাহাড়ের উপর হইতে ম্যাণ্ডেলে সহরটি অতি সুন্দর দেখায়। একদিকে ইরাবতী রূপার মত শাদা জল বুকে করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে, আর চারিদিকে সবুজ তৃণ-মণ্ডিত পর্ব্বত-শ্রেণী। এখানকার রাস্তাগুলির নাম A road, B road ইত্যাদি।

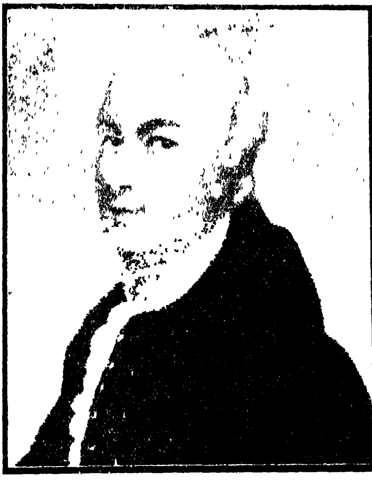
ম্যাণ্ডেলের প্রধান দ্রষ্টব্য হইতেছে এখানকার রাজ-প্রাসাদ। সহর হইতে এই বিখ্যাত প্রাসাদটি দেড় মাইল দূরে অবস্থিত।



জেমস ক্রস

১৭৫৮ খৃঃ অব্দের কথা। সে সময়—ইংলণ্ড এবং স্পেনের মধ্যে যুদ্ধ আসন্নপ্রায় হইয়া আসিয়াছে। উইলিয়ম পিট (বড়) রাজার আদেশে জরুরী বিষয়ে চিন্তা করিতেছিলেন একজন অধস্তন কর্মচারীর উদ্ভাবিত নূতন উপায়ে শত্রুসৈন্যদের আক্রমণ করিবার কথা ভাবিতেছিলেন।

একজন তরুণ যুবকের এরূপ অসমসাহসিক উদ্ভাবনী শক্তি-কৌশলের পরিচয় পাইয়া পিট তাঁহাকে নিজের নিকট ডাকিয়া পাঠাইলেন। একজন অতি দীর্ঘদেহ স্বচ্ছ যুবক আসিয়া পিটের সম্মুখে উপস্থিত হইলেন। ইনিই জেমস্ ক্রস্। তখন পর্য্যন্ত তিনি সামান্য মদ্য-ব্যবসায়ী মাত্র। কেহ তাঁহার নামও জানিত না। যুদ্ধের আক্রমণ-কৌশল বিষয়ে জেমস্ ক্রস্ কিছুই জানিতেন না, তথাপি অসাধারণ আত্মবিশ্বাস ও দৃঢ়তার সহিত বিরুদ্ধ প্রতিবাদ তুচ্ছ করিয়া তিনি নিজ মত প্রতিষ্ঠা করিতে দৃঢ়সঙ্কল্প হইলেন। ক্রস্ বলিলেন যে, গ্যালিসিয়ার (Galicia) ফেরল (Ferrol) নামক স্থানে পারিলেও তাঁহার এই দৃঢ় ধারণা হইয়াছে যে, ফেরল হইতে সমুদ্রের দিক দিয়া স্পেন আক্রমণ করিলে জয়লাভের সুনিশ্চিত সম্ভাবনা রহিয়াছে।



জেমস্ ক্রস

পিট ক্রসের সঙ্কল্পের দৃঢ়তার পরিচয় পাইয়া তাঁহাকে কার্য্যে প্রস্তুত হইতে সম্মতি দিলেন। ক্রস্ কথা ও কাজে সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া কহিলেন—"রাজা যদি আমার হস্তে একটি তরণী ও জাতীয়-পতাকার ভার ন্যস্ত করেন, তাহা হইলে আমি তাহা নিজ হস্তে ফেরলের তীরে উত্তোলন করিয়া আসি।"

কিন্তু ভাগ্য অনুকূল ছিল না। ক্রস্ যখন রাজকীয় অনুমতির অপেক্ষা করিতেছিলেন, সে

সময় খবর আসিল—পিট কর্ম্মত্যাগ করিয়াছেন, কাজেই সেই সামরিক অভিযান-যাত্রা স্থগিত হইয়া গেল। তথাপি এ ঘটনা ব্রুসের জীবনে স্মরণীয়, কারণ এই ব্যাপারের ফলেই তিনি লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের অমূল্য বন্ধুত্ব লাভ করেন।

১৭৩০ খৃঃ অব্দের ১৪ই ডিসেম্বর তারিখে ষ্টার্লিং সায়ারের (Stirling Shire) কিনার্ড (Kinnaird) নামক স্থানে জেমস্ ব্রুসের জন্ম হয়। তিন বৎসর বয়স হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মা মারা যান। বাল্যকালে ব্রুসের স্বাস্থ্য মোটেই ভাল ছিল না। নানাবিধ ব্যায়াম-চর্চ্চা ও ক্রীড়াশক্তির ফলে যৌবনে তিনি সবল স্বাস্থ্য লাভ করেন।

প্রথমে হ্যারোতে (Harrow) ও পরে এডিনবরা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিয়া তিনি যাজক হইবেন স্থির করেন। পরে তিনি আবার আইন পড়িবেন ঠিক করিলেন। ১৭৫৩ খৃঃ অব্দে বিবাহের পর সমুদয় সঙ্কল্প ত্যাগ করিয়া ব্রুস্ একজন মদ্য-ব্যবসায়ীর অংশীদার হন। বিবাহের এক বৎসর পরেই দুর্ভাগ্যবশতঃ ব্রুসের পত্নী বিয়োগ হয়। ভগ্নমনে ব্রুস্ দেশভ্রমণে বাহির হইবেন স্থির করিলেন। কয়েক বৎসর তিনি স্পেনে ও পর্টুগালে ঘুরিয়া বেড়ান।

উইলিয়াম পিটের সহিত পরিচিত হইবার পর হইতেই জেমস্ ব্রুসের আবিসিনিয়ার দিকে দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়। লর্ড হ্যালিফ্যাক্সের ব্রুস্ সম্বন্ধে অতি উচ্চ ধারণা হইয়াছিল। তিনি উদ্যোগী হইয়া ব্রুস্কে এ্যালজিয়ার্স-এ (Algiers) কন্সাল রূপে প্রেরণ করিবেন স্থির করিলেন। ব্রুসের এই রকম কার্য্যই মনোমত ছিল, কারণ এ কাজে কৌশল, বুদ্ধি ও সাহসিকতা প্রভৃতির প্রয়োজন আছে। ব্রুসের এ সমুদয় গুণই ছিল। কাজেই নানা অসুবিধা সত্ত্বেও ব্রুস্ এ কার্য্যে বিশেষ দক্ষতার পরিচয় দিতে পারিয়াছিলেন।

দুঃসাহসিক কার্য্যে ব্রুসের চিরদিনই প্রবল আগ্রহ ছিল। কন্সালরূপে নানা বিপজ্জনক অবস্থায় ব্যাপৃত থাকা সত্ত্বেও ব্রুসের এ আগ্রহ মিটিল না, তিনি লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে জানাইলেন যে, তিনি এ কার্য্য হইতে অবকাশ লইতে চান। নীল নদের উৎস-সন্ধান ও পার্শ্ববর্ত্তী দেশগুলি আবিষ্কার করিয়া বেড়াইবেন—ইহাই তাঁহার ছুটি লইবার কারণ। অনেক বিবেচনার পর ব্রুসের আবেদন মঞ্জুর হইল। ১৭৬৫ খৃঃ অব্দের গ্রীষ্মকালে ব্রুস্ কার্য্য হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেন।

আবিসিনিয়া যাইবার প্রবল আগ্রহ সত্ত্বেও ব্রুস্ প্রথমতঃ রহস্যময় বার্ব্বারি (Barbary) প্রদেশে যাইবেন স্থির করিলেন, কারণ লর্ড হ্যালিফ্যাক্সকে কতকগুলি প্রাচীন ধ্বংসাবশেষের চিত্র আঁকিয়া দিবার তাঁহার কথা ছিল। এ কার্য্যে ব্রতী হইবার পূর্ব্বে ব্রুস্ প্রায় ছয়মাসকাল ইটালীতে থাকিয়া রেখাঙ্কন-বিদ্যা শিক্ষা করেন। এতদ্ব্যতীত আরবীয় ভাষাও তিনি বিশেষ মনোযোগের সহিত শিখিয়াছিলেন।

বালুগানি (Balugani) নামক একজন দক্ষ রেখাঙ্কনবিদকে সঙ্গী লইয়া ব্রুস্ প্রায় একবৎসর কাল মরুভূমিতে কাটাইয়া তিনি কতকগুলি আশ্চর্য্য চিত্রলিপি প্রস্তুত করিয়াছিলেন। এই চিত্রগুলি পরিশেষে ইংলণ্ডরাজের উইণ্ডসর প্রাসাদের চিত্র-সংগ্রহে স্থানলাভ করিয়াছিল।

এইবারে ব্রুসের প্রধান যাত্রার পালা। বহু শতাব্দী ধরিয়াই নীল নদের উৎস-সম্বন্ধে নানা বিতর্ক চলিয়া আসিতেছিল। ব্রুস্ সে সমস্তার সম্পূর্ণ সমাধান করিবেন স্থির করিলেন।

প্রথমেই এমন বিপদ ঘটিল যে, অন্য লোক হইলে ইহাতেই হাল ছাড়িয়া দিতেন। ব্রুস্ বেনগাজি (Bengazi) নামক দুর্ভিক্ষ-পীড়িত দেশ হইতে পলায়ন করিয়া আসিতেছিলেন, এমন সময় ত্রিপলির (Tripoli) তীরে জাহাজ ভগ্ন হয়। ব্রুস্ খুব ভাল সাঁতার জানিতেন। কাজেই কোনরূপে সাঁতরাইয়া প্রাণরক্ষা করিয়া তীরে উঠিলেন। দীর্ঘ সাঁতারে অবসন্ন হইয়া তীরে পড়িয়া আছেন, সেই সময় একদল আরব তাঁহাকে আক্রমণ করিল, এবং দারুণ ভাবে প্রহার করিয়া তাঁহার কাপড়-জামা সমুদয় কাড়িয়া লইল। ইহার পরে আবার তাঁহার খুব ম্যালেরিয়া জ্বর হয়। এ রোগের প্রকোপ হইতে তিনি জীবনে সম্পূর্ণরূপে সারিয়া উঠিতে পারেন নাই।

ব্রুসের দুর্দ্দম মানসিক শক্তি এইসব বাধা-বিঘ্নে আরও বাড়িয়া গেল। একটু সারিয়া উঠিতেই তিনি কাইরো (Cairo) রওনা হইলেন। এখানে পৌছিয়া দেখিলেন, তাঁহার আগমন-সংবাদ পূর্ব্বেই

রটিয়া গিয়াছে। এই স্থানের প্রধান শাসন-কর্ত্তার (Bey) অমায়িক লোক হিসাবে কোন খ্যাতি ছিল না, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এ-ক্ষেত্রে বে পরম সমাদরে ব্রুস্‌কে গ্রহণ করিলেন। এমন কি ব্রুসের দেওয়া উপঢৌকনও তিনি লইতে অসম্মত হইলেন।

ব্রুস্ তো কয়েকদিন পর্য্যন্ত ভাবিয়াই ঠিক করিতে পারিলেন না—বে'র এত সদয় ব্যবহারের কারণ কি! তখন হঠাৎ তাহার মনে পড়িল, তাইত! আলেক-জান্দ্রিয়াতে যখন ব্রুসের জিনিসপত্র খুলিয়া দেখা হয়, তখন কতকগুলি আশ্চর্য্য যন্ত্রপাতি দেখা গিয়াছিল। নিশ্চয়ই বে তাঁহাকে একজন গ্রহতত্ত্ববিদ্ জ্যোতিষী ভাবিয়াছেন। বে'র প্রধান সখ ছিল জ্যোতিষচর্চ্চা করা। সেই জন্যই ব্রুসের এত আদর! ব্রুস্ ব্যাপার বুঝিয়া খুশী হইয়া উঠিলেন।



মিশরের পুরোহিত

কাইরো পরি-ত্যাগের সময় আবার আরেকটী মজার ব্যাপার ঘটিয়াছিল। একদিন ভোরবেলা ঘুম ভাঙ্গিয়া বে আবিষ্কার করিলেন যে, তিনি দারুণ রোগে কষ্ট পাইতে-ছেন। তখনই ব্রুস্‌কে ডাকা হইল। ব্রুস্ বলিলেন—"এ কিছু না, এ সামান্য পেট-ব্যথা মাত্র।" তখন তিনি ঔষধ ব্যবস্থা করিলেন সবুজ চা (Green tea)। বে বলিলেন যে, ব্রুস্ আগে না খাইলে তিনি কিছুতেই খাইবেন না। ব্রুস্‌ও কিছুতে রাজী নন। অবশেষে বে নিজেই খাইয়া ফেলিলেন এবং শীঘ্রই সুস্থ হইয়া উঠিলেন।

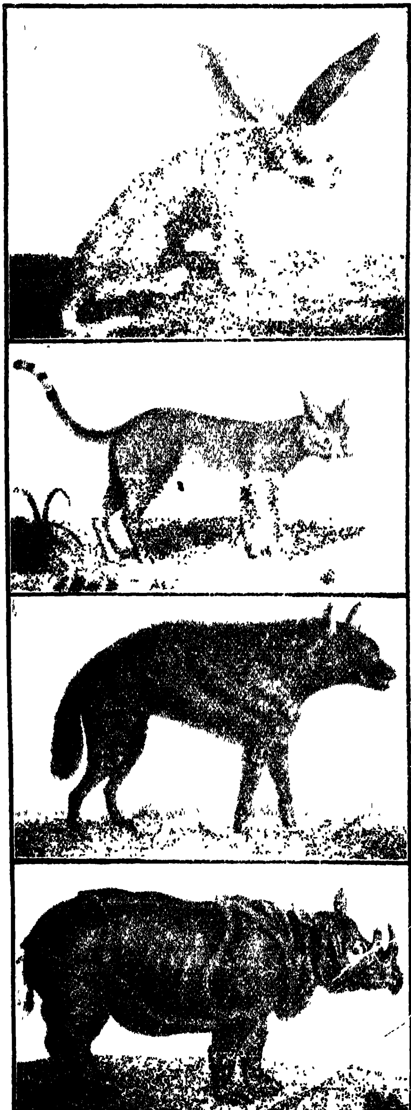
বে'র নিকট হইতে বহু প্রশংসা ও অনুমোদন-পত্র সংগ্রহ করিয়া ব্রুস্ নীল নদ ধরিয়া আসোয়ান (Assuan) যাত্রা করিলেন। মরুভূমি পার হইয়া কসেয়ার (Cosseir) পর্য্যন্ত গিয়া পরে লোহিতসমুদ্র পথে যাত্রা আরম্ভ করিলেন এবং আর অধিক সময় নষ্ট করা উচিত নহে স্থির করিয়া আবিসিনিয়ার উদ্দেশ্যে রওনা হইলেন। আবিসিনিয়া আফ্রিকায় অবস্থিত, ইহার পূর্ব্ব নাম ইথিওপিয়া (Ethiopia)। ব্রুস্ দেখিলেন, আবিসিনিয়াবাসীদের প্রধান উৎসাহ যুদ্ধবিগ্রহ। বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত তাহা বিদ্যমান রহিয়াছে।

ব্রুসের পূর্ব্বে মাত্র চারিজন ইউরোপবাসী এদেশে আসিয়াছিলেন। এদেশে অভিযান করা যে কি দুরূহ ব্যাপার, তাহা তিনি বুঝিতে পারিলেন। অতিশয় সুস্থ সমর্থ ব্যক্তির পক্ষেও এরূপ কষ্ট সহ্য করা সহজ নহে। দুর্গম পার্ব্বত্য পথ, দুঃসহ গরম, প্রবল বর্ষা, দারুণ রোগ-ভয়, সিংহ, হায়েনা, হিপোপটেমাস, কুমীর প্রভৃতির আক্রমণ ইত্যাদি মিলিয়া ব্রুসের আবিসিনিয়া হইতে গণ্ডর পর্য্যন্ত যাত্রা ভীষণ বিপদসঙ্কুল করিয়া তুলিয়াছিল। এ দেশের অধিবাসীরা বেশীর ভাগই সন্দিগ্ধ প্রকৃতির ও শত্রুভাবাপন্ন লোক। কেবল ব্রুসের বুদ্ধিকৌশলেই বহুবার অভিযানযাত্রীর দল রক্ষা পাইয়াছিল। তদ্ব্যতীত পূর্ব্ববর্ত্তী অভিযানকারীদের মত মাঝে মাঝে খাদ্যাভাবও ঘটিত।

এই আশ্চর্য্য অভিযান-পথে ব্রুস্ এক অদ্ভুত প্রথা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, যাহা পরবর্ত্তী জীবনেও স্মরণ করিয়া তাঁহার হৃৎকম্প হইত। ইংল্যাণ্ডে ফিরিয়া তাঁহার 'ভ্রমণ' (Travels) গ্রন্থে বন্ধুদের আপত্তি সত্ত্বেও তিনি সে-প্রথার এক বিশদ বিবরণ দেন। জনসাধারণ ইহা মিথ্যা গল্প বলিয়া মনে করে এবং ব্রুসের কথার সত্যতা সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করে। পরে অবশ্য অন্যান্য অভিযানকারীরাও এ-প্রথার যাথার্থ্য সম্বন্ধে প্রমাণ করিয়া গিয়াছেন।

দুর্গম যাত্রাপথে ব্রুস্‌কে বহু হিংস্রজন্তুর সম্মুখে পড়িতে হইয়াছিল। তিনি সিংহ তাড়াইবার এক নূতন কৌশল আবিষ্কার করিয়াছিলেন। তাঁবুর চারিদিকের সাদা দড়িগুলিতে কতকগুলি ঘণ্টা বাঁধা হইত। বাতাসে দড়িগুলি দুলিত ও তাহাতে বাঁধা ঘণ্টাগুলি একসঙ্গে বাজিয়া উঠিত, সে শব্দে সিংহ সভয়ে পলায়ন করিত।

গণ্ডরে (Gondar) পৌঁছিয়া ব্রুস্ দেখিলেন, সে স্থানের উজীর মাইকেলের সহিত বন্ধুত্ব না করিলে তাঁহার পক্ষে নীল নদের উৎস-সন্ধানে অধিকদূর



ক্রসের দেখা আফ্রিকার নানারকম জন্তু

অগ্রসর হওয়া সম্ভবপর হইবে না। কিন্তু ইহাতেও বিপদ্, কারণ দেশীয় লোকেরা সাধারণতঃ বিদেশীদের সন্দেহের চক্ষে দেখিত। অসাধারণ বুদ্ধি-কৌশলে তাহাদের বিশ্বাস উৎপাদন করিয়া ক্রস্ সে-যাত্রা অগ্রসর হইতে পারিয়াছিলেন।

শুনিতে অদ্ভুত শোনাইলেও ক্রস্ সৌভাগ্য-ক্রমে সে-স্থানে পৌঁছিয়া দেখিলেন, বসন্তরোগ সংক্রামক রূপে দেখা দিয়াছে। সহরের কয়েকজন খ্যাতনামা লোক এই দারুণ রোগাক্রান্ত হইয়া পড়িয়াছেন। ক্রস্ এ-রোগ সম্বন্ধে কিছু চিকিৎসা জানিতেন, কাজেই এ-সুচিকিৎসার ফলে রোগাক্রান্তেরা আরোগ্য হইয়া উঠিলেন এবং রোগের প্রকোপও ক্রমে দেশ হইতে কমিয়া গেল।

এই কারণে দেশীয় লোকেরা ক্রসের উপর অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিল। কাজেই তাঁহার যাত্রার পথে বিশেষ কোন বাধা রহিল না। তাহা ছাড়া ছিল ক্রসের বিরাট দেহ এবং অসামান্য ব্যক্তিত্ব—কোন বাধা-বিঘ্নই বেশীক্ষণ তাঁহাকে আটকাইয়া রাখিতে পারিত না।

ক্রসের বন্দুক ছোঁড়া দেখিয়া দেশীয় লোকেরা মনে মনে তাঁহাকে অত্যন্ত সম্মান ও ভয় উভয়ই করিত। একবার একজন সৈন্যদলের কর্ম্মচারী মদ খাইয়া নিজের বাহাদুরী দেখাইয়া ক্রস্কে বন্দুক ছুঁড়িতে অক্ষম কাপুরুষ বলিয়া গালি দেয়। ক্রস্ও ক্রুদ্ধ হইয়া বলেন—"আমি যদি বন্দুক দিয়া গুলির বদলে কেবল মাত্র মোমবাতি ছুঁড়ি, তাহা হইলেও উহা তোমার ছোঁড়া গুলির চাইতে বেশি জোরে আঘাত করিবে।" লোকটা রাগিয়া গিয়া ক্রস্কে লাথি মারিল। ক্রস্ও বা সহিবেন কেন? তখন দুইজনে তুমুল মারামারি ঘটিবার উপক্রম! যাহারা এ ব্যাপার দেখিতেছিল, তাহারা বহুকষ্টে দুইজনকে মুক্ত করিয়া দেয়।

ইহার কয়েকদিন পরে ক্রসের মৌখিক দর্পের সত্যতা প্রমাণ করিবার জন্য রাজা তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠান। ক্রস্ হাসিয়া সম্মত হইলেন। তাঁহার কথানুসারে মেজেতে অনতিদূরে তিনটা ঢাল রাখা হইল। ক্রস্ গুলির পরিবর্ত্তে চর্ব্বির মোমবাতি ভরিয়া লইলেন এবং দর্শকদিগের বিস্মিত দৃষ্টির সম্মুখে সেই মোমবাতির গুলি ছুঁড়িলেন। তাহা ঢাল ভেদ করিয়া দেয়ালে গিয়া ভাঙ্গিয়া চুরমার হইয়া গেল। ক্রস্ ইহার পরে আরেকটী

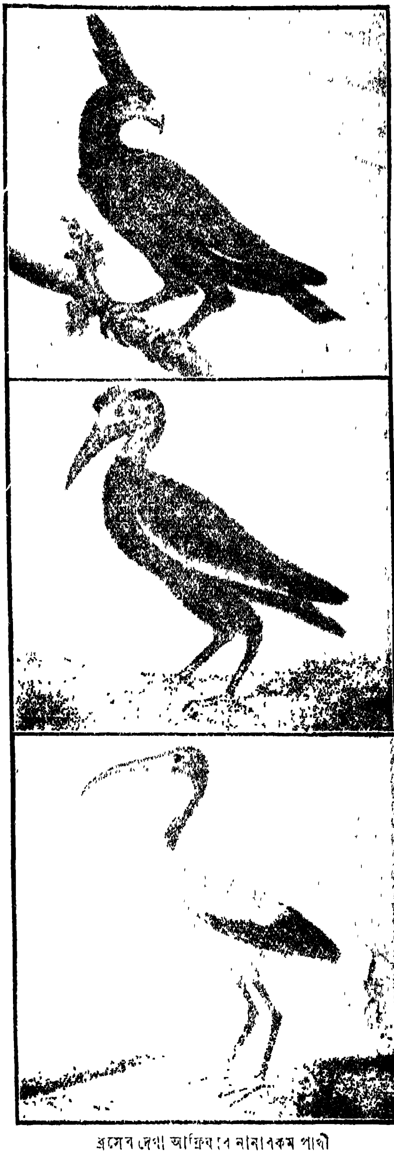
মোমবাতি ছুঁড়িয়া একটী টেবিল বিদীর্ণ করিয়া দিলেন।

এই ব্যাপারের পর হইতে ব্রুসের জনপ্রিয়তা খুব বাড়িয়া গেল। রাজা ও অন্যান্য সর্দ্দারেরাও এই আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখিয়া ব্রুসের অসাধারণ গুণ-পনায় বিমুগ্ধ হইয়া পড়িল। এমন কি চল্লিশ বৎসর পরে গিয়াও একজন অভিযানকারী আবিসিনিয়ায় ব্রুসের মোমবাতি ছুঁড়িবার কাহিনী শুনিতে পাইয়াছেন।

এই বারে তাঁহার মাইকেল নামক যে বৃদ্ধ উজীরের সহিত বন্ধুত্ব ছিল, তাঁহাকে সঙ্গে লইয়া তিনি ফাসিল নামক একজন বিদ্রোহীকে শাস্তি দিবার জন্য যাত্রা করেন। কিন্তু এই অভিযান সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত হইয়া যায়। ব্রুস্ সদলবলে গণ্ডারে (Gondar) আশ্রয় গ্রহণ করেন।

এই ব্যাপারে ব্রুস্ বুঝিলেন—মাইকেলের সহায়তায় আর কোন কাজ হইবে না। এখন তাঁহাকে পুনরায় বিদ্রোহী ফাসিলএর (Fasil) সহিত বন্ধুত্ব করিতে হইবে। কিন্তু সে-ব্যাপারটী তত সহজ ছিল না। ফাসিল ব্রুসের সহিত বন্ধুত্ব করিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখান দূরে থাকুক, বরং ব্রুস্‌কে এত উত্যক্ত করিতে লাগিলেন যে, ব্রুসের ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। তিনি ফাসিলের নাকে সজোরে এমন এক ঘুঁষি মারিলেন যে, তাঁহার নাসিকা বাহিয়া দর দর করিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল।

কিন্তু ভগবান ব্রুসের সহায়। ব্রুসের অসাধারণ বন্দুক ছুঁড়িবার কৌশল ও চিকিৎসা-বিদ্যার জ্ঞান এবারেও তাঁহার উপকারে আসিল। এ সময় বিদ্রোহী দলপতি ফাসিলের একজন সৈন্যাধ্যক্ষ বিশেষ ভাবে পীড়িত হইয়া পড়েন এবং পরিশেষে ব্রুসের চিকিৎসাতেই সারিয়া উঠেন। তাহাছাড়া দুইটী উড়ন্ত চিলকে বন্দুকের গুলিতে মারিতে পারিয়াও তিনি বিদ্রোহী ফাসিলের মুগ্ধ-বিস্ময় লাভ করেন। আরেকদিন একটা বন্যঘোড়াকে শায়েস্তা করিয়াও তিনি বিদ্রোহীদের চমৎকৃত করিতে পারিয়াছিলেন। এরূপে ব্রুসের চিকিৎসা-নৈপুণ্য ও অন্যান্য গুণপনা দেখিয়া ফাসিল ব্রুসের সহিত বন্ধুত্ব-সূত্রে আবদ্ধ হইলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিলেন, এবং একটী ঘোড়া উপহার দিলেন।



ব্রুসের দেখা আফ্রিকার নানারকম পাখী

ফাসিল তাঁহার প্রতিজ্ঞানুরূপ কার্য্য করিয়াছিলেন। কোন অনুমোদনপত্র না দিয়া ফাসিল ক্রুস্‌কে তাঁহার সম্মুখে একটা চমৎকার ঘোড়া দিয়া সুসজ্জিত হইয়া চড়িতে বলিলেন। সেই চমৎকার ঘোড়াটা দেখিয়াই দেশীয় লোকেরা সভয়ে পলায়ন করিতে লাগিল। এইভাবে নিরাপদে তাঁহারা গীস (Geesh) পর্য্যন্ত পৌছিলেন। এখানে আসিয়া ক্রুস্‌ বিস্ময়-মিশ্রিত আনন্দের সহিত নীল নদের একটী ক্ষীণ ধারা দেখিতে পাইলেন।

ক্রুসের মনে হইল, এইবার তিনি গন্তব্যস্থানে পৌছিয়াছেন। তিনি ভাবিলেন—যে পাহাড়ের পাদদেশে তিনি দাঁড়াইয়া আছেন, তাঁহার নিম্নেই নীল নদের উৎপত্তিস্থল।

ক্রুস্‌ লিখিয়াছেন—"সে সময়কার মনোভাব আমি ভাষায় প্রকাশ করিতে পারিব না। সেখানে দাঁড়াইয়া অদ্ভুত আনন্দ হইতেছিল—তিনহাজার বৎসরের কত অবিশ্রাম চেষ্টার ফলেও যাহা কেহ পারে নাই, আজ বুঝি তাহারই সন্ধান মিলিল।"

ক্রুসের পক্ষে এই গর্ব্বমিশ্রিত আনন্দ হওয়া সম্পূর্ণ স্বাভাবিক, কিন্তু তিনি একটা দারুণ ভুল করিয়াছিলেন। উহা নীল নদের উৎসস্থল নহে, উহা ব্লু-নাইল (Blue-Nile) নামক নীল নদের প্রধান শাখার উৎপত্তিস্থল। এই ভুল ভাঙ্গিবার পরে ক্রুসের যে বিষম দুঃখ হইয়াছিল, তাহা আমরা সহজেই অনুমান করিতে পারি। অবশেষে ইহাও প্রমাণ হইয়া গেল যে, তিনি সে-স্থলে প্রথম যান



ফাসিল ক্রুস্‌কে একটা ঘোড়া উপহার দিতেছেন

নাই। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে পেড্রু পায়েজ (Pedro Paez) নামক একজন জেসুইট ধর্ম্মপ্রচারক সেখানে গিয়াছিলেন। কিন্তু ক্রুসই প্রথম এস্থানের প্রকৃত মূল্য আবিষ্কার করেন। পূর্ব্ববর্ত্তী ধর্ম্মপ্রচারকের নিকট এই ক্ষীণ জলধারার বিশেষ কোনই মূল্য ছিল না।

ক্রুস্‌ আবার গণ্ডরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিলেন, মাইকেল রাজধানীকে বিধ্বস্ত করিয়া ফেলিয়াছেন। ফাসিল সম্পূর্ণ পরাজিত হইয়াছেন এবং নতুন রাজা পূর্ব্ব-প্রতিশোধ লওয়ার জন্য সকলকে হত্যা করিবার আদেশ দিয়াছেন। উদার হৃদয় ক্রুস্‌ এ নৃশংস হত্যাকাণ্ড বন্ধ করিবার জন্য বহু চেষ্টা করিয়াছিলেন কিন্তু তাহা অরণ্যে রোদন-মাত্র সার হইল। কেহই তাঁহার কথায় কর্ণপাত করিল না। কাজেই কয়েক মাস ক্রুসকে বাধ্য হইয়া সহরে থাকিতে হইল। অবশেষে নিরাপদ্‌ বুঝিয়া তিনি সেস্থান পরিত্যাগ করিলেন। ক্রুসের যাত্রাকালে দেশীয় লোকেরা তাঁহাকে অত্যন্ত শ্রদ্ধাপ্রদর্শন করে। ইহা ক্রুসের অসামান্য ব্যক্তিত্বের ফল।

নিউবিয়ার (Nubia) রাজধানী সেন্নারএ (Sennar) পৌছিবার পথে বহু বাধা-বিঘ্ন ছিল। দেশীয় অধিবাসীরা ছিল দারুণ বিশ্বাসঘাতক। পথে গ্রীষ্ম ছিল দুঃসহ, তাহা ছাড়া বন্য হিংস্র জন্তুর দল তো ছিলই। পাঁচমাসকাল সেন্নারএ বাসকালে ক্রুস্‌ বহু আশ্চর্য্য জিনিস প্রত্যক্ষ করিয়াছিলেন। একদিন ক্রুস্‌ দেখিলেন, একজন দেশীয় নরপতিকে হাতীর চর্ব্বি মাখান হইতেছে। তাঁহার বিশ্বাস—ইহাতে দেহের সামর্থ্য ও কেশের কৃষ্ণতা বৃদ্ধি পায়!

সেন্নারএ থাকিতে ক্রুসকে সর্ব্বদা প্রাণভয়ে বিপন্ন থাকিতে হইত। এস্থান পরিত্যাগ করিতে পারিয়া তিনিও বাঁচিয়া গেলেন এবং স্থির করিলেন, প্রথমে আসোয়ান (Assuan) যাইবেন, পরে যত শীঘ্র সম্ভব ইউরোপ যাত্রা করিবেন। মরুভূমির পথ পার হওয়াই সর্ব্বাপেক্ষা দুঃসাধ্য ব্যাপার। এ যাত্রা ক্রুসের দৈহিক কষ্ট সহ্য করিবার ক্ষমতার চূড়ান্ত পরীক্ষা হইয়াছিল। কেমন করিয়া অসহ্য কষ্ট সহিয়া অবশিষ্ট মুষ্টিমেয় সঙ্গীকে সঙ্গে লইয়া ক্রুস আসোয়ান পৌছেন, তাহা জগতের

ইতিহাসে বীরত্বের কাহিনী বলিয়া গণ্য হইয়াছে।

পূর্ব্ব অভিজ্ঞতার ফলে ব্রুস্ বিপদের সম্ভাবনা মনে মনে স্থির করিয়াই রাখিয়াছিলেন, কিন্তু তাহা যে এমন ভয়াবহ হইবে, তাহা তিনি তখনও জানিতেন না। সেই যাত্রা পথে সব চাইতে বিপজ্জনক ছিল 'সিমুম' (Simoom) হাওয়া। এই ধূলিপূর্ণ হাওয়া দেহে লাগিলে নিঃশ্বাস রুদ্ধ হইয়া মরিবার মতন যন্ত্রণা হইত। এই কারণেই আরবের মরুভূমিগুলি এত ভীষণ ও অস্বাস্থ্যকর।



আরবদেশীয় সেখ

তিন মাস ধরিয়া ব্রুস্ এই প্রকার নিদারুণ কষ্ট সহ্য করেন। এতদিন ভৃত্যেরা বিশ্বস্ত ছিল, এবার সেখানেও ভাঙ্গন ধরিল। তাহারা বিশ্বাসঘাতক হইয়া উঠিল। ব্রুসের উট চুরি হইতে লাগিল, খাদ্য ও পানীয়ের অভাব হইতে লাগিল এবং তাঁহার মনে হইত যে, বোধ হয় অনাহারে ও পিপাসায়ই তাঁহাকে প্রাণত্যাগ করিতে হইবে।

পরে তিনি লিখিয়াছেন—"মনে হইত প্রতি পদে মৃত্যু যেন থাবা পাতিয়া বসিয়া আছে।" দলের কেহ অন্ধ, কেহ পাগল হইয়া গেল, কাহারও বা এত কষ্ট সহ্য না হওয়াতে মৃত্যু ঘটিল। অবশেষে উটগুলিও এত পরিশ্রান্ত হইয়া পড়িল যে, আর হাঁটিতে পারে না; অদম্য মানসিক শক্তিশালী দলপতির পাও অবশ হইয়া আসিয়াছে—আর বুঝি চলে না।

লক্ষ্য করিয়া দেখিলে আশ্চর্য্য মনে হয়—রহস্যময় আফ্রিকারাজ্য ভ্রমণকারীদের যেন মন্ত্রমুগ্ধের মত বার বার আকর্ষণ করে। বার বার ঘুরিয়া ফিরিয়া তাঁহারা সেখানে আসিতে চান। ব্রুসের বেলায় কিন্তু সে নিয়ম খাটে না। ব্রুস্ কিন্তু দেশে ফিরিয়া গিয়া পুনরায় আবিসিনিয়ায় আসিতে চাহেন নাই।

লিভিংষ্টোন ও অন্যান্য বিখ্যাত ভ্রমণকারীদের মত ব্রুসেরও অদম্য ভ্রমণাকাঙ্ক্ষা ছিল, কিন্তু তিনি কোন উৎসাহ লাভ করেন নাই। এ কারণে তাঁহার মন তিক্ত হইয়া গিয়াছিল।

প্রথমে অবশ্য তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করা হয় এবং তাঁহার কার্য্যের যথোচিত সমাদর হয়। পরে জনসাধারণ তাঁহার কথা নিছক রূপকথার কাহিনী বলিয়া হাসিয়া উড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিল। আবিসিনিয়াবাসীদের আচার-ব্যবহারের বিষয় যাহা তিনি লিপিবদ্ধ করেন, তাহা জনসাধারণ অবিশ্বাস্য বলিয়া মনে করিল। ব্রুস্ এ মিথ্যাপবাদ বিদূরিত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু পারিয়া উঠেন নাই। কেহ কেহ শত্রুতা করিয়া এমনও রটনা করিতে লাগিল যে, ব্রুস্ জীবনে কখনও আবিসিনিয়ায় যান নাই।

এই নিদারুণ আঘাতে ভগ্নহৃদয়ে ব্রুস্ তাঁহার স্কটল্যাণ্ডের জমিদারীতে ফিরিয়া গিয়া নিঃসঙ্গ ভাবে বাস করেন। প্রায় বার বৎসর পরে বহু অনুরোধে তিনি তাঁহার ভ্রমণ বৃত্তান্ত (Travels) লিখিতে আরম্ভ করেন। যখন পাঁচখণ্ড শেষ হইয়া যায়, তখন তাঁহার সম্বন্ধে জনসাধারণের কৌতূহল জাগ্রত হয়, কিন্তু তখনও কেহ তাহা বিশ্বাস করিত না। বহু-সংখ্যক পুস্তক বিক্রয় হইতে লাগিল। সাধারণের ধারণা তখনও ছিল, 'এগুলি আজগুবি গল্পমাত্র।'

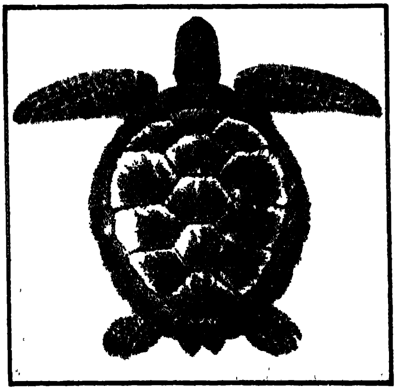
এই অপবাদের জন্য ব্রুস্ যে বিন্দুমাত্র দায়ী নহেন, তাহা নহে। দুই-এক জায়গায় তিনি অসাবধান ভাবে দুই-একটি বিষয় লিপিবদ্ধ করেন। এই কারণে সমালোচকেরা তাহা আরও বাড়াইয়া কঠোর বিদ্রূপ করিতে থাকে। তাহা ছাড়া ব্রুস্ যে রূঢ় দাম্ভিক প্রকৃতির লোক ছিলেন—এই জন্যও অনেকে তাঁহাকে মোটেই পছন্দ করিত না। ইহার ফলে জীবিতকালে ব্রুসের প্রতি

যথোচিত সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা হয় নাই। তাঁহার মৃত্যুর কিছুকাল পরে তাঁহার অপবাদ মোচন করিয়া আফ্রিকা আবিষ্কর্ত্তাদের মধ্যে তাঁহাকে যোগ্যস্থান দেওয়া হইয়াছে।

লিভিংষ্টোন, ষ্টেনলী বার্টন, স্পেকের সহিত ব্রুসের নাম এক পর্য্যায়ে স্থান পাইবার যোগ্য। ভৌগোলিক আবিষ্কারক হিসাবে গণনা করিলে অবশ্য দেখা যায় ব্রুস্ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তীদের মত ততটা সফলকাম হন নাই। তথাপি তাঁহার পরাজয়—গৌরবময় পরাজয়।

ব্রুস্ নীল নদের উৎস-স্থল আবিষ্কার করেন নাই সত্য, কিন্তু উহার প্রধান শাখার উৎপত্তি-স্থল আবিষ্কার করিয়াছেন। পরবর্ত্তী অভিযানকারীদের জন্য তিনি পথ প্রস্তুত করিয়া গিয়াছেন। তিনিই ইউরোপবাসীদের প্রথম পথ দেখাইয়া গিয়াছেন যে, ভ্রমণের পক্ষে আবিসিনিয়ার মতন স্থানও দুরধিগম্য নহে। ইচ্ছা করিলে আবিসিনিয়াবাসীদের মনও কৌশল, বীরত্ব ও সহৃদয়তা দ্বারা জয় করা সম্ভব।

গর্ব্বিত দেশীয় সর্দ্দারদের সহিত ব্যবহারে ব্রুসের চরিত্রের বিশেষত্বগুলি সহজে প্রকাশিত হইত। বিপদের মুখে তাঁহার ধৈর্য্য ও সাহস যেন বেশি



ব্রুসের দেখা আফ্রিকার কচ্ছপ

বাড়িয়া যাইত। একটি গল্প বলিলেই তাহা সহজে বুঝা যাইবে।

একবার একজন আরব শেখ (Sheik) সর্দ্দারের গৃহে গিয়া ব্রুস্ দেখেন যে, তিনি অতিরিক্ত মদ্যপান করিয়াছেন। ব্রুস্‌কে দেখিয়া সেই সর্দ্দার কহিলেন—"যাহা আছে সমুদয় আমাকে দিয়া

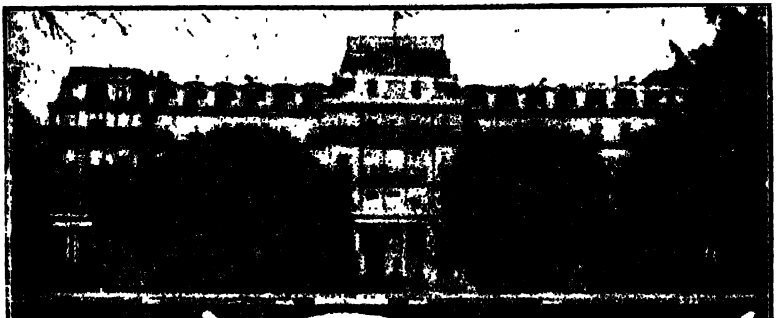


ব্রুসের দেখা আফ্রিকার এক অদ্ভুত পাখী

দাও।" ব্রুস্ উত্তর করিলেন—"কিছু ভাল ঔষধ আছে, তাহা আমি সানন্দে দিতে প্রস্তুত।" শেখ-সর্দ্দার ক্রুদ্ধ হইয়া কহিলেন—"সে সব কথা শুনিতে চাই না, অর্থ দাও। আমি শুনিয়াছি, তোমার কাছে ২০,০০০ হাজার স্বর্ণমুদ্রা আছে—তাহা আমাকে অবিলম্বে দাও, না হইলে তোমার মৃত্যু অবশ্যম্ভাবী।" এই বলিয়া তরবারি কোষমুক্ত করিয়া লইয়া, জামার আস্তিন গুটাইয়া ব্রুসের প্রতি রুখিয়া দাঁড়াইলেন।

ব্রুস্ হাসিয়া পিস্তল খুলিয়া সেই সর্দ্দারের মস্তক লক্ষ্য করিয়া জবাব দিলেন—"একজন মদ্যপের হাতে পশুর মত মৃত্যু হইবার জন্য আমি প্রস্তুত নহি। খবরদার, এক পা অগ্রসর হলেই মৃত্যু নিশ্চিত জানিবে।" ব্রুসের মূর্ত্তি দেখিয়া সর্দ্দার ভীত হইয়া পড়িলেন এবং মৃদুকণ্ঠে বলিতে লাগিলেন যে, এতক্ষণ তিনি কেবল ঠাট্টা করিয়াছেন মাত্র।

ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে, এই দুঃসাহসী ব্যক্তি, যিনি আবিসিনিয়ায় কতবার বিষম মৃত্যুর মুখ হইতে রক্ষা পাইয়াছেন—সামান্য আকস্মিক ঘটনায় গৃহে তাঁহার মৃত্যু হয়। ১৭৯৪ খৃঃ অব্দের ২৭-এ এপ্রিল তারিখ একজন মহিলা অভ্যাগতকে নীচে পৌঁছাইয়া দিবার জন্য সিঁড়ি বাহিয়া নামিবার কালে ব্রুস্ টলিয়া পড়িয়া যান। ইহার ফলেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে।



রাজনৈতিক আদর্শ

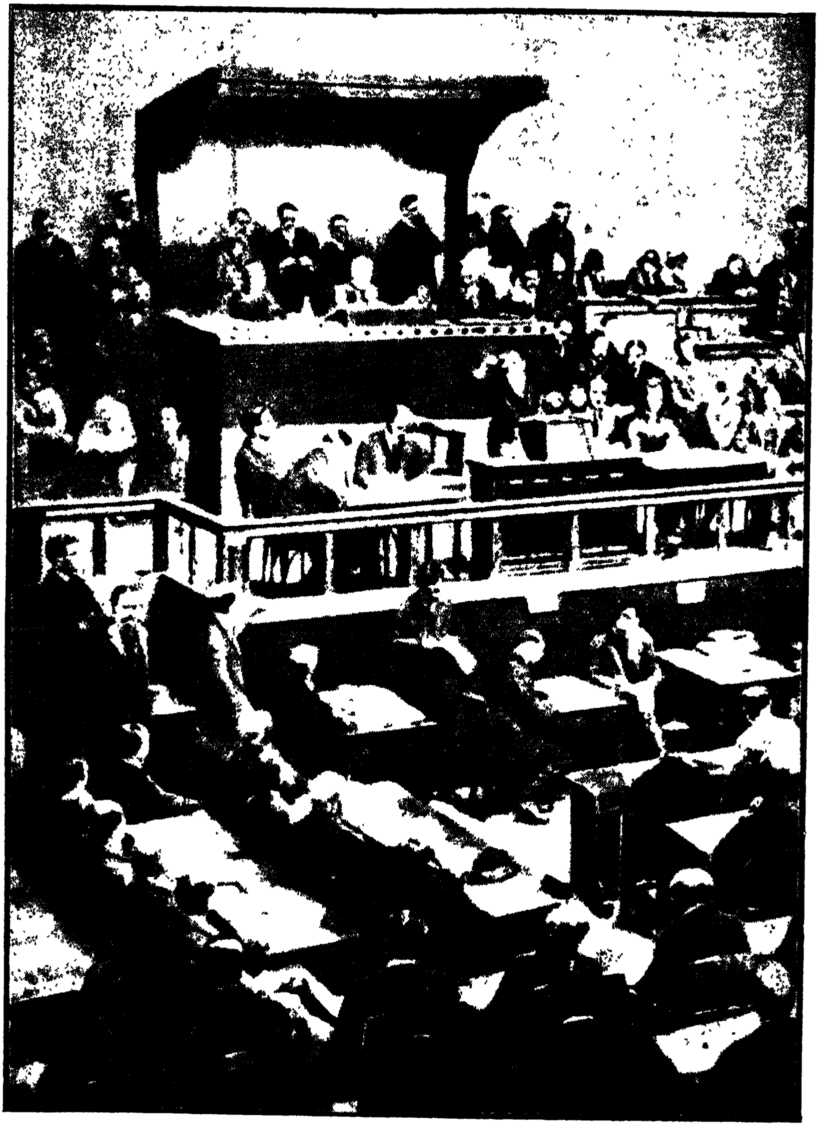
আন্তর্জাতিকতা

১৬৩১ পৃষ্ঠার পর

জাতীয়তার কথা আলোচনা করিতে গিয়া আমরা দেখিয়াছি যে, ঐ আদর্শ সভ্যতার ইতিহাস অতি নূতন। তবু, জাতীয় একত্ববোধ আজ মানুষের মনে এত প্রবল যে, হঠাৎ ভাবিলে মনে হয়—এই অনুভূতিটা না জানি কত সহস্র বৎসর ধরিয়া দেশ-বিদেশকে তোলপাড় করিতেছে। ইহার প্রধান কারণ এই যে, জাতীয়তা কথাটার মধ্যেই এমন একটা সম্মোহন-শক্তি আছে, যাহার কাছে মানুষ স্বভাবতঃই মাথা নত করিতে বাধ্য হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, নিজেদের পারিপার্শ্বিক স্বাতন্ত্র্যেই জাতীয়তার উদ্ভব এবং স্বাতন্ত্র্য-রক্ষা ও তাহার উৎকর্ষ বিধান বিষয়ে মানুষের একাগ্রতা আদিম ও চিরন্তন।

কিন্তু জাতীয়তার আদর্শই মানুষের সভ্যতার ইতিহাসে চরম আদর্শ নহে। তীব্র জাতীয়তাবোধ একদেশের লোককে অন্য দেশের লোক হইতে একেবারে পৃথক করিয়া রাখে। জাতীয়তাবোধে উদ্বুদ্ধ প্রত্যেক জাতি যদি তাহাদের নিজেদের দাবী-কেই বড় করিয়া দেখে; তাহা হইলে সকল দেশের মানুষের একতা একেবারে নষ্ট হইয়া যায় এবং ছোট-বড় নানাবিষয়ে বিভিন্ন দেশ বা জাতির মধ্যে কলহ ও সঙ্ঘর্ষ উপস্থিত হয়। তাহাতে ভবিষ্যতে কোন দেশেরই উপকার হয় না এবং পৃথিবীর উন্নতির পথ আরও অবরুদ্ধ হইয়া যায়।

গত পৃথিবীব্যাপি মহাযুদ্ধের পর জাতীয়তারূপ দাবীর এই শোচনীয় পরিণামের কথা খুব স্পষ্টভাবে মানুষের চোখের সম্মুখে দেখা দিয়াছিল। কতলোক যে এই মহাযুদ্ধে প্রাণবিসর্জ্জন করিয়াছিল, তাহার ইয়ত্তা নাই এবং এই মহাযুদ্ধের ফলে প্রায় সকল দেশেই আর্থিক ও অর্থ-নৈতিক অনেক প্রকার ক্ষতি হইয়াছিল। তাই যুদ্ধ যখন শেষ হইয়া আসিল, তখন গুটিকয়েক দেশের নেতা এবং



বিশ্বরাষ্ট্র সঙ্ঘের প্রথম অধিবেশন

রাজনীতিক বলিলেন যে, জাতীয়তার অভিব্যক্তিকে সংযত করিতে হইবে, জাতির দাবীর উপরেও যে বড় একটা দাবী আছে—আন্তর্জাতিকতার দাবী (Internationalism)—তাহাকে প্রবল করিয়া তুলিতে হইবে।

ঐ মহাযুদ্ধ ঘটিবার প্রধান একটা কারণ ছিল এই—বিভিন্ন দেশের কলহ ও অনৈক্যগুলি যুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন উপায়ে মীমাংসা করার কোনই পথ ছিল না। তখন কোথাও এমন কোন সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার সম্মুখে কোন দেশ তাহার অভাব-অভিযোগ উত্থাপন করিতে পারে এবং যেখানে সকলে নিরপেক্ষভাবে আলোচনা করিয়া কলহোন্মুখ দেশগুলির মধ্যে বন্ধুত্ব পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে পারে। একটা দেশের সাথে অন্য একটা দেশের কোনপ্রকার অনৈক্য হইলেই যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া পড়িত এবং একবার যখন যুদ্ধের আগুন জ্বলিয়া উঠিত, তখন কাহারও আর দিগ্বিদিক জ্ঞান থাকিত না, যেমন করিয়া হউক শত্রু-রাজ্যকে পরাস্ত করিতে হইবে—এই ইচ্ছায় উভয় পক্ষ উন্মত্ত হইয়া উঠিত। তারপর যখন যুদ্ধ শেষ হইয়া যাইত, তখন বিজয়ী রাজ্যও দেখিত যে, যুদ্ধে তাহার যত না ক্ষতি হইয়াছে, তাহার চেয়েও বেশি ক্ষতি হইয়াছে দেশের লোকের প্রাণক্ষয়ে, দেশ-ব্যাপী দারিদ্র্যে এবং দেশের সাধারণ জীবনযাত্রা ও সভ্যতার বিনাশে। আর পরাভূত রাজ্যের যে কত ক্ষতি হইত, তাহা সহজেই অনুমান করিতে পার।

১৯১৪-১৮ খৃষ্টাব্দের মহাযুদ্ধ হয়ত একেবারেই বাধিত না, যদি এমন কোন একটা নিরপেক্ষ প্রতিষ্ঠান থাকিত, যাহার সম্মুখে কোন ক্ষতিগ্রস্ত দেশ অন্য দেশের বিরুদ্ধে তাহার অভাব-অভিযোগের কথা উত্থাপন করিতে পারে। যুদ্ধটা বাধিয়া-ছিল খুবই সামান্য কারণে। অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী তখন ছিল মস্তবড় একটা সাম্রাজ্য এবং তাহার অধীনে অনেক ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বল্‌কান জাতি বাস করিত। এই বল্‌কানরা কিছু কাল হইতেই স্বাধীনতা লাভ করিতে চেষ্টা করিতেছিল এবং এই ব্যাপারে তাহারা কয়েকটা স্বাধীন বল্‌কান রাজ্য এবং রাশিয়ার সম্রাটের কাছ হইতে নানা-প্রকার সহায়তা পাইতেছিল। এদিকে অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর বন্ধু ছিল জার্ম্মেণী, আর রাশিয়ার বন্ধু ছিল ফ্রান্স ও গ্রেট্ ব্রিটেন্। সকলেই একটা যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত হইয়াই যেন ছিল। এমন সময় একটা কাণ্ড ঘটিল, যাহার ফলে যুদ্ধ অবশ্যম্ভাবী হইয়া উঠিল। সেই কথাই বলিতেছি।

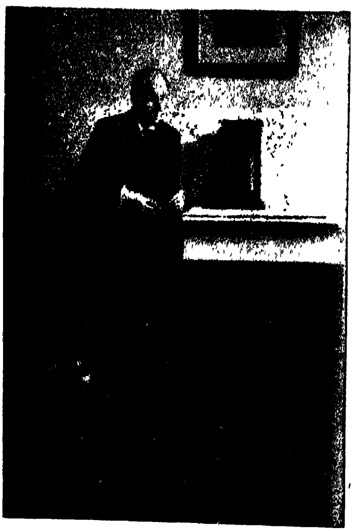
অষ্ট্রীয়া হাঙ্গেরীর যুবরাজ গিয়াছিলেন তাঁহাদের অধীন বল্‌কান প্রদেশ বস্‌নিয়ার রাজধানী সেরাজেভো সহরে। সেখানে একজন বিপ্লবী তাঁহার গাড়ীর উপর বোমা মারিয়া তাঁহার প্রাণনাশ করে। পরে জানা গেল, এই বিপ্লবী পার্শ্ববর্ত্তী এক ক্ষুদ্র স্বাধীন বল্‌কান রাজ্যের অধিবাসী। অম্‌নি অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর সম্রাট সেই রাজ্যের কাছে দাবী জানাইলেন, চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে ক্ষতিপূরণ করিতে হইবে, নতুবা যুদ্ধঘোষণা করিব। চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে কোন ক্ষতিপূরণ আসিল না—যুদ্ধ ঘোষিত হইল। দেখিতে দেখিতে রাশিয়া আসিল বল্‌কানদের পক্ষে, আর জার্ম্মেণী আসিল অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরীর দিকে। কয়েকদিনের মধ্যে ফ্রান্স ও গ্রেট্ ব্রিটেন্‌ও রাশিয়ার সহায়তায় আসিয়া উপস্থিত হইল। তারপর পৃথিবীর অনেক দেশ কোন না কোন পক্ষে এই যুদ্ধে যোগ দিল এবং সুদীর্ঘ চার বৎসর ধরিয়া সারা পৃথিবীর বুকে এই যুদ্ধ চলিল। যুদ্ধ



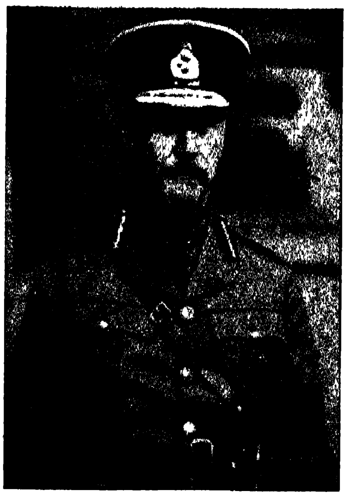
উড্র উইলসন্



লয়েড জর্জ্জ



লর্ড রবার্ট সিসিল



জেনারেল স্মাট্স্

যখন শেষ হইল, তখন জার্ম্মেণী ও অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী সম্পূর্ণভাবে পরাভূত। রাশিয়া ও ইটালী গৃহবিপ্লবে বিধ্বস্ত, আর গ্রেট্ ব্রিটেন্ ও ফ্রান্স শ্রান্ত ও দরিদ্র।

এতবড় একটা যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল খুবই সামান্য একটা কারণে, অথচ যুদ্ধ ছাড়া কলহের সেই হেতুটাকে মীমাংসা করিবার আর কোন উপায় ছিল না। ইউরোপে তখন এমন কোনই সঙ্ঘ বা প্রতিষ্ঠান ছিল না, যাহার সম্মুখে অষ্ট্রীয়া-হাঙ্গেরী তাহার অভিযোগ জানাইতে পারিত এবং যাহার নিরপেক্ষ বিচার সকলেই মানিয়া লইতে পারিত।

এই মহাযুদ্ধের শেষভাগে (১৯১৬ খৃঃ) আমেরিকার যুক্তরাজ্য আসিয়া গ্রেট্ ব্রিটেনের পক্ষে যোগ দিয়াছিল। তখন যুক্তরাজ্যের প্রেসিডেণ্ট ছিলেন উড্র উইল্‌সন (Woodrow Wilson) আর গ্রেট্ ব্রিটেনের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন লয়েড জর্জ্জ (Lloyd George)। যুদ্ধ শেষ হইয়া যখন সন্ধির কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল, তখন তাঁহারা স্থির করিলেন যে, সন্ধির সাথে সাথে ইউরোপে এমন একটা প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে হইবে, যাহার কাছে পৃথিবীর সমস্ত জাতি তাহাদের অভাব-অভিযোগ জানাইতে পারে এবং যে প্রতিষ্ঠানের সহায়তায় তাহারা যুদ্ধ না করিয়া তাহাদের পরস্পরের কলহ-বিবাদ মীমাংসা করিয়া লইতে পারে। বিজেতা ও পরাজিত সমস্ত দেশই এই প্রস্তাবে রাজী হইল এবং তখন এক আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের (League of Nations) প্রতিষ্ঠা হইল।

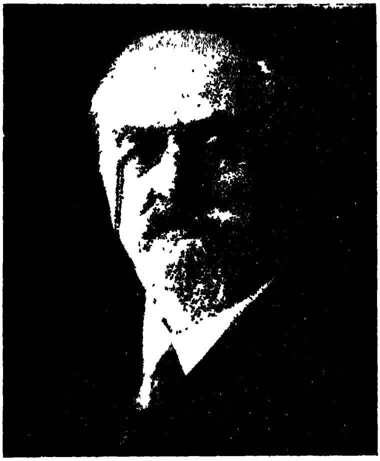
এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের স্থান হইল সুইজারল্যাণ্ডের অন্তর্গত জেনেভা সহরে। সুইজারল্যাণ্ড পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে কোন পক্ষেই যোগ দেয় নাই, তাহা ছাড়া বহু বৎসর ধরিয়া পৃথিবীর সমস্ত দেশ তাহাকে নিরপেক্ষ রাজ্য (Neutral country) বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছিল, তাই সকলেই জেনেভাকে আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের উপযোগী আদর্শ সহর বলিয়া মানিয়া লইল। ইংলণ্ডের লর্ড রবার্ট সিসিল এবং জেনারেল স্মাট্‌স্, ফ্রান্সের লিয়ঁ বুর্জ্জোয়া প্রভৃতি আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের প্রতি একান্ত অনুরাগী ছিলেন এবং তাঁহারা প্রতিনিধিত্ব করিয়াছিলেন। স্যর এরিক ড্রামণ্ড ইহার সর্ব্বপ্রথম প্রধান কর্ম্ম-সচিবের পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের কথা এখন বলিব। পৃথিবীর যে কোন স্বাধীন বা প্রায়-স্বাধীন দেশ এই সঙ্ঘের সভ্য হইতে পারে এবং সমস্ত সভ্যদের লইয়া যে সভা গঠিত হয়, তাহার নাম হইতেছে এসেমব্লি (Assembly)। এই সভা অনেকটা পার্লা-মেণ্টের মত; বড় বড় আইনকানুন ও রীতি-নীতি এই সভায় আলোচিত হওয়া চাই।

এসেমব্লি হইতে কয়েকজন মাত্র সভ্য লইয়া ছোট একটি কার্য্যনির্ব্বাহক সভা গঠিত হয়, তাহার নাম কাউন্সিল (Council)। এই কাউন্সিলে দুই শ্রেণীর সভ্য থাকেন—স্থায়ী ও অস্থায়ী। বড় বড় দেশগুলি কাউন্সিলের স্থায়ী সভ্য এবং ছোট ছোট দেশগুলি তাহাদের নিজেদের মধ্য হইতে জন কয়েক অস্থায়ী সভ্য কাউন্সিলে পাঠাইতে পারে।

এই কাউন্সিলের ক্ষমতা অনেক। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের সভ্য কোন দেশের সাথে যদি অন্য এক দেশের কলহ উপস্থিত হয়, তখন সেই কলহ কাউন্সিলের সম্মুখে উপস্থাপিত করিতেই হইবে এবং তখন যদি বিবাদী দেশ দুইটি বাদে আর সকলে কলহের একটা মীমাংসা করিয়া দেয় তবে, সেই মীমাংসা উভয় পক্ষকেই মানিয়া

লইতে হইবে। যদি না মানিয়া লয়, তবু তাহারা ছয় মাসের মধ্যে কোন প্রকার যুদ্ধ



লিয়ঁ বুর্জোয়া

করিতে পারিবে না এবং যতদিন সঙ্ঘের সভ্য থাকিবে, ততদিন যুদ্ধসংক্রান্ত কোন প্রকার আয়োজন করিতে পারিবে না।

আর যদি এমন হয় যে কাউন্সিলের মীমাংসা এক পক্ষ মানিয়া লইল, কিন্তু অপর পক্ষ মানিতে রাজী হইল না, তখন কাউন্সিল অপর পক্ষকে সমস্ত সঙ্ঘের শত্রু বলিয়া ঘোষণা করিতে পারে এবং শত্রু হিসাবে তাহার বিরুদ্ধে নানাপ্রকার বল প্রয়োগ করিতে পারে, যাহাতে সে কাউন্সিলের মীমাংসা মানিয়া লইতে বাধ্য হয়। প্রয়োজন হইলে কাউন্সিল অপর পক্ষের বিরুদ্ধে যুদ্ধও ঘোষণা করিতে পারে।

ইহা হইতে দেখা যায়, আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের প্রধান উদ্দেশ্য হইতেছে পরামর্শ ও বিচার-বুদ্ধি দ্বারা দেশ ও জাতিসমূহের কলহ মীমাংসা করা। কোন দেশ যদি অন্যান্য সকল দেশের সম্মিলিত সিদ্ধান্ত মানিয়া লইতে রাজী না হয় তাহা হইলেই তাহার বিরুদ্ধে বল প্রয়োগ করা হইবে, নতুবা নয়।

এই প্রকার একটা আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ যে পৃথিবীর শান্তি ও সভ্যতা অক্ষুণ্ণ রাখার পক্ষে কতখানি দরকার, তাহা বোধ হয় তোমরা অসায়াসেই বুঝিতে পারিতেছ। দেশ বা রাজ্যসমূহ যদি কথায় কথায় যুদ্ধ দ্বারা তাহাদের পরস্পরের দাবী মিটাইতে চায়, তবে অর্থ ও লোকক্ষয় হয় প্রচুর, তাহা ছাড়া সভ্যতার অগ্রগতিও অনেকখানি বন্ধ হইয়া যায়।

এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ ১৯২০ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্থাপিত হয়। তারপর অনেক দেশ এই সঙ্ঘের সম্মুখে তাহাদের ছোট-বড় অভাব-অভিযোগ উপস্থিত করিয়াছে এবং সঙ্ঘের কাউন্সিলও এসেমব্লির প্রচেষ্টায় অনেক অভাব-অভিযোগই বিনারক্তপাতে মীমাংসা হইয়া গিয়াছে। তাহা ছাড়া



স্যর এরিক ড্রামণ্ড

পৃথিবীর নানাদেশের মধ্যে মৈত্রী ও একতা স্থাপন করা বিষয়েও এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘ

অনেকখানি সাহায্য করিয়াছে। ও এই সঙ্ঘে যোগ দিয়াছিল।



জার্ম্মেণী আন্তর্জাতিক সঙ্ঘে প্রবেশ করিতেছে—১৯২৬

কিন্তু এই আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের গোড়ায় কতকগুলি গলদ রহিয়া গিয়াছে। যে সমস্ত উচ্চ আদর্শ লইয়া এই সঙ্ঘ প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল, সঙ্ঘের সভ্যদের অনেকের মনেই সেই আদর্শ বিরাজমান নাই। অনেক দেশ, বিশেষ করিয়া বেশি শক্তিশালী দেশগুলি, সঙ্ঘের উপর নির্ভর না করিয়া নিজেদের স্বার্থচিন্তা করিতেছে বেশি এবং গুটিকয়েক পার্শ্ববর্ত্তী দেশকে ডাকিয়া আনিয়া স্থানীয় দল (regional groups) সৃষ্টি করিতেছে। ইহার ফল হইতেছে এই যে, অনেকেই ভাবিতেছে, সঙ্ঘের নিজের কোন শক্তি নাই এবং কোন বড় বিপদ্ বা কলহ উপস্থিত হইলে সঙ্ঘ তাহার সম্মিলিত সিদ্ধান্ত জোর করিয়া প্রচার করিতে পারিবে না। তাহা ছাড়া যে কোন একটা মীমাংসায় সকলে একমত না হইলে, তাহার কোনই মূল্য নাই—এই নিয়মেও অনেক অসুবিধা হইতেছে। অনেক সময় এমন হয় যে, একটি দেশের অসম্মতিতে একটা মীমাংসা নষ্ট হইয়া যায় এবং তখন যুদ্ধের সম্ভাবনা প্রবল হইয়া উঠে।

গত কয়েক বৎসরের মধ্যে এই গলদ-গুলি খুবই সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। প্রথমে জাপান যখন চীন দেশের অন্তর্গত মাঞ্চুরিয়া প্রদেশ আক্রমণ করিল, তখন চীন আন্তর্জাতিক সংঘের কাছে প্রতিবাদ জানাইল, কিন্তু শক্তিশালী জাপানের বিরুদ্ধে সঙ্ঘ কিছুই করিতে পারিল না। তারপর আসিল ইটালীর আবিসিনিয়া অভিযান। ইটালীর নেতা মুসোলিনী রণোন্মত্ত হইয়া যখন সঙ্ঘের চোখের



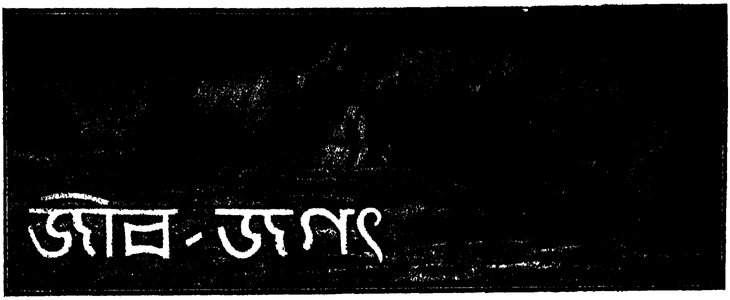
ইটালীর নেতা সিনর মুসোলিনী

সম্মুখে আবিসিনিয়া দেশকে আক্রমণ করিয়া পরাজিত করিলেন এবং অন্যান্য দেশের প্রতিবাদ বা পরামর্শে ভ্রূক্ষেপও করিলেন না। সঙ্ঘ আবিসিনিয়াকে বিশেষ কোন সাহায্য করিল না। অবশেষে সঙ্ঘের দুর্ব্বলতার সুযোগ পাইয়া জার্ম্মেণীর নেতা হিট্‌লার সমস্ত সন্ধি ও চুক্তি উপেক্ষা করিয়া রাইন্‌ল্যাণ্ডে জার্ম্মাণ বাহিনী প্রেরণ করিলেন। কিন্তু তবু সঙ্ঘ বিশেষ কোন প্রতিবাদ করিল না। আন্তর্জাতিক সঙ্ঘের অন্তর্নিহিত সমস্ত শক্তি যে প্রায় নিঃশেষিত হইয়া আসিতেছে জাপান, ইটালী ও জার্ম্মেণীর মত তিনটি প্রতাপশালী দেশের অবজ্ঞা ও ঔদ্ধত্যই তাহার প্রমাণ।



জার্ম্মেণীর নেতা হের হিট্‌লার

কিন্তু তাই বলিয়া আন্তর্জাতিকতার আদর্শ অসার বা অলীক নহে। আদর্শ হিসাবে এই দুর্ব্বল আন্তর্জাতিক সঙ্ঘও সভ্যতা ও শক্তির একমাত্র আলোক। বর্ত্তমান সঙ্ঘ যথোপযুক্ত শক্তিসম্পন্ন হইতে না পারে, কিন্তু তাহার অর্থ এই নয় যে, পৃথিবীতে আন্তর্জাতিক একটা সঙ্ঘের কোনই প্রয়োজনীয়তা নাই। যুদ্ধের মত নৃশংস ও বর্ব্বরোচিত পন্থাকে যাহারা কলহ-মীমাংসার উপায় মনে করে, তাহাদের হাতে দেশ-শাসনের ভার ছাড়িয়া দিলে বর্ত্তমান সভ্যতা অতি অল্প সময়ে বিধ্বস্ত হইয়া যাইবে। এই পরিণাম হইতে মানুষকে ও পৃথিবীকে রক্ষা করার একমাত্র উপায় এমন একটা শক্তিসম্পন্ন আন্তর্জাতিক সংসদ স্থাপন করা, যেখানে পৃথিবীর সমস্ত রাজ্য সভ্য হইতে পারিবে এবং যাহার আশ্রয়ে দেশ-বিদেশের পরস্পরের কলহ শান্তিতে মীমাংসা হইয়া যাইবে। যতদিন এই প্রকার সম্পূর্ণ ও সুষ্ঠু একটা সংসদ প্রতিষ্ঠিত না হয়, ততদিন আন্তর্জাতিকতা প্রত্যেক দেশের শান্তিকামী লোকদের আদর্শ ও লক্ষ্য হইয়া থাকিবে।



জলহস্তী

১৯৬৬ পৃষ্ঠার পর

যে সকল পশুর গায়েব চামড়া খুব পুরু, তাহাদিগকে 'স্থূলত্বক্' জীব বলে। ইহাদের পায়ে একটিব বেশি খুর আছে। অনেকের গায়ে রোম হয় না। সকলেরই তিন প্রকারের দাঁত থাকে। চর্ব্বণদন্ত বিস্তৃত এবং ঐ দাঁত দিয়া ইহারা উদ্ভিদ্ অর্থাৎ ঘাস, লতা, পাতা, গাছেব কোমল শাখা প্রভৃতি চিবাইয়া খায়। এই জাতীয় প্রাণীরা বেশির ভাগই বাস করে উষ্ণপ্রধান দেশে। হস্তী স্থূলত্বক্ প্রাণী—হস্তীর কথা তোমাদের কাছে পূর্ব্বে বলা হইয়াছে।

হস্তীর পর যদি কোন বড় স্থূলত্বক্ জন্তুর কথা বলিতে হয়, তাহা হইলে হিপোর (Hippopotamus) কথা বলিতে হয়। ইহাদিগকে বাঙ্গলা ভাষায় জলঘোটক, নদীঘোটক বা জলহস্তী নাম দেওয়া হইয়াছে। কোন কোন হিপোর ওজন প্রায় চার টন (এক টন ওজনে প্রায় ২৭।০ মণ)। ইহারা আকারে—দৈর্ঘ্যে ক্ষুদ্র ল্যাজ সমেত প্রায় ষোল ফুট হইয়া থাকে, উচ্চতায় হয় প্রায় পাঁচ ফুট।



জলহস্তী

সংস্কৃত সাহিত্যেও জলহস্তীর নাম পাওয়া যায়। গ্রীসদেশের লোকেরা এই জন্তুর নাম দিয়াছিলেন Hippopotamus। ওলন্দাজেরা বলেন—See-kuhs সমুদ্রের গরু (Sea-cow)। আরবেরা বলেন জলমহিষ (Water-buffalo)। প্রাচীন মিশর দেশের লোকেরা বলিতেন River-swine। এখন আমাদের দেশে জলহস্তী নাই, কিন্তু এক সময়ে ভারতবর্ষেও জলহস্তী ছিল, তাহার প্রমাণ মধ্য ভারতের নর্ম্মদা নদীর উপত্যকাভূমি হইতে দুই জাতীয় জলহস্তীর কঙ্কাল পাওয়া গিয়াছে। ইহাদের নাম জলহস্তী বা নদীঘোটক হইলে কি হইবে? ইহারা কিন্তু সব সময় জলে বাস করে না। তবে আফ্রিকার কোন কোন অংশে এক প্রকারের জলহস্তী আছে, তাহারা কিন্তু প্রকৃত পক্ষে জলেই বেশি সময় থাকে।

এই জলহস্তীর গায়ের রং অনেকটা হাতীর মত এবং দাঁতও তেমনি বড় বড়। হাতীর দুইটি দাঁত, ইহাদের চারিটি। উপরের মাড়িতে দুইটি ও নীচের মাড়িতে দুইটি। পূর্ব্ব আফ্রিকায় শাদা দাঁতওয়ালা এবং শাদা পাওয়ালা জলহস্তী দেখা যায়। এই প্রাণীদের একটা বিশেষত্ব এই যে, ইহাদের গায়ের ঘাম দেখিতে হয় রক্তের মত এবং গায়ের চামড়া প্রায় দুই ইঞ্চি পুরু হইয়া থাকে।

জলহস্তীগুলি দেখিতে একেবারেই ভাল নয়। কিন্তু এরা বেশ দ্রুত চলাচল করিতে পারে। মানুষও অনেক সময় ইহাদের সঙ্গে দৌড়াইয়া পারে না, ইহারা জলে থাকিতে খুব ভালবাসে। জলের ভিতর ডুব দিয়া পাঁচ মিনিট হইতে দশ মিনিট পর্য্যন্ত থাকে। ইহারা যে কেবল জলে সাঁতরায়, ডুব দেয়—তাহাই নয়, এমন কি জলের নীচ দিয়া দিব্যি হাঁটিয়া যাইতে পারে, সেজন্য উপরে উঠিয়া শ্বাস প্রশ্বাসও লইতে হয় না।

তোমরা চিড়িয়াখানায় যাইয়া এই কুৎসিত প্রাণীটিকে দেখিয়া হয়ত এইকথা মনে ভাবিতে পার—এমন একটা বিশ্রী জানোয়ারের দ্বারা পৃথিবীর কি উপকার হয়? ঈশ্বর কোন প্রাণীকেই বৃথা



জলহস্তীর সম্মুখভাগ

সৃষ্টি করেন নাই। হিপোর দ্বারাও অনেক উপকার হয়। প্রচুর পরিমাণে জলজ উদ্ভিদ্ খাইয়া ইহারা নদী-নালা-খাল পরিষ্কার রাখে—ঐ সব অনিষ্টকারী জলজ উদ্ভিদ্গুলি বৃদ্ধি পাইয়া নদী খাল-বিল প্রভৃতি আর ভরিয়া ফেলিতে পারে না।



জলহস্তীর সাঁতার

ইহাদের পাকস্থলীটি বড় কম নয়, সেটি লম্বায় হইবে প্রায় ১১ ফিট। প্রায় ছয় বুশেল (bushel) পরিমাণ খাদ্য ইহাদের পাকস্থলীতে ধরে। এক এক বুশেলের ওজন হইতেছে ৯।০ সের। সময় সময় ইহারা ডাঙ্গায় আসিয়া ক্ষেতের ফসল খাইয়া নষ্ট করে। জলপথ পরিষ্কার রাখিবার জন্য হিপোর প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশি। ইহারা অনেক সময় সারাদিন জলে থাকে, তারপর সন্ধ্যার সময় পাড়ে উঠিয়া গাছপালা ও লতাপাতা খায় এবং সমস্ত রাত্রি মাঠেতে চরিয়া বেড়ায়।

জলহস্তীর ছানারা যতদিন পর্য্যন্ত না বড় হয়, ততদিন মা'র পিঠে চরিয়া বেড়ায়। আফ্রিকার লোকেরা জলহস্তীর মাংস খাইতে খুব ভালবাসে। ইহাদিগকে শিকার করিবার জন্য তাহারা নানাপ্রকার উপায় অবলম্বন করে। ইহারা একটুকুতেই ভয় পায়, যদি কোনও কারণে একবার ভয় পায়, তাহা হইলে ইহাদিগকে শিকার করা অত্যন্ত কঠিন হইয়া পড়ে।

আফ্রিকাদেশের লোকেরা কিরূপে 'হিপো' শিকার করে, সে কথা বলিতেছি। তাহারা এক গাছি দড়িতে কাঁটা বাঁধিয়া আস্তে আস্তে সাঁতার দিয়া, ইহাদিগকে সেই কাঁটা ছুঁড়িয়া মারে। কাঁটা জলহস্তীর গায়ে বিঁধিলে সেই দড়িটা ছাড়িয়া দেয়। পূর্ব্বেই দড়িতে একটি চোঙা বাঁধিয়া রাখে।

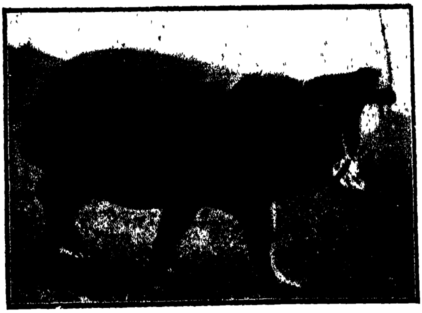


পরে কৌশলে চোঙাটি ধরিয়া টানাটানি করে। এইরূপ করিতে করিতে যখন জন্তুটি ক্লান্ত হইয়া



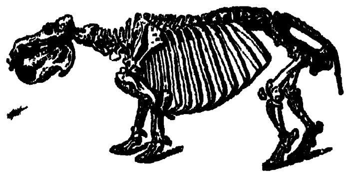
জলহস্তীর ছানা

পড়ে, তখন তাহাকে ধরিয়া মারিয়া ফেলা হয়। এক একটি জন্তুর শরীর হইতে দুইমণ-আড়াইমণ চর্ব্বি বাহির হয়; চামড়াও যেমন কাজে লাগে, ইহাদের হাড়ও তেমনি নানা কাজে ব্যবহৃত হয়। হিপোরা স্বাভাবিক ভাবে কত বৎসর বাঁচে, তাহা ঠিক করিয়া বলা কঠিন। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় ১৮৫০ খৃষ্টাব্দে একটি হিপোকে বাচ্চা অবস্থায় রাখা হইয়াছিল, সেই জলহস্তীটি ১৮৭৮ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত বাঁচিয়া ছিল। তাই মনে হয় যে বন্য অবস্থায় ইহাদের পরমায়ু বড় কম নহে।



লিবেরিয়া অঞ্চলের বামনবীর জলহস্তী

এক সময়ে সাহারা মরুভূমির দক্ষিণাংশে আফ্রিকার নদী-বহুল অংশে অধিক সংখ্যক জলহস্তী বাস করিত। প্রাচীন কালে রোম নগরে ২৯ খৃঃ পূর্ব্বাব্দ বা ৫৮ খৃঃ পূর্ব্বাব্দে রোম-সম্রাট অগাষ্টাসের (Augustus) রাজত্বকালে একটি হিপো ও পাঁচটি কুমীর রোমনগরীর মল্লভূমিতে দেখান হইয়াছিল। গ্রীক ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) লিখিয়াছেন—"সেকালে রোমনগীরর যোদ্ধারা



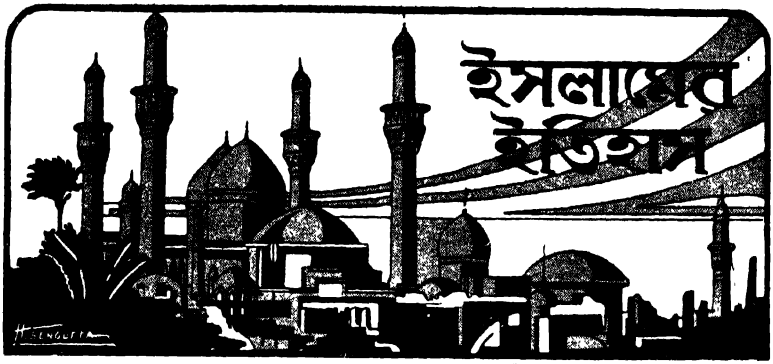
জলহস্তীর কঙ্কাল

তাহাদের শিরস্ত্রাণ এবং বন্ধন-রজ্জু হিপোর চামড়া দিয়া প্রস্তুত করিত।"

রোমসাম্রাজ্যের পতনের সাত শত বৎসর পরে ইউরোপে ১৮৩০ খৃষ্টাব্দে লণ্ডন নগরের পশু-শালায় একটি জলহস্তী আনা হয়। ইহার আগে ইউরোপের আর কোথাও জলহস্তী নীত হয় নাই।

পশ্চিম আফ্রিকায় এক জাতীয় ক্ষুদ্রাকার জলহস্তী দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুলি ছয় ফিট লম্বা হয় এবং উচ্চে হয় মাত্র ত্রিশ ইঞ্চি। এগুলিকে বলে লিবেরিয়া অঞ্চলের জলহস্তী (Liberian hippopotamus), দেখিতে অনেকটা বুনো শূকরের মত। ইহাদের পাগুলিও ছোট হয়। বামনবীর জলহস্তীদের স্বভাবের সহিত সাধারণ জলহস্তীর প্রকৃতিরও অনেকটা তফাৎ আছে, ইহারা বড় একটা জলে থাকে না। এই জাতীয় প্রাণীরা দল বাঁধিয়া বিচরণ করে না। দুইটি দুইটি করিয়া জোড়া বাঁধিয়া চলে, আর সাধারণ জলহস্তীরা পালে পালে চরিয়া বেড়ায়।

আফ্রিকা-ভ্রমণকারীদের মধ্যে প্রায় সকলেই লিখিয়াছেন—জলপথে যাইবার সময় জলহস্তীরা সময় সময় এমন ভাবে পথরোধ করিয়া দাঁড়ায় এবং নৌকা ডুবাইয়া দিবার চেষ্টা করে যে, সতর্ক হইয়া না চলিলে বিপদে পড়িতে হয়। বেকার, লিভিংষ্টোন প্রভৃতি ভ্রমণকারীরা অনেকবার এইরূপ বিপদে পড়িয়াছেন।



খেলাফতের অবসান

১৯৮৬ পৃষ্ঠার পর



মহাত্মা আলীর মৃত্যুর পর হজরত মুহম্মদের দৌহিত্র—আলীর পুত্র ইমাম হাসান কুফা ও তৎসন্নিকটবর্ত্তী মুসলমান কর্ত্তৃক খলিফা নির্ব্বাচিত হন; কিন্তু মুয়াবিয়া এই খিলাফত স্বীকার না করিয়া ইরাক আক্রমণ করিলেন। অন্য দিকে হাসানের বন্ধুগণও মুয়াবিয়ার প্রবোচনায় তাঁহার বিরুদ্ধাচরণ করিতে লাগিল। একদা জনৈক খারেজী মুসলমান হাসানের উরুদেশে অস্ত্রাঘাত করিল, ইহার পর হাসান ও মুয়াবিয়ার মধ্যে সন্ধি হইল—উভয়ে পবিত্র কোরাণশরীফ স্পর্শ করিয়া শপথ করিলেন যে, মুয়াবিয়া জীবিতাবস্থায় খলিফা থাকিবেন এবং তাঁহার মৃত্যুর পর হাসান পুনরায় খলিফা হইবেন। সর্ত্তানুযায়ী হাসান পদত্যাগ করিলেন এবং মুয়াবিয়া খলিফা হইলেন, হাসান ৬৬১ খ্রীষ্টাব্দে পরিবারবর্গসহ মদিনায় কালযাপন করিতে লাগিলেন। মুয়াবিয়া তাঁহার রাজধানী দামেস্কাসনগরে স্থানান্তরিত করিলেন।

ইহার কিছুকাল পরে মুয়াবিয়ার চক্রান্তে হাসানের পক্ষাবলম্বীদের ক্রমশঃ বিষপ্রয়োগ অথবা গুপ্ত-ঘাতকের হস্তে প্রাণত্যাগ করিতে হইল। এমন কি হাসানকেও গুপ্তভাবে বিষপ্রয়োগে হত্যা করা হইল, আশ্চর্য্য যে, আরবী মুসলমান এই দুর্দ্দান্ত নির্ম্মম স্বার্থান্বেষী মুয়াবিয়ার নায়কত্ব স্বীকার করিয়া লইল। মুয়াবিয়া ক্রমে তাঁহার শত্রু নিপাত করিয়া পুত্র এজিদকে খলিফা মনোনয়ন করিলেন। তোমাদের মনে আছে যে, একদিন মুয়াবিয়া কোরাণশরিফ স্পর্শ করিয়া শপথ করিয়াছিলেন যে, তাঁহার মৃত্যুর পর হোসেন খলিফা হইবেন, কিন্তু ইরাক ও সিরিয়াবাসিগণ এজিদের মনোয়ন সমর্থন করিল। মাত্র চারিজন—আলির পুত্র হাসান, ওমরের পুত্র আবদুল্লা, আবুবকরের পুত্র আবদুর রহমান ও যুবায়েরের পুত্র আবদুল্লা ভিন্ন মক্কা ও মদিনার সকলেই এজিদের মনোনয়ন সমর্থনের প্রতিশ্রুতি দিলেন, এখানেই ইসলামের সত্যিকারের রাজত্বের সূত্রপাত হইল, নির্ব্বাচনের যুগ লোপ হইয়া গেল।

কারবালা—মহরম

মুয়াবিয়া ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দে ইহলোক ত্যাগ করিলেন। মুয়াবিয়ারের ন্যায় নির্ম্মল চরিত্র, ক্রূর বুদ্ধি অথচ কর্ম্মক্ষম উদ্যমশীল নায়ক, ইসলামের ইতিহাসে অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। মুয়াবিয়া স্বার্থের জন্য করিতে না পারিতেন এমন

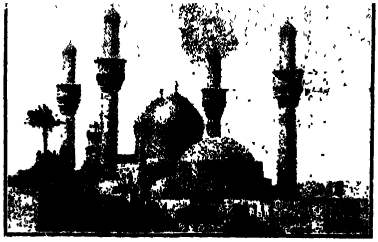
কাজ পৃথিবীতে অল্পই ছিল। মিথ্যা, প্রবঞ্চনা, শঠতা, প্রতিজ্ঞাভঙ্গ, হত্যা, গুপ্তহত্যা ইত্যাদি দ্বারা তিনি সমস্ত জীবনকে কলঙ্কিত করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু তিনি রাজ্যের উন্নতিসাধনে ও রাজ্যবিস্তারে বিশেষ ভাবে সচেষ্ট ছিলেন। তাঁহার সময় আফ্রিকার কোন কোন অংশ বিজিত হয়। আফগানিস্থানে মুসলমান ধর্ম্ম প্রচার করা হইল এবং গ্রীসের কয়েকটী দ্বীপ ও আফগানিস্থানের পূর্ব্বাংশ জয় করা হয়। ধর্ম্মের দিক দিয়া মুয়াবিয়া ইসলামের আচরণ ও অনুষ্ঠানগুলি যত্নের সহিত রক্ষা করিয়া চলিতেন, নামাজ ও রমজানের প্রতি তাঁহার বিশেষ দৃষ্টি ছিল, তাঁহার সময় দামেস্কাসে খলিফার জন্য প্রাসাদ নির্ম্মিত হয় এবং খলিফার শরীর-রক্ষী নিয়োগ করা হয়। পারস্য ও রোমকদিগের অনুকরণে তিনি ডাক-বিভাগের প্রবর্ত্তন করেন।

মুয়াবিয়া ৬৮০ খ্রীষ্টাব্দের এপ্রিল মাসে পরলোক গমন করেন। তাঁহার মৃত্যুর পর এজিদ নির্ব্বাচনের



খলিফা ওমর নির্ম্মিত মসজিদ—জেরুজেলেম

অপেক্ষা না করিয়া পিতার সিংহাসনে আরোহণ করেন। এজিদ হজরত মুহম্মদের সহচর ও সহকর্ম্মীদের লোকচক্ষে হেয় করিতে বিশেষ আনন্দ লাভ করিতেন। রাজসভায় এবং প্রকাশ্যে



শিয়াসম্প্রদায়ের একটী বিখ্যাত মসজিদ—বোগদাদ

উচ্ছৃঙ্খলতা এজিদের খিলাফতের বিশেষত্ব। এজিদ মুসলমানের পবিত্র মদিনাতীর্থ আক্রমণ করেন এবং মক্কার অতি পবিত্র কাবাগৃহ বিধ্বস্ত করেন।

এজিদের খিলাফত গ্রহণ বহু মুসলমান অস্বীকার করিয়াছিলেন, মুহম্মদের দৌহিত্র ইমাম হোসেন এজিদের চরিত্রদোষ হেতু তাঁহাকে বিশেষ ভাবে ঘৃণা করিতেন এবং নিজে নিরাপদ হইবার জন্য মদিনা ত্যাগ করিয়া মক্কায় আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। হোসেন ছিলেন শান্তপ্রকৃতি, নম্রচরিত্র অথচ প্রয়োজন বোধে দৃঢ়চিত্ত ব্যক্তি। এজিদের অনাচারের বিরুদ্ধে যখন ইরাকবাসিগণ হোসেনকে ইরাকের নেতৃত্ব গ্রহণ করিতে অনুরোধ করিলেন, তখন তিনি ন্যায়ানুরোধে এই ধর্ম্মযুদ্ধে যোগদান করিতে স্বীকার করিলেন। তাহাদের সাহায্যের প্রতিশ্রুতির উপর নির্ভর করিয়া হোসেন তাঁহার দুই পুত্র, বিশ্বস্ত অনুচর, বহু স্ত্রীলোক ও শিশু সমেত আরবের বিশাল মরুপ্রান্তর পার হইয়া কুফার দ্বারদেশে উপস্থিত হইলেন। কিন্তু কুফার প্রতিশ্রুত সৈন্যগণকে না দেখিয়া তাহাদের বিশ্বাসঘাতকতা বুঝিতে পারিলেন এবং ইউফ্রেতীস নদীর পশ্চিম-কূলের **কারবালা** নামক স্থানে শিবির সন্নিবেশ করিলেন।

এদিকে এজিদের সৈন্যগণ হোসেনের শিবির অবরোধ করিল এবং ইউফ্রেতীসের পথ বন্ধ করিয়া দিল, মরুপ্রান্তরে জলাভাবে হোসেনের ও তাঁহার সঙ্গীদের দুর্দ্দশার সীমা রহিল না। হোসেন সন্ধির প্রস্তাব করিলেন, কিন্তু অপমানের সঙ্গে সেই প্রস্তাব

প্রত্যাখ্যাত হইল। সম্মুখযুদ্ধে হোসেনের অনুচরবর্গ বিপুল বিক্রম প্রকাশ করিলেন, কিন্তু অসংখ্য পরিপুষ্ট শত্রু কর্ত্তৃক দূর হইতে নিক্ষিপ্ত শরাঘাতে বহু অনুচর প্রাণত্যাগ করিল। সমস্ত দিনব্যাপী যুদ্ধের পর পরিশ্রান্ত কলেবরে হোসেন পিপাসায় কাতর হইয়া জলের সন্ধানে বাহির হইলেন, কিন্তু শত্রুর শর তাঁহাকে বিতাড়িত করিয়া দিল। শিবিরে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়া তিনি একটী শিশু সন্তান ক্রোড়ে লইয়া বাহির হইলেন। অকস্মাৎ শত্রুর তীর শিশুকে বিদ্ধ করিল, একে একে তাঁহার পুত্র ও ভ্রাতুষ্পুত্র নিহত হইল, পিপাসার্ত্ত ও শ্রান্ত হোসেনকে একটী নারী একপাত্র জল পান করিতে দিল। ত্রস্ত হস্তে পানপাত্র মুখের সম্মুখে উত্তোলন করিতেই দূর হইতে নিক্ষিপ্ত শত্রুর তীর মুখ বিদ্ধ করিল, শত্রুর ব্যবহারে হতাশ হইযা হোসেন শত্রু নিপাতে ধাবিত হইলেন, কিন্তু রক্তপাত-হেতু অবসন্ন দেহ আর ধরিয়া রাখিতে পারিলেন না। হঠাৎ দুর্ব্বল দেহ ভূমিতে লুটিয়া পড়িল, শত্রুসৈন্য মৃতপ্রায় বীরকে আক্রমণ করিল। শীমার হোসেনের মস্তক দেহ বিচ্যুত করিল, হোসেনের বংশে জয়নাল আবেদীন্ ব্যতীত আর কেহ অবশিষ্ট রহিল না। সত্তরটী দেহ-হীন মুণ্ড এজিদের সেনা-পতি ওবায়দুল্লার নিকট প্রেরিত হইল। হোসেনের মস্তক দামেস্কাসে এজিদের নিকট প্রেরিত হইল। কারবালার অধিবাসিগণ হোসেনের দেহাংশ ঐ স্থানে সমাধি দান করিল। সুতরাং কারবালা মুসলমানদের অতি প্রিয় স্থান। হোসেনের ছিন্ন মুণ্ড দামেস্কাস্ হইতে মদিনা এবং তথা হইতে কায়রো নগরে নীত হইয়া সমাধিস্থ হইল। সেই-জন্য ঐ সব স্থান মুসলমানের পুণ্য তীর্থ। এমনি করিয়া হজরত মুহম্মদের বংশের শেষ বীর-সন্তানকে কারবালার বিজন মরুপ্রান্তরে সহায়হীন তৃষ্ণার্ত্ত জীবন বিসর্জ্জন করিতে হইল।

কারবালার এই শোচনীয় কাহিনীর স্মৃতিপূজাই **মহরম** নামক পর্ব্বে অনুষ্ঠিত হয়।

আদিম খলিফাদের শাসন-প্রণালী

খলিফাদের শাসন বহু বিস্তৃতি লাভ করিলেও শাসন-প্রণালী প্রথমতঃ আরবজাতিকে বেষ্টন করিয়া গড়িয়া উঠে এবং আরবীয় জীবন-ধারার সঙ্গে খেলাফতের শাসন-প্রণালীর বিশেষ নিকটসম্বন্ধ আছে; সুতরাং আরবীয় জীবন-ধারার সঙ্গে পাঠকের একটু পরিচয় থাকা দরকার।

আরব জাতি ছিল প্রথমতঃ অশিক্ষিত, নিয়ম-বন্ধনবিহীন, অসহিষ্ণু এবং স্বাধীনতাপ্রিয়—জীবনে যুদ্ধ করা, যুদ্ধে জয়ী হইয়াও বিজিতের প্রাণ নেওয়া অথবা বিজিতের হস্তে প্রাণ দেওয়া ভিন্ন অন্য কোন চারুশিল্প বা সভ্যতার বিকাশ ছিল না। এই যুদ্ধময় জীবনের অবসর মুহূর্ত্তগুলিকে তাহারা উৎসব, নাচ, গান ও কবিতায় ভরিয়া দিত। প্রাক্ মহম্মদীয় যুগের আরবী কবিতাগুলি খুবই সরস ও মনোরম। তাহারা দেবতা ও ঈশ্বর বিশ্বাস করিত। আরবীয় ঈশ্বর ছিল বহু। প্রায়ই দেবতারা মঙ্গলবাচক ছিলেন না। বেশির ভাগ দেবতার মূলে ছিল রুষ্ট দেবতার রোষ ও শাস্তি। "দেবতা মঙ্গল কর আর না কর, অমঙ্গল করিও না।" দেবতাদিগের সঙ্গে আরবদিগের সম্বন্ধ ছিল দেওয়া আর নেওয়া। অনেক সময় প্রার্থনা করিয়া ইষ্ট লাভ না করিলে আরবীয়গণ তৎক্ষণাৎ সেই দেবতাকে ত্যাগ করিয়া অন্য দেবতার আশ্রয় গ্রহণ করিত। দেবতার প্রাধান্য প্রতিষ্ঠার জন্য বিভিন্ন আরব গোষ্ঠী যুদ্ধ পর্য্যন্ত করিতে কুণ্ঠিত হইত না। মুহম্মদকে বহু ঈশ্বর বাদ দিয়া এক ঈশ্বর প্রতিষ্ঠা করিতে অনেক লাঞ্ছনা ভোগ করিতে হইয়াছিল। মুহম্মদের অনুবর্ত্তিগণ যখন একেশ্বর-বাদী ইস্‌লাম্‌গোষ্ঠী প্রতিষ্ঠা করিতে প্রয়াস পাইলেন, তখন অন্যান্য দেবতাবাদী আরবীয়গণ তাঁহাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিল। বিরুদ্ধবাদিগণের প্রতিরোধমানসে মুহম্মদ খলিফা অর্থাৎ ধর্ম্মনেতার পদ সৃষ্টি করিলেন।

এই খলিফা হইলেন ধর্ম্মযাজক, ধার্ম্মিক-মণ্ডলীর শাসক ও বিচারক। ইস্‌লামীগণকে রক্ষণ, পালন, পরিবর্দ্ধন করাই ছিল ইঁহার প্রধান কাজ। প্রধান-তম রাজপুরুষ রূপে যথেচ্ছাচারী হইতে পারিলেও তাঁহার একটী শাসন-পরিষদ্ ছিল। এই পরিষদের সভ্যগণ সাধারণতঃ বয়োবৃদ্ধ এবং জ্ঞানবৃদ্ধ মুহম্মদের শিষ্য হইতে মনোনীত হইয়াছিল। অবশ্য দুই-একজন 'বেদুইন' সর্দ্দার ও বিশিষ্ট নাগরিক কখনও কখনও আহূত হইত। এই পরিষদে বিভিন্ন বিভাগ ছিল, যথা—শাসন, রাজস্ব ও জিজিয়া, বিচার, সংবাদ আদান-প্রদান, যুদ্ধ ও জেহাদ্।

শাসন-বিভাগ—শাসন-বিভাগ প্রধানতঃ খলিফার নিজের তত্ত্বাবধানে থাকিত। অধীনস্থ ও বিজিত দেশসমূহ শাসন-সুবিধার জন্য বিভিন্ন অংশে বিভক্ত করা হইত এবং প্রতি অংশে আমীর নিযুক্ত করা হইত, তাহাদের অধীনে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কর্ম্মচারী থাকিত। খলিফা ওমারই এই বিভাগের বিশেষ উন্নতিসাধন করেন। আমীরগণ প্রতি শুক্রবারে সরকারী মসজিদে নামাজের সময় ইমামের কাজ করিতেন এবং খোৎবা পড়িতেন। আমীরের অধীনে অর্থবিভাগের জন্য দেওযান নামক কর্ম্মচারী থাকিতেন, এই দেওয়ানের দপ্তরে প্রত্যেক দেশ-বাসীর নাম, ধাম, জমি, জায়গার একটী বিবরণ থাকিত, সেই অনুসারে প্রতি লোকের নিকট হইতে রাজস্ব আদায় করা হইত। এই বিভাগের তত্ত্বাবধানে সেচন-বিভাগ ছিল, তাঁহারা বেবিলনের খাল, তাইগ্রিসের ও ইউফ্রেটীসের বাঁধ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। মিশরে নীলনদীর অব্যবহৃত জল-ধারা ওমর কর্ত্তৃক পরিষ্কৃত হইয়াছিল।

রাজস্ব-বিভাগ—রাজস্ব-বিভাগও খলিফার তত্ত্বাবধানে ছিল। যে সমস্ত অর্থ সাধারণ কোষা-গারে রক্ষিত হইত, তাহাকে আরবী ভাষায় 'বায়তুলমাল' বলা হয়। নিম্নলিখিত আয়-দ্বারা 'বায়তুলমাল' গঠিত হইত—

(১) প্রতি মুসলমানের আয়ের শতকরা ২॥০ টাকা।

(২) যুদ্ধলব্ধ শতকরা ২৪৲ টাকা।

(৩) জিজিয়া।

(৪) ওসার ও খেরাজ।

প্রতি মুসলমানের সমস্ত বৎসরের খরচের পর আয়ের উদ্বৃত্ত অংশের মধ্য হইতে প্রতি শতে ২॥০ টাকা করিয়া খলিফার কোষাগারের দান-স্বরূপ দিতে হইত। যুদ্ধে শত্রুর নিকট হইতে প্রাপ্ত অর্থের শতকরা ৮০ ভাগ সৈন্যগণ গ্রহণ করিত, এবং বাকী অংশ ২০ ভাগ খলিফার কোষাগারে নীত হইত। অমুসলমান প্রজাদের নিকট হইতে জিজিয়া নামক 'কর' গ্রহণ করা হইত। কোরাণে ও 'হাদিসে' এই জিজিয়ার উল্লেখ নাই। তথাপি ওমর এইবার প্রথম এইরূপ কর ধার্য্য করেন যে, প্রত্যেক ধনী ব্যক্তি বার্ষিক ১২৲, মধ্যবিত্ত ব্যক্তি বার্ষিক ৬॥০, সাধারণ ব্যক্তি বার্ষিক ৩৲ হিসাবে কর দিবে। অবশ্য স্ত্রীলোক, বালক, বৃদ্ধ ও পীড়িত ব্যক্তিগণকে এই জিজিয়া কর দিতে হইত না। ভারতে আকবর ও জাহাঙ্গীর ব্যতীত সকল মুসল-মান সম্রাটই এই কর গ্রহণ করিতেন। যে সমস্ত অমুসলমান প্রজা খলিফার পক্ষে যুদ্ধ করিতে অস্বীকার করিতেন, তাহাদিগকেও এই জিজিয়া কর দিতে হইত, যেমন নর্ম্ম্যান্ যুগে ইংলণ্ডের ব্যক্তিগত সামরিক কার্য্যের বিনিময়ে 'Scutage' দিত।

'ওসার' ছিল সেচন-শুল্ক, যাহাকে ইংরেজীতে বলে 'Irrigation Tax'। যাহাদের জমি এই পয়ঃপ্রণালী দ্বারা সেচিত হইত, তাহারা এই কর দিত। এই কর জমির আয়ের দশমাংশের সমান ছিল বলিয়া তাহারা 'ওসার' ($\frac{১}{১০}$) দিত। বিজয়ী সৈন্যদের মধ্যে বণ্টিত ভূমির উপর এই কর ধার্য্য করা হইত। অন্যান্য জমির উপর ধার্য্য করকে 'খেরাজ' বলিত।

'বায়তুলমালে'র অর্থ 'সাধারণের যুদ্ধকার্য্য' জাতি-কর কার্য্য' ও কর্ম্মচারীর বেতন, বার্ষিক বৃত্তি ও দরিদ্রকে দানের জন্য ব্যয়িত হইত। প্রথম চার খলিফা এই 'বায়তুলমালে'র কোনও অর্থ নিজের কোন কাজে ব্যয় করেন নাই; খলিফা হজযাত্রী-দের ব্যয়-ভার নিজে গ্রহণ করিতেন কিংবা তৎপরিবর্ত্তে আমীর-উল-হজ নিযুক্ত হইত।

বিচার-বিভাগ—খলিফাদের যুগে এই বিভাগ 'কাজী' নামক বিচারপতির হস্তে ন্যস্ত ছিল, কাজী খলিফা কর্ত্তৃক নিযুক্ত হইত। কাজীগণ অভিযোগ শুনিতেন ও বিচার করিতেন, মস্‌জিদ ও ওয়াকফ্ সম্বন্ধে মীমাংসা করিতেন। নাবালকের জন্য অভি-ভাবক নিযুক্ত করিতেন। রাস্তাঘাট পর্য্যবেক্ষণ করিতেন। তাঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে আপীল হইত। খলিফা আপীল-আদালতের সভাপতি ছিলেন। কাজী আমীর শাসিত প্রদেশে থাকিলেও আমীরের কর্ত্তৃত্বের বাহিরে ছিলেন। খলিফা ওমর প্রথমে বেতনধারী কাজী নিযুক্ত করেন এবং 'হাকিম' পদবী দেন। শরিয়তের নিয়ম ও দৃষ্টান্ত অনুসারে হাকিমকে বিচার করিতে হইত। এইজন্য তাঁহাকে হাকিম্-উস্ শহেরা বলা হয়। খলিফাদের ন্যায় তাঁহার জ্ঞান খুব তীক্ষ্ণ ও তীব্র ছিল, যথাশক্তি মানুষের সাধারণ শিক্ষার জন্য মসজিদের সংলগ্ন 'মক্তব' স্থাপন করেন। তিনি ন্যায় বিচার করিতে চেষ্টা করিতেন। পুলিশের কাজ প্রথমতঃ জন-সাধারণের উপর অর্পিত ছিল। খলিফা 'ওমর'ই রাত্রির জন্য চৌকিদার নিযুক্ত করেন। আলী

পুলিশপ্রথা শৃঙ্খলাবদ্ধ ও প্রহরীগণকে সঙ্ঘবদ্ধ করেন। মুহম্মদের মক্কা হইতে মদিনা গমনের সময় হিজরী বা মুসলমানের 'সন্' গণনা করার প্রথা ওমর প্রচলিত করেন। মুসলমানগণ চন্দ্রের গতির দ্বারা দিনকাল নিয়মিত করেন। তুর্কী আলবেরুণী পারশী ওমরখৈয়াম ও ভারতীয় আকবর এই চান্দ্রমাসের প্রতিবাদ করিয়াছিলেন। শাহজাহান এই আকবরের সৌরমাসের পরিবর্ত্তন কবিয়া পুনরায় চান্দ্রমাস প্রবর্ত্তন করেন।

সংবাদ আদান-প্রদান-বিভাগ—ইহাকে পররাষ্ট্র-বিভাগ বলা যাইতে পাবে। ইসলামেব তদানীন্তন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আলীব উপব এই বিভাগের ভার ছিল। তাহাব উপব পরাজিত যুদ্ধেব বন্দীর পর্য্যবেক্ষণ এবং যুদ্ধেব 'Ransom' নির্ণয়ের ভার ছিল (মুক্তি-কব)।

যুদ্ধ-বিভাগ—আরবী মুসলমানগণ সাধাবণতঃ যুদ্ধজীবী ও যুদ্ধব্যবসায়ী ছিল। প্রত্যেক আববীয়কে বাঁচিয়া থাকিতে হইলে তাহাকে শত্রুর হস্ত হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে হইত; সুতরাং যুদ্ধের জন্য সৈন্য সংগ্রহ করা খলিফার পক্ষে কোন অসুবিধা ছিল না। সাধারণ বিভিন্ন tribe (গোষ্ঠী) হইতে সৈন্য সংগ্রহ করা হইত। সৈন্যগণ সাধারণতঃ তিন-ভাগে বিভক্ত ছিল—অশ্ববাহিনী, উষ্ট্রবাহিনী ও পদাতিক। উষ্ট্রবাহিনী সাধাবণতঃ মাল সরবরাহ করিত। অশ্বারোহিগণ ঢাল, অসি ও বর্শা ব্যবহার করিত। পদাতিকেরা ঢাল, বর্শা এবং অসির পরিবর্ত্তে তীর ব্যবহাব কবিত। অশ্বারোহিগণ লোহার বর্ম্ম ও শিরস্ত্রাণ ব্যবহার করিত। পদাতিকগণ বর্ত্তমানকালের পায়জামার মতন ঢিলা জামা পরিধান করিত। সাধারণতঃ যুদ্ধে ব্যক্তিগত প্রতিযোগিতা দ্বারা আরম্ভ হইত, যেমন ফারদোসীর সোরাব ও রোস্তামের গল্পে জানা যায় যে যুদ্ধের পূর্ব্বে তাহারা কোরাণের আয়াৎ উচ্চারণ করিয়া যুদ্ধে অগ্রসব হইত। সৈনিকগণ ঢোল ও কানাড়া নামক বাদ্যযন্ত্র ব্যবহার কবিত। সৈন্যদের কোনও নির্দ্দিষ্ট আবাসস্থান ছিল না। তাল ও খেজুরের পাতাদ্বারা তৈয়ারী কুটীরে বাস করিত। পরে ওমর চিরস্থায়ী সামরিক আবাসস্থান নির্ম্মাণ করেন এবং বিজিত দেশসমূহে দুর্গ স্থাপন কবিতে আরম্ভ করেন। সৈন্যগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের স্ত্রী-পুত্র লইয়া সৈনিকাবাসেব নির্দ্দিষ্ট প্রকোষ্ঠে বাস কবিতে পারিত। বিবাহিত সৈনিকগণ সাধারণতঃ একাদি-ক্রমে চাবিমাস থাকিত। তারপব পবিবাবেব নিকট প্রত্যাবর্ত্তন করিবার অনুমতি পাইত। সৈন্যগণ যুদ্ধের সময় রেশম ইত্যাদি সূক্ষ্মবস্ত্র ব্যবহার কবিতে পাইত না। স্বর্ণাঙ্গুরী প্রভৃতি বিলাসদ্রব্য বর্জ্জনীয় ছিল। মাদকতাব জন্য শাস্তি ছিল আশীটী বেত্রাঘাত। শাসন ও নিয়ম কঠোব ভাবে প্রচলিত ছিল। যুদ্ধবিজিত দেশেব লুণ্ঠিত দ্রব্যের শতকরা ষাট ভাগ সৈন্যদিগেব প্রাপ্য ছিল। যাহারা শত্রু নিপাত করিয়া যুদ্ধে জয়ী হইত, তাহাদিগকে 'গাজী' ও যাহাবা যুদ্ধে 'হত' হইত তাহাদিগকে 'শহিদ' বলা হইত। শহিদ ও গাজী উভয়েই স্বর্গলাভ কবিত। এইরূপ ধর্ম্মের প্রেরণাই ইসলামের পৃথিবীজয়ের একটা প্রধান কারণ।



একনাথ

২০৪৫ পৃষ্ঠার পর

একনাথ মহারাষ্ট্রদেশের একজন বিখ্যাত সাধু পুরুষ ছিলেন। তাঁহার পিতা সূর্য্যজী জাতিতে ব্রাহ্মণ এবং গোদাবরী তীরে পৈঠন নামক একটি গ্রামের অধিবাসী ছিলেন।

একনাথ একদিকে যেমন ধর্ম্মপরায়ণ সাধু ছিলেন, তেমনি ছিলেন সুকবি ও সুলেখক। তিনি ভাগবতের অনুবাদ করিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করেন। ভাগবত-ধর্ম্ম বলিতে কি বুঝায়, এই কথা তাঁহার ভাগবতের অনুবাদে বিশেষ ভাবে বলা হইয়াছে। একনাথের ভাগবতের ধর্ম্ম সম্বন্ধে যে ধারণা, তাহা অতি উদারভাবে পূর্ণ। তিনি বলিয়াছেন—ঈশ্বরকে ভালবাসিবে, আর জাতির অহঙ্কার ত্যাগ করিবে। ভক্তিপরায়ণ হওয়া ও জাতিভেদের গৌরব পরিত্যাগ করাই হইতেছে ভাগবতের শ্রেষ্ঠ ধর্ম্ম। প্রীতি বল, বৈরাগ্য বা মুক্তি বল—সে সমুদয়ই ভক্তির মধ্যে নিহিত। যিনি ভক্ত, তিনি মুক্তি চাহেন না। তাঁহার কাছে ভক্তিই শ্রেষ্ঠ ও আদরণীয়।

একনাথ জাতিভেদ মানিতেন না। দক্ষিণ দেশের মাহার জাতি সমাজে পতিত ও অতি নিকৃষ্ট বলিয়া গণ্য হয়। সাধু একনাথ মাহারদের সঙ্গে এক গৃহে থাকিতে কিংবা ভোজন করিতে ইতস্ততঃ করিতেন না। এইজন্য তাঁহাকে তাঁহার সমাজের ব্রাহ্মণেরা জাতিচ্যুত করিল, কিন্তু তিনি তাহা গ্রাহ্য করিলেন না। তাঁহাকে অপমান করিবার জন্য তাঁহার লেখা সমস্ত বই গোদাবরী নদীর জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল। গল্প আছে যে, নদীর জলে যেমন বইগুলি ব্রাহ্মণেরা ফেলিয়া দিল, অমনি সেই সব বই আবার ভাসিয়া উঠিল। তাঁহার সম্বন্ধে এইরূপ আরও অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য অলৌকিক ঘটনার কথা আছে।

একনাথ ভাগবতের অনুবাদ করিয়া মহারাষ্ট্র-দেশে অক্ষয়-কীর্ত্তি অর্জ্জন করিয়া গিয়াছেন। ১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দে একনাথ পরলোক গমন করেন।

একনাথের বাণী

ঈশ্বরের প্রতি প্রেম, ভক্তি এবং জাতিভেদের অহঙ্কার ত্যাগ করিবে।

* * *

বিষয় ত্যাগ করিলেও ছাড়ে না। আবার আসিয়া কাঁধে চাপিয়া বসে, কাজেই সর্ব্বপ্রকারে বিষয় ত্যাগ করিবে।

* * *

ভক্তের কাছে মুক্তি অপেক্ষাও ভক্তি শ্রেষ্ঠ।

তুকারাম

তোমরা মহারাষ্ট্র-বীর ছত্রপতি শিবাজী মহা-রাজার নাম ও তাঁহার সম্বন্ধে অনেক কথাই

ইতিহাসে পড়িয়াছ। শিবাজীর রাজত্বকালে মহারাষ্ট্রীয় দেশে যে সকল মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করেন, তাঁহার মধ্যে তুকারাম ছিলেন একজন বিখ্যাত সাধু ও কবি।

পুনা সহর হইতে প্রায় আট-নয় ক্রোশ দূরে ইন্দ্রায়নী নদীর তীরবর্ত্তী দেউ নামক গ্রামে শূদ্র বংশে তুকারাম জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চরিত্র অত্যন্ত নির্ম্মল ছিল। সর্ব্বদা মন টলিল না। তুকারামের স্ত্রী তুকারামের ত্যাগ ও বৈরাগ্য জিনিষটাকে একেবারেই ভাল চক্ষে দেখিতেন না। তিনি তুকারামকে তাঁহার সংসার-বিষয়ে বৈরাগ্যের জন্য সর্ব্বদা গাল-মন্দ দিতেন। কিন্তু ঈশ্বরভক্ত তুকারাম সে সব কথায় কান দিতেন না, তিনি আপনার মনে ভজন ও আরাধনা করিতেন।

শিবাজী মহারাজ তুকারামের কথা শুনিয়া



ছত্রপতি শিবাজী এবং তাঁহার দুইজন সেনাপতি (একখানি প্রাচীন তৈল-চিত্র হইতে গৃহীত)

আপন-মনে নির্জ্জনে বসিয়া ঈশ্বরের বিষয়ে চিন্তা করিতেন। কুড়ি বৎসর বয়সে তাঁহার মনে বৈরাগ্য উপস্থিত হয়। এ সময়ে তাঁহার কাজ ছিল শুধু ভক্তি বিষয়ে আলোচনা ও নাম সংকীর্ত্তন করা। ব্রাহ্মণেরা তাঁহার ধর্ম্ম সম্বন্ধে আলোচনা, এবং শ্রুতি-স্মৃতির সম্বন্ধে সকলের কাছে ব্যাখ্যা করা ভাল চোখে দেখিলেন না। তাঁহারা নিরীহ ভাল মানুষ তুকারামকে অপমান করিতে লাগিলেন। ব্রাহ্মণদের অপমান ও লাঞ্ছনায় কিন্তু তুকারামের তাঁহাকে দেখিবার জন্য ডাকিয়া পাঠাইলেন। তুকারাম তাহা শুনিলেন না। শিবাজী দ্বিতীয় বার তাঁহাকে বিনীত ভাবে নিমন্ত্রণ করিয়া উপঢৌকন স্বরূপ অনেক মূল্যবান দ্রব্যাদি প্রেরণ করিলেন। তুকারাম তাহা গ্রহণ না করিয়া শিবাজীকে লিখিয়া পাঠাইলেন—হে মহারাজ! আমার কাছে সোনাও যেমন, মাটিও তেমন। তোমার প্রেরিত ধন-সম্পদ উপহার দিয়া আমি কি করিব? "তুম চেঁ যের বিত্ত-ধন তৈঁমজ মৃত্তিকে

সমান।”—তোমার যে বিত্ত-ধন, তাহা যে আমার কাছে মৃত্তিকা সমান। তুকা আশা করে, তুমি হরির (ঈশ্বরেব) দাস হও।

গল্প আছে যে, তুকারাম যখন কোন রূপেই শিবাজীর সঙ্গে দেখা করিতে গেলেন না, তখন স্বয়ং ছত্রপতিরাজ তুকারামকে দর্শন করিতে আসিলেন। শিবাজী তুকারামের ভক্তি, ত্যাগ এবং সাধুতা দেখিয়া একেবারে মুগ্ধ হইয়া গেলেন। তিনি তুকাবামের প্রতি এতদূব অনুবাগী হইয়া পড়িলেন যে, কোথায় বহিল তাঁহার বাজধর্ম্ম! কোথায় বা রহিল তাঁহার যুদ্ধ-বিগ্রহ! তিনি নিজ রাজকার্য্য পবিত্যাগ করিযা তুকাবামেব সহিত ভজন ও কীর্ত্তন করিতে লাগিলেন।

ইহা দেখিযা শিবাজীব মাতা জিজাবাঈ তুকাবামেব নিকট আসিলেন এবং যাহাতে শিবাজী রাজকার্য্যে মনোনিবেশ কবেন, সেজন্য অনুবোধ কবিলেন। তখন তুকাবাম শিবাজীকে উপদেশ দিলেন—আমি ভক্তি পথেব পথিক, তুমি বাজা, তোমাব পক্ষে কর্ম্মই শ্রেয়ঃ! তুমি কর্ম্মযোগী হইবে, অতএব তুমি রাজধানীতে ফিরিযা যাইয়া রাজকার্য্য কব।

শিবাজী যাইবাব সময তুকাবামকে জিজ্ঞাসা কবিলেন—প্রভু! আমি কাহাকে গুরু কবিব এবং কাহাব উপদেশ মত চলিব, এ বিষয়ে উপদেশ দিন।

তখন তুকাবাম বলিলেন—

রায়া ছত্রপতি ঐ কাবে বচন রামদাসী ধ্যান লাবাবেগীঁ।
রামদাস স্বামী সোযরা সজ্জন ত্যাসীঁ তূঁন মন অর্পা বাপা।
ধর্কনকো আস আমুচী ভূপালা রামদাসী ডোলা লাবা বেগীঁ
শরণ অসাবেঁ রামদাস লাগীঁ নমন সাষ্টাঁগী ঘালীঁ ত্যাসী।

হে ছত্রপতি রাজা, শুন (আমার) বচন, রামদাসে ধ্যান লাগাও।

রামদাস স্বামী তোমার মিত্র ও সজ্জন, তাঁহাকে তুমি নমস্কার অর্পণ কর (হে) বাপা।

ধরনা আমার আশা হে ভূপাল, রামদাসের প্রতি (নিজ) চক্ষু (মন) লাগাও।

শরণ লও রামদাস স্বামীর, তাঁহাকে সাষ্টাঙ্গে নমস্কার কর।
[প্রবাসী—৩২২ পৃষ্ঠা, তৃতীয ভাগ ১৩১০]

শিবাজী তুকারামের উপদেশ অনুসারে রামদাস স্বামীকে নিজ গুরুবরণ করিলেন।

তুকারাম একজন বিখ্যাত কবি ছিলেন। তিনি যে ছন্দে কবিতা রচনা করিয়াছিলেন, তাহার নাম ‘অভঙ্গ’। ১৬৫৯ খ্রীষ্টাব্দে তুকারামের মৃত্যু হয়।

রামদাস স্বামী

বসিয়া প্রভাতকালে, সেতারার দুর্গভালে,
শিবাজী হেবিলা একদিন—
রামদাস, গুরু তাঁব, ভিক্ষা মাগি' দ্বার দ্বার
ফিরিছেন যেন অন্নহীন। ইত্যাদি।

বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথেব লিখিত ‘প্রতিনিধি’ নামক এই কবিতাটি তোমরা অনেকেই পড়িয়া থাকিবে। শিবাজীর গুরু সেই রামদাসের কথাই এখানে বলিতেছি।

হায়দারাবাদ রাজ্য হইতে প্রায় পনের মাইল দূরে পাতুর নামক রেল-ষ্টেশনের কাছে জাম্ব



জাম্ব গ্রাম

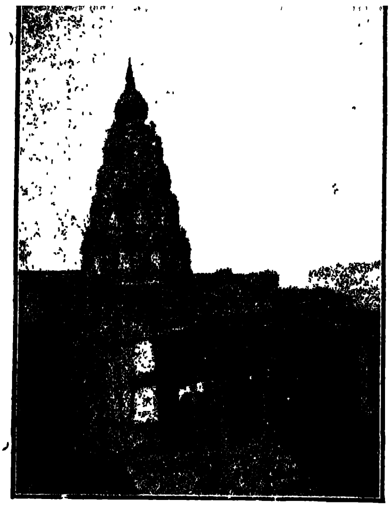
(Jamb) গ্রাম অবস্থিত। জাম্ব গ্রামটি বেশ সুন্দর, চারিদিকের শস্য-শ্যামল ক্ষেত্রসমূহের মধ্যে ইহার অবস্থান। এই জাম্ব গ্রামে ১৬০৮ খৃষ্টাব্দে রাম-দাসের জন্ম হয়। ইনি জাতিতে ব্রাহ্মণ ছিলেন। রামদাসের পূর্ব্বপুরুষ কৃষ্ণজী যোশার নামে একজন ব্রাহ্মণ ৯১০ খ্রীষ্টাব্দে বিদারে বাস করিতেন। তাঁহার বংশধরেরা পরে জাম্ব গ্রামে আসিয়া বাস করিতে থাকেন। রামদাসের পিতা সূর্য্যাজীপন্ত কৃষ্ণজী হইতে বাইশ পুরুষ। রামদাসের পিতা সূর্য্যাজীপন্ত ১৫৬৮ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন।

গল্প আছে যে, সূর্য্যাজীপন্ত নিঃসন্তান ছিলেন বলিয়া নানারূপ পূজা ও উপাসনা করিতেন।

অবশেষে সূর্য্যদেবের তপস্যা করার ফলে রামদাস জন্মগ্রহণ করেন। রামদাসের মাতা রাণুবাঈ রামদাস জন্মিবার পূর্ব্বে নানারূপ আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য স্বপ্ন দেখিতেন। রামদাসের জ্যেষ্ঠভ্রাতা গঙ্গাধর ১৬০৫ খ্রীষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার তিন বৎসর পরে চৈত্র মাসের ৯ই তারিখ শুক্ল পক্ষে রামনবমীর দিনে রামদাস জন্মলাভ করেন। তাঁহার জন্ম শক ১৫৩০ (১৬০৮ খ্রীষ্টাব্দ)।

রামদাসের পিতামাতা এবং অন্যান্য সকলে নারায়ণকে রামভক্ত দেখিয়া তাঁহার নাম 'নারায়ণ' বদলাইয়া 'রামদাস' রাখিলেন। মহারাষ্ট্রীয়দের বিশ্বাস, তিনি মারুতি অর্থাৎ হনুমানের অবতার ছিলেন।

বাল্যকাল হইতেই তাঁহার আশ্চর্য্য প্রতিভার পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল। অল্পদিনের মধ্যেই তিনি



জাম্ব গ্রামের শ্রীরামজীর মন্দির

বর্ণমালা শিখিয়া ফেলেন এবং মাত্র এগার দিনের মধ্যে হিসাব রাখিবার কৌশল আয়ত্ত করেন। সেকালে পাঠশালায় মোটামুটি যেরূপ লেখাপড়া শিক্ষা দেওয়া হইত, সে সমুদয়ই তিনি শিখিয়া ফেলিয়াছিলেন। রামদাসের সমুদয় জীবনচরিত লেখকেরাই বলেন যে, বাল্যকাল হইতেই তিনি একা থাকিতে ভালবাসিতেন, এবং নির্জ্জন স্থানে বসিয়া ঈশ্বরচিন্তা করিতেন।

যেমন বয়স বাড়িতে লাগিল, তেমনি সংসারের প্রতি তাঁহার আসক্তি কমিয়া আসিল। রামদাসের বিবাহের নিমিত্ত তাঁহার পিতামাতা সমুদয় আয়োজন করিয়াছিলেন, কিন্তু তিনি বিবাহ করিবেন না—এই সঙ্কল্প করিয়া বাড়ি হইতে পলায়ন করিলেন। এ সময়ে রামদাসের বয়স ছিল মাত্র বার বৎসর। একবস্ত্রে বালক রামদাস জাম্ব গ্রাম হইতে পঞ্চবটী বা নাসিকে আসিলেন। সম্ভবতঃ এইখানে তাঁহার সহিত একদল তীর্থযাত্রী সন্ন্যাসীর সাক্ষাৎ হইয়াছিল। কিছুদিন তিনি নাসিকে থাকিয়া পরে সাতারার নিকট চাঁফল নামক স্থানে আসিয়া বাস করেন। তাঁহার অধিকাংশ সময় তীর্থ পর্য্যটনে কাটিয়া যাইত। আমরা তাঁহার ও তাঁহার শিষ্যদের রচিত 'অভঙ্গ' হইতে জানিতে পারি যে, তিনি কাশী, গোকুল, মথুরা, দ্বারকা, শ্রীনগর, বদ্রিনারায়ণ, কেদারেশ্বর, হিমালয় পর্ব্বত, জগন্নাথ, দক্ষিণভারত, রামেশ্বর, লঙ্কা, গোকর্ণ মহাবালেশ্বর, ত্রিম্বকেশ্বর ইত্যাদি নানা প্রসিদ্ধ তীর্থস্থান পর্য্যটন করেন।

চৌদ্দটি অভঙ্গে রচিত রামদাসের একটি কবিতা হইতে আমরা তাঁহার ভ্রমণ-বৃত্তান্ত সম্বন্ধে অনেক কথা জানিতে পারি। আনুমানিক ১৬৪৪ খ্রীষ্টাব্দে রামদাস মহারাষ্ট্র দেশে ফিরিয়া আসেন। তিনি আর জন্মভূমি জাম্ব গ্রামে গেলেন না, সাতারার নিকট চাঁফল নামক স্থানে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। এই স্থানটি শোভা ও সৌন্দর্য্যে পরম রমণীয়—বর্ষার সময় নদী কূলে কূলে জল পরিবেশন করিয়া বেগে ছুটিয়া চলে, আর পাহাড়গুলি তাহাদের শ্যামল শোভায় সজ্জিত হইয়া চোখের সম্মুখে এক স্বপ্নরাজ্য আনিয়া দেয়। এইরূপে সুন্দর প্রাকৃতিক শোভা-সম্পদপূর্ণ স্থানে তিনি বাস করিতে লাগিলেন।

১৬৪৮ খ্রীষ্টাব্দে রামদাস এখানে রাম ও মারুতির মন্দির প্রতিষ্ঠা করেন। গল্প আছে যে, রাম এবং পার্ব্বতীর মূর্তি দুইটি তিনি কৃষ্ণানদীর মধ্যে পাইয়াছিলেন। এ বিষয়ে সকলে একমত নহেন।

রামদাসের কার্য্য করিবার শক্তি ছিল অসাধারণ। তিনি প্রায় চল্লিশটি মঠ স্থাপন করিয়া

গিয়াছেন। তাঁহার শিক্ষা ও উপদেশ বেশ প্রণালীবদ্ধ ছিল। এই মহাপুরুষের জীবনীসম্বন্ধে সব কথা ভাল করিয়া জানা যায় না। সম্ভবতঃ তিনি এক গ্রাম হইতে অন্য গ্রামে, এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে যাতায়াত করিতেন এবং কীর্ত্তন করিয়া বেড়াইতেন বলিয়াই তাঁহার নাম-যশ এবং সঙ্গে সঙ্গে ধর্ম্মমত এত সুপ্রচারিত হইয়াছিল।

১৬৫৪ খ্রীষ্টাব্দে সাতারায় আসিয়া দশ বৎসর কাল আপনার মনে ধ্যান-ধারণা এবং অভঙ্গ রচনা করেন। তাঁহার রচিত গ্রন্থের মধ্যে 'দাসবোধ' স্ফুট অভঙ্গ, মনাচে শ্লোক ও সমাস আত্মারাম প্রসিদ্ধ।

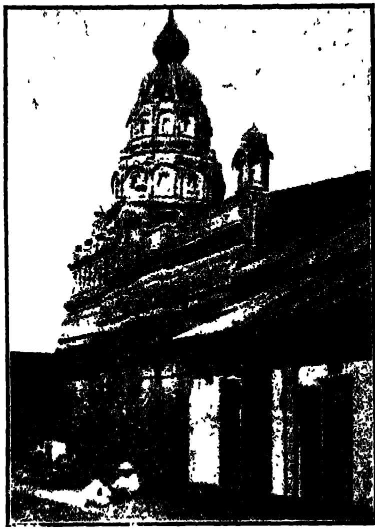
রামদাস যে কেবল অভঙ্গ রচনা করিয়াই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিলেন, তাহা নহে। চিঠিপত্র লিখিতেও তাঁহার অসাধারণ জ্ঞান ছিল। তিনি কখন কোথায় থাকিতেন, তাহার কোন স্থিরতা ছিল না বলিয়া শিষ্যগণ তাঁহার নিকট পত্র লিখিয়া উপদেশ গ্রহণ করিতেন। রামদাসও শিষ্যবর্গকে নানা বিষয়ে উপদেশ দিয়া পত্রোত্তর দিতেন। সে



পারলী দুর্গ

সকল পত্রের মধ্যে তাঁহার ভাষা, বিষয়জ্ঞান ও রাজনীতি সম্বন্ধে অসাধারণ দূরদৃষ্টি প্রকাশ পাইত।

সে সময়ে দেশের প্রধান ও অপ্রধান বহুব্যক্তি তাঁহার শিষ্য হইয়াছিলেন। ছত্রপতি



শ্রীরামজীর মন্দির—সজ্জনগড়

তাঁহার একজন শিষ্য ছিলেন। শিবাজী তাঁহার শেষজীবনে গুরু রামদাসের সহিত কি ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় ব্যাপার, কি রাজকীয় ব্যাপার—প্রত্যেক বিষয়েই তাঁহার গুরুর সহিত পরামর্শ করিয়া করিতেন। রামদাস সর্ব্বদা তীর্থ পর্য্যটন করিয়া বেড়াইতেন এবং কখন কোথায় থাকিতেন, তাহার কোনও স্থিরতা ছিল না বলিয়া সাতারা হইতে ছয় মাইল দূরে **পারলী** নামক পর্ব্বতোপরি যে একটি দুর্গ আছে, স্বামীর নিবাসের জন্য ঐ স্থান শিবাজী তাঁহাকে দান করেন। স্বামিজী এখানে স্থায়ী ভাবে বাস করিতে আরম্ভ করিলে পর নানা স্থান হইতে সাধু-সন্ন্যাসী তাঁহাকে দেখিবার জন্য আসিতেন। সজ্জনেরা আসিতেন বলিয়া এই স্থানের নাম **সজ্জনগড়** বলিয়া বিদিত হয়। স্বামিজীর ব্যয়-নির্ব্বাহার্থ শিবাজী মহারাজ নিকটবর্ত্তী কয়েকটি গ্রাম জাইগির স্বরূপ দান করেন। কোন্দোপন্ত নামক একজন কর্ম্মচারী স্বামিজীর হইয়া সমুদয় হিসাব-পত্র করিতেন ও প্রয়োজনীয়

ব্যয় ইত্যাদি নির্ব্বাহ করিতেন। আর স্বামিজী আপনার মনে কীর্ত্তন করিতেন, 'অভঙ্গ' রচনা করিতেন এবং গ্রামের লোক ও সাধু-সন্ন্যাসীদের সহিত ধর্ম্মপ্রসঙ্গে কাল অতিবাহিত করিতেন।

শিবাজী সময়ে সময়ে তাঁহাকে যে সব পত্র লিখিতেন, সেগুলির মধ্যে তাঁহার গুরুর প্রতি অসাধারণ ভক্তি ও শ্রদ্ধা প্রকাশ পাইত। সে সমুদয় চিঠির মধ্যে অনেক চিঠিই হারাইয়া গিয়াছে। সজ্জনগড়ে যে দুই-একখানা চিঠি পাওয়া গিয়াছে, এখানে তাহার একখানা চিঠির অনুবাদ দেওয়া হইল। ১৬৭৮ খ্রীঃ অঃ শিবাজী এই চিঠিখানা গুরু রামদাসকে লিখিয়াছিলেন।

শ্রীরঘুপতি শ্রী মারুতি শ্রীস্বামী,

গুরুদেব চরণে,

আমি শিবাজী আপনার চরণ-রেণু; আপনার নিকট নতমস্তকে একটী আবেদন জানাইতেছি। হে পরম পূজনীয় গুরুদেব! আপনি আমাকে পবিত্র মন্ত্রদানে দীক্ষিত করিয়াছেন এবং হিন্দুরাজ্য স্থাপন করিতে উপদেশ দিয়াছেন। ব্রাহ্মণ ও দেবতার পূজা করিতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন। প্রজাদিগের কল্যাণ করিতে এবং তাহাদের দুঃখ-দুর্দ্দশা দূর করিবার জন্যও আদেশ-বাণী আমার উপর অর্পিত হইয়াছে। আপনি আমাকে উচ্চ আদর্শে জীবন গঠিত করিয়া কার্য্য করিতে উপদেশ দিয়াছেন—আপনার আদেশ অনুযায়ী কার্য্য করিলে শ্রীরামচন্দ্র আমাকে প্রত্যেকটী কার্য্যে সফল করিবেন—ইহাই আপনার আদেশ। হে আমার আদর্শ মহাপুরুষ! আপনার এই সমুদয় আদেশ-বাণী শিরোধার্য্য করিয়াই আমি কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর হইয়াছি। আমি যখন আপনাকে আমার রাজ্য দান করিয়াছিলাম, তখন আপনি সেই দান অঙ্গীকার করিলেন বটে, কিন্তু আবার তাহা আমাকে প্রত্যর্পণ করিয়া বলিলেন যে, রাজ্যের উপর আমার প্রভুত্বের চিহ্নস্বরূপ তোমার সৈন্যদিগের 'ভগবা' অর্থাৎ গৈরিক পতাকা রাখ, এবং তুমি আমার প্রতিভূস্বরূপ রাজ্য পরিচালনা কর। আমি আপনার সেই আদেশ পালন করিতেছি।

আমার একটি অনুরোধ এই যে, আপনি আপনার বাসস্থানের নিকট শ্রীরামজীর মন্দির নির্ম্মাণ করিতে অনুমতি দিবেন। তাহা হইলে আমরা সর্ব্বদা সেখানে আসিতে পারিব এবং রামদাসী সম্প্রদায়ও বিস্তার লাভ করিবে।

হে পরম পূজনীয় গুরুদেব! আমার অপর অনুরোধ এই যে, শ্রীরামচন্দ্রের মন্দিরের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য আমি কিছু ভূ-সম্পত্তি উৎসর্গ করিতে চাই, সেই সম্পত্তির আয় হইতে মন্দিরের ব্যয় নির্ব্বাহ, অতিথি-অভ্যাগতের সেবা, ব্রাহ্মণের সেবা, উৎসব-ব্যয়, মন্দির ও অট্টালিকানির্ম্মাণ এবং অন্যান্য প্রয়োজনীয় ব্যয় ইত্যাদি নির্ব্বাহ হইবে।

* * *

তোমরা অনেক সময় মাড়োয়ারী সম্প্রদায়ের মধ্যে কিংবা উত্তর-পশ্চিম অঞ্চল এবং অন্যান্য স্থানের হিন্দু অধিবাসীদের মধ্যে, বিশেষতঃ মহারাষ্ট্রীয়দের মধ্যে 'রাম রাম' বলিয়া অভিবাদন করিতে দেখ। কথিত আছে যে, এই রীতিও নাকি রামদাসের আদেশে শিবাজী প্রবর্ত্তন করেন।

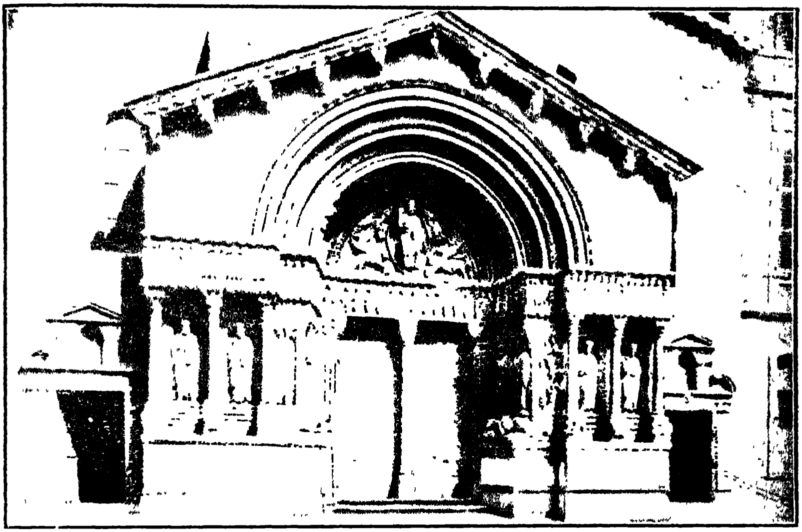


শ্রীরামদাস স্বামী

১৬৮১ খ্রীষ্টাব্দে ৭৩ বৎসর বয়সে রামদাস স্বামী সজ্জনগড় দুর্গেই সমাধিপ্রাপ্ত হন। এইখানে যে ছবিটি দেওয়া হইল—তাহা সজ্জনগড়ের মূর্ত্তির প্রতিচ্ছবি।

গুরু রামদাস স্বামীর সম্বন্ধে যে কত অলৌকিক গল্প ও কাহিনী প্রচলিত আছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখানে দুই একটি গল্প বলিলাম।

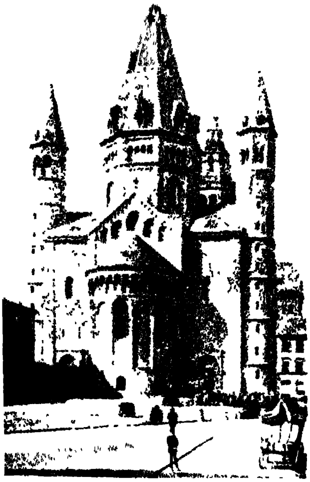
পৃথিবীর ছয়টি প্রসিদ্ধ গীর্জ্জা



সপ্তম শতাব্দীতে প্রতিষ্ঠিত সেণ্ট ট্রফিমাসের একটি প্রাচীন গীর্জ্জা



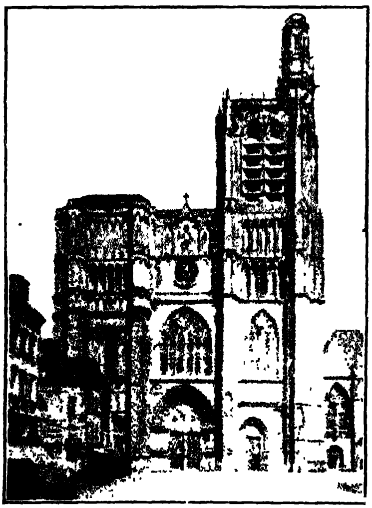
মর্ম্মর প্রস্তর নির্ম্মিত ইতালীয় একটি প্রাচীন [illegible] ইহা [illegible] নগর দক্ষিণ পূর্ব [illegible]
একটি পাহাড়ের উপর অ[illegible]ত—দ্বাদশ শতাব্দী



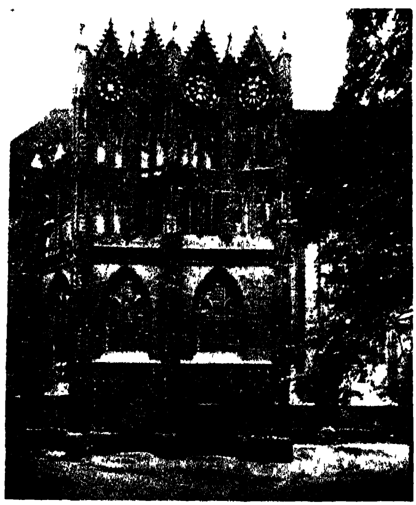
মায়েন্সের গির্জ্জা—ইহা দশম শতাব্দীতে
নির্ম্মিত হইয়াছিল



গেরনরোড (এ্যানহাল্ট্) জার্ম্মাণদিগের
একটি প্রাচীন গির্জ্জা—দশম শতাব্দী



সেন্‌স্-এর (ফ্রান্স) গির্জ্জা



ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি গথিক গির্জ্জা (জার্ম্মেণী)

রামদাস পশু, পক্ষী, জীবজন্তু প্রভৃতিকে বড় ভালবাসিতেন। একবার তিনি এক গভীর বনের মধ্য দিয়া চলিবার সময়, তাঁহার আদেশে একজন শিষ্য চীৎকার করিয়া কহিলেন—ব্যাঘ্রগণ। তোমরা বন ছাড়িয়া চলিয়া যাও, স্বামিজী এই বনের পথ দিয়া যাইবেন।

অমনি বাঘেরা বন ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

কখনও তিনি সিংহের পিঠে চড়িয়া বেড়াইতেন, কখনও বা বাঘের কান মলিয়া তাহাদিগকে শাসন করিতেন। জলের নীচে থাকা, মৃতের জীবন দান, রূপ পরিবর্ত্তন, এমন কত কি অলৌকিক কাজ যে করিতেন, তাহার ইয়ত্তা নাই।

একবার রামদাস তাঁহার শিষ্যদিগের সহিত সজ্জনগড়ে যাইতেছিলেন। তাঁহারা একটি গভীর বনের মধ্যে বিশ্রাম করিতে প্রবৃত্ত হইলেন। তিনি শিষ্যদিগকে নিকটবর্ত্তী সহরে যাইয়া ভিক্ষা করিবার জন্য আদেশ করিলেন। রামদাস উদ্ধব এবং কল্যাণ নামে দুইজন শিষ্যের সহিত আম বাগানে বসিলেন।

এদিকে শিষ্যেরা যেমন সহরে প্রবেশ করিয়াছে, অমনি সহর কোতোয়াল আসিয়া বলিল—তোমরা নগরে প্রবেশ করিয়া ভিক্ষা করিতে পারিবে না।

রামদাসীরা যতই বলেন যে, তাঁহারা স্বামী রামদাসের শিষ্য, কোতোয়ালের ততই জেদ বাড়িয়া যাইতে লাগিল। সে তাঁহাদিগকে নগর-তোরণ হইতে তাড়াইয়া দিল।

সহসা নগরের দিক হইতে ভীষণ কোলাহল শোনা গেল। একটা হনুমান মশাল জ্বালাইয়া নগরের বাড়ি বাড়ি আগুন ধরাইয়া দিয়াছে। আগুনের শিখা লকলক্ করিয়া আকাশ ছাইয়া ফেলিয়াছে। দেখিতে দেখিতে সারা সহরে আগুন ছড়াইয়া পড়িয়া দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতে লাগিল।

এই বিপদের সময় সহরের সব লোকেরা, এমন কি কোতোয়াল পর্য্যন্ত ছুটিয়া আসিয়া স্বামিজীর পদতলে লুটাইয়া পড়িল। কোতোয়াল রামদাসের পা দু'টি জড়াইয়া ধরিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করিতে লাগিল। রামদাস স্বামী তাহাকে ক্ষমা করিলেন। সহরের লোকেরা স্বামিজীকে প্রণাম করিয়া নগরে ফিরিবার সময় দেখিতে পাইল, যে হনুমান মশাল দিয়া সহরের প্রত্যেক বাড়িতে আগুন জ্বালাইয়া দিয়াছিল, সেই হনুমানই আবার একটি জলের কলসী হইতে জল ঢালিয়া ঢালিয়া প্রত্যেক বাড়ির আগুন নিবাইয়া দিয়াছে।—এমন আরও বহু অলৌকিক কাহিনীর উল্লেখ আছে।

কিংবদন্তী এইরূপ যে, মৃত্যুর কিছুদিন পূর্ব্বে তিনি শিবাজীর মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র শম্ভোজীকে এক পত্র লিখিয়াছিলেন। তাহাতে তিনি শম্ভোজীকে পিতার মত শাসন করিতে উপদেশ দেন। তাহাতে একটি কথা ছিল—"মহারাষ্ট্র ধর্ম্ম বাঢ বাবা।" মহারাষ্ট্রধর্ম্মের বৃদ্ধি কর—এই ছিল তাহার অর্থ। মহামতি রাণাডের মতে মহারাষ্ট্র-ধর্ম্মের অর্থ স্বদেশপ্রীতি। রামদাস একদিকে যেমন অসাধারণ তেজস্বী সাধু ও মহাপুরুষ ছিলেন, তেমনি মহারাষ্ট্রীয় ভাষা ও সাহিত্যের একজন শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন।

এখানে তাঁহার রচিত একটি অভঙ্গের কিয়দংশ উদ্ধৃত করিলাম—

একলাচি যে তাঁ একলাচি জাতাঁ।
মধেঁচি দুশ্চিন্তা মায়া-জাল।
মায়াজালীঁ! পাপীজন গুণ্ডাললে।
পুণ্যশীল গেলে সুটোনির্যাঁ।

সংসারে একা আসিয়াছি, আবার একাই চলিয়া যাইব। মাঝখানে কেবল দুশ্চিন্তার মায়াজালের বিড়ম্বনা। পাপী যাহারা, তাহারা মায়াজালে বদ্ধ হইল, আর যাঁহারা পুণ্যবান, তাঁহারা মায়ার জাল কাটিয়া মুক্ত হইয়া গেলেন।

রামদাসের বাণী

পৃথিবীর সব জিনিসই ক্ষণস্থায়ী। রাবণের মত কাহার সম্পত্তি! কিন্তু সেই রাবণ যাইবার সময় একাই চলিয়া গেল।

* * *

পরাক্রমশালী বানরের রাজা বালীও একাই চলিয়া গেলেন। কেহই অমর নয়, সব মিথ্যা।

পরের সেবা ও ধর্ম্ম প্রচারই হইতেছে মহৎ ধর্ম্ম

ইতর যাহারা—তাহারা মানুষকে কু-পরামর্শ দেয়। সৎ যাঁহারা, সাধু যাঁহারা—তাঁহারা মানুষকে ভাল পথে টানিয়া নেন।

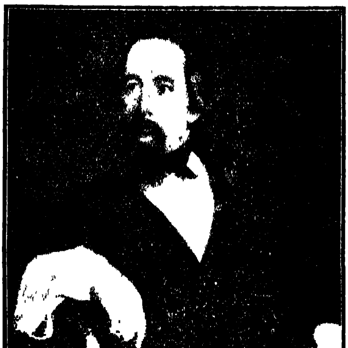
অতিথি ও দরিদ্রের সেবা পরম ধর্ম্ম।



অলিভার টুইষ্ট

২০৪৩ পৃষ্ঠার পর

[চার্লস ডিকেন্স ইংল্যাণ্ডের একজন বিখ্যাত ঔপন্যাসিক। ১৮১২ খ্রীষ্টাব্দে পোর্টসমাউথের (Portsmouth) কাছাকাছি একটি ছোট গ্রামের এক দরিদ্র-পরিবারে ডিকেন্স জন্মগ্রহণ করেন। ডিকেন্সের বয়স যখন দুই বৎসর তখন ১৮১৪ খ্রীষ্টাব্দে টেমস নদীর তীরে লণ্ডনের কাছাকাছি চ্যাথহ্যামে (Chatham) আসিয়া ডিকেন্স-পরিবার বাস করিতে থাকেন। সেখান হইতে ডিকেন্সের পিতা-মাতা লণ্ডনসহরে আসিয়া বাস করেন এবং এইখানে তাঁহার পিতা কোন কাজ-কর্ম্ম না করিয়া আলস্যে দিন অতিবাহিত করিবার দরুণ ঋণজালে জড়িত হইয়া দেনার দায়ে কারাগারে যাইতে বাধ্য হন। চার্লসের বয়স যখন দশ বৎসর তখন হইতেই পারিবারিক দুর্দ্দশার জন্য তাঁহার কাজ-কর্ম্ম করিতে হয়, নতুবা আর অন্য উপায় ছিল না। সপ্তাহে এক শিলিং মাত্র বেতনে একটা Blacking ware-house-এ কিছুদিন কাজ করিবার পর তাঁহাদের অবস্থার কিছু উন্নতি হইলে ডিকেন্স লেখাপড়া করিতে আরম্ভ করেন। বিদ্যাশিক্ষা করিবার পরে কিছুদিন তিনি একজন আইন ব্যবসায়ীর অধীনে কাজ করিয়াছিলেন। ছেলেবেলা হইতেই তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা ছিল যে, তিনি লেখক হইবেন। ভবিষ্যতে তাঁহার এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হইয়াছিল। সর্টহাণ্ড শিক্ষা করিয়া প্রথমে তিনি একখানি সংবাদ-পত্রের সংবাদ-দাতা হইয়াছিলেন ক্রমশঃ তিনি সাহিত্য-চর্চ্চায় মনোনিবেশ করেন এবং একে একে বহু গ্রন্থ রচনা করেন। ডিকেন্সের 'Pickwick Papers' একখানা উৎকৃষ্ট গ্রন্থ। তাহা ছাড়া তিনি 'David Copperfield', 'A Tale of Two Cities', 'Christmas Carol', 'Oliver Twist' প্রভৃতি অনেক গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন। ডিকেন্স তাঁহার রচিত 'David Copperfield' নামক গ্রন্থখানাকে সবচেয়ে ভাল বই বলিয়া মনে করিতেন। তিনি বলিতেন—"Like fond parents, I have my favorite child, and his name is David Copperfield!" —অনেক বাপমায়ের কাছে যেমন দুই-একটী ছেলেমেয়ে অত্যন্ত প্রিয় থাকে, তেমনি আমার মানস-সন্তানদের মধ্যে David Copperfield সবচেয়ে আমার প্রিয়।—'A Tale of Two Cities' বইখানা ফরাসী-বিপ্লবের কাহিনী লইয়া বিরচিত। তোমাদের 'Oliver Twist'এর গল্পটীর অনুবাদ দেওয়া হইল।



চার্লস্ ডিকেন্স

অলিভার টুইষ্ট

সব দেশের ছেলেমেয়েদের কাছেই এই গল্পটী অত্যন্ত প্রিয়। তোমাদের কাছেও এই গল্পটী বেশ ভাল লাগিবে বলিয়া সংক্ষেপে ইহার আখ্যান-ভাগ বলা হইল। ১৮৭০ খ্রীষ্টাব্দে রোচষ্টারের (Rochester) কাছাকাছি Gad's Hill নামক বাড়িতে ডিকেন্সের মৃত্যু হয়। ওয়েষ্ট মিনষ্টার এবির (West Minister Abbey) Poet's Corner নামক স্থানে তাঁহাকে সমাধিস্থ করা হইয়াছে।]

অলিভারের জন্মকাহিনী

অলিভার টুইষ্টের জন্ম হয় এক অনাথ-আশ্রমে। যে রাত্রে সে বেচারী জন্মায়, সেই রাত্রেই তাহার মা মারা যান। সুতরাং সেই অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তারা প্রথমটায় মহা মুস্কিলে পড়িলেন। কারণ তাহার বাবা বা মায়ের নাম না জানিলে তাঁহারা তাহার পদবী ঠিক করেন কি করিয়া? দশ পাউণ্ড পুরস্কার ঘোষণা করিয়াও যখন অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তারা ছেলেটীর মা-বাপের নামের কোনও সন্ধান পাইলেন না, তখন তাঁহারা নিজেরাই উহার নামকরণ করিলেন। ইংরেজী বর্ণমালার অক্ষর অনুসারে সেখানে ছেলেদের নামকরণ হইত। উহার আগের ছেলেটীর নামকরণ করা হইয়াছিল 'এস্' অক্ষর দিয়া। সুতরাং তাঁহারা অলিভারের পদবী দিলেন 'টি' দিয়া—টুইষ্ট।

মিসেস্ ম্যান্ নামে একটী স্ত্রীলোক বড় না হওয়া পর্য্যন্ত অনাথ-আশ্রমের ছোট ছোট শিশুদের লালন-পালন করিতেন। সুতরাং শিশু অলিভার টুইষ্টের লালন-পালনের ভার পড়িল সেই মিসেস ম্যানের উপরে। তাঁহার প্রাণে একটুও মায়া-মমতা ছিল না। অনাথ-আশ্রম হইতে মিসেস্ ম্যান্‌কে কিছু কিছু টাকাকড়ি দেওয়া হইত। কিন্তু মিসেস্ ম্যান্ ঐ সব ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খাওয়ার জন্য বরাদ্দ টাকা হইতে যথেষ্ট চুরি করিয়া নিজের পুঁজি বাড়াইতেন। তাহাতে ছেলে-মেয়েদের একরকম না খাইয়াই দিন কাটাইতে হইত। ইহা ছাড়া ছেলে-মেয়েদের উপর তাঁহার অত্যাচারের মাত্রাটাও বড় কম ছিল না। ছেলে-মেয়েরা একদিনের জন্যও তাঁহার মুখে কোনও স্নেহের কথা শোনে নাই, অথবা তাঁহার মুখে হাসি দেখে নাই। যাহা হউক, দীর্ঘ নয় বৎসর পরে অলিভার এই মিসেস্ ম্যানের অত্যাচারের হাত হইতে উদ্ধার পাইয়া অনাথ-আশ্রমে গিয়া আশ্রয় পাইল।

কিন্তু অলিভার টুইষ্ট সেখানে গিয়াও অবস্থা-গতিক বড় বিশেষ ভাল দেখে নাই। অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তারা ছেলেগুলিকে না খাইতে দিয়া মারিয়া ফেলিবার বেশ সুন্দর একটা উপায় বাহির করিয়া সেই কৌশল অনুসারে ছেলেদের খাওয়া-দাওয়া চালাইতেছিলেন। ছেলেরা মাত্র তিন বেলা তিন বাটি খুব গাঢ় সাগুর পায়েস ছাড়া আর কিছুই খাইতে পাইত না। আবার সেই সাগুতে দুধের চেয়ে জলের মাত্রাটাই থাকিত বেশি। ক্ষুধায় পেট জ্বলিয়া যাওয়া সত্ত্বেও এক বাটির বেশি আর এক ফোঁটা সাগুও কোন ছেলেকে দেওয়া হইত না। প্রায় মাস ছয়েক ধরিয়া এইরূপ অল্প খাইয়া খাইয়া বেচারীরা ক্ষুধার জ্বালায় এমনি অস্থির হইয়া উঠিল যে, রাত্রে তাহাদের ঘুম পর্য্যন্ত হইত না।

ক্ষুধার জ্বালা আর সহ্য করিতে না পারিয়া একদিন একটা বড়-সড় ছেলে অন্য সব ছেলেদের ডাকিয়া বলিল যে, অনাথ-আশ্রমের ঐ রকম খাওয়া-দাওয়ার একটা প্রতিবাদ করিতেই হইবে। সে যদি প্রতি বারে দুই বাটি করিয়া সাগু না পায়, তাহা হইলে রাত্রিবেলা সে তাহার পাশের বিছানার ছেলেটাকে নিশ্চয়ই খাইয়া ফেলিয়া তাহার ক্ষুধা দূর করিবে। ক্ষুধার জ্বালায় সেই ছেলেটার মুখ-চোখ এমনই ভীষণ দেখাইতেছিল যে, সব ছেলেরা তাহার প্রতিজ্ঞাটাকে সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিয়া লইল এবং সকলেই মত দিল যে, খাওয়া-দাওয়ার একটা প্রতিবাদ করা নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কে প্রতিবাদ করিবে? যাহা হউক তাহারা ঠিক করিল—লটারি করিয়া ঠিক করা হউক কে প্রতিবাদ করিবে। লটারিতে নাম উঠিল অলিভার টুইষ্টের।

সন্ধ্যাবেলা সকলকে খাবার দেওয়া হইয়া গেল। তখন অন্য সব ছেলেরা ইসারা করিয়া করিয়া অলিভারকে আবার খাবার চাহিবার জন্য পাঠাইয়া দিল। যে লোকটা খাবার দিয়াছিল অলিভার তো মরিয়া হইয়া তাহার কাছে গিয়া বাটি পাতিয়া বলিল, "আমাকে আর একটু দিন না!" ঐ

অতটুকু ছেলের সাহস দেখিয়া সেই লোকটার চোখ একেবারে কপালে উঠিবার জোগাড় হইল। সে যেন তাহার নিজের কানকে বিশ্বাস করিতে পারিতেছিল না। সেইজন্য একবার জিজ্ঞাসা করিল, "কি বলিস ?" অলিভার বলিল, "আমি আর একটু খাবার চাই।" লোকটা রাগে অগ্নিমূর্ত্তি হইয়া পরিবেশন করিবার হাতাটা দিয়া অলিভারের ঘাড়ে কষিয়া এক ঘা বসাইয়া দিল! তারপর দৌড়াইয়া গিয়া অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তাদের কাছে জানাইল—"অলিভারের এমনি স্পর্দ্ধা যে, তাহাকে যাহা খাইতে দেওয়া হয়, তাহাতে সে সন্তুষ্ট নহে—আবার আসে প্রতিবাদ করিতে!"

ইহাতে অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তারাও খুব আশ্চর্য্যান্বিত হইলেন এবং বলিলেন, "এত সাহস এটুকু ছেলের! তোমরা দেখিয়া লইও ও-ছেলে নিশ্চয়ই ফাঁসি কাঠে ঝুলিবে।" অনেক কথাবার্ত্তার পর তাঁহারা ঠিক করিলেন যে, অলিভারকে আর সেখানে রাখা যাইতে পারে না। কারণ ও সেখানে থাকিলে অন্য সব ছেলেরা উহার দৃষ্টান্তে খারাপ হইয়া যাইবে। সেইজন্য একটা পুরস্কার ঘোষণা করা হইল যে, যদি কেহ অলিভারকে গ্রহণ করে, তবে সে পাঁচ পাউণ্ড পুরস্কার পাইবে। একজন কবরখানার লোক তাহার ব্যবসায় শিখাইবার জন্য অলিভারকে লইয়া গেল। সে লোকটার নাম ছিল স্নোবেরি।

অলিভারের লণ্ডন-যাত্রা

অলিভার ভাবিয়াছিল যে, সে যখন অনাথ-আশ্রম হইতে রেহাই পাইল, তখন তাহার বরাত নিশ্চয়ই ফিরিবে। কিন্তু কোথায় কি? মিসেস্ স্নোবেরি অলিভারের প্রতি এমনই নির্দ্দয় ব্যবহার করিতেন যে, সে সেখানেও অতিষ্ঠ হইয়া উঠিল। সেইজন্য একদিন খুব ভোরে উঠিয়া সে স্নোবেরির বাড়ী হইতে পলাইয়া গেল। পথে বাহির হইয়া সে ঠিক করিল, সে লণ্ডনে যাইবে। কারণ সে শুনিয়াছিল, লণ্ডন না কি মস্ত বড় শহর। সুতরাং অত বড় শহরে গিয়া ভীড়ের মধ্যে মিশিয়া গেলে সেই অনাথ-আশ্রমের নিষ্ঠুর লোকেরা আর তাহাকে খুঁজিয়া পাইবে না, আর সেখানে গিয়া তাহার একটা-না-একটা গতি হইবে নিশ্চয়ই। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া একটা মাইল ষ্টোন দেখিয়া অলিভার বুঝিল যে, লণ্ডন সেখান হইতে সত্তর মাইল দূরে। তবু সে স্থির করিল যে, সে সত্তর মাইল হাঁটিতে গিয়া যদি তাহার মৃত্যু হয়, সেও ভাল, কিন্তু কিছুতেই সে আর অনাথ-আশ্রমের লোকগুলির নিষ্ঠুর কবলে ধরা দিবে না।

দিন সাতেক অনবরত হাঁটিয়া একদিন সকালে অলিভার টুইষ্ট খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে একটা ছোট শহরে উপস্থিত হইল। লণ্ডন তখনও কিছু দূরে। পথ চলিয়া চলিয়া তাহার পা কাটিয়া দর্‌দর্ করিয়া রক্ত পড়িয়াছিল—কন্‌কনে শীতে তাহার রক্ত প্রায় জমিয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছিল। তাহার উপর ক্ষুধার জ্বালায় সে একেবারে অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গে তাহার একটীও পয়সা ছিল না যে, সে কিছু কিনিয়া খাইবে। সেইজন্য পথে একবার ভিক্ষা করিবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু একটা লোক ভিক্ষা দিবে বলিয়া লোভ দেখাইয়া অলিভারকে অনেকক্ষণ ধরিয়া তাহার গাড়ীর পিছনে পিছনে দৌড়াইতে বাধ্য করাইয়া তারপর ফাঁকি দিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল। এই সব নানা কারণে সে এত ক্লান্ত হইয়াছিল যে, টলিতে টলিতে গিয়া একটা বাড়ীর দরজার সাম্‌নে হেলান দিয়া বসিয়া বসিয়া ঝিমাইতে লাগিল। হঠাৎ একজনের ডাকে সে চম্‌কাইয়া উঠিয়া চাহিয়া দেখিল যে, প্রায় তাহারই সমবয়সী একটী ছেলে তাহাকে ডাকিতেছে। অলিভার সে ছেলেটার অদ্ভুত বেশভূষা দেখিয়া একটু অবাক্ হইল। সে দেখিল—সেই ছেলেটার জামা-কাপড় বেশ ময়লা, আর এমন ঢিলা একটা কোট পরিয়াছে যে, উহা তাহার প্রায় গোড়ালি পর্য্যন্ত নামিয়াছে। যাহা হউক, সেই ছেলেটা অলিভারকে ডাকিয়া তুলিয়া বলিল—"তোমাকে দেখিয়া ক্ষুধার্ত্ত বোধ হইতেছে। তুমি কি খাবার খাইবে? তাহা হইলে আমার সঙ্গে আইস।" সেই ছেলেটার স্নেহের ডাকে ক্লান্ত অলিভার টুইষ্ট আনন্দে একেবারে গলিয়া গেল। ছেলেটা সত্যসত্যই অলিভারকে একটা ছোট হোটেলে লইয়া গিয়া বেশ পেট ভরিয়া খাওয়াইল। তাহার পরে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিল যে, অলিভার লণ্ডনে যাইবে। তখন জিজ্ঞাসা করিল, "সেখানে তোমার থাকিবার জায়গা আছে?" অলিভার উত্তর দিল, "না।" ছেলেটা আবার বলিল, "তোমার সঙ্গে তাহা হইলে টাকাকড়ি আছে তো?" অলিভার বলিল, "না, একটী পয়সাও আমার হাতে নাই।" এই কথা বলিয়া অলিভার টুইষ্ট একে

একে তাহার জীবনের সব কথা ছেলেটার কাছে প্রকাশ করিল। অলিভারের সব কথা শুনিয়া সে ছেলেটা বলিল, "তুমি আমার সঙ্গে যাইবে? আমিও আজ লণ্ডনে যাইতেছি। সেখানে আমি একজন খুব ভাল লোককে জানি। তুমি আমার সহিত গিয়া তাঁহার কাছে অতিথি হইতে পার। তিনি যে তোমার খাওয়া-পরার সব ভার লইবেন, এ আমি নিশ্চয় জানি। আর তাহার বিনিময়ে তোমাকে বিশেষ কিছুই করিতে হইবে না। এমনি ভাবে আরও কত ছেলে যে তাঁহার কাছে থাকে তাহার আর সংখ্যা নাই।" অলিভারের তখন যে অবস্থা, তাহাতে একটা আশ্রয় পাইলে সে বাঁচিয়া যায়। সেইজন্য অতি সরল মনে সে সেই ছেলেটার সব কথা বিশ্বাস করিয়া লইল এবং আশ্রয় পাইবার সম্ভাবনাতে তাহার মনে হইল যে, সে যেন হাতে স্বর্গ পাইয়াছে। লণ্ডনের পথে যাইতে যাইতে অলিভার জানিল যে, সেই অদ্ভুত পোশাক পরা ছেলেটার নাম জ্যাক ডকিন্স্—তবে সবাই তাহাকে চালাক ডজার বলিয়াই ডাকে। প্রায় সন্ধ্যার সময়ে অলিভার এবং ডজার লণ্ডনে একটা নোংরা বস্তির মধ্যে গিয়া হাজির হইল। একটা বাড়ীর সামনে গিয়া ডজার যেই শিস্ দিল, অমনি ভিতর হইতে কে একজন সাড়া দিল, তাহার পর দরজাটা খুলিয়া দিল। অলিভারকে সঙ্গে লইয়া ডজার একটা স্যাঁৎসেঁতে চুনবালি-খসা নোংরা অন্ধকার ঘরে গিয়া ঢুকিল। অলিভার দেখিল যে, ঘরের মেঝের উপরে পাশাপাশি কয়েকটা ছেঁড়া চটপাতা বিছানা রহিয়াছে, আর ঘরের একপাশে একটা টেবিলের চারিপাশে বসিয়া তাহারই মত চার-পাঁচটা ছেলে দিব্যি আরামে সিগারেট ফুঁকিতেছে। আর ঘরের অপর পাশে একজন বুড়ো খুব গম্ভীর ভাবে একবার করিয়া রান্নাবান্না দেখিতেছে, আর একবার করিয়া একরাশ সিল্কের রুমাল কাচা পরীক্ষা করিয়া দেখিতেছে। ঐ বুড়োই সেই বাড়ীখানার কর্ত্তা। ডজার উহার কথাই অলিভারকে বলিয়াছিল। বুড়োর নাম ফ্যাগিন্—সে ইহুদি।

ডজার বুড়োর কাছে গিয়া প্রথমে তাহাকে চুপিচুপি কি যেন কতকগুলা কথা বলিল, তাহার পরে অলিভারকে ডাকিয়া বুড়ো ফ্যাগিনের সহিত তাহার পরিচয় করাইয়া দিল। ফ্যাগিন্ খুবই আদর-অভ্যর্থনা করিয়া অলিভার টুইষ্টকে সেখানে থাকিতে বলিল।

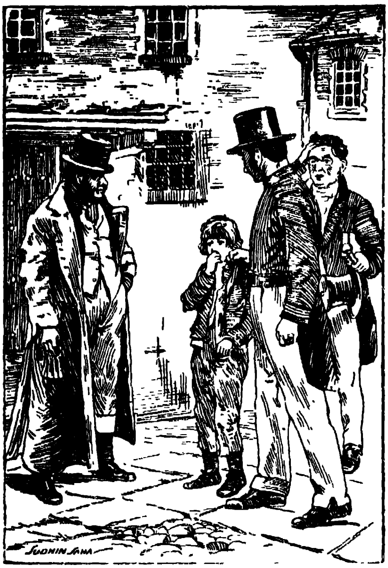
সেরাত্রে অলিভার পেট ভরিয়া খাইয়া আরামে সেই ছালাপাতা বিছানার উপরে ঘুমাইল। পরদিন সকালবেলাকার খাওয়াদাওয়া শেষ হইলে পর অলিভার দেখিল যে, বুড়ো ফ্যাগিন্ আর চার্লি বেট্স্ নামে একটা ছেলে সেই ঘরের মধ্যেই বেশ মজার একটা খেলা খেলিতে আরম্ভ করিল।

ফ্যাগিনের দল

ফ্যাগিন্ তাহার প্যাণ্টালুনের এক পকেটে একটা নস্যির ডিবা রাখিয়া, অপর পকেটে একটা ছোট নোট-বই রাখিল। তারপর তাহার কোটের পকেটে একটা চশমার খাপ ও একটা রুমাল রাখিয়া, তাহার ওয়েষ্ট কোটের এক পকেটে একটা ঘড়ি রাখিয়া, ঠিক যে ভাবে বুড়োরা রাস্তা চলে, সেই-ভাবে ঘরের এদিক-ওদিক পায়চারি করিতে লাগিল। ডজার আর বেট্সের কাজ হইল যে, এমনভাবে সেই সব জিনিষগুলি একে একে ফ্যাগিনের পকেট হইতে বাহির করিয়া আনিতে হইবে, যাহাতে সে কিছুই টের না পায়। উহারা সত্যসত্যই খুব কৌশলের সঙ্গে একটা একটা করিয়া সেই সব জিনিষ বুড়ো ফ্যাগিনের পকেট হইতে বাহির করিয়া আনিল। ফ্যাগিন্ সত্যই কিছু টের পাইল না। মজা দেখিয়া অলিভার এমনই হাসিতে লাগিল যে, তাহার পেটে একেবারে খিল ধরিবার যোগাড় হইল।

কিন্তু অল্পদিনের ভিতরেই অলিভার এইরকম খেলা করার অর্থটা বেশ পরিষ্কার করিয়াই বুঝিতে পারিল। সে বুঝিল যে, ঐ বুড়োটার চুরি করা ও পকেট-মারার ব্যবসায় আছে। বুড়োর নিজের বয়স হইয়াছে, কাজেই নিজে ও-সব হাত-সাফাইয়ের কাজ করিবার সাহস পায় না, সেইজন্য কতকগুলা ছেলেকে খাওয়া-পরা দিয়া হাতে রাখিয়াছে। আর রোজই একবার করিয়া চুরি করা ও পকেট মারার খেলা খেলিয়া উহাদের হাত পাকায়। ফ্যাগিন্ প্রায়ই ছেলেদের শিখাইত যে, কেমন করিয়া দুই আঙুলে করিয়া বুকপকেট হইতে ফস্ করিয়া রুমাল বা মনিব্যাগ তুলিয়া লইতে হয়—কেমন করিয়া পকেট হইতে ঘড়ি চুরি করিতে হয়—কেমন করিয়া পাশের পকেট বা প্যাণ্টালুনের পকেট হইতে জিনিষ-পত্র সরাইতে হয় ইত্যাদি।

একদিন ডজার ও বেট্‌স্‌ অলিভারকে লইয়া বেড়াইতে বাহির হইল। বেড়াইতে বেড়াইতে ডজার ও বেট্‌স্‌ একটা বইয়ের দোকানের সাম্‌নে একজন বুড়ো ভদ্রলোককে একমনে বসিয়া বই পড়িতে দেখিয়া হঠাৎ রাস্তায় দাঁড়াইয়া পড়িল। তারপর ডজার আর বেট্‌স্‌ সেই ভদ্রলোকটীর কাছে আগাইয়া গেল। ডজার সুযোগ বুঝিয়া তাহার হাতখানা ঐ ভদ্রলোকের পাশের পকেটে ঢুকাইয়া দিয়া একটা রুমাল বাহির করিয়া আনিয়াই বেট্‌সের হাতে উহা চালান করিয়া দিল। তাহার পরেই উহারা দুইজনে সেখান হইতে দিল দৌড়, আর গলির একটা মোড় ফিরিয়া একেবারে অদৃশ্য হইয়া গেল। ব্যাপার দেখিয়া অলিভারের তো চক্ষুস্থির! সে একটু ইতস্ততঃ করিয়া তাহার পরে দৌড় দিল। সেই বুড়ো ভদ্রলোকটী ঠিক সেই



রুমাল চুরির অভিযোগে অভিযুক্ত অলিভার টুইষ্ট

সময়েই তাঁহার রুমাল হাতড়াইয়া না পাইয়া এদিক ওদিক চাহিয়া অলিভারকে ঐরকম করিয়া দৌড়াইতে দেখিয়া মনে করিলেন, "ওই ত চোর ভাগিতেছে!" তিনি বই হাতেই "চোর চোর" করিয়া তাহার পিছনে পিছনে দৌড়াইতে লাগিলেন। যাহা হউক, অলিভারকে ধরিতে বিশেষ বেগ পাইতে হয় নাই। তাহাকে ধরিয়া থানায় হাজির করা হইল।

বিচারে অলিভারের শাস্তি ঠিক হইয়া গেল। কিন্তু অলিভারকে বিচারালয়ের বাহিরে লইয়া যাইবার পূর্ব্বেই বইয়ের দোকান-ওয়ালা আসিয়া বিচারককে বলিল যে, সে নিজের চোখে দেখিয়াছিল, অলিভার চুরি করে নাই। আর দুইজন ছেলে চুরি করিয়া ভাগিয়াছে। বিচারক তখন বইওয়ালাকে ধমক দিয়া বলিলেন—"তখন তখনই তুমি সত্যকার চোরেদের ধর নাই কেন? এতক্ষণ পরে তোমার হুঁস হইল? ইহার অর্থ কি?" বইওয়ালা উত্তর দিল—"তখন আমার দুই হাতেই অনেকগুলা বই ছিল, সেইজন্য আমি চোর ছেলেদুটাকে স্পষ্ট দেখিয়াও ধরিতে পারি নাই।" তাহার কথা শুনিয়া বিচারালয়ের সকলে হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিল। বিচারকও তাহার অদ্ভুত উত্তরে তাঁহার গাম্ভীর্য্য বজায় রাখিতে না পারিয়া হাসিয়া ফেলিলেন। এই সাক্ষীর ফলে অলিভার কিন্তু মুক্তি পাইল। বিচারালয়ের সকলে যখন বিচারের শেষে চলিয়া যাইবার উপক্রম করিতেছেন, তখন ভয়ে ও ক্লান্তিতে অলিভার হঠাৎ মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িল। যে বুড়ো ভদ্রলোকটীর পকেট হইতে রুমাল চুরি গিয়াছিল, তাঁহার নাম ব্রাউন্‌লো। অলিভারের অবস্থা দেখিয়া তাঁহার মন দয়ায় গলিয়া গেল। তিনি একখানা গাড়ী করিয়া উহাকে তাঁহার নিজের বাড়ীতে লইয়া গেলেন।

ব্রাউন্‌লোর আশ্রয়ে

ব্রাউন্‌লো লোকটী বড় দয়ালু ছিলেন। তিনি অলিভারকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিয়া সেবা-শুশ্রূষা ও চিকিৎসা করাইয়া ভাল করিয়া তুলিলেন। অলিভার ভাল হইয়া উঠিয়া ব্রাউন্‌লোকে বলিল, "আমি তো এখন ভাল হইয়া উঠিয়াছি। এখন আপনি তো আমাকে তাড়াইয়া দিবেন না?" এই অনুরোধটুকু করিয়া বেচারী অলিভারের মুখ-চোখ এমন করুণ হইয়া উঠিল যে, তাহা দেখিয়া ব্রাউন্‌লো খুব স্নেহের সঙ্গে তাহাকে বলিলেন,—"না, না, সে কি কখন হয়? আমি

যতদিন বাঁচিয়া আছি, ততদিন তোমার কোনও ভাবনা নাই। তুমি নিশ্চিন্ত হইয়া এইখানেই থাক।" ব্রাউন্‌লোর বাড়ীতে তাঁহার আপনার বলিতে কেহ ছিলেন না। তাহার উপর অলিভারের মিষ্টি স্বভাবে তিনি তাহাকে খুবই ভাল বসিয়া ফেলিয়াছিলেন। সেইজন্য অলিভারকে তাঁহার বাড়ীতে রাখিতে তিনি কিছুমাত্র কুণ্ঠিত হন নাই।

অলিভার টুইষ্ট বেশ সুখে স্বচ্ছন্দে ব্রাউন্‌লোর বাড়ীতে রহিল। কিন্তু তাহার অদৃষ্টে তখনও অনেক দুঃখ-কষ্ট সঞ্চিত ছিল। তাহার অত সুখ সহিবে কেন?

ব্রাউনলোর ঘরের দেওয়ালে একটী স্ত্রীলোকের ছবি টাঙ্গানো ছিল। সেই স্ত্রীলোকটীর চেহারার সঙ্গে অলিভারের চেহারার আশ্চর্য্য রকম সাদৃশ্য দেখিয়া মাঝে মাঝে তিনি অবাক্ হইয়া যাইতেন। সেইজন্য একদিন কৌতূহলী হইয়া তিনি অলিভারকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "তুমি তো এখন বেশ ভাল হইয়া উঠিয়াছ। এখন তোমার জীবনের সব কথা একদিন আমার কাছে বলিবে না?" অলিভার খুব আনন্দিত হইয়া বলিল, "নিশ্চয়ই বলিব।"

কিন্তু যেদিন ব্রাউন্‌লোর কাছে অলিভারের জীবনের সব ঘটনা প্রকাশ করিয়া বলিবার কথা, সেদিন একটা দুর্ঘটনা ঘটিল। ব্রাউন্‌লোর এক বন্ধু জানিতেন যে, অলিভার পূর্ব্বে চোর ও পকেট-মারার দলে ছিল। সেইজন্য তিনি তাঁহার বন্ধুকে বলিলেন, "বন্ধু, তুমি অলিভারকে অতটা বিশ্বাস করিও না। জান তো একটা কথা আছে—স্বভাব না যায় ম'লে।" ব্রাউন্‌লো তাহার বন্ধুর কথায় অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হইয়া বলিলেন, "আচ্ছা, তুমি অলিভারের সাধুতা ও সততার কি প্রমাণ চাও?" অনেক কথাবার্ত্তার পর ঠিক হইল যে, অলিভারকে একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট দিয়া বইয়ের দোকানে পাঠানো হউক। সে যদি ভাল হয়, তবে ঐ টাকা চুরি করিয়া পলাইবার লোভ সামলাইয়া আবার ফিরিয়া আসিবে নিশ্চয়। ব্রাউন্‌লো তখনই অলিভারের হাতে একখানা পাঁচ পাউণ্ডের নোট গুঁজিয়া দিয়া তাহাকে কয়েকখানা বই দিয়া বলিলেন, "অলিভার এই বই কয়খানা বইওয়ালাকে ফিরাইয়া দিও। আর আমার আছে বইওয়ালার চার পাউণ্ড দশ শিলিং পাওনা আছে। সেই টাকা কয়টা উহাকে দিয়া বাকী দশ শিলিং লইয়া শীঘ্র করিয়া বাড়ী ফিরিয়ো।" অলিভার টাকা ও বই লইয়া খুব উৎসাহের সঙ্গে বলিল, "এই কাজ? আমি মিনিট দশেকের মধ্যে বাড়ী ফিরিয়া আসিতেছি।"

ব্রাউন্‌লোর বাড়ীতে আসার পরে সে আর কোনও দিন বাড়ীর বাহির হয় নাই। সেই দিনই প্রথম রাস্তায় বাহির হইল।

ন্যান্সির কবলে

ওদিকে যেদিন হইতে অলিভার সেই বুড়ো ফ্যাগিনের হাতছাড়া হইয়া গিয়াছিল, সেইদিন হইতে বুড়োর আর ভাবনা-চিন্তার অন্ত ছিল না। সে কেবলই ভাবিত যে, অলিভার হয়ত কাহারও কাছে তাহার চুরি ও পকেটমারার ব্যবসায়ের কথা প্রকাশ করিয়া দিবে, আর তাহার ফলে একদিন তাহারা সকলে বিপদে পড়িবে। এই বিপদ্ হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য ফ্যাগিন্ ভাবিয়া ভাবিয়া একটা ফন্দী আঁটিয়াছিল। ফ্যাগিনের দলে ন্যান্সি বলিয়া একটী মেয়ে থাকিত, ফ্যাগিন্ সেই মেয়েটীর উপর অলিভারকে ফিরাইয়া আনিবার ভার দিয়া একটা মতলব বাৎলাইয়া দিল।

বুড়ো ফ্যাগিনের ষড়যন্ত্রের পরদিন হইতেই ন্যান্সি আর বিল্ সাইক্‌স্ নামে ফ্যাগিনের দলেরই একটা লোক রোজই সেই বইয়ের দোকানটার কাছাকাছি ঘোরাঘুরি করিত।

সেদিন যখন টাকা আর বই লইয়া অলিভার বইয়ের দোকানের কাছাকাছি গিয়াছে, অমনি, পিছন হইতে একজন স্ত্রীলোকের ডাক শুনিয়া সে ফিরিয়া দাঁড়াইল। মেয়েটী আর কেহ নহে—সে ন্যান্সি। ন্যান্সি বলিতেছিল, "ভাই, তুমি কতদিন বাড়ী ছাড়িয়াছ? আজ আমি তোমায় খুঁজিয়া পাইয়াছি। আর ছাড়িব না।" এই কথা বলিয়া সে দৌড়াইয়া আসিয়া অলিভারকে জড়াইয়া ধরিল। অলিভার বিরক্ত হইয়া তাহার হাত ছাড়াইয়া বলিল, "যাও, যাও। আমি তোমায় চিনি না।" ইহার মধ্যে বিল্ সাইক্‌স্ আসিয়া ন্যান্সিকে জিজ্ঞাসা করিল, "ব্যাপার কি?" ন্যান্সি বলিল, "এই ছেলেটী আমার ভাই। ও হারাইয়া গিয়াছিল। এতদিন পরে আমি উহাকে ফিরাইয়া পাইয়াছি। কিন্তু এখন ও বাড়ী ফিরিয়া যাইতে

চায় না।" বিল্ সাইক্স্ তাহার লাল লাল চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "বটে। পাজি ছেলে, বাড়ী যা বলিতেছি!" এই কথা বলিয়া দাঁতে দাঁত চাপিয়া অলিভারের হাত হইতে বই কয়খানা কাড়িয়া লইয়া উহা দ্বারা তাহার মাথায় সজোরে এক ঘা বসাইয়া দিল। তারপর বইগুলাকে ছিঁড়িয়া-খুঁড়িয়া রাস্তার একপাশে টান মারিয়া ফেলিয়া দিল। বিল্ সাইক্সের রুক্ষ চেহারা দেখিয়া অলিভার তো ভয়ে একেবারে কাঁদ কাঁদ হইয়া গিয়াছিল! তারপর যখন ঐভাবে মার খাইল, তখন সে চোখে অন্ধকার দেখিতে লাগিল। ঐরকম কৌশল করিয়া বেচারী অলিভারকে তাহারা প্রথমে হতভম্ব করিয়া দিল তারপর তাহাকে পাঁজাকোলা করিয়া ধরিয়া সেখান হইতে পালাইতে লাগিল। অলিভার অনেক কাঁদিয়া কাকুতি-মিনতি করিল—তাহাদের হাত হইতে উদ্ধার পাওয়ার জন্য বিস্তর চেষ্টা করিল, কিন্তু তাহাতে কোন ফল হয় নাই। তাহাদের মন পাষাণের মত কঠিন—ছোটছেলের কান্নায় কি উহা গলে?

ঘুরিয়া ফিরিয়া অলিভার আবার বুড়ো ফ্যাগিনের কবলে গিয়া পড়িল।

ব্রাউন্‌লোর চাকরবাকরেরা অনেকবার বইয়ের দোকান পর্য্যন্ত গিয়া এবং রাস্তার এদিক-ওদিক সন্ধান করিয়াও অলিভারের কোনও খোঁজ পাইল না। পাঁচমিনিট দশমিনিট করিয়া কত ঘণ্টাই কাটিয়া গেল। ব্রাউন্‌লো বিষণ্ণ মুখে তাঁহার বাহিরের ঘরে অলিভারের অপেক্ষায় বসিয়া রহিলেন। ক্রমে সন্ধ্যা হইল। রাস্তার আলোগুলা এক একটা করিয়া জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু অলিভার ফিরিয়া আসিল না!

অলিভারের চুরির দায়ে ধরা পড়া

কয়েকদিন পরেই বিল্ সাইক্স্ ও তাহার এক বন্ধু একটা বাড়ীতে চুরি করিতে যাইবে বলিয়া স্থির করিল। একদিন গভীর অন্ধকার রাত্রে তাহারা অলিভারকে সঙ্গে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল, আর তাহাকে শাসাইয়া দিয়া বলিল যে, সে যদি পথে কোনও গণ্ডগোল বাধায়, তবে তাহারা তাহার মাথা একেবারে গুঁড়াইয়া ফেলিবে।

অলিভারকে টানিয়া লইয়া তাহারা একখানা বাড়ীর সামনে গিয়া পৌছাইল। বাড়ীখানা একটু নির্জ্জনে—কাছাকাছি আর কোনও বাড়ী ছিল না। বিল্ সাইক্স্ ও তাহার বন্ধু অলিভারকে সঙ্গে লইয়া দেয়াল বাহিয়া বাহিয়া দোতলার একটা জানালার সামনে গেল। জানালাটার একটা গরাদ আর সার্সিগুলা ভাঙিয়া বিল্ ও তাহার বন্ধুটী অলিভারের হাতে একটী আলো ধরাইয়া দিল।



"...আর যদি দুষ্টামি করিস্ তো পিস্তলের গুলি মারিয়া তোর মাথার খুলি উড়াইয়া দিব!"

তারপর তাহাকে জানালা গলাইয়া ভিতরে ঢুকাইয়া দিয়া একটা পিস্তল উচাইয়া বলিল—"তুই আস্তে আস্তে গিয়া নীচের দরজার খিল খুলিয়া দে। তবে আমরা ঢুকিতে পারিব। আর

যদি দুষ্টামি করিস্ তো এই পিস্তলের গুলি মারিয়া তোর মাথার খুলি উড়াইয়া দিব!" বেচারী অলিভার তো তাহাদের কথা শুনিয়া বলির পাঁঠার মত কাঁপিতে কাঁপিতে ঘরের ভিতরে অগ্রসর হইতে লাগিল। কিন্তু বিল্ সাইক্‌স্ হঠাৎ সিঁড়ির কাছে একটা আলো নড়িতে দেখিয়া বুঝিল যে, তাহাদের সাড়া পাইয়া সেই বাড়ীর কোনও লোক সিঁড়ি দিয়া উঠিতেছে। সেই জন্য বিল্ বলিয়া উঠিল, "এই ফের্ ফের্!" অলিভার ইহাতে এমনই ঘাবড়াইয়া গেল যে, তাহার হাতের আলোটা মাটিতে পড়িয়া চুরমার হইয়া গেল। পরমুহূর্ত্তেই সেই বাড়ীর দুইজন লোক আলো লইয়া সিঁড়ি দিয়া উপরে উঠিয়া আসিল আর দুম্ করিয়া একটা গুলি করিল। গুলিটা অলিভারের হাতে লাগিল, সে ধপ্ করিয়া মাটিতে পড়িয়া গেল। বন্দুকের ধোঁয়াটা একটু পরিষ্কার হইতেই বিল্ সাইক্‌স্ জানালার আড়াল হইতে উঁকি মারিয়া দেখিল যে, অলিভার মেঝের উপরে লুটাইয়া পড়িয়াছে, আর লোক দুটা আরও লোকজন ডাকিবার জন্য নীচে নামিয়া যাইতেছে। সুযোগ বুঝিয়া বিল্ সাইক্‌স্ চট করিয়া ঘরে ঢুকিয়া অলিভারকে কাঁধে লইয়া বাহির হইয়া পড়িল। তাহার পর দেয়াল বাহিয়া নীচে নামিয়া পড়িল। অলিভারের হাত হইতে ভীষণ রক্ত পড়িতেছিল। সেইজন্য রুমাল দিয়া সেখানে খুব কসিয়া একটা বাঁধন দিয়া তাহারা অন্ধকারে গা ঢাকা দিয়া সেখান হইতে পালাইতে লাগিল। কিন্তু ততক্ষণে সেই বাড়ীর সমস্ত লোক তাহাদের পিছু পিছু তাড়া করিয়াছে। বিল্ সাইক্‌স্ ও তাহার বন্ধুটী দেখিল যে, অলিভারকে লইয়া ছুটিতে তাহাদের ভীষণ অসুবিধা হইতেছে। ঐ ভাবে চলিলে তাহাদের ধরা পড়িতে বিলম্ব হইবে না। সেইজন্য অলিভারকে একটা খানার মধ্যে ফেলিয়া দিয়া তবে তাহারা পালাইয়া বাঁচিল।

বেচারী অলিভার কিন্তু সারারাত অজ্ঞান হইয়া সেই খানার ভিতরেই পড়িয়া রহিল। পরদিন সকালে যখন তাহার জ্ঞান হইল, তখন সে দেখিল যে, তাহার হাতের গুলি লাগা জায়গাটায় অসহ্য বেদনা, আর সেই রুমালটা রক্তে ভিজিয়া একেবারে লাল হইয়া উঠিয়াছে। সে ভাবিল যে, সে যদি ঐ খানার মধ্যে আর কিছুক্ষণ থাকে, তাহা হইলে যন্ত্রণায় ও শীতে তাহার মৃত্যু হইবে। সুতরাং কোথাও গিয়া আশ্রয় লওয়া তাহার নিতান্ত প্রয়োজন। কিন্তু কোথায় আশ্রয় লইবে? যে বাড়ীতে তাহারা চুরি করিতে গিয়াছিল কাছাকাছির মধ্যে কেবল সেই বাড়ীটাই। বেশীদূর হাঁটিবার ক্ষমতা তাহার হইবে না বুঝিয়া সে সেই বাড়ীটার



"এই যে চোরটা আসিয়াছে!"

দিকেই টলিতে টলিতে রওনা হইল। বাড়ীটার সামনে গিয়া দরজায় ধাক্কা দিয়া অলিভার তখনই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িয়া গেল। বাড়ীর ভিতরের লোকেরা তখন চোরের গল্পেই মাতিয়া ছিলেন। তাঁহাদের গল্পে বাধা পড়াতে তাঁহারা একটু বিরক্ত হইয়া দরজা খুলিয়া যাহা দেখিলেন, তাহাতে সবাই

খুব অবাক হইয়া গিয়া বলিয়া উঠিলেন, "এই যে চোরটা আসিয়াছে।"

তাঁহারা মূর্চ্ছিত অলিভারকে তুলিয়া ঘরে লইয়া গেলেন। বাড়ীর সব মেয়ে-পুরুষে খবর পাইয়া তাড়াতাড়ি চোর দেখিতে আসিলেন। কিন্তু কোথায় তাঁহারা একটা লম্বা চওড়া রুক্ষ চেহারার লোক দেখিবেন, না অলিভার টুইষ্টের সেইরকম কচি ফুলের মত ফুটফুটে মুখখানি দেখিয়া তাঁহারা নির্ব্বাক হইয়া ছেলেটীকে দেখিতে লাগিলেন।

মুক্তির আনন্দ

যখন অলিভারের জ্ঞান ফিরিয়া আসিল, তখন অলিভারের মুখ-চোখ দেখিয়া সকলের ধারণা হইল যে, ছেলেটা নিশ্চয় নির্দ্দোষ—কোনও দুষ্ট লোকের পাল্লায় পড়িয়া ঐ রকম কাজ করিতে আসিয়াছিল। অলিভারের অবস্থা দেখিয়া



মেলি-পত্নীর নিকট ন্যান্সির ষড়যন্ত্র প্রকাশ

সকলের মন করুণায় ভরিয়া গেল। তাঁহারা উহাকে পুলিশে ধরাইয়া না দিয়া খুব যত্ন করিয়া ডাক্তার দেখাইয়া সেবা-শুশ্রূষা করাইতে লাগিলেন।

সেই বাড়ীখানির মালিক মিসেস্ মেলি ও তাঁহার এক ভাইঝির স্নেহ ও যত্ন পাইয়া অলিভার শীঘ্রই ভাল হইয়া উঠিল। একটু



বৃদ্ধ ফ্যাগিনের ভূমিকায় বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা স্যার হারবার্ট বীরবম ট্রি—ফ্যাগিনের ফাঁসির হুকুম হইবার পর যখন সে ফাঁসির জন্য জেলে অপেক্ষা করিতেছিল, তখনকার দৃশ্য

ভাল হইয়া অলিভার তাহার জীবনের সব ঘটনা তাঁহাদের কাছে বলিল। তাঁহারা তাহার সব কথাই বিশ্বাস করিলেন। অলিভার আবার একটা আশ্রয় পাইল।

কিন্তু ফ্যাগিন আর বিল্ কেমন করিয়া যেন খবর পাইল যে, অলিভার মিসেস্ মেলির বাড়ীতে আছে। এই খবর পাইয়া আবার তাহারা ষড়যন্ত্র করিতে লাগিল যে, কি করিয়া অলিভারকে চুরি করিয়া আনা যায়। সেবারে কিন্তু ন্যান্সি ইহাতে খুব প্রতিবাদ করিল। কারণ সে অলিভারকে বড় ভালবাসিত। ন্যান্সি কিন্তু আসলে বেশ ভাল মেয়েই ছিল। কিন্তু কেবল

ফ্যাগিন আর বিলের মারধোরের ভয়েতে অনেক সময় ন্যান্সিকে অনেক খারাপ কাজ করিতে হইত। প্রথমবারে অলিভারকে ধরিয়া আনিবার সময় সে অনেক প্রতিবাদ করিয়াছিল। কিন্তু তাহাতে কোনও ফল হয় নাই। এবারেও ন্যান্সির প্রতিবাদে যখন কোনও ফল হইল না, তখন সে লুকাইয়া লুকাইয়া মাঝে মাঝে মিসেস্ মেলি ও তাঁহার ভাইঝির কাছে গিয়া সব ষড়-যন্ত্রের কথা বলিয়া দিয়া আসিত।

অলিভার যাহাতে আর কোনও বিপদে না পড়ে, সেইজন্য ব্রাউন্‌লোকে খুঁজিয়া বাহির করা হইল। অলিভার ব্রাউন্‌লোর কাছে ফিরিয়া গেল। অলিভারের মুখে তাহার জীবনের সব ঘটনা শুনিয়া ব্রাউন্‌লো বুঝিলেন যে, অলিভার তাঁহারই এক বিশেষ বন্ধুর ছেলে। সেই বন্ধুটীই অলিভারের মায়ের একখানা ছবি ব্রাউন্‌লোকে দিয়া গিয়া-ছিলেন। সেই ছবিখানাই ব্রাউন্‌লোর ঘরে টাঙান ছিল, আর তাহারই সহিত অলিভারের মুখের সাদৃশ্য দেখিয়া তিনি খুব আশ্চর্য্য হইয়াছিলেন।

অলিভারের বাবার নাম ছিল লিফোর্ড। তিনি খুবই ধনী ছিলেন। কিন্তু তিনি এম্‌নি হঠাৎ মারা যান যে, মৃত্যুর সময়ে তিনি অলিভারের মায়ের কোনও খোঁজ পর্য্যন্ত লইতে পারেন নাই। তাহার উপর অলিভারের মা তখন বিদেশে ছিলেন। অনেক দিন স্বামীর কোনও খোঁজ খবর না পাইয়া অলিভারের মা একদিন লণ্ডনে তাঁহার স্বামীর কাছে যাইতেছিলেন, তখন পথেই অলি-ভারের জন্ম হয় এবং তিনি সেইখানেই মারা যান। এইজন্যই অলিভার অনাথ-আশ্রমে মানুষ হইয়াছিল।

ব্রাউন্‌লো অলিভারের বাবার বিষয়-সম্পত্তিরও খবর রাখিতেন। অলিভার বড় হইয়া যাহাতে সে-সব ফিরিয়া পায়, তিনি তাহার বন্দোবস্ত করিয়া ফেলিলেন। তারপর, তিনি তাঁহার বন্ধুর ছেলেকে খুব আদর-যত্ন করিয়া মানুষ করিতে লাগিলেন।

ওদিকে ন্যান্সি সমস্ত ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করিয়া দিয়াছে জানিয়া একদিন বিল্ এমনই রাগিয়া গেল যে, সে রাগের মাথায় ন্যান্সিকে খুন করিয়া ফেলিল। তারপর পালাইয়া গিয়া একটা পুরান বাড়ীতে লুকাইয়া রহিল। কিন্তু সেখানে পালাইয়া লুকাইয়া থাকিয়াও বিল্ রেহাই পায় নাই। তন্ন তন্ন করিয়া খুঁজিতে খুঁজিতে পুলিশের লোকেরা একদিন বিলের ঠিকানা বাহির করিয়া ফেলিল। তাহার পর সেই বাড়ীখানা ঘেরাও করিয়া তাহাকে ধরিয়া ফেলিবার উপক্রম করিল। বিল্ ভয়ে ছাদে উঠিয়া পড়িয়া দেখিল যে, বাড়ীর একপাশে একটা গভীর খানা আছে। উহা দেখিয়া সে দড়ি বাহিয়া উহার মধ্যে নামিয়া-পালাইবে বলিয়া স্থির করিল। কিন্তু দড়ি বাহিয়া নামিতে গিয়া তাহার গলায় ফাঁস লাগিয়া সে মরিয়া গেল।

বুড়ো ফ্যাগিনও রেহাই পায় নাই। পুলিশের লোকেরা তাহাকেও ধরিয়া ফেলিয়াছিল। অনেক লোকের সর্ব্বনাশ করিয়াছিল বলিয়া বিচারে তাহার ফাঁসির হুকুম হইল। সেও ফাঁসিকাঠে ঝুলিয়া মরিল।

এইবার অলিভারের আর কোনও বিপদ্ বা ভয়ের সম্ভাবনা রহিল না। ব্রাউন্‌লোর কাছে থাকিয়া লেখাপড়া শিখিয়া সুখে-স্বচ্ছন্দে তাহার দিন কাটিতে লাগিল।



মার্লো, সেক্সপিয়র ও বেন্ জনসন

২০২৪ পৃষ্ঠার পর

তোমরা সকলেই ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলিতে দেখিয়াছ। তাহাদের ছোট জীবনের ছোট ঘটনাগুলিই কি এই খেলার ভিতর ফুটিয়া উঠে না? তাহাদের আশেপাশে যাহা ঘটে, যে সমস্ত ঘটনা তাহাদের ছোট মনটীকে আলোড়িত করে, সেই সমস্তই তাহাদের খেলায় স্থান পায়। তাই তাহাদের পুতুলেরা মানুষের মতই চায়ের মজলিস্ করে, তাহাদের পুতুলদের আবার বিবাহও হয়। কখনও বা তাহারা পুলিশ হইয়া চোর ধরিতে যায়—তাহারা নিজেরাই হয় নট ও নটী। এই নাট্য প্রতিভা মানুষের এমন প্রকৃতিগত যে, ইহার জন্যই সমস্ত পৃথিবীকে একটী রঙ্গমঞ্চ মনে করা এবং সমস্ত মানুষকে অভিনেতা বা অভিনেত্রী রূপে কল্পনা করা হইয়াছে। কিন্তু মানুষের এই নাট্য প্রতিভার বিকাশ মোটেই আধুনিক নয়—প্রাগৈতিহাসিক যুগ হইতে মানুষের নাট্য প্রেরণা চলিয়া আসিতেছে এবং ছোট ছেলে-মেয়েদের খেলার মধ্যেও বিশেষ করিয়া সেই সত্য রূপ লইয়াছে।

আজ আমি তোমাদের ইংরাজী সাহিত্যের নাটক সম্বন্ধে কিছু বলিব। তোমরা সকলেই জান গীতিকাব্য ballad) কবিতার আদিরূপ এবং পুরাকালে চারণগণ তাহা একস্থান হইতে অন্যস্থানে গাহিয়া বেড়াইত। অলৌকিক লীলাবিষয়ক নাটক (Miracle play) ইংরাজী নাটকের আদিরূপ। ম্যাথু প্যারিস (Mathew Paris) নামক একজন লেখক বলেন যে, ডান্‌ষ্টেবল (Dunstable) নামক স্থানে 'St. Katherine' নামক অলৌকিক লীলা-বিষয়ক নাটক আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম অভিনীত হয়। এই বইখানি ল্যাটিন ভাষায় লিখিত হইয়াছিল। এই সমস্ত নাটক প্রধানতঃ যিশুখৃষ্ট ও অন্যান্য ঋষিদের জীবন-কাহিনী অবলম্বনেই লিখিত। এই সমস্ত নাটকের সহিত আমাদের যাত্রার অনেক সাদৃশ্য আছে। আমাদের যাত্রা যেমন রামায়ণ ও মহাভারতের ঘটনাবলী ও বহু পৌরাণিক কাহিনীর নাট্যরূপ ছাড়া আর কিছুই নয়, পৌরাণিক লীলাবিষয়ক নাটকেও (Miracle

play) তেমনি খৃষ্টান ঋষিদের জীবন-কাহিনী ও তাঁহাদের অলৌকিক কার্য্যাবলীর কথা ছাড়া আর কিছুই নাই এবং রহস্যাত্মক নাটকগুলি (mystery play) যিশুখৃষ্টের জীবন-কাহিনী অবলম্বনে লিখিত।

গোড়ায় পুরোহিতগণ এই সমস্ত নাটকে অভিনয় করিতেন এবং গির্জ্জা ও তৎ-সংলগ্ন স্থানই ছিল তাঁহাদের নাট্যশালা। কিন্তু কিছুদিন পরে অন্যান্য ব্যবসায়-কেন্দ্র হইতেও অভিনেতা বাছিয়া লওয়া হইতে লাগিল। তখন হইতে হাস্যরসাত্মক উপাদানও মিরাক্‌ল্ প্লে-তে (Miracle play) স্থান পাইতে লাগিল। একটা সাধারণ কাষ্ঠনির্ম্মিত দ্বিতল মঞ্চই ছিল সে যুগের রঙ্গমঞ্চ। ইহার নীচে চাকা থাকিত এবং ইহাকে যথেচ্ছা একস্থান হইতে স্থানান্তরে টানিয়া লওয়া হইত। ইহার দ্বিতলে ছিল যথার্থ রঙ্গমঞ্চ এবং একতলায় ছিল অভিনেতাদের সাজ-ঘর। নীচের তলার প্রবেশ দ্বারকে নরকের দ্বার বলিয়া মনে করা হইত এবং লাল রঙে রঞ্জিত দুইটি ড্রাগনের চোয়াল ইহার দুইপাশে রক্ষিত হইত। এই চোয়াল হইতে ধূম ও অগ্নিশিখা নির্গত হইত এবং ইহার মধ্য হইতে মাঝে মাঝে ভীষণ চীৎকার শোনা যাইত! লাল পোষাক পরিহিত শয়তানগণ ইহা হইতে বাহির হইয়া আসিয়া পুরোহিত ও মানুষ-দের পাপের পথে টানিয়া লইয়া যাইত। এই হইল ইংরাজী নাটকের আদিযুগ।

এইবার আমরা ইংরাজী নাটকের দ্বিতীয় যুগে আসিয়া উপস্থিত হইলাম। এই সময় যে নাটকের প্রচলন আরম্ভ হইল, তাহার নাম নৈতিক নাটক (Morality play)। এই সমস্ত নাটকের নায়ক-নায়িকা এবং অন্যান্য চরিত্র মর-জগতের সাধারণ মানুষ নয়—তাহারা পাপ ও পুণ্যের বিভিন্ন প্রতীক বা রূপ ছাড়া আর কিছুই নহে। ইহার মধ্যে পাপের চরিত্রই ছিল সবচেয়ে উপভোগ্য। পাপ আসিয়া শয়তানগণকে ভীষণ ভাবে প্রহার করিত এবং নিজে মূর্খের মত আচরণ করিত। ইহা দেখিয়া দর্শকগণ অত্যন্ত আমোদ উপভোগ করিতেন।

ষোড়শ শতাব্দীর প্রথমভাগে সর্ব্ব-প্রথম রাজসভায় অভিনয় করিবার উপযোগী নাটক (court play) অভিনীত হইতে লাগিল। অভিজাত-বংশের লোকেরা এইরূপ নাটককে সাদরে বরণ করিয়া লইলেন। ইহাদের মধ্যে উইলিয়াম কর্নিশ (William Cornish) ও জন্ হে উডের (John Hey Wood) নাম বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য। উৎসবাদির আনন্দ বর্দ্ধনের জন্য মাঝখানে একটী ছোট নাটকের অভিনয় করা সে যুগে খুবই জনপ্রিয় হইয়া উঠিয়াছিল।

ষোড়শ শতাব্দীর মধ্যভাগে 'রাল্‌ফ রয়ষ্টার ডয়ষ্টার' (Ralph Royster Doyster) নামক নাটক লিখিত হয়। প্রাচীন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের (classics) প্রভাব ইহার মধ্যে বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। ইহাকে একটী হাস্যরসাত্মক ঘটনা-বহুল ও মিলনান্ত নাটক বলা যাইতে পারে। 'গ্যামার গার্টনের নীড্‌ল্' নাটকটা (Gammar Gurton's Needle) 'রাল্‌ফ রয়ষ্টার ডয়ষ্টারে'র সমসাময়িক হইলেও ইহার মধ্যে প্রাচীন শ্রেষ্ঠ গ্রন্থসমূহের প্রভাব বড় একটা দৃষ্ট হয় না। সমাজের সকলের নীচে যাহাদের স্থান, সেই মজুর-দের জীবনযাত্রার কাহিনীই ছিল এই নাটকের বিষয়বস্তু, সুতরাং তাহাদের অমার্জ্জিত ভাষা ও স্থূল রসিকতাই ছিল ইহার বিশেষত্ব। এই গেল মিলনান্ত নাটকের কথা। ইংরেজী সাহিত্যের সর্ব্ব

প্রথম বিয়োগান্ত নাটক টমাস্ স্যাক্‌ভিল্ (Thomas Sackville) লিখিত 'গর্ব্বোডাক' (Gorboduc)। এই নাটকে সর্ব্বাগ্রে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু ছন্দ ও নাটক উভয়ই ছিল অত্যন্ত নিম্নশ্রেণীর এবং প্রাচীন গ্রন্থাদির প্রভাবও ইহার মধ্যে পূর্ণমাত্রায় বিদ্যমান ছিল।

১৫৬৪ খৃষ্টাব্দে ইংলণ্ডে এমন দুইজন মনীষী জন্মগ্রহণ করেন, যাঁহাদের প্রতিভা ইংরেজী নাটকে যুগান্তর আনয়ন করিতে সমর্থ হইয়াছিল। এক নিমেষে ইংরেজী নাটকের দীনাহীনা মূর্ত্তি কোথায় অন্তর্হিত হইল, তাহার রাজ-রাজেশ্বরী মূর্ত্তি দর্শনে সকলে বিস্মিত ও চকিত হইয়া উঠিল—ইংরেজী নাটক সহসা উন্নতির সর্ব্বোচ্চ শিখরে উপনীত হইল।

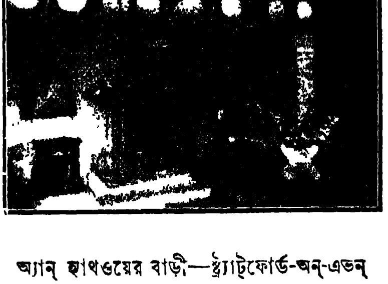
একই বৎসরে ক্রিষ্টোফার মার্লো (Christopher Marlowe) এবং উইলিয়াম সেক্সপিয়রের (William Shakespeare) জন্ম হয়। ক্যাণ্টারবারির (Canterbury) এক চর্ম্মকারের গৃহে মার্লো জন্মগ্রহণ করেন এবং ক্যেম্ব্রিজে (Cambridge) লেখাপড়া শিখেন। লেখাপড়া শেষ হইলে তিনি লেখক ও অভিনেতা হিসাবে জনসমাজে সমাদৃত হন। 'ট্যাম্বারলেন্' (Tamberlaine), 'ডক্টর ফষ্টিন্' (Dr. Faustin), 'মাল্টার ইহুদি' (The Jew of Malta) এবং 'দ্বিতীয় এডওয়ার্ড' (Edward II)—এই চারিটি তাঁহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক। নাটকে কেমন সুন্দর ভাবে অমিত্রাক্ষর ছন্দ ব্যবহার করা যাইতে পারে, মার্লোই সেক্সপিয়রকে তাহা দেখাইয়া যান। সেক্সপিয়রের মত প্রতিভাশালী লেখকের হাতে পড়িয়াই যে ইংরেজী নাটক এত উৎকর্ষ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছে, এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। কিন্তু তাই বলিয়া ইহা ভুলিলে চলিবে না যে, ইহার রূপ ও আকৃতি দিয়াছেন মার্লো। ২৯ বৎসর বয়সে মার্লো একটী সরাইখানায় আততায়ীর ছুরিকাঘাতে নিহত হন। এইরূপে ইংরেজী নাটকের প্রথম উজ্জ্বল জ্যোতিষ্কটী অকালে কালগ্রাসে পতিত হন।

ইংরেজী সাহিত্যের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নাট্যকার সেক্সপিয়র ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন্-এভনে (Strat-



সেক্সপিয়রের জন্ম-গৃহ—ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড অন্-এভন্

ford-on-Avon) জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা জন্ সেক্সপিয়র (John Shakespeare) একজন ব্যবসায়ী ছিলেন। সেক্সপীয়র স্থানীয় পাঠশালায় (Grammar



অ্যান্ হ্যাথওয়ের বাড়ী—ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন্-এভন্

School) লেখাপড়া শিখিতে আরম্ভ করেন; কিন্তু তাঁহার পিতার অবস্থা এত খারাপ হইয়া পড়ে যে, চৌদ্দ বৎসর বয়সে তাঁহাকে

লেখাপড়া ছাড়িয়া দিয়া পিতাকে সাহায্য করিবার জন্য কাজে ঢুকিতে হয়।

আঠার বৎসর বয়সে সেক্সপিয়র অ্যান্ হ্যাথ্ওয়েকে (Ann Hathway) বিবাহ করেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার চেয়ে আট বৎসরের বড় ছিলেন। বিবাহের পর বৎসর তাঁর জ্যেষ্ঠা কন্যা সুজোনার (Susona) জন্ম হয়! তিন বৎসর পর তাঁহাদের হ্যামনেট্ (Hamnet) ও জুডিথ্ (Judith) নামে দুইটী যমজ সন্তান জন্মগ্রহণ করে। ইহার পর সাত বৎসব সেক্সপিয়র কি ভাবে কাটাইয়াছিলেন, সে বিষয় পবিষ্কাব ভাবে কিছুই জানা যায় নাই। কিংবদন্তী আছে



সেক্সপিয়রের বাস গৃহ—ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন্‌-এভন্

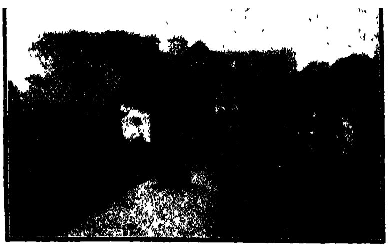
যে, তিনি স্যার্ টমাস্ লুসির (Sir Thomas Lucy) বাগান হইতে একটী হরিণ চুরি করেন এবং জেলে যাওয়ার ভয়ে লণ্ডনে পলাইয়া যান। কিন্তু এই গল্প কোন মতেই বিশ্বাস করা যায় না। খুব সম্ভবতঃ সেক্সপিয়র তাঁহার ক্রমবর্দ্ধমান পরিবারের অন্নবস্ত্র সংস্থানের চেষ্টায় লণ্ডন সহরে চলিয়া গিয়াছিলেন।

১৫৯২ খৃষ্টাব্দে আবার আমরা সেক্সপিয়রের কথা শুনিতে পাই। রবার্ট গ্রীন্ (Robert Greene) এই সময়ে একজন ভুঁইফোঁড় লেখকের (upstart crow) উল্লেখ করেন। এই ভুঁইফোঁড় লেখকটীই যে সেক্সপিয়র—এ কথা বিশ্বাস করিবার অনেক কারণ আছে। তাঁহার এইরূপ



পবিত্র ট্রিনিটি গীর্জ্জা—ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন্‌-এভন্

সমালোচনা হইতে ইহাই প্রতীয়মান হয় যে, সেক্সপিয়র তখন নাট্যকার হিসাবে দিন দিন জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছিলেন। ১৫৯৩ খৃষ্টাব্দে 'ভেনাস ও অ্যাডোনিস্' (Venus and Adonis) নামে তাঁহার একটী কবিতার বই প্রকাশিত হয়। বইখানি তিনি আর্ল অফ্ সাদামটনের (Earl of Southampton) নামে উৎসর্গ করিয়াছিলেন। আর্ল ইহাতে সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে ১,০০০ হাজার পাউণ্ড দান করেন। বোধ হয় এই অর্থ সাহায্য পাইয়াই



সেক্সপিয়রের বাসগৃহ ও বাগান—
ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন্‌-এভন্

তিনি ১৫৯৭ খৃষ্টাব্দে ষ্ট্রাট্‌ফোর্ডের সবচেয়ে সুন্দর স্থান 'নিউ প্লেস' (New Place)

ক্রয় করেন। এই সময় হইতে ১৬১৬ খৃষ্টাব্দ অবধি সেক্সপিয়র খুব সম্ভবতঃ লণ্ডনেই বাস করিয়াছিলেন। মাঝে মাঝে ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডে যাইয়া স্ত্রীপুত্র-কন্যাদের সঙ্গে থাকিয়া আসিয়াছেন। কিন্তু মৃত্যুকালে তিনি ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডেই বাস করিয়াছিলেন। ১৬১৮ খৃষ্টাব্দে ৬২ বৎসর বয়সে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইংরেজ কবি ও নাট্যকার সেক্সপিয়র পরলোক গমন করেন এবং ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ডের গির্জ্জায় তাঁহাকে সমাহিত করা হয়। তাঁহার সমাধির গায়ে খোদিত আছে--

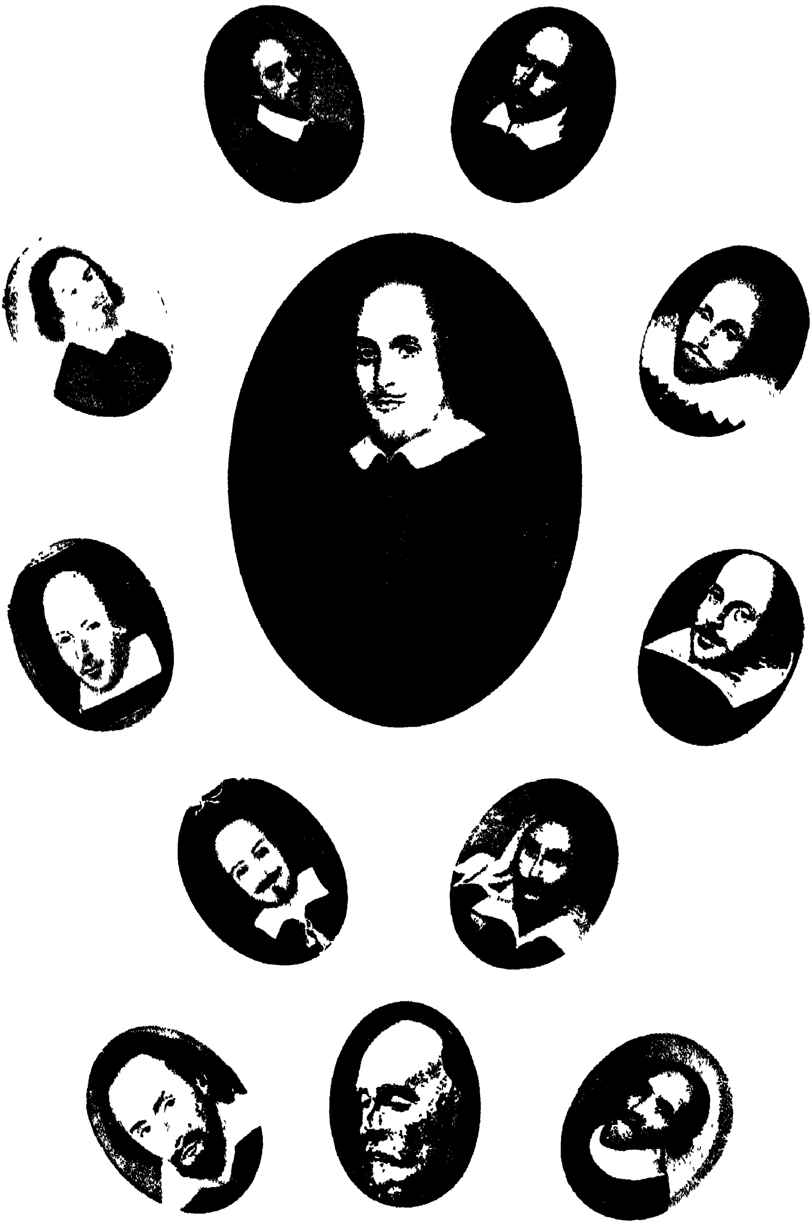
Good frend for Iesys sake forbeare
To digg the dyst encloased here.
Blese be ye man yt spares thes stones
And cvrst be he yt moves my bones.

সেক্সপিয়র-নাট্যরচনার কালকে চারিটী ভাগে ভাগ করা যায়। প্রথম যুগের নাটকে প্রেম ও কল্পনার প্রাচুর্য্য বিশেষ ভাবে পরিলক্ষিত হয়। 'কমেডি অব এরারস্' (Comedy of errors), 'মিড্‌ সামার নাইটস্ ড্রীম্' (Mid-Summer night's dream), 'রোমিও অ্যাণ্ড জুলিয়েট্' (Romeo and Juliet), 'দ্বিতীয় রিচার্ড' (Richard II), 'তৃতীয় রিচার্ড' (Richard III) প্রভৃতি এই যুগের রচনা।



ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন্-এভনের গীর্জ্জা ও নদীর দৃশ্য

দ্বিতীয় যুগের নাটকগুলি রসসৃষ্টির দিক্ হইতে যথেষ্ট উন্নত হইয়াছে। তিনি শুধু ভাষার কারুকার্য্য, প্রেম ও কল্পনার উচ্ছ্বাস করিয়া ক্ষান্ত হন নাই—তিনি এবার বাস্তব জগতে অনেক দূর নামিয়া আসিয়াছেন। মনোবৃত্তি বিশ্লেষণের সূক্ষ্ম-দৃষ্টি তাঁহার এ যুগের নাটকগুলিকে সমৃদ্ধ করিয়াছে। 'অ্যাজ্‌ ইউ লাইক্ ইট্' (As you like it), 'মার্চেণ্ট অব্‌ ভেনিস্' (Merchant of Venico), 'চতুর্থ হেনরী'



বিভিন্ন শিল্পীর অঙ্কিত সেক্সপিয়রের প্রতিকৃতি

(Heney IV), 'পঞ্চম হেন্‌রী' (Henry V) প্রভৃতি এই যুগের রচনা।

তৃতীয় যুগে তাঁহার শ্রেষ্ঠ বিয়োগান্ত নাটক 'ওথেলো' (Othello), 'ম্যাক্‌বেথ্' (Macbeth), 'কিং লিয়ার' (King Lear), 'হ্যাম্‌লেট্' (Hamlet) প্রভৃতি রচিত হয়।



গ্লোব থিয়েটার—লণ্ডন

এই সময় তিনি নিজের জীবনে যেমন দুঃখ পাইয়াছেন, তাঁহার নাটকেও তেমনই তাহার ছাপ পড়িয়াছে।

চতুর্থ যুগের নাটকে দেখিতে পাই তাঁহার পরিপক্ক বুদ্ধি, গাম্ভীর্য্য এবং চিন্তাশীলতার অভিব্যক্তি। প্রথম যুগের উচ্ছ্বাস বা পরবর্ত্তী যুগের বিষাদের গভীরতা এ যুগের নাটকে দৃষ্ট হয় না সত্য কিন্তু ভাবের গভীরতায়, সমবেদনায় এবং কমনীয়তায় এ যুগের নাটক সকলের মন করে। 'সিম্বেলিন্' (Cymbeline), 'উইন্টার্‌স্ টেল' (Winter's Tale), 'টেম্পেষ্ট' (Tempest) প্রভৃতি নাটক এই যুগেই রচিত হইয়াছিল। লণ্ডনের গ্লোব থিয়েটারে সেক্সপিয়রের বহু নাটক অভিনীত হইত। এই রঙ্গালয়ে সেক্সপিয়রের 'অষ্টম হেন্‌রী' (Henry VIII) নামক নাটক অভিনীত হইবার সময় ইহা অগ্নি লাগিয়া ভস্মীভূত হয়। এখানে যে ছবি দেওয়া হইল, তাহা ১৬১২ খ্রীষ্টাব্দের একখানি প্রাচীন তৈল-চিত্র হইতে গৃহীত।

এইবার আমি তোমাদের সেক্সপিয়রের 'মার্চ্চেণ্ট অব ভেনিস' (Merchant of Venice) নাটকের গল্পটী বলিব। এই গল্প তোমাদের বেশ ভাল লাগিবে।

ভেনিস্ নগরীর সওদাগর

সেকালে ইটালীর ভেনিস্ সহরে সাইলক্ (Shylock) নামে এক ধনী য়িহুদী বণিক বাস করিত। তাহার মত অর্থগৃধ্নু, নিষ্ঠুর প্রকৃতির লোক খুব কমই দেখা যায়—দয়া, মায়া, স্নেহ, প্রীতি প্রভৃতি সদ্‌গুণের সঙ্গে তাহার কোন সম্বন্ধ ছিল না। সে খুব বেশি সুদে টাকা ধার দিত এবং কখনও এক পয়সা সুদ ছাড়িত না। সকলেই তাহাকে ঘৃণা করিত, বিশেষতঃ অ্যাণ্টোনিও (Antonio) নামক একজন ধনী খৃষ্টান বণিকের সহিত তাহার ভীষণ শত্রুতা ছিল। অ্যাণ্টোনিওর স্বভাব ছিল তাহার ঠিক বিপরীত। তাঁহার মত সহৃদয়, দয়ালু লোক ভেনিসে কেন, সমস্ত পৃথিবী খুঁজিলেও পাওয়া যাইত না। মানুষের বিপদ দেখিলেই তিনি সাহায্য করিবার জন্য ছুটিয়া যাইতেন—তিনিও টাকা ধার দিতেন কিন্তু কাহারও নিকট হইতে সুদ লইতেন না, এইজন্য সাইলক্ তাঁহাকে মনে মনে ঘৃণা করিত কিন্তু মুখে কিছু বলিত না। ভেনিসের সকলেই

অ্যাণ্টোনিওকে খুব ভালবাসিত। কিন্তু ব্যাসানিও (Bassanio) নামক একজন সম্ভ্রান্ত বংশের তরুণ যুবকের সহিত তাঁহার সবচেয়ে বেশি বন্ধুত্ব ছিল। ব্যাসানিওর আভিজাত্য গৌরব থাকিলেও অর্থের গৌরব ছিল না। যে সামান্য অর্থ তিনি



সাইলকের ভূমিকায় বিশ্ববিখ্যাত অভিনেতা স্যার হ্যানরি আর্ভিং

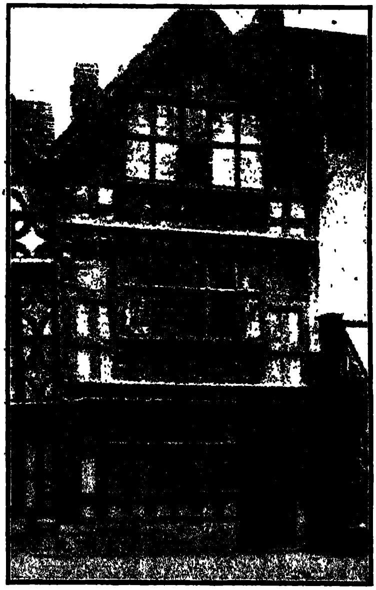
উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন, তাহার বেশির ভাগই তিনি আমোদ-প্রমোদে ব্যয় করিয়া ফেলিয়াছিলেন এবং প্রয়োজন হইলেই অ্যাণ্টোনিওর নিকট হইতে টাকা ধার করিতেন। তাঁহাদের মত অভিন্নহৃদয় বন্ধু একরকম দেখা যায় না বলিলেই চলে।

একদিন ব্যাসানিও অ্যাণ্টোনিওর নিকট তিন হাজার ডাকাট্ (ইটালী দেশীয় মুদ্রা) ধার চাহিলেন।

ভেনিসের নিকট বেলমণ্ট সহর—সেখানে পোরসিয়া (Portia) নামে একজন অতি রূপবতী ও গুণবতী ধনী-কন্যাকে তিনি বিবাহ করিতে চান। পোরসিয়া ধনী পিতার একমাত্র উত্তরাধিকারিণী এবং সম্প্রতি পিতার মৃত্যুতে সমস্ত সম্পত্তির অধিকারিণী। এমন পোরসিয়ার পাণি-প্রার্থী হইয়া যাইতে হইলে তদুপযুক্ত উপকরণের প্রয়োজন, সুতরাং ব্যাসানিওর টাকা না হইলে চলিবে কেন? কিন্তু অ্যাণ্টোনিওর হাতেও টাকা নাই। তখন দুই বন্ধু মিলিয়া সাইলকের নিকট গেলেন। সাইলক দেখিল এই তাহার উত্তম সুযোগ, তাই অ্যাণ্টোনিওর উপর প্রতিশোধ লইবার এমন সুযোগ সে কিছুতেই ছাড়িল না। সে তিন হাজার ডাকাট্ বিনা সুদে ধার দিল, কিন্তু তিন মাসের মধ্যে যদি অ্যাণ্টোনিও টাকা শোধ করিতে না পারেন, তবে তাঁহার শরীরের যেখান হইতে খুশী সেখান হইতে সাইলক এক পাউণ্ড (প্রায় অর্দ্ধ সের) মাংস কাটিয়া লইবে। ব্যাসানিও এইরূপ সর্ত্তে রাজি হইতে যথেষ্ট আপত্তি করিলেও অ্যাণ্টোনিও ঐ সর্ত্তে টাকা ধার করিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, তাঁহার জাহাজগুলি তিন মাসের মধ্যে বহু অর্থ লইয়া বিদেশ হইতে ফিরিয়া আসিবে এবং সামান্য তিন হাজার ডাকাট্ শোধ করিতে তাঁহার মোটেই বেগ পাইতে হইবে না।

এ দিকে ব্যাসানিওই শেষ পর্য্যন্ত পোরসিয়ার স্বামীরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন এবং তাঁহাদের বিবাহের কথা স্থির হইয়া গেল। পোরসিয়া ও ব্যাসানিওর আনন্দের সীমা নাই। ব্যাসানিও যে মোটেই ধনী

নহেন, সে কথা তিনি পোরসিয়াকে খুলিয়া বলিয়াছিলেন। সত্য কথা বলার জন্য পোরসিয়া খুশীই হইয়াছেন। পোরসিয়ার যাহা কিছু আছে সবই তো ব্যাসানিওর—তাঁহার ঘর বাড়ী, দাস-দাসী, বিষয়-সম্পত্তি, এমন কি তিনি নিজে পর্য্যন্ত ব্যাসানিওর—অর্থের অভাব কি? ব্যাসানিওর বন্ধু ও সহকারী গ্রাসিয়ানোও (Gratiano) তাঁহার সঙ্গে বেলমণ্ট গিয়াছিলেন এবং পোরসিয়ার



হারবার্ট গৃহ—ষ্ট্র্যাট্‌ফোর্ড-অন্-এভন্

সাহায্যকারিণী ও সখী নেরিসার (Nerissa) সঙ্গে তাহার বিবাহ ঠিক হইয়া গেল। ব্যাসানিও এবং পোরসিয়া সানন্দে তাহাদের বিবাহে অনুমতি দিলেন। তাঁহারা যখন নিজেদের আনন্দে বিভোর, তখন ব্যাসানিওর কাছে একটী চিঠি আসিল। চিঠি পড়িয়া তাঁহার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল। নিকটতম আত্মীয়দের মৃত্যু-সংবাদ শুনিলে মানুষের যে অবস্থা হয়, এই চিঠি পড়ার পর তাঁহার সেই অবস্থাই হইল। এই চিঠি অ্যাণ্টোনিওর। তিনি জানাইয়াছেন যে, তিন মাস উত্তীর্ণ হইয়া যাওয়ায় তাঁহার অঙ্গীকার-পত্রের মেয়াদ ফুরাইয়াছে, এদিকে তাঁহার জাহাজ ফিরে নাই। সাইলক তাঁহাকে ছাড়িবে না, সুতরাং তাঁহার মৃত্যু সুনিশ্চিত। ব্যাসানিও যদি পারেন তবে যেন মৃত্যুর পূর্ব্বে তাঁহার সঙ্গে একবার দেখা করেন।

টাকা ধার করার কথা, অ্যাণ্টোনিওর এক পাউণ্ড মাংস দেওয়ার কথা ব্যাসানিও পোরসিয়াকে সব খুলিয়া বলিলেন। সব শুনিয়া পোরসিয়া অ্যাণ্টোনিওর মত অকৃত্রিম বন্ধুর প্রাণ বাঁচাইবার জন্য তাঁহাকে সমস্ত কাজ ফেলিয়া ভেনিসে যাইতে অনুরোধ করিলেন। দশগুণ, বিশগুণ অর্থও যদি দিতে হয়, তাহা দিয়াও যেন ব্যাসানিও অ্যাণ্টোনিওকে উদ্ধার করিয়া বেলমণ্টে লইয়া আসেন। কিন্তু যাইবার আগে তাঁহাদের বিবাহ হওয়া উচিত, কারণ তাহা না হইলে ব্যাসানিও আইনতঃ পোরসিয়ার অর্থের অধিকারী হইবেন না। সেইদিনই ব্যাসানিওর সঙ্গে পোরসিয়ার ও গ্রাসিয়ানোর সঙ্গে নেরিসার বিবাহ হইয়া গেল এবং বিবাহ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই ব্যাসানিও এবং গ্রাসিয়ানো ভেনিস অভিমুখে যাত্রা করিলেন।

পোরসিয়া তাঁহার স্বামীকে পাঠাইয়া দিলেও নিজে নিশ্চেষ্ট হইয়া বসিয়া রহিলেন না। অ্যাণ্টোনিওকে উদ্ধার করিবার এক প্রবল আকাঙ্ক্ষা তাঁহাকে পাইয়া বসিল। বেলারিও (Bellario) নামে তাঁহার একজন আইন ব্যবসায়ী আত্মীয় ছিলেন। তিনি তাঁহার নিকট ঘটনার সমস্ত বিবরণ লিখিয়া

দিলেন এবং যথোচিত উপদেশ চাহিয়া পাঠাইলেন। ব্যালারিওর উপদেশ পৌঁছিলে তাঁহার প্রেরিত আইন ব্যবসায়ীর পোষাক পরিধান করিয়া পোরসিয়া নিজে অ্যান্টো-নিয়োকে বাঁচাইবার জন্য ভেনিস্ অভিমুখে যাত্রা করিলেন। নেরিসাও তাঁহার সঙ্গে গেল।

বিচার আরম্ভ হইয়াছে—ভেনিসের ডিউক স্বয়ং বিচারালয়ে উপস্থিত। পোরসিয়া আইন ব্যবসায়ী এবং নেরিসা তাঁহার কেরাণীরূপে সেখানে উপস্থিত হইল। ব্যাসানিও এই ছদ্মবেশী পোর-সিয়াকে চিনিতে পারিলেন না। পোরসিয়া প্রথমে দয়ার অশেষ গুণের কথা বলিলেন এবং সাইলককে অ্যান্টোনিওর প্রতি সদয় হইতে অনুরোধ করিলেন। এত সুন্দর ভাবে তিনি দয়ার ব্যাখ্যা করিলেন যে, তাহা শুনিয়া অতি বড় পাষাণ হৃদয়ও বিগলিত হয়, কিন্তু সাইলকের হৃদয় পাষাণের চেয়েও কঠিন। তিনি যখন বুঝিতে পারিলেন যে, অনুনয়-বিনয়ে কোন ফল হইবে না—সাইলক তাহার অঙ্গীকার-পত্রে যে সর্ত্ত আছে, তাহা হইতে একচুল নড়িবে না, তখন তিনি অঙ্গীকার-পত্রটী দেখিতে চাহিলেন এবং দেখিয়া বলিলেন যে, মেয়াদ ফুরাইয়া যাওয়ায় অ্যান্টোনিওর এক পাউণ্ড মাংস তাহার প্রাপ্য। পোরসিয়া তাহার পক্ষ সমর্থন করিতেছেন মনে করিয়া সাইলকের আনন্দের সীমা রহিল না—সে পোরসিয়ার খুব প্রশংসা করিতে লাগিল। পোরসিয়া তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, টাকা লইয়া সে অ্যান্টোনিওকে নিষ্কৃতি দিবে কি না। ব্যাসানিও তিন হাজারের পরিবর্ত্তে যাট হাজার ডাকাট্ দিতে চাহিলেন কিন্তু সাইলক রাজি হইল না। সাইলক তখন মনের আনন্দে তাহার ছুরি শান দিতে লাগিল। অ্যান্টোনিওর আজ আর নিস্তার নাই কিন্তু তিনি সুখ-দুঃখে রঅতীত অবস্থায় আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। পোরসিয়া অ্যান্টোনিওকে জিজ্ঞাসা করি-লেন, তাঁহার কিছু বলিবার আছে কিনা। অ্যান্টোনিওর কিছুই বলিবার ছিল না। তিনি ব্যাসানিওকে বলিলেন, "বন্ধু, তোমার জন্য আমি মরিতেছি—এ কথা ভাবিয়া কষ্ট পাইও না। তোমার স্ত্রীকে আমার প্রীতি-

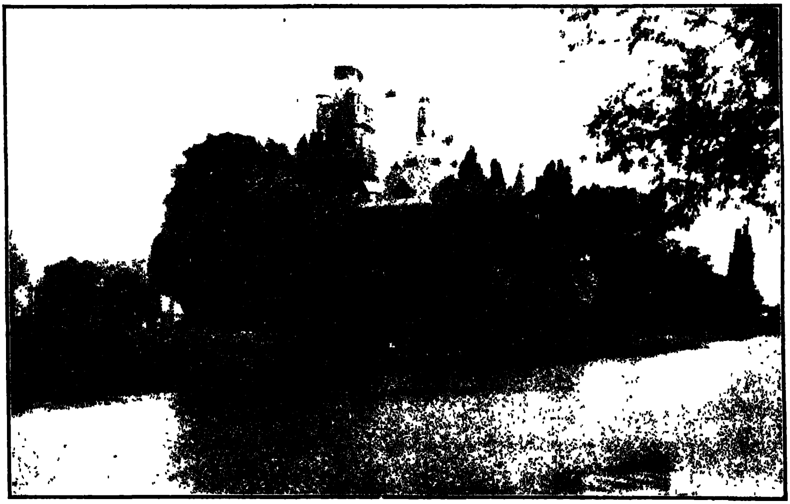


আইন ব্যবসায়ীর বেশে পোরসিয়া

সম্ভাষণ জানাইও। তোমাকে আমি কত ভালবাসিতাম, সে কথা তাঁহাকে বলিও।" ব্যাসানিও উত্তর করিলেন, "আমার স্ত্রীকে আমি প্রাণের চেয়েও বেশি ভালবাসি কিন্তু আমার নিজের জীবন, আমার স্ত্রী, আমার সর্ব্বস্ব দিয়াও তোমায় আজ আমি রক্ষা করিতে প্রস্তুত।" পোরসিয়া ব্যাসা-নিওর একথা শুনিয়া মোটেই রাগ করি-

লেন না, বরং খুশীই হইলেন যে, তাঁহার স্বামী তাঁহার বন্ধুকে এমন ভালবাসেন! কিন্তু রহস্য করিবার এই সুযোগ তিনি ছাড়িলেন না। পোরসিয়া উত্তর করিলেন, "রক্ষা—তোমার স্ত্রী এখানে নাই, তিনি এই কথা শুনিলে নিশ্চয়ই খুব খুশী হইতেন না।"

সাইলক আর অপেক্ষা করিতে পারিতেছিল না। মাংস কাটার দরুণ রক্তস্রাবে অ্যান্টোনিওর মৃত্যু হইতে পারে, সেজন্য সম্পত্তি সমস্ত রাজ-সরকারে বাজেয়াপ্ত হইয়া যাইবে। তাহা ছাড়া তোমাকে ঠিক এক পাউণ্ড মাংস কাটিতে হইবে, এক চুল বেশি বা কম না হয়।" কি সর্ব্বনাশ! বিনা রক্তপাতে মাংস কাটা সম্পূর্ণ অসম্ভব, সুতরাং সাইলক তাহার টাকা চাহিল। ব্যাসানিও অমনি টাকা দিতে গেলেন কিন্তু পোরসিয়া তাঁহাকে নিষেধ করিলেন। তিনি বলিলেন, "সাইলক, তুমি



ষ্ট্র্যাট্ ফোর্ডের রঙ্গালয় (এইখানে সেক্সপিয়রের নাটক অভিনীত হইত)
ইহা ১৯২৩ খৃষ্টাব্দের ৬ই মার্চ্চ অগ্নি লাগিয়া ভস্মীভূত হয়

একজন ডাক্তার উপস্থিত থাকা প্রয়োজন। কিন্তু অঙ্গীকার-পত্রে সর্ত্ত ছিল না বলিয়া সাইলক তাহাতে রাজী হইল না এবং অ্যান্টোনিওকে প্রস্তুত হইতে বলিল। তখন পোরসিয়া বলিলেন, 'য়িহুদী বণিক, ক্ষান্ত হও! অঙ্গীকার-পত্রে শুধু মাংসের কথাই আছে, রক্তের কথা নাই, সুতরাং তুমি শুধু মাংস পাইবে, রক্ত পাইবে না। একবিন্দু রক্তপাত হইলে তোমার বিষয়-একজন খৃষ্টান নাগরিককে হত্যা করিবার ষড়যন্ত্র করিয়াছ। তোমার শাস্তি প্রাণদণ্ড। তুমি নত জানু হইয়া ডিউকের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর।" ডিউক তাহাকে ক্ষমা করিলেন, তাহাকে প্রাণদণ্ডে দণ্ডিত না করিলেও তিনি তাহার বিষয়ের অর্দ্ধেক রাজসরকারে এবং বাকী অর্দ্ধেক অ্যান্টোনিওর বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করার জন্য তাঁহাকে ভাগ করিয়া দিলেন।

সদাশয় অ্যান্টোনিও তাঁহার প্রাপ্য অর্দ্ধেক গ্রহণ করিলেন না। তিনি বলিলেন যে, যদি সাইলক তাঁহার মৃত্যুর পর ঐ সম্পত্তি তাহার মেয়ে জেসিকা (Jessica) ও তাহার স্বামী লরেঞ্জোকে (Lorenzo) দিবার অঙ্গীকার করিয়া লেখাপড়া করিয়া দেয়, তবে তিনি তাহার দাবী ছাড়িয়া দিবেন। সাইলক পরাজিত ও বিধ্বস্ত হইয়া তাহাতেই রাজি হইল এবং গৃহে ফিরিয়া যাইবার অনুমতি চাহিল। ডিউক তখন বলিলেন, "সাইলক, তুমি যদি তোমার কৃতকর্ম্মের জন্য অনুতপ্ত হও এবং খ্রীষ্ট ধর্ম্ম অবলম্বন কর, তবে তোমার অপর অর্দ্ধও তোমাকে ফিরাইয়া দেওয়া হইবে।"

অ্যান্টোনিওর মুক্তিতে সকলেই খুব আনন্দিত হইলেন। ডিউক পোরসিয়ার বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের খুব প্রশংসা করিলেন এবং তাঁহাকে নিজগৃহে নিমন্ত্রণ করিলেন কিন্তু পোরসিয়াকে তাঁহার স্বামীর পূর্ব্বে বেলমন্টে ফিরিয়া যাইতে হইবে, সুতরাং তিনি বিনীত ভাবে জানাইলেন যে, কোন বিশেষ কারণ বশতঃ তিনি তাঁহার নিমন্ত্রণ গ্রহণ করিতে অক্ষম।

এই তরুণ আইন ব্যবসায়ীর জন্যই অ্যান্টোনিও রক্ষা পাইয়াছেন—তাঁহার কাছে ব্যাসানিওর কৃতজ্ঞতার অন্ত নাই। ব্যাসানিও তাঁহাকে তিন হাজার ডাকাট্ দিতে চাহিলেন, কিন্তু তিনি কিছুতেই লইবেন না। পোরসিয়া যখন কিছুতেই টাকা লইলেন না, তখন উপহার হিসাবে কিছু লইবার জন্য ব্যাসানিও তাঁহাকে খুব পীড়াপীড়ি করিতে লাগিলেন। অ্যান্টোনিওর নিকট হইতে তিনি তাঁহার দস্তানা চাহিয়া লইলেন, আর ব্যাসানিওর নিকট চাহিলেন তাঁহার আংটীটী। কিন্তু সে আংটীটী ব্যাসানিও কিছুতেই দিতে পারেন না, ঐ আংটী তাঁহার স্ত্রীর দেওয়া এবং তিনি স্ত্রীর নিকট প্রতিজ্ঞাবদ্ধ যে, কোন কারণেই তিনি ঐ আংটী হস্তান্তর করিবেন না। ব্যাসানিও সে কথা তাঁহাকে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে, ঐ আংটীর বদলে ভেনিসের সবচেয়ে মূল্যবান আংটী তিনি তাঁহাকে উপহার দিবেন। পোরসিয়া রাগের ভান করিয়া বলিলেন, "ভিক্ষুকের সঙ্গে কেমন ব্যবহার করিতে হয় মহাশয়, আপনার নিকট তাহা শিখিলাম।" তাহার পর তিনি চলিয়া গেলেন।

অ্যান্টোনিও তখন ব্যাসানিওকে বলিলেন, "ভাই ব্যাসানিও, এই ব্যক্তির জন্য আমি আজ জীবন পাইলাম। আমার খাতিরেই না হয় তুমি তাঁহাকে আংটীটা দিলে। তোমার স্ত্রীর অসন্তুষ্টির চেয়ে এই দানকে কি তোমার উচ্চস্থান দেওয়া উচিত নয়?"

ব্যাসানিও একটু লজ্জিত হইলেন এবং গ্রাসিয়ানোকে দিয়া আংটীটী তাঁহার নিকট পাঠাইয়া দিলেন। গ্রাসিয়ানো পোরসিয়াকে সে আংটীটা দিয়া ত আসিলই, সঙ্গে সঙ্গে নিজের আংটীটাও বালকবেশী নেরিসাকে দিয়া আসিল।

পোরসিয়া বেলমণ্ট ফিরিয়া চলিয়াছেন। তাঁহার আর আনন্দের সীমা নাই—আকাশে বাতাসে সর্ব্বত্র যেন আনন্দের মেলা বসিয়া গিয়াছে। সৎকার্য্যের আত্মপ্রসাদ এইরূপই হইয়া থাকে। চাঁদের আলোতে সমস্ত পৃথিবী ভরিয়া গিয়াছে, দূর হইতে তাঁহার ঘরের আলো দেখা যাইতেছে, আর তাঁহার নিজের বাড়ী হইতেই গানের সুর ভাসিয়া আসিতেছে। আজ সব জিনিষই পোরসিয়ার নিকট অপূর্ব্ব মাধুর্য্যময় মনে হইতে লাগিল।

পোরসিয়া এবং নেরিসা গৃহে পৌঁছিয়া যাঁর যাঁর প্রকোষ্ঠে নিজেদের স্বামীর অপেক্ষা করিতে লাগিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে

ব্যাসানিও, অ্যান্টোনিও ও গ্র্যাসিয়ানো আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ব্যাসানিও পোরসিয়ার সঙ্গে অ্যান্টোনিওর পরিচয় করাইয়া দিলেন এবং শুভেচ্ছা-জ্ঞাপন ও আদর-আপ্যায়ন শেষ হইতে না হইতে অন্য প্রকোষ্ঠে নেরিসা ও গ্রাসিয়ানোর ঝগড়া শুনা গেল। নেরিসা তাহার স্বামীর হাতে আংটী না দেখিয়া ভয়ানক ঝগড়া বাঁধাইয়া দিয়াছে। গ্রাসিয়ানোর কোন কথাই সে শুনিতে চায় না। পোবসিয়ার নিকট তাহারা বিচারের জন্য আসিল। পোরসিয়াও ব্যাসানিওর নিকট আংটী চাহিলেন। ব্যাসানিওর অবস্থাও তদ্রূপ। পোরসিয়া দেখাইলেন যে, তিনি খুব রাগ করিয়াছেন। ব্যাসানিও তাঁহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, কি অবস্থার বিপাকে পড়িয়া তিনি সে আংটী দিতে বাধ্য হইয়াছেন, কিন্তু সে কথা শুনে কে? যতই তিনি বুঝাইতে চেষ্টা করিলেন, ততই তিনি উল্টা বুঝিতে লাগিলেন। তখন ব্যাসানিও প্রতিজ্ঞা করিলেন, আর কখনও তিনি অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না। অ্যান্টোনিও দেখিলেন যে, তিনিই যত অনিষ্টের মূল, সুতরাং তিনি বলিলেন, "একবার আমার বন্ধুর জন্য আমি আমার দেহ জামিন রাখিয়াছিলাম, এবার তাহার চেয়েও বড় আমার অবিনশ্বর আত্মা জামিন রাখিতেছি, ব্যাসানিও আর অঙ্গীকার ভঙ্গ করিবেন না।" তখন পোরসিয়া বলিলেন, "বেশ, তাহাই হোক্, আমি আর একটী আংটী দিতেছি এটী যেন তিনি পূর্ব্বের চেয়ে ভাল করিয়া রাখেন।" ব্যাসানিও তো আংটী দেখিয়া অবাক্! এ যে তাঁহার পূর্ব্বের আংটীই। তখন পোরসিয়া সব খুলিয়া বলিলেন। পোরসিয়াই অ্যান্টোনিওর জীবনদাতা তরুণ আইন ব্যাবসায়ী—তাঁহার বুদ্ধি ও প্রত্যুৎপন্ন-মতিত্বের জন্য অ্যান্টোনিও জীবন পাইয়াছেন, এ কথা জানিতে পারিয়া দুই বন্ধু বিস্মিত হইয়া গেলেন। নেরিসাও গ্রাসিয়ানোকে আংটী ফিরাইয়া দিয়াছে। এইখানেই আনন্দের শেষ হইল না। পোরসিয়া অ্যান্টোনিয়কে একখানা চিঠি দিলেন। অ্যান্টোনিও সে চিঠি পড়িয়া জানিতে পারিলেন, তাঁহার জাহাজগুলি মোটেই ডুবিয়া যায় নাই, বহু অর্থ লইয়া দেশে ফিরিয়া আসিয়াছে। বিপদের মেঘ কাটিয়া যাইবার পর ঘটনার এই শুভ পরিণতিতে সমস্ত গৃহে উৎসবের সাড়া পড়িয়া গেল।

ব্যাসানিও ও গ্রাসিয়ানো বিচারালয়ে তাঁহাদের নিজ নিজ পত্নীকে চিনিতে পারেন নাই, চতুরতা দেখাইয়া পোরসিয়া ও নেরিসা যে তাঁহাদের নিকট হইতে অঙ্গুরীয় লইতে পারিয়াছিলেন, এখন সেই সব কথা লইয়া খুব হাসি-তামাসা চলিতে লাগিল। গ্রাসিয়ানো নেরিসার নিকট হইতে পুনরায় অঙ্গুরীয় পাইয়া আনন্দিত হইল এবং একটী কবিতা রচনা করিয়া বলিতে লাগিল:—

বেঁচে থাক্‌বো যতদিন ভাব্‌বো নাকো কিছু আর,
শঙ্কামাত্র হারাই যদি নেরিসার উপহার।

সেক্সপিয়র জন্মিবার নয় বৎসর পর বেন্ জন্‌সন্ (Ben Jonson) জন্মগ্রহণ করেন এবং সেক্সপিয়রের মৃত্যুর ২১ বৎসর পর মৃত্যুমুখে পতিত হন। তাঁহার সময় হইতেই এলিজাবেথের যুগের নাটকের (Elizabethan drama) অধঃপতন আরম্ভ হয়। বেন্ জন্‌সন্ একজন ধর্ম্মযাজকের পুত্র এবং একজন প্রসিদ্ধ রাজমন্ত্রীর সৎপুত্র ছিলেন। তিনি খুব ভাল লেখাপড়া শিখিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং গ্রীক্ ও ল্যাটিন ভাষায় খুব দক্ষতা অর্জ্জন করিয়াছিলেন। কিছুদিন যাবৎ জন্‌সন্ তাঁহার পিতার শিক্ষানবিসী করিয়াছিলেন কিন্তু অল্পদিন পরে সৈন্যদলে নাম লিখাইয়া তিনি নেদার-

ল্যাণ্ড (Netherland) চলিয়া যান। শীঘ্রই তিনি ফিরিয়া আসেন এবং একটী থিয়েটারে নাট্যকারের পদ গ্রহণ করেন। তাঁহার সময় জন্‌সন্‌ই ছিলেন সবচেয়ে শিক্ষিত নাট্যকার। নিজের নির্ভুল রচনা সম্বন্ধে তাঁহার খুব গর্ব্ব ছিল এবং সুযোগ পাইলেই সেক্সপিয়রের ভুলের তীব্র সমালোচনা করিতেন। প্রথম জেম্‌স (James 1)



বেন্ জন্‌সন্

সিংহাসনে আরোহণ করিলে জন্‌সন্ তাঁহার খুব প্রিয় হন এবং ১৬১৬ খৃষ্টাব্দে তাঁহাকে রাজকবি (Poet Laureate) করা হয়। ১৬৩৭ খৃষ্টাব্দে জন্‌সনের মৃত্যু হয় ও ওয়েষ্ট-মিনষ্টার অ্যাবিতে তাঁহাকে সমাধি দেওয়া হয়। 'ডক্টর ফষ্টাস্' (Dr. Faustus), 'দি অ্যালকেমিষ্ট' (The Alchemist), 'দি সাইলেণ্ট উম্যান্' (The Silent Woman), 'ভল্‌পানি' (Volpani) প্রভৃতি জন্‌সনের প্রসিদ্ধ রচনা।

বেন্ জন্‌সন্ ও সেক্সপিয়রের নাট্যলীলার মধ্যে একটা পার্থক্য সহজেই চোখে পড়ে। সেক্সপিয়র হইতেছেন দেশ, কাল, পাত্র প্রভৃতির অনেক উপরে। অর্থাৎ আমরা সেক্সপিয়রের নাটক যখন পড়ি বা তাহার অভিনয় দেখি, তখন তাঁহার নাটকের পাত্র ও পাত্রী কোন্ দেশের, কোন্ কালে আবির্ভূত হইয়াছিলেন, সে কথা আমাদের মনে আসে না। আমরা আমাদের মনো-রাজ্যে দেখিতে পাই সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব বিকাশ।

কথাটা আরও সহজভাবে বলা যাইতে পারে। তোমরা Merchant of Venice নাটকের আখ্যান-ভাগ পড়িয়াছ। King Lear ও তাঁহার একখানা প্রসিদ্ধ নাটক। কে জানে রাজা লিয়র কতদিন আগে কেল্টদের (Celt) রাজা ছিলেন। আমরা সে দেশের সে কালের সভ্যতার বা রীতি-নীতি বা সংস্কারগত কোন কথা জানি না। কিন্তু সেক্সপিয়রের কল্পনা প্রভাবে আমরা King Learকে দেখিতে পাই বিশ্ব-মানবের অন্তর্ভূত চরিত্র, আমাদেরই মত শোকে-দুঃখে ম্রিয়মাণ, আমাদেরই মত দোষে-গুণে মানুষ। কিন্তু বেন্ জন্‌সনের নাটকে সেক্সপিয়রের এই বিশ্বমানবতার আদর্শ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি নিজ নিজ বিশেষত্বের গণ্ডিতে আবদ্ধ। তাহারা সাধারণ মানুষের রূপে আসিয়া উপস্থিত হয় না। তাহারা যে মূর্ত্তিতে আসিয়া আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, তাহা সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক ও সাহিত্যিক ব্যতীত অপরের পক্ষে বুঝিয়া উঠা কঠিন। একজন সমগ্র বিশ্বজগতের— আর একজন শুধু দেশ, কাল, পাত্রের ক্ষুদ্র



শাহরাজাদী সুলতান শাহরিয়ার নিকট গল্প বলিতেছেন



গল্প ও কাহিনী

আরব্য-উপন্যাস

['আরব্য-উপন্যাসের' নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে এবং তোমরা নিশ্চয়ই তাহার ছু'-চারিটি গল্পও পড়িয়াছ। আমরাও তোমাদের কাছে 'আরব্য-উপন্যাসের' কয়েকটি প্রসিদ্ধ গল্প বলিব। এই 'আরব্য-উপন্যাসের' গল্পগুলি কত দিনের পুরানো এবং কে এই গল্পগুলি রচনা করিয়াছিলেন, সে কথা বলা বড় কঠিন। অনেক বড় বড় পণ্ডিতের মতে এই গল্পগুলি ভারতবর্ষ হইতে আরব, পারস্য প্রভৃতি দেশের মধ্য দিয়া অবশেষে ইউরোপে গিয়া পৌঁছিয়াছিল। সংস্কৃত 'কথাসরিৎসাগরের' (Ocean of the Streams of Narrative) অনেক গল্পের সহিত 'আরব্য-উপন্যাসের' অনেক গল্পের সাদৃশ্য আছে। 'সিন্ধাবাদ' নাবিকের গল্পটি যে ভারতীয়, এ কথা ইউরোপের পণ্ডিতেরাও স্বীকার করেন। গ্রীকেরা সিন্ধাবাদ নাবিকের গল্পের অনুবাদের নাম দিয়াছিলেন 'সিন্তিপাস্' (Syntipas—

Book of Sindabad)। এইরূপ আরও গল্পের কথা বলা যাইতে পারে, কিন্তু সে সব আলোচনার এখানে কোনও আবশ্যক নাই।

'আরব্য-উপন্যাসের' গল্পগুলির কি ভাবে সৃষ্টি হইল, তাহার একটা ইতিহাস আছে। কথিত আছে—সেকালে বাগদাদ নগরীতে শাহরিয়ার নামে এক খলিফা ছিলেন। এই খলিফার অতি নিষ্ঠুর একটা অভ্যাস ছিল, তিনি প্রত্যেক দিন এক একটি সুন্দরী মহিলাকে বিবাহ করিতেন এবং পরদিন প্রাতে আবার তাঁহাকে মারিয়া ফেলিতেন। এই ভাবে তিনি বহু নারীকে হত্যা করেন। অবশেষে তাঁহার উজীরের (Vizir) কন্যা শাহরাজাদীকে বিবাহ করেন। এই বুদ্ধিমতী মহিলা সুলতানের নিকট প্রতিদিন রাত্রিতে এক একটি গল্প বলিয়া তাঁহাকে এতদূর মুগ্ধ করিয়াছিলেন যে, তিনি শাহরাজাদীকে ভালবাসিয়া ফেলিলেন এবং তাঁহার একান্ত অনুরক্ত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে আর হত্যা করিলেন না। শাহরাজাদী এমন ভাবে গল্প বলিতেন যে, এক রাত্রিতে তাহা আর শেষ হইত না। খলিফা তোমাদেরই মত 'তারপর কি হইল? তারপর কি হইল?' জানিবার আগ্রহে শাহরাজাদীকে মারিবার অবসরই পাইলেন না। ছবিতে দেখ শাহরাজাদী সুলতানকে তাঁহার প্রথম গল্পটি বলিতে আরম্ভ করিয়াছেন।

স্যার রিচার্ড ফ্রান্সিস্ বার্টনের নাম তোমাদের জানা আছে। 'শিশু-ভারতী'তে (অজ্ঞাতের সন্ধানে—১৯২৯ পৃষ্ঠা) তাঁহার কথা পড়িয়াছ। বার্টন সাহেব 'আরব্য-উপন্যাসের' গল্পগুলি আরব্য ও পারস্য ভাষা হইতে ইংরাজীতে অনুবাদ করেন। তাঁহার মতে 'আরব্য-উপন্যাসের' সব চেয়ে পুরানো গল্পটি অষ্টম শতাব্দীতে খলিফা আল-মনসুরের (Al Mansur) রাজত্বকালে রচিত হইয়াছিল। পরের কোনটি দশম শতাব্দীতে, কতকগুলি ষোড়শ শতাব্দীতে লিখিত হইয়াছিল। আমরা আরব্য-উপন্যাসের, গল্পগুলি যেরূপ ভাবে সংগৃহীত অবস্থায় দেখিতে পাই, তাহা ত্রয়োদশ শতাব্দীর পূর্ব্বে হয় নাই। কে এই গল্পগুলি লিখিয়াছেন সে সম্বন্ধে বার্টন বলেন—"The Author is unknown for the best reason; there never was one.' 'আরব্য উপন্যাসে'র কে রচয়িতা তাহা বলা কঠিন, কেন না এসকল গল্প একজনের লেখা নয়। লোকের মুখে মুখে গল্পগুলি দেশবিদেশে জয়যাত্রা করিয়া অবশেষে পৃথিবীর সর্ব্বত্র তাহাদের প্রতিষ্ঠা স্থাপন করিয়াছে।]

ধীবর ও দৈত্য

[২০১৯ পৃষ্ঠার পর

এক যে ছিল বৃদ্ধ ধীবর, অতি কষ্টে তাহার দিন চলিত। কোন দিন অন্ন জুটিত, কোন দিন জুটিত না। তিনটি সন্তান ও স্ত্রী সহ তাহার এই ক্ষুদ্র পরিবারের অন্ন-সংস্থান করিবার মত ক্ষমতাও তাহার ছিল না। সে প্রতিদিন খুব সকালে উঠিয়া নদীতে যাইয়া জাল ফেলিত। তাহার একটা নিয়ম ছিল যে, সে চারি বারের বেশি জাল ফেলিত না।

একদিন চাঁদ ডুবিতে-না-ডুবিতে অতি প্রত্যূষে যাইয়া সে নদীতে জাল ফেলিল। জাল টানিবার সময় জালটা খুব ভারি বলিয়া মনে হইল। অতি কষ্টে জাল উপরে তুলিয়া দেখিল—সে একটা মড়া গাধা টানিয়া তুলিয়াছে। তাহার মনটা একেবারে দমিয়া গেল। সে ভাবিয়াছিল হয়ত বা মস্ত একটা মাছ উঠিবে, তাহা না উঠিয়া উঠিল কিনা একটা মড়া গাধা! কি আর করিবে; বিষণ্ণ মনে সে আবার জাল ফেলিল। এই দ্বিতীয় বারও জাল টানিয়া তুলিবার সময় বেশ ভারি বোধ হইল—হয়ত বা এবার একটা বড় মাছ পড়িয়া থাকিবে, এইরূপ মনে করিয়া পরম উৎসাহের সহিত জালটা টানিয়া তুলিল। কিন্তু এমনি তাহার দুর্ভাগ্য, এইবার উঠিল কিনা একটা বালি ভরা মাটির কলসী। তৃতীয় বার জাল তুলিল—তাহাতে উঠিল কতকগুলি নুড়ি, পাথর, ভাঙ্গা শিশি-বোতল প্রভৃতি নানা নোংরা জিনিস। সে কিন্তু কিছুতেই দমিল না। ঈশ্বরের দয়ার উপর নির্ভর করিয়া সে চতুর্থ বার জাল ফেলিল। এইবার উঠিল একটি তামার কলসী। কলসীটির মুখ সীসকের ঢাকনি দিয়া বন্ধ। তাহার উপর ডেভিডের (দায়ুদ) ছেলে সম্রাট সুলেমান বা সলোমানের (Solomon) নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের সিলমোহর করা। এই তামার কলসীটি পাইয়া ধীবরের মনে একটু আনন্দ হইল। সে ভাবিল—এই তামার কলসীটি বেচিয়া কিছু টাকা পাওয়া যাইবে নিশ্চয়ই। তাহার মনে হইল, কলসীটির ভিতর না জানি কি আছে! সে এইরূপ উৎসুক হইয়া ছুরি দিয়া ঢাকনিটি কাটিয়া ফেলিল। সে যেমন ঢাকনিটি খুলিয়া ফেলিল, অমনি তাহার ভিতর হইতে কুণ্ডলি পাকানো ধোঁয়ার পর ধোঁয়া বাহির হইতে লাগিল। সে ধোঁয়ায় আকাশ একেবারে অন্ধকার করিয়া ফেলিল। ক্রমশঃ সে ধোঁয়া ঘনীভূত হইয়া এক ভীষণ দৈত্যের আকার ধারণ করিল। বেচারা ধীবর দৈত্যের ভীষণ মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে কয়েক পা পিছাইয়া গেল। দৈত্য



বীবর ও দৈত্য

মেঘ-গর্জ্জনের মত গম্ভীর স্বরে কহিল—ওরে ধীবর, তুই কি ভাবে মরিতে চাস্ বল। জানিস্ আমি সম্রাট্ সলোমানের আদেশ অমান্য করিবার দরুণ তিনি আমাকে এই তামার কলসীর ভিতর বন্দী করিয়া জলের ভিতর ফেলিয়া দিয়াছিলেন! আমি শত শত বৎসর যাবৎ সমুদ্রের অতল তলে এইরূপ বন্দী অবস্থায় পড়িয়াছিলাম। আমি তখন প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলাম যে, একশো বছরের আগে যে ব্যক্তি আমাকে মুক্ত করিবে, তাহাকে আমি অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি করিয়া দিব। একশো বছর চলিয়া গেল, কেহ আমাকে মুক্ত করিল না। পরে পণ করিলাম—দু'শো বছর পূর্ণ না হইতে যদি কেহ

তাহার মাথায় এক বুদ্ধি খুলিয়া গেল। বিপদে পড়িলে অনেকের মাথায়ই নানারূপ বুদ্ধি আসে। ধীবর কহিল—ওহে দৈত্য! আমার কোন মতেই বিশ্বাস হয় না যে, তুমি এই কলসীটার ভিতর ছিলে। তোমার এত বড় বিরাট শরীরের সামান্য একটা পায়ের নখও যে এই কলসীর মধ্যে ঢুকিবে না!

দৈত্য বলিল—কি যে বলিস্! সত্যিই তো আমি কলসীর ভিতর ছিলাম।

—হাঁ, ছিলে বৈ কি!! যাও তো দেখি আবার কলসীর ভিতরে!

দৈত্য গর্জ্জন করিয়া বলিল—নিশ্চয় পারি!



এবার উঠিল একটি তামার কলসী

আমায় মুক্ত করে, তাহা হইলে আমি তাহাকে পৃথিবীর গুপ্ত-ধনের সন্ধান বলিয়া দিব, কিন্তু কেহ আমাকে মুক্তি দিল না। তৃতীয় বার পণ করিলাম—যদি কেহ আমাকে মুক্তি দেয়, তাহা হইলে তাহাকে আমি পৃথিবীর একচ্ছত্র সম্রাট করিয়া দিব এবং আমি প্রতিদিন তাহার তিনটি ইচ্ছা পূর্ণ করিব। কিন্তু এই তিনশো বছরের মধ্যে কেহ আমাকে মুক্তি দিল না। তারপর চতুর্থ বার রাগ করিয়া প্রতিজ্ঞা করিলাম—যদি এইবার কেহ আমাকে মুক্ত করে, তাহাকে আমি মারিয়া ফেলিব। কাজে কাজেই, ওরে দুর্ভাগা ধীবর, মৃত্যুর জন্য প্রস্তুত হ'। কি ভাবে মরিতে চাস্ বল্!

ধীবর অনেক অনুনয়-বিনয় করিয়াও দৈত্যের মনে দয়ার উদ্রেক করিতে পারিল না। তখন

—তবে যাও দেখি!

ধীবরের এই কথায় তৎক্ষণাৎ দৈত্য আবার ধোঁয়ার আকারে সেই তামার কলসীর ভিতরে গিয়া প্রবেশ করিল।

আর যায় কোথায়! ধীবর অমনি সীসার ঢাকনি দিয়া কলসীটার মুখ পূর্ব্বের মত বন্ধ করিয়া দিল।

দৈত্য বন্দী হইয়া অনেক কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু ধীবর কিছুতেই বিচলিত হইল না। শেষটায় দৈত্য বলিল—আমাকে মুক্ত করিয়া দেও, আমি আল্লার নামে শপথ করিতেছি যে, তোমার কোনও অনিষ্ট করিব না, বরং আমি তোমাকে অতুল ধন-সম্পদের অধিকারী করিয়া দিব।

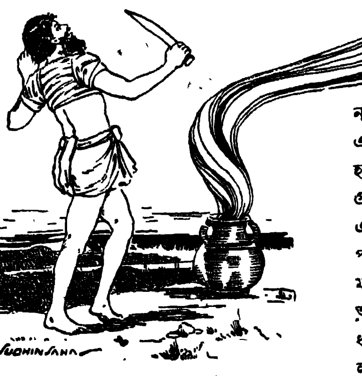


ধীবর তাহার এই শপথে বিশ্বাস করিয়া দৈত্যকে আবার মুক্ত করিয়া দিল! এইবার দৈত্য ধীবরকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিল। তাহারা দুইজনে এক কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বতশ্রেণীর পশ্চাতে এক হ্রদের নিকটে আসিল। হ্রদের জল স্ফটিকের মত স্বচ্ছ। জলের ভিতরে নানা রঙ-বেরঙের মাছেরা খেলিয়া বেড়াইতেছিল।

দৈত্য কহিল—তুমি প্রত্যহ হ্রদের জলে একবার জাল ফেলিবে। জালে প্রত্যহ চারিটি করিয়া মাছ ধরিতে পারিবে। এই মাছ চারিটি সুলতানের নিকট বিক্রয় করিলে তোমার আর অর্থের কোনও অভাব থাকিবে না। কিন্তু সাবধান! কখনও লোভে পড়িয়া যেন একবারের বেশি জাল ফেলিও না। তাহা হইলে কিন্তু তোমার ভয়ানক অনিষ্ট হইবে।

ধীবর তাহাই করিল এবং প্রথম দিনই চারিটি করিয়া বিভিন্ন বর্ণের মৎস্য পাইল। সেই চারিটি মৎস্য সুলতানের নিকট বিক্রয় করিয়া সে প্রচুর অর্থ লাভ করিল। সেদিন হইতেই তাহার অর্থের অভাব ঘুচিতে আরম্ভ করিল।

সুলতান কৌতূহলী হইয়া সেই কৃষ্ণবর্ণ পর্ব্বত-বেষ্টিত হ্রদের নিকট যাইয়া চারিদিক পর্য্যবেক্ষণ করিয়া অনেক আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষ্য করিলেন। এই হ্রদ যেখানে, সেখানে ছিল এক সময়ে এক জনবহুল প্রসিদ্ধ নগরী। অতি প্রাচীন কালে যাদুবিদ্যার প্রভাবে এই সহর ও এই সহরের লোকজনেরা প্রাণ হারাইয়াছিল। সুলতানের আশ্চর্য্য আবিষ্কারের প্রভাবে ক্রমে আবার সেই সহরের উদ্ধার হইল এবং নগরবাসীরাও তাহাদের প্রাণ ফিরিয়া পাইয়াছিল। ধীবরের জন্যই এইরূপ একটা মহৎ কার্য্য সুসম্পন্ন হইল বলিয়া সুলতান তাহাকে অনেক ধন-রত্ন দান করিলেন। ধীবর অতুল ধন-রত্নের অধিকারী হইয়া বাকী জীবন স্ত্রী-পুত্র লইয়া পরম সুখে বাস করিতে লাগিল।



দৈত্যকে দেখিয়া ধীবর পিছাইয়া গেল



সাঁতারের কথা

১৯১৯ পৃষ্ঠার পর

তোমরা অনেকেই ছেলেবেলায় এই সুন্দর কবিতাটিও পড়িয়াছ—'জলে না নামিলে কেহ শিখে না সাঁতার।' এ কথা অতি সত্য। জলে না নামিলে কি কেহ সাঁতার শিখিতে পারে?—তারপর ছোট ছোট খোকা-খুকুরা হাঁটিবার যখন প্রথম চেষ্টা করে, তখন একবার আছাড় খায়, আবার উঠে। তেমনি যদি তোমাদের সাঁতার শিখিতে ইচ্ছা হয়—তবে 'আগে গিয়ে নাব জলে।' জলে নামিলে তবে সাঁতার শিখিবে। জলে না নামিলে কেহই সাঁতার শিখিতে পারে না। আমরা ছেলেবেলায় সাঁতার শিখিবার সময় কত উপায়ে কত ভয়ে ভয়ে যে সাঁতার শিখিয়াছি, সে সব কথা তোমাদের বলিতে গেলে তোমরা না হাসিয়া থাকিতে পারিবে না। তাই আর বলিলাম না। একবার যখন সাঁতার শিখিলাম, মনে সাহস ও বল আসিল, তখন পুকুর ছাড়িয়া ক্রমে দুই-একটি ছোট-খাট নদী সাঁতরাইয়া পার হইতেও কোন ভয় হইত না। তখন নদীর ঢেউয়ের তালে তালে মনের আনন্দে সাঁতরাইতাম। নদীর ও-পাড়ে সাঁতরাইয়া যাইয়া সেখানকার মাঠে ও গ্রামে বেড়াইয়া আসিতাম। এমন কি পুরী যাইয়া সমুদ্রের মধ্যেও তাল গাছের মত উঁচু ঢেউয়ের মাথায় মাথায় সাঁতরাইতে সাঁতরাইতে অনেক দূর চলিয়া গিয়াছি এবং এইরূপ ভাবে সাঁতার দিতে কত আনন্দ পাইয়াছি। সাঁতার শিখা সকলের পক্ষেই ভাল। যাহারা সাঁতার জানে না, তাহারা অনেক সময় জলে ডুবিয়া মারা যায়। তুমি যদি ভাল সাঁতার জান, তাহা হইলে যাহারা সাঁতার জানে না, এমন অনেক লোককে বিপদের হাত হইতে উদ্ধার করিতে পার। এমন গল্প সংবাদ-পত্রেও বোধ হয় অনেকে পড়িয়া থাকিবে।

সেদিন আমরা 'আনন্দবাজার পত্রিকা'য় এই সংবাদটি পড়িয়াছি—

> ১৯৩৪ সালের ৩০শে জুন তারিখে যশোহর জেলায় চণ্ডীশ্বরপুর গ্রামে নব গঙ্গা নদীতে একখানা নৌকা প্রচণ্ড বাতাসে হঠাৎ উল্টাইয়া পড়ে, তখন শ্রীমান সুধীররঞ্জন চট্টোপাধ্যায় নামক জনৈক দারোগার পুত্র নদীতে স্নান করিতেছিল, সে সাঁতরাইয়া নৌকার নিকট গিয়া দুইটি বালিকাকে রক্ষা করে। সুধীরের বয়স ষোল বৎসর। 'রয়েল হিউমেন সোসাইটী' তাহার বীরত্বের জন্য তাহাকে একখানি প্রশংসাপত্র দিয়াছেন।

দেখিলে তো সাঁতার জানিলে কিরূপে জলমগ্ন বিপন্নদিগকে উদ্ধার করিয়া আনন্দ লাভ করিতে পারা যায়!

শরীর-চর্চ্চা সম্বন্ধে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত যে সকল ব্যায়াম আছে, সন্তরণ হইতেছে তাহার মধ্যে সর্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যপ্রদ ও আনন্দদায়ক। এতদিন লোকে মনে করিত যে, পেশীর পুষ্টি সাধন হইতেছে

ব্যায়ামের প্রধান লক্ষ্য। কিন্তু বিজ্ঞান-চর্চার সঙ্গে সঙ্গে এ ধারণা দূর হইয়া গেল। এখন লোকে বুঝিল যে, পেশী অপেক্ষা ফুস্‌ফুসের শক্তি বাড়ানোই হইতেছে স্বাস্থ্যবান্ হইবার একমাত্র প্রশস্ত উপায়। বিজ্ঞানসম্মত প্রণালী অনুযায়ী সাঁতার কাটা নিখুঁৎ স্বাস্থ্যলাভের পক্ষে যে শ্রেষ্ঠ উপায়, এখন একথা সকলেই স্বীকার করেন। বর্ত্তমান সময়ে পৃথিবীর সব দেশেই সন্তরণ (swimming)—এই ব্যায়ামটির উপর বিশেষ ভাবে ঝোঁক পড়িয়াছে। নানা প্রকার ক্রীড়া-কৌতুক ও ব্যায়ামের মধ্যে সাঁতার কাটা উৎকৃষ্ট ব্যায়াম এবং ছোট ছোট ছেলে-মেয়েদের পক্ষে যেমন ভাল, তরুণ ও তরুণীদের পক্ষেও তেমনি ভাল এবং বৃদ্ধ ও বৃদ্ধারা পর্য্যন্ত সন্তরণ ব্যায়াম দ্বারা আনন্দলাভ করিতে পারেন। সকলের পক্ষে সমান রুচিকর বলিয়া পৃথিবীর সব দেশের লোকের কাছেই ইহার সমান আদর।

তোমরা স্বাস্থ্যের বইতে পড়িয়া আসিতেছ—'ত্বক্ পরিষ্কার রাখা স্বাস্থ্য রক্ষা করিবার প্রধান উপায়। কারণ শরীরের ত্বক্ বা চামড়া যদি পরিষ্কার না থাকে, তাহা হইলে রোমকূপসমূহ বন্ধ হইয়া যায় এবং তজ্জন্য শরীরের যাবতীয় দূষিত ময়লা ঐ রোমকূপের পথে বাহির হইতে না পাইয়া নানারূপ রোগের সৃষ্টি করিয়া থাকে। সাঁতার কাটিলে শরীরের ত্বক্ বেশ পরিষ্কার থাকে এবং রোমকূপসকলও উত্তমরূপে পরিষ্কৃত হয়।'

আমরা যদি মুক্ত ও বিশুদ্ধ বায়ু সেবন না করি, তাহা হইলে আমরা সহজেই পীড়াগ্রস্ত হইয়া পড়ি। সন্তরণ করিলে বিশুদ্ধ বায়ু শ্বাস-প্রশ্বাসের সহিত গ্রহণ করিবার সুযোগ ঘটে।

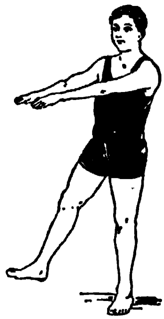
সন্তরণ একটি অতি উৎকৃষ্ট ব্যায়াম। কেন উৎকৃষ্ট ব্যায়াম বলিতেছি, তাহার উত্তর শোন। সাঁতার কাটিবার সময় আমাদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের সম্যক্ চালনা হয়, সেই চালনার ফলে শরীরের আভ্যন্তরীণ যন্ত্রসমূহ উত্তমরূপে ক্রিয়াম্বিত হইয়া সাধারণ স্বাস্থ্যের যথেষ্ট উন্নতি সাধন করে। এমন কি নিয়মিত সাঁতার কাটার ফলে কুব্জ দেহও সোজা হইয়াছে।

যাহাদের বুক বেশি চওড়া নয়, হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া দুর্ব্বল তাহাদের সাঁতার কাটা একান্ত আবশ্যক এমন কি পক্ষাঘাতগ্রস্ত ব্যক্তিরাও সাঁতার কাটিয়া সময়ে সময়ে বিশেষ ফল লাভ করিয়াছেন। প্রতি দিন নিয়মিতভাবে সাঁতার কাটিয়া অনেকে হাঁপানি, সর্দ্দি-কাশি এবং বাতের আক্রমণের হাত হইতে আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। নিয়মিতভাবে স্নান করিলে ও সাঁতার কাটিলে মস্তিষ্কের ব্যাধি, চুল উঠা এবং মেদাধিক্য বা স্থুলত্ব দূর হইয়া শরীরের গঠন বেশ সুন্দর হয়।

বুকের প্রসারতা বৃদ্ধি ও স্কন্ধের পেশীর পরি-পুষ্টি এবং শক্তি অর্জ্জন করিতে হইলে হামাটানার মত সাঁতার কাটা আদর্শ ব্যায়াম বলিয়া বিবেচিত হয়। সাঁতার কাটিলে কেবল যে পেশী পরিপুষ্ট হয় তাহা নহে, ইহা দ্বারা শরীরের কমনীয় ভাবও সম্পূর্ণরূপে সুরক্ষিত থাকে। উল্টা হামা টানিয়া চিৎ সাঁতার অভ্যাস করিলে কটিদেশ হইতে



চিত্র—১নং



চিত্র—২নং

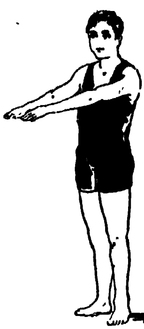
নিম্নাঙ্গের যথেষ্ট পুষ্টি সাধিত হয়। এই ভাবে চিৎ সাঁতার, কাৎ সাঁতার ইত্যাদির দ্বারা উরুদেশ ও উরুসন্ধি পরিপুষ্ট হয়। দাঁড়টানার মত হাতের ভঙ্গী করিয়া সাঁতার কাটিলে হাতের কব্জীতে প্রভূত বল সঞ্চয় হয়। বিভিন্ন প্রকারের সাঁতারের কথা পরে বলিব।

একটা কথা এই যে, ভরা পেটে অর্থাৎ পেট ভরিয়া খাওয়া-দাওয়ার পর কখনও সাঁতার কাটিবে না। অনেকের মনে এইরূপ ভুল ধারণা আছে যে, অনেকক্ষণ জলে থাকিলে বা সাঁতার কাটিলে সর্দ্দি-কাশি প্রভৃতি রোগ হইবার সম্ভাবনা বেশি কিন্তু এই ধারণা যে ভ্রান্ত তাহা পরীক্ষিত সত্য। ফলতঃ স্বাস্থ্যবান্ ও শক্তিমান্ হইয়া সুখী হইতে হইলে সাঁতার যে অন্যতম সুন্দর উপায়, তাহাতে এখন আর কোন সন্দেহ নাই।

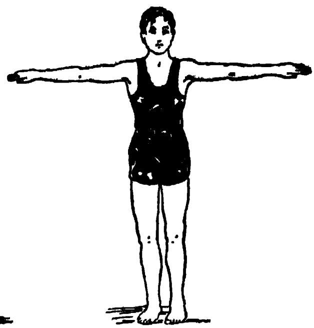
সাঁতারের কথা

সাঁতার শিক্ষার মূল উদ্দেশ্য আত্মরক্ষা এবং বিপন্নের উদ্ধার। এই দুই বিষয়ে পারদর্শিতা লাভের জন্য বৈজ্ঞানিক উপায়ে সাঁতার শিক্ষা করা

সাঁতার শিখিবার জন্য কি কি সাজ-সরঞ্জাম আবশ্যক, এখানে তাহা বলিলাম। (১) সাঁতার কাটিবার নির্দ্দিষ্ট পোষাক, (২) জলে ভাসিবার



চিত্র—৩নং



চিত্র—৪নং

ডানা (Water Wings), (৩) মস্তকাবরণ, (৪) লম্বা অথচ সরু তক্তা, (৫) মোটব গাড়ীর রবারের নল (Tube), (৬) সাঁতারের গলবন্ধ (Swimming Collar), (৭) সাঁতারের কটিবন্ধ (Swimming Belts), (৮) বায়ুপূর্ণ সাঁতারের পোষাক (Inflated Swimming Costumes)।

মানুষের যত্ন ও শ্রম করিয়া সাঁতার শিখিতে হয়, কিন্তু ইতর প্রাণীরা আপনা হইতেই স্বাভাবিক ভাবে সাঁতার কাটিতে পারে। কুকুর, বিড়াল, গরু, ঘোড়া, মহিষ, হস্তী, ব্যাঘ্র প্রভৃতি জানোয়ারেরাও ইচ্ছামত সাঁতরাইতে পারে কিন্তু মানুষের পক্ষে একথা খাটে না, মানুষের রীতিমত উদ্যোগ ও আয়োজন করিয়া সাঁতার শিখিতে হয়।

তোমরা জলে নামিয়া সাঁতার শিখিবার পূর্ব্বে বাড়িতে হাত পা ছুঁড়িয়া দুই হাতেব ও দুই পায়ের ব্যায়াম কবিতে পার। এখানে বাড়ীতে কিরূপে ব্যায়াম করিয়া প্রারম্ভিক সাঁতারেব জন্য প্রস্তুত হইতে পার, চিত্রে ঐরূপ ব্যাযামের আদর্শ দেখান হইল।

এক সংখ্যক চিত্রে দেখ—হাত দুইখানি গুটাইয়া দুই পাশে আন এবং সম্মুখে ও পশ্চাতে প্রসারিত কর। পা দুইটিরও উঠা নামা কর। **দুই নম্বর চিত্রের** মত বাহু দুইটি সমান্তরাল ভাবে রাখিয়া প্রসারিত করিয়া পা দুইটি একটি একটি কবিয়া একবার সম্মুখে ও একবার পশ্চাতে লইয়া এক সঙ্গে হস্ত ও পদের ব্যাযাম কর।

তৃতীয় সংখ্যক চিত্র—দ্বিতীয় সংখ্যক চিত্রেব মত হাত দুইখানি প্রসারিত কব। এবং **চারি সংখ্যক চিত্রের** মত হাত দুইখানি বিস্তৃত কর। এইভাবে ব্যায়াম করিলে বুকের প্রসারতা বাড়িবে, হস্ত ও পদ সঞ্চালনের অভ্যাস হইবে এবং দম রাখিবার শক্তিও বাড়িবে। তোমরা নিয়মিত ভাবে এইরূপ ব্যাযাম কবিলে অতি সহজেই জলে নামিয়া অনেকক্ষণ সাঁতার কাটিতে পারিবে। সাঁতার সম্বন্ধে আমরা অনেক কথা পরে বলিব, এই প্রবন্ধ কেবল সূচনা মাত্র।



কুষাণ বংশের পতন ও গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়

২০৪৮ পৃষ্ঠার পর

কুষাণ সম্রাট্ প্রথম বাসুদেবের পর হইতেই কুষাণ সাম্রাজ্যের অধঃপতনের সূত্রপাত হইয়াছিল। কুষাণ সাম্রাজ্য বহু ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডরাজ্যে বিভক্ত হইয়াছিল। তৃতীয় বাসুদেবের মৃত্যুর পর কনিষ্কের বংশের অধিকার হয় লোপ পাইয়াছিল অথবা অতি ক্ষুদ্র ভূখণ্ডে সীমাবদ্ধ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীতে 'কিদার কুষাণ' নামক একটি রাজবংশ আফ্গানিস্থানে একটি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিল। ইহাদের মুদ্রা কুষাণ রাজগণের মুদ্রার অনুকরণে মুদ্রিত।

কুষাণ সাম্রাজ্যের পতনের কারণ আমরা ঠিক অবগত নহি। সচরাচর দেখা যায় কোনও মহান সাম্রাজ্য উন্নতির চরম সীমায় আরোহণ করিবার পর পতনোন্মুখ হইয়া থাকে। মনে হয় যেন একটি অন্তর্নিহিত ধ্বংস শক্তি ক্রিয়াশীল হইয়া সাম্রাজ্যটিকে দুর্ব্বল করিয়া ফেলে। সেই সময় বহিঃশক্তির আক্রমণ সাম্রাজ্যটিকে ধ্বংসের পথে ঠেলিয়া দেয় ও অচিরাৎ নষ্ট করিয়া ফেলে। কুষাণ সাম্রাজ্যও যখন স্বাভাবিক কারণ বশতঃ দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল, সেই সময় **নাগবংশের** রাজগণের আক্রমণে তাহা ধ্বংসমুখে পতিত হইয়াছিল।

কুষাণ বংশের পতন ও গুপ্ত বংশের অভ্যুদয়ের মধ্যবর্ত্তী কালের ইতিহাস সম্বন্ধে এতদিন প্রায় কিছুই জানা ছিল না কিন্তু ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের ফলে এই তিমিরাচ্ছন্ন যুগের বিষয় এখন কিছু কিছু জানা গিয়াছে। এই সময় উত্তর ও মধ্যভারতের অনেক অংশে নাগবংশের রাজাদের অধিকার স্থাপিত হইয়াছিল, কতকগুলি প্রাচীন লিপিতে **ভারশিব** নামক একটি রাজবংশের উল্লেখ পাওয়া যায়। ভারশিব বংশের রাজগণ নাগবংশীয় ছিলেন। এই বংশে ভবনাগ নামক একজন প্রবল পরাক্রান্ত সম্রাট্ জন্মিয়াছিলেন। একটি তাম্রলিপি হইতে জানা যায় যে, ভারশিবেরা একাদিক্রমে দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন ও পুণ্যতোয়া ভাগীরথীর অমল জল সিঞ্চন দ্বারা তাঁহারা মূর্দ্ধাভিষিক্ত হইয়াছিলেন অর্থাৎ তাঁহাদের মস্তকে গঙ্গাজল ছিটাইয়া দিয়া তাঁহাদের রাজ্যাভিষেক হইয়াছিল। শুঙ্গেরা মাত্র দুইটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়া চক্রবর্ত্তী রাজাদের মধ্যে পরিগণিত হইতেন। ভারশিবেরা দশটি অশ্বমেধ যজ্ঞ করিয়াছিলেন। অতএব বুঝিতে পারিতেছ, তাঁহাদের রাজশক্তি কত প্রবল ছিল। ভারশিব বংশীয় রাজাদের রাজধানী কান্তিপুর নামক স্থানে ছিল, তাহাও নাগবংশীয় রাজাদের অধিকার পদ্মাবতী (আধুনিক সিন্দিক রাজ্যের পদম পবারা গ্রাম), বিদিশা (আধুনিক ভিল্‌সা) ও মথুরাতে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। হয়ত মথুরা ও পদ্মাবতীর নাগরাজগণ ভারশিব সম্রাটদের সামন্ত ছিলেন। দীর্ঘকাল বিদেশী রাজাদের অধীনে থাকিয়া আর্য্য-সভ্যতা ও

সংস্কৃতি ম্লান হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়িয়াছিল। ভারশিবদের রাজ্যকালে আর্য্য-সভ্যতার নবজীবনের সঞ্চার হইয়াছিল।

গুপ্তসাম্রাজ্য

এইবার তোমাদিগকে গুপ্তসাম্রাজ্যের ইতিহাসের কথা বলিব। গুপ্তসাম্রাজ্যের কাল প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের সুবর্ণযুগ বলিয়া একবাক্যে স্বীকৃত হইয়াছে। এই যুগে বড বড় শক্তিশালী রাজারা পশ্চিমে দ্বারকা হইতে পূর্ব্বে আসাম পর্য্যন্ত ও উত্তরে হিমাচল হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদার উপকূল পর্য্যন্ত নিজেদের প্রভাব বিস্তার করিয়াছিলেন। এই যুগে ভারতবর্ষ বিদেশী রাজাদের অধীনতা পাশ হইতে সম্পূর্ণ মুক্ত হইয়াছিল। মৌর্য্য যুগের পরে ভারত আর একবার বিরাট্ সাম্রাজ্যসূত্রে গ্রথিত হইয়াছিল। সংস্কৃত সাহিত্যের অপূর্ব্ব শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছিল। বর্ণাশ্রমধর্ম্মের পুনরায় অভ্যুত্থান হইয়াছিল। ললিতকলার অশেষ উন্নতি হইয়াছিল। ভারতের বাহিরেও ভারতের জ্ঞান, বিদ্যা, ধর্ম্ম ও সভ্যতার বিশেষ আদর হইয়াছিল। এই উন্নতির মূলে ছিল গুপ্তবংশীয় রাজাদের আশ্চর্য্য সর্ব্বতোমুখী প্রতিভা, তাঁহাদের প্রভাব ও অদ্ভুত সংগঠন-শক্তি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্তবংশের কীর্ত্তিকলাপ অতুলনীয়।

সৌভাগ্য বশতঃ গুপ্ত রাজাদের রাজত্ব কালীন ভারতের ইতিহাস লিখিবার প্রচুর উপকরণ পাওয়া যায়। গুপ্তরাজগণ কর্ত্তৃক উৎকীর্ণ অনেক শিলালেখ, তথা তাম্রলিপি এবং তাঁহাদের দ্বারা অঙ্কিত অনেক মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই সকল 'সাধনের' সাহায্যে তাঁহাদের শৃঙ্খলাবদ্ধ ইতিহাস নির্ম্মাণ করা বিশেষ কঠিন নহে। তাহা ছাড়া খৃষ্টীয় পঞ্চম শতাব্দীর প্রারম্ভে চীন দেশীয় বৌদ্ধ শ্রমণ ফা হিয়ান ভারত-ভ্রমণে আসিয়াছিলেন। এই ভ্রমণ-বিবরণ হইতে গুপ্ত-রাজাদের সময়কার সামাজিক অবস্থা, শাসন-ব্যবস্থা ও ধর্ম্ম-পরিস্থিতির বিষয় অনেক কিছু জানা যায়। তাহা ছাড়া প্রাচীন সংস্কৃত সাহিত্যে, বিশেষতঃ কাব্য ও নাটকে তাঁহাদের যুদ্ধ-বিগ্রহের বা কীর্ত্তিকলাপের অল্পবিস্তর উল্লেখও পাওয়া যায়।

খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগে মগধে শ্রীগুপ্ত নামক গুপ্তবংশসম্ভূত একজন সামন্তরাজার বিষয় অবগত হওয়া যায়। তিনি কাহার অধীনে রাজ্য করিতেন, তাহা জানা যায় না এবং তাঁহার পরবর্ত্তী রাজাদের নামও অপরিজ্ঞাত। কোন কোন পণ্ডিত মনে করেন যে, এই শ্রীগুপ্ত ও গুপ্তলেখমালার মহারাজ গুপ্ত অভিন্ন ব্যক্তি। কিন্তু ইহা মনে করিবার কোন সঙ্গত কারণ নাই।

গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতার নাম **গুপ্ত**। ইঁহাকে গুপ্তলেখমালায় 'মহারাজ' উপাধিতে ভূষিত দেখা যায়। ইনি মগধে ২৭৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। এই সময়ে উত্তরাপথের রাজনৈতিক অবস্থা কিরূপ ছিল, তাহা জানা আবশ্যক। আর্য্যাবর্ত্তের বিস্তৃত ভূভাগে নাগবংশীয় রাজাদের আধিপত্য ছিল। পদ্মাবতী অহিচ্ছত্র, মথুরা প্রভৃতি প্রদেশ ইহাদের রাজশক্তির কেন্দ্র ছিল। সিন্ধু, কচ্ছ ইত্যাদি প্রদেশে 'ম্লেচ্ছ' অর্থাৎ শক জাতীয় রাজাদের অধিকার ছিল। উজ্জয়িনীতে শকবংশীয় ক্ষত্রপদের প্রভুত্ব তখনও অক্ষুণ্ণ ছিল। ইহা ছাড়া পঞ্জাবের অংশবিশেষে এবং মালব, রাজপুতানা ইত্যাদি প্রদেশে যৌধেয়, মালব প্রভৃতি কতকগুলি স্বাধীন গণতন্ত্র রাজ্য ছিল।

দাক্ষিণাত্যেও ভিন্ন ভিন্ন রাজবংশের অধিকার ছিল। এই সকল বংশের মধ্যে প্রথম উল্লেখযোগ্য **বাকাটক** বংশ। এই বংশের প্রতিষ্ঠাতা বিন্ধ্য-শক্তি খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে আধুনিক বুন্দেলখণ্ডের অংশবিশেষে একটি ক্ষুদ্র রাজ্য স্থাপন করিয়াছিলেন। বিন্ধ্যশক্তির বংশধরেরা স্বীয় বাহুবলে বুন্দেলখণ্ড হইতে কর্ণাটক পর্য্যন্ত বিস্তৃত একটি বিশাল সাম্রাজ্য গঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সে অবশ্য পরের কথা। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠার সময় বাকাটক রাজশক্তি বেশি প্রবল ছিল না। দাক্ষিণাত্যের পশ্চিম প্রদেশে নাসিকের নিকটবর্ত্তী স্থান-সমূহে 'আভীর' নামক একটি জাতির অধিকার ছিল। ত্রৈকূট নামক একটি রাজবংশের প্রভুত্ব কোঙ্কণ প্রদেশে (বম্বের উত্তরে সমুদ্রতীরস্থ প্রদেশ) স্থাপিত ছিল। কুন্তল (আধুনিক কানারা প্রদেশ) দেশে প্রতাপান্বিত কদম্বরাজবংশের শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। কদম্ব-রাজ ব্রাহ্মণকুলাবতংশ ময়ূর শর্ম্মা ২৮৫ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বদাক্ষিণাত্যে কৃষ্ণা ও গোদাবরী নদীর মধ্যবর্ত্তী সমুদ্র তটবর্ত্তী

প্রদেশে ক্ষত্রিয় ইক্ষ্বাকুবংশীয় রাজগণের শাসনাধীন ছিল। পল্লব নামক একটি রাজবংশ কাঞ্চী, অন্ধ্রাপথ, সাতহনী রট্ট (আধুনিক বেলারি জেলা ও তন্নিকটবর্ত্তী দেশসমূহ) ইত্যাদি প্রদেশে স্বীয় আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠাতা সামন্তরাজ মহারাজ শ্রীগুপ্তের সময়ে মগধেশ্বর কে ছিলেন, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা কঠিন। কদম্বরাজ ময়ূর শর্ম্মার একটি লেখা হইতে জানা যায় **মৌখরি** নামক বিখ্যাত রাজবংশের অস্তিত্ব খৃষ্টীয় তৃতীয় শতাব্দীর শেষ ভাগেও ছিল। পরবর্ত্তী কালে মৌখরি রাজশক্তির কেন্দ্র মগধে ছিল। অতএব হইতে পারে যে, মহারাজ শ্রীগুপ্তের প্রভু মৌখরি বংশের কোনও রাজা ছিলেন। মৌখরি বংশ ছাড়া আমরা মগধে ভারশিব বা বাকাটক বংশের অতি প্রভুত্বের কথাও মনে করিতে পারি। কিন্তু এ বিষয়ে বিশ্বাসযোগ্য কোনই প্রমাণ নাই।

কেহ কেহ মনে করেন যে, মহারাজ গুপ্ত জাতিতে অতিশয় হীন ছিলেন। কিন্তু এই অনুমান অমূলক। পরবর্ত্তী কালে গুপ্ত সম্রাটেরা অন্যান্য উচ্চবংশের রাজকুলের সহিত বৈবাহিক সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলেন। যদি তাঁহারা জাতিতে অতিশয় হীন হইবেন, তবে ইহা সম্ভবপর হইত না।

মহারাজ গুপ্তের পুত্র মহারাজ ঘটোৎকচগুপ্ত পিতার ন্যায় একজন সামান্য সামন্ত রাজা ছিলেন। মগধ দেশে তাঁহার প্রভাব-প্রতিপত্তি অধিক ছিল না, কিন্তু অকস্মাৎ ভাগ্যলক্ষ্মী গুপ্তবংশের উপর সুপ্রসন্ন হইলেন। ঘটোৎকচগুপ্তের পুত্র প্রথম চন্দ্রগুপ্ত ৩২০ খৃষ্টাব্দে সিংহাসনারোহণ করিয়া নিজেকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিয়াছিলেন ও স্বাধীনতা-সূচক 'মহারাজাধিরাজ' পদবী গ্রহণ করিয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতেই গুপ্তবংশের প্রতিষ্ঠার সূত্রপাত, কিন্তু এই প্রতিষ্ঠার মূলে ছিল **লিচ্ছবি** জাতি। এই লিচ্ছবি জাতি প্রাচীন কালে বৈশালী নামক রাজ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। বৌদ্ধ ও জৈন ধর্ম্মের উদয়কালে লিচ্ছবি জাতি একটি বিশেষ প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন জাতি ছিল। কিন্তু শিশুনাগবংশীয় রাজা অজাতশত্রুর রাজত্বকাল হইতে আরম্ভ করিয়া দীর্ঘ আটশত বৎসর লিচ্ছবি জাতির কোনও বিশেষ পরিচয় ইতিহাসের পৃষ্ঠায় পাওয়া যায় না। মনে হয় তিব্বতে ও নেপালে তাহাদের শাখা বর্ত্তমান ছিল। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত এই লিচ্ছবি জাতির এক রাজকন্যার পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন, তাঁহার নাম কুমারদেবী। এই বিবাহ বন্ধন গুপ্তবংশের ভাবী অভ্যুদয়ের কারণ হইয়াছিল। হইতে পারে যে, পাটলিপুত্র লিচ্ছবি জাতির অধিকারভুক্ত ছিল। কিন্তু কুমারদেবীর বিবাহোপলক্ষে তাহারা পাটলিপুত্রের স্বামিত্ব চন্দ্রগুপ্তকে সমর্পণ করিয়াছিল। যাহা হউক এ বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই যে, গুপ্তবংশীয় রাজগণ এই সম্বন্ধকে অতিশয় সৌভাগ্যের, গৌরবের ও গর্ব্বের বিষয় মনে করিতেন। এই বৈবাহিক সম্বন্ধের স্মরণার্থে কতকগুলি সুবর্ণ মুদ্রা অঙ্কিত করা হইয়াছিল। ইহাতে প্রথম দিকে চন্দ্রগুপ্ত ও তাঁহার পত্নী কুমার দেবীর মূর্ত্তি ও তাঁহাদের নাম অঙ্কিত আছে। অপর দিকে সিংহবাহিনী লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি ও লিচ্ছবয়ঃ লিখিত আছে। লিচ্ছবয়ঃ পদ ইহাই সূচিত করে যে, চন্দ্রগুপ্ত লিচ্ছবি বংশের সহিত সম্বন্ধ স্থাপিত করিয়াই রাজ্য নির্ম্মাণ-কার্য্যে সাফল্য লাভ করিয়াছিলেন।

অল্পকাল সিংহাসনে অধিষ্ঠিত থাকিয়াও চন্দ্রগুপ্ত রাজ্য সীমা যথেষ্ট বৃদ্ধি করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। তাঁহার রাজ্য মগধ হইতে প্রয়াগ পর্য্যন্ত বিস্তৃত—অর্থাৎ সমগ্র গঙ্গাতটস্থ প্রদেশই রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তাহা ছাড়া অযোধ্যা প্রভৃতি জনপদও তাঁহার রাজ্যান্তর্ভুক্ত ছিল।

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যাভিষেকের সময় হইতে একটি নূতন সংবতের প্রবর্ত্তন হয়। ইতিহাসে এই সংবৎ **গুপ্ত সংবৎ** বলিয়া প্রসিদ্ধ। পণ্ডিতেরা গণনা করিয়া স্থির করিয়াছেন যে, ৩১৯ খৃষ্টাব্দে এই অব্দের আরম্ভ হয়। এই অব্দটি অনেককাল যাবৎ প্রচলিত ছিল। গুপ্তবংশের পতনের পর এই সংবৎটি কাঠিয়াবাড় দেশে বলভী সংবৎ নামে প্রসিদ্ধ হইয়াছিল। প্রসিদ্ধ মুসলমান জ্যোতির্ব্বিদ আল্ বারুনির কথানুসারে শক সংবৎ (৭৮ খৃষ্টাব্দ) ও গুপ্তসংবতের মধ্যে ২৪১ বৎসরের অন্তর ছিল। শক সংবতে ২৪১ বৎসর যোগ করিলে গুপ্তাব্দের প্রথমবর্ষ ৩১৯-২০ খৃষ্টাব্দ নিরূপিত হয়।]



জন্তু-জানোয়ারেরা কি আবহাওয়ার খবর জানে ?

২০৮০ পৃষ্ঠার পর

বেলা পড়িয়া আসিয়াছে। সূর্য্য অস্ত যাইতেছে। ছেলেরা খেলার মাঠে জড় হইয়াছে, এইবার খেলা সুরু হইবে।

এমন সময় হঠাৎ কোথা হইতে ঘন কালো মেঘ করিয়া ঝড় আসিল, চারিদিক অন্ধকারে ছাইয়া গেল এবং পর মুহূর্ত্তেই মুষলধারে বৃষ্টি পড়িয়া ছেলে-মেয়েদের খেলার আনন্দটা একেবারে মাটি করিয়া দিল। ভিজিতে ভিজিতে কোন ক্রমে বাড়ী পৌঁছিয়া বৃষ্টিতে ভিজিবার দরুণ মা-ঠাকুরমার বকুনি খাইয়া ঘরে বন্দী হইয়া তাহারা ভাবিতে লাগিল 'ধ্যেৎ'! বৃষ্টিটা আর সময় পাইল না! যেমনি আমরা খেলিতে গিয়াছি, অমনি আসিল! কেন, সকালের দিকে স্কুলে যাইবার সময় হইলে কি ক্ষতিটা হইত? আগে যদি জানিতাম যে, আজ বিকালে বৃষ্টি হইবে, তবে আর কে এত কষ্ট করিয়া মাঠে খেলিতে যাইত?'

সত্যিই! তোমাদের অমন সাধের খেলাটা এইরূপ ভাবে নষ্ট হইয়া গেল, ইহা কি কম কষ্টের কথা! আজকাল কিন্তু তোমাদের এই দুঃখ অনেকটা কমিবার উপক্রম হইয়াছে, কেন না, এখন তোমরা অনেকেই বেতার-বার্ত্তায় আবহাওয়ার অফিস হইতে ঝড় বা বৃষ্টির আগমন বার্ত্তা পূর্ব্ব হইতে শুনিতে পাও এবং কি বাঙ্গালা, কি ইংরাজী দৈনিক খবরের কাগজ খুলিলেই দেখিতে পাও যে, সেখানে আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বাভাষ লেখা রহিয়াছে। কাজেই এখন তোমরা পূর্ব্ব হইতে এই বিষয়ে সতর্ক হইবার বিশেষ সুবিধা পাও এবং এইজন্য আর আপসোস করিতে হয় না। তারপর তোমরা যখন দেখ, বেতার-বার্ত্তায় যে ঝড়ের আগমন-বার্ত্তা শুনিয়াছ এবং সংবাদপত্রে যাহা পাঠ করিয়াছ, অনেক সময় ফলিয়া গিয়াছে, অবশ্য অনেক সময় ফলেও না, তখন আশ্চর্য্য হইয়া ভাবো, তাইতো! ইহারা কি করিয়া এত ঠিক বলিতে পারিল এবং তোমরা তখন আবহ-বিদ্যার আশ্চর্য্য ক্ষমতায় বিস্ময়ান্বিত হইয়া পড়। কিন্তু বিস্ময়ের কারণ নাই। কেন না বিজ্ঞানের যে শাখা বায়ুমণ্ডলের প্রকৃতি ও তত্ত্বের অনুসন্ধান করে, তাহাকে Meteorology বা আবহ-বিদ্যা বলে। কাজেই এ বিদ্যার সাহায্যে আবহ-তত্ত্ববিদেরা ঐরূপ forecast বা পূর্ব্বাভাষ প্রচার করেন। তোমাদের কাছে এ বিষয় পরে বলা হইবে।

কিন্তু তোমরা বোধ হয় শুনিলে আরও আশ্চর্য্য হইয়া যাইবে যে, এই সকল আবহাওয়া-তত্ত্ববিদ্‌গণ নানারূপ যন্ত্রাদি দ্বারা যে জ্ঞান লাভ করেন, সামান্য কীট, পতঙ্গ, পশু, পক্ষীরাও তাহাদের সহজ ও স্বাভাবিক জ্ঞানে তাহা উপলব্ধি করিতে সক্ষম

হয় এবং ইহাদের মধ্যে প্রায় অধিকাংশই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন অতি আশ্চর্য্যরূপে ধরিতে পারে। অনেক সময় বিজ্ঞানের আশ্চর্য্য ক্ষমতায় যে সকল যন্ত্রের সৃষ্টি হইয়াছে, তাহাও ভুল সংবাদ দান করে কিন্তু এই সকল পশুপক্ষীরা তাহাদের সহজাত স্বাভাবিক জ্ঞানে প্রায় সমস্ত সময়ই আবহাওয়ার সঠিক পরিচয় প্রদান করে। সুতরাং তোমরা যদি একটু মনোযোগ দিয়া ইহাদের গতি-বিধি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে দেখিবে, ইহারা আবহাওয়ার কিরূপ সঠিক বিবরণ দান করে। আমাদের সকলের মধ্যেই অল্প-বিস্তর অনুভব করিবার শক্তি রহিয়াছে। আমরা হঠাৎ হয়ত একজন অপরিচিত লোককে দেখিয়া ভাবি, 'বাঃ, এর সঙ্গে আমার নিশ্চয়ই খুব ভাব হইবে। লোকটি তো বেশ।' অথচ পূর্ব্বে কোন দিনও ইহার সঙ্গে আমাদের দেখা সাক্ষাৎ হয় নাই। এখানে আমাদের মনের অনুভব-শক্তি বলিয়া দিল যে, লোকটি এই রকমের হইবে। আবার হয়ত কাহাকেও দেখিয়া আমাদের একেবারেই ভাল লাগিল না। এবং সেই ক্ষেত্রেও আমাদের মনের অনুভব শক্তি আমাদের সেই কথাই জানাইয়া দিল। এইরূপ পশুপক্ষীদের মধ্যেও অনুভব-শক্তি রহিয়াছে এবং এই শক্তি দ্বারা তাহাদের মধ্যে প্রায় প্রত্যেকেই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন খুব ভাল ভাবে বুঝিতে পারে, যাহা সাধারণ মানুষের পক্ষে বোঝা একেবারে সাধ্যাতীত।

এর কারণ নির্ণয় করাও খুব সোজা। মানুষ সব সময় নিজ দেহকে বস্ত্রদ্বারা আচ্ছাদিত করিয়া রাখে। সুতরাং এই কৃত্রিম আবরণের ভিতর দিয়া আমরা যাহা অনুভব করিতে পারি না, পশু এবং পক্ষীরা তাহাদের কৃত্রিম আবরণ-হীন-দেহে তাহা সহজেই উপলব্ধি করিতে পারে। তোমরা শুনিলে আশ্চর্য্য হইবে যে অসভ্য বর্ব্বর জাতিরা আবহাওয়া সম্বন্ধে সুসভ্য মানব অপেক্ষা অধিক জ্ঞানবান। ইহার কারণ হইতেছে এই যে, এই সকল অসভ্য জাতিরা প্রকৃতির কোলে মানুষ এবং কৃত্রিম বসন-ভূষণের প্রাচুর্য্য ইহাদের প্রকৃতি হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দেয় নাই। সুতরাং প্রকৃতির নানা পরিবর্ত্তন ইহারা পশুপক্ষীদের মত সহজাত অনুভব শক্তির বলে সহজেই বুঝিতে পারে।

অসভ্য মানুষদের কথা ছাড়িয়া, তোমাদের পশুপক্ষীদের আবহাওয়া সম্বন্ধে সাধারণ জ্ঞানের কথাই বলি। পশুপক্ষীরা সাধারণতঃ শুষ্ক এবং সুন্দর আবহাওয়া, বৃষ্টি বা ঝড় হইবে কি না, ইহার পূর্ব্বাভাষ দিতে পারে এবং সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় হইতেছে এই যে, ইহাদের মধ্যে যে সকল প্রাণী সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট, তাহারাই শুষ্ক ও সুন্দর আবহাওয়া কখন হইবে, তাহা ঠিক বলিতে পারে। তাহাদের অপেক্ষা যাহারা একটু বেশি উন্নত তাহারা বৃষ্টি হইবে কি না, তাহার ভবিষ্যৎ বাণী এবং পশুপক্ষী-দের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বুদ্ধিমান যাহারা, যেমন কুকুর বিড়াল এবং ঘোড়া কেবলমাত্র ইহারাই প্রবল ঝড় এবং বজ্রপাতের পূর্ব্বাভাষ দিতে পারে। আর একটি জিনিস লক্ষ্য করিবার বিষয়—এই সকল পশুপক্ষীরা যে ঝড়-বৃষ্টির পূর্ব্বাভাষ দেয়, তাহা শীত অপেক্ষা গ্রীষ্মকালেই বেশি ঠিক হয়। সুতরাং তোমরা যদি পশুপক্ষী দেখিয়া আবহাওয়া নির্ণয় করিবার ইচ্ছা কর, তবে গ্রীষ্মকালেই তাহা আরম্ভ করিও। সরীসৃপ এবং কীট-পতঙ্গেরাই পরের দিন শুষ্ক বা সুন্দর আবহাওয়া হইবে কি না, তাহার সর্ব্বাপেক্ষা সঠিক বিবরণ দান করিতে পারে। যদি সন্ধ্যাবেলা দেখিতে পাও ঝিঁঝিঁ পোকা উড়িতেছে কিংবা মশার ঝাঁক দল বাঁধিয়া বাতাসে কিংবা গাছের নীচের অন্ধকারে ঝোপে ঝাড়ে উড়িতেছে, তাহা হইলে পরদিন যে বেশ ভাল দিন হইবে, সে বিষয়ে নিঃসন্দেহ থাকিও। এই নিশ্চয়তার কারণ হইতেছে এই যে, বাতাসে জলকণা থাকিলে কীট-পতঙ্গেরা তাহাতে উড়িবার সুবিধা পায় না, কিন্তু শুষ্ক আবহাওয়ায় সহজেই উড়িতে পারে। সেক্সপিয়র এই বিষয় লক্ষ্য করিয়াছিলেন এবং তিনি তাঁহার 'Comedy of Errors' নামক নাটিকাতে লিখিয়াছেন—

"When the sun shines, let foolish
gnats make sport;
But Creep in Crannies, when he
hides his beams."

কীট-পতঙ্গদের ক্ষুদ্র পাখায় পক্ষীদের মত তৈলাক্ত পদার্থ নাই। ঐ তৈলাক্ত পদার্থই কিন্তু পাখীদের বর্ষাতির কাজ করে। তাহা নাই বলিয়াই কীট-পতঙ্গাদি বৃষ্টি হইলে উড়িতে পারে না।

কি ও কেন ?

বাদুড়েরাও পরদিন শুষ্ক এবং সুন্দর রৌদ্রালোকিত হইবে কি না তাহার আভাস দিতে



বাদুড়

পারে, কেন না ইহারা বৃষ্টি পছন্দ করে না এবং উড়িবার সময় ও কীট-পতঙ্গাদি শিকার করিবার কালে জলীয় বাষ্প বাতাসই অধিকতর পছন্দ করে।

এক প্রকার সবুজ গেছো ব্যাঙ্ ফ্রান্স দেশের দক্ষিণাংশে দেখিতে পাওয়া যায়। এগুলিকে এক একটি জীবন্ত ব্যারোমিটার (Barometer) বা বায়ুমান-যন্ত্র বলিলেও ভুল হয় না। ইহাদের কতকগুলিকে যদি ধরিয়া কাচের বাক্সে রাখিয়া দেওয়া যায়, তবে দেখা যায় যে, সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল দিনে ইহারা বাক্সের ভিতরে যে জল আছে, তাহার উপর ভাসিয়া বেড়াইতেছে এবং বৃষ্টির আভাষ পাইবা মাত্রই জলের নীচে আশ্রয় লইয়া গলা ফুলাইয়া গ্যাঙর গ্যাঙ্ শব্দ করিতেছে।

তোমরা সকলেই জান (বিশেষ করিয়া যাহারা পাড়াগাঁয়ে থাক) যে, বর্ষাকালে পুকুর, ডোবা, খাল-বিলের ধারে ব্যাঙদের মহা আসর জমিয়া যায়। এই গাল ফুলো কোলা ব্যাঙের ডাক শুনিলে বৃষ্টি যে সুনিশ্চিত, ইহা তোমরা সকলেই জান এবং প্রত্যক্ষ দেখিয়াছ। ইহা হইল 'কি করিয়া ব্যাঙেরা বৃষ্টির আভাষ দেয়' তাহার কথা, কিন্তু সব চাইতে আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যদি দেখ খুব ঝুপ্ ঝুপ্ করিয়া অনবরত বৃষ্টি হইতেছে, বিরাম নাই—বিশ্রাম নাই এবং পুকুর পাড়ে ব্যাঙের দল বৃষ্টিতে মহা উৎসাহে গান জুড়িয়া দিয়াছে, তবে বুঝিবে শীঘ্রই আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন ঘটিবে। ভাবী আশ্চর্য্য, না? এতদিন আমরা শুধু জানিতাম যে, ব্যাঙ্ রা বৃষ্টির আভাষই কেবল দিতে পারে কিন্তু এখন দেখা যাইতেছে যে, ইহারা বৃষ্টি কখন থামিবে তাহারও সংবাদ রাখে।

জার্ম্মাণীর কোন কোন প্রদেশে ব্যাঙের বদলে একরকম মাছের সাহায্যে আবহাওয়া নির্ণয় করিতে পারা যায়। এই মাছগুলি যখন বৃষ্টির আভাষ পায়, তখন নড়িয়া চড়িয়া পুকুরের জল একেবারে ঘোলা করিয়া দেয়, কিন্তু সুন্দর আবহাওয়ার আভাষ পাইবামাত্র পরিষ্কার নির্ম্মল জলে শান্তভাবে বিচরণ করে। একটা পুরাতন পদ্যে মাছের আবহাওয়া সম্বন্ধে পূর্ব্বাভাষ দিবার ক্ষমতা জানিতে পারা যায়—



ব্যাঙ্ ডাকিতেছে

"When the wind is in the north,
The fishes won't come forth ;

When the wind is in the south,
It blows the bait into fishes' mouth."

এই শ্রেণী হইতে যাহারা একটু অধিক উন্নত, যেমন পক্ষী ইত্যাদি, ইহারাও সুন্দর আবহাওয়ার সৃষ্টি যে কখন হইবে তাহা বলিতে পারে। চাতক পাখীরা যখন আবহাওয়া সুন্দর হইবে বলিয়া বুঝিতে পাবে, তখন অনেক উঁচুতে উঠিয়া উড়িতে থাকে এবং বৃষ্টির আভাষ পাইলে খুব অল্প উঁচুতে উঠিয়া গান করিতে থাকে।

ঘুঘু এবং কবুতরের অনবরত ডাক শুনিলেও বুঝিতে হইবে যে, সুন্দর আবহাওয়া হওয়া একেবারে সুনিশ্চিত। সে যাহাই হোক্ মোটের উপর রৌদ্রালোকিত উজ্জ্বল দিন অপেক্ষা বৃষ্টির পূর্ব্বাভাষ পশুপক্ষীদের আচার-ব্যবহার হইতেই অধিক পরিমাণে অবগত হওয়া যায়। কারণ বেশির ভাগ পশুপক্ষীই বৃষ্টিকে ভয় পায়। গাধা প্রভৃতি জন্তুরাও



গাধা চেঁচাইতেছে

বৃষ্টি হইবে কি না, তাহার পূর্ব্বাভাষ দিতে পারে। এই সম্বন্ধে একটি প্রবাদ রহিয়াছে—

ঐ শোনা যায় গাধার ডাক
বৃষ্টি হবে আজ নির্ঘাৎ!

গাধারা বৃষ্টি হইবে ইহা অনুভব করিতে পারা মাত্র চীৎকার করিয়া লাফাইয়া বাতাস শুঁকিয়া একেবারে অস্থির হইয়া উঠে, কিন্তু রৌদ্রালোকিত উজ্জ্বল শান্ত দিনে মনের আনন্দে শান্তভাবে চলিয়া বেড়ায়। অশ্বও বৃষ্টির পূর্ব্বাভাষ পাইলে পূর্ব্বোক্তরূপ ব্যবহার করিতে থাকে। জন্তুদের এই ব্যবহার দেখিলে মনে হয় যে, ইহারা বৃষ্টির আগমনে বিশেষ আনন্দ উপভোগ করিতেছে না। সম্ভবতঃ তাহাদের উন্মুক্ত শরীরে আবহাওয়ার পরিবর্ত্তন খুব যন্ত্রণাদায়ক বলিয়া মনে হয়। যেমন অনেক বাতের বা বহুদিনের পুরাতন রোগের রোগী বলিয়া থাকে যে, বৃষ্টির দিনে তাহাদের বেদনা বেশি বাড়িয়া যায়, ইহাদেরও বোধ হয় বৃষ্টির দিনে সেইরূপ কষ্ট অনুভূত হয়। আর একটা জিনিস তোমরা লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে যে, বৃষ্টির আভাষ পাইবামাত্র গরু-বাছুর প্রভৃতি কিরূপ অস্থির হইয়া উঠে এবং ক্ষুর দিয়া মাটি খুঁড়িয়া জোরে জোরে হাম্বারব করিতে থাকে। আমাদের গ্রামে এক কৃষকের একটা মস্ত বড় ষাঁড় ছিল। সেটা সুন্দর রৌদ্রোজ্জ্বল শান্তদিনে কাহাকেও কিছু বলিত না, কিন্তু বৃষ্টির দিনে কাহাকেও সামনে দেখিতে পাইলেই শিং নাড়িয়া আক্রমণ করিতে ছুটিত। ইউরোপের পশ্চিম প্রদেশে একটা কবিতা আছে—

"When the cat sleeps on her brain,
We 're sure to have rain."

এই কবিতাটির প্রকৃত অর্থ বোধ হয় এই যে, বৃষ্টির আভাষ পাইলেই বিড়ালীরা তাহাদের মাথার উপর থাবা রাখিয়া শুইয়া পড়ে, কারণ মনে হয় যে, ইহারা কান এবং মাথার সাহায্যেই ঝড়-বৃষ্টি আসিবার আভাষ পায়।

যদি গ্রামের পথে মাঠ দিয়া যাইতে যাইতে দেখিতে পাও ছুঁচোর গর্ত্তে মাঠ ভরিয়া গিয়াছে, তবে বুঝিবে যে, বৃষ্টি সুনিশ্চিত। কেন না বৃষ্টির পূর্ব্বাভাষ পাইবামাত্র ছুঁচোরা অতি ব্যস্ততা সহকারে তাহাদের গৃহ-নির্ম্মাণে মনোযোগ প্রদান করিবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া যায়। খুব সম্ভব ইহারা যে কেঁচো ইত্যাদি খায়, তাহা বর্ষার দিনেই মাঠে দেখিতে পাওয়া যায় বলিয়া ইহারা এত ব্যস্ত হইয়া পড়ে। কেঁচোরা শুক্‌নো মাটির অপেক্ষা ভিজা পিছল পথে চলিবার সুবিধা পায় বলিয়া এই সময় তাহাদের অধিক দেখিতে পাওয়া যায়।

উইপোকারাও বৃষ্টির পূর্ব্বাভাষ পাইলে অতি ব্যস্ত হইয়া গৃহ-সংস্কারে মনোযোগ প্রদান করে এবং মৌমাছিরা বেশি দূর উড়িবার পরিবর্ত্তে তাহাদের চাকের কাছাকাছিই উড়িতে থাকে।

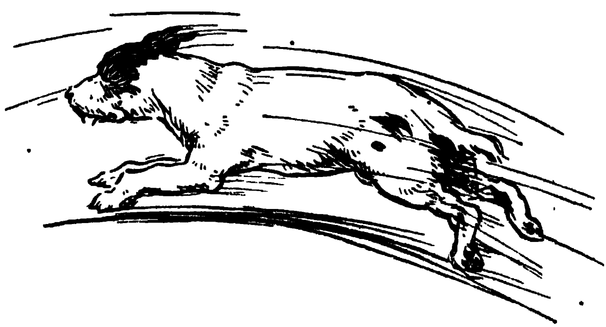


বিড়ালী বৃষ্টির খবর জানিয়াছে

ইহাদের এই সকল লক্ষণ হইতে আসন্ন বৃষ্টির পূর্ব্বাভাস অতি সহজেই বুঝিতে পারা যায়।

এই পর্য্যন্ত যাহাদের কথা বলিলাম, তাহারা সকলেই বৃষ্টি কখন হইবে, তাহা বেশ বুঝিতে পারে কিন্তু ঝড় ও বজ্রপাতের পূর্ব্বাভাষ দিবার ক্ষমতা ইহাদের কাহারও নাই। কেবলমাত্র বিড়াল, কুকুর, অশ্ব ইত্যাদি জন্তুরাই ঝড়ের পূর্ব্বাভাষ দিতে পারে। বিড়ালেরা যখন ঝড় আসিবে বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন অসাধারণ চঞ্চল হইয়া উঠে এবং গৃহের কোণে লুকাইবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়ে। যখন ঝড় এবং বজ্রপাত আরম্ভ হয়, তখন ঘরের এক কোণে গিয়া জড়সড় হইয়া বসিয়া কাঁপিতে থাকে। কুকুরেরা ঠিক ঝড়ের পূর্ব্বাবস্থায় চক্রাকারে ঘুরিয়া দৌড়াইতে থাকে এবং অদ্ভুত রকম অস্থিরতা প্রকাশ করে। তারপর যখন ঝড় আরম্ভ হয়, তখন প্রভু এবং প্রভু-পত্নীর পায়ের কাছে মাথা লুকাইয়া শান্ত হইয়া পড়িয়া থাকিতে ভালবাসে! ইহাদের এইরূপ অদ্ভুত আচরণের অর্থ হইতেছে যে, খুব সম্ভব ইহাদের পূর্ব্বপুরুষগণ যখন বন্য-অবস্থায় ছিল, তখন ঝড়ে বড় বড় গাছ চাপা পড়িয়া মারা যাইত বলিয়া ঝড়ের আগমনের পূর্ব্ব হইতেই আত্মরক্ষা করিবার চেষ্টা করিত। এখন যদিও তাহার দরকার নাই, কিন্তু ইহাদের মধ্যে সেই বহু পুরাতন পূর্ব্বপুরুষদের অনুভব-শক্তি রহিয়া গিয়াছে।

এইখানে কুকুরেরা ঝড়-বৃষ্টির আভাষ পূর্ব্ব হইতে কিরূপে পাইয়া থাকে, সে বিষয়ে একটি সত্য গল্প বলিতেছি। একবার পাঞ্জাবের লুধিয়ানা প্রদেশে একটি মেলা বসিয়াছিল। মেলায় অনেক দূর হইতেও লোক আসিয়াছিল এবং তাহারা কয়েকদিন সেখানে থাকিয়া আমোদ-প্রমোদের পর আবার বাড়ি ফিরিয়া যাইবার জন্য প্রস্তুত ছিল। এই সকল লোক রাতে যেখানে সেখানে গাছের তলায় পড়িয়া রাত কাটাইয়া দিত। এইরূপ একদল লোক একদিন রাত্রে একটা নিম গাছের তলায় রাত্রি কাটাইবার বন্দোবস্ত করিল। তাহারা সংখ্যায় প্রায় ১২।১৪ জন ছিল এবং সেই গাছের নীচে তাহারা ছাড়া একটি কুকুরীও তাহার বাচ্চা সমেত আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। সেদিন বড় গুমোট করিয়াছিল এবং তাহারা বহুক্ষণ এপাশ ওপাশ করিবার পর সকলেই নিশ্চিন্তভাবে একে একে নিদ্রার কোলে ঢলিয়া পড়িল।



কুকুর চক্রাকারে ঘুরিতেছে

মধ্য রাত্রে হঠাৎ কুকুরটির তারস্বরে তাহারা জাগিয়া উঠিল এবং দেখিল যে কুকুরটি তাহার

ছানাগুলি সেই গাছের নীচে হইতে সরাইয়া লইয়া গিয়াছে এবং অদ্ভুত ভাবে চেঁচাইতেছে ও আকাশে ঘন ঘটা করিয়া ঝড় আসিবার লক্ষণ দেখা যাইতেছে।

তাহারা প্রথমে কুকুরটির অদ্ভুত ব্যবহারে হতভম্ব হইয়া গেল কিন্তু পরে নিজেদের মধ্যে সিদ্ধান্ত করিয়া লইল যে, নিশ্চয়ই কুকুরটি নিম গাছের কাছে কোন সাপ দেখিয়াছে, তাই ওরূপ করিতেছে। সুতরাং তাহারা ভয়ে ভয়ে তল্পি-তল্পা গুটাইয়া সে গাছের নীচ হইতে সরিয়া আসিল।

কিন্তু কি আশ্চর্য্য, তাহারা গাছের নীচ হইতে চলিয়া আসিবার তিন-চার মিনিট পরেই সেখানে ঘোর রবে বজ্রপাত হইল এবং দেখিতে দেখিতে গাছটি ভস্মীভূত হইয়া গেল। তখন সকলেই বুঝিতে পারিল, কুকুরটি ওরূপ করিতেছিল কেন। এই গল্পটি হইতে তোমরা বুঝিতে পারিতেছ যে, কুকুর যে ঝড়-বৃষ্টি ও বজ্রপাতের পূর্ব্বাভাষ জানিতে পারে, তাহা কাল্পনিক নহে। এই সংবাদটি এলাহাবাদের 'Leader' নামক একখানা দৈনিক কাগজে (১৫ই জুলাই, ১৯৩৫) প্রকাশিত হইয়াছিল।

ঝড়ের সময় পাখীরাও খুব অস্থিরতা প্রকাশ করে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে দেখা যায় যে, ঝড়ের অনতিকাল পূর্ব্ব হইতেই দলে দলে পাখীরা ডানা মেলিয়া পর্ব্বত হইতে পর্ব্বতান্তরে উড়িয়া যাইতেছে। ঝড়ের সময় দাঁড়াকাকদের প্রায়ই সজোরে ডানা ঝটপট্ করিতে দেখা যায়।

মোটের উপর মনে হয় যে, তোমরা যদি সব সময় আবহাওয়া নিরূপণ-যন্ত্রের অপেক্ষায় না থাকিয়া প্রকৃতির এই সকল জীবন্ত ব্যারোমিটারের প্রতি অধিক লক্ষ্য রাখ, তাহা হইলে তোমরাও অতি সহজেই আবহাওয়া সম্বন্ধে এক একজন ভবিষ্যদ্বক্তা হইয়া উঠিতে পারিবে।

আমাদের দেশের সাধারণ কৃষকেরা, নৌকার মাঝিরা, গ্রাম্য পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা আকাশের দিকে তাকাইয়া এবং মেঘের অবস্থা দেখিয়া ঝড় ও বৃষ্টির অবস্থা বুঝিতে পারে। ডাকের বচন, খনার বচন—এই সকল প্রচলিত শ্লোক হইতেও আবহাওয়ার পূর্ব্বাভাষ জানা যায়। তোমরা আকাশের মেঘের দিকে যদি লক্ষ্য কর, তাহা হইলে কোন্ মেঘ হইতে বৃষ্টি হইবে বুঝিতে পারিবে। এইরূপ প্রাকৃতিক শিক্ষা যেমন কৌতূহলোদ্দীপক তেমন আনন্দদায়ক।



দাঁড়কাকেরা পাখা ঝটপট্ করিতেছে



4—07図



প্রথম পরিচয়

ইংরেজীতে এই বিদ্যার নাম Oceanography। পুরাকালে মহাসমুদ্রের বিষয়ে বেশী কিছু জানা ছিল না। একে ত সে রকম মজবুত ও বড় জাহাজের অভাবে খোলা সমুদ্রে যাতায়াত কঠিন ছিল, তায় আবার অজ্ঞেয় সাগর-গর্ভের অবস্থা ভাল করে পরীক্ষা করবার বা সব জিনিস মাপ-জোখ করে দেখবার উপযোগী যন্ত্রাদিও ছিল না। অবশ্য তীরের কাছে অল্প জলে ভাসমান প্রাণী ও উদ্ভিদের সঙ্গে মানুষের পরিচয় অনেক কাল থেকেই আছে। সেই রকম বেলাভূমির উপর ঢেউয়ে ভেসে এসে পড়েছে এমন শৈবাল জাতীয় আগাছা, জেলীমাছ, নানারকম তারামাছ, ঝিনুক শামুক জাতীয় শক্ত খোসাওয়ালা নানা জলজ প্রাণী, এ সবও মানুষ দেখছে সেই আদিম কাল থেকে। বড় জীবের মধ্যে তিমি-মাছ কাচ্চা-বাচ্চা নিয়ে জলের উপর খেলা করতে আসে তীরের খুব কাছাকাছি, পাঁচ মাইলের মধ্যে। কখন কখন এক একটা প্রকাণ্ড মরা তিমি ভেসে এসে লাগে জলের কিনারায়। তাই মানুষের সঙ্গে তিমির পরিচয়ও খুব পুরানো। অক্টোপাস্ নামে যে আটদশটা শুঁড়ওয়ালা অদ্ভুত সমুদ্রের জীব আছে, তার সঙ্গেও প্রাচীন গ্রীক ও মিসরীদের, এমন কি আদিম অসভ্য মানবের, চেনা-শুনো ছিল। কেন না এই অক্টোপাস্ কিনারার কাছে ছয় ফুট জলে পর্য্যন্ত আসা যাওয়া করে। কিন্তু এই সব সত্যিকার জীবজন্তুর সঙ্গে সঙ্গে সেকালের লোকে আবার কত রকম কাল্পনিক রাক্ষুসে বা অর্দ্ধ-মানব জানোয়ারের অস্তিত্বেও বিশ্বাস করতেন। সে সব অত্যদ্ভুত নক্র-কুম্ভীর, Mermaid, Harpy, Sea-Serpent কখনও যে সমুদ্রে যথার্থ ছিল, তা মনে করবার কোন কারণ নেই। এখনকার কালের জলজন্তু যে কেউ মানুষের মত কথা কয় না, বা মানুষের মত অবয়বধারী নয়, এটা নিশ্চিত।

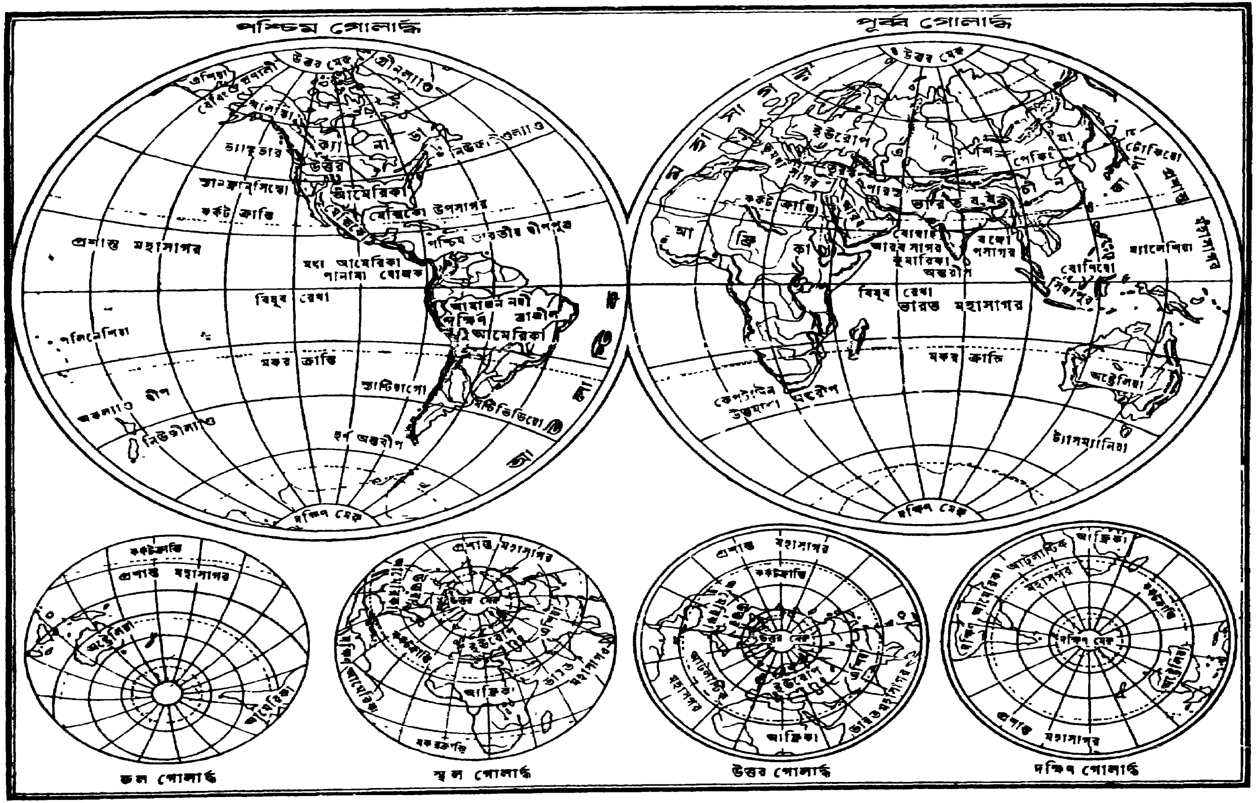
লঙ্কাদ্বীপের কাছে কি পারস্য সাগরে ডুবুরীরা বহুকাল যাবৎ সমুদ্রতল হতে মুক্তার জন্য ঝিনুক তুলে আনছিল বটে। কিন্তু তাহাদের ত কোন যন্ত্রপাতি ছিল না, তাই তারা অতি অল্প সময় মাত্র জলে ডুবে থাকতে

পারত। উপরন্তু তারা বেশীর ভাগই ছিল নিরক্ষর জেলে-মালা, কোনও ক্রমে নিজের কাজটা সেরে উপরে ভেসে উঠত। জলের মধ্যে যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চার্য্য জিনিস তাদের নজরে পড়ত, তা তারা লক্ষ্য করে দেখতও না, সে গুলো বর্ণনা করার ক্ষমতাও তাদের ছিল না। এই ভাবে মধ্যযুগের শেষ পর্য্যন্ত কেটে গেল। সাগর সম্বন্ধে মানুষের ধারণা সেই প্রাচীন যুগের মতই অদ্ভুত রয়ে গেল। পঞ্চদশ শতকে যখন বড় বড় সমুদ্রগামী জাহাজ তৈরী হতে লাগল, যখন কলম্বস্, ভাস্কো দা গামা, কেবট্, ড্রেক প্রভৃতির মত অসমসাহসিক নাবিকেরা মহা-সমুদ্রে পাড়ি দিতে সুরু করলেন, তখন জলের উপরকার ঢেউ, স্রোত, জোয়ার-ভাটা, মৌসুমী ঝড় ইত্যাদি নানা ব্যাপারের দিকে মানুষের বেশী করে নজর যেতে লাগল। কারণ এ সব বিষয়ে জ্ঞান না থাকলে খোলা দরিয়াতে জাহাজ চালান অসম্ভব। তারপর ক্রমশঃ ডুবুরীদের পোষাক, টুপী, মুখোসের উদ্ভব হল। জলের ভিতর অক্সিজেন-সাহায্যে তাদের শ্বাস-প্রশ্বাস নেওয়ার ব্যবস্থা হল। তখন তারা সমুদ্রগর্ভের জীব-জন্তু, গাছ-পালা, পাহাড়-পর্ব্বত সব নজর করে দেখবার অবকাশ পেলে। ততদিনে তাপ-মান, চাপ-মান যন্ত্রাদিও তৈরী হয়েছে, অতি সূক্ষ্ম পদার্থ-কণা ও জীবাণু পরীক্ষা করার উপযোগী অণুবীক্ষণ যন্ত্রও আবিষ্কার হয়েছে। ক্রমে শিক্ষিত লোকও ডুবুরীর সাজ-সরঞ্জাম নিয়ে সাগর জলে ডুব দিতে আরম্ভ করলে, মুক্তা তোলার জন্য নয়, সমুদ্রতল পর্য্যবেক্ষণ করার জন্য। কত কি সুন্দর সুন্দর আশ্চার্য্য আশ্চর্য্য জিনিস তারা তুলে আনতে লাগল!

উনিশ শতক পর্য্যন্ত সমুদ্র-তলের সঙ্গে মানুষের কত দূর পরিচয় হয়েছিল, তার কতকটা ধারণা হবে তোমরা যদি বিখ্যাত ফরাসী লেখক জুল ভার্ণ-এর একখানি উপন্যাস পড়—'সাগর-গর্ভে বিশ হাজার লীগ'। বইখানি তোমাদের সবায়ের পড়া উচিত। পড়লে সমুদ্র সম্বন্ধে মনে একটা কৌতূহল জাগবে, এ বিষয়ে আরও জানতে চাইবে। অবশ্য ভুললে চলবে না, যে উপন্যাস পড়ছ। কেন না ওতে সত্যের আভাস যেমন আছে, কাল্পনিক ব্যাপারও তেমনি অনেক কিছুই আছে। কাপ্তান নেমো বলে এক ব্যক্তি সংসারের উপর, আত্মীয় স্বজনের উপর, বিরক্ত হয়ে এক ডুবুরী জাহাজ তৈরী করে তাইতে সমুদ্রগর্ভে ঘুরে বেড়ান। তিনি ডাঙ্গার সঙ্গে কোন সংস্রব রাখেন না। খাবার জিনিস ও নিজেদের প্রয়োজনীয় অপর জিনিস সমস্তই সংগ্রহ করেন সমুদ্র থেকে। কত রকম মাছ ও জলজন্তুর বর্ণনা যে আছে ওই বইখানাতে! কত জলজ গাছ-পালার নাম যে শিখবে তোমরা! জাহাজখানার নামও তেমনি—নটিলস্! এই নটিলস সমুদ্র-তলের এক অদ্ভুত দর্শন জানোয়ার। বড় বড় জ্বলজ্বলে চোখ, অক্টোপাসের মত মাথার চারিদিকে গোটা দশেক লম্বা লম্বা শুঁড়। সাধারণতঃ দেহটাকে সঙ্কুচিত করে লুকিয়ে রাখে তার খোসার ভেতর। যখন সাঁতার দেয়, খোসাটা দেহের নীচে নীচে চলে ঠিক যেন একখানি সুন্দর ছোট্ট নৌকা! এই নটীলস্ সম্বন্ধে সে কালের আরিষ্টটল থেকে একালের বায়রন, পোপ, হোম্‌স্ অবধি কত সুন্দর সুন্দর কবিতা লিখে গেছেন। দুই একটা নমুনা না দিয়ে থাকতে পারছি না। যারা ইংরাজী জান, পড়লেই বুঝতে পারবে।

The tender Nautilus
who steers his prow
The sea-born sailor
of his shell canoe.

—Byron


পশ্চিম গোলার্দ্ধ
পূর্ব্ব গোলার্দ্ধ
উত্তর মেরু
দক্ষিণ মেরু
প্রশান্ত মহাসাগর
বিষুব রেখা
মকর ক্রান্তি
কর্কট ক্রান্তি
মধ্য আমেরিকা
পানামা যোজক
উত্তর আমেরিকা
দক্ষিণ আমেরিকা
আমাজন নদী
ব্রাজীল
মেক্সিকো উপসাগর
পশ্চিম ভারতীয় দ্বীপপুঞ্জ
গ্রীনল্যাণ্ড
নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড
নিউজীল্যাণ্ড
হর্ণ অন্তরীপ
ইউরোপ
আফ্রিকা
ভারত মহাসাগর
আরব সাগর
বঙ্গোপসাগর
কুমারিকা অন্তরীপ
অষ্ট্রেলিয়া
ট্যাসম্যানিয়া
বোর্ণিও
সিঙ্গাপুর
পেকিং
টোকিও
বোম্বাই
উত্তমাশা অন্তরীপ
জল গোলার্দ্ধ
স্থল গোলার্দ্ধ
উত্তর গোলার্দ্ধ
দক্ষিণ গোলার্দ্ধ

পৃথিবীর মানচিত্র

This is the ship of pearl,
which poets feign,
Sails the unshadowed main.—
The venturous bark that flings,
On the sweet summer
wind its purpled wings,
In gulfs enchanted,
where the siren sings,
And coral reefs lie bare,
Where the cold sea-maids
rise to sun their
streaming hair.
—Holmes

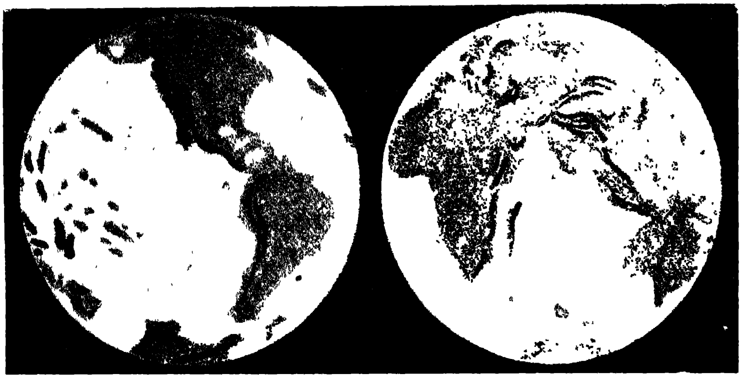
কাপ্তান নেমো, যখন ইচ্ছা হয়, ডুবুরীর পোষাক পরে বেড়াতে বেরোন সমুদ্র-তলের পাহাড়ে, ময়দানে। মরজী হলে শিকার খেলতে যান সাগর-গর্ভের বন-জঙ্গলে। তোমদেরও যেতে ইচ্ছে করে না? অন্তত: একবার বইখানা সংহগ্র করে পড়ে নিও বাঙ্গলা তরজমার নাম 'সাগরিকা। তাহলে সাগরতত্ত্বের কথা আমি যা বলছি তা বুঝতেও পারবে, ভালও লাগবে।

সমুদ্রবাসী জীব-জন্তু ও জলজ গাছপালা সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক গবেষণার সূত্রপাত করে-ছিলেন পণ্ডিতবর ডারউইন। তিনি ১৮৩১ হতে ১৮৩৬ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত পাঁচ বছর Beagle নামে এক জাহাজে সমুদ্রে সমুদ্রে ঘুরেছিলেন এই বিষয়ে ও অন্য নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করবার জন্য। এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে (১৮৭৩) চ্যালেঞ্জার (Challenger) নামে এক জাহাজে আর এক দল পণ্ডিত, নানা বিদ্যায় পারদর্শী, তাঁদের সব যন্ত্রপাতি নিয়ে সমুদ্র বিজয়ে বেরোলেন। তাঁরা তিন বছর ধরে দেশ-বিদেশে ঘুরে নানা দ্রব্য সংগ্রহ করে, সাগর সম্বন্ধে প্রভূত জ্ঞান সঞ্চয় ক'রে, যখন দেশে ফিরলেন, তখন তাঁরা 'চ্যালেঞ্জার সোসায়টি বলে এক স্থায়ী সমিতি স্থাপন করিলেন। এই সমিতির বিষেশ কাজ হল সাগর-তত্ত্বের গভীর চর্চ্চা। আরও কয়েক বছর গেল। বর্ত্তমান শতকের আরম্ভে মোনাকো। সংস্থানের রাজা অগাধ খরচপাত্র করে, Princesse Alice নামেএক জাহাজ যন্ত্র-তন্ত্রে সাজিয়া বার করলেন ওই একই উদ্দেশ্য সাধনের জন্য। তাঁর জাহাজ যে সমস্ত আশ্চর্য্য আশ্চর্য্য দ্রব্য সংগ্রহ করে নিয়ে এল সমুদ্রগর্ভ থেকে, তা তিনি আপন রাজধানীতে এক সুন্দর নূতন যাদুঘর তৈরী করে তাইতে সযত্নে সাজিয়ে রাখলেন। ডার-উইনের Beagle-এ ভ্রমণ, Challenger-এর সমুদ্র-প্রবাস, তার পর Blake নামক এক জাহাজের তিন বার সাগর পরিক্রমণ, সব শেষ মোনাকো রাজের প্রচেষ্টা, এর ফলে আমাদের সাগর বিষয়ে জ্ঞান অনেক এগিয়ে গেছে। সে সম্বন্ধে তোমাদের কতকটা ধারণা থাকা উচিত। তোমরা আজ একটা নিতান্ত অকেজো ঘুমন্ত জাতের ছেলে মেয়ে। নইলে বলতাম যে, তোমরাও বড় হয়ে মহাসাগরে পাড়ি জমাবে, কত নূতন তথ্য সংগ্রহ করে আনবে। তবে কে জানে আজ যে ঘুমোচ্ছে, কাল হয়ত সে জাগবে! হয়ত একদিন তোমাদেরও চ্যালেঞ্জার বেরোবে সমুদ্রের গুপ্ত নিধির সন্ধানে।

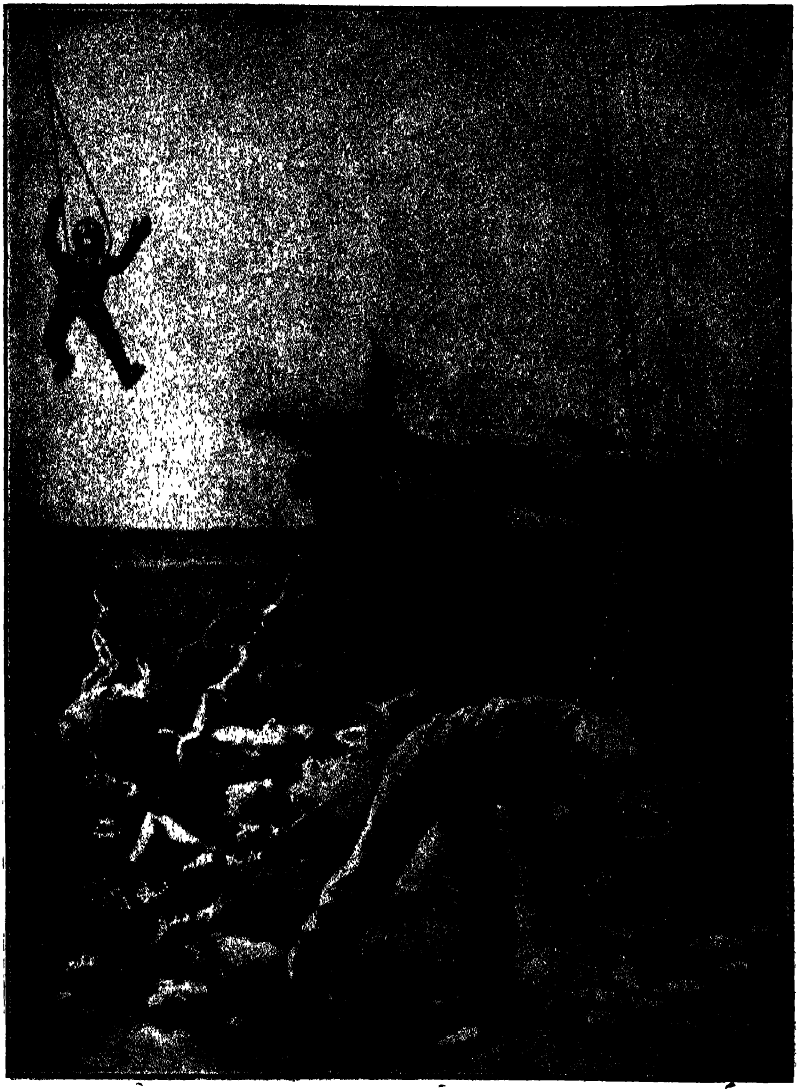
এখনকার দিনে সমুদ্রের জীবজন্তু ও গাছ-পালার সঙ্গে পরিচয় করা আগের চেয়ে অনেক সহজ হয়েছে। প্রথমতঃ এ সম্বন্ধে নানা রকম বই বেরিয়েছে—সুন্দর সুন্দর ছবিতে ভরা। তোমরা ইংরেজী, ফরাসী, শিখলেই সে সব বই পড়তে পারবে। তার পর পৃথিবীর সকল সভ্য দেশেই আজকাল লোকশিক্ষার জন্য Aquarium তৈরী করা হয়েছে। আমাদের ভারতবর্ষেও একটা আছে—মাদ্রাজে। এই Aquarium এক প্রকাণ্ড চৌবাচ্চা, সমুদ্রের জলে ভরা। তার চরিদিকে স্বচ্ছ কাচ। ভেতরে আলো দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। জলে ভেসে

বেড়াচ্ছে কত কত সামুদ্রিক জীব। তলায় রকম রকমের জলজ গাছ আগাছা। তোমরা যদি মাদ্রাজে যাও ত একবার দেখো। তা ছাড়া ডুবুরী জাহাজ, যা জুল ভার্ণ-এর আমলে স্বপ্নমাত্র ছিল, তা আজ সত্য হয়েছে। এমন দিন আসবে যখন লোকে টিকিট কিনে ডুবুরী জাহাজে যাতায়াত করতে পারবে। হয়ত তোমরাই সে দিন দেখবে। তখন সমুদ্রের দৃশ্য আর কেতাবে বা Aquarium-এ দেখতে হবে না।

তোমরা নিশ্চয় জান যে, সারা পৃথিবী জুড়ে রয়েছে এক অখণ্ড মহাসমুদ্র। আট-লান্টিক, প্রশান্ত, ভারত, উত্তর, দক্ষিণ, নামে যে সব মহাসাগর ম্যাপে দেখ, তারা পরস্পর জোড়া, অবিচ্ছিন্ন। এই যে বিশাল জলরাশি, ভূবিদ্যায় এর নাম দেওয়া হয়েছে Hydrosphere বা বারিমণ্ডল। এই বারিমণ্ডল সমস্ত পৃথিবীর সাত ভাগের পাঁচ ভাগ। এর অধিকাংশটা রয়েছে দক্ষিণ মেরুর মহাদেশকে ঘিরে। তোমার গ্লোবটাকে একটু তেরচা করে কেটে যদি দুই ভাগ করা যায় ত দেখবে যে, দক্ষিণ ভাগে মেরুপ্রদেশ ও অষ্ট্রেলিয়া ছাড়া আর ডাঙ্গা নেই বললেই হয়। এরকম ভাবে ডাঙ্গা ও জল যে কেন সাজান রয়েছে, তা বলা যায় না। তবে এটা মনে রাখতে হবে যে, চিরদিন কিছু সাত ভাগের পাঁচ ভাগ জল ছিল না। প্রাচীনেরা বিশ্বাস করতেন যে, সৃষ্টির আদিতে সারা ভূমণ্ডল জলময় ছিল। বৈজ্ঞানিকেরাও এ কথার প্রতিবাদ করেন নাই। পৃথিবী যে প্রারম্ভে জ্বলন্ত বাষ্পমণ্ডল ছিল এ বিষয়ে মতভেদ নেই। বাষ্প জুড়িয়ে জমাট বাঁধলে প্রথমতঃ তরল, জলীয় পদার্থ হবেই। তার পর আরও জুড়িয়ে, তারও জমাট বাঁধলে হবে কঠিন পদার্থ। এখন তোমরা যদি মনে রাখ যে, আমাদের পৃথিবী সারাক্ষণ ভীষণ বেগে চরকী-পাক দিচ্ছে, তা হলেই বুঝবে যে তার জমাট বাঁধা ব্যাপারটা সব জায়গায় সমান ভাবে হতে পারে না। ইস্ক্রুপের প্যাঁচের মত অসমান ভাবে জমাট বাঁধাই স্বাভাবিক। হয়েছিলও তাই। এই অসমান জমাট বাঁধার দরুন জল-স্থলের উদ্ভব। তার পর এমন ত নয় যে, আদি যুগ থেকে জল আর ডাঙ্গা যেমনকার তেমনি রয়েছে।



অখণ্ড মহাসমুদ্রের বুকে স্থলভাগের সৃষ্টি



এই চিত্রে দুইজন ডুবুরী দেখিতে পাইতেছ। একজন ডুবুরী সমুদ্রজলে নীচে নামিয়া আসিতেছে, অন্যজন সমুদ্রতলে মুক্তা, প্রবাল, স্পঞ্জ ইত্যাদির অনুসন্ধান করিতেছে। অনেক সময় ডুবুরীরা ১৫০ শত ফিট হইতে ২০০ শত ফিট গভীর জলে নামিয়া আসে। ডুবো-জাহাজ হইতেও ডুবুরীরা ধন-রত্ন উদ্ধার করে। একটি স্পেনীয় ডুবো-জাহাজ হইতে একবার ডুবুরীরা ১,০০,০০০ পাউণ্ড মূল্যের স্বর্ণ উদ্ধার করিয়াছিল।

কত ডাঙ্গা জল হয়ে গেছে, কত জল ডাঙ্গা হয়ে গেছে! ভূগর্ভ ত আজও পুরোপুরি কঠিন হয়ে যায় নাই, তার আগুনের ঠেলায় এই সব বিপর্য্যয় ক্রমাগতই হচ্ছে। ধর, যেমন বিখ্যাত গণ্ডোয়ানা যুগে সমুদ্রভাগ এখনকার চেয়ে অনেক কম ছিল, ডাঙ্গা অনেক বেশী ছিল। অতএব তোমরা এইটুকু মনে রেখো যে, জল-স্থলের যে ভাগ তোমরা আজ দেখছ, তা চিরন্তন নয়।

পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, সমুদ্রের আয়তন নানা কারণে ধীরে ধীরে কমে যাচ্ছে। কিন্তু সে এত ধীরে ধীরে যে, সেজন্য তোমাদের কোনও ভয়-ভাবনার কারণ নেই। এখনও বহু যুগ এই ভূমণ্ডল নর-নারী, পশু-পক্ষী, কীট-পতঙ্গের আবাসস্থল থাকবে। এই যে বললাম সমুদ্রের আয়তন কমে যাচ্ছে, এর থেকে তোমরা যেন মনে কোরো না যে, সাগরের জল শুকিয়ে যাচ্ছে। সাগরের জল শুকিয়ে যাবে কোথায়? বাষ্প হয়ে আকাশে উঠবে বটে, কিন্তু সেখানেও ত তার থাকবার উপায় নেই। প্রথম জমে মেঘ হবে, তার পর বৃষ্টি তুষার হয়ে এই পৃথিবীতেই পড়বে, আর পৃথিবীর যেখানেই পড়ুক, তাকে গড়িয়ে গিয়ে শেষ পর্য্যন্ত মহাসমুদ্রে মিশতেই হবে।

ভূ-বিদ্যা পড়বার সময় তোমরা শিখেছ যে, এই বৃষ্টির জল সমুদ্রের পানে যেতে যেতে নানা জিনিস সঙ্গে নিয়ে যায়। ডাঙ্গা ধুয়ে বালি-কাদা কাঁকর তো বয়ে নিয়ে যায়ই। উপরন্তু বড় ছোট কত পাথর, শুধু নুড়ী নয় চাঙ্গড়া পর্য্যন্ত, গড়াতে গড়াতে ঠেলতে ঠেলতে নিয়ে গিয়ে সমুদ্রে ঢেলে দেয়। এই সমস্ত পদার্থ, যা জলের টানে এসে সমুদ্রে পড়ে, সেগুলো কিছু বেলা-ভূমির উপরেই পড়ে থাকে না। সেমু আপন জোরে সেগুলোকে টেনে দিয়ে দু-তিনশো ক্রোশ অবধি জলের তলায় বিছিয়ে দেয়। এ সব তোমাদের কাছে পুরানো কথা। ক্ষিতিমণ্ডলের এই ভাঙ্গা-গড়ার ব্যাপার এখানে আবার বর্ণনা করে কোন ফল নেই। সমুদ্র-তলটা কি রকম দেখতে, সেখানে কি কি আছে, এ সকল কথা পরে বলব।

আপাততঃ সমুদ্রের জলের কথা বলি, শোন। এ জলে আছে কি? খেলে তৃষ্ণা মেটে না। স্নান করতে করতে একটু পেটে গেলে তখনই আবার পেট থেকে বেরিয়ে আসে। এর স্বাদ অত্যন্ত নোনা, একটু একটু তেতো। নদীর জলে, কুয়োর জলে, পুকুরের জলে তো কই এ রকম হয় না। ছেঁকে নাও, ফিল্টার করে নাও, কোন তফাৎ হবে না, যেমনকার তেমনি বিস্বাদ থাকবে। তাহলে বুঝতে হবে যে, কাদা মাটি ছাড়াও আর কিছু এর মধ্যে আছে। শুধু আছে তা নয়, জলে একেবারে গোলা রয়েছে। সমুদ্রের জল খানিকটা নিয়ে যদি ফোটাও তাহলে জলটা সব মরে গেলে দেখতে পাবে যে, সাদা সাদা কিসের দানা পড়ে আছে। এই সাদা পদার্থটা অধিকাংশ আমাদের নিত্যকার খাদ্যদ্রব্য নুন। তাছাড়া আরও অন্য অনেক রকমের লবণ এই জলে আছে। পণ্ডিতেরা পরীক্ষা করে স্থির করেছেন যে, হাজার ভাগ সাগর-জলে পঁয়ত্রিশ ভাগ লবণ আছে। আর এই পঁয়ত্রিশ ভাগের মধ্যে সাতাশ ভাগ আমাদের খাবার নুন—রসায়নে যার নাম সোডিয়ম ক্লোরাইড। বাকী আট ভাগের মধ্যে এক রকম চা-খড়ির মত লবণ আছে, যার নাম তোমাদের জানা উচিত—কেল্‌সিয়াম বাই-কার্ব্বনেট। প্রবাল কীট ও অন্য নানা রকম (ঝিনুক-শামুক জাতীয়) সমুদ্রের জীব জল থেকে এই লবণ টেনে নেয়, তাদের শরীর

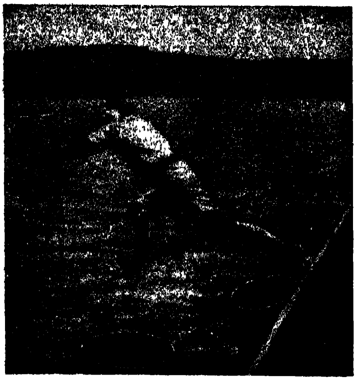
গঠনের সাহায্য হবে বলে। আমাদের এক সেকেলে কথা আছে, 'যা নেই ভারতে (মহাভারতে), তা নেই ভারতে।' তোমরা সমুদ্র সম্বন্ধেও বলতে পার, 'যা নেই সাগরে, তা নেই জগতে।' সাগরের জলে পণ্ডিতেরা মেগনিসিয়া, লোহা, চুন, গন্ধক, পটাশ, এমোনিয়া, তামা, চাঁদি এমন কি সোনা পর্য্যন্ত পেয়েছেন। সোনা খুব অল্প পরিমাণে আছে বটে, কিন্তু তবুও যদি মহাসাগরের সব সোনা বার করে একত্র করা যেত ত তার ওজন হত প্রায় একশো কোটী টন। একবার মার্কিন দেশের এক দল জুয়াচোরের মাথায় এক ফিকির এল লোক ঠকিয়ে টাকা রোজগার করার। তারা এক জাল কারবার ফেঁদে বসল। সর্ব্বত্র প্রচার করলে যে, সাগরের জল থেকে অজস্র সোনা সংগ্রহ করবার এক সহজ উপায় তারা আবিষ্কার করেছে। বোকা হাবার ত জগতে অভাব নেই! সমুদ্রে সোনা আছে এ কথা তো বৈজ্ঞানিকেরাই বলেন। এখন যদি সেই সোনা সহজে বের করা যায়, তাহলে ত রাতারাতি বড় মানুষ! বহুলোক কোম্পানীর শেয়ার কিনতে ছুটল। একটা হৈ হৈ পড়ে গেল। কোম্পানীর অপিসে খানিকটা কাঁচা সোনা রাখা ছিল। সবাইকে সেইটে দেখিয়ে বলা হত, এই সোনা আমাদের মেইন্ উপকূলের গুপ্ত কারখানাতে জল থেকে বের করা হয়েছে। জুয়াচোরের দল কিছুদিন বেশ টাকা লুটলে, কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত ধরা পড়ে গেল। লোকে তখন বুঝতে পারলে যে, সাগরে সোনা আছে বটে, কিন্তু সে সোনা এত কম যে বের করার মজুরী পোষায় না।

এই যে সমুদ্রের লবণ, এ এল কোথা থেকে, বলতে পার? আসবে আর কোথা থেকে, ক্ষিতি মণ্ডলেরই দান! আদিম যুগে যখন প্রথম হাইড্রজেন ও অক্সিজেন মিলে জলের উৎপত্তি হল, আর সেই জল পৃথিবীর সমস্ত নীচু জায়গায় ভরে গেল, তখন সেই সেই জায়গার মাটিতে যে লবণ ছিল, তা জলে গলে মিশে গেল। প্রথম নোনা জলের সূত্রপাত হল। তখন থেকে আজ পর্য্যন্ত যত জল নদী বেয়ে পড়ছে, সব জলই ডাঙ্গা থেকে একটু একটু লবণ গলিয়ে সঙ্গে নিয়ে আসছে, সে লবণ এত অল্প যে, নদীর জল মুখে দিলে ধরা পড়ে না। কিন্তু কম হলে কি হয়, সমুদ্রের লবণরস যে এই ভাবে তিলে তিলে বেড়ে উঠছে, তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। যখন খুব বেড়ে উঠবে, তখন নানা অনর্থ ঘটবে। কিন্তু সেদিন এখনও বহুদূরে।

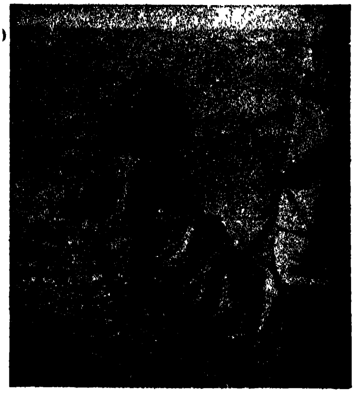
উপরে তোমাদের বলেছি যে, সাগর জলে লবণের পরিমাণ হাজার-করা পঁয়ত্রিশ। এটা সরাসরি হিসাব। কোথাও এর চেয়ে বেশী, কোথাও বা কম। দুই মেরুর লাগা সমুদ্র, যেখানে ঠাণ্ডার দরুন জল বেশী শুকোয় না, সেখানে লবণ কম। আবার কৃষ্ণসাগর ও বল্টিকের মত ডাঙ্গায় ঘেরা সমুদ্র, যেখানে শীতের জন্য জলও তেমন শুকোচ্ছে না, উপরন্তু চারিদিক থেকে নানা নদ-নদী নূতন জল ঢালছে, সেখানে লবণের ভাগ আরও কম। সব চেয়ে লবণ বেশী উত্তরায়ণ ও দক্ষিণাযনের কাছাকাছি অনেক জায়গায়, যেখানে সমুদ্র কিনারা অবধি মরুভূমি এসে পড়েছে, বৃষ্টিও নেই, নদ-নদীও নেই, অথচ গরমি দরুন হু হু করে জল শুকিয়ে যাচ্ছে। লোহিত সাগরে লবণের পরিমাণ হাজারে চল্লিশ পর্য্যন্ত উঠেছে, কেন না ওই সাগরে একটীও বড় নদী এসে পড়ে নাই। কিন্তু তোমরা শুনে আশ্চার্য্য হবে যে, বিষুবরেখার কাছের সমুদ্রে লবণের ভাগ অনেক কম। এর কারণ এই যে, সেখানে জল খুব তাড়াতাড়ি শুকালেও প্রচুর বৃষ্টি পড়ছে, আর



ডুবুরীর আত্মরক্ষা



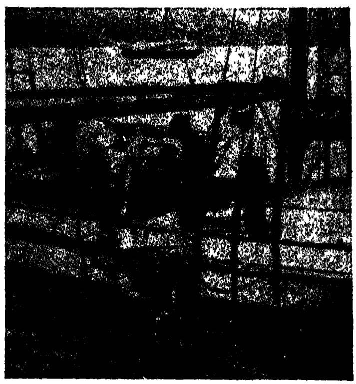
সেকালের ডুবুরী মুক্তার সন্ধানে সমুদ্রের জলের ভিতর ঝাঁপাইয়া পড়িতেছে



আধুনিক বৈজ্ঞানিক সাজ-সজ্জায় সজ্জিত ডুবুরী সমুদ্রের জলে নামিতেছে



ঝিনুক খুলিয়া মুক্তার সন্ধান করিবার চিত্র। সমুদয় শুক্তির মধ্যেই যে মুক্তা পাওয়া যায়, তাহা নহে



সমুদ্রের তল হইতে প্রত্যাগত ডুবুরীকে ডুবুরী-জাহাজে তুলিয়া লওয়া হইতেছে

এমেজন, কঙ্গো, নাইগার ইত্যাদির মত বড় বড় নদী অনবরত মিঠে জল এনে ঢালছে। তোমরা তাহলে হিসেবটা বুঝলে ত যে, সাগরের জলে লবণের ভাগ হাজার-করা ত্রিশ থেকে চল্লিশ পর্য্যন্ত। কিন্তু এই জলে শুধু যে লবণ আছে তা নয়। নানা রকমের বাষ্পীয় পদার্থ বা গ্যাসও আছে। এই গ্যাস গুলির মধ্যে দুটির নাম তোমাদের মনে রাখা দরকার—অক্সিজেন ও কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে, অক্সিজেন আমাদের প্রাণবায়ু। এই গ্যাস আমরা নাক দিয়ে মুখ দিয়ে শরীরে টেনে নিয়ে বেঁচে থাকি। অক্সিজেন নইলে কোন প্রাণী বাঁচতে পারে না। সমুদ্রের জলে এই গ্যাস মিশে আছে বলেই সমুদ্রগর্ভে জীবজন্তুর বেঁচে থাকা সম্ভব হয়েছে। উপরে তোমাদিগকে যে একোয়েরিয়মের কথা বলেছি, সেখানে এই অক্সিজেন কৃত্রিম উপায়ে জলে ছাড়তে হয়। তিমি, সিন্ধুঘোটকের মত জানোয়ারের অনেক বেশী অক্সিজেনের প্রয়োজন, তাই তাদিকে বাইরে বেরিয়ে নিশ্বাস নিতে হয়। বাইরে বেরিয়ে নিশ্বাস নেওয়া ব্যাপারটা বিশ্বাসের অযোগ্য মনে কোরো না। আমাদের পরিচিত শোল মাছ, কই মাছও জল থেকে মুখ বার করে নিঃশ্বাস নেয়। এই অক্সিজেন আসে কোথা থেকে, তা তোমাদের জান্‌তে ইচ্ছে হতে পারে। কিন্তু এতে গভীর রহস্য কিছু নেই। সমুদ্রের জল একরকম জোর জবরদস্তি করেই বায়ুমণ্ডল থেকে ক্রমাগত অক্সিজেন সংগ্রহ করে নিচ্ছে।

কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস কি, তা তোমরা জান ত! অঙ্গার বা কয়লাকে জ্বালালে, অর্থাৎ অক্সিজেন খাওয়ালে, এই গ্যাস উৎপন্ন হয়। এ গ্যাস বায়ুমণ্ডলে প্রচুর আছে, প্রাণী মাত্রেই ক্রমাগত এই গ্যাস নাক থেকে ছাড়ছে। এই বাষ্পের প্রধান কাজ গাছগাছড়াকে অঙ্গার সরবরাহ করা। গাছগুলো এর অঙ্গারভাগ টেনে নিয়ে আপন দেহের পুষ্টি-সাধন করে। যেমন বাইরে, তেমনি জলের ভিতরে এই ব্যাপার ক্রমাগত ঘটছে। সমুদ্রের জল থেকে যদি কার্ব্বনিক এসিড গ্যাস না পেত, ত কোনও গাছ-গাছড়াই সেখানে জন্মাতে বা বাড়তে পারত না।

সাগর-জলকে রীতিমত বিশ্লেষণ করে রাসায়নিক পণ্ডিতেরা স্থির করেছেন যে, এতে কি কি পদার্থ আছে। সেই পদার্থ একত্র করে আবার তাঁরা কৃত্রিম সাগর-জল তৈরী করেছেন। কিন্তু একটা মজার কথা বলি, এই কৃত্রিম জলে সামুদ্রিক জীব-জন্তু গাছ-আগাছা বাঁচে না। Aquarium-এ এটা পরীক্ষা করে দেখা গেছে। অথচ তাইতে একটু স্বাভাবিক সাগরজল মেশান থাকলেই কোন গোলযোগ হয় না, জীবজন্তু দিব্যি থাকে। এর থেকে এইটুকু আন্দাজ করা যায় যে, রাসায়নিক পণ্ডিতেরা এই জলে যে যে পদার্থ পেয়েছেন, তা ছাড়া আরও কিছু এতে আছে। সেই আরও কিছুটা Bacteria বা জীবাণুঘটিত কোন ব্যাপার। আমাদের জীব-তত্ত্বের জ্ঞান আরও অনেক না বেড়ে উঠলে এ সব জিনিস পূরোপূরি বোঝা যাবে না। তোমাদিগকে একটা সামান্য ঘরোয়া ব্যাপারের উদাহরণ দিই। দুধ বাসি হলেই আপন থেকে কিছু দই হয় না! দুধে লেবুর রস দিলেও দই হবে না, ছানা কেটে যাবে। কিন্তু সামান্য এতটুক দই-এর দম্বল দিয়ে রাখ সবটা দই হয়ে যাবে। এটা সম্পূর্ণ Bacteria বা জীবাণুর খেলা, জানবে।

জীবাণুর খেলা এখনও কেউ সম্পূর্ণরূপে বোঝে না। জীব-তত্ত্ব গভীর রহস্যে ভরা। শামুক, ঝিনুক যে জল থেকে কেলসিয়াম টেনে নিয়ে নিজের দেহ গড়ে তোলে, এ কথাও সবাই মানেন না।



আলাদ্দীন ও আশ্চর্য্য-প্রদীপ

এক

২১৪৮ পৃষ্ঠার পর

চীনদেশের কোন এক বড় সহরে মুস্তাফা নামে এক বৃদ্ধ গরীব দরজী বাস করিতেন। আলাদ্দীন নামে তাঁহার এক পুত্র ছিল। সে বাল্যকাল হইতেই কোন কাজ কর্ম্ম করিত না। ব্যবসায় কিংবা লেখাপড়া কিছুই শিখিবার জন্য সে মন না দিয়া সারাদিন কেবল এখানে ওখানে ঘুরিয়া বেড়াইত, যত সব অলস ও দুষ্ট বালকদের সঙ্গে খেলিয়া সময় কাটাইত। তাহার গুণের মধ্যে এই ছিল যে, সে ভয় বলিয়া কিছুই জানিত না। এইভাবে কয়েক বৎসর কাটিয়া গেল। আলাদ্দীনের বয়স যখন প্রায় পনের বৎসর, সে সময়ে তাহার পিতার মৃত্যু হইল।

পিতার মৃত্যুতেও আলাদ্দীনের স্বভাবের কোন পরিবর্ত্তন হইল না। সে পূর্ব্বের ন্যায় পথে পথে ঘুরিয়া বেড়াইত। আলাদ্দীনের মাতা অতি কষ্টে সূতা কাটিয়া কোনরূপে নিজের ও পুত্রের জীবিকা-নির্ব্বাহ করিতেন। এইভাবে অতি কষ্টে তাঁহাদের দিন চলিতেছিল। একদিন আলাদ্দীন রাজপথে তাহার সঙ্গীদের সঙ্গে খেলাধূলা করিতেছে, এমন সময়ে একজন অপরিচিত ব্যক্তি আলাদ্দীনের কাঁধে হাত দিয়া স্নেহের সহিত জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি মুস্তাফা দরজীর ছেলে?" আলাদ্দীন উত্তর করিল—"হাঁ। আমার বাবার কয়েক বৎসর হইল মৃত্যু হইয়াছে।" "বল কি? মুস্তাফা যে আমার বড় ভাই ছিলেন। এ বড় দুঃসংবাদ বাবা, আমি এতদিন নানা দেশ-বিদেশ ঘুরিয়া বেড়াইয়াছি, তাই কোন সংবাদ জানিতে পারি নাই"—এই কথা বলিয়া সেই অপরিচিত ব্যক্তি আলাদ্দীনকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া শোক প্রকাশ করিতে লাগিল। তাহার দুই চক্ষু বাহিয়া অশ্রু গড়াইয়া পড়িল। আলাদ্দীন তাহার বাবার মুখে কোন দিন শোনে নাই যে, তাহার কোনও কাকা আছেন, কাজেই সে আশ্চর্য্য হইয়া আগন্তুকের মুখের দিকে চাহিয়া রহিল।

সেই অপরিচিত ব্যক্তি আলাদ্দীনের সহিত তাহাদের বাড়ীতে যাইয়া উপস্থিত হইলেন এবং তাহার মাতার নিকট দুইটি স্বর্ণমুদ্রা দিয়া উত্তমরূপে আহারাদির ব্যবস্থা করিবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যথাসময়ে খাদ্য-দ্রব্যাদি আসিয়া উপস্থিত হইল এবং আলাদ্দীন ও তাহার মাতাসহ আগন্তুক খাইতে বসিয়া বলিলেন—"আমার ভাইয়ের মৃত্যুতে আমি প্রাণে অত্যন্ত বেদনা পাইয়াছি, তাহার চেয়েও বেশি দুঃখ হইতেছে আপনাদের

এমন দুরবস্থা দেখিয়া, আলাদ্দীন কি কোন কাজ কর্ম্ম করে না ?” অপরিচিত ব্যক্তি প্রথমেই আলাদ্দীনের কাছ হইতে কৌশলক্রমে তাহাদের পারিবারিক সমুদয় জানিয়া লইয়াছিলেন।

আলাদ্দীনের মা দুঃখ করিয়া কাঁদিতে কাঁদিতে বলিলেন—“আলাদ্দীন যদি মানুষ হইত, তাহা হইলে কি আমার কোন দুঃখ থাকিত! আমার মৃত্যুর পর যে তাহার কি অবস্থা হইবে, তাহা ভাবিয়াই তো আমি অস্থির হইয়া পড়িয়াছি!”

আগন্তুক বলিলেন—“বাবা আলাদ্দীন, এ তো বড় ভাল কথা নয়! এখন আর তোমার চুপ করিয়া



আলাদ্দীন সুন্দর পোষাকে সজ্জিত হইয়া আগন্তুকের সহিত মাঠের পথে চলিয়াছে

বসিয়া থাকা চলে না। তুমি কোন একটা ব্যবসায়ে মন দাও, আমি যতটা পারি তোমাকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিব। বেশ তো একটা দোকান কর না ?”

এই প্রস্তাবটা আলাদ্দীনের কাছে খুবই ভাল লাগিল এবং সে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইল। স্থির হইল—পর দিন আলাদ্দীনের নূতন কাকা তাহার জন্য দোকান করিবার ব্যবস্থা করিয়া দিবেন। সারারাত্রি মাতা ও পুত্র তাঁহাদের এই আকস্মিক সৌভাগ্যের কল্পনায় নানারূপ গল্প করিতে করিতে কাটাইয়া দিলেন।

পরদিন ঐ অপরিচিত ব্যক্তি আলাদ্দীনকে এক দরজীর দোকান হইতে ভাল ভাল পোষাক কিনিয়া তাহাকে সুন্দর ভাবে সাজাইলেন। তারপর সহরের পথে চলিতে চলিতে রাজার বাড়ী, সুন্দর সুন্দর বাগান ও দোকানের পর দোকান সব ছাড়িয়া দুইজনে চলিতে চলিতে মাঠের পর মাঠ পার হইয়া একটা গাছ-পালা বিহীন রুক্ষ ও কঠোর পাহাড়ের নীচে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। ঐখানে ঐ রকম তরু-গুল্ম-বিহীন পাহাড়ের সারি একটির পর একটি মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে।

আলাদ্দীনের মত সাহসী ছেলেও এখানে আসিয়া একটু ভয় পাইয়াছিল, সে কহিল—“কাকা চলুন এইবার বাড়ী ফিরিয়া যাই।” আগন্তুক কহিলেন—“তোমাকে এখন আমি এমন একটা আশ্চর্য্য ব্যাপার দেখাইব, যাহা কেহ কোন দিন দেখে নাই।” একথা বলিতে বলিতে তাঁহারা একটা কালো পাথরে ঢাকা পাহাড়ের কাছে আসিয়া পৌঁছিলেন। পাহাড়ের নীচে একটা মস্তবড় সুড়ঙ্গ। সে সুড়ঙ্গের নীচে কি যে আছে, তাহার কিছুই দেখিবার যো নাই। আলাদ্দীন ভয়ে পলাইবার উপক্রম করিতেই আগন্তুক কর্কশ কণ্ঠে কহিলেন—“সাবধান, আমার কথার অবাধ্য হইও না।” আলাদ্দীন কাঁদিতে কাঁদিতে কহিল—“আমি তো কোন অপরাধ করি নাই, তবে আমাকে এইরূপ ধমকাইতেছেন কেন ?”

আগন্তুক কহিলেন—“বাবা, তোমার উপকার করিব বলিয়াই আমি তোমাকে এখানে আনিয়াছি। এই যে সুড়ঙ্গের মুখে পাথরটা দেখিতেছ, এই পাথরটা সরাইয়া তুমি সুড়ঙ্গের পথে যাও। সুড়ঙ্গের পথে কিছুদূর গেলেই চারিদিকে হীরা, মণি, মুক্তা কত কি দেখিতে পাইবে, পৃথিবীর কোন রাজা-রাজরারও এত ধন-রত্ন নাই। আমি এ সকলই তোমাকে দিব।” এই বলিয়া আলাদ্দীনের হাতে একটি আংটি দিয়া আবার বলিলেন—“দেখ, এই আংটিটি সর্ব্বদা হাতে রাখিবে, তাহা হইলে তোমার কোন বিপদ ঘটিতে পারিবে না। তুমি হীরা, মণি মুক্তা কিছুই সংগ্রহ করিও না। সেখানে এক যায়গায় বেদীর উপর একটি প্রদীপ

দেখিতে পাইবে, সেই প্রদীপটি আনিয়া আমাকে দিও।" দীন দরিদ্র আলাদ্দীন মণি, মুক্তা, হীরা, জহরৎ দেখিবার লোভে কোনরূপ আপত্তি না করিয়া সুড়ঙ্গপথে চলিয়া গেল। যাইবার সময় ঐ আগন্তুক তাহাকে বার বার করিয়া বলিয়া দিয়াছিলেন—"তুমি ঐখানে যাহা কিছু দেখিতে পাইবে, সাবধান তাহার কিছুই ছুঁইও না, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ তোমার মৃত্যু হইবে।" এ লোকটা কে, জান? এ একজন মিশরদেশের প্রসিদ্ধ যাদুকর। আলাদ্দীনের কাকা নহেন।

দুই

যাদুকর সুড়ঙ্গের মুখে বসিয়া রহিলেন। আলাদ্দীন সুড়ঙ্গের পথ দিয়া যতই নীচে নামিতে লাগিল, ততই হীরা, মণি, মাণিক্যের জ্যোতিঃতে তাহার চক্ষু ঝলসিয়া যাইতে লাগিল। ইচ্ছা হইল এই সব সে সংগ্রহ করিয়া নেয়। কিন্তু সে তাহা



"বাবা, প্রদীপটি আমাকে দাও।"

করিল না। কিছুদূরে গেলে সে একস্থানে বেদীর উপরে একটি প্রদীপ দেখিতে পাইল। আলাদ্দীন যাদুকরের কথা অনুসারে অতি সাবধানে সেই প্রদীপটি লইয়া তাড়াতাড়ি সুড়ঙ্গের মুখে ফিরিয়া আসিয়া বলিল—"কাকা, আমাকে হাত ধরিয়া উপরে তুলুন।" যাদুকর সুড়ঙ্গের মুখ হইতে বলিলেন—"বাবা, প্রদীপটি আগে আমাকে দাও। আমি প্রদীপটি না পাইলে তোমাকে সুড়ঙ্গের মুখ হইতে তুলিব না।"

আলাদ্দীন কহিল—"তবে আমি বাতি দিব না।" আলাদ্দীনের এই কথায় যাদুকরের চক্ষু দুইটি আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তিনি যখন কোনরূপেই আলাদ্দীনের নিকট হইতে বাতিটি গ্রহণ করিতে পারিলেন না, তখন সুড়ঙ্গের মুখে পাথর চাপা দিয়া বন্ধ করিয়া চলিয়া গেলেন।

তিন

আলাদ্দীন সুড়ঙ্গের মধ্যে বন্দী হইয়া পড়িল। চারিদিকে ভীষণ অন্ধকার। কিছুই দেখা যায়



দৈত্য আলাদ্দীনকে চীনদেশে তাহার বাড়ী পৌছাইয়া দিতেছে

না। আলাদ্দীনের মত সাহসী বালকও ভয়ে কাঁপিতে লাগিল। সে ভাবিল—চুপ করিয়া

থাকিয়াও কোন লাভ নাই, সে প্রাণপণে সুড়ঙ্গের মুখ হইতে পাথরটা সরাইয়া ফেলিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। হঠাৎ তাহার হাতের প্রদীপটির সহিত পাথরের যেমন ঘষা লাগিয়া গেল, অমনি এক ভীষণাকার দৈত্য আসিয়া তাহার সম্মুখে উপস্থিত হইল। দৈত্য বলিল—"এই প্রদীপ যাঁহার হাতে থাকে, আমি তাহার গোলাম। প্রদীপটি একটু ঘষিলেই আমি তাহার নিকট উপস্থিত হই। আমাকে কি করিতে হইবে আদেশ করুন।"

আলাদ্দীন দুই দিন পর্যান্ত অনাহারী ছিল, সে বলিল—"আমার জন্য কিছু খাবার লইয়া আইস।" যেমন বলা, তেমনি সোনার রেকাবি আর সোনার পেয়ালায় নানারকম ভাল ভাল খাদ্য-দ্রব্য আসিয়া উপস্থিত হইল। আলাদ্দীন মনের আনন্দে পেট ভরিয়া খাইল। আর তাহাকে পায় কে? এইবার সে দৈত্যকে আদেশ করিল—"চীনদেশে আমার বাড়ী, এখনই আমাকে সেই দেশে আমার বাড়ীতে লইয়া যাও।" যেমন বলা, অমনি নিমেষ-মধ্যে দৈত্য আলাদ্দীনকে চীনদেশে তাহার বাড়ীতে পৌছাইয়া দিল। আলাদ্দীনের মা তাহাকে পাইয়া আনন্দে অধীরা হইলেন। এখন আর তাহাদের কোন অভাব রহিল না, বেশ সুখে দিন কাটিতে লাগিল।

একদিন ঘটনাক্রমে আলাদ্দীন চীনদেশের রাজকুমারীকে স্নান করিতে যাইবার সময় দেখিতে পাইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া পড়িল এবং তাহার মাকে বলিল—"মা, আমাকে যদি বাদশাহের মেয়ের সহিত বিবাহ না দাও, তাহা হইলে আর আমি বাঁচিব না।" তাহার মা বলিলেন—"বাবা, তুমি সাধারণ দরজীর ছেলে, তোমার সহিত বাদশাহ তাঁহার মেয়ের বিবাহ দিবেন—এ অসম্ভব কথা। বাদশাহ একথা শুনিতে পাইলে তোমার গরদানা লইবেন।"

আলাদ্দীন তাহার মাতার কোন নিষেধ শুনিল না। সে দৈত্যের দ্বারা অনেক হীরা, মণি, মুক্তা সংগ্রহ করিয়া সোনার থালায় সেগুলি সাজাইয়া দিয়া বলিল—"মা, তুমি এইগুলি লইয়া বাদশাহের দরবারে যাও এবং তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আমার বিবাহের কথা বলিও।"

আলাদ্দীনের মাতা বাদশাহের দরবারে ঐ সোনার থালায় সাজান হীরা-মণি-মাণিক্যগুলি উপস্থিত করিলেন। সে হীরা-মণি-মাণিক্য বড় সহজ নয়, ইহার এক একখানি দিয়া বাদশাহের রাজ্য কিনিতে পারা যায়। বাদশাহ উহা দেখিতে



রাজকুমারী স্নান করিতে যাইতেছেন

পাইয় আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন এবং আলাদ্দীনের মাতাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"তুমি কি চাও?"

আলাদ্দীনের মাতা এইবার সুযোগ বুঝিয়া বাদশাহের কন্যার সহিত পুত্রের বিবাহের প্রস্তাব করিলেন। বাদশাহ মনে করিলেন, এইরূপ হীরা-মণি-মাণিক্য যাঁহার ধন-ভাণ্ডারে আছে, সে কখনই সাধারণ ব্যক্তি নয়, তখন বাদশাহ মন্ত্রীর সহিত পরামর্শ করিয়া বলিলেন—"তোমার ছেলে যদি চল্লিশ খানা রেকাবি ভরিয়া চল্লিশ জন ক্রীতদাসের মাথায় করিয়া হীরা-মণি-মাণিক্য উপহার দিতে পারে, তবেই তোমার ছেলের সহিত রাজকুমারীর বিবাহ হইতে পারে।" আলাদ্দীনের মা আসিয়া যখন ছেলের কাছে এই কথা বলিলেন, তখন আলাদ্দীন আনন্দে লাফাইয়া উঠিয়া নাচিতে লাগিল।

আলাদ্দীন দৈত্যের সাহায্যে পরদিন বাদশাহের আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিল। বাদশাহ চমৎকৃত হইলেন। আর কোন আপত্তি করিতে পারিলেন না

মহা ধুমধামের সহিত আলাদ্দীনের সহিত তাঁহার কন্যার বিবাহ দিলেন।

চার

বিবাহের পর আলাদ্দীন দৈত্যকে দিয়া মস্ত বড় বাড়ী নির্ম্মাণ করাইয়া লইল। কত হাতী, ঘোড়া, বাঁদী, গোলাম, লোক-লস্কর, মণি-মাণিক্য হীরা-জহরৎ ও মূল্যবান আসবাব-পত্র দিয়া যে সে বাড়ী সজ্জিত হইল, তাহা সহজেই বুঝিতে পার। বাদশাহের মেয়ের জন্য কত সুন্দর সুন্দর বসন-ভূষণ, হীরা-মাণিক্য, পান্না-চুনি, মুক্তা যে সংগ্রহ করিল, তাহা বলিতে পারা যায় না। এইভাবে আলাদ্দীন পরম সুখে দিন অতিবাহিত করিতে লাগিল।

এদিকে সেই যাদুকর গণিয়া জানিতে পারিলেন যে, আলাদ্দীন আশ্চর্য্য প্রদীপের সাহায্যে বাদশাহের কন্যাকে বিবাহ করিয়া পরম সুখে বাস করিতেছে। যাদুকর হিংসায় জলিয়া উঠিলেন, তিনি সঙ্কল্প করিলেন যে, যেরূপেই হউক ইহার প্রতিশোধ লইতে হইবে। প্রদীপটা হাতে করিতেই হইবে।

এইরূপ সঙ্কল্প করিয়া তিনি চীনদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন এবং অনুসন্ধান করিয়া জানিতে পারিলেন যে, আলাদ্দীন কয়েক দিনের জন্য বাহিরে শিকার করিতে গমন করিয়াছে। তখন তিনি প্রদীপটি হস্তগত করিবার জন্য এক ফন্দী করিলেন। সেই দিন দুপুর বেলা আলাদ্দীনের বাড়ীর কাছে দাঁড়াইয়া চীৎকার করিয়া ডাকিতে লাগিলেন—"চাই পুরানো বাতির বদলে নূতন বাতি। চাই পুরানো বাতির বদলে নূতন বাতি।"

রাজকন্যা উপরের জানালা হইতে ফেরিওয়ালার হাতে ঝক্ ঝকে সব নূতন বাতি দেখিতে পাইয়া ঐ রকম একটি নূতন বাতি লইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। তিনি দাসীকে দিয়া ফেরিওয়ালাকে ডাকাইয়া আনিয়া সেই আলাদ্দীনের আশ্চর্য্য প্রদীপটা ছদ্মবেশী ফেরিওয়ালা যাদুকরের হাতে দিয়া তাহার কাছ হইতে একটি নূতন বাতি গ্রহণ করিলেন।

যাদুকর প্রদীপটি হাতে পাইয়া আনন্দে অধীর হইলেন। তিনি অমনি প্রদীপটি এক দেওয়ালের গায়ে ঘষা দিলেন। যেমন ঘষা—অমনি ভীষণাকার দৈত্য আসিয়া উপস্থিত হইল। যাদুকর জিজ্ঞাসা করিলেন—"বল দেখি দৈত্য, এখন তুমি কার?" দৈত্য উত্তর দিল—"এই প্রদীপ যখন যাহার, আমি তখনই তাহার।" তখন যাদুকর তাহাকে আদেশ করিলেন—"তুমি এই মুহূর্ত্তে বাদশাহের কন্যাসহ



"চাই পুরানো বাতির বদলে নূতন বাতি!...

এই বাড়ী-ঘর সমুদয় আমার দেশে লইয়া যাও!" দৈত্য তৎক্ষণাৎ আদেশ পালন করিল।

আলাদ্দীন সহরে ফিরিয়া আসিয়া দেখিতে পাইল, তাহার বাড়ী-ঘর, লোকজনের কিছুমাত্র চিহ্ন নাই। এই দৃশ্য দেখিয়া আলাদ্দীন একেবারে হতাশ হইয়া পড়িল। বুঝিতে পারিল যে, যাদুকরই তাহার এই সর্ব্বনাশ করিয়াছে। তখন আলাদ্দীন প্রতিজ্ঞা করিল যে, যেরূপেই হউক ঐ প্রদীপটি পুনরায় হস্তগত করিতে হইবে।—এইরূপ মনে করিয়া সে সঙ্কল্প স্থির করিবার জন্য বেড়াইতে বেড়াইতে নির্জ্জন নদীর তীরে যাইয়া উপস্থিত হইল। সে সময় বেলা শেষ হইয়া আসিয়াছিল—

সূর্য্য অস্ত যাইতেছিল। আলাদ্দীন মনে করিল, উপাসনা করিবার পর যাহা হয় একটা কিছু চিন্তা করিয়া স্থির করিবে। হস্ত মুখ প্রক্ষালনের জন্য যেমন নদীর কিনারায় যাইয়া জল লইবার জন্য হাত বাড়াইয়া দিয়াছে, সে-সময়ে সেই আংটিটির হঠাৎ পাথরে ঘষা লাগিয়া গেল, অমনি এক দৈত্য আসিয়া তাহার কাছে উপস্থিত হইল। আলাদ্দীন যাদুকরের দেওয়া এই আংটির কথা একেবারেই ভুলিয়া গিয়াছিল। আলাদ্দীন দৈত্যকে বলিল—"এক যাদুকর বাড়ীসহ আমার স্ত্রীকে লইয়া গিয়াছে, তুমি এখনই উহা লইয়া আইস।"

এই আংটির দৈত্য বলিল—"প্রভু, একাজ করিবার শক্তি আমার নাই। প্রদীপের দৈত্যের শক্তি আমার চেয়ে অনেক বেশী। তবে আমি আপনাকে যাদুকরের দেশে লইয়া যাইতে পারি।" আলাদ্দীন আর কি করে, শেষটায় সে তাহাতেই রাজী হইল। দৈত্য তাহাকে কাঁধে করিয়া যাদুকরের দেশে—সেই ঘর-বাড়ী ও বাদশাহের কন্যার কাছে পৌঁছাইয়া দিয়া আকাশে মিলাইয়া গেল।

পাঁচ

যাদুকর সকল সময়ে বাড়ীতে থাকিত না বলিয়া আলাদ্দীন অতি সহজেই বাদশাহের কন্যার সহিত সেই বাড়ীতে দেখা করিতে পারিল। বাদশাহের কন্যা তাহার ঐরূপ ত্রুটির কথা বলিলে আলাদ্দীন বলিল—"যাহা হইবার হইয়াছে, সেজন্য দুঃখ করিয়া লাভ নাই, আমারই অন্যায় হইয়াছে, আমি যদি তোমাকে প্রদীপের সব কথা খুলিয়া বলিতাম, তাহা হইলে কখনই এইরূপ ঘটিতে পারিত না।" এইবার আলাদ্দীন জিজ্ঞাসা করিল—"আচ্ছা, যাদুকর প্রদীপটি কোথায় রাখেন, সে কথা বলিতে পার কি?"

রাজকন্যা বলিলেন—"যাদুকর এক মুহূর্ত্তের জন্যও প্রদীপটি কাছ ছাড়া করেন না। সর্ব্বদা বুকের মধ্যে লুকাইয়া রাখেন।" আলাদ্দীন মহা বিপদে পড়িল। যাদুকরকে মারিয়া ফেলিতে না পারিলে আর কোনরূপেই প্রদীপটি পাইবার আশা নাই দেখিয়া সে তাহাকে মারিবার উপায় স্থির করিল।

আলাদ্দীন এক ক্রীতদাসের ছদ্মবেশে সহরের বাজার হইতে একটা ভয়ানক বিষের গুঁড়া কিনিয়া আনিয়া রাজকুমারীর হাতে দিয়া বলিল—"যাদুকর বাড়ী আসিলে তোমার সহিত বসিয়া খাইতে বলিও এবং তখন তাহার সরবতের সহিত এই চূর্ণ মিশাইয়া দিও।" যাদুকর সেদিন ফিরিয়া আসিলে আলাদ্দীনের কথা অনুযায়ী রাজকুমারী তাহাকে একসঙ্গে বসিয়া খাইবার জন্য অনুরোধ করিলেন। যাদুকরের সহিত রাজকুমারী পূর্ব্বে আর কোন দিন এমন সদয় ব্যবহার করেন নাই। কাজেই যাদুকর অত্যন্ত আনন্দিত হইয়া খাইতে বসিলেন। রাজকুমারী পূর্ব্বেই কৌশল করিয়া সরবতের সহিত সেই ভীষণ বিষের গুঁড়া মিশাইয়া রাখিয়াছিলেন। যাদুকরকে রাজকুমারী প্রথমেই নিজের হাতে সেই সরবৎ পান করিতে দিলেন। সেই সরবৎ পান করিয়াই যাদুকর ভয়ানক যন্ত্রণায় ছট্‌ফট্ করিয়া প্রাণত্যাগ করিলেন। আলাদ্দীন অমনি যাদুকরের বুক হইতে তাহার সেই সাধের প্রদীপটি বাহির করিয়া লইল। তখন মহা আনন্দে রাজকুমারীর সহিত নানা উপাদেয় দ্রব্য-সহকারে পান ভোজন করিল।

আর তাহাকে কে পায়? প্রদীপ ঘষিয়া দৈত্যকে ডাকিয়া তাহার সাহায্যে আবার সে তাহার অপূর্ব্ব প্রাসাদসহ চীনদেশে চলিয়া গেল। বাদশাহ আলাদ্দীনের বিরুদ্ধে সৈন্য ইত্যাদি প্রেরণ করিয়া তাহাকে শাস্তি দিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিয়াছিলেন। কিন্তু পরের দিন দেখিতে পাইলেন—পূর্ব্বের ন্যায় আলাদ্দীনের বিশাল সুন্দর প্রাসাদ শোভা পাইতেছে। বাদশাহ পুনরায় কন্যা ও জামাতাকে ফিরিয়া পাইয়া রাজধানীতে উৎসবের আয়োজন করিলেন।





গণ্ডার

২১০৯ পৃষ্ঠার পর

গণ্ডার জলহস্তীর অপেক্ষা আকারে কতকটা ছোট হইলেও স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে হস্তী ও জলহস্তীর পরই আকারে বৃহৎ।

তোমরা হয়ত অনেকেই গণ্ডার দেখিয়াছ। না দেখিয়া থাকিলে কলিকাতার চিড়িয়াখানায় যাইয়া গণ্ডার দেখিয়া আসিও। গণ্ডারদের মাথাটা কিছু লম্বা। নাকের ছিদ্রের কাছ হইতে বাঁকা ও সূক্ষ্মাগ্র অতি কঠিন খড়্গ উদ্ভূত হয়। এই খড়্গ তিন ফুট পর্য্যন্ত লম্বা হইতে দেখা যায়। গণ্ডারের চক্ষু অতি ক্ষুদ্র। ইহারা দৈর্ঘ্যে বার ফুট এবং উচ্চে সাধারণতঃ সাত ফুট হয়। লোকে কথায় বলে 'গণ্ডারের চামড়া'- কথাটি খুব সত্য। গণ্ডারের চামড়া এত কঠিন যে, বাঘের তীক্ষ্ণ নখ পর্য্যন্ত উহাতে সহজে বিদ্ধ হয় না। হস্তীর দন্তও উহা বিদীর্ণ করিতে পারে না। তরবারের দ্বারাও কাটা যায় না। সাধারণের বিশ্বাস আছে যে, বন্দুকের গুলি গণ্ডারের শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না— একথা সত্য নয়। এখানে এ বিষয়ে একটি গল্প বলিতেছি। অনেক দিন পূর্ব্বে একবার একজন আইরিস সৈনিক দিল্লী নগরীতে একটি ধৃত গণ্ডারকে লক্ষ্য করিয়া গুলি করিয়াছিলেন। গুলি করিবার পরেই গণ্ডারটি মারা গেল। বন্দুকের গুলি তাহার শরীরে বিদ্ধ হইয়াছিল। কাজেই সাধারণের মধ্যে এই যে একটা বিশ্বাস প্রচলিত আছে, বন্দুকের গুলি গণ্ডারের শরীরে প্রবেশ করিতে পারে না, তাহা সত্য নহে।

গণ্ডারের চারিটি পা। পা চারিটি মোটা ও ছোট। প্রত্যেক পায়ে তিনটি খুর আছে। ইহাদের এক জাতি আছে তাহাদের নাকের আগায় দুইটি খড়্গ হয়। তাহাদের নাম দ্বি-খড়্গ গণ্ডার। দ্বি-খড়্গ গণ্ডার আফ্রিকার বনে-জঙ্গলে দেখা যায়। গণ্ডারের গায়ে খুব জোর, ইহারা গভীর শক্তিশালী হইলেও অকারণে কাহারও অনিষ্ট করে না। গণ্ডার বড় একটা পোষ মানে না। কখন কখন ইহারা এমন রাগিয়া যায় যে, কোনরূপেই তাহাদের শান্ত করিতে পারা যায় না।

ভারতবর্ষের গণ্ডার

ভারতবর্ষে এক জাতীয় গণ্ডার আছে, তাহাদের মাথায় একটি মাত্র শৃঙ্গ হইয়া থাকে। তাহাদিগকে এক শৃঙ্গ বা খড়্গী গণ্ডার বলে (Rhinoceros unicorn's)। সে অনেক দিন আগে আনুমানিক ১৫১৩ খৃষ্টাব্দে একটি ভারতীয় গণ্ডার পর্ত্তুগাল দেশে নীত হইয়াছিল। এই জাতীয় গণ্ডারের মাথা ও কান শরীরের তুলনায় বড়। গণ্ডার ও

আমাদের ভারতবর্ষের গণ্ডারেরা ঘাস-জঙ্গলে ভরা জলাভূমিতে থাকিতে ভালবাসে। আফ্রিকার শ্বেত গণ্ডারের সহিত ভারতীয় গণ্ডারের বেশ সাদৃশ্য আছে। ভারতীয় গণ্ডারের প্রধান খাদ্য হইতেছে



ভারতবর্ষের গণ্ডার

ঘাস বা তৃণ জাতীয় উদ্ভিদ্। ইহারা কাদা-জলে সারা শরীর ডুবাইয়া স্নান করিতে খুব ভালবাসে।

অনেকের বিশ্বাস গণ্ডার খুব হিংস্র জন্তু এবং হস্তীর সহিত ইহাদের প্রায়ই মারামারি হয়। বনে-জঙ্গলে যাহারা একসঙ্গে বাস করে, তাহাদের মধ্যে এইরূপ কলহ হওয়া স্বাভাবিক। কারণ প্রত্যেকেই তো বাঁচিতে চায়! তবে গণ্ডার স্বভাবতঃ নিরীহ জীব। কিন্তু যদি কোন জন্তুর সহিত সংঘর্ষ উপস্থিত হয়, তাহা হইলে ইহারাও খড়্গ দিয়া আক্রমণ কারীকে আক্রমণ করে। ভারতবর্ষের গণ্ডারেরা বন্দী অবস্থায়ও অনেক দিন বাঁচে। চিড়িয়াখানায় আবদ্ধ গণ্ডারেরাও ত্রিশ চল্লিশ বৎসর বাঁচে। বন্য অবস্থায় ইহাদের পরমায়ু একশত বৎসরও হইয়া থাকে।

গণ্ডারীর উভয়ের খড়্গ বা শৃঙ্গ সমান আকারের হইয়া থাকে। ইহাদের দেহের আকার দৈর্ঘ্যে ৫ ফিট হইতে ৫॥ ফিট পর্য্যন্ত হয়। কেবল একটি ভারতীয় গণ্ডার ১০ ফিট ৬ ইঞ্চি লম্বা দেখা গিয়াছিল। এই জাতীয় গণ্ডারের খড়্গ সচরাচর দুই ফিটের বেশী লম্বা হইতে দেখা যায় না।

ভারতীয় গণ্ডার সমতল ভূমিতে যেখানে ঘাস ও জঙ্গল বেশি, সেইরূপ স্থানে বিচরণ করিতে ভালবাসে। আজকাল ব্রহ্মদেশের জঙ্গলে, আসামের বিস্তৃত সমতল বনে, তিস্তা উপত্যকার বন-প্রদেশে এবং নেপালের তরাই অঞ্চলে দলে দলে গণ্ডার দেখিতে পাওয়া যায়। এক সময়ে সুদূর রোহিল-খণ্ডেও গণ্ডার দেখা যায়। পূর্ব্বে বাঙ্গালা দেশের রাজমহল অঞ্চলের পার্ব্বত্য প্রদেশে অনেক গণ্ডার ছিল। ষোড়শ শতাব্দীর প্রথম ভাগে পঞ্জাব হইতে পেশোয়ার, যুক্তপ্রদেশ, নর্ম্মদা উপত্যকা, মাদ্রাজ



ভারতীয় এক-খড়্গী গণ্ডার

প্রদেশ—এক কথায় ভারতবর্ষের প্রায় সব দেশেই গণ্ডারের বাস ছিল। যুক্তপ্রদেশে ও নর্ম্মদা উপত্যকায় গণ্ডারের কঙ্কাল ও প্রস্তরীভূত দেহ পাওয়া গিয়াছে।

যবদ্বীপের গণ্ডার

যবদ্বীপে যে জাতীয় গণ্ডার দেখা যায় তাহারা আকারে ভারতীয় গণ্ডার অপেক্ষা ছোট। গণ্ডারের গায়ের রং সাধারণতঃ ধূসর। ইহাদের মাথাও শরীরের তুলনায় বড়। চামড়া পুরু। দৈর্ঘ্যে ভারতীয় গণ্ডার অপেক্ষা সামান্য ছোট।

এই জাতীয় গণ্ডারকে বাঙ্গালা দেশের সুন্দরবন অঞ্চলে, পূর্ব্ববঙ্গের বন্য প্রদেশে, সিকিম তেরাই অঞ্চলে, এমন কি আসাম উপত্যকা হইতে আরম্ভ করিয়া ব্রহ্মদেশ, মালয় উপদ্বীপ, সুমাত্রা ও যবদ্বীপ পর্য্যন্ত বিচরণ করিতে দেখা যায়। ইহারা জলাভূমি অপেক্ষা পাহাড় অঞ্চলের গভীর

অরণ্যে বাস করিতে ভালবাসে। সুন্দরবনের নানা স্থানে ইহাদের দেখা গেলেও ইহাদের স্বভাব হইতেছে পাহাড়ের উচ্চতম অংশে বাস



চট্টগ্রাম অঞ্চলের গণ্ডার

করা। ব্রহ্মদেশের এবং যবদ্বীপের পর্ব্বতশ্রেণীর উচ্চতম শৃঙ্গে সাত আট হাজার ফিট উপরেও এই জাতীয় গণ্ডারদের বাস করিতে দেখা যায়।

হিমালয় পর্ব্বতের গায়ে, শিবালিক পাহাড়ের উপরেও এই শ্রেণীর গণ্ডারেরা বিচরণ করে। সেখানে এক-খড়্গী গণ্ডারের প্রস্তরীভূত দেহও পাওয়া গিয়াছে।

সুমাত্রাদ্বীপে যে জাতীয় গণ্ডার এখন পর্যান্ত বাঁচিয়া আছে, তাহারা আকারে পৃথিবীতে বর্ত্তমান সময়ে যে যে জাতীয় গণ্ডার রহিয়াছে, তাহাদের সহিত তুলনায় সব চেয়ে ছোট। এই সব গণ্ডারের মাথায় দুইটি করিয়া খড়্গ আছে, এজন্য ইহাদের নাম দ্বি-খড়্গী গণ্ডার। সুমাত্রার গণ্ডারদের সঙ্গে ভারতীয় গণ্ডার এবং যবদ্বীপের গণ্ডারের আকারে প্রকারে এবং দাঁতের সংখ্যার দিক্ দিয়াও পার্থক্য বিদ্যমান। সুমাত্রাজাতীয় গণ্ডারদের গায়ে লম্বা লম্বা লোম হয়।

কালো গণ্ডার

আফ্রিকায় দুই জাতীয় গণ্ডার দেখা যায়। একটি শ্বেতকায় বা সাদা গণ্ডার—অন্যটি হইতেছে কৃষ্ণকায় বা কালো গণ্ডার। যদিও তাহাদের সহসা দেখিলে কোনও প্রভেদ বুঝিতে পারা যায় না। তবে কাছাকাছি আসিলে সাদা গণ্ডার ও কালো গণ্ডারের পার্থক্যটা ধরা যায়। আকারে প্রকারে ইহাদের সহিত এসিয়াবাসী গণ্ডারের অনেকটা প্রভেদ দেখা যায়। কি সাদা গণ্ডার, কি কালো গণ্ডার, উভয়েরই দুইটি করিয়া মাথায় উপর খড়্গ আছে। এসিয়ার গণ্ডারের মত এই গণ্ডারের চামড়ায় থাক নাই।

কালো গণ্ডার ও সাদা গণ্ডারের মধ্যে আকারে কালো গণ্ডার ছোট, কিন্তু ইহারা সাদা গণ্ডার অপেক্ষা সংখ্যায় অনেক বেশি। পূর্ব্ব আফ্রিকা, মধ্য আফ্রিকা, আবিসিনিয়া, সোমালি দেশ এবং দক্ষিণে কেপ কলোনি (Cape Colony) পর্য্যন্ত স্থানসমূহে এই জাতীয় গণ্ডারেরা বাস করে।

আবিসিনিয়ার কালো গণ্ডারেরা চারপাঁচ হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের উপর বাস করিতে ভালবাসে। কিন্তু সাধারণতঃ এই জাতীয় গণ্ডারেরা নদীর কিনারায় ঘন ঘাসবনে ও ঝোপে-ঝাড়ে দল বাঁধিয়া বাস করে। ইহারা দুর্গম অরণ্যে এবং জলাভূমির তীরে তীরে গভীর ঘাসের বনের মধ্য দিয়া নিজেরাই পথ তৈয়ারি করিয়া যাতায়াত করিয়া থাকে। ইহাদের প্রিয় খাদ্য হইতেছে জলজ উদ্ভিদ, গাছের শিকড়, ফল-মূল ইত্যাদি। এই জাতীয় গণ্ডারেরা ঘাস খাইতে ভালবাসে না। কালো গণ্ডারেরা খুব দ্রুত চলাফেরা করিতে পারে



কালো গণ্ডার

এবং স্বচ্ছন্দে অনেক দূর পর্য্যন্ত চলিয়া যায়। ইহাদের মেজাজ যখন বিগড়াইয়া যায়, তখন এই জাতীয় গণ্ডারদের গর্জ্জন শুনিলে মনে হয় যেন—রেলের এঞ্জিন গাড়ী ভোঁস ভোঁস শব্দ করিয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

গণ্ডারদের এই অদ্ভুত শরীর লইয়াও তাহারা অনায়াসে অত্যুচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গে আরোহণ করে। এইরূপ গতিবিধি দেখিলে বিস্মিত হইতে

F. 3—28

হয়। এই জাতীয় গণ্ডারের শাবকেরা মাতার সঙ্গে সঙ্গে চলাফেরা করে।

সাদা গণ্ডার

দক্ষিণ আফ্রিকায় সাদা গণ্ডারের সংখ্যা বেশি নাই। জ্যাম্বেসী নদীর তীরে উত্তরাঞ্চলে ইহাদের বড় একটা দেখিতে পাওয়া যায় না। এই জাতীয় গণ্ডারের বংশ দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে।



শ্বেত গণ্ডার

সাদা গণ্ডারেরা বুনো ঘাস খাইতে ভালবাসে এবং বুনো ঘাসে ভরা বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে বিচরণ করে। সাদা গণ্ডারদের দৃষ্টিশক্তি ক্ষীণ কিন্তু ইহাদের ঘ্রাণ-শক্তি এবং শ্রবণ-শক্তি প্রবল।

গণ্ডার নানা জাতীয় আছে। এখানে আমরা মাত্র প্রধান কয়েক জাতীয় গণ্ডারের বিষয় বলিলাম।

গণ্ডারের শৃঙ্গ বা খড়্গ

গণ্ডারের শৃঙ্গ বা খড়্গ সম্বন্ধে নানাদেশে নানা-প্রকারের কিংবদন্তী প্রচলিত। আরব দেশের কোন কোন জাতীয় লোকদের মধ্যে এইরূপ একটা বিশ্বাস আছে—গণ্ডারের শৃঙ্গে করিয়া যদি বিষ পান করা যায়, তাহা হইলে সে বিষে কোনরূপ ক্রিয়া করে না। এজন্য তাহারা কোথাও বেড়াইতে গেলে—সঙ্গে করিয়া গণ্ডারের শৃঙ্গ লইয়া যায়, এবং অন্য পক্ষেরা পানীয় জল কিংবা অন্য কোনও পানীয় দ্রব্য দিলে তাহারা গণ্ডারের শৃঙ্গে করিয়া পান করে। আবার অনেক অসভ্য জাতিদের মধ্যে এইরূপ একটা আশ্চর্য্য বিশ্বাস আছে যে, গণ্ডারের খড়্গের মধ্যে এমন এক আশ্চর্য্য জিনিস আছে, যাহা দৈবক্রমে সংগ্রহ করিয়া খাইতে পারিলে মানুষের অমরত্ব লাভ হয়!

গ্রীক্ ঐতিহাসিক প্লিনির লিখিত বিবরণ হইতে জানা যায় যে, ইউরোপে পম্পিনগরীতে সর্ব্বপ্রথম গণ্ডার প্রদর্শিত হইয়াছিল। সেই সময়ে গণ্ডারের সহিত হাতীর লড়াই দেখান হইত। ইংল্যাণ্ডে ১৬৮৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্বপ্রথম গণ্ডার নীত হয়। ভারতীয় গণ্ডারের খড়্গ এক ফুটের বেশি দীর্ঘ হয় না।

ভারতবর্ষে গণ্ডারের বংশ ক্রমশঃ লোপ পাইতেছে। মোগল সম্রাট আকবর যখন দিল্লীর সিংহাসনে অধিষ্ঠিত ছিলেন, তখন দিল্লীর নিকটবর্ত্তী বনে জঙ্গলে অনেক গণ্ডার বাস করিত। এখন ভারতবর্ষের নেপাল, আসাম, প্রভৃতি স্থানে গণ্ডার দেখা যায়। শ্যামদেশে গণ্ডার শিকার করিতে রাজার নিষেধ আছে। গণ্ডার শিকারের প্রধান কারণ হইতেছে গণ্ডারের খড়্গ বা শৃঙ্গ। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, গণ্ডারের শৃঙ্গ নানা রূপ ব্যারাম-পীড়ার প্রতিষেধক বলিয়া সাধারণের বিশ্বাস আছে। এক একটি গণ্ডারের খড়্গের দাম এক হাজার টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

গণ্ডারের অত বড় শরীর হইলেও উহারা বেশ বেগে চলিতে পারে। উহাদের আকার দেখিলে তাহাকে ভয়ঙ্কর হিংস্র জন্তু বলিয়া মনে হয়, একথা কিন্তু ঠিক নয়। ইহাদিগকে নিঃসন্দেহে নিরীহ জীব বলা যাইতে পারে। মানুষের প্রতি ইহারা কখনও সহজে অত্যাচার করে না। গণ্ডার-শিকারীরা বলেন যে, গণ্ডারকে গুলি করিয়া মারিলে ইহারা মাটিতে বসা অবস্থায় পড়িয়া যায়, এমন কি মৃত্যুর পরও সেইরূপ ভাবেই থাকে। গণ্ডারের দৃষ্টিশক্তি খুব কম। ইহাদের পাশ দিয়া দৌড়াইলেও ইহারা দেখিতে পায় না।

গণ্ডার ও হাতীর মধ্যে যখন লড়াই বাঁধে, তখন আকারে ক্ষুদ্র ও দ্রুতগামী বলিয়া অনেক সময় গণ্ডারেরাই জয়ী হয়। গণ্ডার তাহার মাথার খড়্গ দিয়া হাতীর পেট চিরিয়া ফেলে। গণ্ডারের চামড়ায় ঢাল তৈয়ারি হয় এবং নানা প্রকার দ্রব্যাদি প্রস্তুত হইয়া থাকে।

গণ্ডারের পূর্ব্ব-পুরুষ

গণ্ডারের কথা তোমাদের কাছে বলিলাম। এইবার গণ্ডারের পূর্ব্ব পুরুষের কথা শোন।

আমরা শিশু-ভারতীতে জীব-জগতের কথা বলিতে গিয়া তোমাদিগকে প্রথমে বলিয়াছি, পৃথিবীতে আজকাল আমরা যে সকল জীবজন্তু দেখিতে পাই, তাহাদের সকলগুলি একসঙ্গে এক সময়ে আসে নাই। ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এক এক সময়ে এক এক জাতীয় জন্তু পৃথিবীতে দেখা দিয়াছে। প্রথমে ছিল শিরদাঁড়া হীন প্রাণী, তারপর আসিল মাছ ও উভচর জীব, তারপর একে একে সরীসৃপ, স্তন্যপায়ী জীব প্রভৃতি উদ্ভূত হইয়াছে। সন্ধানের জন্য মঙ্গোলিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সেখানে বালুচিথেরিয়ামের একটি প্রস্তরীভূত দেহ পাইয়াছেন। আকারে ইহা একটি বিরাট ঘোড়ার মত, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, গণ্ডারের এই জাতি মহাশয়ের নাকের উপর গণ্ডারের ন্যায় শৃঙ্গ বা খড়্গ নাই। এই জন্তুটি যে আকারে বেশ বড় ছিল, তাহা ইহার প্রস্তরীভূত দেহ হইতে বেশ বুঝিতে পারা যায়। ইহার মাথাটি পাঁচফিট লম্বা এবং পায়ের হাড়গুলিও খুব বড় বড়। আজকালকার আফ্রিকার



মধ্য এসিয়ার বালুচিথেরিয়াম

পণ্ডিতেরা বলেন স্তন্যপায়ী জন্তু যেমন গরু, বাইসন, হরিণ, গণ্ডার প্রভৃতি প্রাণী 'টার্শিয়ারী' যুগে আমাদের পৃথিবীর বুকে আসিয়া দেখা দেয়। ইহাদের মধ্যে যে জন্তুটি সকলের চেয়ে বড়, তাহার নাম বালুচিথেরিয়াম, ইহাদের বাস ছিল মধ্য এসিয়ায়।

বালুচিথেরিয়াম গণ্ডার জাতীয় জীব এবং অনেক প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতের মতে ইহারাই হইতেছে গণ্ডারের পূর্ব্বপুরুষ বা নিকট জ্ঞাতি। কিছুদিন পূর্ব্বে আমেরিকা হইতে একদল বৈজ্ঞানিক নানা প্রকার জীব-জন্তুর কঙ্কাল অনু- বৃহত্তম হস্তী অপেক্ষাও ইহার আকার বৃহৎ ছিল। কাজেই আমরা বালুচিথেরিয়ামকে যদি অতিকায় জন্তু বলি, তাহা হইলে অন্যায় কিছু হয় না। তবে বর্ত্তমান সময়ে গণ্ডারেরা যেমন তৃণভোজী এবং যেখানে বন-জঙ্গল বেশি সেইখানেই বাস করিতে ভালবাসে, তেমনি এই অতিকায় জন্তুরাও তৃণভোজী ছিল এবং ইহারাও বৃক্ষলতা-পূর্ণ বন-জঙ্গলে বা পাহাড়ের অধিত্যকা প্রদেশে বাস করিতে ভালবাসিত। ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে যে, গণ্ডারের পূর্ব্বপুরুষদের আকার কিরূপ ছিল।



মুসলমান ধর্ম্মাবলম্বীদের মধ্যে বহু সাধু মহাপুরুষ জন্মগ্রহণ করিয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের জীবন-চরিত যেমন ত্যাগ ও মহত্ত্বের গরিমায় গৌরবান্বিত, তেমনি শিক্ষাপ্রদ। এসিয়ার অন্তর্গত আরব, তুরস্ক, পারস্য প্রভৃতি দেশে এই সকল সাধু ভক্তেরা জন্মগ্রহণ করিয়া সকল দেশের সকল লোকের গৌরবের কারণ হইয়া আছেন। বাঙ্গলা সাহিত্যে নববিধান ব্রাহ্ম সমাজের অন্তর্ভুক্ত গিরিশচন্দ্র সেন মহাশয় মূল আরবা ও পারস্য গ্রন্থ অবলম্বনে ১৮৭৯খ্রীষ্টাব্দে 'তাপসমালা' নামক তিনখণ্ড গ্রন্থ রচনা করিয়া সাধু মহাপুরুষদের বিষয় প্রচার করেন। ইহার পূর্ব্বে বাঙ্গলা ভাষায় মুসলমান সাধকদের সম্বন্ধে কেহ কোনও গ্রন্থ প্রকাশ করেন নাই। 'শরহোলকলুব কশফোল্ আস্রার,' 'মারফতোন্নফস্ ও অবুবব'—এই তিনখানি শ্রেষ্ঠ গ্রন্থে মুসলমান মহর্ষিদিগের জীবনচরিত বিবৃত হইয়াছে। এই সকল গ্রন্থের সার সঙ্কলনে 'তেজকরতোল্ আওলিয়' (ঋষিদিগের প্রসঙ্গ) গ্রন্থ বিরচিত হইয়াছে। আমরা সেই গ্রন্থ অবলম্বনে এই মহাপুরুষ চরিত লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছি।

জাফর সাদেক

২১২১ পৃষ্ঠার পর

আবুজাফর অল মনসুর যখন আরব দেশের খলিফা, সে সময়ে সাদেক ছিলেন ইস্লামের অগ্রণী। তিনি ছিলেন অসাধারণ পণ্ডিত। আর এদিকে তিনি মহাপুরুষ মোহম্মদের দৌহিত্র ছিলেন। কোরাণ শরীফের অর্থ-সম্বন্ধে তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী পণ্ডিত সেকালে আরব দেশে কেহই ছিলেন না। তিনি ধর্ম্মপথের পথিক ছিলেন। এই মহাপুরুষের কাছে উপদেশ পাইবার জন্য দলে দলে লোক আসিত। সাধু সাদেকের ছিল অসাধারণ প্রতিপত্তি। একজন সাধুর কিনা এতবড় প্রতিপত্তি! ইহাতে খলিফার মনে অত্যন্ত আক্রোশ হইল। তিনি একদিন মন্ত্রীকে বলিলেন—যাও মন্ত্রি, তুমি সাদেককে ধরিয়া আন, আমি তাঁহাকে বধ করিব।

মন্ত্রী খলিফার মুখে এইরূপ কথা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইলেন। তিনি বিনীত ভাবে খলিফাকে কহিলেন—প্রভু! যে ব্যক্তির সংসারের সহিত কোন সংস্রব নাই, সহরের এক প্রান্তে যিনি বাস করেন, তাঁহাকে আপনি—

—হাঁ, তাঁহাকেই আমি বধ করিব! কেন তাঁহার এত নাম, এত যশঃ, কেন তাঁহাকে সকলে এত মান্য করে?

এ কথার কোন উত্তর নাই। মন্ত্রী বার বার এইরূপ অন্যায় আদেশ ফিরাইয়া লইবার জন্য অনুরোধ করিলেন, কিন্তু খলিফার কেমন জেদ বাড়িয়া গিয়াছিল, তিনি বলিতে লাগিলেন—আমি তাঁহাকে চাই, তাঁহাকে আনিতেই হইবে।

মন্ত্রী কি আর করিবেন। সাদেককে আনিতে চলিলেন।

এদিকে খলিফা ভৃত্যদের প্রতি আদেশ দিলেন—যখন সাদেক রাজসভায় আসিবে, তখন আমি আমার মাথা হইতে মুকুট খুলিয়া লইব, এই ইঙ্গিত পাওয়া মাত্র তোমরা সাদেকের মাথা কাটিয়া ফেলিবে।

সাদেক আসিলেন। তাঁহাকে দেখিবামাত্র খলিফা সিংহাসন হইতে নামিয়া আসিয়া তাঁহার দিকে অগ্রসর হইয়া তাঁহাকে বিনীতভাবে অভ্যর্থনা করিয়া আনিয়া সিংহাসনে বসাইলেন এবং নিজে সম্মুখে বসিলেন। ভৃত্যেরা দেখিয়া অবাক্। খলিফা তো মাথা হইতে মুকুট নামাইলেন না! তিনি সাদেককে জিজ্ঞাসা করিলেন—বলুন, আপনার প্রার্থনা কি?

সাদেক বলিলেন—আমার এই প্রার্থনা যে, আপনি আমাকে ডাকিয়া আনিয়া তপস্যাব বিঘ্ন ঘটাইবেন না।

খলিফা সম্মত হইলেন—সাদেক চলিয়া গেলেন।

সাদেক চলিয়া যাইবার পর খলিফা কাঁদিতে কাঁদিতে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। খলিফাব যখন জ্ঞান হইল, তখন মন্ত্রী জিজ্ঞাসা কবিলেন—আপনার এইরূপ হইল কেন?

খলিফা বলিলেন—সাদেক যখন দ্বারদেশে আসিয়া উপস্থিত হইলেন, তখন আমি দেখিলাম যে, তাঁহার সঙ্গে সঙ্গে একটা ভয়ানক কালসর্প আসিতেছে এবং সে ফণা বিস্তার করিয়া বলিতেছে—'সাবধান খলিফা, যদি তুমি কোন প্রকারে সাদেককে অপমান কর, তাহা হইলে আমি তোমার প্রাণবধ করিব।' ভয়ে আমার প্রতিজ্ঞা ভুলিয়া গেলাম, তাঁহার নিকট ক্ষমা চাহিলাম এবং পরে অজ্ঞান হইয়া পড়িলাম।

সাদেক এমনি ছিলেন তেজস্বী ও ধার্ম্মিক মহাপুরুষ। তাঁহার সম্বন্ধে অনেক সুন্দর সুন্দর গল্প আছে। এখানে তাহাব কয়েকটি বলিতেছি।

একদা সাদেক মূল্যবান্ পোষাক পরিয়াছিলেন। তাঁহাকে এইরূপ পোষাক পরিতে দেখিয়া নানা জনে নানা কথা বলিতে লাগিল। একজন বলিল—আপনি প্রেরিত মহাপুরুষের বংশধর, আপনার কি এই প্রকার মূল্যবান্ পোষাক-পরিচ্ছদ পরা উচিত?

সাদেক তাঁহার হাতখানি টানিয়া লইয়া আপনার আস্তিনের নীচে লইয়া গেলেন। মূল্যবান্ পোষাকের নীচে অত্যন্ত মোটা কাপড়ের তৈয়ারী জামা ছিল। সে ব্যক্তি তাহা অনুভব করিয়া লজ্জিত হইল। সাদেক তখন হাসিয়া বলিলেন—আমার বাহিরের পোষাক লোককে দেখাইবার জন্য, আর ভিতরের বস্ত্র ঈশ্বরের জন্য।

একবার একব্যক্তি টাকার একটি থলে হারাইলে সাদেককে নিকটে দেখিতে পাইয়া আক্রমণ করিয়া বলিল—তুমিই আমার টাকার থলে চুরি করিয়াছ।

সে সাধু সাদেককে চিনিত না। সাদেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তোমার থলেতে কত টাকা ছিল?

সে বলিল—হাজার টাকা।

সাদেক তাহাকে সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইয়া এক হাজার টাকা দিলেন। পরে কিন্তু সেই লোকটি তাহার টাকার থলে ফিরিয়া পাইয়া সাদেকের নিকট উপস্থিত হইয়া বলিলেন—আমি ভুল করিয়াছি, আপনার টাকা আপনি নিন্।

সাদেক বলিলেন—আমি যখন তোমাকে দান করিয়াছি, তখন আর গ্রহণ করিব না।

পরে যখন সেই ব্যক্তি জানিতে পারিল যে, তিনি মহা তপস্বী জাফব সাদেক, তখন আর তাহার লজ্জার অবধি রহিল না।

একদা একটি লোক সাধু সাদকের নিকট আসিয়া বলিল—আমি ঈশ্বর দেখিতে চাই, তাঁহাকে আমার নিকট আনিয়া উপস্থিত করুন।

সাদক তৎক্ষণাৎ তাঁহার অনুচরদিগকে বলিলেন—এই লোকটার হাত-পা বাঁধিয়া ইহাকে নদীর জলে ফেলিয়া দাও।

অনুচরেরা তাহাকে নদীর জলে ফেলিল। সে কতকটা ডুবিলে পর তাহারা তাহাকে উঠাইয়া লইল। তখন সে 'হে প্রেরিত পুরুষের সন্তান' বলিয়া চেঁচাইতে লাগিল। সাদেক বলিলেন—ইহাকে আবার জলে ডুবাও।

তাহাই করা হইল। এইরূপ ভাবে সাদেকের অনুচরেরা কয়েকবার তাহাকে ডুবাইতেছিল ও উঠাইতেছিল—সে পুনঃ পুনঃ সাদেকের নিকট আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছিল। যখন তাহাকে অগাধ জলে ফেলিয়া দেওয়া হইল, তখন সে সম্পূর্ণ নিরাশ ও নিরাশ্রয় হইয়া পড়িল, পরে যখন ক্রমশঃ গভীর জলে ডুবিয়া যাইতেছিল, তখন সে 'হে ঈশ্বর' বলিয়া আর্ত্তনাদ করিতে লাগিল। এইবার সাদেক বলিলেন—ইহাকে তুলিয়া আন।

অনুচরেরা সে লোকটিকে সাদেকের নিকট উপস্থিত করিল। লোকটি একটু সুস্থ হইলে পর সাদেক তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—কেমন, ঈশ্বরকে দেখিয়াছ?

সে বলিল—যতক্ষণ অপরের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছিলাম, ততক্ষণ আবরণ ছিল। কিন্তু যখন সম্পূর্ণরূপে ঈশ্বরের উপর আত্মসমর্পণ করিলাম, তখন হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া গেল। মনের অশান্তি দূর হইল।

সাদেক বলিলেন—যতক্ষণ তুমি আমার নিকট আশ্রয় ভিক্ষা করিতেছিলে, তখন তুমি মিথ্যাবাদী ছিলে কিন্তু যখন তুমি ঈশ্বরের নাম করিলে, তখন সত্যকে লাভ করিলে।

একদিন সাদেক ঈশ্বরের নাম করিতে করিতে পথ দিয়া যাইতেছিলেন। সে সময়ে একজন দুঃখী ব্যক্তিও 'ঈশ্বর' 'ঈশ্বর' বলিয়া তাঁহার পশ্চাতে পশ্চাতে যাইতেছিল। সাদেক বলিতেছিলেন—হে দয়াল ঈশ্বর! আমার পরিবার কাপড় নাই, হে ঈশ্বর! আমার গায়ের কাপড় নাই।

কি আশ্চর্য্য, অলৌকিকরূপে তৎক্ষণাৎ তিনি কয়েকখানি উৎকৃষ্ট বস্ত্র প্রাপ্ত হইলেন ও তাহা পরিলেন। তখন সেই দুঃখী লোকটি বলিল—আমি ঈশ্বরের নাম উচ্চারণে আপনার অংশী ছিলাম, এখন আপনার পুরাতন বস্ত্র আমাকে দান করুন।

সাদেক সন্তুষ্ট হইয়া ঐ দুঃখী ব্যক্তিকে তাঁহার নিজের পুরাতন বসন দান করিলেন।

সাদেকের বাণী

চারি ব্যক্তির সঙ্গ করিবে না, যথা—মিথ্যাবাদী, নির্ব্বোধ, কৃপণ ও হৃদয়হীন লোক। যদি মিথ্যাবাদীর সঙ্গে থাক, তবে সর্ব্বদা প্রতারিত হইবে। নির্ব্বোধের সঙ্গে থাকিলে তাহার মনে তোমার শুভ আকাঙ্ক্ষা থাকিলেও তাহার নির্বুদ্ধিতার দরুন, তোমার অশুভ হইবে। কৃপণ নিজের জন্য তোমার সময় নাশ করিবে। হৃদয়হীন লোক তোমার অভাবের সময় তোমাকে বিপন্ন করিবে।

* * * *

মূর্খ মিত্র অপেক্ষা জ্ঞানী শত্রু অনেক ভাল।

* * * *

যে পাপকে ভয় করে, এবং ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করে তাহাকে সাধক বলিতে পার।

* * * *

অনুতাপ ব্যতীত যথার্থ সাধনা হয় না, ঈশ্বর অনুতাপকে সাধনার একটি অঙ্গ করিয়াছেন।

* * * *

ঈশ্বর মানুষের মধ্যে বাস করেন।

* * * *

উন্নত কে? পাপ যাঁহাকে নত করে নাই। মুক্ত কে? লোভ যাঁহাকে দাস করিয়া রাখে নাই। কর্ত্তা কে? শয়তান যাঁহাকে বন্দী করে নাই। জ্ঞানী কে? যিনি ঈশ্বরে বিশ্বাসী এবং নিজের জীবনের বিষয় ভাবেন।

* * * *

মানুষের সৌভাগ্যের মধ্যে একটি সৌভাগ্য এই, যদি তাহার শত্রু জ্ঞানী হয়। যাহা ঈশ্বর হইতে তোমাকে দূরে রাখে, তাহা হইতে দূরে থাকিবে।

* * * *

যিনি দান করেন, গ্রহণ করেন না, তিনি **পুরুষ**; যিনি গ্রহণ ও দান করেন, তিনি **অর্দ্ধপুরুষ**; যিনি গ্রহণ করেন, দান করেন না, তিনি **কাপুরুষ**।



সমুদ্রং

২১৫৪ পৃষ্ঠার পর

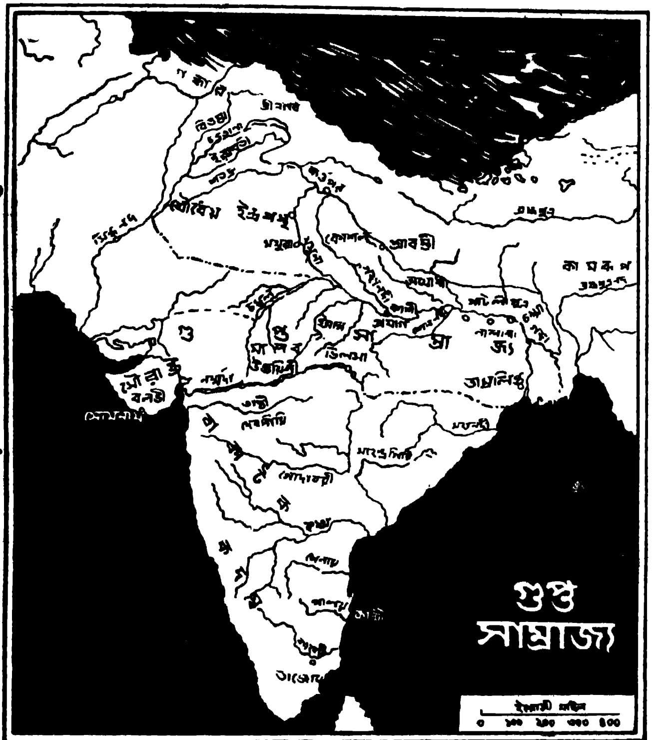
চন্দ্রগুপ্ত অল্পকাল মাত্র রাজত্ব করিয়াছিলেন। তাঁহার রাজত্বকাল ৩২০ খৃষ্টাব্দ হ তে ৩৩৫ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরা হয়। তাঁহাব মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্র সমুদ্রগুপ্ত গুপ্তসিংহাসনের উত্তরাধিকারী হই়.- ছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত চন্দ্রগুপ্তের জ্যেষ্ঠপুত্র ছিলেন না, তথাপি পুত্রগণের মধ্যে পিতা সমুদ্র-গুপ্তকেই উত্তরাধিকারী মনোনীত করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্ত লিচ্ছবি-রাজ-দুহিতা বা কুমারদেবীব গভজাত ছিলেন। এই কারণে সমুদ্রগুপ্ত তাঁহার খোদত লিপিতে আপনাকে লিচ্ছবি দৌহিত্র বলিয়া পরিচিত করিয়াছেন। চন্দ্রগুপ্তের নির্ব্বাচন সার্থক হইয়াছিল। কারণ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় প্রতিভা ও শৌর্য্যের দ্বারা এক সমৃদ্ধি সম্পন্ন বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইয়া-ছিলেন। তিনি যে কেবল দিগ্বিজয়ী বীর ছিলেন, তাহাই নহে। তিনি একজন শ্রেষ্ঠ রাজনীতিজ্ঞ, প্রকাণ্ড বিদ্বান, প্রসিদ্ধ কবি ও সঙ্গীতানুরাগী নৃপতি ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালে ভারতের অশেষ প্রকার উন্নতি সাধিত হইয়াছিল। এক অশোক ছাড়া সমুদ্রগুপ্তের সমকক্ষ সম্রাট প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পাওয়া যায় না। মহারাজ কনিষ্কও ভারতের ইতিহাসে শ্রেষ্ঠ আসন লাভ করিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার ধমনীতে বিদেশী রক্ত প্রবাহিত হইত। সমুদ্রগুপ্ত ভারতের জাতীয় সম্রাট। তিনি স্বীয় অতুল পরাক্রমের দ্বারা ভারতে এক বিরাট সাম্রাজ্য নির্ম্মাণ করিয়া-ছিলেন। তাঁহার রাজত্বকালের সবিস্তার ইতিহাস এলাহাবাদ দুর্গের ভিতরে অবস্থিত অশোক-স্তম্ভের গাত্রে খোদিত একটি লিপি হইতে প্রাপ্ত হওয়া যায়। লিপিটি সংস্কৃত ভাষায় গদ্যে এবং পদ্যে রচিত, ইহাব ভাষা অতিশয় প্রাঞ্জল। সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের সবিস্তার বর্ণনা ইহাতে লিপিবদ্ধ আছে। এই প্রকার লিপিকে 'প্রশস্তি' বলা হয়। মহাকবি হরিষেণ এই প্রশস্তিটি রচনা করিয়াছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের রাজ্য-কালের ঘটনাবলির ও তাঁহার জীবন-চরিতের বিশদ বিবরণ থাকার জন্য এই লিপিটির মহত্ত্ব অসাধারণ।

সমুদ্রগুপ্ত সর্ব্বপ্রথমে আর্য্যাবর্ত্তের অন্যান্য রাজ-গণের উচ্ছেদসাধনে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। রুদ্রদেব, মতিল, নাগদত্ত, চন্দ্রবর্ম্ম, গণপতি নাগ, নাগসেন, অচ্যুত, নন্দী ও বলবর্ম্মা প্রভৃতি আর্য্যাবর্ত্ত রাজগণের রাজ্য তিনি ধ্বংস করিয়াছিলেন।" রুদ্রদেব ও মতিল, কোন্ বংশের ছিলেন, তাঁহাদের রাজ্য কোথায় ছিল স্থির করিবার কোনই উপায় নাই। নাগদত্ত হয়ত নাগবংশীয় একজন রাজা ছিলেন কিন্তু নিশ্চয় করিয়া বলা অসম্ভব। চন্দ্রবর্ম্মা বর্ম্মবংশীয় রাজা ছিলেন। রাজপুতনার পুষ্করণ (আধুনিক পোখরণ) তাঁহার রাজধানী ছিল ও তাঁহার রাজ্য পশ্চিম মালব

দেশে বিস্তৃত ছিল। এই পোখরণের অবস্থান লইয়া নানারূপ মতভেদ আছে। সমুদ্রগুপ্তের দ্বারা পরাজিত হইয়া তিনি বোধ হয় বঙ্গদেশাভিমুখে পলায়ন করিয়াছিলেন। কারণ বাঁকুড়া জেলায় শুশুনিয়া পর্ব্বতগাত্রে খোদিত একটি লিপিতে চন্দ্রবর্ম্মা নামক জনৈক রাজার নাম পাওয়া যায়।

ছিল। অচ্যুতের রাজধানী বোধ হয় অহিচ্ছত্র (বেরিলি জেলায় অবস্থিত আধুনিক রামনগর) ছিল।

আর্য্যাবর্ত্ত অধিকৃত হইলে 'আটবিক' অর্থাৎ বনময় প্রদেশসমূহের রাজগণ সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন।



গুপ্ত সাম্রাজ্যের মানচিত্র

কিন্তু এই অভিন্নতা নিরূপণ সমস্তই আনুমানিক বা কাল্পনিক। কিছুই স্থির করিয়া বলিবার উপায় নাই।

গণপতি নাগ, নাগসেন ও নন্দী নিশ্চয়ই নাগবংশীয় রাজা ছিলেন ও সম্ভবতঃ পদ্মাবতী, বিদিশা ইত্যাদি স্থানে তাঁহাদের রাজ্য অবস্থিত

সমগ্র উত্তরাপথ বিজিত হইলে, সমুদ্রগুপ্ত দক্ষিণাপথ জয় করিবার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। তিনি তাঁহার রাজধানী পাটলিপুত্র হইতে যাত্রা করিয়া মগধ ও উড়িষ্যার মধ্যবর্ত্তী বনময় প্রদেশের দুইজন রাজাকে পরাজিত করিয়াছিলেন। ইহাদের মধ্যে প্রথম দক্ষিণ কোশলের রাজা মহেন্দ্র ও

দ্বিতীয় মহাকান্তারের অধিপতি ব্যাঘ্ররাজ। দক্ষিণ কোশল বলিতে আধুনিক মধ্য প্রদেশের (Central Provinces) অন্তর্গত বিলাসপুর ও সম্বলপুর জেলা বুঝায়। আর মহাকান্তার হইল উক্ত প্রদেশের সোনপুরের দক্ষিণস্থ বনময় দেশসকল। দক্ষিণ ও মহাকান্তার বিজিত হইলে পর সমুদ্রগুপ্ত কৌরল-দেশের অধিপতি মণ্টরাজকে পরাজিত করিয়া-ছিলেন। কৌরাল বোধ হয় আধুনিক কোল্লেরু হ্রদের নিকট বর্ত্তী স্থানসমূহের প্রাচীন নাম। মণ্টরাজকে পরাজিত করিয়া বিক্রমকেশরী 'পরাক্রমাঙ্ক' সমুদ্রগুপ্ত কলিঙ্গ দেশের পুরাতন রাজধানী পিষ্টপুর (আধুনিক পিঠপুরম্‌) অধিকার করিয়াছিলেন। পিষ্টপুরের রাজা ছিলেন মহেন্দ্র। তাহার পর গিরিকোট্টুর দুর্গের অধিপতি স্বামিদত্ত সমুদ্রগুপ্ত কর্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। গিরি কোট্টুর বলিতে আধুনিক গঞ্জাম জেলার 'কোঠুর' বুঝিতে হইবে। ইহার পর এরণ্ডপল্লবরাজ দমন, কাঞ্চিনগরাধিপতি বিষ্ণুগোপ, অবমুক্তরাজ নীলরাজ, বেঙ্গিনপরাধিপতি হস্তিবর্ম্মা, পলককরাজ উগ্রসেন, দেবরাষ্ট্রের অধিপতি কুবের এবং কুস্থল পুররাজ ধনঞ্জয় প্রভৃতি দক্ষিণাপথের রাজগণ সমুদ্রগুপ্ত কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়াছিলেন। এরণ্ডপল্ল আধুনিক চিকাকোলের নিকটবর্ত্তী স্থান বিশেষের প্রাচীন নাম ছিল।

কাঞ্চী বলিতে অবশ্য পল্লবদের বিখ্যাত রাজধানী (কঞ্জীবরম্‌) বুঝিতে হইবে। বিষ্ণুগোপ অবশ্যই এই সময়ে পল্লবরাজের নাম ছিল। বেঙ্গী পূর্ব্ব-সমুদ্রতটস্থ গোদাবরী ও কৃষ্ণা নদীর মধ্যবর্ত্তী প্রদেশের প্রাচীন নাম ছিল। এখানকার রাজা হস্তিবর্ম্মা সম্ভবতঃ পল্লববংশের ছিলেন। প্রাচীন পলকক ও আধুনিক পলককদ (নেলোর জেলা) অভিন্ন। ইহা পল্লবরাজের প্রতিনিধির শাসনাধীন ছিল। দেবরাষ্ট্র বলিতে ভিজিগাপটম্‌ জেলার এল্লমঞ্চিলি নামক স্থান বুঝিতে হইবে। কুস্থলপুর সম্ভবতঃ উত্তর আর্কট জেলার পোলুরের নিকটবর্ত্তী কোট্টালুর নামক স্থান বিশেষ। এইভাবে সমুদ্রগুপ্ত পূর্ব্ব-দাক্ষিণাত্যের রাজন্যবর্গকে পরাজিত করিয়া-ছিলেন, কিন্তু তিনি তাঁহাদের উচ্ছেদসাধন করেন নাই। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহাদিগকে কারামুক্ত করিয়া স্ব স্ব রাজ্যে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করিয়া-ছিলেন। তিনি 'শস্ত্রবিজয়ী' পররাজ্যাপহারক অত্যাচারী রাজা ছিলেন না, তিনি অশোকের ন্যায় 'ধর্ম্মবিজয়ী' ছিলেন।

আশ্চর্য্যের বিষয় যে, হরিষেণের লিপিতে বাকা-টকরাজের কোনই উল্লেখ নাই। এইরূপ অনুমান হয় যে, সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক বাকাটক রাজা ছিলেন প্রথম পৃথিবীষেণ এবং যে মহাকান্তারাধিপতি ব্যাঘ্ররাজকে সমুদ্রগুপ্ত পরাজিত করিয়াছিলেন, তিনি খুব সম্ভবতঃ পৃথিবীষেণের অধীন সামন্তরাজ ব্যাঘ্রদেব ভিন্ন অপর কেহই নহেন। সমুদ্রগুপ্তের বিজয়াভিযানের ফলস্বরূপ মধ্যপ্রদেশে বাকাটক প্রভুত্ব লুপ্ত হইয়াছিল ও গুপ্তাধিপত্য সুপ্রতিষ্ঠিত

সমতট (পূর্ব্ববঙ্গ), ডবাক (হয়ত আধুনিক ঢাকার প্রাচীন নাম), কামরূপ (আসাম), নেপাল, কর্তৃপুর (বর্ত্তমান কুমায়ুন ও গড়ওয়াল) প্রভৃতি সীমান্ত রাজ্যের নরপতিগণ সমুদ্রগুপ্তের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছিলেন ও তাঁহাকে কর প্রদান করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

মালব, আর্জ্জুনায়ন, যৌধেয়, মদ্রক, আভীর প্রার্জ্জুন, শণকানীক, কাক, খরপরিক প্রভৃতি 'গণরাষ্ট্র' সমুদ্রগুপ্তকে করপ্রদান করিত। এই সমস্ত গণরাষ্ট্র পঞ্জাব, রাজপুতনা, মালব এবং মধ্য ভারতে (Central India) বর্ত্তমান ছিল।

হরিষেণের প্রশস্তিতে কতকগুলি বিদেশী রাজার উল্লেখ পাওয়া যায়। প্রশস্তিকার লিখিয়াছেন যে, সমুদ্রগুপ্ত 'দেবপুত্র-শাহী-শাহানুসাহী,' শক-মুরুন্ড তথা সিংহলরাজ বহুমূল্য উপঢৌকনাদি লইয়া সম্রাটের সমক্ষে উপস্থিত হইতেন এবং স্ব স্ব রাজ্য শাসন করিবার নিমিত্ত তাঁহার নিকট আদেশ প্রার্থনা করিতেন। দেবপুত্র-শাহী-শাহানুশাহী কুষাণবংশীয় রাজা কনিষ্ক, হুবিষ্ক ও বাসুদেবের উপাধি ছিল। খুব সম্ভব এলাহাবাদ প্রশস্তির 'দেবপুত্র-শাহী-শাহানুশাহী' উপাধি-ভূষিত রাজা কনিষ্কের বংশধর কুষাণবংশীয় রাজা ভিন্ন অপর কেহই নহেন। তিনি সাসানীয় বংশীয় পারস্য রাজ দ্বিতীয় শাপুরের অধীনে ছিলেন, কিন্তু সমুদ্রগুপ্তের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন, শক-মুরুন্ড পদ দ্বারা উজ্জয়িনীর ক্ষত্রপকে বুঝিতে হইবে। 'মুরুন্ড' অর্থে স্বামী। আমরা জানি যে, সুরাষ্ট্র এবং গুজরাতের ক্ষত্রপেরা নিজের নামের সহিত স্বামী পদ ব্যবহার করিতেন।

সমুদ্রগুপ্তের সমসাময়িক সিংহলরাজের নাম মেঘবর্ণ। ইনি একজন বিখ্যাত রাজা ছিলেন ও ৩৬০ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি সমুদ্রগুপ্তের নিকট একজন রাজদূত পাঠাইয়াছিলেন। বুদ্ধগয়ায় বোধি-দ্রুমের নিকট সিংহল হইতে আগত যাত্রীদের জন্য তিনি একটি মঠ নির্ম্মাণ করিতে চাহিয়াছিলেন এবং ইহারই জন্য অনুমতি প্রার্থনা করিতে তিনি সমুদ্রগুপ্তের রাজদরবারে দূত পাঠাইয়াছিলেন।

মহেন্দ্রপরাক্রম বিজয়ী বীর সমুদ্রগুপ্ত স্বীয় দিগ্বিজয়ের দ্বারা এক বিশাল সাম্রাজ্যের অধিপতি হইলেন। এই সাম্রাজ্য পূর্ব্বে ব্রহ্মপুত্র নদ হইতে পশ্চিমে যমুনা ও চম্বল নদী পর্য্যন্ত ও উত্তরে হিমাচলের উপত্যকা হইতে দক্ষিণে নর্ম্মদা পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। দক্ষিণাপথের অনেক রাজা তাঁহার শরণাগত হইয়াছিলেন ও বিদেশী কুষাণ, শক ও সিংহলের রাজারা তাঁহার আজ্ঞা শিরধার্য্য করিতেন। ঐতিহাসিকেরা তাঁহার তুলনা নেপোলিয়ানের সহিত করিয়া থাকেন।

দিগ্বিজয়ের পর রাজচক্রবর্ত্তী সমুদ্রগুপ্ত অশ্বমেধ যজ্ঞ উদ্‌যাপন করেন। এই উপলক্ষে তিনি ব্রাহ্মণ-দিগকে বহুলক্ষ স্বর্ণমুদ্রা, অলঙ্কার ও গোভূমি-গ্রামাদি প্রদান করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণদিগকে দিবার জন্য তিনি যে বিশেষ প্রকারের স্বর্ণমুদ্রা



অশ্বমূর্ত্তি খোদিত সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

প্রস্তুত করাইয়াছিলেন, তাহার অনেকগুলি পাওয়া গিয়াছে। ঐ মুদ্রার উপরিভাগে অশ্বের প্রতিমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে।

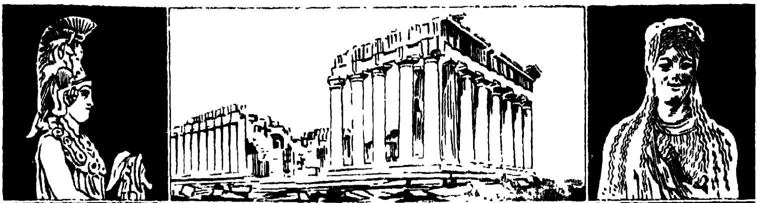
সমুদ্রগুপ্ত কেবল দিগ্বিজয়ী নৃপতি ছিলেন না। পরন্তু তিনি কবি, দার্শনিক, রাজনীতিজ্ঞ—একাধারে সকলই ছিলেন। সঙ্গীত-কলায় তিনি নারদ ও তুম্বুরুকেও লজ্জিত করিতেন, একথা প্রশস্তিকার হরিষেণ স্বয়ং বলিয়াছেন। তাঁহার সঙ্গীত-প্রিয়তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ কতকগুলি বীণাঙ্কিত মুদ্রা। এই সকল



বীণাবাদনরত সমুদ্রগুপ্তের মুদ্রা

মুদ্রায় মহারাজাধিরাজ সমুদ্রগুপ্ত লেখা আছে ও বীণাবাদনরত রাজমূর্ত্তি অঙ্কিত আছে। সমুদ্রগুপ্ত সাহিত্যের অনুরাগী ও সাহিত্যিকের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। হরিষেণ লিখিয়াছেন যে, তিনি কাব্য ও লক্ষ্মীর বিরোধ মিটাইয়া দিয়াছিলেন। তিনি অতিশয় কাব্যরসিক ছিলেন ও স্বয়ং উচ্চশ্রেণীর কাব্যরচনায় অশেষ দক্ষতা প্রদর্শন করিয়াছিলেন। তিনি স্বধর্ম্মানুরাগী ছিলেন ও বেদমার্গের অনুগামী ছিলেন, তিনি অতিশয় দয়ালু ছিলেন, পরাজিত শত্রুদের সহিত তিনি অতিশয় উদার ব্যবহার করিতেন। তিনি দরিদ্রনারায়ণের সেবা করিতেন। ফলতঃ তিনি আদর্শ রাজা ছিলেন।

সমুদ্রগুপ্ত সিংহলের রাজা মেঘবর্ণের সমসাময়িক ছিলেন। মেঘবর্ণের রাজ্যকাল ৩৫১ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত। তাঁহার উত্তরাধিকারী চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়ের প্রাচীনতম লিপি ৩৮০ খ্রীষ্টাব্দে উৎকীর্ণ হইয়াছিল, অর্থাৎ উক্ত বৎসরে চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় সিংহাসনারূঢ় ছিলেন। আমরা সমুদ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ৩৩৫ খ্রীষ্টাব্দ হইতে ৩৭৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত ধরিতে পারি।



পৃথিবীর ইতিহাস

গ্রীস—স্পার্টা

১৯৮০ পৃষ্ঠার পর

উত্তর দিক হইতে ডোরিয়ান (Dorian) গ্রীকরা পেলোপনিসাসে (Peloponnesus) আসিয়া ইউরোটাস্ নদীর উপত্যকায় আস্তানা গাড়িয়া বসে। তাহারা আপনাদিগকে ল্যাসিডিমনিয়ান্ (Lacedaemonian) বলিত। তাহারা প্রথমাবস্থায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রাম প্রতিষ্ঠা করিয়া বাস করিতেছিল। কালক্রমে এখানে স্পার্টা নামে একটি সহর গড়িয়া উঠে। এই সহরের অধিবাসীরা নিজদিগকে স্পার্টান (Spartan) বলিত এবং আশেপাশের গ্রামগুলির উপর প্রভুত্ব বিস্তার করিয়াছিল। এই সব গ্রামের অধিবাসীরা যদিও স্বাধীন ছিল এবং স্থানীয় শাসন ব্যাপার তাহাদের নিজেদের হাতেই ছিল, তথাপি স্পার্টা রাজ্যের নাগরিক অধিকার তাহাদের মোটেই ছিল না। রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা স্পার্টানদেরই একচেটিয়া ছিল। তবে স্পার্টার হইয়া তাহাদিগকে যুদ্ধ করিতে হইত এবং রাজ সরকারের জমি চাষ বাস করিতে হইত। সুতরাং রাষ্ট্র ও সমাজে তাহাদের স্থান স্পার্টানদের নীচে ছিল। ইহাদের পেরিইকাই (Perioeci) বলা হইত।

স্পার্টারাজ্যের শাসনতন্ত্র অদ্ভুত ছিল। সাধারণতঃ কোন রাজ্যে একজন মাত্র রাজা থাকেন, স্পার্টায় কিন্তু একই সময় দুইজন রাজা রাজত্ব করিতেন। তাঁহাদের ক্ষমতাও ছিল ঠিক একই প্রকার। দুইটি রাজবংশ ছিল এবং রাজছত্র বংশপরম্পরা প্রচলিত ছিল। পিতার মৃত্যুর পর পুত্রই রাজা হইতেন। ধর্ম্মবিষয়ে তাঁহাদের অনেকটা ক্ষমতা ছিল, তাঁহারা ছিলেন রাজ্যের প্রধান পুরোহিত। যুদ্ধের সময় তাঁহাদের ক্ষমতা ছিল অপ্রতিহত। তাঁহারা ছিলেন প্রধান সেনাপতি এবং যুদ্ধক্ষেত্রে সৈন্যদের জীবন-মরণের ক্ষমতা তাঁহাদের হাতে ছিল। তাঁহাদের রক্ষা করিবার জন্য একশত দেহরক্ষী নিযুক্ত হইত। তবে যুদ্ধঘোষণা অথবা শান্তি-স্থাপনের ভার তাঁহাদের হাতে ছিল না। এবিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত করিত জনসভা। আর তাহা ছাড়া যুদ্ধক্ষেত্রে কোন অন্যায় ব্যবহার করিলে যুদ্ধশেষে সাধারণের কাছে তাঁহাদিগকে জবাবদিহি করিতে হইত। বিচার বিষয়ে সাধারণতঃ তাঁহাদের কোন ক্ষমতা ছিল না। তাঁহাদের ব্যয়নির্ব্বাহের জন্য জমিদারী নির্দ্দিষ্ট ছিল। ইহা ব্যতীত আরও নানাপ্রকার আয় তাঁহাদের ছিল। যাগযজ্ঞের সময় তাঁহারা নিহত পশুর চামড়া ও মাংসের দ্বিগুণ অংশ পাইতেন। রাষ্ট্রীয়-ভোজের সময় তাঁহাদিগকে সর্ব্বপ্রধান আসন ও বিশিষ্ট ভোজ্যদ্রব্য দেওয়া হইত।

শাসনব্যাপারে তাঁহাদিগকে সাহায্য করিত প্রবীণ পরিষদ (Council of Elders)। ইহাকে গেরুসিয়া (Gerusia) বলা হইত। রাজারাও এই পরিষদের সভ্য ছিলেন। তাঁহাদিগকে লইয়া

মোট সভ্যসংখ্যা ছিল ত্রিশ। সাধারণ সভ্যদের অন্ততঃপক্ষে ৬০ বৎসর বয়স্ক হইতে হইত। জনসভা তাহাদের মনোনয়ন করিত এবং একবার মনোনীত হইলে আজীবন তাঁহারা সভ্য থাকিতেন। শুধু অভিজাত-সম্প্রদায়ের লোকেরাই নির্ব্বাচিত হইতে পারিতেন। ইঁহাদের প্রধান কাজ ছিল রাজাদের পরামর্শ দেওয়া এবং যে সব ব্যাপার জনসভায় আনা হইত, তাহার আলোচনা ও সিদ্ধান্ত করা। ফৌজদারী মামলার বিচার ইহারাই করিতেন।

স্পার্টার জনসভার (Assembly) নাম ছিল আপেল্লা (Apella)। ত্রিশ বৎসরের অধিক বয়স্ক স্পার্টানরা এই জনসভার সভ্য ছিল। মাসে একবার করিয়া ইহার অধিবেশন হইত এবং ইহাতে বৈদেশিক ব্যাপার, যুদ্ধ ও শান্তি প্রভৃতির সিদ্ধান্ত হইত। এই সভাতে কোন আলোচনা হইত না—সমবেত জনতা শুধু 'হাঁ' কি 'না' বলিতে পারিত।

তবে স্পার্টার শাসনতন্ত্রের সর্ব্বাপেক্ষা -- যোগ্য অঙ্গ হইল পাঁচজন ইফোর (Ephors)। যে কোন স্পার্টান এই পদের প্রার্থী হইতে পারিত, আর নির্ব্বাচন করা হইত ভাগ্য পরীক্ষা করিয়া by lot)। ইফোরদের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল প্রজাদের স্বার্থ রক্ষা করা। তাঁহারা রাজাদের প্রত্যেক কাজেই শ্যেনদৃষ্টি রাখিতেন, যাহাতে কাহারও প্রতি কোনরূপ অন্যায় অবিচার না হয়। এমন কি যুদ্ধের সময় দুইজন ইফোর রাজার সঙ্গে থাকিতেন। রাজারা কোন অন্যায় করিলে তাহার বিচার পর্য্যন্ত তাঁহারা করিতেন। দেওয়ানী মামলার বিচারও তাঁহারা করিতেন এবং পেরিইকাইদের ফৌজদারী মামলাও তাঁহাদের কাছে হইত। স্পার্টা রাজ্যের শান্তি ও শৃঙ্খলা-রক্ষার ভারও ইঁহাদের হাতে ছিল। এক কথায় ইঁহারাই ছিল রাজ্যের একরূপ সর্ব্বেসর্ব্বা।

স্পার্টান ও পেরিইকি ছাড়া আরও একশ্রেণীর লোক ছিল, তাহাদের হিলট্ (Helot) বলা হইত। স্পার্টার দক্ষিণ-পশ্চিম দেশের নাম মেসেনিয়া (Messenia) ছিল। স্পার্টানরা মেসেনিয়াবাসীদের পরাজিত করিয়া তাহাদের দেশ অধিকার করিয়া তাহাদের জমি-জমা কাড়িয়া লয় এবং পরাজিত লোকদের হিলট্শ্রেণীতে পরিণত করে। অবশ্য মেসেনিয়া-জয়ের পূর্ব্বেও স্পার্টা রাজ্যে হিলট্ ছিল। হিলট্দের অবস্থা অনেকটা ক্রীতদাসের মত ছিল, যদিও কতক বিষয়ে তাহারা তাহাদের অপেক্ষা ভাল ছিল। তাহাদের কাজ ছিল স্পার্টান প্রভুর জন্য জমি চাষ করা। যে জমি তাহারা চাষ করিত, তাহা হইতে তাহাদিগকে উচ্ছেদ করা যাইত না। তাহাদিগকে অবশ্য প্রতি বৎসর নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ শস্য, মদ ও ফলমূলাদি প্রভুকে দিতে হইত। উদ্বৃত্ত অংশ তাহারা নিজের ভোগের জন্য পাইত—তাহাদের নিজ নিজ বাড়ী ও স্ত্রী-পরিবার ছিল। যুদ্ধের সময় তাহাদিগকে প্রভুর সঙ্গে যাইতে হইত। কাজেই হিলট্রা নিজের অবস্থায় মোটেই সন্তুষ্ট ছিল না। সুতরাং সুবিধা পাইলেই তাহারা বিদ্রোহ করিতে ইতস্ততঃ করিত না। যাহাতে তাহাদের মধ্যে অশান্তি প্রবল না হইতে পারে, সেইজন্য একদল যুবককে তাহাদের উপর চোখ রাখিবার জন্য গ্রামে গ্রামে পাঠান হইত। তাহাদের কাহারও উপর যখন সন্দেহ হইত, তখনই তাহারা তাহাকে মারিয়া ফেলিতে পারিত। এই গুপ্তচরদিগকে ক্রিপ্টিয়া (Krypteia) বলা হইত। এই উপায়েই অল্পসংখ্যক স্পার্টান সংখ্যাধিক হিলট্দের নিজেদের আয়ত্তাধীনে রাখিত।

স্পার্টানরা কিন্তু সর্ব্বদাই এই বিপদের বিষয় সচেতন থাকিত। তাহারা জানিত হিলট্রা সকলেই মনে মনে বিশেষ অসন্তুষ্ট, যে কোন মুহূর্ত্তেই বিদ্রোহের আগুন জ্বলিয়া উঠিতে পারে। সেইজন্য তাহাদিগকে সর্ব্বদাই যুদ্ধের জন্য প্রস্তুত থাকিতে হইত এবং এইজন্যই স্পার্টান রাজ্যের একমাত্র উদ্দেশ্য ও আদর্শ ছিল এক শক্তিশালী সামরিক জাতি গঠন করা। স্পার্টার শিক্ষা-দীক্ষা, আইন-কানুন—সবারই লক্ষ্য ছিল যে, স্পার্টানরা সকলেই আদর্শ সৈনিক হইবে। প্রত্যেক স্পার্টানকে আজীবন বিশেষ শৃঙ্খলার (discipline) মধ্যে অতিবাহিত করিতে হইত। তাহার প্রত্যেক খুটিনাটি কাজের উপরই রাষ্ট্রের সজাগ দৃষ্টি থাকিত। ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই প্রত্যেক স্পার্টানের জীবনের উপর রাষ্ট্রের প্রভাব আরম্ভ হইত, এবং ইহার শেষ হইত মৃত্যুর সঙ্গে। প্রকৃতপক্ষে স্পার্টাকে একটা বৃহৎ সামরিক বিদ্যালয় বলিলে ভুল হইবে না। প্রত্যেক স্পার্টানকেই সৈন্য হইতে হইত এবং

সেইজন্য ভূমিষ্ঠ হইবামাত্রই তাহার শিক্ষা আরম্ভ হইত। প্রত্যেক শিশু ভূমিষ্ঠ হইলেই তাহাকে গোষ্ঠীপতিদের (Heads of the Tribe) কাছে আনা হইত। তাঁহারা যদি মনে করিতেন যে, শিশুটী দুর্ব্বল অথবা রুগ্ন, তাহা হইলে টেইজিটাস পর্ব্বতে (Mt Taygetus) তাহাকে ফেলিয়া দেওয়া হইত—তাহার আর বাঁচিয়া থাকিবার কোন অধিকার থাকিত না। সাত বৎসর পর্য্যন্ত শিশু মায়ের কাছে থাকিত, তারপর তাহাকে মায়ের নিকট হইতে সরাইয়া সরকারী স্কুলে ভর্ত্তি করা হইত। তাহাকে নানারূপ খেলা-ধূলা, শারীরিক ব্যায়াম ও সামরিক শিক্ষা দেওয়া হইত। তাহাকে সর্ব্বদা কঠোর শৃঙ্খলার মধ্যে থাকিতে হইত। শিক্ষার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল কষ্ট সহ্য করিতে অভ্যস্ত করা। সহিষ্ণুতা পরীক্ষা করিবার জন্য তাহাদিগকে মাঝে মাঝে কষাঘাত করা হইত, যে নীরবে অম্লানবদনে সমস্ত তাড়না সহ্য করিতে পারিত, তাহারই কৃতিত্ব সর্ব্বাপেক্ষা বেশী। কথিত আছে, মাঝে মাঝে কেহ কেহ বেত্রাঘাতে জর্জ্জরিত হইয়া মারা যাইত, তবু কোনরূপ শব্দ করিত না। ক্ষুধা-তৃষ্ণা সহ্য করিতেও তাহাদিগকে অভ্যস্ত করা হইত। এইজন্য তাহাদিগকে যে খাদ্যদ্রব্য দেওয়া হইত, তাহাও পর্য্যাপ্ত পরিমাণে নহে। ইচ্ছা করিলে অবশ্য শিকার করিয়া আহার্য্য সংগ্রহ করিতে পারিত। এমন কি চুরি করাও দোষের ছিল না, তবে ধরা পড়িলে বিশেষ শাস্তি ভোগ করিতে হইত। কুড়ি বৎসর বয়সে স্পার্টান যুবকের সামরিক জীবন আরম্ভ হইত। তাহাকে এই সময় বিবাহ করিতে হইত, কিন্তু সংসার-ধর্ম্ম পালন করিতে দেওয়া হইত না। কারণ তাহাকে অন্যান্য সঙ্গীদের সঙ্গে সৈন্যাবাসে থাকিতে হইত। তবে অনেক সময় তাহারা পালাইয়া স্ত্রীর সঙ্গে দেখা করিতে আসিত। ত্রিশ বৎসর বয়স হইলে তাহার শিক্ষা সমাপ্ত হইত এবং সে সর্ব্বপ্রকার নাগরিক অধিকার (right of citizenship) লাভ করিত। এইবার সে গৃহধর্ম্ম পালন করিতে পারিত, কিন্তু খাইতে হইত তাহাকে অন্য সঙ্গীদের সহিত একসঙ্গে মিলিত ভাবে।

স্পার্টানদের জীবন ছিল কঠোর সাধনা। দেশের বেদীমূলে প্রত্যেক স্পার্টানকেই আত্মোৎসর্গ করিতে হইত। ব্যক্তিত্ব বলিয়া তাহার আর কিছু থাকিত না। দেশ ও রাষ্ট্রই ছিল তাহার সব, জীবনের একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল দেশের সেবা করা—দেশরক্ষার জন্য সর্ব্বদা প্রস্তুত থাকা। তাহার জীবনে বিশ্রাম ও আয়াসের কোন অবসর ছিল না। সকল প্রকার বিলাসিতা তাহার পক্ষে নিষিদ্ধ ছিল। স্পার্টান জীবনের সরলতা প্রবাদ বচনে পরিণত হইয়াছিল। যাহাতে কোনরূপ বিলাসিতা না আসে, সেইজন্য কাহাকেও সোনা ও রূপা রাখিতে দেওয়া হইত না। অবশ্য অনেকে গোপনে এই আইন ভঙ্গ করিত।

স্পার্টান মেয়েদের জীবনও কঠোর সাধনায় অতিবাহিত হইত। তাহারাও দেশকে প্রাণের চেয়েও বেশী ভালবাসিত। যুদ্ধে যাইবার সময় স্পার্টান-মাতা তাহার পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিত—হয় জয়ী হইয়া ফিরিবে—না হয় যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিবে।

স্পার্টানরা মনে করিত, তাহাদের শিক্ষাদীক্ষা ও শৃঙ্খলার আদর্শ **লাইকারগাস** নামে স্পার্টার একজন প্রধান পণ্ডিতের সৃষ্টি।

আজকালকার ঐতিহাসিকেরা তাহা বিশ্বাস করেন না।

এথেন্স্

এদিকে গ্রীসদেশে আর একটি নগর-রাজ্য আস্তে আস্তে বড় হইয়া উঠিতেছিল। এই রাজ্যটির নাম এথেন্স। অতি প্রাচীনকালে অ্যাটিকা প্রদেশে (Attica) অনেকগুলি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্য ছিল। এখানকার আদিম অধিবাসীদের পেলাসগীয়ান বলা হইত। কালক্রমে গ্রীকেরা আসিয়া তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া অ্যাটিকা অধিকার করে। এই গ্রীকদের নাম ছিল কেক্রোপ্ (Cecropes)। পরে অন্য গ্রীকেরা শক্তিশালী হইয়া নিজেদের আধিপত্য বিস্তার করে ও এথেনা দেবীর (Athena) পূজা প্রবর্ত্তন করেন। এই গ্রীকদের এথেনীয়ান্ বলা হইত ও তাহাদের রাজ্যের নাম হইল এথেন্স্। অবশেষে অ্যাটিকার ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রাজ্যগুলি এথেন্সের সঙ্গে মিলিয়া একটি বৃহত্তর রাষ্ট্রের সৃষ্টি করে—এই নব রাষ্ট্রের নাম হইল এথেন্স। এথেনীয়ানরা মনে করিত যে, এই মিলনের কর্ণধার ছিলেন থিসিউস্ (Theseus)।

প্রথমে এথেন্স্ রাজতন্ত্র ছিল। পরে আস্তে আস্তে রাজতন্ত্রের পরিবর্তে অভিজাত তন্ত্র Aristocracy স্থাপিত হয়। রাজার ক্ষমতা সীমাবদ্ধ করিয়া অভিজাত সম্প্রদায়ের লোকেরা একজন সেনাপতি মনোনীত করে। ইহার নাম হইল পলিমাক (Polemerch)। তারপর একজন রাজপ্রতিনিধি অথবা আকণ (Archon) নিযুক্ত করা হয়। রাজার অধিকাংশ ক্ষমতা ইহার হাতে ন্যস্ত করা হয়। প্রথমে মিডনটিড্ বংশের কাহাকেও আকণ করা হইত এবং তিনি মৃত্যু পর্য্যন্ত ঐ পদে অধিষ্ঠিত থাকিতেন। পরে দশ বৎসরের জন্য আকণ নিযুক্ত করা হইত। অবশেষে প্রতিবৎসর একজন নূতন লোককে আকণ মনোনীত করা হইত এবং অন্য বংশের লোকেরাও ঐ পদে নিযুক্ত হইতে পারিতেন। রাজপদবী অবশ্য একেবারে তুলিয়া দেওয়া হইল না। একজন সাক্ষীগোপাল রাজা (Basileus) থাকিতেন। এমন কি শেষে যখন সমস্ত কর্ম্মচারীকেই একবৎসরের জন্য নিযুক্ত করা হইত, তখন ইহাদের মধ্যে একজনের রাজা উপাধি (Archon Basileus) থাকিত।

খৃঃ পূঃ সপ্তম শতাব্দীতে এথেন্সে অভিজাততন্ত্র প্রতিষ্ঠিত ছিল। রাজ্য শাসনভার একবৎসরের জন্য মনোনীত তিনজন কর্ম্মচারীর হাতে ছিল। তাঁহাদের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় ছিলেন আকণ। আকণের প্রধান কর্ত্তব্য ছিল দেওয়ানী মামলার বিচার করা। পলিমার্ক ছিল সেনাপতি—তাহা ছাড়া যে সমস্ত মোকদ্দমায় অনাগরিকেরা (non-citizen) জড়িত ছিল, তাহাদের বিচারও তিনি করিতেন। আর রাজা নামে অভিহিত কর্ম্মচারীর কাজ ছিল রাষ্ট্রীয় ধর্ম্মের বন্দোবস্ত করা এবং কতকগুলি বিশেষ মোকদ্দমার তত্ত্বাবধান করা।

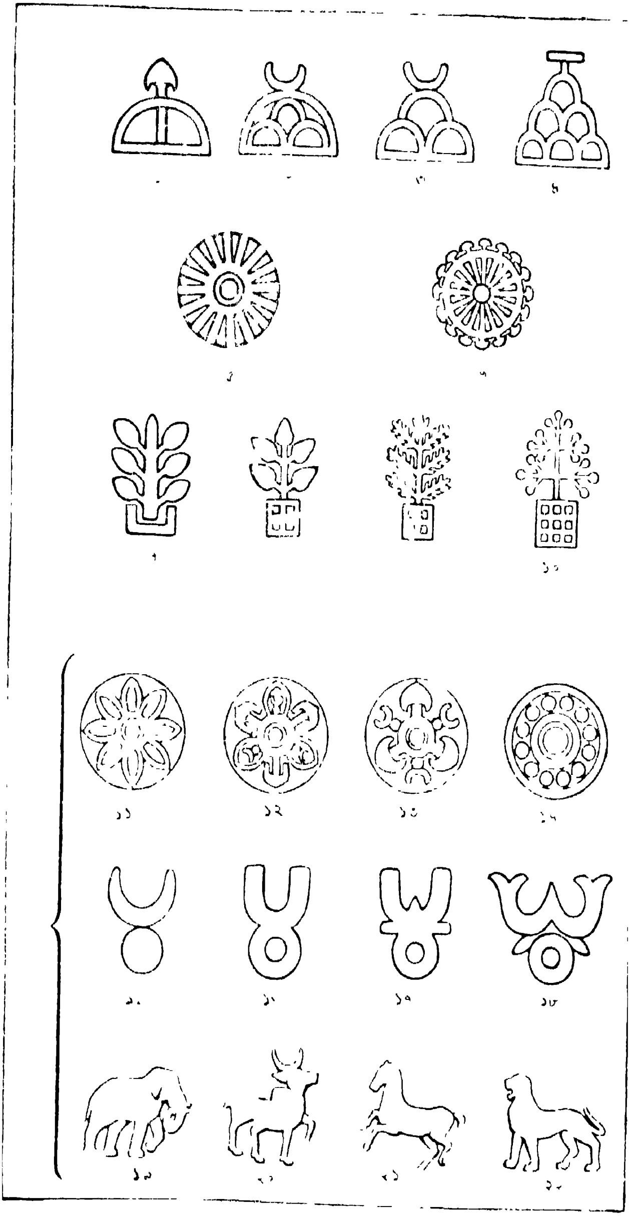
প্রবীণ পরিষদের পরে কাউন্সিল অব এরিও-পেগাস্ (Council of Areopages) নামে পরিচিত হন। এই নামের উৎপত্তির কারণ এই যে, কতকগুলি বিশেষ ব্যাপারে এই পরিষদের অধিবেশন এরিস্ পর্ব্বতে হইত। এই কাউন্সিলেই নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর ফৌজদারী মোকদ্দমার বিচার করিত।

এথেন্স রাজ্যের অধিবাসীরা চারিটী গোষ্ঠীতে বিভক্ত ছিল। এই গোষ্ঠীদের নাম ছিল—গেলিওন্টিস্, আর্গোডিস্, আইজিকরিস্ ও হপ্লিট্স্। ইহা ছাড়া এথেন্সের নাগরিকেরা আবার তিন শ্রেণীতে বিভক্ত ছিল—ইউপ্যাট্রিডী (Eupatridae) অথবা সম্ভ্রান্ত লোক, জার্জ্জি (Georgi) অথবা কৃষিজীবী ও ডেমিয়ার্জি অথবা দোকানদার ও ব্যবসায়দার। এই সমস্ত নাগরী-কেরা (Citizens) জন-সভার সভ্য ছিল। এই তিন শ্রেণীর নাগরিক ছাড়া আরও অনেক স্বাধীন লোক ছিল, তাহাদের কিন্তু নাগরিকের অধি-কার ছিল না। তাহাদের নিজেদের কোন জমি-জমা ছিল না—অন্যের জমীতে মজুরের কাজ করিয়া তাহারা জীবিকা-নির্ব্বাহ করিত।

এদিকে ব্যবসায়-বাণিজ্যের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে দেশের ধন-সম্পদ বাড়িতে লাগিল। অভিজাত শ্রেণীর অনেকে দরিদ্র হইল, আবার সাধারণ লোকের মধ্যে অনেকে প্রভূত সম্পদশালী হইল। এই অবস্থায় রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা অভিজাত শ্রেণীর হাতে একচেটিয়া করিয়া রাখা অসম্ভব হইল। কাজেই পুরাতন শ্রেণীবিভাগের স্থানে এক নূতন শ্রেণী বিভাগ স্থাপিত হইল। পুরাণ শ্রেণীবিভাগ ছিল জন্মগত কিন্তু নূতন শ্রেণী বিভাগ হইল ধনতান্ত্রিক। অর্থসম্পদ অনুসারে লোকদিগকে তিন ভাগ করা হইল। প্রথম শ্রেণীর নাম ছিল পেন্টাকোশিও মেডিমি, দ্বিতীয়শ্রেণী হিপ্পিয়াস্ ও তৃতীয় শ্রেণী জিউগাইটাই। আকণ প্রভৃতি প্রধান শাসনকর্ত্তারা প্রথম শ্রেণী হইতে মনোনীত হইতেন। তার পূর্ব্বে যেমন ইহাদিগকে ইউপ্যাট্রিড্ অথবা অভিজাত শ্রেণীর হইতে হইত, এখন আর সে নিয়ম রহিল না। এই সময়ে আরও ছয় জন নূতন কর্ম্মচারী নিযুক্ত হইলেন, তাঁহাদিগকে থেস্মোথিটী (Thes-mothetae) অথবা বিচারক বলা হইত। তাঁহাদের প্রধান কাজ ছিল বিচার-বিভাগের তত্ত্বাবধান করা। এই ছয়-জন থেস্মোথিটী ও আর্কণ, পলিমার্ক ও রাজা—এই নয় জন প্রধান কর্ম্মচারী রাজ্য শাসন করিতেন। অনেক সময় এই নয় জনকেই আর্কণ বলা হইত।

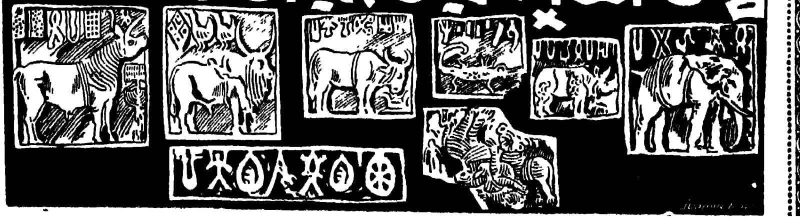
পূর্ব্বোক্ত তিন শ্রেণীর লোক ছাড়া আরও অনেক লোক ছিল, তাহাদের আয় খুব কম ছিল। তাহাদের কেহ কেহ সামান্য কৃষক ছিল—আবার কেহ কেহ ছিল কারুকার। ইহাদিগকে থীট্স্ (Thetes) বলা হইত। নাগরিক বলিয়া গণ্য করা হইলেও ইহাদের কোন রাষ্ট্রীয় অধিকার ছিল না।

প্রাচীন ভারতের মুদ্রায়—বৌদ্ধ নিদর্শন



মুদ্রাতত্ত্ব [illegible] হইয়া [illegible] মুদ্রা [illegible] [illegible]। প্রাচীন [illegible] মুদ্রা [illegible] অনেক [illegible] চিহ্ন আছে। ১, ২, ৩, ৪, চিহ্ন [illegible] [illegible] ... [illegible] ১৯, ৩৩, শ্বেতহস্তী মায়াদেবীর উদরে প্রবেশ করেন, বুদ্ধদেবের জন্ম জ্ঞাপক, ২০ বৃষ জন্মরাশি, ২১ অশ্ব মহানিষ্ক্রমণ চিহ্ন, ২২ সিংহ, শাক্যসিংহ (শাক্যকুলে সিংহ সদৃশ Lion among the Çakyas শাক্যমুনি) অনেক প্রাচীন মুদ্রায় এইরূপ নিদর্শন অঙ্কিত আছে।

প্রাচীন ভারতের মুদ্রাতত্ত্ব



প্রাচীন জনপদ ও গণসমূহের মুদ্রা

২০২৯ পৃষ্ঠার পর



অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রাগুলির উৎপত্তিস্থান সকল সময় নির্ণয় করা সহজ নহে। কোন কোনও প্রদেশের বিশেষ চিহ্ন ছিল, মুদ্রার উপর ঐ চিহ্নগুলি পাওয়া গেলে সেইটা কোন্ স্থানের মুদ্রা, তাহা অতি সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়। কিন্তু আমরা এখন পর্যন্ত সকল প্রদেশের চিহ্নগুলি নির্দ্ধারণ করিতে পারি নাই। তক্ষশিলায় একটি বিশেষ চিহ্ন ছিল। এই চিহ্নটি যে সকল অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রায় দেখা যায়, তাহা তক্ষশিলার মুদ্রা বলিয়া চিনিতে কোনই কষ্ট হয় না। এই মালবচিহ্নটা মালবদেশীয় মুদ্রায় পাওয়া যায়। যদি আমরা বিভিন্ন প্রদেশের বা জাতির নির্দ্দেশক চিহ্নগুলি চিনিতে পারিতাম, তাহা হইলে অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রার উৎপত্তি স্থান নির্ণয় করা অতি সহজ হইত। পরবর্ত্তিকালের মুদ্রাগুলির উপর বিভিন্ন মূর্ত্তি এবং কোন কোন সময়ে উৎকীর্ণ লিপিও পাওয়া যায়। যে সমস্ত মুদ্রার লিপিতে উৎপত্তিস্থানের উল্লেখ আছে, সেইগুলি অতি সহজেই চিনিয়া লওয়া যায়, কিন্তু কেবলমাত্র মুদ্রার উপর অঙ্কিত মূর্ত্তির সাহায্যে বিভিন্ন প্রদেশের মুদ্রা চিনিয়া উঠা সহজ নহে। যে সকল প্রদেশের বা জাতির মুদ্রাসমূহ সম্যক নির্দ্ধারিত হইয়াছে, তাহাদিগের কিঞ্চিৎ বিবরণ দেওয়া গেল।

আর্জ্জুনায়ন—মহাভারত প্রভৃতি প্রাচীনগ্রন্থে এই জাতির উল্লেখ নাই। পাণিনির গণপাঠে প্রথম এই নাম পাওয়া যায়। খৃষ্টীয় চতুর্থ শতাব্দীর (৩৮০ খৃঃ অঃ) সমুদ্রগুপ্তের এলাহাবাদস্থিত প্রসিদ্ধ অনুশাসনের প্রত্যন্তজাতিদিগের ভিতর আর্জ্জুনায়নদের নাম পাওয়া যায়। সম্ভবতঃ খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীতে শুঙ্গরাজত্বকালে এই জাতিটীর উদ্ভব হয় এবং জাতির প্রতিষ্ঠাতা আর্জ্জুনায়নের নামে ইহার নামকরণ হইয়াছিল। তাহারা আগ্রা ও মথুরার পশ্চিমদিকে, বর্ত্তমান ভরতপুর ও আলোয়ার প্রদেশে বাস করিত। এই জাতির মুদ্রা খৃঃ পূঃ প্রথম শতাব্দীতে প্রচলিত হইয়াছিল, কিন্তু এই সকল মুদ্রা অত্যন্ত দুষ্প্রাপ্য এবং সমস্তই তাম্রনির্ম্মিত। ব্রাহ্মী অক্ষরে লিপিতে জাতির নাম লিখিত আছে- (ক) 'আর্জু-নায়ন'—আর্জ্জুনায়নদিগের (মুদ্রা), (খ) অথবা 'আর্জ্জুনায়ন জয়'—আর্জ্জুনায়নদিগের জয় হউক! এই জাতির মুদ্রার সহিত যৌধেয়, ঔড়ুম্বর, রাজন্য প্রভৃতি জাতির মুদ্রার বিশেষ সাদৃশ্য আছে। আর্জ্জুনায়নদিগের দুই রকমের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে।

প্রথম শ্রেণী—দণ্ডায়মান মূর্ত্তি ও ককুদপৃষ্ঠ বৃষ (তাম্র)। এই প্রতীকের (Type) সম্মুখভাগে ককুদপৃষ্ঠ (Humped) বৃষ ও পশ্চাতে প্রসারিত দক্ষিণ হস্ত একটী দণ্ডায়মান মনুষ্যমূর্ত্তি এবং মুদ্রার কিনারায় ব্রাহ্মীঅক্ষরে লিপি—'আর্জ্জুনায়ন'।

দ্বিতীয় শ্রেণী—হস্তী ও বৃষ — (তাম্র)। সম্মুখভাগে বেষ্টনীমধ্যস্থ

একটী বৃক্ষ ও বামপার্শ্বে উত্তোলিত শুণ্ড একটী হস্তী; পশ্চাতে 'আৰ্জ্জুনয়ন জয়' লিপি ও একটা বক্র পদার্থ, সম্ভবতঃ একটী ধ্বজচিহ্ন। হস্তীর জায়গায় উষ্ট্রও দেখা যায়, কিন্তু অতি অস্পষ্ট বলিয়া ঠিক উষ্ট্র কিনা নির্ণয় করা যায় না।

অশ্বক—প্রাচীন তক্ষশিলার নিকটে কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছিল; এইগুলির একপৃষ্ঠে **'বটশ্বক'** কথাটী ব্রাহ্মী অক্ষরে মুদ্রিত আছে। অধ্যাপক রেপ্‌সনের মতে মুদ্রাগুলি অন্ততঃ খৃষ্টপূর্ব্ব দুই শত বৎসর পূর্ব্বেকার, কিন্তু বস্তুতঃ এইগুলিকে আরও পূর্ব্বকালের বলিয়াই মনে হয়। 'বটশ্বক' শব্দটীর অর্থ সম্বন্ধে নানা মত আছে। কিন্তু ইহা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে যে, এইগুলি অশ্বক-জাতির মুদ্রা। আফগানিস্থানের সন্নিকটে স্বাৎ উপত্যকায় অশ্চকেনয় (Assakenoi) জাতির উল্লেখ এরিয়ানের (Arrian) গ্রন্থে পাওয়া যায়। ইহারা মহাবীর আলেকজাণ্ডারের সহিত যুদ্ধ করিয়াছিল। সংস্কৃত ভাষায় এই জাতি অশ্বক নামে পরিচিত। 'বট' শব্দের অর্থ কপর্দ্দক বা কড়ি, ইহা বঙ্গদেশে এখনও প্রচলিত আছে। প্রাচীন-কালে কড়িও মুদ্রারূপে ব্যবহৃত হইত। সুতরাং 'বটশ্বক' শব্দটীর অর্থ—অশ্বকদিগের বট বা মুদ্রা। তক্ষশিলার নিকট এই শ্রেণীর আরও কতকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে, কিন্তু ইহাদের উপরে 'বটশ্বক' বা অন্য কোনও লিপি নাই। এই সকল মুদ্রাও অশ্বকজাতির মুদ্রা বলিয়া মনে হয়, তবে 'বটশ্বক' লিপিযুক্ত মুদ্রা হইতে প্রাচীন। ইহাতে আশ্চর্য্য হওয়ার কোনও কারণ নাই। অশ্বকজাতি গ্রীসীয় বীর আলেকজাণ্ডারের সমসাময়িক এবং তৎকালে অর্থাৎ খৃঃ পূঃ চতুর্থ শতাব্দীতে বিশেষ ক্ষমতাপন্ন জাতি বলিয়া পরিচিত ছিল এবং তাহারাই এই সকল মুদ্রা ব্যবহার করিত—এইরূপ অনুমান করা অন্যায় হইবে না।

অশ্বকদিগের দুই রকমের মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এইগুলির এক পিঠ সাদা; অন্য পিঠে লিপি ও চিহ্ন অঙ্কিত আছে। প্রথম শ্রেণীর মুদ্রাগুলির উপর কোন লিপি খোদিত নাই, কেবল কতকগুলি চিহ্ন আছে—তন্মধ্যে দুইটী পর্ব্বতচিহ্ন, একটা স্বস্তিকা এবং একটী বক্ররেখা, সম্ভবতঃ কোনও নদী-চিহ্ন। কতকগুলি গোলক স্তূপাকার করিয়া একটা পর্ব্বত-চিহ্ন গঠিত হইয়াছে, অপরটী কেহ কেহ বৌদ্ধদিগের চৈত্য বা উপাসনাগারের চিহ্ন বলিয়া মনে করেন, কিন্তু বাস্তবিক পক্ষে কোনও পর্ব্বতের প্রতিকৃতি বলিয়াই মনে হয়। দ্বিতীয় শ্রেণীর মুদ্রা-গুলিতে এই সকল চিহ্ন আছে, তৎসঙ্গে পোষাক পরিহিত একটী মনুষ্যমূর্ত্তি হস্তোত্তলন করিয়া উপাসনার ভঙ্গিতে দণ্ডায়মান রহিয়াছে; তাহার নীচে একটী নন্দিপদ চিহ্ন এবং বামপার্শ্বে খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতাব্দীর ব্রাহ্মী অক্ষরে 'বটশ্বক' লিপিটী মুদ্রিত আছে। এই মুদ্রাগুলি যদিও অতি প্রাচীন, কিন্তু দেখিতে বেশ সুন্দর এবং লিপিযুক্ত মুদ্রা বলিয়া ঐতিহাসিকদিগের নিকট অতি গুরুত্ব-বিশিষ্ট। এই সময় হইতেই বোধ হয় অন্যান্য দেশের অনুকরণে ভারতীয় মুদ্রার উপর লিপি মুদ্রিত হইতে আরম্ভ হয়।

অবন্তী—খৃষ্টীয় ৭ম বা ৮ম শতকের পূর্ব্বে মালবদেশকে অবন্তী বলিত এবং ইহার রাজধানী ছিল বিখ্যাত উজ্জয়িনী নগর। খৃষ্টপূর্ব্ব তৃতীয় শতকে মৌর্য্যবংশীয় রাজা অশোক এখানে বাস করিয়াছিলেন। পেরিপ্লাস নামক গ্রীক্ গ্রন্থে ইহার উল্লেখ পাওয়া যায় এবং টোলেমির মতে ইহা খৃষ্টীয় দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগে শকবংশীয় ক্ষত্রপ বা শাসনকর্ত্তা চষ্টনের রাজধানী ছিল।

অবন্তীর মুদ্রাগুলির বিপরীত দিকে একটা বিশেষ চিহ্ন আছে—ক্রুশচিহ্নের চারিপ্রান্তে চারিটা গোলক। ইহাকে পূর্ব্বে উজ্জয়িনীচিহ্ন বলা হইত, কিন্তু এইটী মালবদেশের বিভিন্ন অংশে, ইরণ, বেস্‌নগর প্রভৃতি স্থানে পাওয়া যায়। সুতরাং ইহাকে মালব-চিহ্ন বলাই যুক্তিযুক্ত। স্মিথ সাহেব এই সকল মুদ্রাকে মোটামুটি দুই ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন—(ক) গোলাকার; এবং (খ) চতুষ্কোণ। সাধারণতঃ উজ্জয়িনীর লোকেরা গোলাকার এবং ইরণের লোকেরা চতুষ্কোণ মুদ্রা ভালবাসিত। এই মুদ্রা-গুলির আরও একটা বৈশিষ্ট্য আছে। পূর্ব্বকালীন অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রার বিভিন্ন চিত্রগুলি পরবর্ত্তীকালে ছাঁচে নির্ম্মিত মুদ্রার উপরও দেখা যায়, ইহাতে স্পষ্টই মনে হয় যে, চিহ্ন প্রতীক মুদ্রাগুলি মূর্ত্তি প্রতীক ও লিপিসংযুক্ত মুদ্রা হইতে প্রাচীনতর। কতকগুলি মুদ্রার উপর 'উজ্জনিয়ে' অর্থাৎ উজ্জ-য়িনীয় এই লিপিটী অঙ্কিত। অক্ষরগুলি খৃঃ পূঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর। উজ্জয়িনীর প্রাচীনতম লিপি-

সংযুক্ত মুদ্রাগুলি ঐ সময়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অবন্তীদেশের মুদ্রাগুলি চারি বিভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

প্রথম শ্রেণী—চিহ্ন প্রতীক (তাম্র)।

(ক) বেষ্টনী মধ্যস্থ বৃক্ষ। সম্মুখ পৃষ্ঠে বেষ্টনীর মধ্যে একটা বৃক্ষ এবং তৎসঙ্গে নিম্নলিখিত এক বা ততোধিক চিহ্ন—(১) মৎস্যপূর্ণ নদী, (২) মৎস্যপূর্ণ পুষ্করিণী (৩) বৃক্ষ, (৪) নদী, ও (৫) মালবচিহ্ন, বিপরীত পৃষ্ঠ-মালবচিহ্ন এবং ত্রি ছত্রচিহ্ন। মুদ্রাব উপর অঙ্কিত নদীটী সম্ভবত: উজ্জয়িনীর পার্শ্ববর্ত্তী সিপ্রানদীকে লক্ষ্য করিতেছে। ত্রি ছত্রচিহ্ন, সার্ব্বভৌমিক ক্ষমতার পবিচায়ক। মৌর্য্যযুগে যখন উজ্জয়িনী মগধ সাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল, সেই সময়েই ইহা প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল বলিয়া মনে হয়।

(খ) মালবচিহ্ন-একদিকে মালবচিহ্ন, ত্রি-ছত্র প্রভৃতি এবং অন্যদিকে সাদাসিধা রকমের চারিটী বৃত্তসম্বলিত মালবচিহ্ন।

(গ) পর্ব্বতচিহ্ন—সম্মুখপৃষ্ঠে তিনটী অৰ্দ্ধবৃত্তদ্বারা পর্ব্বতচিহ্নের প্রতিকৃতি প্রদর্শন কবা হইয়াছে এবং তদোপরি একটা অর্দ্ধচন্দ্র সংস্থাপিত. পার্শ্বেই অর্দ্ধবৃত্তাকার একটা ছোট পর্ব্বতচিহ্ন, বিপরীত দিকে মালবচিহ্ন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—জীবপ্রতীক (তাম্র)।

(ক) বৃষ—একটা বৃষ বেষ্টনীমধ্যস্থ বৃক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান এবং তৎসঙ্গে আরও দুইটী চিহ্ন ত্রি-ছত্র ও নদী, বৃষের পৃষ্ঠে ককুদ (কুঁজ), কোন কোন মুদ্রায় পাগুলি বেশ লম্বা, আবার কতকগুলি মুদ্রায় বেষ্টনীস্থিত বৃক্ষ অথবা মালবমূর্ত্তিই প্রধান চিহ্ন। বিপরীতদিকে বিভিন্ন প্রকারের মালবচিহ্ন। এই সকল মুদ্রার একটা প্রকারভেদ আছে; তাহার বিপরীত দিকে প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে 'কুনমাস' বা 'কুনমিস' লিপি দেখা যায়—সম্ভবতঃ ইহা কোনও রাজার নাম।

(খ) গণ্ডার—একদিকে দ্বিশৃঙ্গ বিশিষ্ট গণ্ডার, তদোপরি মালবচিহ্ন, বিপরীতদিকেও মালবচিহ্ন।

(গ) হস্তী—সম্মুখপৃষ্ঠে গজদন্তবিশিষ্ট দণ্ডায়মান হস্তী এবং তদোপরি একটী চক্র অথবা সূর্য্যমূর্ত্তি, বিপরীতদিকে মালবচিহ্ন। কতকগুলি-মুদ্রার বিপরীতদিকে খৃষ্টপূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যভাগের ব্রাহ্মী অক্ষরে প্রাকৃত ভাষায় ঐ সহরের নাম পাওয়া যায়—'উজনিয়ে', অর্থাৎ উজ্জয়িনীর (মুদ্রা); উপরে একটা হস্তচিহ্ন, ইহার কি মর্ম্ম তাহা এখনও নির্ণয় করা যায় নাই।

(ঘ) অশ্ব—একদিকে অশ্বের প্রতিকৃতি ও তদোপরি চক্র, অন্যদিকে মালবচিহ্ন।

তৃতীয় শ্রেণী—দণ্ডায়মান মানবপ্রতীক—(তাম্র)। এই শ্রেণীর মুদ্রা সচরাচর দৃষ্ট হইয়া থাকে। একটা মানুষ পতাকাহস্তে দণ্ডায়মান, সম্ভবতঃ তৎকালীন রাজার মূর্ত্তি, কিন্তু নিশ্চিতভাবে কিছুই বলা যায় না। ইহা কোনও দেবমূর্ত্তি অথবা কোনও রাজার বিশেষ চিহ্নসূচক পতাকাধারীও হইতে পারে। তবে রাজমূর্ত্তি হওয়াই বিশেষ সম্ভব এবং এই মূর্ত্তির প্রকারভেদ হইতে ইহাও মনে হইতে পারে যে, রাজারা তাঁহাদের নিজ নিজ মূর্ত্তি তৎকালীন মুদ্রার উপর অঙ্কিত করিয়া দিয়াছিলেন।

সম্মুখ পৃষ্ঠে জামা এবং উচ্চ উষ্ণীষ পরিহিত মালবমূর্ত্তি; বামহস্ত সলম্ব এবং দক্ষিণহস্তে একটী পতাকা। এই মূর্ত্তির সহিত কতকগুলি চিহ্নও থাকে—যেমন নন্দিপদ, স্বস্তিক, ত্রি-ছত্র, পুষ্করিণী, মালবচিহ্ন প্রভৃতি। একটী মুদ্রার পতাকার উপর রশ্মিবিশিষ্ট সূর্য্যচিহ্ন এবং আর একটীতে খৃষ্টপূর্ব্ব দুইশত বৎসরের ব্রাহ্মীলিপি পাওয়া গিয়াছে। কিন্তু এই লিপিটা এতই অস্পষ্ট যে, সম্যক পাঠ অসম্ভব; কেবলমাত্র দুইটা অক্ষর 'তস' পড়া যায়; বোধ হয় ইহা কোনও রাজার নামের শেষভাগ মাত্র। এইরূপ একটা মুদ্রার পতাকা পার্শ্বে এক বৃষ মূর্ত্তি দেখা যায়। কোনও কোনও মুদ্রায় মানবমূর্ত্তিটা শ্মশ্রুবিশিষ্ট, কোথাও বা দক্ষিণ হস্ত উত্তোলিত।

বিপরীত দিকে মালবচিহ্ন কিন্তু প্রান্তস্থিত বৃত্তগুলির ভিতরে কোথাও বা ক্রসচিহ্ন, কোথাও স্বস্তিক বা সূর্য্যচিহ্ন, অথবা ভিতরে শূন্যসহ আর একটা বৃত্ত। কোন কোনও মুদ্রায় দুইটা মালবচিহ্ন দেখা যায়। একশ্রেণী মুদ্রার ককুদযুক্ত বৃষ ও নন্দিপদ চিহ্ন আছে। আর এক শ্রেণী মুদ্রায় শাখান্বিত স্বস্তিক চিহ্ন পাওয়া গিয়াছে। একটী মুদ্রায় ভেকের প্রতিকৃতি দেখা যায়।

চতুর্থ শ্রেণী—দেবমূর্ত্তি প্রতীক (তাম্র)।

(ক) গজলক্ষ্মী···অবন্তীদেশের কতকগুলি মুদ্রার উপর ঐ দেশবাসীর উপাস্য দেবমূর্ত্তি দৃষ্ট হয়;

তন্মধ্যে মহাকাল ও লক্ষ্মীমূর্ত্তি বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই। এক শ্রেণী মুদ্রায় সম্মুখপৃষ্ঠে লক্ষ্মীদেবী পদ্মের উপর উপবিষ্ট আছেন, তাঁহার উপরে দুইপার্শ্ব হইতে দুইটী হস্তী জল বর্ষণ করিতেছে। এই মূর্ত্তির বামে বেষ্টনীমধ্যস্থ বৃক্ষ এবং বিপরীত দিকে মালব-চিহ্ন, ইহার শেষপ্রান্তস্থ বৃত্তচারিটীর মধ্যে স্বস্তিক, নন্দিপদ প্রভৃতি চিহ্ন দেখা যায়। একটী মুদ্রায় ক্যানিংহাম সাহেব তিনটী অক্ষর 'মু-বু-মি' পাড়িয়াছিলেন, কিন্তু ইহার কোন অর্থ-সঙ্গতি নাই, সুতরাং পাঠ ভুল হইয়াছে বলিয়াই মনে হয়। গজলক্ষ্মী মূর্ত্তি শুভকর এবং মাঙ্গল্যজনক বলিয়া এখন গণ্য হইয়া থাকে।

(খ) মহাকাল—শিবের এক নাম মহাকাল। তিনি উজ্জয়িনী নগরীর রক্ষাকারী দেবতা এবং তাঁহার পূজা বহুকাল হইতে সেখানে চলিয়া আসিতেছে। আদিম মূর্ত্তিটী নাই, মন্দিরও নাই, তাহার স্থানে পুরাতন ভিত্তির উপরই বর্ত্তমান মন্দিরটী নির্ম্মিত হইয়াছে। এই মুদ্রাগুলির সম্মুখপৃষ্ঠে ত্রিমুণ্ড, দণ্ডায়মান মহাকাল মূর্ত্তি। তাঁহার এক হস্তে গদা এবং অপর হস্তে কমণ্ডলু—এই দুইটী শিবের রূপক বা নিদর্শন। বিপরীত দিকে মালব-চিহ্ন। প্রাচীনকালে মহাকাল শিব উজ্জয়িনীর প্রধান পূজ্য দেবতা বলিয়া গণ্য হইতেন, ইহাতে কোনও সন্দেহ নাই।

অযোধ্যা—প্রাচীন কোশলই বর্ত্তমান অযোধ্যা প্রদেশ; সূর্য্যবংশীয় রামের রাজ্য। ইহার প্রাচীন রাজধানী সরযূ নদীর তীরে অবস্থিত, কিন্তু কয়েক মাইল দূরস্থ বর্ত্তমান ফৈজাবাদই এখন অধিক সমৃদ্ধিশালী। বৌদ্ধযুগে অযোধ্যা প্রদেশ সরযূ নদীদ্বারা উত্তর ও দক্ষিণ দুইভাগে বিভক্ত হইত। রাপ্তিনদী-তীরস্থ শ্রাবস্তী উত্তর কোশল এবং সরযূ-তীরস্থ অযোধ্যা দক্ষিণ কোশলের রাজধানী ছিল, বৌদ্ধেরা ইহাকে সাকেত বলিত এবং টোলেমির গ্রন্থে সগত বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

অযোধ্যার প্রাচীন ইতিহাস লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। এই নগরে এবং নিকটবর্ত্তী ফৈজাবাদে যে সমস্ত মুদ্রা পাওয়া যায়, তাহাদের সময় নির্ণয় করার একমাত্র উপায় ঐ সকল মুদ্রার নির্ম্মাণ-প্রণালী ও তদোপরি অঙ্কিত লিপি। আমরা মুদ্রাগুলি হইতে জনদশেক রাজার নাম মাত্র পাইয়া থাকি এবং তাঁহাদের আর কোন তথ্যই আবিষ্কার করিতে সমর্থ হই নাই। অতি প্রাচীন মুদ্রাগুলি ছাঁচে ঢালিয়া তৈয়ার করা হইয়াছিল, তৎপরবর্ত্তী যুগের মুদ্রা ছাপে তৈয়ারী (die-struck) চিহ্ন প্রতীক মুদ্রাগুলিই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন এবং এইগুলি খৃষ্ট পূর্ব্ব দ্বিতীয় শতাব্দীর পূর্ব্ব কালীন।

প্রথম শ্রেণী—চিহ্নপ্রতীক (তাম্র)।

(ক) রশ্মিবিশিষ্ট বৃত্ত পরিবৃত একটা চিহ্ন; তক্ষশিলা নগরীর বিশেষ চিহ্নের সহিত ইহার সাদৃশ্য আছে কিন্তু ইহার প্রকৃত মর্ম্ম নির্ণয় করা যায় নাই। বিপরীত দিক একেবারে সাদা; কোন চিহ্ন বা লিপি কিছুই দেখা যায় না।

(খ) স্বস্তিক ও নন্দিপাদ—একদিকে স্বস্তিক ও অন্যদিকে বৃত্তাকারে সজ্জিত চারিটী নন্দিপদ চিহ্ন।

(গ) মৎস্য এবং তুলাযন্ত্র—একদিকেএকটা মৎস্য ও তদোপরি স্বস্তিক; অন্যদিকে একটা তুলা-যন্ত্র এবং তদোপরি নন্দিপদ। ক্যানিংহাম সাহেব তুলা যন্ত্রটাকে কুঠার বলিয়া নির্ণয় করিয়াছিলেন, কিন্তু ইহা এক প্রকার তুলাযন্ত্র নিঃসন্দেহে বলা যায়।

(ঘ) নন্দিপদ ও বেষ্টনীমধ্যস্থ বৃক্ষ—সম্মুখ-দিকে কারুকার্য্যখচিত নন্দিপদ এবং নীচে রাজার 'বিজয়মিতস', অর্থাৎ বিজয় মিত্রের (মুদ্রা)। বিপরীত দিকে বেষ্টনীমধ্যস্থ বৃক্ষ, উপরে একটা অদ্ধশয়ান বৃষ অস্পষ্ট লক্ষিত হয়। সম্ভবতঃ এই মুদ্রাটীর উপর দুইবার ছাপ পড়িয়াছিল। মুদ্রা তৈয়ার করার সময়ে নন্দিপদ ও বৃক্ষ চিহ্ন ছিল, পরে রাজা বিজয় মিত্র তাঁহার নাম ও বৃষ-মূর্ত্তি অঙ্কিত করিয়া দেন। বিজয় মিত্রের কুক্কুট ও বৃষ প্রতীক মুদ্রা হইতে ইহা নিশ্চয়ই প্রাচীন।

দ্বিতীয় শ্রেণী—বৃষ প্রতীক (তাম্র)।

(ক) দণ্ডায়মান বৃষ-বৃষটার সম্মুখে একটা অদ্ভুত রকমের স্তম্ভ এবং ইহার পশ্চাৎভাগে একরূপ ক্রুশের চিহ্ন (St. Andrew's Cross); উপরে আনুমানিক ২০০ খৃষ্ট পূর্ব্বের ব্রাহ্মী অক্ষরে লিপি 'বিসাখদেবস', অর্থাৎ বিসাখদেবের (মুদ্রা); বিপরীত পৃষ্ঠ বিস্তারিত ভাবে অঙ্কিত নন্দিপদ চিহ্ন, ইহার দুই পার্শ্বে বেষ্টনীমধ্যস্থ বৃক্ষ এবং নীচে একটা বক্র রেখা, বোধ হয় নদী চিহ্ন! এই সকল মুদ্রায় মূর্ত্তিগুলি অত্যধিক উদ্গতভাবে in high relief) ঢালাই করিয়া তৈয়ার করা হইয়াছে।

ধনদেব, কুমুদসেন প্রভৃতি আরও কয়েকজন রাজার এইরূপ মুদ্রা পাওয়া যায়, কিন্তু বিভিন্ন

রাজার মুদ্রায় সামান্ত পার্থক্য আছে। ধনসেনের মুদ্রায় বৃষের সম্মুখে কোনও পদার্থ নাই, প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে লিপি 'ধনদেবস' অপর পৃষ্ঠে বেষ্টনীস্থ বৃক্ষ, নীচে নদী এবং বামে বেষ্টনীমধ্যস্থ বক্র স্তম্ভ হইতে নন্দিপদ, মালব চিহ্ন এবং সম্ভবত: স্বস্তিক—এই তিনটী চিহ্ন ঝুলিতেছে বলিয়া দৃষ্ট হয়। রাজা কুমুদ সেনের মুদ্রায় বৃষটী বেষ্টনীস্থ বৃক্ষের সম্মুখে দণ্ডায়মান রহিয়াছে এবং ইহার পশ্চাৎ দিকে একটা বক্র রেখা। স্মিথ সাহেব মনে করেন যে, ইহা লেজের উপর দণ্ডায়মান সর্পের প্রতিকৃতি; নীচে পরিষ্কার বড় বড় ব্রাহ্মী অক্ষরে লিপি—'রাজ্ঞঃ কুমুদসেন,' রাজা কুমুদসেনের (মুদ্রা)। অন্যদিকে বিশেষ কারুকার্য্যখচিত নন্দিপদ। রাজা অজবর্মের মুদ্রা কুমুদসেনের মুদ্রার অনুরূপ। কিন্তু ধাতু পিত্তল ও লিপি বিভিন্ন অজবর্মণ (অথবা—বর্মনো), অজবর্মের (মুদ্রা)। কুমুদসেন ও অজবর্মের মুদ্রা ছাপে তৈয়ারি, বিশাখসেনের মুদ্রার ন্যায় ঢালাই করা নহে। এই সকল ছাপে তৈয়ারী মুদ্রা বিশাখ সেন, ধনদেব, শিবদত্ত রাজার ঢালাই মুদ্রা হইতে পরবর্ত্তী কালের। বিজয়মিত্র ও সত্যমিত্র নামীয় রাজাদের মোটামুটি অনুরূপ মুদ্রা পাওয়া যায়।

(খ) চলয়মান বৃষ--বৃষ প্রতীক মুদ্রার একটী প্রকার ভেদ আছে। তাহাতে বৃষটী চলয়মান এবং তৎসম্মুখে বেষ্টনীমধ্যস্থ একটা ত্রিশূলাকৃতি স্তম্ভ; উপরে প্রাচীন ব্রাহ্মী অক্ষরে লিপি—'ধনদেবস', ধনদেবের (মুদ্রা); বিপরীত পৃষ্ঠের মধ্যস্থলে একটী স্ত্রীমূর্ত্তি, কোনও দেবীমূর্ত্তি হওয়াই সম্ভব এবং ইহার দুই পার্শ্বেই বেষ্টনীস্থ বৃক্ষ ও নীচে বক্ররেখা বা নদীচিহ্ন, উপরে স্বস্তিক ও আর দুইটী চিহ্ন কিন্তু বড়ই অস্পষ্ট। এই মুদ্রা বিশাখ দেবের মুদ্রার নির্ম্মাণ-প্রণালীর অনুরূপ, ইহাতে প্রতীয়মান হয় যে, এই দুইজন রাজা প্রায় সমসাময়িক ছিলেন এবং সম্ভবত: একজনের পর অন্যজন সিংহাসনে আরোহণ করিয়াছিলেন।

তৃতীয় শ্রেণী—হস্তী প্রতীক (তাম্র অথবা বর্ত্তলোহ—তাম্র ও রঙ্গমিশ্রিত ধাতু)।

সম্মুখপৃষ্ঠে একটা স্তম্ভের দিকে চলয়মান (চরিষ্ণু) হস্তী ও ব্রাহ্মী লিপি। মুদ্রাসংলগ্ন লিপি হইতে তিনজন রাজার নাম জানিতে পারা যায়—(ক) 'মূলদেবস', মূলদেবের, (খ) 'বায়ুদেবস', বায়ুদেবের, এবং (গ) 'শিবদতস' বা শিবদত্তের। বিপরীত পৃষ্ঠে একটী চিহ্ন আছে, তাহা বড়ই অস্পষ্ট—নন্দিপদ (অথবা পুষ্পমালার) এবং মূলদেব ও বায়ুদেবের মুদ্রার নীচে নদী চিহ্ন; শিবদত্তের মুদ্রায় বেষ্টনীস্থ বৃক্ষ ও মালব চিহ্ন।

চতুর্থ শ্রেণী—গজলক্ষ্মী প্রতীক (তাম্র)।

একদিকে দণ্ডায়মান লক্ষ্মীদেবী এবং দুই পার্শ্ব হইতে দুইটী হস্তী দেবীকে অভিষেক করিতেছে; ব্রাহ্মী লিপি—'বিশাখদেবস' বিশাখদেবের (মুদ্রা); অন্যদিকে মধ্যভাগে একটা চিহ্ন বড়ই অস্পষ্ট, সম্ভবত: নন্দিপদ এবং ইহার দুইপার্শ্বে বেষ্টনীস্থ দুইটী বৃক্ষ; নীচে নদীচিহ্ন ও উপরে স্বস্তিক।

পঞ্চম শ্রেণী—কুক্কুট ও বৃষ প্রতীক (তাম্র)।
(তথা-কথিত মিত্রবংশের মুদ্রা)

স্তম্ভ সম্মুখে দণ্ডায়মান বৃষ, নীচে ব্রাহ্মী লিপি—বিপরীত দিকের মধ্যভাগে একটী খর্জ্জুর বৃক্ষ এবং তাহার বামে বৃক্ষের দিকে মুখ ফিরাইয়া একটা বক্ররেখার (?) উপর দণ্ডায়মান কুক্কুট অথবা ময়ূর, যদিও অনেকেই এই প্রতিকৃতিটা কুক্কুট বলিয়া মনে করিয়া থাকেন, কিন্তু ময়ূর হওয়াই খুব সম্ভব। ময়ূরের প্রতিমূর্ত্তি অন্যান্য মুদ্রায়, এমন কি অতি প্রাচীন অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রার উপরেও পাওয়া গিয়াছে। এই সকল মুদ্রায় চারিজন বিভিন্ন রাজার নাম দেখা যায়—(ক) 'অয়ু' (বা অয়ু)—'মিতস', অয়ুমিত্রের; (খ) 'সত্যমিতস', সত্যমিত্রের; (গ) 'দেবমিতস'' দেবমিত্রের; (ঘ) 'বিজয়মিতস', বিজয়মিত্রের (মুদ্রা)। মুদ্রাগুলির বিপরীত দিকে সর্ব্বদাই খর্জ্জুর বৃক্ষ এবং তথা-কথিত কুক্কুট (বা ময়ূর); কেবলমাত্র পরস্পর অবস্থানে বৈলক্ষণ্য দৃষ্ট হয়।

এই প্রসঙ্গে অযোধ্যার একাদশ জন রাজার মুদ্রা সম্বন্ধে আলোচনা করা হইল। তাঁহাদের নাম নিম্নে দেওয়া হইতেছে, কিন্তু ধারাবাহিক কাল নিরূপণ করা অত্যন্ত কঠিন।

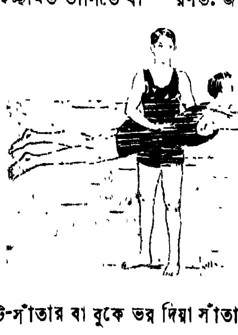
১। বিশাখদেব, ২। ধনদেব, ৩। মূলদেব, ৪। বায়ুদেব, ৫। কুমুদসেন, ৬। অজবর্ম, ৭। সত্যমিত্র, ৮। বিজয়মিত্র, ৯। দেবমিত্র, ১০। সত্যমিত্র, ১১। অয়ুমিত্র—ইঁহারা তিনটী রাজবংশের নৃপতি ছিলেন বলিয়া মনে হয় এবং আনুমানিক প্রায় তিনশত বৎসর রাজত্ব করিয়াছিলেন।



সন্তরণ-শিক্ষা-প্রণালী

১১৫১ পৃষ্ঠার পর

এইবার সাঁতার সম্বন্ধে তোমাদিগকে আরও অনেক কথা বলিব। যাহারা জলে ভাসিবার প্রণালী একেবারে জানে না, তাহারা কতকগুলি নল সংযুক্ত বায়ুপূর্ণ থলের দ্বারা নির্ম্মিত জলে ভাসিবার পক্ষ বা ডানা (water wings) ব্যবহার করিতে পারে। বাজারে বিক্রীত ডানা সন্তরণ শিখিবার বা জলে ভাসিবার একটা সন্তোষজনক সহজ অবলম্বন বা আশ্রয়। ইহা ব্যয়-সাপেক্ষ মনে করিলে মোটরকারের কিংবা সাইকেলের নলকে (tube) বায়ুপূর্ণ করিয়া ব্যবহার করিলেও সন্তোষজনক ফল পাওয়া যায়। ইহা কোমরে পরিয়া নিরাপদ ভাবে ইচ্ছামত ভাসিতে বা সন্তরণ করিতে পারা যায়।



পট-সাঁতার বা বুকে ভর দিয়া সাঁতার শিক্ষা করা

অনেক সময় ছেলেরা ঐরূপ নলের পরিবর্ত্তে ছিদ্রযুক্ত কাঠের পাটা ব্যবহার করে। কিন্তু ইহা সেরূপ প্রীতিপ্রদ ও নিরাপদ নয়, বরং বিরক্তিকর ও বিপজ্জনক। এখন সাঁতার সংক্রান্ত বিদেশী সাজ-সরঞ্জাম নূতন শিক্ষার্থীদের জন্য বাহির হইলেও, সে সমস্ত মূল্যবান্ সৌখিন দ্রব্যাদি খুব কমই ব্যবহৃত হয়। অনেক শিক্ষার্থীকে শোলার সাহায্যে এইরূপ অবলম্বন (supports) তৈয়ারী করিয়া ব্যবহার করিতে দেখা যায়। কেহ কেহ আবার ফুটবলের ব্লাডার দিয়াও সাঁতার কাটিবার অবলম্বন তৈয়ারী করে। আবার উপরি উক্ত জিনিসের সাহায্য না লইয়াও অন্য এক ব্যক্তির সাহায্যে সাঁতার শিক্ষা করিতে পারা যায়—চিত্র দেখিলেই ইহা বুঝিতে পারিবে।

সাঁতার কাটিবার সময় অঙ্গ-সঞ্চালন

সাঁতার-শিক্ষা বা অভ্যাস করিতে হইলে সাধারণতঃ জন্তুদের সাঁতার কাটার ধরণে সাঁতার কাটিবার অভ্যাস করিতে হয় বলিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত একটা ধারণা ছিল। কিন্তু বিজ্ঞানের ক্রম-বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে এই ভ্রান্ত ধারণা দূরীভূত হইল। কারণ এইরূপ চেষ্টার দ্বারা কোনরূপ উপকার হয় না বা দ্রুত সাঁতার কাটিবার পক্ষে কোন সাহায্যই হয় না। সুতরাং সাঁতার-শিক্ষা-প্রণালীর উন্নতির জন্য নানারূপ চেষ্টা আরম্ভ হইল। এইরূপ প্রচেষ্টার ফলেই বিভিন্ন প্রকার

Strokes বা অঙ্গসঞ্চালন পদ্ধতির আবিষ্কার হইল। যেমন—

১। জন্তুদের মত পদসঞ্চালন এবং হস্ত অর্দ্ধ-বৃত্তাকারে সম্মুখ হইতে পিছন দিকে ও জলের নীচের দিকে টানিয়া আনা। প্রথম চিত্রের মত হস্তসঞ্চালন-পদ ঊর্দ্ধে তুলিয়া পিছন দিকে ধাক্কা দেওয়া।

২। বুকে ভর দিয়া সাঁতার—পর পর না করিয়া একত্রে হস্তপদ সঞ্চালন।

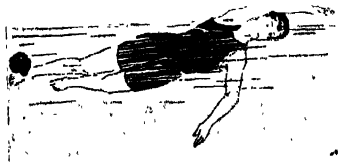
৩। পাশাপাশি ভাবে বা কাৎভাবে সাঁতার—মুখ পর পর পাশে ঘুরাইয়া ও শরীর মোচড় দিয়া



কাৎ হইয়া সাঁতার (উপর হইতে দেখ)

এবং হাত পর পর পাক দিয়া বাড়াইয়া সাঁতার কাটা। এইরূপ ভাবে সাঁতার কাটিবার সময় পদ দ্বারা পাশে ধাক্কা না দিয়া ডান পা দিয়া বাম দিকে এবং বাম পা দ্বারা ডান দিকে অর্থাৎ (Scissor Kick মারিয়া) সম্মুখে ও পিছনে যুগপৎ ধাক্কা মারিয়া সাঁতার কাটা।

৪। কাৎ সাঁতারের মত হাত জলের ভিতরেই না নাড়াইয়া মাথার উপর দিকে ও জলের উপরে সোজা ও দৃঢ়ভাবে প্রসারিত বা সঞ্চালন করা অর্থাৎ মাথাবেড়া সাঁতার বা Overarm Stroke.



মাথা-বেড়া সাঁতার

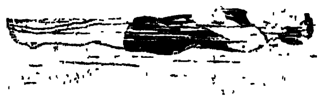
৫। কাৎ সাঁতারের মত পায়ের ভঙ্গী করিয়া এবং হাত পাশের দিকে সম্মুখ হইতে ঘুরাইয়া



পরিশ্রান্ত হইয়া সাঁতার

আনা, অর্থাৎ পরিশ্রান্ত হইয়া সাঁতার বা Trudgen Swimming।

৬। চিৎ হইয়া সাঁতার—চিৎ সাঁতার সাধারণতঃ জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিবার জন্য ব্যবহৃত হয়।

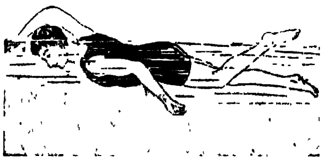


চিৎ-সাঁতার

৭। যতদূর সম্ভব পা নাড়া-চাড়া না করিয়া হাত পর পর সম্মুখ হইতে পিছন দিকে লইয়া উরুতে ঠেকান, অর্থাৎ হামাটানা সাঁতার বা Crawl Stroke.

যত রকম সাঁতারের প্রক্রিয়া আবিষ্কৃত হইয়াছে, তৎসমুদয়কে স্থূলতঃ তিনভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে।

১। বুকে ভর দিয়া সাঁতার বা পট সাঁতার—
(ক) জন্তুদের মত সাঁতার।
(খ) হামাটানার মত সাঁতার।



হামাটানা সাঁতার

(গ) বুকে ভর দিয়া সাঁতার বা পট-সাঁতার।

২। কাৎ হইয়া সাঁতার—
(ক) কাৎ সাঁতার।
(খ) মাথা-বেড়া সাঁতার।

৩। চিৎ-সাঁতার —
(ক) কেবলমাত্র হাতের সাহায্যে চিৎ-সাঁতার।
(খ) জলমগ্ন ব্যক্তিকে রক্ষা করিবার জন্ত কেবলমাত্র পায়ের সাহায্যে চিৎ-সাঁতার।
(গ) হাত গুটাইয়া চিৎ-সাঁতার।
(ঘ) হাত পিছন দিকে বা নীচের দিকে রাখিয়া চিৎ-সাঁতার।
(ঙ) মাথাবেড়া চিৎ সাঁতার।
(চ) হামা টানিয়া চিৎ-সাঁতার।

জন্তুদের মত সাঁতার শিক্ষা ব্যতীত যাবতীয় সাঁতারই জলে শিখিবার পূর্ব্বে ডাঙ্গায় কিছু কিছু প্রারম্ভিক ক্রিয়া দ্বারা অভ্যাস করিয়া লওয়া ভাল।

জন্তুদের মত সাঁতার

চতুষ্পদ জন্তুরা যেরূপ ভাবে শক্ত জমীতে দৌড়ায় বা চলাফেরা করে, ঠিক সেইরূপ কৌশলেই তাহারা জলের মধ্যে পা নাড়াইয়া সাঁতার কাটে। সাঁতার শিখিবার প্রণালী বা কৌশল তাহাদের আর নূতন করিয়া শিখিতে হয় না। এই জন্যই তাহাদের জন্মগত স্বাভাবিক কৌশল অনুযায়ী সাঁতার কাটাকে Animal paddling বলা হয়।

এই কৌশল অভ্যাসকালে হাত ও পা স্বাধীন ভাবে নাড়াচাড়া করিবে। প্রথমে এক কোমর জলে দাঁড়াইবে, তাহার পর সম্মুখে হেলিয়া কাঁধ অবধি জলে ডুবাইবে এইবার জন্তুদের চলার ভঙ্গীর মত সময়ানুযায়ী পরপর হাত ও পা নাড়াইতে হইবে। হাতের তেলো কিন্তু সর্ব্বদাই নীচের দিকে থাকিবে এবং হাতের তেলোর ভঙ্গী ঠিক জন্তুর থাবার মত হইবে। হাতের তেলোর দ্বারা সম্মুখ হইতে পিছন দিকে ও নীচের দিকে ধাক্কা দিতে হইবে। এক হাত যখন পিছন দিকে থাকিবে, তখন অপর হাত সঙ্গে সঙ্গে সম্মুখ দিকে যাইবে। সেই সময়েই ঠিক হাতের কৌশলের মতই এক পা যখন হাঁটু বাঁকাইয়া নীচের দিকে ও সম্মুখ দিকে আগাইবে, অপর পা তখন হাঁটু সোজা করিয়া পিছন দিকে ধাক্কা দিবে। পদদ্বয় বা গোড়ালিদ্বয় কখনও জলের উপর উঠাইবে না। পদদ্বয়দ্বারা কখনও জল উৎক্ষিপ্ত করিবে না। সমস্ত শরীর জলের সহিত সমান্তরালভাবে ভাসাইয়া রাখিতে হইবে। ঘাড় হইতে সমস্ত মাথা জলের উপরে তুলিয়া সমুখ দিকে তাকাইতে হইবে। পদদ্বয় ধীরে ধীরে নড়াচড়া হইলেই শরীর আপনা আপনি জলের সহিত সমান্তরাল হইয়া অগ্রসর হইবে। এই কৌশল অবলম্বন করিয়া দ্রুত সাঁতার কাটিবার চেষ্টা করিলে অঙ্গভঙ্গী সম্পূর্ণ ও সুন্দররূপ না হইয়া প্রকৃত উদ্দেশ্য ব্যর্থ হয়। কিন্তু এই কৌশল যখন উত্তমরূপ আয়ত্ত হইয়া যাইবে, তখন শিক্ষার প্রথম অবস্থা অপেক্ষা কিছু দ্রুত সাঁতার কাটা সম্ভব হয়।

হামাটানার মত সাঁতার

দ্রুত সাঁতার কাটিবার প্রয়োজন হইলে হামাটানার মত পদ্ধতি অবলম্বনে সাঁতার কাটাই প্রশস্ত। কারণ এই হামাটানা-পদ্ধতি কৌশলদ্বারা খুব দ্রুত সাঁতার কাটা যায়। এই কারণ বশতঃ জলমগ্ন ব্যক্তিকে উদ্ধার করিতে হইলে তাহার নিকট যাইবার জন্ত হামাটানা পদ্ধতিই সহজসাধ্য ও প্রকৃষ্ট উপায়। এই কৌশলে সাঁতার কাটিতে গেলে সাধারণতঃ মুখ জলে ডুবিয়া থাকে, কিন্তু মুখ বাম দিক হইতে সম্মুখে ও সম্মুখ হইতে ডান দিকে এবং পুনরায় ডান দিক হইতে সম্মুখে ও বামে সময়ানুযায়ী



বল দেখি এরা সব কি করে ?

ঘুরাইতে হয়। হাঁটু সোজা রাখিয়া পদদ্বয় জলের ভিতরে উঠানামা করিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে—গোড়ালিদ্বয় যেন আদৌ জলের উপরে না উঠে।

প্রথম দক্ষিণ হস্ত সম্মুখ হইতে আনিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে এবং সেই সময়ে অপর বাহু সোজা করিয়া কানের পাশে উঠাইয়া আনিয়া সম্মুখে লইয়া যাইবে। এইবার বাম বাহুর কনুই ভাঙ্গিয়া এবং কনুই হইতে তালু পর্য্যন্ত সোজা রাখিয়া নীচের দিকে ধাক্কা দিয়া উরুদেশ পর্য্যন্ত লইয়া যাইতে হইবে। এইরূপ পর পর দুই বাহু চালনা করিতে হইবে। এইরকম ক্ষেত্রে হাতের তেলো খুলিয়া রাখিতে হইবে। হাত ও চোখের সম্মুখে আপন আপন দিকে জলে ডুবাইয়া পূর্ব্বোল্লিখিত-মত ভঙ্গী করিতে হয়। হাত জলের উপরে উঠাইবার সময় সোজা করিয়া উঠাইতে হইবে। কিন্তু বেশী উচ্চে উঠিবে না। এই নিয়মানুযায়ী সাঁতার কাটিবার সময় ঝাঁকনা দিয়া বা অনিয়মিত ভাবে কোন ভঙ্গী করা চলিবে না। অঙ্গভঙ্গী সর্ব্বদাই সহজ ও সুন্দর হইবে।

বুকে ভর দিয়া সাঁতার বা পট-সাঁতার

বুকে ভর দিয়া সাঁতার কাটিবার কালে মুখের নীচের দিকটা অধিকাংশ সময় জলে ডুবিয়া থাকে। কিন্তু গন্তব্য পথের প্রতি লক্ষ্য রাখিবার জন্য মাথা জলের উপরে উঠিয়া থাকিবে। এমন কি এরকম কৌশলে সাঁতার কাটিবার সময় সঙ্গীর সহিত কথোপকথন করিতে করিতে যাওয়া যায়। প্রথমে এক বুক জল পর্য্যন্ত যাও, তারপর সম্মুখ দিকে জলে হেলাইয়া পড়। এইবার হাত সম্মুখ দিকে ভাসাইয়া দাও। তাহার পর হাত পাশের দিকে ও নীচের দিকে অর্দ্ধবৃত্তাকারে ঘুরাইয়া লইয়া আইস। আবার হাত সম্মুখে আন। হাঁটু ভাঙ্গিয়া সম্মুখে পা আন। এইবার হাত সোজা করিয়া ভাসাইয়া সম্মুখে লইয়া যাও এবং জোড় পায়ে একত্রে পাশের দিকে ধাক্কা মারিতে থাক। এইরূপ করিলে ক্রমেই অগ্রসর হইতে থাকিবে।

অঙ্গুলিমধ্যে যাহাতে ফাঁক না থাকে, সে বিষয়ে সর্ব্বদাই সতর্ক থাকিতে হইবে।, শরীরের গতিভঙ্গী সর্ব্বদাই সহজভাবে ও ক্রমান্বয়ে করিতে হইবে। এইরূপ পদ্ধতি অনুযায়ী দ্রুত সাঁতার কাটিবার চেষ্টা করিতে গেলে অতি সহজেই ক্লান্ত হইয়া পড়িতে হয়। ফলে ডুবিয়া যাইবার সম্ভবনা ঘটে। এইরূপ ধরণে সাঁতার কাটিবার সময় কেবলমাত্র থুত্‌নি ডুবাইয়া মুখ তুলিয়া রাখিতে হয়। দ্রুত সাঁতার কাটিবার সময় এই পদ্ধতি সাধারণতঃ নির্ভুল ভাবে অনুসৃত হয় না।

পদদ্বয় সর্ব্বদাই জলের একটু নীচে থাকিবে। বিশেষতঃ হাত-পা ছড়াইয়া শরীর সোজা করিয়া অগ্রসর হইবার সময় পদদ্বয় সর্ব্বদাই জলের একটু নীচে থাকিবে। হাত দিয়া জলে ধাক্কা মারিবার সময় হাতের তেলো খুলিয়া রাখিতে হইবে। কারণ তাহাতে জলে ধাক্কা দিবার সময় বেশ জোর পাওয়া যায়। যতদূর সম্ভব শরীর জলের সহিত সমান্তরালভাবে রাখিবে।

এইভাবে সাঁতার কাটা আরম্ভ করিবার সময় প্রথমে হাত ও পা সোজা করিয়া রাখিতে হয়। তাহার পর হাত শক্ত করিয়া নীচের দিকে ও বাহিরের দিকে বৃত্তের $\frac{1}{4}$ লইয়া গিয়া শেষ রাখিবার সময় হাত দু'খানি সমকোণের মত করিতে হইবে। হাত দিয়া টানিয়া শেষ করিবার সময় মাথা ডুবিয়া যাওয়া খুবই স্বাভাবিক। এইবার হাঁটু বাঁকাইয়া ও কনুই ভাঙ্গিয়া হাতের বৃদ্ধাঙ্গুলি থুৎনিতে ঠেকাইবার মত করিতে হইবে। এখন হাত সম্মুখে সোজা করিয়া আগাইয়া দাও এবং সঙ্গে সঙ্গে পদদ্বয় দ্বারা জলে ধাক্কা মার। শরীর জলের সহিত সমান্তরালভাবে থাকিবে।

সাঁতারের সময় একটা কথা সর্ব্বদা মনে রাখিবে—বাহাদুরী দেখাইবার চেষ্টা কখনও করিও না, কিংবা নিজের ক্ষমতার বেশী কিছু করিতে যাইও না। অনেক সময় যে নানা দুর্ঘটনা ঘটে, তাহার প্রধান কারণই হইতেছে দুঃসাহসিকতা বা অনাবশ্যক বাহাদুরী চেষ্টা। সাঁতারে সাহস, ধৈর্য্য, প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব এবং ধীরতা হইতেছে একান্ত প্রয়োজনীয়। বাজী ধরিয়া সাঁতার দিয়ো না। তাহার ফল ভাল হয় না। যে নদী, খাল বা পুষ্করিণীতে সাঁতার কাটিবে, তাহার পারিপার্শ্বিক অবস্থা জানিয়া লওয়াও খুব ভাল। সাঁতারের মূল মন্ত্র সাবধানতা ও সতর্কতা—ইহা কখনও বিস্মৃত হইও না।



লে মিজেরাব্‌ল্‌

২১৩১ পৃষ্ঠার পর

[ভিক্টর হুগে পৃথিবীর মধ্যে সাহিত্যের দিক্ দিয়া, কবিত্বের দিক্ দিয়া এবং রাষ্ট্রের দিক্ দিয়া একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার ন্যায় একজন পণ্ডিত এবং স্বাধীন প্রকৃতির লোক অতি অল্পই জন্মগ্রহণ করিয়াছেন। ভিক্টর হুগোর লেখার অসাধারণ ক্ষমতা ছিল। তাঁহার লেখার জন্য সকলে তাঁহাকে ভক্তি ও সম্ভ্রমের চক্ষে দেখিত। এক সময়ে তিনি ফরাসী জাতির নেতা ছিলেন বলিলে বেশী কিছু বলা হয় না। রাষ্ট্রসংক্রান্ত ব্যাপারেও তাঁহার অসাধারণ প্রতিভা ছিল। রাজকর্ম্মচারীরাও তাঁহার নিকট আসিয়া রাজসংক্রান্ত ব্যাপারে নানা উপদেশ গ্রহণ করিতেন।

ভিক্টর হুগে প্রণীত 'লে মিজেরাব্‌ল্‌' একখানি বিখ্যাত গ্রন্থ। তোমরা হয়ত অনেকেই এই গ্রন্থের নাম শুনিয়া থাকিবে এবং কেহ কেহ হয়ত পড়িয়াছ। আমরা এখানে সেই বিখ্যাত গ্রন্থের আখ্যানভাগ প্রকাশ করিলাম। তোমরা উহা পড়িয়া বুঝিতে পারিবে যে, হুগে কত বড় একজন বিখ্যাত লেখক ছিলেন এবং মানুষের চরিত্র বুঝিবার ক্ষমতা তাঁহার কত অসাধারণ ছিল। ইংরাজ-কবি টেনিসন হুগোকে 'lord of human tears' এই উপাধি দিয়াছেন। তাহা অতি সত্য। দুঃখ, যন্ত্রণার চিত্র আঁকিতে তাঁহার সমান লেখক বড় একটা দেখা যায় না। ভিক্টর হুগোর নাটক ও তাহার গদ্য উপন্যাসাবলির মধ্যে একটু বিশেষ পার্থক্য অনুভূত হয়। তাঁহার উপন্যাসগুলিতে মনুষ্য প্রকৃতির মহত্তর দেবোপম গুণেরই প্রাধান্য বেশী। মানুষ কত দূর উন্নত ও মহান্ হইতে পারে, তাঁহার গ্রন্থে তাহাই দেখান প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া মনে হয়। কিন্তু নাটকগুলির প্রকৃতি সেইরূপ নহে। ইহাতে মানব মনের নিকৃষ্টতা অংশেরই প্রাধান্য। ভিক্টর হুগে ১৮০২ খৃষ্টাব্দে জন্মগ্রহণ করেন এবং ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে তাঁহার মৃত্যু হয়। তাঁহার প্রণীত গ্রন্থের সংখ্যা বড় কম নহে। আমরা এখানে মাত্র দুই একখানার নাম করিলাম। তাঁহার লিখিত 'Le Roi Samusel,' 'The Kings,' 'Diversion,' 'Hernani', 'Rui Bla প্রভৃতি বেশ নাম করা বই তাঁহার নাটকের চরিত্রগুলি অতিশয় দক্ষতার সহিত চিত্রিত হইয়াছে। ভিক্টর হুগো পৃথিবীর একজন অমর লেখক।]


ভিক্টর হুগো

জিন্ ভল্‌জিন্

সূর্য্যদেব অনেকক্ষণ হয় পশ্চিমের আকাশে হেলিয়া পড়িয়াছেন। দিনের আলো ধীরে ধীরে যতই মিলাইয়া আসিতেছিল, আকাশের ধারের মেঘগুলি ক্রমে ক্রমে ততই আকাশের মাঝখানে ঘনঘটা করিয়া জমিয়া গেল, আর উত্তর দিক হইতে কন্‌কনে শীতের বাতাস আসিয়া সকলকে কাঁপাইয়া দিয়া যাইতে লাগিল। ঠিক সেই সময়ে একটি লোক শ্রান্ত ধূলামলিন দেহে শত ছিন্ন পোষাক-পরিচ্ছদ পরিয়া টলিতে টলিতে গিয়া একটি ছোট্ট সহরের মধ্যে প্রবেশ করিল।

সেই লোকটির নাম জিন্ ভল্‌জিন্। উনিশ বৎসর পূর্ব্বে সে জেলে গিয়াছিল এবং আজ চারদিন হইল ছাড়া পাইয়াছে। কিন্তু এখনও সে কোথাও আশ্রয় বা খাবার পায় নাই। জেলে যাইবার পূর্ব্বে জিন্ ভল্‌জিন্ গাছকাটা কাঁচি দিয়া লোকের বাগানে বাগানে বা রাস্তার ধারে গাছ কাটিয়া-ছাঁটিয়া সুন্দব করিয়া বেড়াইত। ইহাই ছিল তাহার পেশা। এই কাজ করিয়া অল্প-স্বল্প যাহা কিছু পাইত তাহাতেই কোনও রকমে তাহার সংসার চলিত। কিন্তু শীতকালে যখন গাছের সব পাতা ঝরিয়া পড়িয়া গাছগুলা কঙ্কালের মত দাঁড়াইয়া থাকিত, তখন তাঁহার কোনও কাজই থাকিত না। সেই সময়ে সে বড় অর্থকষ্টে এবং অন্নকষ্টে পড়িত। একবার শীতকালে কোনও কাজ না পাইয়া তাহার এমন হইল যে, অনাহারে তাহার প্রাণ একেবারে যায় যায়। সেই সময়ে একদিন ক্ষুধার জ্বালা সহ্য করিতে না পারিয়া সে এক রুটিওয়ালার দোকানের জানালা ভাঙ্গিয়া দোকানের ভিতর ঢুকিয়া পড়িয়া একখানা রুটি চুরি করিয়া তাহার ক্ষুধা মিটাইতে গিয়াছিল। কিন্তু ধরা পড়িয়া তাহার পাঁচ বছরের জেল হয়। জিন্ ভল্‌জিন্ অনেকবার জেল হইতে পালাইবার চেষ্টা করে কিন্তু তাহাতে তাহার মেয়াদ ক্রমাগত বাড়িয়া বাড়িয়া উনিশ বৎসরে ঠেকিয়াছিল। এই দীর্ঘ উনিশ বৎসর পরে ছাড়া পাইয়া সে দেখিল যে, তাহার আপনার লোকেরা সবাই শীতে ও অনাহারে বহু পূর্ব্বেই মারা গিয়াছে। তখন তাহার আপনার বলিতে অথবা আশ্রয় লইবার মত স্থান কোথাও ছিল না। সেইজন্য চারদিন ধরিয়া নানা জায়গায় ব্যর্থভাবে ঘোরার পর একটা অচেনা ও অজানা সহরের মধ্যে আশ্রয়ের আশায় ও ক্ষুধা-তৃষ্ণা মিটাইবার আশায় সে ঢুকিয়া পড়িয়াছিল।

লোকটির বেশ-ভূষা এবং রুক্ষ-শুষ্ক ও মলিন চেহারা দেখিয়া কাহারও আর বুঝিতে বাকি রহিল না যে সে সদ্য জেল হইতে খালাস পাওয়া আসামী। সেইজন্য রাস্তার ধারের ছোট ছোট ছেলেমেয়েগুলি তাহার দিকে আঙ্গুল দেখাইয়া দেখাইয়া তাহাদের সঙ্গীদের কাছে চুপি চুপি লোকটির পবিচয় দিতেছিল। আর সেই লোকটি বৃথাই আশ্রয়ের আশায় এ-দরজা ও দরজা করিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছিল।

সহরের মধ্যে দুইটি সরাইখানা ছিল। অনেক সাধাসাধি করিয়াও উভাব একখানিতে তাহার স্থান মিলিল না। একরাত্রিব জন্য একটু আশ্রয় এবং খাবাবের জন্য জিন্ ভল্‌জিন্ দ্বিগুণ, এমন কি চতুর্গুণ টাকা দিতেও রাজী ছিল। কিন্তু কেহই তাহাকে খাবার অথবা আশ্রয় দেয় নাই। সে যে একজন জেল-ফেরৎ আসামী—এই পরিচয়টুকু পাইয়া কেহই তাহাকে আশ্রয় দিতে ভরসা পায় নাই। বরং ঘৃণা প্রকাশ করিয়া সকলে তাহাকে দূর দূর করিয়া তাড়াইয়া দিল।

কোথাও আশ্রয় পাইবার আশায় জলাঞ্জলি দিয়া সে শেষকালে হতাশ হইয়া আবার জেলখানার দরজাতেই ফিরিয়া গেল এবং মাত্র এক-রাত্রির জন্য সেখানে থাকিতে চাহিল। জেলের কর্ত্তা তাহার প্রার্থনা শুনিয়া বলিলেন—"না না, তাহা হইতে পারে না। কোনও অপরাধ করিয়া গ্রেপ্তার হইয়া না আসিলে জেলখানায় আশ্রয় পাওয়া যায় না। তুমি চুরি ডাকাতি যা'হোক একটা কিছু করিয়া ধরা পড়িয়া তারপর এখানে আসিয়া থাকিতে পার। তাহার পূর্ব্বে নয়।"

জেলখানাতেও আশ্রয় না পাইয়া সে মনমরা হইয়া আবার পথে আসিয়া দাঁড়াইল। কি করিবে, কোথায় যাইবে, কিছুই সে স্থির করিয়া উঠিতে পারিতেছিল না। সমস্ত রাত্রিটা সে যে বাহিরে পথের ধারে বসিয়া কাটাইয়া

দিবে, তাহাও অসম্ভব। কারণ তখন শীতকাল। আল্পস্ পাহাড় হইতে যেরকম কন্‌কনে ঠাণ্ডা



জিন্ ভল্‌জিন্ বৃথা সরাইখানায় আশ্রয় প্রার্থনা করিতেছে

বাতাস বহিয়া আসিতেছিল, তাহাতে সন্ধ্যাবেলা-তেই সকলের রক্ত প্রায় জমিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছিল। সুতরাং বেশী রাত্রে যে কি রকম শীত পড়িবে, তাহা জিন্ ভল্‌জিন্ সহজেই কল্পনা করিতে পারিয়াছিল।

যাহাহউক, ভাবিয়া লাভ নাই বুঝিয়া সে তাহার শ্রান্ত দেহখানাকে কোনও রকমে টানিয়া লইয়া বাজারে গেল। সেখানে গিয়া একটা পাথরের বেঞ্চের উপরে বসিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। সেই সময়ে একটি স্ত্রীলোক রাস্তা দিয়া যাইবার সময়ে জিন্ ভল্‌জিন্‌কে ঐভাবে ঝিমাইতে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া ভাবিলেন যে, অত শীতে লোকটি সেখানে বসিয়া ঝিমায়, ইহার কারণ কি? স্ত্রীলোকটি জিন্ ভল্‌জিন্‌কে ডাকিয়া তুলিয়া জানিলেন যে, থাকিবার মত আশ্রয় তাহার কোথাও নাই। জিন্ ভল্‌জিনের কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন—"ঐ যে বাজারের সাম্‌নে একটা গির্জ্জা দেখিতেছ, তুমি ঐ গির্জ্জার বিশপের কাছে গিয়া আশ্রয় প্রার্থনা কর। তাঁহার মত দয়ালু লোক বড় একটা দেখা যায় না। তিনি তোমাকে খুব আদর-যত্ন করিয়াই তাঁহার কাছে রাখিবেন।" এই কথা কয়টি বলিয়াই স্ত্রীলোকটি সেখান হইতে চলিয়া গেল।

রূপার বাসন চুরি

আশার একটা ক্ষীণ আলো দেখিতে পাইয়া জিন্ ভল্‌জিন ধীরে ধীরে বিশপের বাড়ীর দরজার কাছে গিয়া ডাক দিল। ভিতর হইতে বিশপ তাহার ডাক শুনিয়া বলিয়া উঠিলেন—"ভিতরে আসুন।"

বিশপের সাম্‌নে উপস্থিত হইয়া জিন্ ভল্‌জিন্ কোনও রকম দ্বিধা না করিয়া বলিল, "আমার নাম জিন্ ভল্‌জিন্। আমি জেল-ফেরৎ আসামী। দীর্ঘ উনিশ বৎসর পরে আমি ছাড়া পাইয়াছি, কিন্তু আজ চারদিন ধরিয়া এখান-ওখান করিয়া



একটি রাত্রি থাকিবার জন্য জিন্ ভল্‌জিন জেলের কর্ত্তার নিকট প্রার্থনা করিতেছে।

নানা স্থানে ঘুরিতেছি। কোথাও আশ্রয় পাই নাই। সকলেই কুকুরের মত আমাকে দূর

দূর করিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত ও ক্ষুধার্ত্ত। আপনি কি আমাকে একটু আশ্রয় দিতে পারেন? আমি তাহার বদলে টাকা দিতে প্রস্তুত আছি।" কোনও রকম কুণ্ঠা বা লজ্জা বোধ না করিয়া সে তাহার সত্য পরিচয়টা প্রকাশ করিয়া বলিয়া দিল। কারণ সকল জায়গায় জিন্ ভল্‌জিন যে রকম ব্যবহার পাইয়াছিল, তাহাতে সেখানেও সে সেইরকম ব্যবহার আশা করিয়াই গিয়াছিল।

বিশপের পরিবারে তাঁহার একমাত্র ভগিনী ম্যাডাম ব্যাপটিস্‌টাইন্ এবং চাকরাণী ম্যাগ্লায়ার ছাড়া আর কেহই ছিলেন না। বিশপের সেই দাসী তখন খাবার পরিবেশন করিয়া টেবিল সাজাইতে-ছিল। জিন্ ভল্‌জিনের অবস্থা দেখিয়া বিশপের মন দয়ায় গলিয়া গেল। তিনি তাঁহার দাসীকে ডাকিয়া বলিলেন, "ম্যাগ্লায়ার, আর এক থালা বেশী খাবার পরিবেশন করিয়ো। একজন অতিথি আসিয়াছেন।" এই কথা বলিয়াই তিনি জিন্ ভল্‌জিন্‌কে বলিলেন, "আপনি বসুন। এখনই খাবার পরিবেশন হইয়া যাইবে। আর আমরা খাইতে খাইতে আপনার বিছানাও প্রস্তুত হইয়া যাইবে। খাইয়া উঠিয়াই আপনি নিশ্চিন্ত হইয়া এখানে ঘুমাইতে পারিবেন।"

যে জিন্ ভল্‌জিন্ দিন চারেক ধরিয়া অতি কাতরভাবে সকলের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করিয়া বেড়াইয়াছে, কিন্তু সব স্থান হইতে সে বিতাড়িত হইয়াছে—সেই জিন্ ভল্‌জিন আজ আশ্রয় পাইল। দয়ার স্পর্শ পাইয়া তাহার মুখে চোখে আনন্দের ও বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়া উঠিল। আনন্দের আতিশয্যে সে এমনই অভিভূত হইয়া পড়িয়াছিল যে, বিশপকে ধন্যবাদ দিতে গিয়া তাহার কণ্ঠরোধ হইয়া আসিতে লাগিল।

কিছুক্ষণ পরেই জিন্ ভল্‌জিন্‌কে লইয়া বিশপ খাইতে গেলেন। জিন্ ভল্‌জিন্ খাইতে বসিয়া দেখিল যে, অতিথিকে সম্মান দেখাইবার জন্য তাহাকে রূপার বাসনপত্রে খাবার দেওয়া হইয়াছে।

জিন্ ভল্‌জিন্ এতই ক্ষুধার্ত্ত হইয়াছিল যে, সে একটিও কথাবার্তা না বলিয়া গোগ্রাসে খাইয়া যাইতে লাগিল। খাওয়ার পরে বিশপ জিন্ ভল্‌জিন্‌কে তাহার বিছানা দেখাইয়া দিলেন। জিন্ ভল্‌জিন্ সেখানে শুইয়া পড়িল। অল্পক্ষণ পরেই বাড়ীর সকলে ঘুমাইয়া পড়িল এবং সমস্ত বাড়ীখানি নিস্তব্ধ হইয়া গেল।

কিছুক্ষণ ঘুমানোর পরেই জিন্ ভল্‌জিনের ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। জাগিয়া উঠিয়া জিন্ ভল্‌জিন্ অনেকবার এপাশ-ওপাশ করিয়া ঘুমাইবার চেষ্টা করিল। কিন্তু তাহার ঘুম কিছুতেই আসিল না। জীবনের সমস্ত ঘটনা এক একটা করিয়া তাহার মনের মধ্যে এমন তোলপাড় করিতে লাগিল যে, সে জাগিয়া উঠিয়া কেবল সেই কথাই ভাবিতে লাগিল।

বহু পূর্ব্বে একটা অনিশ্চিত আতঙ্কে কাঁপিতে কাঁপিতে জিন্ ভল্‌জিন্ একদিন জেলে গিয়াছিল। কিন্তু সে যখন জেল হইতে বাহির হইয়া আসিল তখন জেলখানার জীবন ও ব্যবস্থা সম্বন্ধে তাহার মন ঘৃণা ও বিতৃষ্ণায় ভরিয়া গিয়াছিল। যে উনিশ বৎসর সে জেলে ছিল, সেই কয় বৎসর স্নেহ-মমতা যে কাহাকে বলে, তাহা সে জানিত না। কিন্তু সেদিন বিশপের বাড়ীতে পা দিয়াই জিন্ ভল্‌জিন্ দয়া, মমতা ও স্নেহের পরিচয় পাইল।

নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে জিন্ ভল্‌জিন্ টপ্ করিয়া বিছানা ছাড়িয়া উঠিয়া পড়িল। বিছানা হইতে উঠিয়াই সেই রূপার বাসনগুলার কথা তাহার মনে পড়িল। সে ভাবিল, "সবাই তো ঘুমাইতেছে। এই সুযোগে অতগুলো রূপার বাসন লইয়া পালাই না কেন। তাহা হইলে সেগুলো বেচিয়া আমার কিছু টাকা-কড়ি হইবে।" দুর্জ্জয় লোভ সামলাইতে না পারিয়া সে অন্ধকারে হাতড়াইতে হাতড়াইতে অতি সন্তর্পণে খাবার ঘরের দিকে গেল। তারপরে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দেখিল যে, একটা ঝুড়ির মধ্যে বাসনগুলা রহিয়াছে। তখন তাড়াতাড়ি বাসনগুলাকে বাহির করিয়া একটা থলির মধ্যে ভরিয়া পা টিপিয়া টিপিয়া বিশপের বাড়ী ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পলাইয়া গেল।

সকালবেলা উঠিয়া বিশপ তাহার বোনের মুখে শুনিলেন যে, তাঁহার অতিথিটি সব রূপার বাসনপত্র লইয়া পলায়ন করিয়াছে, তখন তিনি হাসিয়া উত্তর দিলেন, "যাক্ না, ভালই হইয়াছে। আমার অত বিলাসিতায় কাজ কি?" বিশপের কথা শুনিয়া তাহার বোন তো একেবারে অবাক্।

কিন্তু বিশপ যত সহজে ছাড়িলেন, পুলিশে জিন্ ভল্‌জিন্‌কে তত সহজে ছাড়িল না। কাঁধে একটা প্রকাণ্ড ভারী থলি বহিতে দেখিয়া পুলিশের লোকেরা তাহাকে সন্দেহ করিয়া তাহার থলি খুলিয়া দেখিল যে, তাহাতে সেই রূপার বাসন-পত্রগুলা রহিয়াছে। উহা দেখিয়া তাহারা জিন্ ভল্‌জিন্‌কে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি এগুলি কোথায় পাইয়াছ?" জিন্ ভল্‌জিন্ ফস্ করিয়া বলিয়া ফেলিল, "বিশপ এগুলি আমাকে দিয়াছেন।" পুলিশের লোকেরা তাহার কথাটা বিশ্বাস করিতে পারিল না। সেইজন্য তাহারা ব্যাপারটা প্রমাণ করিয়া দেখিবার জন্য জিন্ ভল্‌জিন্‌কে তাহাদের সহিত বিশপের বাড়ীতে যাইতে বলিল। জিন্ ভল্‌জিন্ আর কি করে? সে অগত্যা মুখ নীচু করিয়া তাহাদের পিছু পিছু বিশপের বাড়ীতে গিয়া উপস্থিত হইল।

বিশপ তখন তাঁহার সকালবেলার জলখাবার খাইতেছিলেন। পুলিশের সার্জেন্ট তাঁহাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তিনি বাহিরে আসিয়া পুলিশ সার্জেন্টের কাছে সব ব্যাপার শুনিতে শুনিতে দেখিলেন যে, জিন্ ভল্‌জিন্ এক পাশে মুখ নীচু করিয়া দাঁড়াইয়া আছে। তিনি তখনই বলিয়া উঠিলেন, "হাঁ হাঁ, আমি তো সব বাসনই উহাকে দিয়াছি।" এই কথা বলিয়া জিন্ ভল্‌জিন্‌কে লক্ষ্য করিয়া বলিলেন, "আমি তো আপনাকে রূপার বাতিদানও দিয়াছিলাম। আপনি যে সে দুটা ফেলিয়া গিয়াছেন।" এই কথা বলিয়া বিশপ বাড়ীর ভিতরে গেলেন এবং তখনই রূপার বাতিদান দুইটি আনিয়া জিন্ ভল্‌জিনের হাতে দিলেন। ইহা দেখিয়া পুলিশের লোকেরা বিশপকে জিজ্ঞাসা করিল, "আমরা তাহা হইলে যাইতে পারি?" বিশপ বলিলেন, "নিশ্চয়। আপনারা অনর্থক ইঁহাকে কষ্ট দিয়া ফিরাইয়া আনিয়াছেন।"

বিশপের কথা শুনিয়া পুলিশের লোকেরা চলিয়া গেল। বিশপ তখন জিন্ ভল্‌জিন্‌কে আশীর্ব্বাদ করিয়া বলিলেন, "যাও ভাই। সৎপথে থাকিয়া পরের উপকার করিতে কখনও ভুলিও না।" জিন্ ভল্‌জিন্ বিশপের ব্যবহারে মুগ্ধ ও অবাক্ হইয়া কেবল একবার বিশপের হাসিমাখা মুখের দিকে চাহিয়া দেখিল, তাহার পর সেখান হইতে রওনা হইয়া সেই সহর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

ফাদার ম্যাডেলিন্

জিন্ ভল্‌জিন্ নানান্ কথা ভাবিতে মাইলের পর মাইল হাঁটিয়া চলিল। বাহিরের কোনও কিছুর প্রতিই তাহার আর কোন খেয়ালই রহিল না। শেষকালে রাস্তার ধারে একটা বেঞ্চের উপরে বসিয়া পড়িয়া আকাশ পাতাল কত কথাই না ভাবিয়া চলিল।

ইহার মধ্যে একটি ছোট্ট ছেলে জিন্ ভল্‌জিনের সম্মুখ দিয়া যাইতেছিল। তাহার হাত হইতে হঠাৎ একটা টাকা পড়িয়া গেল এবং উহা গড়াইয়া গিয়া জিন্ ভল্‌জিনের পায়ের কাছে পড়িল। জিন্ ভল্‌জিন্ টপ্ করিয়া টাকাটার উপর তাহার জুতাসুদ্ধ পাখানি চাপিয়া বসিল। ওদিকে ছেলেটি আসিয়া টাকাটি ফিরাইয়া দিবার জন্য অতি করুণভাবে কত অনুনয় বিনয় করিল—তাহার পাখানি টানিয়া কাঁদিয়া কতই না কাকুতি-মিনতি করিল, কিন্তু টাকাটার উপর জিন্ ভল্‌জিনের পা এমনভাবেই চাপিয়া রহিল যে, তাহার পা সেখান হইতে একচুলও নড়িল না। এমনি গম্ভীরভাবে জিন্ ভল্‌জিন্ চিন্তা করিতেছিল যে, ছেলেটির কাতর অনুরোধ তাহার কানেই গেল না।

ছেলেটি চলিয়া যাওয়ার খানিক পরেই তাহার মনে হইল, "কি করিলাম! ঐ অতটুকু একটি ছেলের টাকা আমি এইভাবে কাড়িয়া লইলাম!" এই চৈতন্য হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে জিন্ ভল্‌জিন্ সেখান হইতে উঠিয়া পড়িয়া এদিক-ওদিক করিয়া ছেলেটির অনেক খোঁজ করিল। ছেলেটি জিন্ ভল্‌জিনের পা সরাইবার চেষ্টা করিতে করিতে তাহার নাম বলিয়াছিল। উহা জিন্ ভল্‌জিনের কানে গিয়াছিল। সেই নাম ধরিয়া জিন্ ভল্‌জিন্ চেঁচাইয়া চেঁচাইয়া কত ডাকিল। কিন্তু ছেলেটি আর আসিল না। ছেলেটিকে কোথাও খুঁজিয়া না পাইয়া এবং নিজের অপরাধের মাত্রাটা বুঝিতে পারিয়া জিন্ ভল্‌জিন্ সেদিন কাঁদিয়া ফেলিল। উনিশ বৎসরের মধ্যে সে অনেক রকম দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াছিল। কোন দিনও তাহার চোখে জল আসে নাই। কিন্তু

সেদিন তাহার অপরাধের গুরুত্বটুকু তাহাকে এমনই পীড়া দিতে লাগিল যে, সে সেই দুঃখ চাপিয়া রাখিতে না পারিয়া কাঁদিতে লাগিল। উনিশ বৎসর পরে সেই দিনই প্রথম তাহার চোখ দিয়া জল গড়াইয়া পড়িতে লাগিল।

ইহার পর জিন্ ভল্জিন হাঁটিতে হাঁটিতে একটা মস্ত বড় সহরে গিয়া প্রবেশ করিল। যেদিন সে সেইখানেই পৌঁছাইল, সেইদিন সেখানে একটা বাড়ীতে ভীষণ আগুন লাগিয়াছিল। জিন্ ভল্জিন্ সেই বাড়ীখানার কাছে গিয়া শুনিল যে, সেই বাড়ীর ভিতরে দুটি ছোট ছোট শিশু রহিয়া গিয়াছে। বাড়ীখানার ভিতর হইতে লক্লক্ করিয়া এমন ভীষণ আগুনের শিখা বাহির হইতেছিল যে, কেহই বাড়ীখানার কাছে পর্য্যন্ত অগ্রসর হইতে সাহস করে নাই। কিন্তু জিন্ ভল্জিন্ একরকম নিজের জীবনটাকে বিপন্ন করিয়াই বাড়ীখানার মধ্যে ঢুকিয়া পড়িল এবং নিরাপদে শিশু দু'টিকে কোলে করিয়া ফিরিয়া আসিল। তাহার এই অসমসাহসিক কাজ দেখিয়া সহরের সকলে তাহার প্রতি খুবই সন্তুষ্ট হইলেন এবং সকলের মন তাহার প্রতি শ্রদ্ধায় একেবারে ভরিয়া গেল। ইহাতে তাহার ভালই হইল, কারণ তাহার পরিচয়টা কেহ একবার ভুলিয়াও জিজ্ঞাসা করিলেন না। সে যে জেল ফেরৎ আসামী এবং দাগী চোর সেই পরিচয়টা প্রকাশ পাইল না।

জিন্ ভল্জিন্ বেশ নিশ্চিন্ত হইয়া সেই সহরেই বাস করিতে লাগিল। ঐ সহরে সে ম্যাডেলিন্ নামে পরিচয় দিত। তাহার আসল নাম যে জিন্ ভল্জিন্, তাহা সে কাহাকেও কোনও দিন ভুলিয়াও বলে নাই।

অল্পদিনের মধ্যেই জিন্ ভল্জিন্ কল-কারখানার অনেক কাজকর্ম্ম শিখিয়া ফেলিল। হাতে কিছু টাকা পাইয়া সে নিজেই একটা কাঁচের পুঁতি তৈয়ারী করিবার কারখানা খুলিয়া দিল। দেখিতে দেখিতে তাহার কারখানাটি মস্ত বড় হইয়া উঠিল এবং ক্রমশঃ সেও খুব ধনী হইয়া উঠিল। তাহার কারখানায় বহু লোক কাজ করিত। দীন-দরিদ্র কর্ম্মচারীদের প্রতি সে এমন দয়া মমতা ও সহানুভূতি দেখাইত যে, তাহারা তাহাকে খুবই ভালবাসিত এবং সম্মান করিত। সকলেই সম্মান করিয়া তাহাকে ফাদার ম্যাডেলিন্ বলিয়া ডাকিত।

ক্রমশঃ এই ফাদার ম্যাডেলিন্ এমন জনপ্রিয় হইয়া উঠিল যে, সেখানকার সব লোকেরা তাহাকে ঐ সহরের মেয়র করিয়া দিল। তাহার ভদ্রতায় এবং মিষ্টি কথায় সেই সহরের সবাই খুব মুগ্ধ হইয়াছিল।

কিন্তু একজন লোক খুব সন্দেহের চোখে এই মেয়রের হাব-ভাব লক্ষ্য করিতেন। ইঁহার নাম ছিল জ্যাভার্ট। ইনি ছিলেন পুলিশের ইন্-স্পেক্টর। ইঁহার মত উৎসাহী এবং কর্ত্তব্য-পরায়ণ পুলিশের লোক বড় একটা দেখা যাইত না। এই জ্যাভার্ট জেলখানাতে জন্মগ্রহণ করিয়া সেইখানেই বড় হইয়াছিলেন। তাঁহার প্রায়ই মনে হইত যে, তিনি যেন এই ফাদার ম্যাডা-লিন্‌কে পূর্ব্বে কোথাও দেখিয়াছেন। কিন্তু ঠিক মনে করিয়া উঠিতে পারিতেন না।

একদিন একটা ব্যাপার লইয়া ফাদার ম্যাডে-লিনের সহিত ইন্স্পেক্টর জ্যাভার্টের একটু মনোমালিন্যও হইয়া গেল। ফাদার ম্যাডেলিনের কারখানায় ফ্যান্টাইন্ নামে একটি অতি গরীব স্ত্রীলোক কাজ করিত। কি একটা কারণে একদিন ফ্যান্টাইন্ তাহার চাকরি হইতে বরখাস্ত হইয়া গেল। ফাদার ম্যাডেলিন্ কিন্তু ইহার বিন্দু বিসর্গও জানিত না।

ফ্যান্টাইনের থাকিবার মধ্যে একটি ছোট্ট মেয়ে ছিল। সেই মেয়েটির নাম ছিল কসেট্। ফ্যান্টাইন্ তাহার মেয়ে কসেট্‌কে মন্ট্ফারমেল্ নামক এক গ্রামে এক হোটেল-ওয়ালার কাছে রাখিয়াছিল। ঐ হোটেলওয়ালা কসেটের ভরণ-পোষণের নাম করিয়া প্রতি মাসে ফ্যান্টাইনের কাছ হইতে বহু টাকাকড়ি আদায় করিত। সুতরাং চাকরি যাওয়াতে গরীব ফ্যান্টাইন্ বড়ই বিপদে পড়িল। অর্থাভাবে ও অন্নাভাবে তাহার নিজের দিনই কাটিতে চাহিত না, সুতরাং সে কেমন করিয়া কসেটের লালন-পালনের জন্য টাকাকড়ি জোগাইবে?

কোথাও কোনও চাকরি জোগাড় করিতে না পারিয়া আর কসেটের লালন-পালনের খরচ জোগাইতে না পারিয়া গঞ্জনা সহ্য করিয়া করিয়া ফ্যান্টাইন্ একেবারে অস্থির হইয়া পাগলের

মত হইয়া গেল। সেইজন্য একদিন ফাদার ম্যাডেলিন্‌কে রাস্তায় দেখিতে পাইয়া ফ্যান্টাইন্ তাহাকে খুব একচোট অপমান করিয়া গালাগালি দিয়া লইল। কারণ তাহার ধারণা ছিল যে, ফাদার ম্যাডেলিনই তাহাকে চাকরি হইতে ছাড়াইয়া দিয়াছেন। ফাদার ম্যাডেলিন্ তো তাহার গালা-গাল শুনিয়া একেবারে অবাক্।

জ্যাভার্ট এই খবর পাইয়া মেয়রকে অপমান করার অপরাধে ফ্যান্টাইন্‌কে গ্রেপ্তার করিয়া তাহার কঠিন শাস্তির ব্যবস্থা করিতে যাইতে-ছিলেন। এমন সময়ে ফাদার ম্যাডেলিন্ মধ্যস্থ হইয়া ব্যাপারটা মিটাইয়া দিল। কিন্তু ইহাতে জ্যাভার্ট মোটেই খুসী হইলেন না।

জ্যাভার্ট ফ্যান্টাইন্‌কে মুক্তি দিলেন বটে কিন্তু তাঁহার কর্ত্তব্যে বাধা পড়িল বলিয়া তিনি মনে মনে রাগিয়া গেলেন। জ্যাভার্ট ভাবিলেন যে, ফাদার ম্যাডেলিন্ এই ব্যাপারটা সামান্য ভাবিতে পারে, কিন্তু তিনি পুলিশ ইন্‌স্পেক্টর হইয়া কেমন করিয়া ঐরকম অপমান করাটাকে তাচ্ছিল্য করিতে পারেন? যাহা হউক, এই ব্যাপারে দুইজনের মধ্যে একটু মনোমালিন্যের সৃষ্টি হইল।

আপনিই জিন্‌ভলজিন্

ফাদার ম্যাডেলিনের দয়ায় ফ্যান্টাইন্ শাস্তি হইতে রক্ষা পাইল বটে কিন্তু ফ্যান্টাইন্‌কে মৃত্যুর হাত হইতে রক্ষা করা তাহার সাধ্যের অতীত ছিল। দুঃখ-কষ্ট সহ্য করিয়াও নানারকম যন্ত্রণা পাইয়া পাইয়া বেচারী ফ্যান্টাইন্ শেষে এমনিই পীড়িত হইয়া পড়িল যে, তাহার আর বাঁচিবার কোনও আশা রহিল না।

ফ্যান্টাইন্ যখন হাসপাতালে মৃত্যুশয্যায় তখন ফাদার ম্যাডেলিন্ প্রায়ই তাহাকে দেখিতে যাইত। যেদিন ফ্যান্টাইন্ মারা যায়, সেদিন সে তাহার মেয়ে কসেটের সমস্ত ভার ফাদার ম্যাডেলিনের হাতে দিয়া গেল। ম্যাডেলিন্ যখন খুসীমনে ফ্যান্টাইনের মেয়ের সকল ভার গ্রহণ করিল, তখন সেই মৃত্যুশয্যায় শুইয়াও ফ্যান্টাইনের মুখ হাসিতে ভরিয়া গেল এবং কৃতজ্ঞতায় তাহার চোখ দুটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

ফ্যান্টাইন্ মারা যাওয়ার পর একদিন বিকালের দিকে ফাদার ম্যাডেলিন্ তাহার আফিসে বসিয়া মেয়রের কতকগুলি জরুরি কাজ-কর্ম্ম সারিতেছিল। কারণ তাহার ইচ্ছা ছিল যে, কয়েকদিনের জন্য সহর ছাড়িয়া মণ্টফারমল্ গ্রামে গিয়া কসেটের খোঁজ করিয়া তাহাকে লইয়া আসিবে। ইহার মধ্যে একদিন হঠাৎ জ্যাভার্ট আফিসে ঢুকিয়া ফাদার ম্যাডেলিন্‌কে বলিলেন, "আপনি আমাকে চাকরি হইতে বরখাস্ত করুন।"

ম্যাডেলিন্ তাহার কাগজ পত্র হইতে মুখ তুলিয়া তাহার দিকে চাহিয়া বলিল, "কেন? কারণ কি?"

জ্যাভার্ট বলিলেন, "বছর পাঁচেক আগে জিন্ ভল্‌জিন্ নামে একটি দাগী আসামী একটি ছোট্ট ছেলের কাছ হইতে টাকা কাড়িয়া লয়। সেই অপরাধের জন্য পুলিশ তাহার নামে গ্রেপ্তারের শমন বাহির করিয়া খোঁজ করিতেছিল। কিন্তু কোথাও সন্ধান করিয়া উঠিতে পারে নাই। আমার কেন যেন সন্দেহ হয় যে, আপনিই জিন্ ভল্‌জিন্। আমি আপনাকে জিন্ ভল্‌জিন্ মনে করিয়া প্যারিসের প্রধান কর্ম্মচারীর কাছে একটা সংবাদ পাঠাইয়াছিলাম।"

জ্যাভার্টের কথা শুনিয়া ফাদার ম্যাডেলিনের মুখ ফ্যাকাশে হইয়া গেল—তাহার বুকের মধ্যটা একবার দুরুদুরু করিয়া উঠিল। তারপর সে নিঃশ্বাস বন্ধ করিয়া বলিল, "তারপর?"

জ্যাভার্ট উত্তর দিলেন, "তারপর সদর হইতে খবর আসিয়াছে যে, আমি একটি আস্ত পাগল। কারণ তাহারা আসল জিন্ ভল্‌জিন্‌কে খুঁজিয়া পাইয়াছে। একদিন এক বুড়া এক বাগানের মধ্যে চুরি করিতে ঢুকিয়াছিল, কিন্তু সে ধরা পড়ে। ধরা পড়িবার পর যখন তাহাকে জেল-খানায় লইয়া যাওয়া হয়, তখন সকলে তাহাকে জিন্ ভল্‌জিন্ বলিয়া স্পষ্টই চিনিতে পারে। আমিও গিয়া তাহাকে সনাক্ত করিয়া আসিয়াছি। কাল আরাস নামক স্থানে তাহার বিচার হইবে। সে দাগী চোর। কাজেকাজেই এইবারকার বিচারে তাহার যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা হইবে নিশ্চয়, এখন আমাকে আপনি স্বচ্ছন্দে কাজ হইতে ছাড়াইয়া দিতে পারেন, কারণ আমার জন্যই আপনার মত একজন সম্ভ্রান্ত ও দেশের সকলের একান্ত প্রীতিভাজন লোকের বিনা দোষে ভয়ানক একটা শাস্তি হইতে যাইতেছিল।"

ম্যাডেলিন্ জোর করিয়া একটু হাসিয়া বলিল, "না, না, ইহাতে আমি তো আপনার কোনও দোষ দেখি না। আপনি আপনার কাজ করিতে থাকুন।" এই কথা শুনিয়া জ্যাভার্ট সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। জ্যাভার্ট সেখান হইতে চলিয়া গেলে পর জিন্ ভল্‌জিনের মনের মধ্যে ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল। সে তখনই বাড়ী ফিরিয়া গেল এবং সেদিন সারারাত তাহার চোখে একটুও ঘুম আসিল না। জ্যাভার্টের কাছ হইতে সেই সব কথাগুলা শোনা অবধি তাহার এমনি দুঃসহ কষ্ট হইতেছিল যে, কেবলই ঘরের মধ্যে ঘুরিয়া ঘুরিয়া সে পায়চারী করিতে লাগিল, আর নানা কথা ভাবিতে লাগিল। জিন্ ভল্‌জিন্ ভাবিল যে, সে তো তাহার কলুষিত অতীত জীবনের সকল কলঙ্ক মুছিয়া ফেলিবার যথেষ্টই চেষ্টা করিয়াছে, তবু কেন বিপদের সম্ভাবনা তাহাকে বারবার ঐরকম উদ্বেগের মধ্যে ফেলিতেছে? আর এবারে ব্যাপারটা কিছু জটিল হইয়াই দাঁড়াইয়াছে। কারণ সে যদি তাহার আসল পরিচয় প্রকাশ করে, তাহা হইলে তাহার এই রাজার ঐশ্বর্য্য, সম্মান ও সম্ভ্রম সব একদিনেই লুপ্ত হইয়া যাইবে। আর যদি সে এইবার তাহার আসল পরিচয়টা চাপিয়া লুকাইয়া যাইতে পারে, তাহা হইলে তাহার নামে আর একজনের শাস্তি হইয়া যাইবে। ইহাতে সে দিব্যি নিশ্চিন্ত হইয়া তাহার জীবনের বাকী দিন কয়টা বেশ আরামেই কাটাইয়া দিতে পারিবে। অথচ তাহার অপরাধের জন্য একজন নির্দোষী বৃদ্ধের যাবজ্জীবন কারাবাস হইয়া যাইবে, ইহা সে কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছিল না। তাহার মন যখন এইরকম দ্বন্দ্বের মধ্যে পড়িয়া কর্ত্তব্য স্থির করিতে পারিতেছিল না, তখন বিশপের উপদেশ ও আশীর্ব্বাদের কথা তাহার মনে পড়িয়া গেল—'**সৎপথে থাকিও।**' এই সব কথা মনে পড়িতেই সে তাহার কর্ত্তব্য স্থির করিয়া ফেলিল। তাহার যেখানে যত টাকাকড়ি ছিল সব একত্র করিয়া এক জায়গায় লুকাইয়া পুঁতিয়া রাখিল, তাহার পর আরাসের অভিমুখে যাত্রা করিল।

জিন্ ভল্‌জিনের শাস্তি

যে বৃদ্ধ লোকটিকে জিন্ ভল্‌জিন্ বলিয়া ঠিক করিয়া লইয়াছিল, তাহার বিচার শেষ হইবার পূর্ব্বেই আসল জিন্ ভল্‌জিন্ অর্থাৎ ফাদার ম্যাডেলিন্ বিচারালয়ে গিয়া উপস্থিত হইয়া বলিল যে, সকলের সম্মানের পাত্র, পরম ধার্ম্মিক ও পরম দয়ালু ফাদার ম্যাডেলিন্‌ই জিন্ ভল্‌জিন্—সে-ই দাগী আসামী, অন্য কেহ নহে। আর যে বৃদ্ধকে জিন্ ভল্‌জিন্ মনে করিয়া তাহার ভীষণ শাস্তির ব্যবস্থা হইতে যাইতেছে, সে হইতেছে সামান্য একজন চোর। তাহার এই কথা শুনিয়া আদালতের সকলে স্তম্ভিত হইয়া গেলেন।

আবার নূতন করিয়া বিচার আরম্ভ হইল এবং সেই বিচারে হুকুম হইয়া গেল যে, আসল জিন্ ভল্‌জিন্‌ই যাবজ্জীবন ধরিয়া দণ্ডভোগ করিবে।

নৌকার দাঁড়ী করিয়া পাঠাইয়া দিয়া জিন্ ভল্‌জিনের অপরাধের শাস্তি দেওয়া হইল। টুলন্ বন্দরে যে সব বড় বড় নৌকা যাওয়া-আসা করিত সেই সব জাহাজে সারা দিনরাত ধরিয়া তাহাকে অন্যান্য আরও সব অপরাধীদের সহিত নৌকার দাঁড় বাহিতে হইত। ইহাতে তাহার ভাগ্যে বিশ্রামের অবসর প্রায় জুটিত না বলিলেই হয়।

একদিন টুলনের এক সংবাদ-পত্রে বাহির হইল যে, গতকল্য একজন লোক সমুদ্রের জলে ডুবিয়া যাইতেছিল। তাহাকে বাঁচাইতে গিয়া একজন কয়েদী আসামী ডুবিয়া গিয়াছে। ঐ কয়েদী আসামীটির নাম জিন্ ভল্‌জিন্। উহার মৃতদেহ কোথাও খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

জিন্ ভল্‌জিন্ ও কসেট্

একদিন এক বৃদ্ধ ধীরে ধীরে আসিয়া মণ্ট-ফারমেল্ গ্রামের মধ্যে প্রবেশ করিল। তাহার চুলগুলি রুক্ষ, চেহারা ও পোষাক-পরিচ্ছদ অত্যন্ত মলিন, চোখ মুখ বসিয়া গিয়া কালো হইয়া উঠিয়াছে, আর তাহার মুখভরা খোঁচা খোঁচা গোঁফদাড়ি। এই বৃদ্ধটিই যে জিন্ ভল্‌জিন, তাহা বোধ হয় আর বলিয়া দিতে হইবে না।

জিন্ ভল্‌জিন্ যে গ্রামে গিয়া প্রবেশ করিয়াছিল, সেখানে থেনার্ডিয়ার নামে একটা ভারী দুষ্ট হোটেলওয়ালা থাকিত। ঐ হোটেলওয়ালার কাছে কসেট্ মেয়েটি থাকিত। থেনার্ডিয়ারের প্রাণে এতটুকু দয়া মমতা ছিল না। সে ঐ

অতটুকু মেয়েটির প্রতি বড়ই নির্দ্দয় ব্যবহার করিত। ঐটুকু মেয়েকে দিয়া সে ঝিয়ের মত অনেক কাজ করাইয়া লইত। অথচ মেয়েটিকে ভাল করিয়া কখনও খাইতে পর্য্যন্ত দিত না। উপরন্তু কাজ-কর্ম্মে ভুল হইলে মাঝে মাঝে কসেট্‌কে মার পর্য্যন্ত খাইতে হইত। দিনের পর দিন কাটিয়া যাইত কিন্তু কসেট্‌ মেয়েটির মুক্তির কোনও একটা উপায় হইত না।

জিন্‌ ভল্‌জিন্‌ থেনার্ডিয়ারের হোটেলের খোঁজ করিতে করিতে সেখানে গিয়া পৌঁছাইল। ফ্যাণ্টাইন্‌ যে তাহার মেয়ের সকল ভার জিন্‌ ভল্‌জিন্‌কে দিয়া যাইতেছে সেই মর্ম্মে একখানা কাগজ সে মারা যাওয়ার সময়ে জিন্‌ ভল্‌জিনের হাতে দিয়া গিয়াছিল। জিন্‌ ভল্‌জিন্‌ হোটেলে পৌঁছাইয়া থেনার্ডিয়ারকে ডাকিয়া সেই কাগজখানি দেখাইল। তারপর বহু টাকাকড়ি দিয়া কসেট্‌কে সেখান হইতে মুক্ত করিয়া তাহাকে সঙ্গে করিয়া হোটেল হইতে বাহির হইয়া পড়িল। এইবার কসেট্‌কে লইয়া সে একেবারে প্যারিসে গিয়া উপস্থিত হইল।

জিন্‌ ভল্‌জিন্‌ কসেট্‌কে লইয়া প্যারিসে একটি বাড়ী ভাড়া করিয়া থাকিত। জিন্‌ ভল্‌জিনের সারা জীবনটা যে রকম দুঃখ-কষ্টের মধ্যে কাটিয়াছিল, তাহাতে সে কোন দিন কাহারও স্নেহ-মমতা বা ভালবাসা পায় নাই এবং স্নেহ-মমতা ও ভালবাসা প্রকাশ করিবার কোনও সুযোগ পায় নাই। সেইজন্য কসেট্‌কে সে তাহার সমস্ত মন-প্রাণ দিয়া ভালবাসিত। বাস্তবিকই কসেট্‌ তাহার মনের অনেকখানি জুড়িয়া বসিয়াছিল। আর কসেট্‌ও জিন্‌ ভল্‌জিন্‌কে খুবই ভালবাসিত। কারণ ইহার পূর্ব্বে ঐ আট বছরের মেয়ে একদিনের জন্যও স্নেহ-মমতার স্পর্শ পায় নাই। অতি অল্প বয়সে মা-ছাড়া হইয়া তাহাকে থেনার্ডিয়ারের কাছে থাকিতে হইয়াছিল এবং তাহার কাছ হইতে সে কেবলই নির্দ্দয় ব্যবহার পাইয়াছিল। থেনার্ডিয়ারের কাছ হইতে সে বেচারী একদিনের জন্যও একটা মিষ্টি কথা শোনে নাই।

প্যারিসে তাহাদের দিনগুলি বেশ আনন্দেই কাটিতেছিল। বৃদ্ধ জিন্‌ ভল্‌জিন্‌ কসেট্‌কে অনেক খেলনা দিয়াছিল। খেলনা পাইয়া সে তো খুব খুসী। কসেট্‌ সব সময়েই হয় জিন্‌ ভল্‌জিনের সহিত কথা কহিত, আর না হয় হাসিত অথবা গান গাহিত।

জিন্‌ ভল্‌জিন্‌ কোনদিন ভুলিয়াও দিনের বেলায় বাড়ীর বাহির হইত না। তাহার সমস্ত কাজ-কর্ম্ম সে রাত্রিবেলাতেই সারিয়া রাখিত। তাহা সত্ত্বেও চারিদিকে রটিয়া গেল যে, সে একজন খুব দাতা সন্ন্যাসী। বাস্তবিকই সন্ধ্যার পরে সে যখন বাহিরে যাইত, তখন বহু গরীব দুঃখীকে দু'হাতে টাকাকড়ি বিলাইয়া দিয়া আসিত। প্রতিদিন সান্ধ্য ভ্রমণের পরে ফিরিবার সময়ে জিন্‌ ভল্‌জিন্‌



গরীব দুঃখীকে দু'হাতে টাকাকড়ি বিলাইত

দেখিত যে, একজন লোক গির্জ্জার সিঁড়ির সম্মুখে দাঁড়াইয়া চোখ বুজিয়া প্রার্থনার ভান করিয়া ভিক্ষা করিত। জিন্‌ ভল্‌জিন্‌ প্রত্যেক দিনই তাহাকে কিছু কিছু সাহায্য করিত। কিন্তু ভিক্ষা পাইয়াও সে চাহিয়া দেখিত না। এই লোকটিই কিন্তু জ্যাভার্ট। একদিন রাত্রে জিন্‌ভল্‌জিন্‌ যেই তাঁহার হাতে কিছু টাকা গুঁজিয়া দিল, অমনি সে চট্‌ করিয়া তাকাইয়া বেশ ভাল করিয়া জিন্‌ ভল্‌জিনের মুখখানি দেখিয়া লইয়া আবার চোখ বুঁজিয়া প্রার্থনা আরম্ভ করিয়া দিলেন। জিন্‌ ভল্‌জিন্‌ সেদিন স্পষ্টই বুঝিতে পারিল যে, ঐ লোকটি জ্যাভার্ট ছাড়া আর কেহ নহেন। ইহা

বুঝিয়াই জিন্ ভল্‌জিনের মুখ ফ্যাকাসে হইয়া গেল এবং ভয়ে ও আতঙ্কে তাহার মনের মধ্যে তোলপাড় করিতে লাগিল।

অল্প কয়েকদিন্ পরে জিন্ ভল্‌জিন্ দেখিল যে, কসেট্‌কে লইয়া সে যে বাড়ীতে বাস করিত, তাহারই নীচের তলায় জ্যাভার্ট আশ্রয় লইয়াছেন। ইহা দেখিয়া সেই রাত্রেই জিন্ ভল্‌জিন্ বাড়ী ছাড়িয়া পথে বাহির হইয়া পড়িল।

বিপদের মুখে ও আশ্রয়-লাভ

তখন গভীর রাত্রি। কসেটের হাত ধরিয়া জিন্ ভল্‌জিন্ নির্জ্জন ও নিস্তব্ধ রাস্তার পর রাস্তা পার হইয়া হন্ হন্ করিয়া হাঁটিয়া চলিতে লাগিল। কিছুদূর অগ্রসর হইয়া গিয়া জিন্ ভল্‌জিন্ ভাবিল যে, এবার আর তাহাদের কোনও বিপদের সম্ভবনা নাই। কিন্তু পিছন দিকে তাকাইয়া চাঁদের আলোতে সে চার পাঁচ জনের অস্পষ্ট ছায়া দেখিতে পাইয়া বুঝিল যে, নিশ্চয়ই পুলিশের কয়েকজন লোক তাহার পিছু লইয়াছে। ইহাতে তাহার সর্ব্বাঙ্গ ভয়ে থর থর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল—তাহার বুকের ভিতরটা দুরুদুরু করিতে লাগিল। জিন্ ভল্‌জিন্ এ-রাস্তা ও রাস্তা করিয়া ঘুরিয়া ঘুরিয়া নিজেকে লুকাইবার চেষ্টা করিতে লাগিল। এই রকম করিয়া ঘুরিতে ঘুরিতে একটা রাস্তায় ঢুকিয়াই সে আশেপাশের রাস্তায় কেবল সৈন্যদলের জুতার শব্দ আর জ্যাভার্টের গলার স্বর শুনিতে পাইল। ইহাতে সে যে কি করিবে, তাহা ঠিক করিতে না পারিয়া সেই রাস্তায় একবার চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। জিন্ ভল্‌জিন্ বেশ বুঝিল যে, জ্যাভার্টের নেতৃত্বে সৈন্যেরা যে রকম করিয়া তাহার খোঁজ করিতেছে, তাহাতে মিনিট পনের-কুড়ির ভিতরে সে তাহাদের জালে নিশ্চয়ই ধরা পড়িবে। ঐরকম ভীষণ অবস্থায় পড়িয়া তাহার মনে হইল যে, এবার বন্দী হইলেই তাহার ফাঁসী হইয়া যাইবে এবং চির-জীবনের মত সে কসেট্‌কে হারাইবে। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে রাস্তার ধারের একটা প্রকাণ্ড উঁচু পাঁচিলের উপরে তাহার চোখ পড়িল। সে তখনই ভাবিল যে, সে যদি সেই পাঁচিলটা একবার ডিঙাইতে পারে, তাহা হইলে সে গা-ঢাকা দিয়া পলাইয়া বাঁচিবে।

কিন্তু অত উঁচু খাড়া পাঁচিলে সে উঠিবে কেমন করিয়া? পলাইবার উপায় ভাবিতে ভাবিতে রাস্তার ল্যাম্পপোষ্টের উপর তাহার নজর পড়িয়া গেল। সে দেখিল যে, ল্যাম্পপোষ্টের গায়ে একটা দড়ি ঝুলিতেছে। সেই দড়িটা তাড়াতাড়ি খুলিয়া লইয়া তাহা দিয়া সে কসেট্‌কে বেশ ভাল করিয়া বাঁধিল। তাহার পর চুপি চুপি কসেটকে বলিল, "একটু আওয়াজ না করিয়া চুপ করিয়া এখানে দাঁড়াইয়া থাক।" এই কথা বলিয়া দড়িটার এক দিককার খুঁটটা দাঁতে চাপিয়া জিন্ ভল্‌জিন্



জিন্ ভল্‌জিন্ কসেট্‌কে দড়ি দিয়া টানিয়া উঠাইতেছে

পাঁচিলের উপর উঠিয়া পড়িল। তারপর ধীরে ধীরে কসেট্‌কে টানিয়া উপরে উঠাইয়া লইয়া পাঁচিল ডিঙাইয়া পলাইয়া গেল। জ্যাভার্ট ও তাঁহার সৈন্যদল বৃথাই জিন্ ভল্‌জিনের খোঁজ করিতে লাগিলেন।

পাঁচিলটার পিছনেই একটা কন্‌ভেণ্ট ছিল। জিন্ ভল্‌জিন্ সেই কন্‌ভেণ্টের বাগানের মধ্যে গিয়া নামিয়াছিল।

সেই কন্‌ভেণ্টের মালী ছিল জিন্ ভল্‌জিনের খুবই পরিচিত। কাজে কাজেই সেই অসময়ে জিন্ ভল্‌জিনের বেশ সুবিধা হইল। সেই মালিটি জিন্ ভল্‌জিনকে নিজের ভাই আর কসেট্‌কে তাহার নিজের নাৎনী বলিয়া পরিচয় দিয়াই তাহার কাছেই

রাখিয়া দিল। কসেট্ সেই কন্‌ভেন্টে পড়াশোনা করিতে লাগিল।

ওদিকে জ্যাভার্ট তো সারারাত ধরিয়া এ-রাস্তা ও-রাস্তা করিয়া জিন্ ভল্‌জিন্‌কে খুঁজিয়া বেড়াইল। একটি মেয়েকে কোলে করিয়া কোনও লোক যে অতবড় একটা পাঁচিল ডিঙ্গাইতে পারে, একথা জ্যাভার্ট কিন্তু স্বপ্নেও ভাবেন নাই। জিন্ ভল-জিন্‌কে খুঁজিয়া না পাইয়া জ্যাভার্ট হতাশ হইয়া ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

প্রায় ছয় বৎসর খুব নিরাপদে এবং সুখে জিন্ ভল্‌জিনের দিনগুলি সেই বাগানের মধ্যে কাটিয়া গেল। তারপর সেই বাগানের মালীর মৃত্যুতে কসেট্‌কে সঙ্গে লইয়া জিন্ ভল্‌জিন্ সহরে গিয়া একটা বাসা করিল।

বিপ্লবের দিনে

দিন যায়। কসেট্ ক্রমশঃ যৌবনে পদার্পণ করিল। এই সময়ে ম্যারিয়াস্ নামে একজন খুব সম্ভ্রান্ত যুবকের সঙ্গে কসেটের খুবই আলাপ-পরিচয় হইল। তাহাদের দুই জনের আলাপ-পরিচয়ের ঘনিষ্ঠতা দেখিয়া জিন্ ভল্‌জিনের মনে হইল যে, উহাদের দুইজনের বিবাহ দেওয়া উচিত। কিন্তু এই চিন্তাতে জিন্ ভল্‌জিনের মনে দুঃখও হইল খুব। কসেটের বিবাহ দেওয়ার মানেই কসেট্‌কে চোখের আড়াল করিতে হইবে এবং কসেট্‌কে ছাড়িয়া দিতে তাহার বুক একেবারে ভাঙ্গিয়া যাইবে। কিন্তু উপায় কি। কসেট্‌কে সুখী করিতে হইলে জিন্ ভল্‌জিন্‌কে তাহার নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতে হইবে।

ইহার মধ্যে প্যারিসে একটা ভীষণ বিপ্লব আরম্ভ হইল। পথে পথে ছোট-খাট যুদ্ধ হইতে লাগিল। ম্যারিয়াস্ এই সব যুদ্ধের একটা দলের নেতা ছিল। ম্যারিয়াসের যাহাতে কোনও ক্ষতি না হয়, সে যাহাতে আহত না হয়, সেজন্য জিন্ ভল্‌জিন্ সব সময়ে তাহার সঙ্গে সঙ্গে থাকিত।

হঠাৎ একদিন জ্যাভার্ট বিপ্লবীদের হাতে বন্দী হইলেন। বিপ্লবীরা জ্যাভার্টকে গুলি করিবে বলিয়া একটা ল্যাম্প্‌পোষ্টের গায়ে খুব করিয়া তাঁহাকে বাঁধিয়া ফেলিল। ইহার মধ্যে জিন্ ভল্‌জিন্ আসিয়া জ্যাভার্টের ঐ অবস্থা দেখিয়া বলিল, "আমি নিজে গুলি করিয়া উহার মাথার খুলিখানা উড়াইয়া দিব। তোমরা উহাকে আমার জিম্মায় দিয়া দাও।" জিন্ ভল্‌জিন্ ম্যারিয়াসের হিতাকাঙ্ক্ষী ছিল বলিয়া বিদ্রোহীদলের লোকেরা তাহাকে খুবই শ্রদ্ধা-ভক্তি করিত। কাজেই উহারা বিনা আপত্তিতে জ্যাভার্টকে জিন্ ভল্‌জিনের হাতে সমর্পণ করিল।

জিন্ ভল্‌জিন্ তাহার ডানহাতে একটা পিস্তল ধরিয়া বন্দী জ্যাভার্টকে একটু আড়ালে নির্জ্জন জায়গায় লইয়া গিয়া তাহার বাঁধন কাটিয়া দিয়া বলিল, "যান। আপনি মুক্ত! এর পরেও যদি আমাকে আপনার দরকার থাকে, তাহা হইলে এই ঠিকানায়



কসেট্ ও ম্যারিয়াস্

গিয়া আমার খোঁজ করিবেন, তাহা হইলেই আমার সন্ধান মিলিবে।" ইহা বলিয়া জিন্ ভল্‌জিন্ তাহার ঠিকানাটা জ্যাভার্টকে জানাইয়া দিল।

জিন্ ভল্‌জিনের ব্যবহারে অবাক্ হইয়া জ্যাভার্ট হতভম্বের মত ধীরে ধীরে সেখান হইতে চলিয়া গেলেন। তখন পিস্তলের একটা ফাঁকা আওয়াজ করিয়া জিন্ ভল্‌জিন্ বিদ্রোহীদের কাছে ফিরিয়া গেল।

অল্প কয়েকদিনের মধ্যেই রাজসৈন্যদের আক্রমণে বিদ্রোহীরা নানা স্থানে পরাজিত হইতে লাগিল। ম্যারিয়াস্ এই যুদ্ধে সাংঘাতিকরূপে আহত হইয়া

পড়িল। জিন্ ভলজিন্ ম্যারিয়াসের সঙ্গে ছিল। সে একটুও বিলম্ব না করিয়া ম্যারিয়াসকে কাঁধে তুলিয়া পলাইবার জন্য প্রস্তুত হইল। কিন্তু পলাইবে কোন্ দিক্ দিয়া। চারিদিক দিয়া রাজ-সৈন্যেরা সবেগে তাড়া করিয়া আসিতেছিল এবং যে সব বিদ্রোহীরা দৌড়াইয়া পলাইতেছিল, তাহাদিগকে গুলি করিয়া কুকুর বিড়াল মারার মত মারিয়া ফেলিতেছিল। ঐ অবস্থায় ম্যারিয়াসকে লইয়া পলাইবার কোনও উপায় না দেখিয়া জিন্ ভলজিন্ মাটির নীচের একটা নর্দ্দমার মধ্য দিয়া পলাইল। কিন্তু 'যেখানে বাঘের ভয় সেইখানেই সন্ধ্যা হয়।' যেই জিন্ ভলজিন্ একটা নিরাপদ জায়গায় গিয়া নর্দ্দমা হইতে বাহির হইল, অমনি চোখোচোখি দেখা হইয়া গেল জ্যাভার্টের সঙ্গে। উভয়ের হঠাৎ এইরকম দেখা হইয়া যাওয়াতে দুই জনেই খুব হতভম্ব হইয়া গেলেন। দু'জনেই কিছুক্ষণ নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন, তাহার পর জিন্ ভলজিন্ সেই নিস্তব্ধতা ভাঙ্গিয়া বলিয়া উঠিল, "ইন্‌স্পেক্টর জ্যাভার্ট। এই লোকটিকে অতি কষ্টে অনেক দূর বহিয়া আনিয়া আমি ক্লান্ত হইয়াছি। ইহাকে আর একটু বহিয়া বাড়ী পৌঁছাইয়া দিয়া আপনি যদি আমাকে একটু সাহায্য করেন, তাহা হইলে আমি আপনার উপর চিরকৃতজ্ঞ থাকিব। তাহার পর ইচ্ছা হইলে আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করিতে পারেন।"

জ্যাভার্টের জন্য নিকটেই একটা গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল। তিনি কোনও কথা না বলিয়া সেই গাড়ী করিয়া ক্লান্ত জিন্ ভলজিন্‌কে এবং আহত ও অচৈতন্য ম্যারিয়াসকে বাড়ী পৌঁছাইয়া দিলেন। ম্যারিয়াসকে তাহার বাড়ীতে পৌঁছাইয়া দিয়া বাহিরে আসিয়া জিন্ ভলজিন্ জ্যাভার্টকে বলিল, "ইন্‌স্পেক্টর জ্যাভার্ট। আমি জানি আপনি আমাকে গ্রেপ্তার করিবার জন্য বহুদিন ধরিয়া চেষ্টা করিতে-ছেন। আজ আমি স্বেচ্ছায় ধরা দিব। তবে আপনার সঙ্গে যাইবার পূর্ব্বে আমি কি অল্পক্ষণের জন্য একবার আমার নিজের বাড়ীতে যাইতে পারি?" জ্যাভার্ট ইহাতে রাজী হইলেন এবং তাঁহারই গাড়ী করিয়া জিন্ ভলজিন্‌কে লইয়া উহার বাড়ীতে উহাকে পৌঁছাইয়া দিলেন। কিন্তু জিন্ ভলজিন্ উপরে যাইতে না যাইতে জ্যাভার্ট সেখান হইতে অদৃশ্য হইয়া গেলেন।

জ্যাভার্ট যে জিন্ ভলজিন্‌কে গ্রেপ্তার না করিয়া সরিয়া পড়িয়াছিল, তাহার একটু কারণও ছিল। জ্যাভার্ট বুঝিয়াছিলেন যে, শুধু কর্ত্তব্য পালনই মানুষের সব চেয়ে বড় কথা নয়। জিন্ ভলজিন্ অবশ্য দাগী আসামী। কিন্তু যে জিন্ ভলজিন্ একদিন জ্যাভার্টকে তাঁহার পরম শত্রুর হাত হইতে রক্ষা করিয়াছিল, তাহার সেই ঋণ তিনি কি জিন্ ভলজিন্‌কে ধরিয়া লইয়া গিয়া শাস্তি দিয়া শোধ দিবেন? অথচ তিনি যতক্ষণ সরকারের কাছ হইতে তাঁহার কর্ত্তব্য করিবার জন্য মাহিনা লইতেছে, ততক্ষণ জানিয়া শুনিয়াই বা জিন্ ভলজিন্‌কে ছাড়িয়া দিবেন কি করিয়া?

জ্যাভার্টের মনের মধ্যে ভীষণ ঝড় বহিতে লাগিল। তিনি মহা দ্বিধার মধ্যে পড়িয়া গেলেন—কেবলই তাঁহার মনের মধ্যে এই চিন্তা আলোড়িত হইতে লাগিল যে, মানুষের কর্ত্তব্য পালনটাই বড়,



কসেট্ ও জিন্ ভলজিন্

না একজনের উপকারের প্রতিদানটাই বড়? অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়াও জ্যাভার্ট এই সমস্যার সমাধান করিতে না পারিয়া একদিন সে সীন্ নদীর জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া আত্মহত্যা করিলেন।

কসেটের বিবাহ ও জিন্ ভল্‌জিনের মৃত্যু

ওদিকে ম্যারিয়াস্ সুস্থ হইয়া উঠিয়া কসেট্‌কে বিবাহ করিল। তখন হইতে জিন্ ভল্‌জিন্ একা একা তাহার দিনগুলি কাটাইতে লাগিল। জিন্ ভল্‌জিন্ তাহার জীবনের সকল কাহিনী কসেট্ ও ম্যারিয়াস্‌কে খুলিয়া বলিয়াছিল। সে যে জেল-ফেরৎ আসামী—একথাও সে গোপন রাখে নাই। এই কথা জানিয়া কসেট্ ও ম্যারিয়াস্ জিন্ ভল্‌জিনের বাড়ীতে বড় একটা যাইত না। তবে যেদিন ম্যারিয়াস্ জানিতে পারিল যে, বিপ্লবের সময়ে জিন্ ভল্‌জিনের জন্যই সে তাহার জীবন ফিরিয়া পাইয়াছিল, সেইদিন সে বুঝিতে পারিল যে, জিন্ ভল্‌জিনের সঙ্গে সংস্রব ত্যাগ করাতে তাহার কতখানি অন্যায় হইয়াছে। ইহা বুঝিয়া সে সেই দিনই জিন্ ভল্‌জিনের কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করিতে গেল। কিন্তু জিন্ ভল্‌জিন্ তখন মৃত্যু-শয্যায়। কসেট্ ও ম্যারিয়াস্‌কে দেখিতে পাইয়া তাহার মৃত্যু-মলিন মুখেও আনন্দের ক্ষীণ জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠিল। জিন্ ভল্‌জিন্ তাহাদের দুইজনকে তাহার শয্যাপার্শ্বে আসিবার জন্য অতি ক্ষীণস্বরে আহ্বান করিল। তাহারা কাছে আসিলে জিন্ ভল্‌জিন্ বলিল—"আমার সময় ফুরাইয়া আসিয়াছে। আমি তোমাদের দু'জনকেই খুব ভালবাসিতাম। কেমন কসেট্, আমি কি তোমাকে ভালবাসিতাম না? আমি জানি কসেট্, এই বুড়ো মরিয়া গেলে তোমার দু' ফোটা চোখের জল নিশ্চয়ই পড়িবে, তবে আমার জন্য বেশী কিছু দুঃখ করিও না। তোমরা বেশ আনন্দে দিন যাপন করিও।" জিন্ ভল্‌জিনের কথা শুনিয়া ম্যারিয়াস্ ও কসেট্ কেহই অশ্রু-সংবরণ করিতে পারিল না। জিন্ ভল্‌জিন্ আবার বলিতে লাগিল—"তোমরা কাঁদিও না। কসেট্ মনে পড়ে কতটুকু তুমি ছিলে, যখন তোমাকে আমি পাইয়াছিলাম। সেই পুতুলটির কথা এই মুহূর্তেও আমার মনে পড়িতেছে, তুমি যাহার নাম দিয়াছিলে, 'ক্যাথেরিন্'! তোমার ছেলেবেলাকার মিষ্টি মধুর কথা শুনিয়া আমি একদিন কত আনন্দ অনুভব করিয়াছি, সব দুঃখ বেদনা ভুলিয়া যাইয়া মন খুলিয়া হাসিয়াছি। মনে পড়ে বৃষ্টির জলে তুমি শুক্‌নো খড়গুলি নালার জলে ভাসাইয়া দিতে! যখন তুমি অতি ছোট ছিলে, তখন তুমি কি আমোদীই না ছিলে! কেবল হাসি, খেলা, আনন্দ ও গল্পের মধ্য দিয়াই দিন কাটাইতে! আজ আমার সব কথা মনে পড়িতেছে, কসেট্! কিন্তু আজ আমার কথা বলা শেষ হইয়া যাইবে! তার মনে পড়ে, সেই বনের কথা, যে বনের তরু-শ্রেণীর ছায়ায় ছায়ায় আমরা বেড়াইয়াছি; সেই বাগানের কথা মনে পড়ে, যে বাগানের মধ্যে আমরা লুকাইয়াছিলাম, সেই সব কথা আজ আমার মনে পড়িতেছে।—সময় সময় আমাকে স্মরণ করো। মনে রাখিয়ো ভালবাসার চেয়ে বড় জিনিস পৃথিবীতে নাই। ঈশ্বর উপরে আছেন, তিনি সব দেখেন, সব শোনেন। আমি—চলিলাম। সময় সময় এই স্নেহশীল বৃদ্ধের কথা মনে করিতে ভুলিও না।—দেখ, আমি আর চোখে ভাল করিয়া দেখিতেছি না। আমার—আমার যে আরও অনেক কিছু কথা বলিবার ছিল! ঈশ্বর তোমাদের আশীর্ব্বাদ করুন, সুখী করুন। এস, তোমরা আমার আরও কাছে এস! আমাকে সুখে মরিতে দাও। তোমাদের মাথায় হাত দিয়া শেষ আশীর্ব্বাদ করি।

কসেট্ ও ম্যারিয়াস্ দুইজনে জিন্ ভল্‌জিনের শয্যার পাশে নতজানু হইয়া উপবেশন করিল। সে তাহার সেই অন্তিম শয্যায় শুইয়া খুব আদরের সঙ্গে তাহাদের আশীর্ব্বাদ করিয়া চিরদিনের মত চোখ বুজিল।

যে জিন্ ভল্‌জিন্, সংসারে কখনও সুখের মুখ দেখে নাই, যে শুধু বিপদের পর বিপদ্ সহিয়াই দিন কাটাইয়াছে, তাহার কাছে কসেটের স্নেহপূর্ণ মুখখানি তাহাকে আনন্দ ও তৃপ্তি দিয়াছিল। আজ সেই প্রিয়জনের কাছে, তাহাদের মাথায় হাত দিয়া সে মৃত্যুর স্নেহ-শীতল কোলে ঢলিয়া পড়িল।



দেশ বিদেশের কথা

ব্রহ্মদেশ

২০৯০ পৃষ্ঠার পর

ম্যাণ্ডেলের বা মান্দালয়ের রাজ-প্রাসাদটি রাজা থিব মিন্দন তৈয়ারী করিয়াছিলেন। দুর্গের চারিদিক্ বেড়িয়া একটি গভীর খাল বা পরিখা আছে পরিখাটি জলে ভরা। খাল পার হইবার জন্য প্রত্যেক দিকে দুইটি করিয়া পুল ছিল, এখন একটি করিয়া আছে, অপরটি ভাঙ্গিয়া ফেলা হইয়াছে। খালের পরে কতকটা পতিত জমি, ইহার পরেই কেল্লার মত ইটের প্রাচীর। তাহার উপরে তোপ রাখিবার জন্য গর্ত্ত আছে। প্রাচীরের প্রত্যেক দিকেই প্রবেশ-দ্বার আছে। তাহাদের নাম উত্তর-তোরণ, দক্ষিণ-তোরণ, পূর্ব্ব-তোরণ ও পশ্চিম-তোরণ। এই তোরণ-দ্বারগুলি বেশ বড় বড়। উহাদের উপরে ফায়ার মত কাঠের ছাদ। প্রত্যেক দরজায়ই প্রহরীদের থাকিবার ও তোপ দাগিবার বন্দোবস্ত আছে। এই যে সম-চতুষ্কোণ স্থান তাহার মধ্যস্থলে রাজা থিবর কাষ্ঠ-নির্ম্মিত রাজভবন। রাজপ্রাসাদের নাম বিশ্বকেন্দ্র (centre of the universe), রাজার বাড়ীর চারিদিক বেড়িয়াও একটি জলপূর্ণ ক্ষুদ্র খাল আছে। ঐ খালের চারিদিক প্রাচীর দিয়া ঘেরা। পূর্ব্বে এই রাজবাড়ী চৌকা প্রাচীর আর সেগুন কাঠের খুঁটির বেড়া দিয়া ঘেরা ছিল। বাকী স্থানটির মধ্যে সরল রাস্তা গিয়াছে। রাজবাড়ীটি দূর হইতে ঠিক ফায়ার মত দেখায়। ইহা কিন্তু কাষ্ঠ-নির্ম্মিত। দুই শত ফুট লম্বা গোল গোল কাঠের খুঁটির মাথায় প্রাসাদের ছাদ, দেয়ালের গায়ে আর প্রাসাদের কার্ণিশের চূড়াতে কাঠের সূক্ষ্ম কারুকার্য্য সোনায় খচিত বলিয়া অতি সুন্দর দেখায়। রাজপ্রাসাদটি অনেকগুলি কক্ষে বিভক্ত—রাজা-রাণী ও তাঁহাদের দাস-দাসীদের থাকিবার ঘর, দরবার ঘর, খেলার ঘর ও পড়িবার ঘর, বেড়াইবার ও নাচিবার ঘর—এগুলি সব দেখিবার মত বটে। কক্ষগুলির চৌকাঠ খুব উঁচু উঁচু। ঘরগুলিতে এখন আর কোন লোকজন থাকে না। কাঠের উপরে অধিকাংশ স্থলই সোনার পাতায় মোড়া। রাজসিংহাসনটিকে ময়ূর-সিংহাসন বলিলে অত্যুক্তি হয় না। কারণ চারিদিকে সোনার ময়ূর তাহাকে ধারণ করিয়া আছে। সিংহাসনটি কম হইলেও পাঁচ ফিট উঁচু হইবে। চারিদিকে কাচ ও স্বর্ণ মণ্ডিত এবং অনেক যায়গা এখন খালি পড়িয়া আছে। সম্ভবতঃ এক সময়ে ঐ সব শূন্য স্থান হীরা-মণি-মুক্তা জহরতে পূর্ণ ছিল। রাজা থিবার সিংহাসন এখন কলিকাতার যাদুঘরে আছে। তোমরা ইচ্ছা করিলে সেইটি

দেখিয়া আসিতে পার। এখন সিংহাসন বসাবার ইটে গাঁথা বেদীটি দরবার ঘরে শূন্য পড়িয়া আছে।



রাজবাড়ীর উত্তর দিকের প্রাচীর ও পরিখা

ঐ বেদীর পিছনের দরজা দিয়া রাজা ও রাণী দরবার গৃহে আসিয়া সিংহাসনে বসিতেন। এই রাজবাড়ীর শোভা সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। বাড়ী ও বাগান, অন্দরমহল—সবই আছে, কিন্তু সে গৌরব তো আর নাই। রাজবাড়ীটি কাঠের বলিয়া ইহার প্রত্যেক স্থানে আগুন নিভাইবার ব্যবস্থা রহিয়াছে। এইখানেই রাজা থিব এবং তাঁহার রাণী সুপায়লাট ইংরাজের হাতে বন্দী হইয়াছিলেন।



রাণীর বাড়ী ও বাগান

মান্দালয় পূর্ব্বে ব্রহ্ম দেশের রাজধানী ছিল। ১৮৫৫ খৃষ্টাব্দে এই সহরের পতন হয়, সে সময়ে ইহা ছিল বর্দ্ধিষ্ণু পল্লীর মত। ক্রমে ইহা সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠে। বর্ত্তমান সময়ে মান্দালয় ব্রহ্মদেশের একটি প্রধান বাণিজ্য-কেন্দ্র। শ্যাম রাজ্য হইতে এখানে নানাপ্রকার পণ্যদ্রব্য আসে এবং ভারতবর্ষ ও ইউরোপ হইতে আমদানী জিনিসপত্র এখান হইতেই চারিদিকে কেনা-বেচা হয়। এখানকার রূপার কাজ, কাঠের খোদাই কাজ এবং তাঁতের তৈয়ারী পশমী ও রেশমী কাপড় প্রসিদ্ধ। এ স্থানে ভারত, চীন এবং অন্যান্য দেশের অনেক লোকের বাস। এখানে সৈন্যাবাস না থাকিলেও ব্রহ্মদেশের প্রধান সৈন্যাবাস বা Military Station মেমিয়োতে অবস্থিত।

মান্দালয়ের রাজা মিন্দন-মিনের একটী বৃহদাকার কামান দেখিবার মত বটে। নদীর অপর তীরে মান্দালয় হইতে পাঁচ ছয় মাইল দূরে ধ্বংসপ্রাপ্ত মিঙ্গুন প্যাগোডার একটি প্রকাণ্ড ঘণ্টা আছে। মস্কো সহরের বৃহৎ ঘণ্টাটির পরেই এই ঘণ্টার নাম করা যায়। পৃথিবীর মধ্যে ইহা দ্বিতীয় স্থানীয়। জাপানের কিয়োটার কিয়োনিন (Chionin) মন্দিরের ঘণ্টাটির ওজন হইবে ৭৪

টন। পিকিনের ঘণ্টার ওজন ৫৪ টন। তবে বেড়ের দিক দিয়া পিকিনের ঘণ্টাটি বড়। মিঙ্গুনের ঘণ্টার বাহিরের ব্যাস ১৬ ফিট ৩ ইঞ্চি। ভিতরের ফুকরের ব্যাস ১০ ফুট, ভিতরের ফুকরের খাড়াই ১১ ফুট ৬ ইঞ্চি, বাহিরের খাড়াই ১২ ফুট। ঘণ্টার ওজন ৮০ টন বা ২,১৬০ মণ।

মান্দালয় সহরটি আয়তনে রেঙ্গুণের চেয়েও বড়। ডাফরিন-কেল্লা হইতে আরম্ভ করিয়া পশ্চিম দিকে নদীর ধার পর্য্যন্ত এবং দক্ষিণে শাজু ষ্টেসন পর্য্যন্ত সহরটি বিস্তৃত। মান্দালয়ের রেল ষ্টেসন হইতে আধ মাইল দূরে ডাফরিন-কেল্লা। এই কেল্লার চারিদিকে গড়খাই কাটা। এই খালের জলে প্রচুর জলজ উদ্ভিদ আছে। এই খালে মান্দালয়ের উত্তর দিকে যে যতন নদী আছে, সে



মিঙ্গুন-মন্দির ও ঘণ্টা

নদী হইতে জল আসে। শাজু ষ্টেসনটি ম্যাণ্ডেলে বা মান্দালয় সহরের দক্ষিণ দিকে অবস্থিত।

সেখানকার আরাকান প্যাগোডা প্রসিদ্ধ। এই মন্দিরে বুদ্ধের একটি প্রকাণ্ড মূর্ত্তি আছে।



রাজা মিন্দনমিনের একটি কামান

১৮৭৪ খৃষ্টাব্দে রাজা বোদওপায়া এই বিরাট্ মূর্ত্তিটি আরাকান দেশ হইতে স্থলপথে আনাইয়াছিলেন। এজন্য মন্দিরটির নাম হইয়াছে 'আরাকান প্যাগোডা'।

মান্দালয় সহরে অনেক প্যাগোডা ও সমাধিমন্দির আছে। সে সকলের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য হইতেছে— আ - তু - মা-শি-পায়া প্যাগোডা ও কোঙ্গ-মু-প-পায়া প্রসিদ্ধ। কোঙ্গ-মু-প-পায়া (৪৫০টি মন্দির)

মান্দালয়ের সরকারী আফিসের বাড়ী ও বড় বড় দোকানের বাড়ীগুলি বড়ই সুন্দর। তাহা ছাড়া এখানকার সকল বাড়ীই কাঠের, সেগুলি কারুকার্য্য-খচিত। বাড়ীগুলি এখানে একটি, ওখানে একটি এই ভাবে ছড়ানো। এ সহরের চারিদিকে তেঁতুল গাছের ঝোপ, দেখিতে

বেশ লাগে। এখানে সহরের ভাব অপেক্ষা পল্লীগ্রামের ভাবই মনে আসে।

ইরাবতী নদীর ওপারে সবুজ ঘাসে ঢাকা পাহাড়ের সারি দেখিতে বড় সুন্দর। আর নদীর



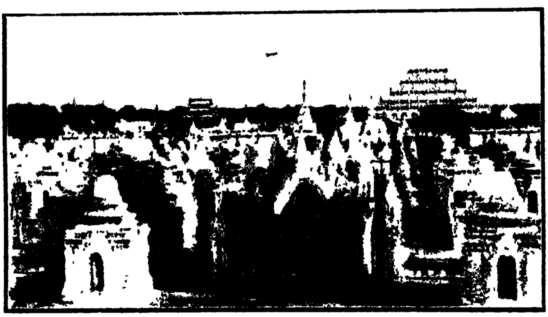
আ-তু-মা-শি-পায়া প্যাগোডা

বুকে ধান বোঝাই নৌকা, ডোঙ্গা নৌকার সারি দেখিলে এখানকার বাণিজ্য-সমৃদ্ধি বুঝিতে পারা যায়। মান্দালয় সহরে ইলেকট্রিক ট্রাম আছে। ট্রাম ছাড়া এখানে নানাবিধ গাড়ীও পাওয়া যায়। সহরটি ছড়ানো বলিয়া রাস্তায় গাড়ী, ঘোড়া ও লোকজনের তেমন ভীড় নাই। রাস্তাগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। সহরের যেখানে যাইবে, সেখান হইতেই প্যাগোডা ও কিয়ং মন্দিরের চূড়া দেখিতে পাইবে।

মান্দালয় সহরের প্রতিষ্ঠাতা রাজা মিন্দন মিনের সমাধি-মন্দিরটি দেখিতে অতি সুন্দর। এখানকার যাদুঘরে প্রাচীনকালের রাজা, রাণী, সেনাপতি, পরিষদ প্রভৃতির মূর্ত্তি যাহার যেমন পোষাক-পরিচ্ছদ ছিল, ঠিক্ সেই পরিচ্ছদে সুশোভিত করিয়া সাজাইয়া রাখা হইয়াছে।

মান্দালয় সহরের মাঝখানে এখানকার সদর বাজার। এখানকার বাজারে ব্রহ্মদেশের সুন্দর কারুকার্য্য করা কাঠের বাক্স-কৌটা, বেতের চেয়ার-কৌচ, রেশমের আর সোলার ফুল, গালা করা জিনিস প্রচুর পরিমাণে বিক্রয় হয়। এই সমস্ত দোকানে বর্ম্মণ মেয়েরা জিনিস বিক্রয় করে। এ সহরের লোক সংখ্যা ১,৪৪,০০০। মান্দালয় ইরাবতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত।

বাঙ্গালা দেশে যেমন দার্জ্জিলিং ব্রহ্মদেশের তেমনি মেমিও (Maymyo)। মান্দালয় হইতে মেমিওর দূরত্ব ৪৩ মাইল মাত্র। মেমিও ৩,৫০০ ফিট পাহাড়ের উপর অবস্থিত। এখানকার জল-বায়ু বেশ ভাল। গ্রীষ্মকালে ব্রহ্মদেশের শাসনকর্ত্তা এখানে থাকেন। মেমিওর সঙ্গে দার্জ্জিলিংএর তুলনা হয় না, কেন না দার্জ্জিলিংএর উচ্চতা ছয় হাজার ফুট আর মেমিওর উচ্চতা মাত্র সাড়ে



মান্দালয়ের ৪৫০টি প্যাগোডা

তিন হাজার ফুট। দার্জ্জিলিং কয়েকটি পর্ব্বতের চূড়ায় নির্ম্মিত, কাজেই দার্জ্জিলিংএর বাড়ীগুলি সিঁড়ির মত স্তরে স্তরে সজ্জিত। একটির উপরে

একটি এবং একটির নীচে আর একটি। কিন্তু মেমিও সহরটি পর্ব্বতের একটি অধিত্যকার উপর নির্ম্মিত বলিয়া মনে হয় না যে, সহরটি পাহাড়ের উপর অবস্থিত। চারিদিকে উচ্চ পর্ব্বত, মাঝখানে মাঠের মত বিস্তৃত সমতল ভূমি। তবে কোথাও যে অল্প ঢালু বা চড়াই উতরাই নাই, তাহা নহে। তাহা হইলেই বা কি, সব রাস্তা গুলিই সরল ও সমতল।

মান্দালয় হইতে লাসিও (Lashio) পর্য্যন্ত রেলপথ গিয়াছে। লাসিও উত্তর শানরাজ্যের রাজধানী। মান্দালয় হইতে রেলগাড়ী কতদূর পর্য্যন্ত সমতল ভূমির উপর দিয়া চলে। তারপর ক্রমশঃ আঁকিয়া বাঁকিয়া পাহাড়ে উঠে। তোমাদের মধ্যে যাহারা দার্জ্জিলিং, সিমলা পাহাড় প্রভৃতি স্থানে রেলে চড়িয়া গিয়াছ, তাহারা এই পথের কথা ও ইহার শোভা ও সৌন্দর্য্য বেশ বুঝিতে পারিবে। মেমিও পাহাড়ে উঠিবার রেলগাড়ী দার্জ্জিলিংয়ের মত ছোট নয়। যে রেলগাড়ী রেঙ্গুন হইতে মান্দালয় পর্য্যন্ত আসে, সেই



ডোঙ্গা নৌকা



মেমিওর সাধারণ দৃশ্য

গাড়ীই পাহাড়ের উপর দিয়া মেমিও, গোটেক ও লাসিও পর্য্যন্ত ১৫০ শত মাইল চলিয়া গিয়াছে। মেমিও হইতে গোটেক যাইতে হয়। গোটেক ষ্টেশনে নামিবার সময় পাহাড়ের উপর হইতে 'গোটেক ভায়াডাক্ট' (লোহার পুল) দেখা যায়। ইহা দেখিবার মত বটে। দুই দিকে দুইটি পাহাড় মাথা তুলিয়া দাঁড়াইয়া আছে, আর তাহার মধ্যে নিম্নভূমিতে একটি ছোট পাহাড়িয়া নদী অতি বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে। চলিতে চলিতে নদীটি পর্ব্বতের এক গুহার মধ্যে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গুহাটি ঠিক রেলগাড়ী যাইবার জন্য পাহাড়ে যেরূপ সুড়ঙ্গ কাটিয়া পথ তৈয়ারী করা হয়, ঠিক সেইরূপ। এই স্থানে এক পাহাড় হইতে অন্য পাহাড়ে যাইবার জন্ম লোহার পুল তৈয়ার করা হইয়াছে। সেই পুলেরই নাম 'গোটেক

F. 8—28

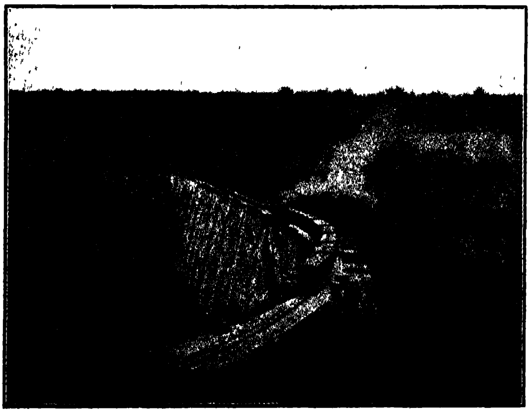
ভায়াডাক্ট'। এই সেতুটির দৈর্ঘ্য ২,১৩৫ ফিট, উচ্চে ৩২০ ফিট। ইহা নির্ম্মাণ করিতে ১৬,৯৮,২০০ টাকা লাগিয়াছে। এই সেতুটির ওজন ৪,২৪১ টন। ইহার নির্ম্মাণ-কার্য্য ১৯০০ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে আরম্ভ হয় ও ১৯০২ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে শেষ হয়। ১৯০২ খৃষ্টাব্দ হইতে এই পুলের উপর দিয়া রেলগাড়ী চলাচল করিতেছে। এই পুলের পশ্চিম দিক্ হইতে একটি রাস্তা আঁকিয়া বাঁকিয়া একেবারে গোটেক গুহার প্রবেশ-দ্বার পর্য্যন্ত গিয়াছে। যে গুহার কথা বলিলাম, সেই গুহার মধ্যে প্রস্তর-মূর্ত্তি গড়িয়া উঠিয়াছে। ঐসব মূর্ত্তি দেখিবার জন্য অনেকে এখানে আসেন। এখানে থাকিবারও সুবিধা আছে। ডাকবাংলো থাকায় রাত্রিতে থাকিবারও সুবিধা রহিয়াছে।



মেমিওর পথের একটি জল-প্রপাত

এই গুহাটি স্বাভাবিক। উত্তর শানরাজ্যের রেলপথ (Northern Shan State Railway) খুলিবার পূর্ব্বে ইহার কথা কেহ জানিত না। এসিয়ার কোথাও এমন আশ্চর্য্য ও সুন্দর গুহা আর নাই। নানা দেশের ভ্রমণকারীরা এই গুহাটি দেখিতে আসেন।

মান্দালয় হইতে ছয় মাইল দূরে **অমরপুর** (Amarpura) অবস্থিত। পূর্ব্বে এই স্থান ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। ঐ স্থানে ১৭৮৩ খৃষ্টাব্দে রাজধানীর প্রতিষ্ঠা হয় এবং ১৮৫৭ খৃষ্টাব্দে উহা পরিত্যক্ত হয়। প্রাচীন বাড়ী-ঘরের অতি সামান্য ধ্বংসাবশেষই এখন সেখানে আছে। এখানকার লোক সংখ্যা দিন দিনই হ্রাস পাইতেছে। অমরপুর হইতে **ছেগাইঙ্গ** (Sagaing) আসিতে হয়। ছেগাইঙ্গ মান্দালয় হইতে দশ মাইল দূরে অবস্থিত। মান্দালয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ স্থান। এক সময়ে এই সহরটি শানদের অধিকৃত একটি বৃহৎ রাজ্যের রাজধানী ছিল। ছেগাইঙ্গ শব্দের অর্থ বৃক্ষ-শাখা। সিট্ (Sit) একজাতীয় গাছ এবং (Kaing শাখা। পালি নাম জিয়া-ওরা (Zeyahwra)।



'গোটেক ভায়াডাক্ট' বা খিলান-সেতু

ছোটদের মেলা



ক্ষুদে চোর

সর্বস্ব লইলি হরি' যাহা কিছু ছিল মোর,
কোথা হতে এলি তুই ওরে ওরে ওরে চোর ?
কোলের উপরে বসে, হৃদয় লইলি চুরে,
বুকেতে কাটিয়া সিঁদ এমনি সাহস তোর !
নয়নের নিদ্রা নিলি উদরের ক্ষুধা,
তৃষার পানীয় নিলি, নিলি স্নেহ সুধা ,
ভূত ভবিষ্যৎ নিলি, নিলি বর্তমান,
হরিলি সমগ্র ধরা জগতের প্রাণ !
আপনা হারায়ে শেষে হলি ভাবে ভোর,
কোথা হতে এলি তুই ওরে ক্ষুদে চোর ?
নেই ভয় নেই শ্রান্তি অম্লান কুসুম কান্তি,
গুড়ি গুড়ি হামাগুড়ি এ ঘর ও ঘর,
বঙ্কিম অধর পুটে দুধে দাঁত দুটি ফুটে,
পলকে পলকে ছোটে হাসির লহর ,
এই কান্না এই হাসি, রোদ বৃষ্টি পাশাপাশি,
গলায় তুলিয়া দিয়া কচি বাহু ডোর,
সর্বস্ব লইলি হরি ক্ষুদে দুধে চোর ।

– গিরীন্দ্রমোহিনী

বেজায় খুসি

বাহবা বাবুলাল ! গেলে যে হেসে !
বগলে কাতুকুতু কে দিল এসে ?
এদিকে মিটি মিটি দেখ কি চেয়ে ?
হাসি যে ফেটে পড়ে দু'গাল বেয়ে !
হাসি সে যে বাছা ঠোঁট দন্ত মেলে
চোখের কোণে কোণে বিজলী খেলে ।
হাসির বসে গ'লে ঝরে যে লালা
কেন এ খি-খি-খি-খি-হাসির পালা ?
যে দেখে সেই হাসে হা-হা হা-হা-হা
বাহবা বাবুলাল বাহবা বাহা !

—সুকুমার





শিকারী তরুলতা

১৯৯১ পৃষ্ঠার পর

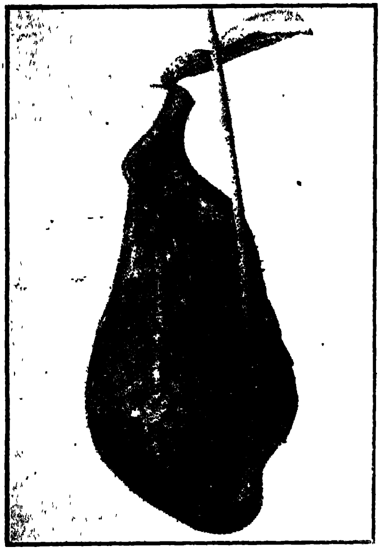
আমরা তো বরাবরই জানি যে, গরু, ছাগল ভেড়া হইতে আরম্ভ করিয়া জীব-জগতের অধিকাংশ অধিবাসীই গাছ গাছড়া হইতে তাহাদের খাদ্য সংগ্রহ করে। সুতরাং এই চির-প্রচলিত প্রথার পরিবর্তে যদি জানা যায় যে, এই নিরীহ গাছ-পালারাও আবার কীটপতঙ্গাদি ধরিয়া খাইতেছে, নানা রকম অদ্ভুত ফাঁদ পাতিয়া শিকার ধরিতেছে, তবে সে কথাটা সহসা বিশ্বাস করা শক্ত। কিন্তু অনুসন্ধান করিয়া দেখা গিয়াছে যে, এই রকম কীটপতঙ্গ-ভুক বৃক্ষলতাও পৃথিবীর নানা যায়গায় আছে। এখানে সেই রকম দুই একটি গাছের কথা তোমাদের বলিব।



ডার্লিংটোনিয়া

শিকারী গাছ নানা রকমের আছে। ইহাদের এক একটি এক এক রকম কায়দা করিয়া শিকার সংগ্রহ করে। আমেরিকার ক্যালিফোর্নিয়া (California) অঞ্চলে এক রকম শিকারী গাছ জন্মে, তাহাদের নাম Side-Saddle-Plant বা Darlingtonia— এই গাছগুলি সমুদ্রের নিকটবর্তী জলাভূমিতে জন্মে। এগুলি যেমন নিষ্ঠুর তেমনি চতুরও বটে। এই গাছের পাতা ও পত্রবৃন্ত দুইই লম্বা— দেখিতে গোলাকার থলির মত এবং প্রত্যেক পাতার মুখের উপরে একটা করিয়া ঢাক্‌নি থাকে। এই ঢাক্‌নিটি বন্ধ করিলে থলির মুখ বন্ধ হইয়া যায়। ভিতরে প্রবেশ করিলে আর বাহির হইতে পারে না। এই ঢাক্‌নি থাকার জন্য বৃষ্টির জল থলির আকারের পাতার মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে না। ঢাক্‌নিটির সামনের দিকে মাছের ল্যাজের মত এক অদ্ভুত রকমের জিনিস ঝুলিতে থাকে। এই অদ্ভুত রকম জিনিসটি এবং ঢাক্‌নি উভয়ের মধ্য দিয়া গাঢ় লাল রঙের কতকগুলি শিরা এমনভাবে চলিয়া গিয়াছে যে, দূর হইতে দেখিলে মনে হয় উজ্জ্বল লাল রঙের অতি সুন্দর কতকগুলি ফুল থোপায় থোপায় ফুটিয়া রহিয়াছে।

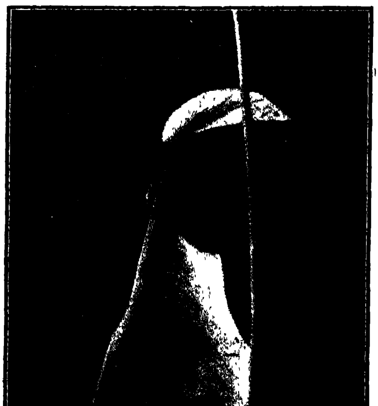
এই উজ্জ্বল বর্ণে আকৃষ্ট হইয়া দূর হইতে কীটপতঙ্গাদি মুগ্ধ হইয়া নিকটে ছুটিয়া আসে। কাছে আসিলে দেখিতে পায় যে, ঢাক্নির নীচে খোলা মুখের চারিদিকে মধু সঞ্চিত রহিয়াছে! কীটপতঙ্গাদি তখন



কলসী গাছ

মহা আনন্দে সেই মধু খাইতে থাকে। যত খায় ততই মিষ্টি এবং পোকাগুলি তখন লোভে পড়িয়া একেবারে ভিতরে নামিয়া আসে। অমনি দেখিতে দেখিতে উপরের ঢাক্নিটি পড়িয়া যায় ও মাছের ল্যাজের মত সেই অদ্ভুত জিনিসটা শিকারের বাহিরে আসিবার পথ রুদ্ধ করিয়া দেয়। হতভাগা শিকার তখন বাহির হইবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করিতে থাকে কিন্তু তাহার সব চেষ্টাই ব্যর্থ হয়। ঢাক্নিটি স্বচ্ছ হওয়ার দরুণ উহা দিয়া থলির ভিতর যে আলো প্রবেশ করে, সে মনে করে যে, উহাই বাহির হইবার পথ। কাজেই বেচারী শিকার যতই সেই জায়গা দিয়া বাহির হইবার জন্য চেষ্টা করে, ততই ঘুরিয়া আবার নীচে পড়িয়া যায়। এইরূপ অনবরত চেষ্টার ফলে সে ক্লান্ত হইয়া থলির তলায় সঞ্চিত জলের মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারায়। শিকারী গাছ তখন মহা আনন্দে মৃত পোকাটিকে খাইয়া ক্ষুধা নিবৃত্তি করে ও পরক্ষণেই আবার নূতন শিকার ধরিবার জন্য উহার ঢাক্নিটি খুলিয়া যায়।

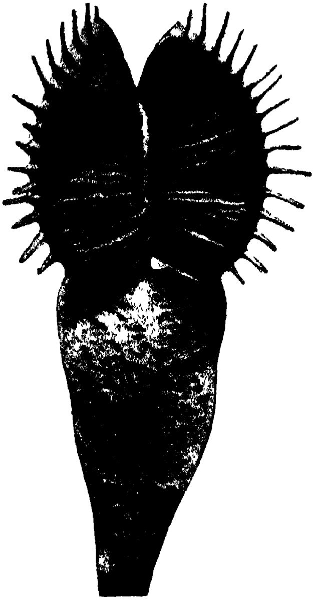
ডার্লিংটোনিয়া গাছ কেবলমাত্র পক্ষ-বিশিষ্ট পতঙ্গ যেমন মাছি ইত্যাদি ছোট ছোট প্রাণী শিকার করে। কিন্তু আর এক রকম শিকারী গাছ আছে, তাহারা পিপড়ে প্রভৃতি পক্ষবিহীন প্রাণীকেও ধরিয়া খাইতে কসুর করে না। এই গাছের ইংরাজী নাম Saracenia বা Trumpet Plant. এই গাছের ফাঁদ পাতিবার ভঙ্গীও অনেকটা ডার্লিংটোনিয়া গাছের ন্যায়, তবে ইহার থলিটির বাহিরের অংশেও মধু মাখানো থাকে। পিপড়ে প্রভৃতি কীটপতঙ্গ সেই মধু খাইবার লোভে থলি বাহিয়া যেমন একেবারে উপরে উঠিয়া আসে, অমনি পা পিছলাইয়া থলির ভিতর পড়িয়া যায়। তারপর আর কি? হতভাগা শিকার তখন শিকারী গাছের কবলে পড়িয়া দেখিতে দেখিতে প্রাণ হারায়।



কলসী গাছের ভিতরের দিক্

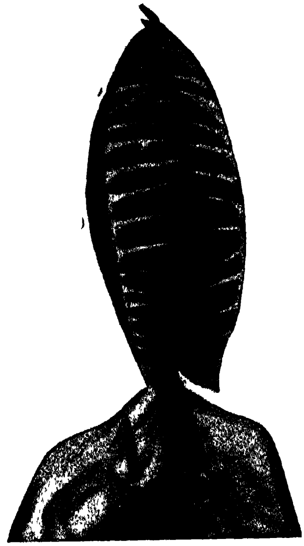
সিংহল ও পপুয়া দ্বীপ প্রভৃতি গ্রীষ্মমণ্ডলস্থিত দেশসমূহে এক রকম শিকারী গাছ দেখিতে পাওয়া

যায়, ইহাদের নাম 'কলসী গাছ'—Pitcher Plants বা Nepenthes. এইগুলি লতানে গাছ। নিকটবর্ত্তী গাছের ডাল, শিকড় বাহিয়া মাটি হইতে অনেকটা উঁচুতে ওঠে। এই গাছে দুইটি পত্ররন্ধ্রের মাঝখানে অদ্ভুত রকমের একটি সবুজ কলসী ঝুলিতে থাকে এবং ইহার জন্যই এই গাছকে কলসী গাছ বলা হয়। নানা রকমের 'কলসী গাছ' দেখিতে পাওয়া যায় এবং তাহাদের কলসীগুলির আকৃতিও নানা রকমের হয়। কতকগুলি ক্ষুদ্র আকারের অর্থাৎ দুই এক ইঞ্চির বেশী আকারে বড় হয় না। আবার কতকগুলি এত বৃহদাকারের হয় যে, পায়রা প্রভৃতি পাখীও তাহার মধ্যে পড়িয়া প্রাণ হারাইতে পারে। এই কলসীগুলি শিশির বা বৃষ্টি সঞ্চিত জলে পূর্ণ থাকে। প্রত্যেক কলসীর চারিধারে মধু মাখানো থাকে



ভেনাস গাছ—ফাঁদ পাতিয়া আছে

এবং এই মধুর লোভেই কীট-পতঙ্গ হইতে আরম্ভ করিয়া ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জন্তু, পাখী ইত্যাদিও আসিয়া ইহার ফাঁদে পড়ে। কলসীটির ভিতর দিকে মোমের মত এক রকম কি মাখানো থাকে এবং মধুপানরত শিকার তাহাতে সহজেই পিছলাইয়া কলসীর ভিতরে পড়িয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে কলসীর তলার দিক হইতে তীক্ষ্ণ দাঁতের সারি বাহির হইয়া শিকারকে মারিয়া ফেলে। তারপর মৃত শিকারের মাংস দিয়া গাছটি তাহার জলযোগ সমাপ্ত করে ও যে অংশগুলি গিলিতে পারে না, সেগুলি তলায় পড়িয়া থাকে। ছবিতে তাহা স্পষ্টই দেখিতে পাইবে।



ভেনাস গাছের দাঁত ও খোলা ফাঁদ

আর এক রকম শিকারী গাছ আছে তাহাদের ফাঁদ পাতিবার ভঙ্গী একটু নূতন ধরণের। এই গাছটির নাম Venus's Fly trap বা Dionaea. এই জাতীয় গাছ কেবলমাত্র পূর্ব্ব আমেরিকার জলাভূমির আর্দ্র মৃত্তিকায় জন্মে। অনেকে মনে করেন যে, শিকারী গাছগুলির মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা চতুরতার সহিত শিকার ধরে। এই গাছের প্রত্যেকটি পাতা দুই ভাগে বিভক্ত, ঠিক যেন

একটি খোলা বইয়ের মত। পাতার ভিতরের দিকটি যেমন সুন্দর, উজ্জ্বল সবুজ, আবার ঠিক তেমনি অসংখ্য সূক্ষ্ম লোমে আবৃত। যখনই কোন কিছুর সহিত এই লোমের স্পর্শ ঘটে, অমনি দেখিতে দেখিতে পাতা দুইটি এক হইয়া বন্ধ হইয়া যায় ও পাতার ধারে ধারে অবস্থিত দুই সারি তীক্ষ্ণ দাঁত একসঙ্গে হইয়া একটি খাঁচা তৈয়ারী করিয়া শিকারের বাহির হইবার আর কোনও উপায় রাখে না। এরপর ধীরে ধীরে পাতা হইতে এক রকম বিষাক্ত রস বাহির হইয়া তাহাকে মারিয়া ফেলে। এই ভাবে ৮।১০ দিন ধরিয়া খাঁচাটি বন্ধ থাকে ও সেই সময়ের মধ্যে শিকারী চাপিয়া গিয়া শিকারকে আটকাইয়া ধরে ও শেষে পরমানন্দে কয়েক দিন ধরিয়া ভোজন করে। অনেক সময় আবার দুই বা ততোধিক পাতা এক সঙ্গে হইয়া প্রজাপতি বা ফড়িং ধরিয়া খাইতেও বাধা করে না। আশ্চর্যের বিষয় এই যে, যদি কোন ধূলিকণা বা অন্য কোন সেই জাতীয় পদার্থ ইহার পাতার মধ্যে আসিয়া পড়ে, তবে কিন্তু এই গাছটি বুঝিতে পারে ও তাহা খাইবার কোন চেষ্টাই করে না।

ছবিতে দেখ একটি Sundew বা নীহারিকা গাছের কাছে ছুচের সুতায় বাঁধিয়া অতি ক্ষুদ্র এক মাংসের টুকরা রাখা হইয়াছে। Sundew গাছ অমনি বুঝিতে পারিয়াছে যে, ইহা তাহার



নীহারিকা গাছ শিকার ধরিতেছে—গাছের কাছে ক্ষুদ্র এক মাংসের টুক্‌রা রাখা হইয়াছে

গাছটি তাহার ভোজন সমাপ্ত করে। এইরূপ দুই-তিনবার আহারেরপর এই গাছের ক্ষুধা নিবৃত্তি হয়।

গ্রেটবিটেনে এক রকম শিকারী গাছের সন্ধান পাওয়া গিয়াছে। সেগুলিকে Sundew বা Drosera নামে অভিহিত করা হয়। এই গাছ-গুলিও জলাভূমিতে জন্মায় এবং দেখিতে অতি সুন্দর হয়। ইহার পাতাগুলি দূর হইতে ঠিক কৃত্রিম গোলাপ ফুলের মত দেখায় ও ইহার প্রত্যেকটি পাতা অসংখ্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র রক্তবর্ণ গর্ত্তে পরিপূর্ণ। এই গর্ত্তগুলি সকল সময়ই জলে ভরা থাকে সুতরাং পিপড়ে প্রভৃতি ক্ষুদ্র কীট পতঙ্গাদি যখন দূর হইতে ইহার সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া নিকটে আসে ও পাতার উপর চড়িয়া বসে—তখন এই গর্ত্তগুলির মধ্যে পড়িয়া যায় ও জলে পড়িয়া হাবুডুবু খাইতে থাকে। তখন দেখিতে দেখিতে গর্ত্তগুলি খাদ্য। সুতরাং ঐ দেখ সে কিরূপ ক্রমশঃ মাংসের টুকরার দিকে অগ্রসর হইয়া টুকরাটিকে জড়াইয়া ধরিয়াছে। ইহা হইতে বুঝিতে পারা যায় যে, শিকারী গাছগুলি তাহাদের খাদ্যদ্রব্য কোন্‌টি তাহা সহজেই চিনিতে পারে। এই গাছকে পশ্চিমাঞ্চলে 'মুখজলি' বলে। এই নামটি কিন্তু বেশ।

ইংলণ্ডে Butterwort (Pinguicular) নামে আর এক রকম শিকারী গাছ আছে। এই শিকারী গাছের হাল্‌কা সবুজ মসৃণ পাতার নীচের দিকে লাঠির মত একটা জিনিস থাকে। ছোট ছোট কীট-পতঙ্গ যখন ইহার পাতার উপর আসিয়া বসে, তখন লাঠিটির সাহায্যে পাতার চারিদিকটা কুঁকড়াইয়া দেখিতে দেখিতে অতি ছোট হইয়া যায় এবং এইভাবে শিকারকে চাপিয়া ধরিয়া প্রাণ সংহার করে।



সাহিত্য

মঙ্গল গান—চণ্ডীমঙ্গল

২১৪৪ পৃষ্ঠার পর

আমাদের দেশে রামায়ণ, মহাভারত, ভাগবত ইত্যাদি গ্রন্থ পড়া হইত, গান করা হইত, এ কথা বলিয়াছি। পড়িয়া শোনান জিনিসটাই ছিল সে কালে চলতি, এখন হইয়াছে বসিয়া বসিয়া নিজে নিজে পড়ার রীতি। আমরা আজকাল অনেক পাঠাগার করিয়াছি, বাড়ীতে পড়িবার জন্য লাইব্রেরীতে আসিয়া লোকে বই লইয়া যায়, কেহ কেহ সেখানে বসিয়াই পড়াশুনা করে কিন্তু একজন বসিয়া পড়িয়া শুনাইতেছে, দশজন শুনিতেছে, এরূপ বড় একটা হয় না। পঁচিশ বৎসর পূর্ব্বেও অনেক গ্রন্থ পড়িয়া শোনান হইত, শ্রাবণ মাসে বর্ষাকালে যখন সাপের উপদ্রব হইত বেশী, তখন মা মনসার পূজা প্রচারের চেষ্টা, চাঁদ সদাগরের বাণিজ্যের কথা, সুর করিয়া পাঠক মহাশয় বিকালে গাহিয়া শোনাইতেন, পাড়ার প্রতিবেশীরা আবালবৃদ্ধবনিতা আসিয়া সে কথা নিত্য শ্রবণ করিতেন, নিত্যই না শুনিলে—নিয়ম-ভঙ্গ হইলে—অমঙ্গল হইবে বলিয়া লোকের ধারণা ছিল—প্রতি চরণ পড়িয়া পাঠক মহাশয় ধূয়া ধরিতেন—'জয় জয়ন্তী দুর্গে'। এইরূপ, 'এবার করেছি আমি দুর্গা নাম সার গো' ও আরও কত ধূয়া গাওয়া হইত, প্রতি শ্লোকের শেষে। মনসামঙ্গলের মত

অনেক মঙ্গলকাব্য বাংলা ভাষায় রচিত হইয়াছিল। ইহাদের নাম ছিল মঙ্গলকাব্য, কারণ লোকে মনে করিত ইহাদের কথা শুনিলে লোকের মঙ্গল হইবে—চণ্ডীর পূজা করিলে, মনসাদেবীর পূজা করিলে, ধর্ম্ম-রাজের মহিমার কথা প্রচার করিলে বা স্বীকার করিলে, কৃষ্ণকথা শুনিলে যাহারা বলে ও যাহারা শোনে সকলেরই মঙ্গল হয়। কয়েকটি মঙ্গলকাব্য এখনও চলিয়া আসিতেছে। আমরা প্রথমে চণ্ডীমঙ্গলের কথাই বলিব।

কালকেতু ছিলেন পূর্ব্বজন্মে ইন্দ্রের পুত্র, তাঁহার নাম ছিল নীলাম্বর। শিবপূজা করিতে গিয়া যে ফুল তিনি শিবের মাথায় দেন তাহার মধ্যে কীট ছিল; কীট শিবকে দংশন করে; জ্বালায় অস্থির হইয়া শিব নীলাম্বরকে শাপ দেন,—"যাও, মানুষ হইয়া জন্ম লও।" নীলাম্বরের সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার স্ত্রী ছায়াদেবীও পৃথিবীতে আসিয়া জন্মগ্রহণ করেন। মনুষ্যজন্মে তাঁহারা ব্যাধকুলে জন্ম লইলেন, নাম হইল কালকেতু ও ফুল্লরা। কালকেতুর বয়স যখন এগার বৎসর, তখন ফুল্লরার সহিত তাঁহার বিবাহ হয়। কালকেতু শৈশবে ছিলেন দুর্দ্দান্ত, যৌবনেও বনে-জঙ্গলে সকলে তাঁহার নামে ভয় পাইত, বাঘ দেখিলে তাঁহার আর আদরের সীমা থাকিত না, গিয়া তাহাকে ধরিয়া এমন জোরে লেজ মোচড়াইয়া দিতেন যে, তাহার প্রাণ শেষ হইয়া যাইত, শুধু সিংহের গায়ে হাত দিতেন না, কারণ দুর্গা যে সিংহবাহিনী। তবে শুধু ধনুক দিয়া তাহাকে এমন জোরে মারিতেন যে, সিংহের পিপাসা পাইত, আকণ্ঠ জলপান করিয়া সে একটু ঠাণ্ডা হইত। কালকেতু যেমন দুর্দ্দান্ত ছিলেন, তেমনি খাইতেও পারিতেন বেশ! একদিন সাজ-সজ্জা করিয়া শিকারে বাহির হইয়াছেন, এমন সময়ে পথে এক সুন্দর গোসাপ দেখিয়া তাঁহার ভারী রাগ হইল। শিকারের জন্যই হউক আর যে কারণেই হউক, বাড়ী হইতে বাহির হইবার সময় লোকে ভাল করিয়া লক্ষণ, শুভচিহ্ন দেখিয়া যাত্রা করিত। দক্ষিণদিকে গো-ব্রাহ্মণ, ফুটন্ত পদ্ম, বাঁ দিকে শিয়ালও পূর্ণঘট দেখিয়া কালকেতু বাহির হইয়াছিলেন, হরি হরি বোল তাঁহার কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল, সবৎসা গাভী তাঁহার সামনে দিয়া গেল, মৃদঙ্গ-মন্দিরা বাজিতে-ছিল—এমন সময় একটা গোসাপ কোথা হইতে আসিল? ও যে ভয়ানক অযাত্রা! কালকেতুর ভারী রাগ হইল, তিনি ধনুকের ছিলায় উহাকে বাঁধিয়া লইলেন—বলিলেন যে, যদি অন্য শিকার পাওয়া যায় তো ভালই; না হইলে আজ উহাকেই শিকপোড়া করিয়া খাইবেন। দুর্ভাগ্য, সেদিন চারদিকে কুয়াসায় ঢাকা, কিছুই দেখা যায় না, কাল-কেতু বহুচেষ্টায় বহু পরিশ্রমে কিছুই শিকার পাইলেন না, ঘোরাই তাঁহার সার হইল, দিনের শেষে খালি হাতে বাড়ী ফিরিলেন।

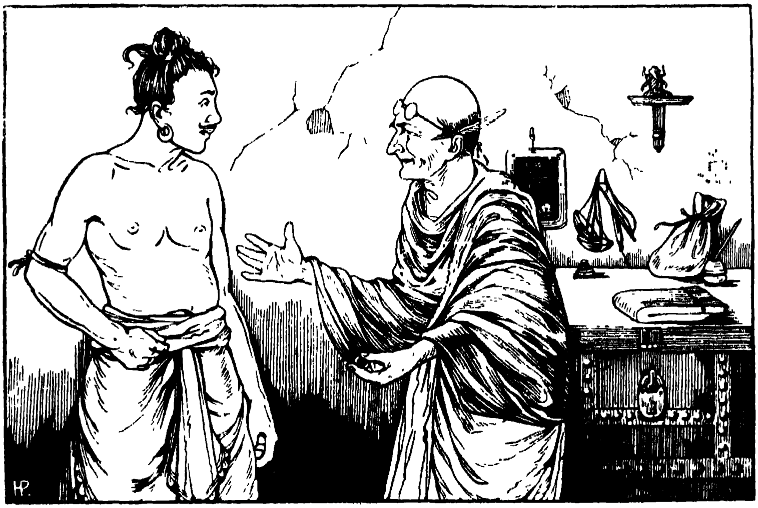
ফুল্লরাসুন্দরী মাথায় হাত দিয়া বসিলেন! কিন্তু মাথায় হাত দিয়া বসিলে তো চলিবে না, খাওয়ার যোগাড় করিতে হইবে, পড়শীদের কাছ হইতে ফুল্লরা ক্ষুদ ধার করিয়া ফিরিলেন। বাড়ী ফিরিয়া দেখেন, কি কাণ্ড! কোথায় সে গোসাপ! তাহার জায়গায় এক পরমা সুন্দরী যুবতী, কুঁড়ে ঘরখানি যেন আলোয় ঝলমল করিতেছে। ফুল্লরা তাঁহার আগমনের কথা জিজ্ঞাসা করিলে যুবতী উত্তর দিলেন,—তাঁহার সতীনের সঙ্গে ঝগড়া করিয়া আসিয়াছেন, এইখানেই থাকিবেন। ফুল্লরার তো চক্ষুস্থির, কত বুঝাইতে চাহিলেন যে, স্বামীর উপর রাগ করিয়া ঘর ছাড়া অন্যায়, কিন্তু সে কথা বুঝিবে কে? যুবতী চুপ করিয়াই রহিলেন। ফুল্লরার মুখে, কালকেতু-ফুল্লরা স্বামী-স্ত্রী যে কত দরিদ্র ছিলেন, তাহা প্রকাশ



সুবর্ণ গোধিকা দেখি,
চিন্তে বীর হয়ে দুঃখী,
অযাত্রিক পাপ দরশনে।

দেখিনু মঙ্গল যত
সকল হইল হত,
দৈব দুঃখ দেয় সব গুণে।

পাইল। গরীবের বারোমাসই কষ্ট। ভাঙ্গা কুঁড়ে, তালপাতার ছাউনি, বৈশাখের ঝড়ে তাহা ভাঙ্গিয়া পড়ে। জ্যৈষ্ঠে শিকারের মাংসে চিলের ভাগ, বইচির ফল খাইয়া আধপেটায় থাকিতে হয়। শ্রাবণে জোঁক, আর বৃষ্টি হইলে বানে ধান ভাসিয়া যায়। আশ্বিনে সকলেই তো প্রসাদী মাংস খায়, মাংসের তেমন বিক্রয় নাই। কার্ত্তিকে



সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥

হরিণের চামড়া পরিয়া থাকিতে হয়, মাঘে শাক তুলিবার জো নাই, ফাল্গুনে খাওয়ার দুঃখ—সুতরাং সারা বৎসরই কষ্ট। কালকেতুর বাড়ীতে থাকিলে এসব কষ্ট পাইতে হইবে। যুবতী কিছুই বলেন না—স্বামী-স্ত্রী দুজনে মিলিয়া কত অনুনয় বিনয়, কত ভয় দেখানো—কিছুতেই কিছু হইল না। অবশেষে কালকেতু ধনুকে বাণ যুড়িলেন, কিন্তু বাণ ছুঁড়িতে পারিলেন না। তখন যুবতী বলিলেন যে, তিনি চণ্ডী, এবং তাঁহার দশভুজা-মূর্ত্তি প্রকাশ করিয়া দেখাইলেন। কালকেতুর অত্যাচারে বনের পশু গিয়া চণ্ডীর কাছে নালিশ করিলে চণ্ডী তাহাদিগকে অভয় দান করেন এবং গোসাপ হইয়া কালকেতুর সামনে পড়েন। সে দিন যে কুয়াসা হইয়াছিল, সে কুয়াসাও তাঁহারই মায়ার সৃষ্টি। স্বামী-স্ত্রীকে দেখিয়া তিনি ভারী খুসী হইলেন এবং একটি অঙ্গুরী ও সাত ঘড়া ধন দিলেন, যাহাতে তাহাদের অবস্থা ভাল হয়। দেবী চলিয়া গেলে কালকেতু আংটী ভাঙ্গাইতে এক প্রতিবেশীর বাড়ীতে গেলেন। প্রতিবেশীর নাম মুরারি শীল। মুরারি শীল শক্ত লোক, কিছুতেই দাম দিতে চাহেন না, কালকেতুকে কি করিয়া ঠকাইবেন, তাঁহার সেই চিন্তা। প্রথমে তো তাঁহাকে আমলই দিতে চাহেন না, বলেন যে, ইহা সোনা-রূপা নহে, পিতল, ঘসিয়া-মাজিয়া একটু চক্‌চকে করা হইয়াছে, তারপরে বাধ্য

হইয়া তাঁহাকে দাম দিবেন স্বীকার করিতে হইল। তাহার কতকটুকু এখানে উদ্ধৃত করিলাম—

সোনা রূপা নহে বাপা এ বেঙ্গা পিতল।
ঘসিয়া মাজিয়া বাপা করেছ উজ্জ্বল॥
রতি প্রতি হয় যদি দশ গণ্ডা দর।
দুই ধানের কড়ি তায় পাঁচ গণ্ডা ধর॥
অষ্ট পণ পাঁচ গণ্ডা অঙ্গুরীর কড়ি।
মাংসের পিছিলা ধার ধারি দেড় বুড়ি॥
একুনে হইল অষ্ট পণ আড়াই-বুড়ি।
চাল খুদ কিছু লহ—কিছু লহ কড়ি॥

*   *   *

কালকেতু বলে খুড়া মূল্য নাহি চাহ।
যেজন দিয়াছে বস্তু দিব তাঁর ঠাঁই॥
বেণে বলে দরে নাহি বাড়ে এক বট।
আমা সনে সওদা কর না পাবে কপট।
ধর্ম্মকেতু দাদা সনে কৈলু লেনা-দেনা।
তাহা হৈতে ভাই পো হয়্যাছ সিয়ানা॥
কোন্ কথা লাগি বাপু কর হুড়াহুড়ি।
যদি না লও চালু খুদ দিব সব কড়ি॥
কালকেতু বলে খুড়া না কর ঝগড়া।
অঙ্গুরী লইয়া আমি যাব অন্য পাড়া॥

চণ্ডীর বরে কালকেতু গুজরাতে বন কাটাইয়া নগর বসাইলেন, কলিঙ্গের রাজার সঙ্গে যুদ্ধ হয়, কালকেতু হারিয়া যান, কিন্তু চণ্ডীর আদেশে রাজা কালকেতুকে গুজরাতের সিংহাসনে বসাইলেন, তারপর একদিন কালকেতু-ফুল্লরা শাপের অন্তে স্বর্গে চলিয়া গেলেন। সংসারে চণ্ডীর পূজা বা মাহাত্ম্য প্রচার হইল।

ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যান

চণ্ডীমঙ্গলে আর একটি উপাখ্যান আছে, তাহা ধনপতি সওদাগরের উপাখ্যান—শ্রীমন্তের উপাখ্যান বলাও চলে। রত্নমালা ছিলেন স্বর্গের অপ্সরা, দেবসভায় সুন্দর নৃত্য করিতে পারিতেন বলিয়া তাঁহার নাম ছিল। একবার নাচিতে নাচিতে তাঁহার তাল ভঙ্গ হয়, তখন তাঁহাকে শাস্তি দেওয়া হয় যে, পৃথিবীতে মানুষভাবে জন্মাইতে হইবে। সেই অনুসারে ইছানী নগরে তাঁহার জন্ম হয়, সাধু লক্ষপতি তাঁহার পিতার নাম, রত্নমালার নূতন নাম হইল খুল্লনা। কিছুকাল পরে উজানীপুরের ধনপতি সাধু একবার পায়রা উড়াইতে যান,—সঙ্গে বন্ধু-বান্ধব ভবানী, শঙ্কর, যাদব, মাধব, হরি, অজিত, হলধর অনেকে ছিল। তখন পায়রাদের নামই বা ছিল কত। রণভঙ্গ, সিংহ, বাঘা, মেঘা, পবনবেগা, হারা, তারা, জুঝারিয়া, আরও কত কি। ইহাদের খাঁচায় বন্ধ করিয়া লইয়া যাইত, শুভক্ষণে পাটের দোলায় চাপিয়া নবীন ধনী যুবক যাত্রা করিতেন, সঙ্গে ভৃত্যাদি পরিজন থাকিত, এবং কয়েকটি পায়রাকে উড়াইয়া দেখিত—কে কত শীঘ্র ফিরিয়া আসে। এইরূপ খেলিতে গিয়া একদিন পায়রা উজানী হইতে একেবারে ইছানীনগরে চলিয়া যায়। খুল্লনা তখন সখাদের সঙ্গে নানারঙ্গে খেলিতেছিলেন। পায়রা গিয়া তাঁহার নিকট বসিল। তিনি পায়রাকে লইয়া রাজবাড়ীতে চলিয়া গেলেন, ধনপতি চাহিলেও তাহাকে দিলেন না, বরং পরিচয়ে জানিলেন, তাঁহার জেঠতুত বোন লহনার স্বামী ধনপতি! ধনপতির তাঁহাকে পছন্দ হইল এবং বিবাহ প্রস্তাব করিয়া ও লক্ষপতিকে সম্মত করাইয়া তিনি বাড়ীতে ফিরিলেন। লহনাকে কৌশলে সন্তুষ্ট করিয়া ধনপতি তাঁহাকেও এই বিবাহ-প্রস্তাবে সম্মত করিলেন। ধনপতি বাড়ীতে আসিয়া কি খাইলেন, কাব্যে তাহার একটি তালিকা পাওয়া যায়—

"প্রথমে সুকতা আনি দিলা ঘণ্ট শাক।
প্রশংসা করয়ে সাধু ব্যঞ্জনের পাক॥
ঘৃতভাজা খণ্ডে মিশ দিলা ফুলবড়ি।
পাখা ধরি বাতাস করয়ে দুয়া চেড়ী॥
ভাজা মীন ঝোল ঘণ্ট মাংসের ব্যঞ্জন।
গন্ধে আমোদিত কৈল ভোজন-ভবন॥"

যাহাহউক, সওদাগর বিবাহ করিয়া দেশে ফিরিলেন। কিন্তু রাজার আদেশে তাঁহাকে শীঘ্রই বিদেশে যাইতে হইল, ইহার মধ্যে খুল্লনাকে দেখা-শোনার ভার থাকিল লহনার উপর। লহনা প্রথমে খুল্লনাকে খুব যত্ন করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বলা বহু পুরাতন দাসী, সে দেখিল, দুই সতীনে ভারী ভাব, আর সতীনে সতীনে মিল থাকিলে দাসদাসীর অসুবিধা; তাই তাহার কাজ হইল দুইজনে ঝগড়া লাগান। দুর্ব্বলার কুপরামর্শে লহনা জাল পত্র প্রস্তুত করাইলেন, ধনপতি যেন লিখিতেছেন, তাঁহার এখন গ্রহ খারাপ, গ্রহকে খুসী করিতে হইলে খুল্লনাকে ছাগল চরাইতে হইবে ইত্যাদি। খুল্লনা এই পত্র সত্য বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন না, ফলে দুইজনে ঝগড়া হইতে মারামারি, তাহাতে খুল্লনা হার মানিলেন। তাঁহার হাতের লোহা ছাড়া আর সব গহনা দূর হইল। তারপর ছাগল চরাইতেও হইল। খাওয়ার ব্যবস্থা হইল, গর্ত্তে কচু পাতার উপর পুরাণ খুদের 'জাউ', আলুণা তরকারি, বেগুনগাছের ডাল বা 'খারা,' লাউ-



ধীরে ধীরে যায় রামা লইয়া ছাগল।
লাঠি হাতে পাত মাথে যেমন পাগল

কুমড়ার খোসা—খাইতে বসিয়া দুঃখে কষ্টে চোখ দিয়া জল আসে, খাওয়া হয় না— কিছু ফেলেন কিছু খান, এইরূপে দিন যায়। একদিন ছাগল পাওয়া যায় না, খুল্লনা ভয়ে অস্থির, এমন সময়ে কে বলিল, "চণ্ডী-পূজা কর, দুঃখের অবসান হইবে।" খুল্লনা চণ্ডীপূজা করিলেন, চণ্ডী তুষ্ট হইয়া বর দিলেন—ছাগল পাওয়া গেল। খুল্লনা আর কোন বর লইলেন না। "মাগো আর কিছু চাই না, শুধু তোমার চরণে, যেন আমার মতি থাকে।" চণ্ডী এদিকে লহনাকে স্বপ্ন দিলেন, লহনা ভয়ে খুল্লনাকে ঘরে আনিয়া উচিতমত আদর-যত্ন করিতে লাগিল; ধনপতিকে স্বপ্ন দিলেন, ধনপতি ত্বরায় গৃহে ফিরিলেন। তাঁহার প্রবাসের কষ্ট দূর হইল, সঙ্গে সঙ্গে খুল্লনার দুর্দ্দিনও কাটিল।

দেবসভায় কালীয়দমন নৃত্য; দেবগণ মুগ্ধ হইয়া মালাধরের নৃত্য দেখিতেছেন। সকলে তুষ্ট হইয়া মালাধরকে নানা অলঙ্কারে পুরস্কৃত করিলেন, পুরস্কারের নানা অলঙ্কারের মধ্যে শিবের দেওয়া হাড়ের মালা দেখিয়া মালাধর হাসিলেন। শিব তাহাতে রুষ্ট হইয়া শাপ দিলেন, মালাধর পৃথিবীতে আসিয়া খুল্লনার উদরে জন্ম লইলেন। তাঁহার নাম হইল, শ্রীমন্ত।

শ্রীমন্তের জন্মের পূর্ব্বে ধনপতি তাঁহার আত্মীয় কুটুম্ব সকলকে প্রীতিভোজন করাই-বার উদ্‌যোগ করেন। কিন্তু খাইতে বসিবার পূর্ব্বে সকলে গোলমাল করিয়া উঠে; বলে যে, খুল্লনা যতদিন ছাগল চরাইয়াছে, ততদিন সে কি ভাবে ছিল কে জানে! সে যে তোমার ঘরে থাকার মত তাহা প্রমাণ করিতে হইবে, পরীক্ষা করিয়া দেখাইতে হইবে। ভাল হইলে তাহার হাতে খাইব, না হইলে খাইব না, তুমিও তাহাকে তাড়াইয়া দিবে। তখনকার দিনে কে ভাল, কে মন্দ, তাহা পরীক্ষা করিবার জন্য নানারূপ ব্যবস্থা ছিল। সেই ব্যবস্থামত নূতন ঘটে এক বিষধর সর্প আনা হইল, সে সর্পের গর্জ্জন যে শোনে তাহারও ভয় হয়; ঘটের মধ্যে ধনপতি সোনার আংটী ফেলিয়া দিলেন। খুল্লনা সাতবার সেই আংটী উঠাইলেন, সাপ তাঁহার কোনও ক্ষতি করিল না। তাহাতেও হইল না। লোহার সাবল আগুনে পোড়াইয়া খুল্লনার সামনে রাখা হইল, কামার আনিয়া তাঁহার হাতে সেই লাল ডগ্‌ডগে সাবল দিল, খুল্লনা ভক্তিভরে চণ্ডীকে প্রণাম করিয়া সাবল লইলেন, সাবল হাতে ঘুরিয়া আসিয়া খড়ের গাদায় ফেলিলেন, খড় পুড়িয়া গেল—তাঁহার কিছুই হইল না। শেষে খুল্লনাকে জতুগৃহে দরজা বন্ধ করিয়া আগুন দেওয়া হইল। আগুন আকাশ ছুঁইল; সকলে মনে করিল, খুল্লনা নিশ্চয়ই এবার পুড়িয়া মরিবেন, কিন্তু খুল্লনার কিছুই হইল না। এসকলই চণ্ডীর মাহাত্ম্য।

এদিকে রাজবাড়ীতে চন্দন ফুরাইয়াছে, ধনপতিকে চন্দন আনিতে সিংহল যাইতে হইবে। যাওয়ার সকল আয়োজন শেষ, লহনা আসিয়া স্বামীর কাছে লাগাইলেন খুল্লনা যেন কোন্ দেবতা না অপদেবতার পূজা করি-তেছেন! শিবের ভক্ত ধনপতি আর কাহাকেও মানেন না; সাধুর যাত্রা ভঙ্গ হইল, তিনি আসিয়া খুল্লনাকে উৎপীড়ন করিলেন, ফলে চণ্ডীর রোষ হইল, যাত্রার সময় শুভ হইল না—অমঙ্গলের মধ্যেই তিনি যাত্রা করিলেন। সাত ডিঙ্গা লইয়া যখন তিনি মগরাতে আসিয়া পৌঁছিলেন, তখন ঝড়ে তাঁহার ছয় ডিঙ্গা জলে ডুবিল। এক ডিঙ্গায় সওদাগর সমুদ্রে আসিয়া পড়িলেন, শ্রীক্ষেত্র ও সেতুবন্ধ দেখিয়া কালীদহে পৌঁছিলেন। সেখানে সুন্দর দৃশ্য—দহের মধ্যে পদ্মের উদ্যান—সারস সারসী, খঞ্জন খঞ্জনী, ডাহুক ডাহুকী, সেখানে কমলাসনে

অপরূপ এক সুন্দরী,—বাম হস্তে গজরাজকে ধরিয়া তাহাকে গিলিতেছেন! চারিদিকে বিদ্যাধরীদের নৃত্য! এই দৃশ্য ধনপতি শুধু দেখিলেন, তাঁহার সঙ্গী আর কেহ দেখিতে পাইল না। সিংহলের রাজসভায় তাঁহার পথের এই বিবরণ কেহ বিশ্বাস করিল না—তাঁহাকে সকলে বন্দী করিয়া কালীদহে লইয়া চলিল, সত্যই কমলে-কামিনী দেখা যায় কি না পরীক্ষা করিবার জন্য। কারাগারেও চণ্ডী তাঁহাকে স্বপ্নে দেখা দিয়া বলিলেন, 'এখনও যদি ভবানীকে এক মনে পূজা কর তবে বাঁচিয়া যাইবে, আমার দেখা পাইবে।' কিন্তু ধনপতি শিবেরই ভক্ত ছিলেন, অন্য দেবদেবীর পূজা করিতে রাজী হইলেন না—ভবানী তাঁহার কাছে তখন ডাকিনী। ফলে ধনপতির অশেষ দুর্গতি হইল, ধনসম্পত্তি, লোকলস্কর সব হারাইলেন, তাঁহাকে কারাগারে পচিতে হইল।

এদিকে শ্রীমন্তের জন্ম হইয়াছে। ছেলেবেলায় শ্রীমন্ত খেলিতেছে। তখনকার দিনে কৃষ্ণচরিত ছিল খেলার উপাদান। কেহ অঘাসুর হইল, কেহ বাছুর হইল, কেহ বা শ্রীকৃষ্ণ সাজিল। আবার কেহ যশোদা সাজিল, কেহ বালক কৃষ্ণ সাজিয়া বাঁধা পড়িল। শ্রীমন্ত যথারীতি লেখা-পড়া শিখিল, কিন্তু একদিন গুরুর সহিত বিবাদে মনে বড় আঘাত পাইল, মাকে কোনও প্রকারে রাজী করাইয়া সিংহল যাওয়ার অনুমতি আদায় করিয়া লইল। যেমন অনুমতি পাওয়া, অমনি যাত্রার ব্যবস্থা, আর দেরী নাই। অত শীঘ্র ডিঙ্গা তৈয়ারী করে কে? চণ্ডী স্বয়ং বিশ্বকর্ম্মাকে পাঠাইলেন, বিশ্বকর্ম্মাই তো কারিগরদের গুরু। হনুমান বীর বিশ্বকর্ম্মার সাহায্য করিলেন, রাতারাতি সাতডিঙ্গা অনায়াসে তৈয়ারী হইল,—মধুকর, রণজয়, রণভীমা, হিল্লোলা, স্বর্ণমালা, হিরামুখী, চন্দ্রকলা। নৌকারই বা নামের বাহার কত! খুল্লনা চণ্ডীপূজা করিয়া কত উপদেশ দিয়া পুত্রকে বিদায় দিলেন।

শ্রীমন্ত যখন মগরায়, তখন বড় জলঝড় হইল। গঙ্গাসাগরে দুর্গমে শ্রীমন্ত মাতার উপদেশ মনে করিয়া দুর্গা স্মরণ করিল, বিপদ কাটিয়া গেল। পিতার মত শ্রীক্ষেত্র, সেতুবন্ধ দেখিয়া বণিকপুত্র কালীদহে আসিয়া কমলে কামিনীকে দেখিতে পাইল। পিতার মতই মুগ্ধ হইল,—কিন্তু প্রথমে তো সিংহলে গিয়া পিতার সন্ধান করিতে হইবে। সহর কোটালেরা ভাল মানুষ নহে, সেকালেও তাহাদের দুর্নাম ছিল,—কোটাল নানারূপ প্রশ্ন করিয়া শ্রীমন্তকে বলিল, "তুমি যদি সত্যই সাধু তবে অকাতরে তোমার এই দামী টোপরটি জলে ফেলিয়া দাও দেখি।" শ্রীমন্ত তাহাই করিল, অন্তরীক্ষে চণ্ডী তাহা দেখিতে পাইলেন এবং তাহা লইয়া খুল্লনার কাছে পৌঁছাইয়া দিলেন।

সিংহলরাজের নিকটে গিয়া আবার সেই কমলে কামিনীর কথা! শ্রীমন্তের কথা শুনিয়া রাজা হাসিলেন। সাধুপুত্রের রোখ চাপিল, সে বলিল,—"আচ্ছা, আমার সঙ্গে এস, যদি সত্য না হয় তবে আমার ধনরত্ন লুটিয়া লইও, আর দক্ষিণ মশানে আমার প্রাণ বধ করিও।" রাজা বলিলেন, আর যদি সত্য হয় তো রাজকন্যা আর অর্দ্ধেক রাজত্ব।" সকলের সামনে এমনি একটা অঙ্গীকারপত্র স্বাক্ষরিত হইল। সকলে নির্দ্দিষ্ট স্থানে গেল, কিন্তু কোথায় সেই কমলে-কামিনী! রাজা রাগ করিয়া কোটালের হাতে শ্রীমন্তকে দিলেন, দক্ষিণ মশানে তাহার প্রাণ বধ হইবে। মিষ্ট কথায় কোটালকে তুষ্ট করিয়া শ্রীমন্ত স্নানাদি সারিয়া লইল। পিতামাতার তর্পণ করিয়া হঠাৎ আঁচলে চণ্ডীর প্রসাদী নির্ম্মাল্য দেখিয়া আসিবার সময় মায়ের উপদেশ মনে পড়িল,

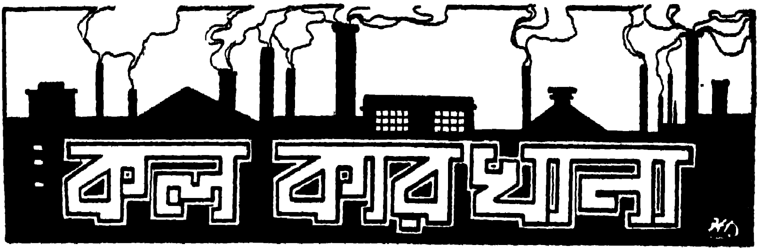
অমনি শ্রীমন্ত চণ্ডিকার স্তব করিতে লাগিল। চণ্ডী ভক্তের ডাকে সাড়া না দিয়া থাকিতে পারিলেন না, তাঁহার ডাকিনী যোগিনী লইয়া মশানে হানা দিলেন, কোটালের লোকজন পলাইয়া গেল। রাজা সৈন্য-সামন্ত লইয়া আসিলেন, চণ্ডীর অনুচর দানা ও প্রেত আসিয়া তাহাদিগকে লণ্ড-ভণ্ড করিল। রাজা চণ্ডীর পদানত হইলেন। রাজকন্যা সুশীলার সহিত শ্রীমন্ত সওদাগরের বিবাহ হইল, ধনপতি মুক্তিলাভ করিয়া পুত্র ও পুত্রবধূ দেখিয়া পরম তুষ্ট হইলেন—দেশে ফিরিবার পথে মগরায় যে সব নৌকা ডুবিয়া গিয়াছিল চণ্ডীর কৃপায় তাহাদের ফিরিয়া পাইলেন। ধনপতি চণ্ডীর পূজা করিলেন, সংসারে চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচার হইতে থাকিল—খুল্লনা যাঁহার পূজা করিয়া জীবনে নানা বিপদ হইতে উদ্ধার পাইয়াছিলেন, তাঁহার পূজা সংসারে কে না করে?

কবিকঙ্কণের চণ্ডী লোকের চলিত ভাষা লইয়া লিখিত হইলেও স্থানে স্থানে সংস্কৃত শব্দেরও যথেষ্ট প্রয়োগ রহিয়াছে। তবে সংস্কৃত অপেক্ষা প্রাকৃত শব্দের ব্যবহার বেশী। কবিকঙ্কণ সাধারণ লোকের বুঝিবার জন্যই চণ্ডীকাব্য রচনা করিয়াছিলেন, এজন্যই বোধ হয় তাঁহার কাব্যে সাধারণ লোকের ভাষা অধিক পরিমাণে আছে। কবিকঙ্কণ পড়িলে আমরা সেই প্রায় চারিশত বৎসরের পূর্ব্বের বাঙ্গলা সমাজের আচার-ব্যবহার, জাতি-প্রণালী, দ্রব্যাদির ব্যবহার-প্রণালী, রীতি-নীতি, খেলাধূলা এবং কোন্ দ্রব্য সুলভ ছিল, কোন্ দ্রব্য দুর্লভ ছিল, তাহা বেশ সুন্দররূপে জানিতে পারি। সেকালের মা খোকাকে কি ছড়া গাহিয়া ঘুম পাড়াইতেন, তাহা এই গানটি হইতে জানিতে পারিবে :—

ঘুমপাড়ানিয়া গান

আয় আয়রে বাছা আয়।
কি লাগিয়া কান্দ বাছা, কি ধন চায়॥
তুলিয়া আনিব গগন-ফুল।
একেক ফুলের লক্ষেক মূল॥
সে ফুল গাঁথিয়া দিব যে হার।
প্রাণের বাছা মোর না কান্দ আর॥
গগন-মণ্ডলে পাতিব ফান্দ।
ধরিয়া আনিব গগন-চান্দ॥
সে চান্দ আনি তোরে পরাব ফোটা।
কালি গড়ায়্যা দিব সোনার ভেটা॥
খাওয়াব ক্ষীরখণ্ড মাখাব চুয়া।
কর্পূর পাকা পাণ সরস গুয়া॥
রথ গজ ঘোড়া যৌতুক দিয়া।
দুই রাজার কন্যা করাব বিয়া॥
শ্রীমন্ত চাপে মোর সোনার নায়।
কুঙ্কুম-কস্তূরী মাখাব গায়॥
পাটে নিদ্রা যাবে চামরের বায়।
অম্বিকা-মঙ্গল মুকুন্দে গায়॥

মুকুন্দরাম কোন প্রাচীন কাব্য বা কিংবদন্তী অবলম্বন করিয়া যে এই কাব্য প্রণয়ন করিয়াছিলেন, তাহা তিনি নিজে স্বীকার করেন না। তিনি বলেন—"হাতে লৈয়া পত্র মসী, আপনি কলমে বসি, যেই বোলান, যেই না লেখান। না জানি কি কৌতুকে, অম্বিকা মুকুন্দমুখে, নিজ সঙ্কীর্ত্তন রস গান।" কিন্তু মুকুন্দরামের পূর্ব্বের রচিত মঙ্গল চণ্ডীর ব্রতকথা ছিল, ইহার প্রণেতা দ্বিজ জনার্দ্দন; শ্রীচৈতন্য ভাগবতেও 'মঙ্গল চণ্ডীর গীত করে জাগরণ' এরূপ দেখা যায়। তাহাতে বুঝিতে পারা যায়, শ্রীচৈতন্যদেবের পূর্ব্বেও মঙ্গলচণ্ডীর কথা বাঙ্গলায় প্রচারিত হইয়াছিল। কবিকঙ্কণের পরেও অনেকে চণ্ডীমঙ্গল লিখিয়াছেন। তাহাদের মধ্যে বিক্রমপুর জপসা নিবাসী জয়নারায়ণ সেনের লিখিত কাব্যখানি খুব সুন্দর।



কাগজ

২০৭৪ পৃষ্ঠার পর

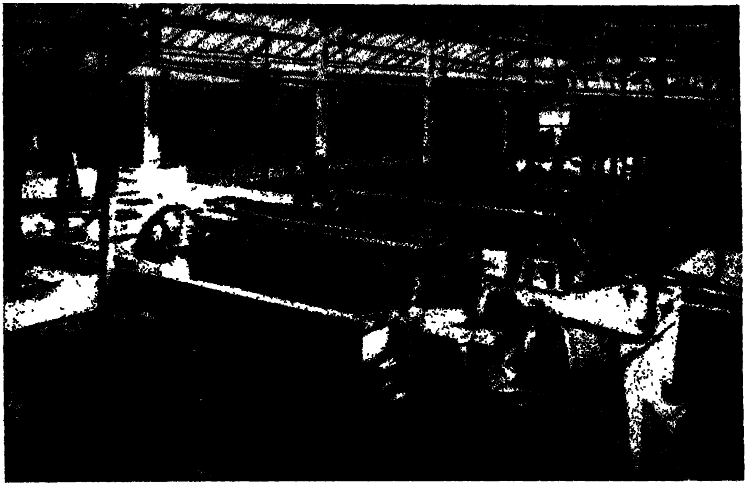
আমরা যদি তোমাদের কাহাকেও জিজ্ঞাসা করি, "বল দেখি—'শিশু-ভারতী' এবং তোমাদের পড়ার বইগুলি কিসের উপর ছাপা হইয়াছে?" তোমরা অমনি এমন একটা সহজ প্রশ্নের উত্তরে আনন্দে মাতিয়া চীৎকার করিয়া বলিবে—"এ আবার কি রকম প্রশ্ন? কেন, কাগজের উপর ছাপা হইয়াছে!" ঠিক্ কথা কাগজের উপরই ছাপা হইয়াছে। কিন্তু এই 'কাগজ' শব্দটি কোথা হইতে আসিল জান? 'কাগজ' পারস্য শব্দ, কিন্তু বাঙ্গলা ভাষায় অন্যান্য বিদেশী শব্দের ন্যায় ইহাও চলিয়া গিয়াছে। সংস্কৃত ও বাঙ্গলা ভাষায় কিন্তু কাগজের প্রতিশব্দ হইতেছে 'পত্র'। 'পত্র' শব্দের ব্যবহার নাই তাই 'কাগজ' বলিতে আমরা যাহা বুঝি 'পত্রে' সেইরূপ বুঝি না। কিন্তু বল দেখি, কি কি উপাদানে কাগজ তৈরী হয়? উত্তর শোন। যা কিছু জিনিস থেঁতলাইয়া বা কাটিয়া কাদার মত করিতে পারা যায়, সে সমুদয় জিনিস হইতেই কাগজ তৈরী হইতে পারে। নানা প্রকার গাছের ছাল, গাছের পাতা, শিম বা কড়াইসুঁটির সুঁটি, নারিকেল ছোব্ড়া, খড়, পাট, শণ, পুরাণো দড়ি, শেওলা, ন্যাকড়া, নানাপ্রকার ঘাস ও চুল, পশুর লোম প্রভৃতি হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়।

কাগজ সৃষ্টির মূল ইতিহাস বড় সুন্দর। মানুষের মনে যে দিন হইতে ভাব প্রকাশ করিবার জন্য একটা সঙ্কেতের প্রয়োজন হইল, যে দিন হইতে বর্ণমালার সৃষ্টির ভাব আসিল এবং যে দিন হইতে তাহা প্রকাশ করিবার সমুদয় আয়োজনও সফল হইল, তখন হইতেই তাহাদের প্রধান একটা ভাবনা হইল—এই অক্ষর-কি ভাবে স্থায়ীরূপ দেওয়া যায়! এইরূপ ইচ্ছা স্বাভাবিক। তাহারই ফলে সভ্যতার বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে মিশরে চিত্রলিপির (picture-writing) আবিষ্কার হইল এবং সেকালের মানুষেরা তাহাদের মনের ভাব প্রস্তরে বা কাঠে খোদিত করিতে লাগিলেন। পিরামিডের গায়ের খোদিত অক্ষর-মালা ইহার প্রাচীনতম নিদর্শন। যখন কাগজের প্রচলন ছিল না, তখন প্রস্তর, ইষ্টক, পিত্তল, তামা, কাঠ, বৃক্ষপত্র ও পশু-চর্ম্ম ইত্যাদির উপর লিখিয়া রাখিবার প্রথা প্রচলিত ছিল।

তোমরা মহানুভব সম্রাট অশোকের কথা 'শিশু-ভারতী'তে পড়িয়াছ। তিনি পর্ব্বতের গায়ে, প্রস্তরের স্তম্ভে যে সকল লিপি রাখিয়া গিয়াছেন, সে সব অশোক-লিপি ভারতবর্ষের নানাস্থানে আছে। সে কালে রাজারা অনেকে তামার পাতে লিখিয়া দান করিতেন, সে গুলির নাম তাম্রশাসন। পূর্ব্বে আমাদের দেশে লোকে কাগজের পরিবর্ত্তে তালপাতা ও ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতির উপর লিখিতেন। কিন্তু ভূর্জ্জপত্র প্রভৃতি তিন-চার শো বৎসরের মধ্যে নষ্ট হইয়া যায় বলিয়া মূল হইতে অনেকবার এক একটি পুঁথি লিখিত হইয়াছে। অনেক দিন পরে এক প্রকার তুলট কাগজও প্রস্তুত হইত। সেই সকল কাগজে লেখা প্রাচীন পুথি তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে। মিসর দেশে 'প্যাপিরাস্' (Papyrus) নামক এক প্রকার উদ্ভিদের পত্র কাগজের পরিবর্ত্তে ব্যবহৃত হইত।

এখনও 'নীল' নদের জলা জমিতে অসংখ্য প্যাপিরাস্ গাছ জন্মে। এই গাছগুলি দেখিতে অনেকটা আমাদের ভারতবর্ষের নল বা শরের ন্যায়। পাঁচ হাজার বৎসর আগের পেপিরাস পাতের উপর লেখা বই পাওয়া গিয়াছে। পেপিরাস তৃণের মূল দেশ হইতে প্রস্তুত কাগজই সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন। এই গাছ সাধারণতঃ ৮।১০ ফিট দীর্ঘ হয়। কোন্ কোন গাছ আরও বড় হয়। ইহার পাতা কতকটা আমাদের মিশরের পুরোহিতেরা ধর্মকথা লিখিয়া বিক্রয় করিতেন।

ইউরোপে কাগজের প্রতিশব্দ ইংরাজী 'পেপার' (paper) এবং জার্মাণ 'পেপিয়ার' (papier)—এই নাম হইয়াছে। চীন ও জাপানে 'বাঁশের ফলকে,' উত্তর-ইউরোপে 'বিচ্' (beech) গাছের কাষ্ঠ-ফলকে লেখা হইত। পণ্ডিতেরা মনে করেন যে, 'বিচ্' শব্দ হইতে 'Bece', Boc', Bucho', এবং 'Book' অর্থাৎ পুস্তক শব্দের উৎপত্তি হইয়াছে।



তৃণ মণ্ড ও কাষ্ঠ মণ্ড তৈরীর কল

ঝাউ গাছের পাতার মত। গাছগুলি সরল হইয়া উঠে এবং মাথার উপরে ছত্রাকার ধারণ করে। গোড়ার অংশের ছাল অতি পাতলা ও মোচার খোলার মত। এই খোলাগুলি টেবিলের উপর রাখিয়া তীক্ষ্ণ অস্ত্র প্রয়োগে খুলিয়া লইয়া আড়ভাবে জুড়িয়া গেলেই 'পেপিরি' প্রস্তুত হইল। যে গাছের গোড়া যতটা মোটা 'পেপিরি' কাগজ ততটা চওড়া হইত। এক এক তা 'পেপিরি' তৈয়ার হইলে হয় হাতীর দাঁত, নয় পালিস করা পাথর ঘসিয়া উহা মসৃণ করা হইত। গ্রীকেরা অতি পাতলা 'পেপিরিকে' 'হেরেটিকা' বলিত। ইহার উপর

চীনদেশে সকলের আগে কাগজ প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছিল। খৃষ্টের জন্মের প্রায় চারিশত বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে শণ ও বাঁশের আঁস হইতে কাগজ প্রস্তুত হইত। চীনদেশের নিকট আরব এবং আরবের নিকট ইউরোপ কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে। ত্রয়োদশ শতাব্দীতে ইউরোপে প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়। কিন্তু এখন ইউরোপেই সর্ব্বোৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হয়।

বাঙ্গলা দেশের অনেক গ্রামে এবং ভারতবর্ষের অনেক যায়গায় এখনও হাতে কাগজ তৈয়ারী হয়।

এইরূপ ভাবে যাহারা কাগজ তৈরী করে তাহা-দিগকে 'কাগজী' বলে। ভারতবর্ষে অনেক কাল হইতেই এইরূপ ভাবে হাতে কাগজ তৈরী হইয়া আসিতেছে। কিন্তু এখন এই কাগজের ব্যবসায় একরূপ লোপ পাইতে বসিয়াছে।

চীনদেশের অতি প্রাচীন কালের ইতিহাস বংশ-ফলকে লিখিত বা খোদিত ছিল। চীনদেশের ভাষায় কাগজকে বলে 'কায়গৎ'। ভারতের দাক্ষিণাত্য-প্রদেশেও কোন কোন যায়গায় 'কাগজ' না বলিয়া 'কাগৎ' বা 'কাখজ' বলে। আমরা এই যে কাগজ ব্যবহার করিতেছি, এই কাগজ প্রস্তুত-প্রণালীর জন্য পৃথিবীর সব দেশের লোকেরা চীনদেশের কাছে ঋণী। চীনেরা প্রথমে জৈব আঁস বা অংশুমান (Cellulose) হইতে কাগজ প্রস্তুত করিয়াছে। প্রাচীনকালে চীনারা বাঁশের ভিতরকার ছালের উপর শলাকা দিয়া আঁচড়াইয়া লিখিত। পরে বাঁশের ছাল, তুলা, রেশম এবং অন্যান্য গাছের ছাল, মাছ ধরা জালের ছিন্ন অংশ, শণ প্রভৃতি একত্র সিদ্ধ করিয়া মণ্ড (pulp) প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করে। কথায় বলে 'ছনয়েচীন', কাগজ উৎপত্তির ইতিহাস আলোচনা করিলে একথার যথার্থতা বুঝিতে পারা যায়। চীন হইতে জাপান, তিব্বত, খোটান, সমরখণ্ড, নেপাল ও কাশ্মীরে কাগজের প্রচলন হয়। ইউরোপে কাগজ প্রচলিত হইবার বহু পূর্ব্বে পারস্য, মধ্য-এসিয়া, চীন ও তিব্বতে খুব উৎকৃষ্ট কাগজ প্রস্তুত হইত। তিব্বতের লোকেরা গাছের আঁস বা মণ্ড হইতে কাগজ প্রস্তুত করিত। তাহারা কাগজকে মসৃণ করিবার জন্য ভাতের মাড় বা চাউলের জলের ব্যবহার করিত।

পুরাতন বস্ত্রাদি হইতে কাগজ প্রস্তুত-প্রণালীর বিষয় সমরখণ্ডের লোকেরা জানিতেন। আরবেরা সমরখণ্ড জয় করিবার পর কাগজের ব্যবহার ও কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী শিখিলেন এবং তাহারাই স্পেনে (Spain) কাগজের প্রচলন করেন। মক্কানগরে ৭১০ খৃষ্টাব্দে প্রথম কাগজ প্রস্তুত হয়।

তোমরা বেশ বুঝিতে পারিতেছ, যেভাবেই হউক চৈনিকদের কাছ হইতেই পৃথিবীর সবদেশের লোকেরা কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী শিক্ষা করিয়াছে।



ছেঁড়া ন্যাকড়া ইত্যাদি জ্বাল দেওয়ার কল

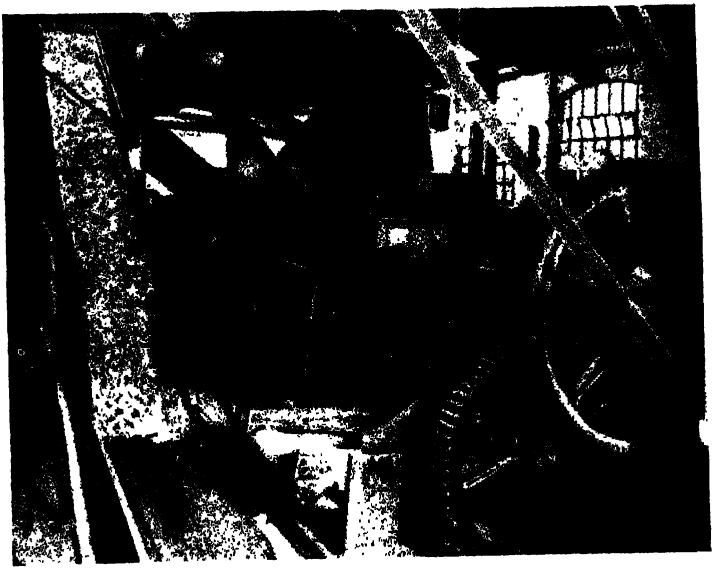
ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যে একে একে জার্ম্মেণী, ফ্রান্স, ইটালি এবং সুইট্জারল্যাণ্ডে প্রথম কাগজের প্রচলন হয়। ১৫৮৮ খৃষ্টাব্দে জন্ স্পিল্ম্যান্ (John Speilman) নামে একজন জার্ম্মাণ ইংল্যাণ্ডে সর্ব্ব প্রথম কাগজ প্রস্তুত করিয়াছিলেন। সাম্রাজ্ঞী এলিজাবেথ জন্ স্পিল্ম্যান্কে নাইট (Knight) উপাধিতে ভূষিত করিয়াছিলেন।

শিলুম্যানের তৈরী কাগজ ছিল বাদামী রঙের। খুব উৎকৃষ্ট এবং সাদা কাগজ ওলন্দাজ ও ফরাসী-দের নিকট হইতে ইংরাজেরা কিনিয়া লইতেন।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত সব দেশেই হাতে কাগজ প্রস্তুত হইত। ১৮০০ খৃষ্টাব্দ হইতেই কিন্তু যন্ত্রের সাহায্যে কাগজ তৈরী হইতে পারে কি-না, সে বিষয়ে চেষ্টা ও যত্ন চলিতেছিল।

১৮২৫ খৃষ্টাব্দে সর্ব্ব প্রথম কলে কাগজ প্রস্তুত হইতে থাকে। সেই প্রথম অবস্থায় প্রতি মিনিটে

গ্রীকৃদিগের লিখিত বিবরণে পাওয়া যায়। তারপর 'তুলট' কাগজের কথা তোমরা নিশ্চয়ই শুনিয়া থাকিবে। আমাদের ভারতবর্ষে এক সময়ে কাশ্মীর কাগজের জন্ম প্রসিদ্ধ ছিল। সেখান হইতে ভারতের অন্যান্য প্রদেশে কাগজ প্রেরিত হইত। তবে ভারতবর্ষে ঠিক্ কোন্ সময় হইতে কাগজের ব্যবহার চলিতেছে, তাহা বলা কঠিন। আবার অনেকের মতে পঞ্চদশ খৃষ্টাব্দ হইতেই ভারতে কাগজের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। সে সময়ে যে সকল



ছেড়া নেকড়া প্রভৃতি কাটাই-কল

আট হস্ত প্রশস্ত এবং ৩৩০ হস্ত দীর্ঘ কাগজ প্রস্তুত হইত। তারপর ক্রমশঃ কাগজ প্রস্তুত-প্রণালীর কত যে উন্নতি হইয়াছে, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। এখন কাগজের কলগুলিতে সমস্ত প্রক্রিয়াই যন্ত্রের সাহায্যে সম্পন্ন হয়।

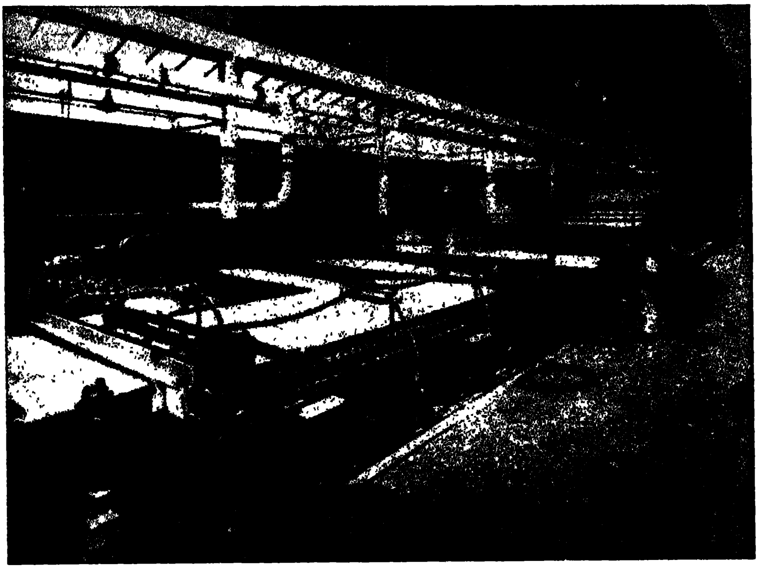
সে অনেক দিন আগে—খৃষ্ট-জন্মের ৩০০ বৎসর পূর্ব্বে এদেশে এক প্রকার 'তুলা চাপড়ান' জিনিসের উপর যে ব্যবসায়ীরা হিসাব লিখিতেন, সে কথা

বিদেশী ভ্রমণকারীরা আমাদের দেশে আসিয়াছেন, তাঁহারা ভারতবর্ষের কোন্ কোন্ স্থানে যে তালপাতার পরিবর্ত্তে কাগজের ব্যবহার প্রচলিত ছিল, সে কথা লিখিয়া গিয়াছেন। মোগল সম্রাট আকবরের সময় কাশ্মীর হইতে ভারতের অন্যান্য স্থানে কাগজ প্রস্তুত-প্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। ১৮৪০ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত প্রতি বৎসর চীনদেশ হইতে বহু টাকার কাগজ ভারতবর্ষে আসিত। ঐ

সময়েই ভারতের প্রায় সকল প্রদেশেই অল্পাধিক পরিমাণে কাগজ কোনও প্রকার যন্ত্রাদির সাহায্য ব্যতীতও হাতে প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করে।

এখনও ভারতবর্ষের কোন কোন স্থানে হাতে কাগজ তৈরী হয়। পূর্ব্ববঙ্গে বিক্রমপুরের আড়িয়ল গ্রামে 'কাগজী'রা (কাগজ তৈরী করে বলিয়া তাহাদের নাম 'কাগজী' হইয়াছে) এখনও হাতে কাগজ প্রস্তুত করে।

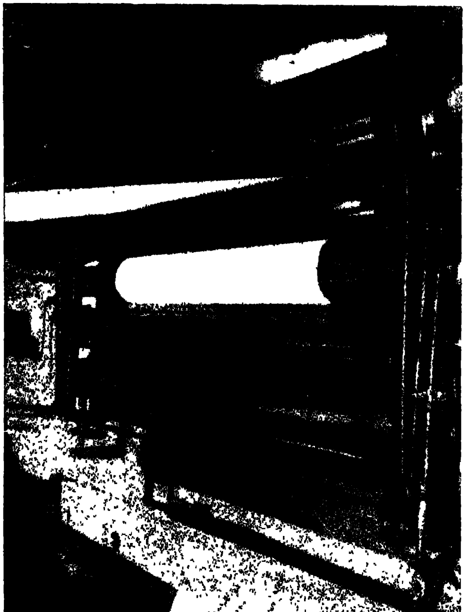
ভারতবর্ষে প্রথম কাগজের কল ১৮৭০ খৃষ্টাব্দে বালি গ্রামে স্থাপিত হয়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুরে একটি ছোট রকমের কাগজের কল ছিল। সেই জন্যই 'শ্রীরামপুরি কাগজ' কথাটা চলিয়া আসিতেছে। শ্রীরামপুরের হাতে তৈরী এক প্রকার দেশীয় সাদা কাগজ হইতেও 'শ্রীরামপুরি কাগজ' নামের সৃষ্টি হওয়া অসম্ভব নয়। Bally Paper Mill-ই হইতেছে ভারতবর্ষের প্রথম কাগজের কল। প্রথম অবস্থায় মাত্র একটি কল লইয়া এই কাগজের কারখানার কাজ আরম্ভ হয়, পরে বালির কাগজের এইরূপ প্রচার হইতে থাকে যে, বালির কারখানায় চারিটি কল চলিতে থাকে এবং প্রতি বৎসর ৫০০০ হাজার টন কাগজ সেখানে উৎপন্ন হইত। কিন্তু বরাবর কলের অবস্থা ভাল চলিল না, ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে এই কল উঠিয়া গেল। বালির কারখানার দুইটি কল টিটাগরের কাগজের কল-ওয়ালারা কিনিয়া নিলেন। টিটাগরের কাগজের কল (Titaghur) ১৮৮২ খৃষ্টাব্দে প্রথম স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৪ সালে তিনটি কল লইয়া Titaghur Paper Mills-এর কাজ আরম্ভ হয়। অনেক দিন পরে ১৮৯২ খৃষ্টাব্দ হইতে ১৮৯৪ খৃষ্টাব্দের মধ্যে 'ইম্পিরিয়াল পেপার মিল কোম্পানী' কর্ত্তৃক হুগলী নদীর তীরে কাঁকিনাড়া নামক স্থানে তৃতীয় কাগজের কল স্থাপিত হয়। কিন্তু এক্ষেত্রে মিলের কার্য্য বিফল হয় এবং ১৯০৩ খৃষ্টাব্দে টিটাগড় কোম্পানী কাঁকিনাড়ার মিলটিকে কিনিয়া লয়। বর্ত্তমান সময়ে টিটাগড় ও কাঁকিনাড়া উভয় মিলের



কাগজ তৈরীর কল

একত্রে আটটি মেসিন আছে এবং বৎসরে ইহারা ২০,০০০ টন কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। ১৮৯২ খৃষ্টাব্দের প্রায় ত্রিশ বৎসর পরে 'ইণ্ডিয়া পেপার পাল্প কোম্পানী লিমিটেডে'র (India Paper Pulp Company Ltd.) উদ্যোগে নৈহাটী মিলে কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। এই কোম্পানীটি ১৯১৮ খৃষ্টাব্দে বাঁশের ছাল ও আঁস হইতে কাগজ প্রস্তুতের জন্য:প্রথমে স্থাপিত হইয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহার একটি মাত্র মেসিন আছে এবং বৎসরে ২,৭৫০ টন কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। 'বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানী' (Bengal Paper Mill Co.) একটি প্রসিদ্ধ কাগজের কল।

১৮৭৯ খৃঃ অব্দে 'আপার ইণ্ডিয়া কুপার পেপার মিল' নামক সর্ব্ব পুরাতন কাগজের কলটি লক্ষ্ণৌ সহরে স্থাপিত হয়। ১৮৮২ খৃঃ অব্দে ইহা একটি মাত্র কল লইয়া কার্য্য সুরু করে; ১৮৯৪ খৃঃ অব্দে আর একটি নূতন মেসিন কেনা হয়। এই মেসিনগুলির এক একটি বৎসরে ৪০০০ টন কাগজ প্রস্তুত করিতে পারে কিন্তু বর্ত্তমানে ইহার একটি মাত্র ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ১৮৮১ খৃঃ অব্দে মহারাজা সিন্ধিয়া গোয়ালিয়রে একটি মাত্র মেসিন লইয়া কাগজের কল স্থাপিত করেন কিন্তু তাহাতে কোন লাভ না হওয়ায় ঐ মিল প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। কয়েক বৎসর বন্ধ থাকিবার পর 'বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানী লিমিটেডে'র কর্ত্তৃত্বাধীনে যুদ্ধ শেষের সময় উহা পুনরায় খোলা হয়। ১৯২২ খৃঃ অব্দে ইহা একেবারে বন্ধ হইয়া যায় এবং মেসিনটি 'রাণীগঞ্জে বেঙ্গল পেপার কোম্পানী'র মিলে স্থানান্তরিত হয়। ১৮৮৫ খৃঃ অব্দে দাক্ষিণাত্য-প্রদেশে কাগজের (The Deccan Paper Mill) কল স্থাপিত হয় এবং ১৮৮৭ খৃঃ অব্দে পুণাতে কাগজ প্রস্তুত আরম্ভ হয়। ইহারও মেসিন মাত্র একটি এবং উহাতে ১,৭০০ টন কাগজ বৎসরে প্রস্তুত হইত। কয়েক বৎসর চলিবার পর ১৯২৪ খৃঃ অব্দের মার্চ্চ মাস হইতে ব্যবসায় মন্দা হইয়া পড়ার সঙ্গে সঙ্গে এই মিলটি বন্ধ হইয়া যায়।



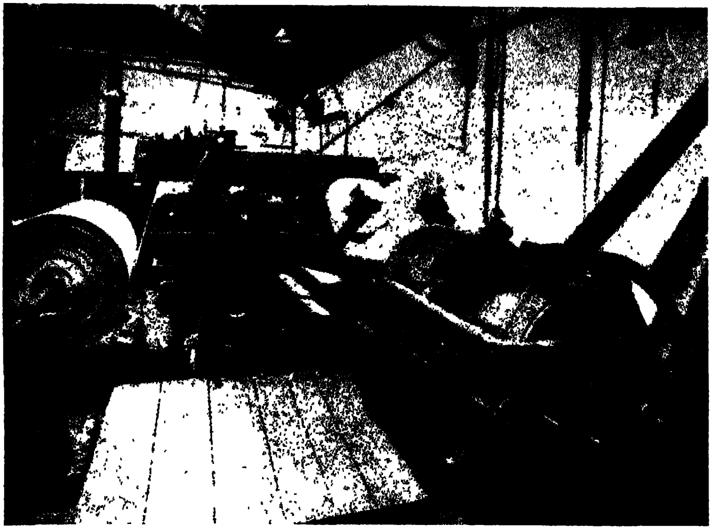
কাগজ মসৃণকরিবার কল

অন্যান্য কাগজের মিলগুলির মধ্যে 'বেঙ্গল পেপার মিল কোম্পানী লিমিটেডে'র স্থাপিত রাণীগঞ্জ মিলই সর্ব্বাপেক্ষা প্রসিদ্ধ। এই কোম্পানী ১৮৮৯ খৃষ্টাব্দে স্থাপিত হয় এবং ১৮৯১ খৃষ্টাব্দে একটি মাত্র মেসিন লইয়া ইহার কাজ আরম্ভ হয়। ১৮৯২, ১৯০০, এবং ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আরও তিনটি নূতন মেসিন আনা হয়। এই মিল বৎসরে, ৪,৮০০ টন কাগজ প্রস্তুত করিয়া থাকে। এতদ্ব্যতীত ভারতবর্ষে আরও তিনটি ছোট ছোট কাগজের কল আছে, তবে

তাহারা তেমন উল্লেখযোগ্য নহে। দুইটি বোম্বেতে আর তৃতীয়টি ত্রিবাঙ্কুর রাজ্যের পুণলুর নামক স্থানে। সস্তা, সাধারণ কাগজ এই মিলগুলিতে প্রস্তুত হয় মাত্র। ঐ সব কলে ৩৩,০০০ হাজার টনের বেশি কাগজ প্রস্তুত হওয়া সম্ভবপর নহে। কিছু দিন হইল 'কর্ণাটক মিল কোম্পানী' কর্তৃক রাজমাহেন্দ্রিতেও (Rajmahudry) একটি কাগজের কল স্থাপিত হইয়াছে। এই কোম্পানী Straw pulp বা তৃণমণ্ড হইতে প্রতি বৎসর ১,৬০০ টন হইতে ৩,০০০ টন পর্য্যন্ত কাগজ প্রস্তুত করিতে পারিবেন। ইহারা বাঁশের আঁশ হইতেও কাগজ তৈরী করিবেন। সাহারাণপুরে কাগজের কল 'পাঞ্জাব পেপার মিল কোম্পানী' (Punjab Paper Mill Company) স্থাপন করিতেছেন। এই কলে প্রতি বৎসর ৬,০০০ টন কাগজ তৈরী হইবে। এই কল দুইটির কাজ চলিলে ভারতবর্ষের সব কয়টি কাগজের কল হইতে প্রতি বৎসর ৪৩,০০০ হাজার টন কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে।

বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে কাগজ প্রস্তুতেরও অনেক উন্নতি হইয়াছে। আমরা এখন নানা প্রকারের কাগজ ব্যবহার করিতেছি। এখানে কিরূপে কলে কাগজ প্রস্তুত হয়, সে কথা বলিতেছি।

এসপার্টোগ্রাস (Espartograss) নামক এক প্রকার তৃণ স্পেনদেশে প্রচুর পরিমাণে জন্মে এবং ইহা কাগজ তৈরীর জন্য ব্যবহৃত হয়। তা ছাড়া পাট, শণ, খড়, বাঁশ, কাঠ, ছিন্ন-বস্ত্র প্রভৃতি হইতে কাগজ প্রস্তুত হয়। প্রস্তুতকারকেরা প্রথমে এই গুলিকে প্রকারভেদে ভিন্ন ভিন্ন অংশে বিভক্ত করিয়া লয়।



কাগজ তৈরী হইয়া গেলে উহা কিরূপে রোলারে জড়াইয়া যায় তাহার চিত্র

এই প্রক্রিয়ার উপর কোন্ শ্রেণীর কাগজ প্রস্তুত হইবে, তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্ভর করে। তারপর উত্তমরূপে পরিষ্কৃত করিয়া কলের সাহায্যে অতি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র খণ্ডে চূর্ণ করে এবং তাহাকে জল মিশ্রিত করিয়া মণ্ডের ন্যায় প্রস্তুত করে।

এখানে যে ছবিগুলি দেখিতে পাইতেছ, তাহার কোন কলের কাজ হইতেছে জীর্ণ বস্ত্র, খড়, কুটা এই সব কাটিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া ফেলা। প্রথম অবস্থায় কাগজ তৈরীর মাল-মসলাগুলি কষ্টিক সোডা

(Caustic Soda) দিয়া ধুইয়া ফেলা হয়, এই ধোয়া ব্যাপারটাও কলের সাহায্যেই হইয়া থাকে। এই ধোয়া কাজটা অনেকক্ষণ চলে। এই ভাবে ধোয়ার পর মণ্ড প্রস্তুত হইয়া থাকে। মণ্ড প্রস্তুত হইলে পর উহা কতকগুলি বিস্তীর্ণ সমতলা ছাঁচে ঢালিয়া দেয়। সেই ছাঁচ বা কলের নাম চালুনী বা ঝাঁঝরী কল। এই ঝাঁঝরী কলের ঝাঁকানীতে মণ্ডের জলীয় অংশ বাহির হইয়া যায়। তখন দেওয়া হয় চূর্ণন যন্ত্রে। ঐ যন্ত্রের ইংরাজী নাম—Paper-Reeling Machine. তারপর সেইগুলি বেশ শক্ত হইয়া উঠিলে পর কাগজ তৈয়ার করিবার যন্ত্রের উপর দেওয়া হয়। সেই যন্ত্রের নাম হইতেছে কাগজ তৈরী কল (Paper-Making Machine)। ছবিতে দেখ—কাগজের মণ্ডগুলি বিস্তীর্ণ সমতল ছাঁচে ঢালিয়া দেওয়া হইয়াছে। এই ভাবে কাগজ প্রস্তুত হইলে পর এই ছাঁচগুলি উপর্য্যুপরি রাখিয়া, সর্ব্বসমেত অতি প্রবল চাপে পেষণ করে। এই যন্ত্রের নাম Finishing Machine বা পরিসমাপ্ত যন্ত্র। এই যে কাগজ প্রস্তুত হইল, উহা কিন্তু তখনই লিখিবার উপযোগী হইল না। উহাতে ভাত, কচু, আলু প্রভৃতির মাড় দিয়া, পুনর্ব্বার শুকাইয়া লইতে হয়, নতুবা লিখিবা-মাত্র চুপ্সিয়া যায়। এইরূপে কাগজ প্রস্তুত হইলে, তাহার প্রান্তভাগ সমান ভাগে কাটিয়া বিক্রয়ের জন্য পাঠাইয়া দেওয়া হয়। কোন রঙিন কাগজ প্রস্তুত করিতে হইলে মণ্ডের সহিত রং মিশ্রিত করিতে হয়। এখানে কাগজ প্রস্তুত করিবার যে প্রক্রিয়ার কথা বলা হইল, কেবল মাত্র হস্ত দ্বারা সেই সমস্ত কার্য্য করিতে হইলে, কাগজ এত দুর্ম্মূল্য হইত যে, সাধারণ ক্রেতার পক্ষে তাহা ক্রয় করা সহজ হইত না। কিন্তু বিজ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই সমস্ত কার্য্যই এখন কলের সাহায্যে সম্পন্ন হইতেছে। সেইজন্য কাগজের মূল্য এত অল্প। কাগজের সৃষ্টি হওয়াতে মানুষের যে কত উপকার হইয়াছে, তাহা তোমরা তো প্রত্যহই বুঝিতে পারিতেছ।

হাতে তৈরী কাগজের মূল্য খুব বেশি। সেই সব দামী কাগজ মূল্যবান্ দলিল-পত্র, নোট ইত্যাদির জন্য প্রস্তুত হয়। সংবাদপত্রে ব্যবহৃত কাগজের নাম 'News Print'—এই কাগজ দৈনিক সংবাদ-পত্রের জন্য প্রস্তুত হয়—ইহা কাঠের মণ্ড হইতে তৈরী হইয়া থাকে। Wood-pulp ক্যানাডার নোভা স্কোটিয়া (Nova Scotia) নামক স্থান হইতে সংগৃহীত হয়।

আজকাল নানাদেশে নানা কাগজের কল আছে। আর কাগজও আছে নানা শ্রেণীর এবং তাহাদের নামই বা কত রকমের যে তাহার অবধি নাই। কাগজ-শিল্প একটি লাভজনক ব্যবসায়। সাধারণতঃ ছাপিবার কাগজ (Printing paper), মোড়কের কাগজ (Wrapping paper), লিখিবার খুব ভাল কাগজ (Writing paper), ইত্যাদি আমরা ব্যবহার করি। তারপর ছাপা ও লেখার কাগজ ছাড়াও বিক্রয়ের জিনিষ মুড়িবার জন্য, ঘর সাজাইবার জন্য, বই বাঁধিবার জন্য, ঔষধের বাক্সের জন্য আমরা পেষ্টবোর্ড (Paste Board) ব্যবহার করিয়া থাকি। তবে মুদ্রাঙ্কনের জন্যই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক পরিমাণে কাগজ ব্যবহৃত হয়।

ভারতবর্ষে বিদেশ হইতেই কোটি কোটি টাকার কাগজ আসে। আমেরিকার যুক্তরাজ্য, জার্ম্মেণী, নরওয়ে, সুইডেন, ফ্রান্স, অষ্ট্রিয়া, স্পেন, ইটালি, জেকোস্লোভাকিয়া, রুশিয়া, সুইটস্‌ল্যাণ্ড, ফিন্‌ল্যাণ্ড, সুইডেন, হাঙ্গারী, স্লাবোনিয়া, নিউজিল্যাণ্ড, তুরস্ক, জাপান প্রভৃতি দেশ হইতে ভারতবর্ষে প্রচুর পরিমাণে কাগজ আসে।

ভারতবর্ষ ও ব্রহ্মদেশে যোজনের পর যোজন বিস্তৃত বাঁশবন উপেক্ষিত ভাবে পড়িয়া আছে। ঐ সব বাঁশ হইতে সহজেই কাগজ প্রস্তুত হইতে পারে। তোমরা শুনিয়া আশ্চর্য্য হইবে যে, এক ক্যানাডাদেশে যে মহাবন পড়িয়া আছে, তাহার কাষ্ঠ হইতে পৃথিবীর সব দেশে প্রায় এক হাজার বৎসর পর্য্যন্ত যে কাগজের প্রয়োজন হইবে, ততটা পরিমাণ কাগজ প্রস্তুত হইতে পারিবে। বাঙ্গালা-দেশে বাঙ্গালীর মূলধনে পরিচালিত একটিও কাগজের কল নাই। একবার সেইরূপ চেষ্টা হইয়াছিল বটে কিন্তু তাহা কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

কি ও কেন

স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে কে বড় আর কে ছোট?

২১৬০ পৃষ্ঠার পর

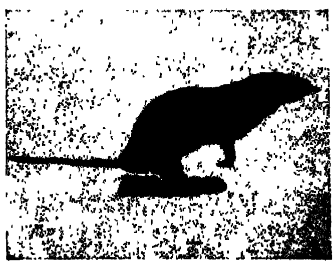
তোমরা কি আমার এই প্রশ্নের উত্তর দিতে পার? বোধ হয় পার না। আমার তো মনে হয়, তোমাদের মধ্যে অনেকেই বলিবে—"স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে হাতীই সব চেয়ে বড়।" কিন্তু হাতীকে যদি স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বড় বল, তাহা হইলে তোমাদের উত্তর ঠিক্ হইবে না। তিমি মৎস্য হইতেছে স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তিমি মাছ জলে বাস করিলেও ইহারা স্তন্যপায়ী জন্তুর অন্তর্ভূত। অন্যান্য স্তন্যপায়ী জন্তুদের মত তিমি মাছেরাও শাবক প্রসব করে এবং শাবকেরা স্তন্য পান করিয়া জীবন ধারণ করে। ছবিতে দেখ, তিমি-শাবকেরা কেমন সুন্দরভাবে মায়ের বুকের



তিমি-শাবকেরা স্তন্য পান করিতেছে

স্তন্য পান করিতেছে। সুতরাং তিমি মাছই যে সর্ব্বাপেক্ষা বড় স্তন্যপায়ী জন্তু, একথাটা তোমরা বুঝিতে পারিলে।

তিমি মাছ যেমন স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে বড়। তেমনি ইংল্যাণ্ডের বামন-ছুঁচো (Pigmy Shrew) নামে একটি প্রাণী হইতেছে স্তন্যপায়ী জন্তুদের মধ্যে সবচেয়ে ছোট। আফ্রিকায়ও এই জাতীয় জন্তু আছে। এই জন্তুর গায়ের রঙ বাদামী ও লাল, এই উভয়ের মিশ্রণ দেখা যায়। ইহাদের ল্যাজটি



বামন-ছুঁচো

কিন্তু বেশ লম্বা। ল্যাজের সাহায্যে ইহারা ঘাস, পাতা ও গুল্মের ছোট ছোট শাখা সরাইয়া কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি খাদ্য খুঁজিয়া বেড়ায়। ইহাদের দাঁতের সংখ্যা মানুষের দাঁতের সমান এবং দাঁতগুলি এত ছোট যে, পরকলার (Lens) সাহায্য ব্যতীরেকে সেগুলি খালিচোখে কেহই দেখিতে পারে না। এখন বুঝিলে তো কে বড় আর কে ছোট?





['শিশু-ভারতী'তে তোমরা ভারতবর্ষের হতিহাস সম্বন্ধে জানিতে পারিতেছ। আমরা এইবার তোমাদের কাছে ভারতবর্ষের ভৌগলিক বৃত্তান্ত বলিব। ভারতবর্ষ যে কত বড় দেশ, তাহা তোমরা সহজে ধারণা করিতে পারিবে না। ইহা এত বড় বিস্তীর্ণ যে, ইহাকে একটি মহাদেশ বলিলেই চলে। প্রকৃতপক্ষে ভাবতবর্ষের বিশালতা, ভারতের প্রাকৃতিক বৈচিত্র্য, ভারতের শস্য-সম্পদ ভারতবর্ষের বিভিন্ন জন-সমাজ, ভারতের জ্ঞান-বিজ্ঞান ও প্রাচীনত্বের বিষয় চিন্তা করিলে বিস্মিত হইতে হয়। পৃথিবীর কোন দেশই ভারতবর্ষের ন্যায় বিরাট্ প্রাকৃতিক সম্পদে গরীয়ান্ নহে। ভারতবর্ষ আমাদের জন্মভূমি।]

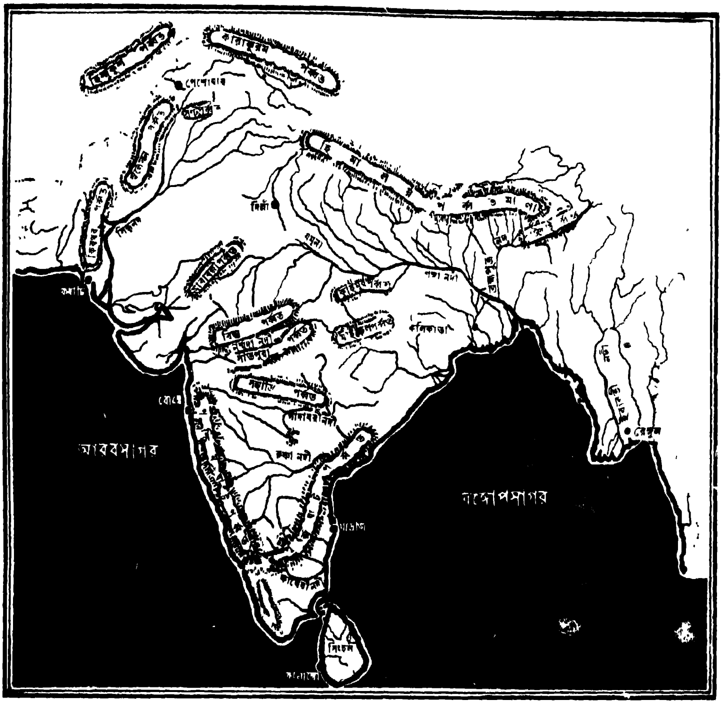
ভারতের পর্ব্বত ও নদী

প্রথম যখন শিশু আসিয়া পৃথিবীতে জন্মগ্রহণ করে, তখন তাহার কাছে পৃথিবীর সব কিছুই নূতন বলিয়া মনে হয়। এই আলো, এই বাতাস, এই তরুলতা, এই নীল আকাশ, সূর্য্য, চন্দ্র গ্রহ-নক্ষত্র এ সকলের কিছুই সে জানে না। কিন্তু তার চেয়ে বয়সে বড় চার পাঁচ বছরের খোকা ও খুকুরা কিন্তু অনেক বেশি জানে। সেই যে অতটুকু শিশুকাল হইতে মানুষের শিক্ষা আরম্ভ হয়, সে শিক্ষা সারাজীবন ব্যাপিয়া চলে। ক্রমে সে যেমন মা, বাবা ও আত্মীয়-স্বজনকে চিনিতে শিখে, তেমনি আপনার বাড়ি-ঘর, লোকজন ও গ্রাম সম্বন্ধেও ক্রমশঃ তাহার জ্ঞান বৃদ্ধি হইতে থাকে। কিশোর-ছেলেরা গ্রামের বাহিরের অনেক সংবাদ রাখে। তারপর স্কুলে পড়িয়া মানচিত্র দেখিয়া একে একে দেশ-বিদেশের পরিচয় পায়। তখন বুঝিতে পারে—মহাসিন্ধু ঘেরা এ ধরণী নেহাৎ ছোট নয়। তারপর যখন আরও বড় হয় এবং দেশ ভ্রমণের সুযোগ লাভ করে, তখন সে নৌকায় বা ষ্টীমারে চড়িয়া, রেল গাড়ীতে ভ্রমণ করিয়া নিজের বাড়ি ও গ্রাম ছাড়িয়া যখন দূর দেশে যায়, তখন নদ-নদী গিরি-পর্ব্বত দেখিয়া উপলব্ধি করিতে পারে—কি সুন্দর এই পৃথিবী! আর কত সুন্দর আমাদের দেশ এই ভারতবর্ষ।

ভারতবর্ষের ভৌগোলিক বৃত্তান্তের সহিত এইবার তোমাদিগকে পরিচিত করিয়া দিতেছি।

এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ ভাগে অবস্থিত যে বৃহৎ দেশটি ক্রমশঃ সরু হইয়া ভারত-মহাসমুদ্রের মধ্যে বহুদূর পর্য্যন্ত প্রসারিত হইয়াছে, তাহার নাম ভারতবর্ষ। মুসলমানেরা এদেশে আসিয়া ইহার নাম দিয়াছিলেন হিন্দোস্থান। এই হিন্দোস্থান হইতে পরে ইহা 'হিন্দুস্থান' নামে পরিচিত

হয়। ইউরোপীয়েরা নাম দিয়াছেন ইণ্ডিয়া (India)। এসিয়া মহাদেশের দক্ষিণ দিকে তিনটি উপদ্বীপ আছে। পশ্চিম দিকে আরব (Arabia) উপদ্বীপ, পূর্ব্বদিকে মালয উপদ্বীপ (Malaya Peninsula), মধ্যস্থলে ভারত-উপদ্বীপ। ভারতবর্ষ ও মালয় উপদ্বীপের পর্ব্বতরাশি দ্বারা বিভক্ত থাকায় বর্ত্তমানে ভারতবর্ষের মধ্যে এই দুইটিকেও ধরা হয়, কেননা শাসনের দিক দিয়া এই দুইটি এখনও ভারতবর্ষের অন্তর্ভূক্ত। কিন্তু শীঘ্রই ব্রহ্মদেশ ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছে। এ জন্যই ভারতবর্ষের বিস্তৃতির পরিমাণ

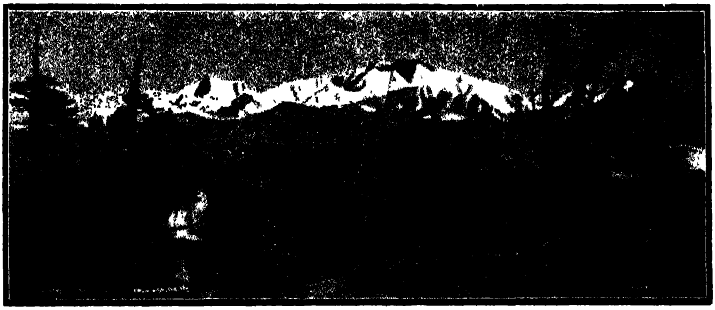


ভারতের মানচিত্র—পর্ব্বত ও নদী

উত্তরভাগে ব্রহ্মদেশ। এই দেশ অতি বৃহৎ। ইহার পরিমাণ ফল ১,৬০,০০০ বর্গ মাইল। উত্তরদক্ষিণে ইহার দৈর্ঘ্য ২,০০০ মাইল। পূর্ব্ব পশ্চিমে ২,৫০০ মাইল। এই বিস্তৃতির সম্বন্ধে এইটুকু বলিবার আছে। ভারতবর্ষের পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ ও পশ্চিমে বেলুচিস্তানের ২,৫০০ মাইল ধরা হয়। রুশিয়া দেশটিকে যদি ইউরোপ মহাদেশ হইতে বাদ দেওয়া যায়, তাহা হইলে যতখানি থাকে, ভারতবর্ষের আকার প্রায় তাহার সমান। ভারতবর্ষের লোক-সংখ্যা প্রায় ছত্রিশ কোটি। দিন দিন লোক-সংখ্যা আরও বাড়িয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষের সীমার কথা বলিতে গেলে প্রথমেই হিমালয় পর্ব্বতের কথা মনে পড়ে। আমাদের দেশের কবিরা হিমালয় পর্ব্বতের শোভা ও সৌন্দর্য্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন। বিশ্ব-কবি রবীন্দ্রনাথ ভারত-ভূমিকে লক্ষ্য করিয়া গাহিয়াছেন—

অয়ি ভুবন-মনোমোহিনি!
নির্ম্মল সূর্য্যোকরোজ্জ্বল-ধরণি,
জনক-জননী-জননি।
নীল-সিন্ধু-জল ধৌত চরণতল,
অনিল-বিকম্পিত শ্যামল অঞ্চল,
অম্বর-চুম্বিত ভাল হিমাচল,
শুভ্র তুষার কিরীটিনি।



শুভ্র তুষার কিরীটিনি —দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে

প্রথম প্রভাত উদিত তব গগনে,
প্রথম সাম-রব তব তপোবনে,
প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
জ্ঞান, ধর্ম্ম, কত পুণ্য-কাহিনী
চির কল্যাণময়ি। তুমি ধন্য—
দেশ বিদেশে বিতরিছ অন্ন;
জাহ্নবী যমুনা—বিগলিত করুণা
পুণ্য পীযুষ স্তন্য-বাহিনী

ভারতবর্ষের সীমার সম্বন্ধে এই সঙ্গীতটি হইতে অনেক কথাই জানিতে পার। হিমালয় পর্ব্ব (হিমবন্ত) ভারতবর্ষের উত্তর সীমারূপে বিরাজমান। হিমাচলের অত্যুচ্চ শিখরগুলি কাশ্মীর হইতে আসাম পর্য্যন্ত ভারতবর্ষের উত্তর সীমা রক্ষা করিতেছে। দক্ষিণ, পূর্ব্ব ও পশ্চিমে ভারত-মহাসাগর (দক্ষিণ জলনিধি) এবং তাহার দুইটি শাখা আরব সাগর (পশ্চিম পয়োধি) এবং বঙ্গোপসাগর (পূর্ব্বসাগর) ভারতবর্ষকে বেষ্টন করিয়া আছে। উত্তর-পূর্ব্ব এবং উত্তর-পশ্চিমে হিমালয়ের নাতি উচ্চ শাখা পর্ব্বত-শ্রেণী সমুদ্র উপকূল পর্য্যন্ত চলিয়া আসিয়া ভারতের সীমা গঠন করিয়াছে। হিমালয়ের উত্তরভাগে কয়েকটি পর্ব্বত শ্রেণী আছে। সেই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে কারাকোরাম, (Karakoram Range), হিন্দুকুশ (Hindukush) বিশেষ প্রসিদ্ধ। উত্তর পশ্চিম দিকে সুলেমান (Sulaman Range), কিরথর পর্ব্বতশ্রেণী (Kirthar Range) আর উত্তর পূর্ব্বে পাটকোই পর্ব্বতমালা আছে। এই সকল পর্ব্বত অতিক্রম করা বড় সহজ নহে।

হিমালয় পর্ব্বতের দৈর্ঘ্য ১,৬০০ মাইল এবং প্রশস্ততা ২০০ মাইল। আল্পসই বল, আন্দিসই বল, পৃথিবীর কোন পর্ব্বতই কি শোভায়, কি উচ্চতায় হিমালয়ের সঙ্গে তুলনীয় নহে। হিমালয়ের উচ্চতা আল্পস পর্ব্বতের উচ্চতার দ্বিগুণ এবং উহার দৈর্ঘ্য

আল্পসের পাঁচ গুণ। তোমরা গর্ব্ব করিয়া বলিতে পার—'কোন্ অদ্রি হিমাদ্রি সমান ?' এই পর্ব্বতের দক্ষিণ দিকে বিশাল ভারত। পূর্ব্বে চীন ও ব্রহ্মদেশ, পশ্চিমে আফগানিস্থান ও বেলুচিস্থান। দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে আরবসাগর, পূর্ব্ব পার্শ্বে বঙ্গোপসাগর।

ইংরাজ কবি কিপলিং (Kipling) ভারত মহাসাগর সম্বন্ধে লিখিয়াছেন—

"The Indian Ocean sets and smiles.
So soft, so bright, so blooming blue ;
There's not a wave for miles and miles
Excep' the Jiggle of the Screw '



ভারতের বন —দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে

উভয়ই ভারত মহাসাগরের বিস্তারিত অংশ। ঊর্দ্ধে অনন্ত নীল আকাশের বিস্তৃতি আর নিম্নে ভারত মহাসাগরের অসীম বিস্তার, ভারতবর্ষের প্রকৃতিক শোভা বৃদ্ধি করিয়াছে।

ভারত মহাসাগরের উজ্জ্বল নীল জল হাসিতেছে, তাহাতে একটিও ঢেউ নাই। শুধু জাহাজের ঝাঁকুনিই ইহার বুকে আলোড়িত করিতেছে।—কি সুন্দর বর্ণনা!

ভারতের পর্ব্বত ও নদী

ভারতবর্ষের মত উর্ব্বর ও সুন্দর দেশ পৃথিবীর মধ্যে অতি বিরল। এদেশের শোভা বলিয়া শেষ করা যায় না। কোথাও অত্যুচ্চ পর্ব্বত, কোথাও বিস্তৃত সমতল উর্ব্বর ভূমি, কোথাও নির্ঝর ঝর্ ঝর্ শব্দে উচ্চ পর্ব্বতের গা হইতে নামিয়া পড়িতেছে, কোথাও জলপ্রপাত, কোথাও বালুকাময় ভীষণ মরুভূমি, কোথাও হিংস্র-পশু পরিপূর্ণ ভয়-সঙ্কুল অরণ্যানী। একই সময়ে ভারতের কোথাও শীত, কোথাও গ্রীষ্ম, কোথাও বর্ষা, কোথাও হেমন্ত, এইরূপ বৈচিত্র্যের সমাবেশ।

ভারতবর্ষের উপকূল-রেখা বা সমুদ্রতট রেখা দৈর্ঘ্যে প্রায় ৩,৫০০ মাইল। তটভাগ সুদীর্ঘ হইলেও উপকূল ভাঙ্গিয়া সমুদ্র ইহার অভ্যন্তরে অধিক দূর অগ্রসর হয় নাই। এইজন্য বৃহৎ বৃহৎ অর্ণবপোত রাখিবার বা উহাদের আশ্রয়স্থল হইতে পারে এইরূপ সুবিধাজনক স্থান বেশি ছিল না বলিয়াই ভারতবর্ষের সমুদ্রতট রেখার মধ্যে স্বাভাবিক ভাবে বহু সংখ্যক সামুদ্রিক বন্দর বা পোতাশ্রয় গড়িয়া উঠে নাই।



গিরিপথ —দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে

প্রাচীনকালে জাহাজগুলি ছোট ছোট ছিল, কাজেই উপকূল রেখার অগভীর জল দিয়া অনায়াসে সে সমুদয় অর্ণবপোত যাতায়াত করিতে পারিত। ভারতের বাহিরেও নিরাপদে পণ্য-দ্রব্যাদি লইয়া নিকটবর্ত্তী দেশ বিদেশে গমনাগমন করিত। কাজেই সে সময়ে ভারতে সামুদ্রিক বন্দরের সংখ্যা নেহাৎ কম ছিল না—সম্ভবতঃ সেকালে

নদীর মোহনায় সমুদ্রের মুখে সে সমুদয় বন্দর অবস্থিত ছিল।

ভারতবর্ষের উপকূলে উপসাগর বেশি নাই। পশ্চিম দিকে সিন্ধু নদের মোহনা হইতে কিছুদূরে কাথিওয়ার একটি উপদ্বীপ। এই উপদ্বীপের উত্তরে কচ্ছ উপসাগর। এই উপসাগর অগভীর—ইহাতে অতি অল্প জল আছে। দক্ষিণে কাম্বে উপসাগর।

এই যে সমুদ্রের কথা বলিলাম, প্রাচীন কালে সমুদ্র ভারতবর্ষের তেমন কোন উপকারে লাগে নাই। সেকালে ভারতবর্ষের যে সকল বাণিজ্য-তরী দেশ-বিদেশে যাতায়াত করিত, তাহার সহিত বর্ত্তমান কালের অর্ণবপোতের তুলনাই হইতে পারে না। প্রায় পাঁচশত বৎসর কাল হইতে ভারতবর্ষের লোকের সহিত সমুদ্র-পথ দিয়া পৃথিবীর অন্যান্য জাতির সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপিত হইয়াছে এবং ব্যবসায়-বাণিজ্য চলিতেছে। অষ্টাদশ শতাব্দীতে পর্তুগীজ জাতি ভারতবর্ষে আসিয়াছিল। তাহাদের পর একে একে ওলন্দাজেরা, ফরাসী ও ইংরাজেরা এই জল-পথ দিয়াই ভারতবর্ষে আসিয়াছিলেন।

তোমাদের কাছে হিমালয় পর্ব্বতের কথা বলিয়াছি। উত্তর দিকে হিমালয়ের মত দুর্ভেদ্য পর্ব্বত শ্রেণী থাকায় উত্তর দিক্ দিয়া ভারতের সহিত কোন জাতির ব্যবসায়-বাণিজ্য বা সংবাদ আদান-প্রদান করা ও চলা-ফেরা বড় সহজ ছিল না। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত হইতে যাহাতে কোন প্রবল-জাতি এদেশে আসতে না পারে, সেজন্য ব্রিটিশ রাজশক্তি পেশোয়ার ও কোয়েটায় দুইটি সুদৃঢ় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়াও সৈন্য স্থাপন করিয়া দেশটিকে সুরক্ষিত করিয়াছেন। এই সকল অত্যুচ্চ পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্য দিয়া যে পথ আছে তাহাকে গিরিসঙ্কট (pass) বলে। খাইবার গিরিসঙ্কট (Khyber pass) ও টোচি পাস (Tochi pass) দিয়া আফগানিস্থানে যাওয়া যায়। উহার দক্ষিণে রহিয়াছে গোমাল গিরিপথ (Gomal pass)। তাছাড়া বোলান, জালাপ্পা গিরিপথ দুইটিও উল্লেখ-যোগ্য। এই সব গিরিপথে বেলুচিস্থানে যাওয়া যায়। অতি প্রাচীনকালে 'ইরাণ' ও 'তুরাণে'র অধিবাসীরা এই পার্ব্বত্য পথেই ভারতবর্ষে প্রবেশ করিয়াছে।

সিংহল ও ব্রহ্মদেশ

সিংহল বা লঙ্কা দ্বীপ ভৌগোলিক হিসাবে ভারতবর্ষের অতি নিকটে অবস্থিত হইলেও ইহাকে ভারতের অংশ বলিয়া মনে করা হয় না। প্রাচীনকালে ভারতের সহিত ইহার সম্বন্ধ থাকিলেও বর্ত্তমান রাষ্ট্রীয় হিসাবে উহা ভারত-সাম্রাজ্যের বহির্ভূত। ভারতবর্ষের বড়লাট বা ভারত-সচিবের শাসন-সম্পর্কে ইহার সহিত কোনও সম্বন্ধও নাই। ব্রহ্মদেশ সংযুক্ত থাকিলেও ভৌগলিক হিসাবে কিংবা অধিবাসিগণের জাতির দিক্ দিয়া ইহার সহিত ভারতের সম্বন্ধ অতি অল্প। ধর্ম্মের দিক্ দিয়া কিন্তু ব্রহ্মদেশের উপর ভারতের প্রভাব বিদ্যমান আছে।

ভারতবর্ষের প্রাকৃতিক বিভাগ

ভারতবর্ষকে ব্রহ্মদেশ ছাড়িয়া দিলে প্রধানতঃ তিন ভাগে বিভক্ত করা যাইতে পারে। **উত্তর দিকের পার্ব্বত্য ভূভাগ** - ভারতবর্ষের উত্তরে হিমালয় পর্ব্বতশ্রেণী দুর্ভেদ্য প্রাচীরের ন্যায় দাঁড়াইয়া আছে। কবি কালিদাস হিমালয় পর্ব্বতকে 'নাগাধিরাজ' এবং পৃথিবীর মানদণ্ডস্বরূপ বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন। হিমালয়ের শোভা ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। কত কবি, কত বৈজ্ঞানিক যে হিমালয়ের সৌন্দর্য্য ও বিবিধ সম্পদ সম্বন্ধে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না।—এই পর্ব্বতশ্রেণীর

অনেক গুলি শাখা-প্রশাখা রহিয়াছে। উত্তর দিকে কারাকোরাম ও হিন্দুকুশ, এই দুইটি পর্ব্বতশ্রেণী যুক্তভাবে আছে। এই শ্রেণীর সহিত পশ্চিম দিকে সুলেমান ও কিরথর পর্ব্বতশ্রেণীর যোগ আছে। পূর্ব্বদিকে পাটকোই পর্ব্বত শ্রেণীর সহিত হিমালয়ের সংযোগ রহিয়াছে। ভারতবর্ষের সমতলভূমি হইতে ক্রমে ক্রমে উচ্চ হইয়া এই পর্ব্বত তিনটি শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়াছে। সীমার অতি নিকটে অবস্থিত। হিমালয়ের সর্ব্বোচ্চ শিখরের নাম এভারেষ্ট (Everest) সমুদ্রতটরেখা হইতে ইহার উচ্চতা ২৯,১৪১ ফিট, কাহারও কাহারও মতে ২৯,০০০ ফিট। সে প্রায় পাঁচ মাইলেরও বেশি। এই উচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের অপর নাম গৌরীশঙ্কর। নেপালের পূর্ব্বপ্রান্তস্থিত কাঞ্চনজঙ্ঘার উচ্চতা হইতেছে ২৮,১৪৬ ফিট। তোমাদের মধ্যে যাহারা দার্জ্জিলিং গিয়াছ, তাহারা



কাঞ্চনজঙ্ঘা - দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে

প্রথমশ্রেণী উচ্চতায় ৩,০০০ হাজার ফিট এবং নিবিড় অরণ্যে পূর্ণ। পরের দুইটি শ্রেণী যথাক্রমে ৭,০০০ হইতে ২০,০০০ ফিট উচ্চ। ১৬,০০০ হইতে ১৯,০০০ ফিট উচ্চতার পরেই ধবল তুষারে পর্ব্বতের মস্তক আবৃত। কারাকোরাম, হিন্দুকুশ এবং সুলেমান পর্ব্বত-শ্রেণী ভারতবর্ষকে আফগানিস্তান হইতে বিভক্ত করিয়াছে।

হিমালয় পর্ব্বত শ্রেণীর মধ্যে কয়েকটি উচ্চশিখর আছে। এইগুলি ভারতবর্ষের নিশ্চয়ই কাঞ্চনজঙ্ঘা বা কিঞ্চিনজঙ্ঘা দেখিয়াছ। যেদিন আকাশ নির্ম্মল থাকে সেদিন কাঞ্চনজঙ্ঘার তুষার-ধবল-শৃঙ্গগুলির অপূর্ব্ব শোভা সকলকে মুগ্ধ করে। সূর্য্যের সোনালি কিরণে কাঞ্চনজঙ্ঘার শৃঙ্গগুলি ঝলমল করিতে থাকে। নেপালের পশ্চিম দিকে ধবলগিরি। এ কয়টি ছাড়া কৈলাস, নন্দাদেবী ও নাঙ্গাপর্ব্বত শিখর প্রধান। কারাকোরাম পর্ব্বতশ্রেণীর সর্ব্বোচ্চশিখরের নাম মাউন্ট গডউইন অষ্টিন (Mount Godwin

Austin) ২৮,২৬০ ফিট উচ্চ। মাউণ্ট গডউইন অষ্টিন শিখরও যে খুব উচ্চ তাহা বুঝিতে পারিতেছ। গডউইন অষ্টিন এই পর্ব্বত শিখর আবিষ্কার করিয়াছিলেন বলিয়া তাঁহার নামানুযায়ী এই শিখরের নাম হইয়াছে। এভারেষ্টের ন্যায় উচ্চ পর্ব্বতশৃঙ্গ পৃথিবীর কোথাও নাই। তোমরা সকলে জান যে সার্ভে বা জরিপ বিভাগের পূর্ব্বকার বড় সাহেব স্যার জর্জ্জ এভারেষ্ট নামে একজন ইউরোপীয় ভদ্রলোক এই শৃঙ্গটি আবিষ্কার করেন, সেজন্য তাঁহার নামে এই পর্ব্বত শৃঙ্গের নাম এভারেষ্ট হইয়াছে। কিন্তু একথাটি সত্য নহে। রাধানাথ শিকদার নামে একজন বাঙ্গালী ভদ্রলোক এই এভারেষ্ট পর্ব্বত চূড়া আবিষ্কার করিয়াছিলেন।

রাধানাথ ১৮১৩ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি সার্ভে আফিসে বা জরিপ বিভাগে কার্য্য করিতেন। এই কাজের জন্য তাঁহার সর্ব্বদা হিমালয়ের গভীর অরণ্যে ও দুর্গম পর্ব্বত-শিখরে যাতায়াত করিতে হইত। কয়েক বৎসর ধরিয়া তিনি হিমালয় পর্ব্বত সম্বন্ধে বিবিধ গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন। এই কাজ করিবার সময়ই তিনি গৌরীশঙ্কর শৃঙ্গের সন্ধান পান এবং একদিন হঠাৎ তাঁহার উপরওয়ালা কর্ম্মচারী স্যার এণ্ড্রু ওয়াহের ঘরে প্রবেশ করিয়া উচ্চৈঃস্বরে বলিলেন—"মহাশয়, আমি পৃথিবী সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শিখর আবিষ্কার করিয়াছি।" সাহেব রাধানাথ বাবুকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন,—"বেশ কথা, তাহা হইলে তুমি তাহা প্রমাণ করিয়া দেখাও।" রাধানাথবাবু অনেকদিন হইতেই এ বিষয়ের গবেষণায় নিযুক্ত ছিলেন, তিনি বেশ দক্ষতার সহিত প্রমাণ প্রয়োগ করিয়া সাহেবকে বুঝাইয়া দিলেন। রাধানাথবাবুর প্রমাণ দেখিয়া সাহেব খুব সন্তুষ্ট হইলেন, এবং স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন যে, রাধানাথবাবুই প্রথম পৃথিবীর এই উচ্চ পর্ব্বত চূড়া আবিষ্কার করিয়াছেন। সে সময়ে স্যার জর্জ্জ এভারেষ্ট (Sir George Everest)



কাঞ্চনজঙ্ঘা —দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে

ছিলেন সার্ভে বিভাগের বড় কর্ত্তা, কাজেই তাঁহার নাম অনুসারে এই সর্ব্বোচ্চ পর্ব্বত শৃঙ্গের নাম হইল এভারেষ্ট পর্ব্বত। বাঙ্গালী রাধানাথ এই পর্ব্বত চূড়ার আবিষ্কার করা সত্ত্বেও তোমরা তাঁহার নাম জান না। কিন্তু এই পর্ব্বত চূড়ার নাম কি দেওয়া উচিত ছিল বল দেখি? রাধানাথ শৃঙ্গ, ঠিক কি-না বল তো!

হিমালয়ের এই উচ্চশৃঙ্গ এভারেষ্ট আরোহণ করিবার জন্য আজ পর্য্যন্ত চারিবার চেষ্টা হইল। কিন্তু মানুষের চেষ্টা ও যত্ন সব বারই বিফল হইয়াছে। কতলোক যে এই হিমালয়-অভিযানে প্রাণ হারাইয়াছে, তাহার সীমা সংখ্যা নাই। ১৯৩৪ খৃষ্টাব্দে এরোপ্লেনের সাহায্যে পৃথিবীর সবচেয়ে উঁচু এই পর্ব্বতচূড়া অতিক্রম করিবার চেষ্টা করা হয়। বিহারের পূর্ণিয়া সহর হইতে এই যাত্রা আরম্ভ হইয়াছিল। পূর্ণিয়া হইতে হিমালয়ের দূরত্ব ১৫০ মাইল। এরোপ্লেন-যাত্রীরা তিন ঘণ্টার মধ্যে এভারেষ্ট পর্ব্বতের চারিদিক ঘুরিয়া সর্ব্বোচ্চ চূড়ার উপর উড়িয়া পূর্ণিয়াতে ফিরিয়া আসেন। তাঁহারা ৩৫,০০০ ফিট পর্য্যন্ত উপরে উঠিয়াছিলেন। সেই সময়ে ক্যামেরার সাহায্যে অনেক সুন্দর সুন্দর ছবি তুলিয়াছিলেন। সে সব চিত্র অতি চমৎকার—দেখিলে মুগ্ধ হইতে হয়।



দার্জ্জিলিংয়ের পথে বনভূমি —দার্জ্জিলিং হিমালয় রেলওয়ে কোম্পানীর সৌজন্যে



ব্রহ্মদেশ

২২১৮ পৃষ্ঠার পর

ছেগাইঙের সম্বন্ধে আর একটি কথা বলা আবশ্যক। এখানকার রেশমী কাপড়েরও বিশেষ প্রসিদ্ধি আছে। ছেগাইঙের উত্তর-পশ্চিমে Kaunghnuda নামে একটি মন্দির (Pagoda) আছে। সেই প্যাগোডাটি সপ্তদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত হইয়াছিল।

ইরাবতী ও মিৎঙ্গি (Myitnge) নদীর সংযোগস্থলে ব্রহ্মদেশের প্রাচীন রাজধানী **আভানগরী** অবস্থিত। প্রায় চারিশত বৎসরকাল আভানগরী ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল।

মিনছেইঙ (Myinsaing) নামক স্থানে শান-সর্দ্দার বাস করেন। পূর্ব্বে ইহাদের অসাধারণ প্রতিপত্তি ছিল। আভার পূর্ব্বে শানদের রাজধানী ছিল পানিয়া নামক স্থানে।

ডফ্রিন দুর্গের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে ও মান্দালয়ের পাহাড়ের নীচে ক্যাথোদ (Kathodaw) নামক স্থানে অনেকগুলি ছোট ছোট মন্দির আছে। যদিও দেশী লোকেরা এবং বিদেশী পথিকেরা ঐগুলির সংখ্যা বলেন ৪৫০টি, প্রকৃতপক্ষে কিন্তু উহা হইতে অনেক বেশি। ঐখানে মোট ৭২৯টি মন্দির আছে। রাজা থিবর একজন ধর্ম্মপ্রাণ খুল্লতাত এই মন্দিরগুলি তৈয়ারি করিয়াছিলেন।—এইসব প্যাগোডার গায়ে একখানি করিয়া শিলা-ফলক আছে, তাহাতে বৌদ্ধধর্ম্মের কথা লেখা রহিয়াছে। এইটিকে ব্রহ্মের ৭২৯ প্যাগোডার বীথি বলিলেই ঠিক্ হয়।

পাগান—ব্রহ্মদেশের মধ্যে ইহা একটি দেখিবার মত স্থান। হাজার বৎসর আগে পাগান ছিল এদেশের রাজধানী। পূর্ব্বের কোন গৌরব চিহ্ন এখন আর নাই। কতকগুলি প্যাগোডা ও মন্দির, ইটের প্রাচীর, পুরাণ বাড়ীঘরের চিহ্ন, ভগ্ন তোরণ—এই সব মাত্র দেখিতে পাওয়া যায়। নদীর পাড়ে আট মাইল পর্য্যন্ত প্রাচীনকালের ধ্বংস চিহ্ন চোখে পড়ে। এখনও প্রায় এক হাজারের উপর প্যাগোডা রহিয়াছে। অনেকগুলি মন্দিরে গোদম বা গৌতমের মূর্ত্তি আছে। কোন কোন মূর্ত্তি কুড়ি পঁচিশ ফিট উচ্চ। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পাগানের এই ধ্বংসের মধ্যে হিন্দু দেবদেবীর মূর্ত্তিও অনেক আছে। পাগানের আনন্দ প্যাগোডা এই ধ্বংস-পুরীতে এখনও বিদ্যমান রহিয়াছে। এই মন্দিরের কারুকার্য্য, শোভা ও সৌন্দর্য্য অতুলনীয়। পাগান কিরূপ সুন্দর সুন্দর বাড়ীঘর ও মন্দিরে সজ্জিত ছিল,

এই আনন্দ প্যাগোডা দেখিলেই তাহা বুঝতে পারা যায়।

ভ্যামো বা ভামো (Bhamo)—ম্যাণ্ডেলের ইরাবতীর উপরে এই সহরটি অবস্থিত।



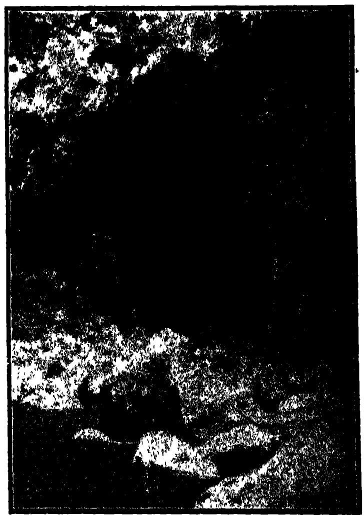
গোটেকের গুহা

রেঙ্গুন হইতে ভ্যামো পর্যান্ত ষ্টিমার আসে। ইহার পর হইতেই ইরাবতী নদীর স্রোত অত্যন্ত প্রখর এবং পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইয়াছে। সেই সমুদয় স্থান অত্যন্ত ভয়ানক। চীন-সীমান্ত হইতে এই সহরটি মাত্র দশ মাইল দূরে থাকায় চীনের সহিত এই সহরের মধ্য দিয়াই স্থলপথে বাণিজ্য হইয়া থাকে।

ইরাবতী নদী যে যে স্থানে পাহাড়ের সংকীর্ণপথে প্রবাহিত, সে সব স্থানের সৌন্দর্য্য নয়ন-মন-মুগ্ধকর। দুই দিকে খাড়া পাহাড়—পাহাড়ের গায়ে তরুশ্রেণী, সবুজ ও সুন্দর। কোথাও দুই একটি ফায়া বা বর্ম্ম-কৃষক-পল্লী—সে এক নূতন জগতের কথা বলিয়া দেয়। এইরূপ শোভা-সম্পদের মধ্য দিয়া ইরাবতী তাহার রূপার মত জলে ঢেউয়ের পর ঢেউ তুলিয়া নাচিয়া ছুটিয়া সাগরের সহিত মিলিত হইবার জন্ম বেগে চলিয়াছে।

মোলমিন্—ব্রহ্মদেশের একটি প্রসিদ্ধ বন্দর। এই বন্দরটি সালউইন্ (Salwin) নদীর তীরে অবস্থিত। এই নদীর উপত্যকা-ভূমিতে জাত চাল ও সেগুন কাষ্ঠ প্রচুর পরিমাণে বিদেশে রপ্তানি হয়।

এ স্থান সোনা, রূপা ও হাতীর দাঁতের কাজের জন্যও বিখ্যাত। মোলমিন আভারণ নদীর সংযোগস্থলে অবস্থিত। এখানে অনেক চালের কল এবং কাঠের কল-কারখানা আছে। এখানে তেলাঙ্গ ও কারাণদের সংখ্যা বেশি। প্রতি-বৎসর কাজকর্ম্মের জন্য মাদ্রাজ প্রদেশ হইতে বহুলোক এখানে আসে। আবার তাহারা দেশে ফিরিয়া যায়। চীনাদের সংখ্যাও এখানে বড় কম নয়। মোলমিন্ মার্ত্তাবান উপসাগরের কাছা-কাছি হইলেও নদীর মুখ বালিতে ঢাকা পড়ায় সামুদ্রিক বন্দর হিসাবে প্রসিদ্ধি লাভ



গোটেকের গুহা

করিতে পারে নাই। এখানকার প্রাকৃতিক দৃশ্যও বেশ মনোরম।

পেগু—মোলমিন্ হইতে পেগু আসিবার রেলপথ আছে। এই রেলপথ থাটোন্ (Thaton),

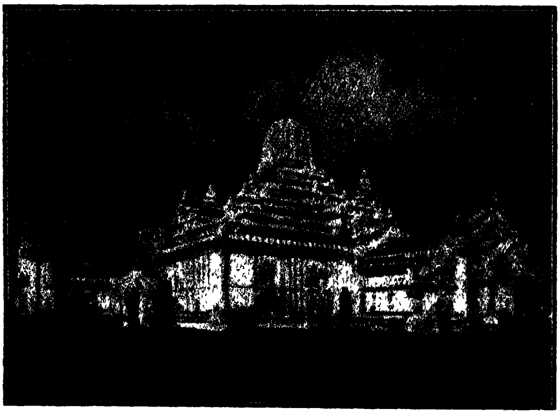
বিলিন (Bilin), কেক্‌তো (Kyaikto) প্রভৃতি জেলা অতিক্রম করিয়া আসে। মার্ত্তা-বান-এর থাটোন্ এক সময়ে তেলাঙ্গদের রাজধানী ছিল। তৈক্‌কলা নামক স্থানটি তেলাঙ্গদের আদি রাজ-ধানী। বিলিন সহর হইতে বারো মাইল দূরে তাহার ধ্বংসাবশেষ দেখা যায়। এসব স্থানে আজকাল মাদ্রাজি এবং বাঙ্গালী অধিবাসীর সংখ্যাই বেশি, তেলাঙ্গদের সংখ্যা ক্রমশঃই কমিয়া আসিতেছে।

আরাকান ইয়োমার সমান্তরালে পেগু ইয়োমাবা পর্ব্বত-শ্রেণী বিদ্যমান। পেগু জেলার বিস্তৃত সমতল ক্ষেত্রে প্রচুর ধান্য জন্মে।



ছোগাইঙ্গের একটি মন্দিরের ভিতরাংশ

পেগু—সহরটি পেগুনদীর তীরে অবস্থিত। এক সময়ে পেগু তেলাঙ্গদের রাজধানী ছিল। সে সময়ে বন্দর হিসাবেও এই নগরের খুব প্রসিদ্ধি ছিল। প্রায় দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে রাজা আলম্প্রা এই সহরটি ধ্বংস করিয়া ইহার সমুদয় সৌন্দর্য্য বিনাশ করিয়াছেন। তবু এখানকার Shewehamdaw সিউ-মা-দা প্যাগোডা দেখি-বার মত বটে। এই প্যাগোডাটির গঠন ঘণ্টার মত। এখানকার অর্দ্ধশায়িত বা হেলান দেওয়া বুদ্ধদেবের মূর্ত্তি একটি অপূর্ব্ব দর্শনীয় জিনিস। এই বুদ্ধ-মূর্ত্তির নাম শিউ-তা চাঙ্গ বা শিন্-বিন্ যা লায়াঙ্গ। মূর্ত্তিটির দৈর্ঘ্য হইতেছে ১৮০ ফিট, আর উচ্চতা ৫০ ফিট। এ মূর্ত্তিটি ইটের তৈরি। অনেক দিন আগে কেহ ইঁহার খোঁজও জানিত না, তখন বন-জঙ্গলে এমন সুন্দর ও বৃহৎ মূর্ত্তিটি সম্পূর্ণরূপে ঢাকা পড়িয়া গিয়াছিল। মান্দালয় হইতে রেঙ্গুণ পর্য্যন্ত রেল-পথ প্রস্তুত করি-বার সময় এই মূর্ত্তিটি রেলকোম্পানীর লোকেরা দেখিতে পাইয়াছিলেন। সে সময় হইতেই এই সযত্নে রক্ষিত হইয়া আসিতেছে। এখন নূতন করিয়া মূর্ত্তির যে যে স্থানের অঙ্গহানি হইয়াছিল,



আনন্দ প্যাগোডা—পাগান



প্যাগোডার বীথি

তাহার সংস্কার করা হইয়াছে। মূর্তিটির হাতের অঙ্গুলি ও নখ সোনায় মুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে। শত শত তীর্থযাত্রী এখানে আসিয়া প্রত্যহ পূজা করিয়া থাকেন। মূর্তির নিকটে পৌঁছিবার জন্য



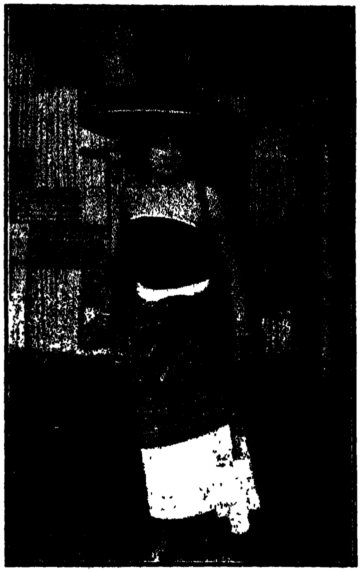
ছেগাইজের মঠ

সিঁড়ি লাগান আছে। পেগুর কাছাকাছি আর একটি প্যাগোডা আছে, সেই প্যাগোডার চারিদিকে চারিটি ধ্যানাসনে উপবিষ্ট গোতম বা বুদ্ধমূর্তি আছে।

পেগু ব্রহ্মদেশের সবচেয়ে পুরানো রাজধানী। ১৩৬৪ খৃষ্টাব্দে এই নগরের প্রথম পত্তন হইয়াছিল। এই নগরীটি ছিল চতুষ্কোণ। এক একদিকে এক মাইলের বেশি লম্বা ছিল না। নগরের ঠিক মাঝখানে এখনও প্রাচীন রাজবাড়ী দেখিতে পাওয়া যায়। সেগুন কাঠের খুঁটির বেড়া। এক একটা খুঁটি চৌদ্দ পনের হাত লম্বা। এইরূপ পর পর তিনটি বেড়ার পর ইটের প্রাচীর। রাজবাড়ীটি পূর্ব্বমুখে অবস্থিত। রাজবাড়ীর সম্মুখেই দরবার-গৃহ। এই ঘরটি ১৭৪ হাত লম্বা। সমস্তটাই সেগুন কাঠের তৈরি। ভিতরে ও বাহিরে বিবিধ কারুকার্য্য এবং গিল্টির কাজ করা। দরবারের ঘরের ভিত্তিটি প্রস্তরের। এই প্রকাণ্ড প্রাসাদের পশ্চাতের দিকে মন্ত্রণাগার এবং অন্যান্য ঘরগুলি অবস্থিত। সকলের পশ্চিম দিকে রাজার অন্তঃপুর ও ফুলেফলে ভরা উদ্যান ও স্বচ্ছ জলেপূর্ণ দীঘি-সরোবর।

ব্রহ্মদেশের অন্যান্য প্রধান সহরের মধ্যে প্রোম' ব্যাসিন্ ও আকিয়াবের নাম করা যাইতে পারে। তা ছাড়া ছোট-বড় আরও অনেক প্রসিদ্ধ সহর ও বর্দ্ধিষ্ণু-পল্লী আছে। সে সকলের কথা তো আর বলা চলে না!

প্রোম—ইরাবতী নদীর বাম তীরে অবস্থিত। এখানে রেলওয়ের একটি প্রধান কেন্দ্রস্থল। এ সহরের পশ্চিম দিকে ঘন বন-জঙ্গলে ঢাকা পর্ব্বত-



শানদের মেয়ে

শ্রেণী। সেই বনে-জঙ্গলে নানা জাতীয় বন্য ও হিংস্র জন্তুর বাস। এ অঞ্চলে চাষবাস বড় কম। পূর্ব্ব ও উত্তর দিকেও বন এবং পাহাড়। তা ছাড়া সমতল ভূমিতে ধানের চাষ খুব হয়। প্রোমের দক্ষিণ-পূর্ব্ব দিকে দশ মাইল দীর্ঘ এবং

চার মাইল চওড়া একটি হ্রদ আছে। প্রোম সহর রেশম-শিল্পের জন্য প্রসিদ্ধ। এখানকারও



ভামোর রাজপথ

ঐতিহাসিক প্রসিদ্ধি আছে। নদীর ধারে পাহাড়ের উপরকার Shwesendaw প্যাগোডাটি স্থাপত্য গৌরবে গৌরবান্বিত। প্রোমের পূর্ব্বদিকে থ্যারে-ক্ষেত্তারা (Tharekhettara) নামক স্থানে অনেক প্রাচীন কীর্ত্তির ধ্বংসাবশেষ আছে। এক সময়ে এই স্থানেও ব্রহ্মদেশের রাজধানী ছিল। বর্ম্মণ ও তেলাঙ্গি-দের মধ্যে অনেক যুদ্ধ-বিগ্রহ এই প্রোম সহরের কাছা-কাছিই হইয়াছে। রেঙ্গুণ হইতে প্রোমের দূরত্ব ১৬০ মাইল। এখানেই রেল লাইন আসিয়া শেষ হইয়াছে।

ব্যাসিন—এই সহরটি ব্যাসিন্ (Bassein) নদীর তীরে অবস্থিত। এখান হইতে প্রচুর পরিমাণে ধান ও চাউল নানাস্থানে রপ্তানি হয়। টেভয় (Tavoy), মার্গুই, আকিয়াব প্রভৃতি সহরও বেশ বড়। আকিয়াব ধান ও চাউল ব্যবসায়ের জন্য বিশেষ প্রসিদ্ধ।

তোমাদের কাছে ব্রহ্ম-দেশের সহর ও প্যাগোডার বিষয়ে অনেক কথা বলিয়াছি। এইবার অন্যান্য প্রয়োজনীয় কথা শোন।

পাহাড়-পর্ব্বত—ব্রহ্মদেশের পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে আরাকান পর্ব্বত—নীল পর্ব্বত (Blue mountain) হইতে আরম্ভ করিয়া লুশাই পর্ব্বত পর্য্যন্ত বরাবর চলিয়া গিয়াছে। এই পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে সবচেয়ে উচ্চ শৃঙ্গ হইতেছে ৭,০০০ ফিট। পেগু পর্ব্বতশ্রেণী ম্যাণ্ডেলে হইতে বরাবর দক্ষিণ দিকে চলিয়া গিয়াছে।

নদ-নদী—ব্রহ্মদেশের বড় নদী ঐরাবতী বা ইরাবতী। চিন্দউইন (Chindwin), সিতাং



গিরিপথে—ইরাবতী

(Sittang), সালউইন—ইরাবতীর এই তিনটি শাখা ব্রহ্মদেশের নানাস্থান দিয়া প্রবাহিত

হইয়াছে। ইরাবতী নদীর প্রায় ৯০০ মাইল পর্য্যন্ত নৌকা চলাচল করিতে পারে।

জল বায়ু— এদেশের জল-বায়ু বেশ ভাল। এখানে মোটামুটি শীত ও বর্ষা—এই দুইটি মাত্র প্রধান ঋতু। ব্রহ্মদেশে খুব বৃষ্টি হয়। সমুদ্রের কূলে যেসব দেশ, সে সব দেশে যেমন বৃষ্টি হয়, দেশের ভিতরের দিকে তেমন বেশি বৃষ্টিপাত হয় না। এদেশের নানা স্থানে এখনও ভীষণ জঙ্গল রহিয়া গিয়াছে। সে সব জঙ্গলা দেশের আশেপাশের স্বাস্থ্য তেমন ভাল নয়। আরাকানে খুব বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার বনে জঙ্গলে সেগুন গাছ প্রচুর পরিমাণে জন্মে। কার্পাস, তামাক, কমলা, আনারস খুব ফলে।



মন্দিরের গায়ে কাঠের কারুকার্য্য

টেনাসেরিয়ম অঞ্চলে খুব বেশি বৃষ্টিপাত হয়। এখানকার পাহাড়গুলি গভীর বনে ঢাকা। রবারের গাছ খুব জন্মে। এখানকার সাগরোপকূলে মুক্তা পাওয়া যায়। টিনের খনিও অনেক আছে।



মোলমিনের প্যাগোডা

ব্রহ্মদেশের প্রধান উৎপন্ন দ্রব্য হইতেছে চাউল ও সেগুন কাঠ। তা ছাড়া হীরার খনি, বর্ম্মা অয়েল নামক কেরোসীন জাতীয় এক প্রকার খনিজ তৈলও এখানে পাওয়া যায়। তারপর চুণী (Ruby), তামা, সীসা এবং দস্তার খনি আছে। এদেশের কাঠের কাজ ও গালার কাজ অতি চমৎকার, সে কথা তোমাদের পূর্ব্বেও বলিয়াছি। এক একটি মন্দিরের গায়ের কাঠের কারুকার্য্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। রেশমের ও বর্ম্মা চুরুটের কারবারও বেশ চলে।

জাতি, ধর্ম্ম, সমাজ ও রীতিনীতি—ব্রহ্মদেশের লোকসংখ্যা ১৯৩১ খৃষ্টাব্দের গণনা অনুসারে ১৪২ কোটি। তাহার মধ্যে বর্ম্মণ নয় কোটির উপর, এক কোটি শ্যাম, আর এক কোটি কারেন। বর্ম্মণেরা তিব্বত-বর্ম্মণ জাতির অন্তর্ভুক্ত। এদেশের লোকেরা বেশির ভাগই বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বী। বুদ্ধদেবের অনেক শতাব্দী পূর্ব্বে শাক্য-বংশের কোনও রাজা আসিয়া ব্রহ্মে রাজ বংশের প্রতিষ্ঠা করেন, এইরূপ গল্প আছে। আর বুদ্ধদেবের আটগাছি চুল লইয়া যে রেঙ্গুণের ভিত্তি স্থাপিত হয়, সে কথা তোমরা আগেই শুনিয়াছ। বৌদ্ধ শাস্ত্রের মতে, বর্ম্মণদের উৎপত্তি ব্রহ্ম হইতে হইয়াছে। তাই তাহারা নিজেদের ব্রহ্মা বা বর্ম্মা বলে। তবে ঐতিহাসিকেরা বলেন যে, বর্ম্মাবাসীদের আদি নিবাস ছিল মধ্য এসিয়ায়।

চীনদেশের ভিতর দিয়া তাহারা ব্রহ্মদেশে আসিয়া বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে। ব্রহ্মদেশের পুরুষেরা অত্যন্ত অলস। কেবল চুরুট খাইয়া, গল্পগুজব ও আমোদ-আহ্লাদ করিয়াই সময়



একটি বুদ্ধমূর্ত্তি

কাটায়। এখন অবশ্য তাহাদের অনেক পরিবর্ত্তন হইয়াছে, তাহাদের মধ্যেও জাগরণের সাড়া পড়িয়া গিয়াছে।

ধানের চাষ এদেশের একটি প্রধান ব্যবসায়। এত বড় ধানের আড়ৎ পৃথিবীর আর কোথাও নাই। প্রতি বৎসর ২০ কোটি ২১ কোটি টাকার ধান এখান হইতে রপ্তানি হয়। বর্ম্মণরা খুব ভাল কারিগর। ঘরে ঘরে রেশমের কাপড় বোনা হয়। বাড়ীতে তাহারা সেই মোটা রেশমের কাপড় ব্যবহার করে।

ব্রহ্মদেশের বিবাহের রীতি আমাদের দেশের বিবাহ-রীতি হইতে বিভিন্ন। বর-ক'নের পরস্পরের ইচ্ছামত বিবাহ হয়। বর, ক'নের বাড়ী গিয়া বিবাহ করেন। ব্রহ্মদেশে স্ত্রীলোকের প্রভাব অত্যন্ত বেশি, এজন্য বিবাহের পর কিছুদিন বরকে শ্বশুর-ঘর করিতে হয়। কেহ কেহ বা শ্বশুর-বংশের নাম লইয়া চিরকাল পোষ্যপুত্রের মত শ্বশুর-ঘরে থাকেন।

বর্ম্মণদের খাদ্য ভাত ও মাছ। এদেশে পচা মাছের এক প্রকার চাটনি ব্যবহার হয়, তাহাকে 'নাপ্পি' বলে। 'নাপ্পি' বর্ম্মণদের কাছে অতি উপাদেয় খাদ্যসামগ্রী বলিয়া বিবেচিত হয়। রাঁধা ভাত ও তরকারি ফেরি করিয়া বিক্রয় হয়। আমাদের দেশের মত রাঁধা খাদ্যদ্রব্যাদি অস্পৃশ্য বা 'সকড়ি' বলিয়া বিবেচিত হয় না। বর্ম্মারা মাটিতে উপু হইয়া বসিয়া হাত দিয়া আহার করে। খাওয়ার পর ইহারা আমাদের মত হাত-মুখ ধুইয়া ফেলে। দুধ এদেশের লোকেরা খায় না। পুরুষ ও স্ত্রীলোক সকলেই ধূমপান করে এবং সকলেই পান-সুপারি খায়। অনেকে অল্প-বিস্তর আফিমও খায়।

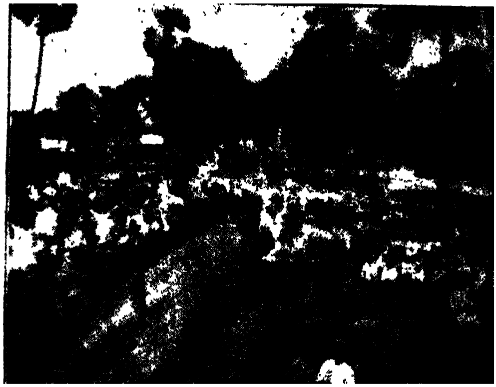
এদেশের স্ত্রীলোকেরা চুল রাখে এবং চুলের আদর এবং যত্নও খুব করে। তাহারা কেশের



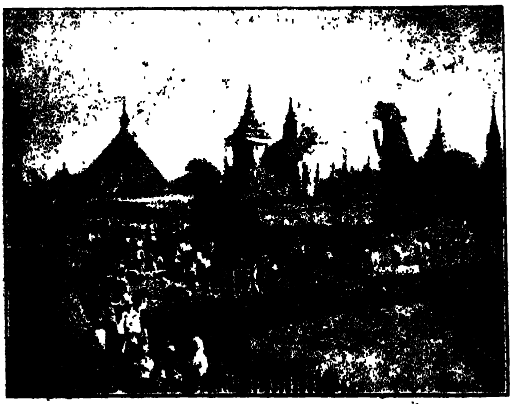
ব্রহ্মদেশের মেয়ে

শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির জন্যই দিনরাত ব্যস্ত থাকে। পুরুষরাও বড় বড় চুল রাখে। স্ত্রী-লোকেরা কান, হাত ও মাথায় গহনা পরে।

পায়ে কোন গহনা পরে না। বেশীর ভাগ স্ত্রী-লোকেরাই 'স্যাণ্ডেল' বা চটিজুতা পায়ে দেয়। পুরুষ ও মেয়ে সকলেই ঢলঢলে পোষাক পরে। লুঙ্গি পরে বলিয়া স্বাধীন ভাবে চলাফেরা করিতে পারে না। বর্ম্মণরা ভবিষ্যতের ভাবনা বড় একটা ভাবে না। সেজন্য ইহাদের মধ্যে ঋণের পরিমাণ অত্যন্ত বেশি। নাচ, গান, আমোদ-প্রমোদ, অভিনয়, ভেড়ার লড়াই, সাপের খেলা, মুরগীর লড়াই, নৌকায় বাচ খেলা, বর্ম্মণদের আমোদ-জনক ক্রীড়া। নদী ও খালে ইহারা দলে দলে বাচ খেলে। এদেশের মাঝিরা পায়ের সাহায্যে অতি দ্রুত নৌকা চালাইতে পারে। এখানকার উৎসব জাটপোয়েতে বর্ম্মার রমণীদের পোয়ে নৃত্য



শবের শ্মশান-যাত্রা



মৃত ফুঙ্গীর শবদেহের শোভাযাত্রা

বেশ কলা-কৌশল সম্পন্ন। সম্ভবতঃ আহারের জন্য চাউল এবং ঘর-বাড়ী তৈয়ারি করিবার জন্য সেগুন কাঠ সহজেই মিলে বলিয়া বর্ম্মণরা এত অলস হইয়া পড়িয়াছে। তাহারা সহজে পরিশ্রম করিতে চাহে না।

ব্রহ্মদেশের লোকেরা সচরাচর শবদেহ গোর দেয় এবং ফুঙ্গিদের শব দাহ করে।

ফুঙ্গিদের ও ধনী ব্যক্তি-দের মৃত্যু হইলে পর শবদেহ খুব ধুম-ধামের সহিত শ্মাসনে নেওয়া হয়। আমাদের দেশে যেমন পরিবারের মধ্যে কাহারও মৃত্যু হইলে অশৌচ পালনের রীতি আছে, ব্রহ্মদেশেও সেইরূপ আছে। সে সময়ের জন্য খাওয়া দাওয়া ও কাপড় পরা সম্বন্ধেও বাঁধা-বাঁধি নিয়ম আছে। স্ত্রী মারা গেলে অশৌচ কম, বাপ কিংবা স্বামী মরিলে অশৌচ বেশি। বাঙ্গলা দেশে এবং ভারতবর্ষের অনেক স্থলেই যেমন সাদা কাপড় পরা শোক-প্রকাশের চিহ্ন, এদেশেও তদ্রূপ। তবে শোকে তাহারা খুব বেশি বিহ্বল হয় না।

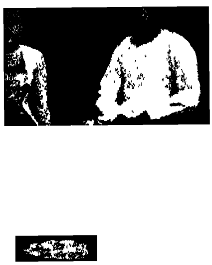
ইতিহাস—একদিন ব্রহ্মদেশ স্বাধীন ছিল এবং তাহাদের রাজ্যও বহুদূর বিস্তৃত ছিল।



রাজা মিন্দনমিন্

আসাম, মণিপুর প্রভৃতিও ব্রহ্মরাজ্যের অধীন ছিল। অতি প্রাচীন ইতিহাস নাই বা বলিলাম। আর সে ইতিহাস নানা গল্প-গুজবে ভরা, ব্রহ্মদেশের খাঁটি ইতিহাস অনেকটা রাজা আলম্প্রার সময় হইতেই ধরিয়া লওয়া হয়। আলম্প্রা নামে একজন সাধারণ অবস্থার লোক অনেক লোকের নেতা হইয়া যুদ্ধ-বিগ্রহ করিয়া ব্রহ্মরাজ্য স্থাপন করেন। সে সময়ে ব্রহ্মদেশ ছোট ছোট বিভিন্ন রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এই সব রাজারা সর্ব্বদা ঝগড়া-বিবাদ করিতেন। কাজেই সাহসী আলম্প্রার পক্ষে ঐসব ক্ষুদ্র রাজ্য জয় করা তেমন কঠিন হইল না। ক্রমে ক্রমে পেগু, আরাকান, টেনিসেরিয়াম—সবগুলিই তিনি জয় করিলেন। অবশেষে শ্যামদেশও জয় করিয়াছিলেন। শ্যামদেশের রাজধানী তাঁহার হস্তগত হইল, কিন্তু সেখানেই তাঁহার মৃত্যু ঘটে। এই আলম্প্রাই রেঙ্গুণে রাজধানী স্থাপন করেন। এই ইতিহাস খুব প্রাচীন নয়, ১৭৫০ খৃষ্টাব্দের কথা। এই বংশের শেষ রাজার সময়ই ব্রহ্মদেশ ইংরাজেরা অধিকার করেন। এই বংশের কোন্ রাজার পর কোন্ রাজা সিংহাসনে বসিয়াছিলেন এখানে তাঁহাদের নাম লিখিলাম। আলম্প্রা নাউঙ্গ দগি, চীৎকাই বা উপাইজা মাউঙ্গ লোক দ্বিতীয় পুত্র। মিঙ্গুমিন্, পাওদোজা, বাগিদ, থায়া ওয়াদীমিন্, পাগনানমিন্, মিন্দনমিন্ এবং থিব মিন্।

আসাম ও মণিপুরের পথ দিয়া ব্রহ্মদেশের রাজারা আসিয়া ব্রিটিশ রাজ্যে লুটপাট করিতেন। ইংরাজের মানা শুনিতেন না। এজন্য প্রথম ব্রহ্ম-যুদ্ধ হয়। লর্ড আমহার্ষ্ট ছিলেন তখন ভারতের বড়লাট। তিনি কয়েকখানি যুদ্ধজাহাজ ব্রহ্মদেশে পাঠাইয়া দিলেন। ক্যাম্পবেল সাহেব (Campbell) সসৈন্যে ইরাবতী নদীতে প্রবেশ করিলেন। একটি মাত্র তোপের আওয়াজে রেঙ্গুণ অধিকৃত হইল। সেই এক গুলিতে সেনাপতির মৃত্যু হওয়াই এই দুর্দ্দশা ঘটিয়াছিল। রেঙ্গুণ জয় করিবার পর তিনি চারিদিকে সৈন্য পাঠাইয়া দেশ জয় করিতে লাগিলেন। নিরুপায় ব্রহ্মদেশের রাজা ইয়াণ্ডাবু



ব্রহ্মের রাজা থিব ও রাণী সুপায়ালাট

নগরে ১৮২৬ খৃষ্টাব্দে সন্ধি করিলেন। এই সন্ধি অনুসারে আরাকান, টেনিসেরিয়াম ও আসাম ইংরাজ পাইলেন, আর পাইলেন যুদ্ধের খেসারত স্বরূপ এক কোটি টাকা। একজন ব্রিটিশ প্রতিনিধিও রেঙ্গুনে রহিলেন। সেইদিন হইতেই রেঙ্গুন ইংরাজের করতলগত হইল।

ইহার প্রায় পঁচিশ বৎসর পরে লর্ড ডাল্‌হাউসীর সময় (১৮৫২ খ্রীঃ অঃ) দ্বিতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ হয়। এই যুদ্ধের কারণ, ইংরাজ বণিকের উপর ব্রহ্মরাজ অত্যাচার করিয়াছেন। এক জন ইংরাজ সৈন্যাধ্যক্ষ ইহার প্রতিকারের জন্য ব্রহ্মদেশে আসিলেন। বিনা যুদ্ধে নিম্ন বর্ম্মা বা পেগু ইংরাজ দখল করিয়া লইলেন।



ইংরাজের নিকট রাজা থিবের আত্মসমর্পণ

লর্ড ডাফরিণ্‌ যখন ভারতের বড়লাট তখন তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ হইয়াছিল। রাজা মিন্দনমিনের মৃত্যুর পর তাঁহার ছেলে থিব রাজা হ'ন। থিব ইংরাজী জানিতেন এবং সকলের প্রিয় ছিলেন। রাজ্যের প্রধানা রাজ্ঞী তাঁহার কন্যা সুপায়ালাটের সহিত থিবের বিবাহ দিয়া তাঁহাকেই সিংহাসনে বসাইয়াছিলেন। ইহার মধ্যেও রাজনৈতিক চাল ছিল!



মীন্‌লাদ প্রাচীন দুর্গ

লোকে বলে যে, থিব রাজা হইয়া রাজবংশের ভ্রাতা ও ভগিনী প্রভৃতি অনেক আত্মী-স্বজনকে গুপ্তভাবে হত্যা করিয়াছিলেন। কিছুদিন রাজত্ব করিবার পর থিব ফরাসী জাতির সহিত বন্ধুত্ব স্থাপন করিয়া ইংরাজ বণিকের উপর অত্যাচার করিয়াছেন বলিয়া লর্ড ডাফরিণ ব্রহ্মরাজের কৈফিয়ৎ তলব করিলেন। কিন্তু রাজা থিব তাহার কোনও সন্তোষজনক উত্তর না দেওয়ায় ১৮৮৫ খৃষ্টাব্দে শেষ বা তৃতীয় ব্রহ্মযুদ্ধ ঘটে। ব্রহ্মদেশে ইংরাজ সৈন্য পাঠাইলেন। রেঙ্গুন দখল করিতে একটি তোপের আওয়াজ হইয়াছিল, কিন্তু ম্যাণ্ডেলে জয় করিতে তাহারও প্রয়োজন হইল না। এখানে ইংরাজ সৈন্যের উপস্থিতি মাত্রেই উহা সম্পন্ন হইল। রাজা থিব ও তাঁহার মহিষীকে বন্দী করিয়া মাদ্রাজে আনা হইল। ইংরাজগণ সমস্ত ব্রহ্মদেশ অধিকার করিলেন। এইভাবে তিনটি যুদ্ধে ব্রহ্মদেশ তাহার স্বাধীনতা হারাইয়াছে। তারপর হইতেই ব্রহ্মদেশের শাসনভার

সম্পূর্ণভাবে ইংরাজের হাতে আসিয়াছে। এখন এদেশের আর্থিক উন্নতি, লোক-বৃদ্ধি এবং ব্যবসায়-



বেদাওবা

বাণিজ্যের প্রসার হইতেছে। শীঘ্রই ব্রহ্মদেশ ভারত হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে। ব্রহ্মদেশ ইংরাজের হাতেই স্বাধীনতা হারাইয়াছে, কিন্তু বহু পূর্ব্বে ব্রহ্মদেশ হীন ও দুর্ব্বল ছিল না। কিন্তু ব্রহ্মযুদ্ধে সে গৌরবের কোন নিদর্শনই পাওয়া যায় নাই।

ব্রহ্মদেশের দর্শনীয় স্থান—ব্রহ্মদেশে অনেক কিছু দেখিবার আছে। তাহাদের কোন কোনটির বিষয় বলিয়াছি, এখানেও কয়েকটি দেখিবার মত স্থানের কথা বলিতেছি।

ইরাবতী নদীর উপরকার মীন্‌লা (Minhla) নামক স্থানের প্রাচীন দুর্গ দেখিবার মত বটে। মোলমিনের কাছে বিঙ্গা নামে যে গুহা আছে, তাহার মধ্যে অনেক বুদ্ধ-মূর্ত্তি আছে। রেঙ্গুণের কাছাকাছি Wingaba-র বিরাট্ বুদ্ধ-মূর্ত্তি দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। টাইক্‌টো-র (Kyaikto) দোদুল্যমান প্রস্তরখণ্ডের উপরিস্থিত বৌদ্ধ-মন্দির পৃথিবীর আশ্চর্য্য দ্রব্যাদির মধ্যে যে একটি, সে কথা নিঃসন্দেহে বলা যাইতে পারে। এই মন্দিরটি পাহাড়ের মাথায় একটি বৃহৎ প্রস্তরখণ্ডের উপর নির্ম্মিত। এই শিলাখণ্ড বাতাসে দোলে, অথচ এমন ভাবে গাথা আছে যে, উল্টাইয়া নীচে পড়িয়া যায় না। ঐ শিলাখণ্ডের আকার বর্ম্মার শাম্পান নৌকার মত বলিয়া এই মন্দিরের নাম শাম্পান প্যাগোডা। মন্দিরে যাইতে হইলে প্রধান পাহাড়ের মাথা হইতে মই দিয়া শিলাখণ্ডে উঠিতে হয়। এই মন্দির সমুদ্রতট-রেখা হইতে ৩,৬৫০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

ব্রহ্মদেশের মোটামুটি ইতিহাস পূর্ব্বে বলিয়াছি, এখানে আরও একটু প্রাচীন কথা তোমাদের কাছে বলিব। তোমরা ভারতবর্ষের ইতিহাস পড়িয়া জান যে, কেমন করিয়া আর্য্য-ঋষিগণ ধীরে



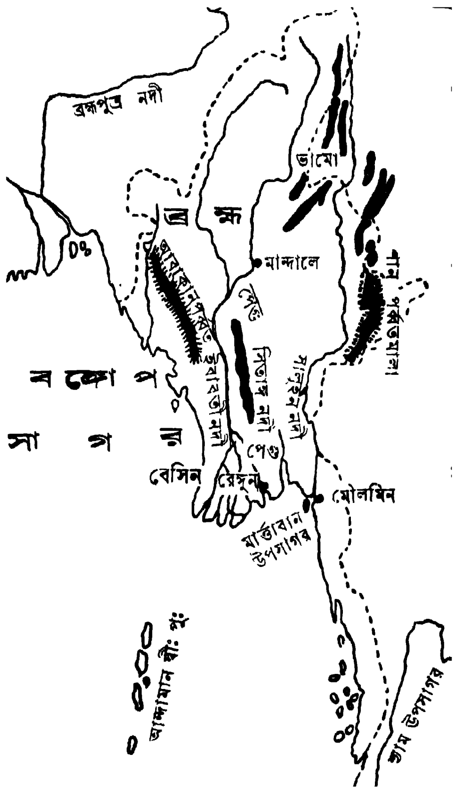
উইঙ্গাবার বিরাট্ বুদ্ধ মূর্ত্তি

ধীরে সমুদয় ভারতবর্ষ অধিকার করিয়াছিলেন। কেমন করিয়া ভারতীয় আর্য্যগণ ব্রহ্ম, শ্যাম, তিব্বত,

চীন, যবদ্বীপ, মালয় প্রভৃতি অধিকার করিয়াছিলেন। সেই অতি প্রাচীন ঋগ্বেদের সময় হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধযুগ পর্য্যন্ত আর্য্যেরা ব্রহ্মর্ষি দেশ, মধ্যদেশ আর্য্যাবর্ত্ত, অঙ্গ, বঙ্গ, কলিঙ্গ, দ্রাবিড়, গুর্জ্জর, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি নানাদেশ আর্য্যদের বসতি বিস্তৃতি হইয়াছিল। কিন্তু তোমরা বোধ হয় জান না যে, একদিন আর্য্য-ঋষিরা ব্রহ্ম, শ্যাম প্রভৃতিও জয় করেন। এ বিষয়টি তেমন প্রচারিত নাই। এখানে সে সম্বন্ধে তোমাদের জানিবার জন্য একটু আলোচনা করিলাম।

ব্রহ্মরাজবংশের একটা ইতিহাস আছে, সে ইতিহাসের নাম—ইবাজাউইন। এই ইতিহাস হইতে জানা যায় যে, শাক্যবংশের অভীরাজা ব্রহ্মে যাইয়া উপনিবেশ স্থাপন করিয়াছিলেন। উত্তর ব্রহ্মের তাগাউঙ্গ নগরে তিনি রাজধানী স্থাপন করেন। অভীরের পরে একে একে বত্রিশ জন রাজা উত্তর ব্রহ্মে রাজত্ব করিয়াছিলেন। পরে পূর্ব্ব দেশে হইতে চীনারা আসিয়া শাক্যবংশকে পরাজিত করে এবং পরে বৌদ্ধধর্ম্মের বিস্তার করে। আরও একজন শক রাজা ঠিক এই সময়ে উত্তর ব্রহ্মে গিয়াছিলেন। ঐ রাজার নাম ছিল—দাজাসাজা। তিনি যে সময়ে উত্তর-ব্রহ্ম জয় করেন, সেই সময়ে গৌতম বুদ্ধ নির্ব্বান লাভ করিয়াছিলেন। কাজেই দেখা যাইতেছে যে, খৃষ্ট পূর্ব্ব নবম কি দশম শতাব্দীতে যে আর্য্যগণ ব্রহ্মদেশ বিজয় করেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই। ব্রহ্মের ভাষায় পালির সহিত অনেক সংস্কৃত শব্দের ব্যবহার আছে। সপ্তাহের সাত দিনের সংস্কৃত নামই বজায় আছে। 'ধম্মথাট্' নামক ব্যবস্থা পুস্তক অনুযায়ী লোকেরা চলে। এখনও হিন্দুর মত অনেক রীতি-পদ্ধতি প্রচলিত আছে। স্তূপাদি খনন করিলে অনেক হিন্দু দেব দেবীর মূর্ত্তি পাওয়া যায়।

দক্ষিণ ব্রহ্মে তৈলঙ্গ দেশ হইতে হিন্দুগণ যাইয়া বাস করেন। টিহ্ টীশরাজা দক্ষিণ ব্রহ্মে রাজা হন। ইনি কণারক বা কর্ণাকের রাজা ছিলেন।



ব্রহ্মদেশ

এই সিহ্, টিহ্, টীশ, ফীহ্ রাজা খৃষ্ট পূর্ব্ব ৫৪৩ অব্দে রাজত্ব করেন। ইনি সুবর্ণভূমি বা থাটন নগরে রাজত্ব করিতেন। এই তৈলঙ্গ বংশের অনেক কীর্ত্তি এখনও দক্ষিণ ব্রহ্মদেশ পাওয়া যায়। সেগুলির সৌন্দর্য্য ও কারুকার্য্য দেখিবার মত বটে।

ইতিহাসের দিক দিয়া যেমন ব্রহ্মদেশের ইতিহাসের সহিত ভারতবর্ষের ইতিহাসের যোগ



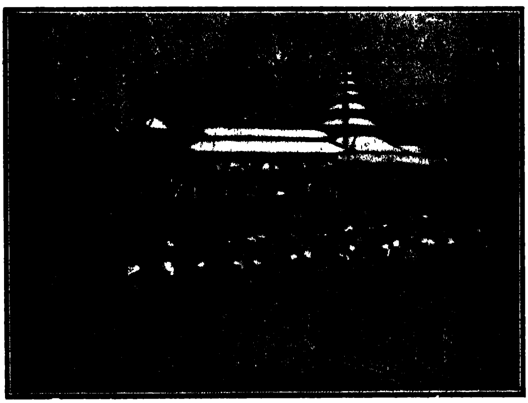
পেগুর শায়িত একটি বুদ্ধ মূর্ত্তি

আছে, তেমনি অনেক দিক দিয়াই যে বেশ একটা মিলন-সূত্র রহিয়াছে, তাহা তোমরা ব্রহ্মদেশ পড়িয়া বেশ বুঝিতে পারিয়াছ।

ব্রহ্মদেশের পাহাড় ও পর্ব্বতে নানা শ্রেণীর অসভ্য জাতির বাস। কাচিন্ পাহাড়ে (Kachin Hills) এক শ্রেণীর পার্ব্বত্য জাতির বাস, তাহারা কাচিন্ নামেই পরিচিত। কাচীন পুরুষ ও স্ত্রীলোকেরা ভামোতে তাহাদের উৎপন্ন দ্রব্যাদি কেনা বেচা করিতে আসে। কাচিনদের মধ্যে আবার মারু প্রভৃতি নানা জাতি আছে। ইহারা বেশ কাপড় বুনিতে পারে। কাচিনেরা ভূত, প্রেত, দেব, দৈত্য প্রভৃতির পূজা করে।

শানরাজ্যের কথাও পূর্ব্বে একটু বলিয়াছি। শানদেশ ব্রহ্মের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। শানদেশকে মালভূমি বলিলেই হয়। সাধারণতঃ সমতল ভূমি হইতে তিন চারি হাজার ফিট উঁচু। পাহাড়ের নীচে দিগন্ত বিস্তৃত বনানী, আর পাহাড়ের উপরের সমতল ভূমি ও তাহার চারিদিকের শোভা দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। শান-রাজ্য কতকগুলি ছোট ছোট মৌজায় বিভক্ত। প্রত্যেকটি মৌজার এক একজন 'প্রধান' বা সর্দ্দার আছেন—তাঁহার নাম বোয়া বা সিয়োজা। শানদেশের সব চেয়ে কাছাকাছি মৌজার নাম ইয়াংশোয়ে (Yawang Hwe)। রাজধানীও ঐ নামেই পরিচিত।

রাজধানীটি ইন্‌লে (Inle Lake) হ্রদের তীরে অবস্থিত। প্রতি বৎসর অক্টোবর মাসে এখানে একটি প্রসিদ্ধ মেলা হয়। এ-সময় যে উৎসব হয়,



নৌকার বাচ খেলা

তাহাকে জলোৎসব বলা যাইতে পারে। এই রাজধানীর বুকেও একটি মঠ আছে। মঠটি শান

প্যাগোডা নামে পরিচিত। দক্ষিণ শান রাজ্যের সর্ব্বত্র বুদ্ধের মূর্ত্তি দেখা যায়। কেঙ্গ-টাঙ্গ (Keng Tung) নামক স্থানে অনেক বুদ্ধমূর্ত্তি আছে। মোঙ্গনাই নামক স্থানের হিম্মা নামক প্যাগোডায় মানুষের আকার পরিমিত একটি বুদ্ধমূর্ত্তি আছে।

শানদের দেশে নানা বিভিন্ন জাতি আছে—যেমন ইন্থাস, (হ্রদের তীরবাসী) তোঙ্গ থাস' তোঙ্গিয়া, দানু, দারি এই সব। চীনা, বর্ম্মণ ও নিজেদের রীতি-নীতির সহিত মিলিত হওয়ার দরুণ ইহাদের জীবন-যাত্রা প্রণালী অদ্ভুত রকমের বলিতে হইবে।

ইন্‌লে হ্রদের বুকে একটি অতি সুন্দর বিশ্রাম-ভবন আছে। জলের উপরেও প্রায় বার ফিট উঁচু হইবে। ইহার উপরে শান পুরুষ ও নারীরা জ্যোৎস্না রাত্রিতে উৎসবের দিনে নৃত্য, গীত ও আনন্দোৎসব করিয়া সারা রাত্রি কাটাইয়া দেয়।



ব্রহ্মদেশের গাড়ী

টাঙ্গু (Toungoo) পর্ব্বতের উপরে কারেণদের মধ্যে অনেকে বাস করে। এই পার্ব্বত্য দেশটি নিবিড় বনে পূর্ণ। টাঙ্গু হইতে ধীরে ধীরে পথ যাইয়া পর্ব্বতের উচ্চ চূড়ায় মিশিয়াছে। এখানকার থান্‌দোঙ্গ সহর—৪,২০০ ফিট উচ্চে অবস্থিত। এই পাহাড়ে কারেণেরা বেশির ভাগ বাস করে। থানদোঙ্গ এবং লেইক্‌থো পাহাড়ে কারেণদের নানা উপজাতির বাস। এই পার্ব্বত্য অঞ্চলের কারেণেরা তেমন হাসি-খুসি বা আমুদে জাতি নয়, ইহারা সর্ব্বদাই বিমর্ষ থাকে। আর বিদেশী লোকদের সন্দেহের চোখে দেখিয়া থাকে। কিন্তু এই পাহাড়ের অধিবাসী পাদোঙ্গ জাতি বেশ বুদ্ধিমান, মিশুক এবং সাহসী। পাদোঙ্গ স্ত্রীলোকেরা গলায়, এবং পায়ে কাঁসার ও পিতলের অলঙ্কার পরে। গলায় আঁটিয়া অলঙ্কার পরিবার ফলে :তাহাদের গলা অত্যন্ত সরু হইয়া যায়। এই সকল



পায়ে নৌকা চালান

জাতির রীতি-নীতি, আচার অনুষ্ঠান ও আকৃতি-প্রকৃতি যে কত বিচিত্র রকমের তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। তোমরা বড় হইয়া সে সব আরও জানিতে পারিবে।

ব্রহ্মদেশের উত্তর, পূর্ব্ব, দক্ষিণ পশ্চিম প্রভৃতি নানা অঞ্চলে বর্ম্মণ, শান চীন, নাগা, কাচিন্, কাছ্. গাকুন, তাযান, মালিন প্রভৃতি নানা জাতির বাস। এই সব জাতিদের মধ্যে কে কোন্ দেশ হইতে আসিল, কি তাহাদের ধর্ম্ম, ভাষা ও আচার-অনুষ্ঠান, কি তাহাদের পোষাক-পরিচ্ছদ—সবই অভিনব—সবই নূতনতর।

রেঙ্গুণে বাঙ্গালীদের কীর্ত্তির মধ্যে বেঙ্গল-একাডেমী নামে একটি উচ্চইংরাজী বিদ্যালয় আছে। এই বিদ্যালয়ের বাড়িটি দেখিতে অতি সুন্দর। বাঙ্গালীরা চাঁদা করিয়া এই বাড়িটি তৈরি করিয়াছেন। বেঙ্গল একাডেমীর কম্পাউণ্ডের ভিতর বালিকা-বিদ্যালয়ও আছে। তাছাড়া ক্লাব, লাইব্রেরী, দুর্গাবাড়ি প্রভৃতিও বাঙ্গালীরা প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

ব্রহ্মদেশ চুণী পাথরের জন্য বিখ্যাত, সে কথা তোমাদের প্রসঙ্গ ক্রমে বলিয়াছি। মোগোক্ নামে একটি স্থান—চুণীর খনির জন্য প্রসিদ্ধ। অনেকে ব্রহ্মদেশ বেড়াইতে যান, কিন্তু চুণীর খনি দেখিয়া আসেন না।—রুবি (চুণী), স্যাপায়ার (নীলা) প্রভৃতি মূল্যবান পাথর এই মোগোকে প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায়। মোগোক্ ৪,০০০ হাজার ফিট উঁচু পাহাড়ের উপর অবস্থিত, এজন্য এখানকার জলবায়ুও বেশ মনোরম। মোগোকের চুণাপাথরের পাহাড়ও দেখিবার মত বটে।—এই পাহাড়ের অধিত্যকায় দুইটি হ্রদ। হ্রদ দুইটি পূর্ব্বে ছিল চুণী নীলা, প্রভৃতি মূল্যবান প্রস্তরের খনি। এখন হ্রদে পরিণত হইয়াছে। এই হ্রদের চারিদিক বেড়িয়াই মোগোক্ সহরটি গড়িয়া উঠিয়াছে। লোক-সংখ্যা আট নয় হাজারের বেশি নহে। প্রতি পাঁচদিন অন্তর এখানে হাট মিলে। ধান, চাল, ফুল, ফল, নিত্য প্রয়োজনীয় সব জিনিষই এখানে পাওয়া যায়। এই বাজারে জহুরীরা আসিয়া চুণী, নীলা প্রভৃতি সব পাথর কেনা-বেচা করে।



হাতীরা সেগুন কাঠ টানিতেছে

এদেশের জীবজন্তুর মধ্যে বাইসন, গণ্ডার, বাঘ, চিতা বাঘ, শূকর, হাতী প্রভৃতি প্রধান। ব্রহ্মদেশের শ্বেত-হস্তীর কথা তো তোমরা জানই। ইংরাজ রাজত্বের সঙ্গে সঙ্গে এবং তাহার পূর্ব্ব হইতেই ভারতের অন্যান্য জাতির ন্যায় বাঙ্গালীরাও এখানে আসিয়া ব্যবসায়-বাণিজ্যের দ্বারা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। কিন্তু ইংরাজ রাজত্বের সহিতই অনেক বাঙ্গালী এদেশে আসেন। ক্রমে বাঙ্গালীর সংখ্যা বাড়িতে থাকে। বাঙ্গালীদের মধ্যে অনেকে বড় বড় চাকরি করিতে থাকেন এবং ব্যবসায় করিয়াও প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়া ধনী হইয়াছেন। এমনও অনেক আছেন।

মোগোকে যে চুণী পাথর দুইটি সবচেয়ে মূল্যবান তাদের নাম Nag Mauk এবং Peace Ruby। ব্রহ্মদেশ সৌন্দর্য্যের লীলাভূমি—একথা যাহারা সে দেশ বেড়াইতে যান, তাহারাই বলেন, তোমরাও একবার বেড়াইয়া আসিও।



অগ্নির প্রথম কথা

আমরা এখন এমন কথা ভাবিতে পারি না যে, আগুন ছাড়া আমাদের প্রতি দিনের জীবন-যাত্রা কি ভাবে চলিতে পারে! কিন্তু এমন একদিন ছিল, যখন মানুষ আগুনের ব্যবহার জানিত না। সে ইতিহাসের অনেক আগের কথা। আদি-মানবেরা আগুনের ব্যবহার জানিত না। ইতর প্রাণীদেব মত তাহারাও বনে বনে কিংবা পাহাড়ের গুহায় কোনরূপে দিন কাটাইত, শীতে কাঁপিত, বর্ষায় ভিজিত, কাঁচা ফল-মূল ও মাংস খাইয়া জীবন ধারণ করিত, রাঁধিবার বালাই তাহাদের ছিল না। কাজেই সেই আদি যুগের মানুষদের জীবন যাত্রাব কথা ভাবিলে, আমাদের বিস্ময়ের অন্ত থাকে না। আমরা আশ্চর্য্য হইয়া ভাবি, সত্য সত্যই কি মানুষ এক সময়ে ঐ ভাবে দিন কাটাইত।—কিন্তু আগুনের অস্তিত্ব তাহাবা নানাভাবে চোখের সম্মুখে দেখিতে পাইত এবং অনুভব করিত। মেঘের কোলে বিদ্যুৎ ঝলসিয়া উঠিয়া চারিদিক আলোকিত করিয়াছে, সময় সময় গাছ-পালা পোড়াইয়া দিতেছে, বনের মধ্যে দাবাগ্নির সৃষ্টি হইয়াছে, আগ্নেয়গিরির অগ্নিস্ফুলিঙ্গ আগুন ছড়াইয়া দিতেছে, এসব দেখিয়া আদি-মানবেরা ভয় পাইয়া পশুদেরই মত নিবিড় বনে যাইয়া লুকাইত। নিত্যকার এই সব ঘটনা দেখিতে দেখিতে ক্রমে বংশপরম্পরাক্রমে মানুষের সাহস বাড়িয়া গেল। একদিন হয়ত তাহাদের মধ্যে কোন সাহসী পুরুষ, প্রাকৃতিক উপায়ে উৎপন্ন অগ্নির সন্ধান পাইল, এবং নির্ভীকভাবে কোন গাছের শাখায় বা প্রজ্জ্বলিত কাষ্ঠখণ্ডের তাপ ও তাহার দহন করিবার শক্তি বুঝিতে পারিয়া ভাবিতে লাগিল—কেমন করিয়া আগুনকে তাহারা কাজে লাগাইতে পারে। সে উপায়ও সহজেই মিলিয়া গেল। অরণ্যবাসী মানবেরা দেখিল যে, আগুন দেখিলে পশুরা ভয়ে পালায়। তারপর একখানা কাঠের উপর আর একখানা শুক্‌নো কাঠ রাখিয়া আগুন জ্বালাইলে তাহা সহজে নিভিবার সম্ভাবনা থাকে না। এই ভাবে আগুনকে বাঁচাইয়া রাখিতে শিখিল। কিন্তু বর্ষাব সময় বৃষ্টিধারায় তো আর আগুন জ্বালাইয়া রাখা সম্ভবপর নয়, আর বিদ্যুৎ বা আগ্নেয়গিরি বা দাবাগ্নির সাহায্য পাওয়ার সুযোগও সকল সময়ে সম্ভবপর নহে কাজেই তখন তাহাদের মাথায় আসিল আগুন উৎপাদন করিবার উদ্ভাবনী-শক্তি। ইচ্ছানুযায়ী অগ্নির উৎপাদন ও তাহার ব্যবহার হইতেছে মানুষের শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি এবং সর্ব্ব প্রধান আবিষ্কার। এখনও আগুনের নিত্য নূতন ব্যবহারের সহিত সভ্যতার নিত্য নূতন বিকাশ দিন দিনই বাড়িয়া চলিয়াছে। একদিন যে মানুষ আগুনের দ্বারা নিজেকে বন্য জন্তুর হাত হইতে এবং শীতের কবল হইতে রক্ষা

করিয়াছে, মানুষ আজ সেই আগুনের সাহায্যে খাওয়া দাওয়া, চলা-ফেরা প্রভৃতি সব বিষয়েই সাহায্য ও শক্তি লাভ করিতেছে। আজ সে অগ্নির সাহায্যেই যুদ্ধে অজেয় হইয়াছে ও আগুনের দ্বারাই অসম্ভবকে সম্ভব করিয়াছে।

অগ্নির তেজ, অগ্নির দীপ্তি, অগ্নির দাহিকা-শক্তি দেখিয়া অনেক দেশে যে অগ্নিকে দেবতা বলিয়া পূজা করিত, সে কিছু আশ্চর্য্য নয়। তোমরা শিশু-ভারতীতে বেদের কথা পড়িয়াছ তাহাতে অগ্নির কথা আছে, এবং অগ্নি দেবতার ছবিও আছে। ('শিশু-ভারতী' - ২৯৫ পৃষ্ঠা) আর্য্যেরা অগ্নিকে দেবতা বলিয়া পূজা করিতেন। হিন্দুর প্রত্যেক শুভকার্য্যে অগ্নি দেবতার পূজা হয়। অগ্নি-দেবতাকে সেকালের আর্য্যেরা কিরূপ ভাবে পূজা করিতেন, ঋগ্বেদের সপ্তম মণ্ডল হইতে তাহার কয়েকটি সূক্ত উদ্ধৃত করিলাম :—

প্রশস্ত, দূরে দৃশ্যমান, গৃহপতি ও গমনবিশিষ্ট অগ্নিকে, নেতাগণ, অরণিদ্বয়ে হস্তগতি ও অঙ্গুলিদ্বারা উৎপাদন করেন। [অরণি শব্দের অর্থ হইতেছে – অগ্নি-মন্থন-কাষ্ঠ।]

হে অগ্নি! তুমি অজস্র জ্বালার সহিত প্রদীপ্ত হও।

হে অগ্নি! তুমি তেজের দ্বারা দগ্ধ করিয়া থাক, সেই তেজ-বলে সমস্ত শত্রুগণকে দগ্ধ কর।

হে অগ্নি! আমার অন্ন বিশেষরূপে শোধিত কর।

হে দেব! তুমি যজ্ঞবানদিগকে অন্ন প্রেরণ কর।

হে অগ্নি! তুমি আমাদের মহৎ কল্যাণকর আছ। হে বলপুত্র! আমরা তোমার স্তোতা, আমাদিগকে মহৎ ধন দান কর।

এইরূপ ভাবে বেদের অনেক সূক্তে অগ্নি দেবতার স্তুতি আছে। অগ্নির সম্বন্ধে স্থানে স্থানে অতি সুন্দর কথা আছে, যথা—যখন (অগ্নি) অশ্বের ন্যায় ঘাস ভক্ষণ করতঃ মহৎ নিরোধ হইতে (বৃক্ষসমূহ) অবস্থান করেন, তখন উহার দীপ্তি প্রবাহিত হয়। অনন্তর (হে অগ্নি) তোমার কৃষ্ণবর্ণ বর্ত্ম হয়।

অগ্নি আলোকের দেবতা। এই অগ্নিকে দেবতা বলিয়া অনেক দেশেই পূজা করা হইত এবং এখনও হয়। আর্য্য-ঋষিরা প্রত্যহ সকালে অগ্নি জ্বালিয়া মন্ত্র পড়িয়া তাহাতে হোম করিতেন। তাঁহারা অন্য দেবতাদের যাহা নিবেদন করিতেন তাহাও অনেক সময়ে এই অগ্নিতেই আহুতি দিতেন। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, এবং বৈশ্য জাতির গৃহস্থ, বিশেষ করিয়া ব্রাহ্মণ গৃহস্থ, অনেক যাগ-যজ্ঞ করিয়া বাড়ীতে অগ্নি স্থাপনা করিতেন এবং সেই অগ্নিকে রাতদিন জ্বালাইয়া রাখিতেন এবং কখনও নিভিতে দিতেন না। তারপর এই অগ্নি হইতে অগ্নি তুলিয়া অন্যান্য যাগ-যজ্ঞ করিতেন।—সেই জন্য ঋগ্বেদ-সংহিতায় ইন্দ্রের স্তবের পরেই অগ্নির স্তবের সংখ্যা বেশী।

ইরাণী বা ইরাণ (পারস্য) দেশ এবং পারসিকদের কথা তোমরা জান। তাহারা অগ্নির উপাসক। তাহাদের অগ্নি-পূজার মন্দির (Fire-Temple) আছে। সেখানে তাহাদের পবিত্র অগ্নি দিন রাত্রি সমান ভাবে জ্বলিতে থাকে। অগ্নিকেই তাহারা ঐশ্বরিক শক্তির প্রতীক মনে



অগ্নি পূজার মন্দির

করে। অপর পৃষ্ঠার ছবিতে দেখ একজন পারসী-মহিলা অগ্নির পূজা করিতেছেন।

কি সভ্য, কি অসভ্য, কি সহরের শিক্ষিত মানুষ, কি বন জঙ্গলের অধিবাসী অসভ্য মানুষ—সকলের কাছেই অগ্নির প্রয়োজনীয়তা আছে। বর্ত্তমান সময়ে বোধ হয় পৃথিবীতে এমন কোন দেশ নাই, যে দেশের লোকেরা আগুনের ব্যবহার না জানে এবং তাহার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি না করে।

প্রথম মানুষ কি ভাবে আগুন জ্বালিতে শিখিল? সে প্রক্রিয়াটি কি? কি ভাবেই বা প্রথম তাহাদের মাথায় উহা আসিল, এই বার সে কথা শোন। তাহারা দেখিল যে, গভীর বনে ডাল-পালায় বায়ু কর্ত্তৃক অনবরত ঘর্ষণে সময়ে সময়ে দাবানলের সৃষ্টি হয়, আদি-মানব প্রথমে সেই প্রক্রিয়ার অনুসরণ করিল। অনেক দেশের আদিম মানুষ এখনও সেই প্রক্রিয়ার দ্বারাই আগুনের সৃষ্টি

করে। সেই প্রক্রিয়াটি যে কাঠে কাঠে ঘষিয়া অগ্নি উৎপাদন করা, তাহা বোধ হয় তোমাদের বলিয়া দিতে হইবে না। বেদেও এই ভাবে অগ্নি উৎপাদনের কথা আছে। এবং ইহা কষ্ট সাধ্য হওয়ায় জালিত অগ্নি যাহাতে নির্ব্বাপিত না হয়, সেই অনুজ্ঞা রহিয়াছে। এখনও এক শ্রেণীর ব্রাহ্মণ আছে, যাঁহারা অগ্নি জালিয়া রাখেন। এ কথা পূর্ব্বেও বলিয়াছি, ইহাদিগকে বলে সাগ্নিক ব্রাহ্মণ। আদিম মানবেরাও অনেক দেশে প্রজ্জ্বলিত অগ্নি নিভিতে দেয় না। যে সকল উপায়ে কাঠে কাঠে ঘষিয়া আগুন জালান হইয়াছে এবং অন্যান্য উপায়ে নানা দেশে আগুন জালা হইয়াছে, তাহা এখন আশ্চর্য্য বলিয়া মনে হয় না কি? আদিম যুগের এই সব উপায় কিরূপ কষ্টসাধ্য, তাহা নিশ্চয়ই বুঝিতে পারিতেছ। এ অসভ্য জাতির মধ্যেও অগ্নি-পূজা চলিয়া আসিতেছে। ছবিতে দেখ—একদল অসভ্য লোক মালা পরিয়া ঢাক্-ঢোল পিটাইয়া অগ্নির পূজা করিতেছে। জলন্ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর দিয়া হাঁটিয়া যাইতেছে।



কাঠেকাঠে ঘসিয়া অগ্নি উৎপাদন

তাহার পর, পাথরের সহিত পাথরের ঠোকাঠুকিতে বা প্রস্তরযুগে পাথরের হাতিয়ার নির্ম্মাণে, অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উত্থান আদিম যুগের মানুষের দৃষ্টিগোচর হয়। অমনি সে আগুন জালাইবার এই নূতন পন্থা বাহির করিয়া ফেলে। ক্রমে, পাথরের সহিত পাথরের পরিবর্ত্তে পাথরের সহিত ধাতু মিশ্রিত পাথর, চকমকি ও লোহা ঠুকিয়া, সোলা বা ছিন্ন বস্ত্রে আগুনের ফিন্‌কি ফেলিয়া আগুন জালাইতে আরম্ভ করা হয়। ঈশ্বর মানুষকে জ্ঞানের দ্বারা জ্ঞান আহরণ করিবার ক্ষমতা দিয়া তাহার নিকট কিছুই অদেয় রাখেন নাই। সেই জ্ঞানের দ্বারা সে বৈজ্ঞানিক জ্ঞানে ঐশ্বর্য্যশালী হইতে আরম্ভ করিয়াছে ও সেই বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের উন্নতির সঙ্গে সে আমাদের নিত্য প্রয়োজনীয় আগুন দিন দিন সহজে পাইবার কত না উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। ধাপে ধাপে সে অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। এই সকল ধাপের কোথাও বা মজবুৎ পিচকারীর ভিতর বাতাস হঠাৎ চাপিয়া উদ্ভূত তাপে তাহার ভিতরে রক্ষিত সুদাহ্য পদার্থে আগুন জ্বালাইয়া লইয়াছে, কোথাও বা রাসায়নিক পোটাসিয়ম ক্লোরেট নামক পদার্থ কাঠির উপর লইয়া তাহা তরল গন্ধকে ডুবাইয়া ধরিয়াছে, কোথাও বা আতসী কাচ দিয়া সূর্য্যরশ্মি কেন্দ্রীভূত করিয়াছে। এই ক্রমোন্নতির একটি উচ্চধাপে মানুষ দীপশলাকা ও বিস্ফোরক প্রস্তুত করিয়াছে। এই দিয়াশলাই দিয়া কতই না অনায়াসে আমরা আগুন জ্বালাই।

এখন আগুন সম্বন্ধে অন্যান্য কথার আলোচনা করিব। কোনও বস্তুর সহিত অক্সিজেনের যোগ হইলে, সেই প্রক্রিয়াকে সাধারণতঃ দহন



একজন পারসী মহিলা পবিত্র অগ্নির পূজা করিতেছেন

বলা হয়। বায়ু অক্সিজেনের একটি বিরাট্ আধার। কাষ্ঠের দাহ, অক্সিজেনের সহিত তাহার দ্রুত সংযোগের ফল। কাষ্ঠের দাহ, লৌহের মরিচা পড়ায়, জীবজন্তুর শ্বাস-প্রশ্বাসে ও চিনির

রসের গাঁজিয়া যাওয়ায় সেই একই ক্রিয়া, দ্রুত বা লঘু গতিতে অনুষ্ঠিত হয়। অক্সিজেনের সহিত এই রাসায়নিক সংযোগে তাপের উৎপত্তি হয়। সেইজন্য দাহে ও তাপে সম্পর্ক দেখা যায়। সংযোগের বেগ অনুসারে তাপের উৎপত্তির বেগ সম্পর্কিত থাকায়, লৌহের মরিচা ধরা ক্রিয়ায় তাপের মৃদু উৎপত্তি অনুভূত হওয়া সুসাধ্য হয় না, কিন্তু শরীরের বেলায় শরীরের উত্তাপে তাহার প্রকাশ পাওয়া যায় ও কাষ্ঠের বেলায় অগ্নিরূপে তাহাকে প্রত্যক্ষ করি।

বৃদ্ধি বলি। সেই কম্পনে বিবিধ ফলের উৎপত্তি হয়। বস্তুটি বাড়িয়া উঠে, গলিয়া যায়, ভরিয়া যায়, ভাঙ্গিয়া পড়ে বা তাহার কণাগুলির স্পন্দনে আভার তরঙ্গ সৃষ্টি হয়। উত্তপ্ত বস্তুটিকে এইরূপ অবস্থায় আমরা রক্তিমাভ দেখি ও আরও প্রচণ্ড তাপে ক্রমে তাহাকে তীব্রোজ্জ্বল শ্বেতবর্ণের পাই। আগুন বলিলে রক্তিমাভা স্বতঃই মনে উদিত হয়, কিন্তু রক্তিমাভা মাত্র তাহার প্রথম বিকাশ। প্রচণ্ড তাপে সেই আভার দৃষ্টি-তীব্র শ্বেত বর্ণের হয়। ইহা তোমরা তো প্রত্যহই লক্ষ্য করিয়া থাক।



অসভ্য লোকেরা অগ্নিস্ফুলিঙ্গের উপর দিয়া হাটিয়া যাইতেছে

যে সকল বস্তু অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইয়া দাহ সৃষ্টি করে, তাহাদিগকে দাহ্য বস্তু বলা হয় ও অক্সিজেনকে দাহক বলা হয়।

তাহা হইলে তাপের একটি বিশেষ প্রকাশকে আমরা অগ্নি কহি। তোমরা তাপের বিষয় কিছু কিছু অবগত আছ। তাপ শক্তি বিশেষ, ইহা বোধ হয় তোমাদের জানা আছে। কোনও বস্তুতে সেই শক্তি প্রযুক্ত হইলে, সেই শক্তির প্রাবল্যে তাহার অনুগুলি কাঁপিতে আরম্ভ করে। কণাগুলির এই কম্পন বৃদ্ধিকে আমরা

তাপ নানাবিধ উপায়ে জন্মে। শুধু দাহেই যে তাহা উৎপন্ন হইবে, তাহা নহে। কাজেই অগ্নিও নানাবিধ উপায়ে সৃষ্ট হইতে পারে। ঘর্ষণে তাপের উৎপত্তি হয়, তাহা তো আমরা নিত্যই দেখিতে পাই। শীতের সময় আমরা হাতে হাত ঘষিয়া হাত গরম করিয়া লই। লোহা পাথরে ঘষিয়া দেখ, শীঘ্রই এত গরম হইয়া উঠিবে যে, তাহা আর ধরিতে পারিবে না। ঘর্ষণ, প্রহার, ঠোকাঠুকি, বাতাসে হঠাৎ চাপ প্রয়োগ প্রভৃতি নানাবিধ উপায়ে তাপের উৎপাদন করা যায়। বাইসাইকেলে

বাতাস ভরিবার সময় পিচকারীর তলদেশ গরম হইয়া ওঠে। এই তাপ প্রচণ্ড মাত্রায় উৎপাদন করিতে পারিলে ও তাহাকে ছড়াইয়া যাইতে না দিয়া রক্ষা করিতে পারিলে আমরা অগ্নি পাইলাম বলিতে পারি। তাহা রাসায়নিক প্রক্রিয়া ছাড়া অন্যান্য উপায়েও আমরা তাপ ও অগ্নি পাইতে পারি। বৈদ্যুতিক আলোক দেখিয়াছ তো! বিদ্যুৎ সঞ্চালনে বাতির ভিতরকার তার আগুন হইয়া ওঠে ও তাহা হইতে শ্বেতরশ্মি নির্গত হইতে থাকে।

রাসায়নিক উপায়ে তাপ ও আগুনের উৎপত্তির একটি প্রধান উপকরণ উপরেই দেওয়া হইয়াছিল। বস্তু বিশেষের সহিত অক্সিজেনের রাসায়নিক সংযোগকে আমরা সাধারণতঃ দাহ বলি। শুধু যে এইরূপ রাসায়নিক প্রক্রিয়াতেই তাপ সৃষ্টি হইতে পারে তাহা নহে, তাপ ও অগ্নি নানাবিধ রাসায়নিক প্রতিক্রিয়াতেই পাওয়া যায়।

রাসায়নিক সংযোগ একটি মজার ব্যাপার। কাঠখানা বাতাসে ফেলিয়া রাখিলে তাহাতে আগুন ধরিয়া উঠে না, অথচ একবার আগুন ধরাইয়া দিলে তাহা জ্বলিতে থাকে, তাহার কারণ কি? নিম্নে এ বিষয়ে মোটামুটি ভাবে উত্তর দিলাম।

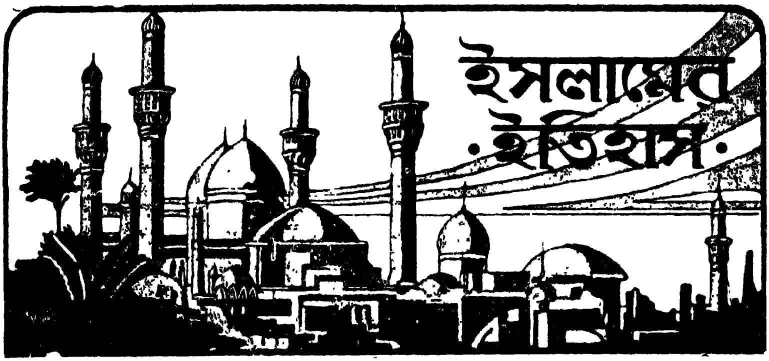
প্রত্যেক বস্তুরই আপন আপন তাপাঙ্ক আছে। সে উত্তাপ তাহার না থাকিলে তাহা অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হইবে না। ঘষিয়াই হউক বা অগ্নি-সংস্পর্শে ফেলিয়া দিয়াই হউক, সেই বস্তুর এক-আধটি কণাকে তাহার জ্বলনাঙ্কে পৌছাইয়া দিতে হইবে। নির্দ্দিষ্ট তাপাঙ্কে উপনীত হইলে তবে তাহা অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইতে সমর্থ হয়। সেই সংযোগে যে তাপ সেই তাপাঙ্ককে জ্বলনাঙ্ক কহে। যদি তাহা পার্শ্ববর্ত্তী কণাগুলিকে জ্বলনাঙ্কে পৌছাইয়া দিতে পারে, তাহা হইলে তাহারাও অক্সিজেনের সহিত সংযুক্ত হইতে সমর্থ হয়। এইরূপে, উদ্ভূত তাপ প্রচুর হইলে কণার পর কণা জ্বলনাঙ্কে উপনীত হয় ও অগ্নির প্রসার হইতে থাকে। উদ্ভূত তাপ অপ্রচুর হইলে বা তাহা ছড়াইয়া বা ঠাণ্ডা পাইয়া বিলয় প্রাপ্তি হইলে জ্বলন স্থগিত হইয়া যায়। তাই কাঠ জ্বালাইবার পূর্ব্বে তাহাকে ধরাইয়া দিতে হয় ও একবার ধরিয়া উঠিলে তাহার দাহের প্রসার হইতে থাকে।

এইরূপে এই ক্ষেত্রে তাপ হইতে রাসায়নিক সংযোগের প্রতিষ্ঠা ও রাসায়নিক সংযোগ হইতে তাপের সৃষ্টি হয়।

কাঠ বাতাসে আপনা হইতে জ্বলিয়া উঠে না, কিন্তু এমন বস্তুও আছে, যাহা বাতাসে আপনা হইতেই জ্বলিয়া উঠে। উদাহরণ স্বরূপ ভাস্ফরসের (Phosphorus) নাম করা যাইতে পারে। ইহাদের জ্বলনাঙ্ক বাতাসের সাধারণ তাপাঙ্কের সমান, সেই জন্য ইহাদের কণাগুলিকে গরম করিয়া লইবার প্রয়োজন হয় না।

তৈলাক্ত ন্যাকড়ার স্তূপে আপনা হইতে কেন আগুন লাগে, তাহা বায়ুতে পড়িয়াছে। তৈলের প্রসারিত পাতলা স্তরের উপর অম্লজানের (Oxygen) ক্রিয়া ঘটিতে থাকে, কারণ আর কিছুই নহে ও সেই ক্রিয়ায় তাপ উৎপন্ন হয়। ন্যাকড়ার ভিতর দিয়া সেই তাপ বাহির হইয়া আসিতে না পারায়, ক্রমে তাহা জমা হইয়া তৈলাক্ত ন্যাকড়াকে জ্বলনাঙ্কে পৌছাইয়া দেয়। এবং তাপের সৃষ্টি হয়।

এখানে প্রসঙ্গ ক্রমে তাপের কয়েকটি ধর্ম্মের কথাও তোমাদের বলিতেছি। তাপের একটা প্রধান ধর্ম্ম এই যে, উহা যে পদার্থে প্রবেশ করে, তাহার আয়তন বাড়াইয়া দেয়। কি কঠিন পদার্থ হউক, কি তরল পদার্থ হউক, কি বায়বীয় পদার্থই হউক, তাপের প্রভাবে তাহা বিস্তৃতি লাভ করে। ক্রমাগত তাপ প্রয়োগে পদার্থের অবস্থা পরিবর্ত্তিত হয়। কঠিন পদার্থ তরল হয়, তরল পদার্থ বাষ্পাকার ধারণ করে। তারপর তাপ এক প্রদেশ হইতে অন্য প্রদেশে সঞ্চালিত হইয়া থাকে। (ক) কোন কঠিন পদার্থের এক প্রান্তে তাপ প্রয়োগ করিলে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সমস্ত অংশটা ক্রমে গরম হইয়া উঠে। ইহার নাম তাপের পরিচালন। (খ) তরল পদার্থের এক অংশে তাপ প্রয়োগ করিলে ঐ অংশটা গরম হইয়া উপরে উঠে, অপর অংশ নামিয়া আসিয়া গরম হয়। ইহার নাম পরিবাহন। (গ) সূর্য্য হইতে পৃথিবীতে তাপ আসিতেছে। তাপ বহন করিবার পক্ষে সূর্য্য ও পৃথিবীর মধ্যে কোনও জড় নাই, তবু তাপ আসিতেছে। এই প্রক্রিয়ার নাম বিকীরণ। তোমরা মোটামুটি ভাবে এই কথা কয়টি মনে রাখিও।



ওম্মিয়া-বংশ বা দামাস্কাস-যুগ

২১১৪ পৃষ্ঠার পর

পূর্ব্বে তোমাদিগকে প্রথম চার জন খলিফার কথা বলিয়াছি। এই চারজন খলিফাকে 'খলিফা-তুর-রাশেদীন' বলা হয় অর্থাৎ সত্যিকার খলিফা। ইঁহাদের দাবী ইসলামে অবিসংবাদিত। ইসলামের সমস্ত শাখা-প্রশাখা এই চারি জন খলিফাকে শ্রদ্ধা করেন, এই যুগকে ইসলামের নির্ব্বাচন-তন্ত্র অথবা সাধারণ-তন্ত্র বলা যাইতে পারে। কারবালার পর মাবিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া ইসলামে অবিরাম রাজতন্ত্র চলিয়া আসিয়াছে এবং ইসলামের সাম্যভাব বহুভাবে ক্ষুন্ন হইয়াছে। ইহার পর হইতে প্রায়ই খলিফার ছেলেরা কিংবা তাঁহার নিকট কোন আত্মীয় খিলাফত গ্রহণ করেন। এবং খিলাফত সিংহাসনে পরিণত হয়। যদিও ব্যক্তিগত ভাবে কোন কোন খলিফা খুবই প্রশংসার যোগ্য ছিলেন, তথাপি মাবিয়া হইতে আরম্ভ করিয়া প্রাক্ মোস্তাফা কামালপাশা পর্য্যন্ত বংশানুক্রমে খলিফা চলিত থাকিয়া ইসলামের সার্ব্বজনীনতা নষ্ট হইয়াছে, খিলাফতের বংশানুক্রমিতার সুযোগ লইয়া পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে ও ইসলাম ধর্ম্মাবলম্বীদের রাজত্ব চলিয়াছে, সূক্ষ্মভাবে দেখিতে গেলে অবশ্য পারস্য, আফগানিস্থান, ভারতবর্ষ, মিশর, স্পেন, তুর্কীস্থান, সমরখন্দ প্রভৃতি খিলাফতের ইতিহাসের অন্তর্গত নহে, কারণ ইহাদের কোন সুলতান কখনো খলিফা বলিয়া সমস্ত মুসলমান কর্ত্তৃক স্বীকৃত হন নাই, যদিও তৈমুরলঙ্গ খিলাফৎ জয় করিয়া বাগদাদ হইতে সমরখন্দে খিলাফতের তক্ত স্থানান্তরিত করিয়াছিলেন, এবং 'খলিফা-তুল্লাহ' উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন, অথবা ভারতবর্ষে সম্রাট আকবরও এইরূপ উপাধি গ্রহণ করিয়াছিলেন বলিয়া কথিত আছে। তথাপি বিশ্ব-ইসলাম কখনো ইঁহাদের খলিফা বলিয়া গ্রহণ করে নাই, মিসরে ফতেমীবংশ কিংবা স্পেন দেশীয় খলিফা কখনো ইসলামের অধিনায়ক বলিয়া স্বীকৃত হন নাই, রাজনৈতিক দাবী হয়ত ইঁহাদের কাহারো আছে, কিন্তু ধর্ম্মের দাবীতে ইঁহাদের কাহারো কোন স্থান নাই, বরঞ্চ প্রাচ্যের বহু সুলতান ওম্মিয়া বা আব্বাসীয়া বংশীয়দের সম্মান করিয়া নিজেকে ধন্য মনে করিতেন, তাঁহারা খলিফাকে খিলাৎ (সম্মানসূচক বস্ত্র,) মক্কার শরীফদের অর্থ, কাবার আচ্ছাদন প্রেরণ করিয়া কৃতার্থ হইয়াছেন, ভারতে সুলতান ইলতুৎমিস্, মহম্মদ তোগলক ফিরোজ তোগলক, আফগানিস্থানের সুলতান মামুদ গজনী এবং বোখারা, খিবা, মস্কটের আমীর-গণ নিজেকে প্রত্যক্ষভাবে খলিফার প্রতিপালিত

ও অনুগৃহীত বলিয়া কৃতার্থ মনে করিতেন, মিসর হইতে প্রতি বৎসর কাবা আস্তরণের জন্য বহুমূল্য প্রচ্ছদপট আসিত এবং সেই বস্ত্রাংশ ইসলামীগনের পক্ষে বিশেষ গৌরবের সামগ্রী। ইহার প্রধান কারণ এই যে, যিনি ইসলামের অধিনায়ক হইতে পারেন, তাঁহার উপর মক্কা, মদিনা, বয়তুল মকদ্দাগ প্রভৃতির ভার ন্যস্ত থাকিবে। প্রত্যেক মুসলিম এই সকল স্থানকে পুণ্যতীর্থ মনে করেন এবং সেখানে হজ করেন ও হজ ব্যপদেশে সেই স্থানে সংস্পর্শে আসিয়া থাকেন। সুতরাং খলিফা বলিতে আমরা এই তীর্থাধিকারী ইসলামের অধিনায়কই বুঝিব। কাজেই খলিফা-তুর রাশেদিন ছাড়া, ওম্মিয়া-বংশ (দামাস্কাস) আব্বাসবংশ (বাগদাদ) ও ওসমান-বংশ (কনস্তান্তিনোপল) খলিফা আমাদের আলোচ্য, অবশ্য পরোক্ষে স্পেন, মিসর, ভারতবর্ষ, তুর্কীস্থান, পারস্য আমাদের আলোচনার মধ্যে স্থান পাইবে।

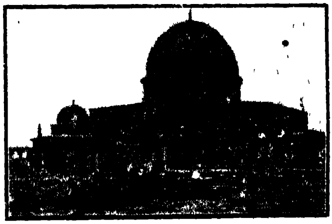
কারবালার যুদ্ধের পর হজরত মহম্মদের বংশ আর কখনো ইসলামের অধিনায়কত্ব করেন নাই। তাঁহার দৌহিত্র বংশ নির্ব্বংশ হইল। যদিও জয়নাল-আবেদীন নামীয় একটি দুর্ব্বল শিশু হোসেনের ভগ্নী জয়নাব কর্তৃক রক্ষা পাইয়াছিলেন মাত্র, এজিদ কর্তৃক কারবালার নৃশংস হত্যাকাণ্ডের পর মদিনাবাসি মুসলীমগণ এজিদের পদচ্যুতি ঘোষণা করিলেন এবং শাসনকর্ত্তাকে বিতাড়িত করিয়া দিল। এজিদ মদিনাবাসীদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিলেন এবং হাবারে তাহাদিগকে পরাস্ত করিয়া মদিনা ধ্বংশ করিলেন. মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের সহকর্ম্মী সহধর্ম্মিদিগের উপর ভীষণ প্রতিহিংসা গ্রহণ করিলেন। যে মদিনা একদিন ইসলামের দুর্দ্দিনে মহাপুরুষ হজরত মহম্মদকে আশ্রয় দিয়াছিল, আজ এজিদ সেই মদিনাকে প্রায় নিশ্চিহ্ন করিয়া দিলেন, মদিনার বিদ্যালয়, চিকিৎসাগার ও ধর্ম্মস্থানগুলিকে ধূলিসাৎ করা হইল, মদিনার যে ক্ষতি এজিদ করিয়াছেন, তাহার পরিপূরণ আর হয় নাই।

মদিনা ধ্বংসের পর আসিল মক্কার প্রতি অভিযান। এই যুদ্ধে কাবার বহু ক্ষতি হইল। মক্কার সঙ্গে জড়িত ইসলামের বহু পুণ্য স্মৃতি নষ্ট করা হইল, এই অবরোধের সময়ই এজিদের মৃত্যু হওয়ায় এজিদের সৈন্যগণ প্রত্যাবর্ত্তন করিল।

এজিদের পরবর্ত্তী খলিফা

এজিদের মৃত্যুর পর ওম্মিয়া-বংশের বার জন খলিফা হ'ন, তাঁহাদের মধ্যে আবদুল মালিক, প্রথম অলীদ, সোলেমান, হেশাম বিশেষ উল্লেখ-যোগ্য ছিলেন।

আবদুল মালিক (৬৮৫—৭০৫খৃঃ অঃ) তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বীকে হত্যা করিয়াখিলাফৎ অধিকার করেন তাঁহার সময় হোসেন-পন্থী একটি বিরুদ্ধ দল হোসেনের হত্যাকারী সীমার ও ওবেদুল্লাকে হত্যা করে। আবদুল মালিক খুব কর্ম্মঠ ব্যক্তি ছিলেন, তিনি ইরাকের বিদ্রোহ দমন করেন, এবং



খলিফা আবদুল মালিক নির্ম্মিত জেরুজেলামের মসজিদ

গ্রীকদিগের নিকট হইতে এশিয়া মাইনরের সীমান্ত অধিকার করেন। তাঁহার সময় আর্ম্মেনিয়া পর্য্যন্ত মুসলিম রাজ্য বিস্তৃত হয়, সিসিলিতে অভিযান প্রেরিত হয়, ভূমধ্য-সাগরের দ্বীপগুলি মুসলমানের অগ্রগতিতে বাধা দিতে সাহস করে নাই।

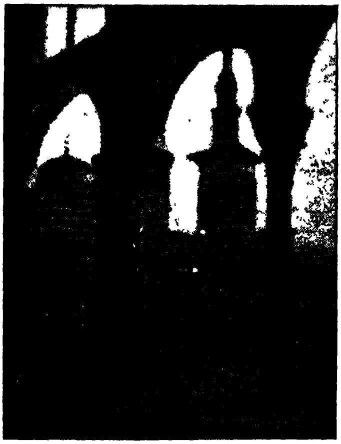
আবদুল মালিক কর্ম্মিষ্ঠ, বুদ্ধিমান্, অধ্যবসায়ী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি ছিলেন। তিনি বিশুদ্ধ আরবী-মুদ্রা প্রচলন করেন। তাঁহার পূর্ব্বে খিলাফতের আয়-ব্যয়ের হিসাব গ্রীক ও পারস্য ভাষায় রক্ষিত হইত। তাঁহার সময়ই প্রথম আরবী ভাষায় হিসাব রাখার ব্যবস্থা হইল। আবদুল মালিক দীর্ঘ একুশ বৎসর কাল রাজত্ব করেন।

অলীদ—(৭০৫-৭১৫ খৃঃ অঃ)

আবদুল মালিকের পর তাঁহার পুত্র অলীদ খলিফা হ'ন। তাঁহার দুইজন বিখ্যাত কর্ম্মচারী ছিলেন;—হাজ্জাজ ইরাকের শাসনকর্ত্তা এবং ওমর

মদিনার শাসনকর্ত্তা। ওমর মদিনার শাসনকর্ত্তারূপে মদিনার প্রণষ্ট গৌরব উদ্ধারের যথেষ্ট চেষ্টা করেন। মক্কা ও মদিনাতে বহু ইমারত তৈয়ার করেন। নূতন পথ—নূতন ব্যবস্থায় মদিনা এক নবীন শ্রীতে মণ্ডিত হয়।

অলীদের রাজত্ব কাল ওম্মিয়া-বংশের সুবর্ণ-যুগ, এই সময়ে খলিফার রাজত্ব বহুদিকে বিস্তৃত লাভ করে;—বোখারা, খোরাসান—মহোর-উন্ত-নাহার (Trans-oxiana) ও চীনের প্রান্তদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। এশিয়ামাইনরে ও আর্ম্মেনিয়াতে গ্রীকগণ পুনরায় বিশেষ ভাবে পরাজিত হয়। কনস্তান্তিনোপলে অভিযানের সুযোগ গ্রহন করা



খলিফা অলীদ নির্ম্মিত দামস্কাসের বিখ্যাত মসজিদ

হয়। এই সময়েই হাজ্জাজের জামাতা মহম্মদ বিন্-কাশিম হিন্দুস্থানে সিন্ধুদেশ ও মূলতান আক্রমণ করেন। আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা মুসার সেনাপতি তারেখ স্পেন দেশ জয় করেন।

মুসা

অলীদের সময় আফ্রিকার শাসনকর্ত্তা মুসা আফ্রিকাতে গ্রীক আধিপত্য সম্পূর্ণভাবে নষ্ট করিয়া মরক্কো, ফেজ ও টানজিয়ার জয় করেন এবং ঐসব দেশে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচার করেন, মেজরকা ও মাইনরকা নামক ভূমধ্যসাগরের দ্বীপপুঞ্জ ইসলামের অধিকৃত হয়। মুসার শাসন ও অধিকার মিসর হইতে আরম্ভ করিয়া ভূমধ্যসাগরের দ্বীপাবলি বেষ্টন করিয়া আটলান্টিক মহাসাগরের তটদেশ পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়। মুসার একজন সৈন্যাধ্যক্ষ সিসিলিতে অবতরণ করিয়া সাইরাকিউজ অধিকার করেন, তারপর সেনাপতি তারেখ স্পেনে অভিযান করিয়া মুসলিম বিজয়বাহিনীকে পিরানিজ পর্ব্বতশ্রেণীর প্রান্ত পর্য্যন্ত চালিত করেন। তার কিছুকাল পরে ৭১২ খৃষ্টাব্দে পর্ত্তুগাল বিজিত হয়। মহাপুরুষ হজরত মহম্মদের মৃত্যুর এক শতাব্দীর মধ্যে ইসলাম তাহার ধর্ম্মবিজয় ও দিগ্বিজয়ের অপূর্ব্ব নিদর্শন পৃথিবীর ইতিহাসে অমর করিয়া রাখিয়াছে।

এই জয়ের উল্লাসে ও উৎসাহে মুসা এবার স্বয়ং সমস্ত ইউরোপ অধিকার করিতে চেষ্টা করিলেন এবং নিজেই ফরাসীদেশের লাঙ্গুডক্ (Langue-doc) প্রদেশে অভিযান করিলেন। লাঙ্গুডক্ বিজিত হইল। এই বিজয়-অভিযানের সূচনাতেই মুসা ও তারেখ খলিফা অলীদ কর্ত্তৃক প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য আদিষ্ট হইলেন। ইউরোপ ও স্বস্তির নিশ্বাস ছাড়িয়া রক্ষা পাইল। মুসা দামস্কাসে আসার পূর্ব্বে তাঁহার পুত্র আবদুল আজিজকে নূতন প্রদেশের শাসন অধিকার দিলেন, অন্যতম পুত্র অবদুল্লা আফ্রিকা ও কনিষ্ঠ পুত্র আবদুল মালিক মরক্কোর শাসনকর্ত্তা নিযুক্ত হইলেন।

স্পেন-বিজয় ও শাসন মুসলমানের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় ঘটনা। এইবার স্পেন-শাসন ব্যপদেশে প্রাচ্য ও প্রাতীচ্যের একটি নিকটতর সম্বন্ধ স্থাপিত হইল; ইহার পূর্ব্বে গ্রীস ও পারস্যকে কেন্দ্র করিয়া প্রাচ্য-ভাব-ধারা পূর্ব্ব-ইউরোপকে কতক পরিমানে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিল। তারপর রোমক সাম্রাজ্যের বাণিজ্যসুযোগে প্রাচীর আলোক ইউরোপকে বহু নবীন তথ্যের সন্ধান দিয়াছিল, স্পেনদেশে মুসলমান শাসনের প্রচেষ্টায় এশিয়ার শিক্ষা ও সভ্যতা, জ্ঞান ও বিজ্ঞান পূর্ব্বদেশীয় দ্বারা ইউরোপে নীত হইল, গ্রীক্ মুসলিম যুগে ইউরোপ ও এশিয়ার সম্বন্ধ ছিল ন্যূনাধিক পরিমাণে—পরোক্ষ এবার হইল প্রত্যক্ষ এবং এশিয়াবাসীই তাহাদের সভ্যতার প্রদীপটি লইয়া ইউরোপের দ্বারে উপস্থিত হইল, ইসলামের সৌভাগ্য ইউরোপেরও সৌভাগ্য

বলিতে হইবে যে, আবদুল আজিজের মতন এক-জন উদার, ন্যায়নিষ্ঠ ও বিচক্ষণ শাসনকর্ত্তা স্পেন-দেশ শাসন করিয়াছিলেন। মুসলিম শাসনাধিকারে স্পেনদেশ জ্ঞান-গরিমায়—শিক্ষা-দীক্ষায়, ধর্ম্মে ও নীতিতে শীঘ্রই ইউরোপের শীর্ষস্থান লাভ করিল।

মুসা ও তারেখ দামেস্কাস আসার পূর্ব্বেই অলীদের মৃত্যু হয় (৭১৫খৃষ্টাব্দ)। অলীদের রাজত্ব প্রায় দশ বৎসর স্থায়ী ছিল। তাঁহার রাজত্বকাল ইস্‌লামের ইতিহাসে একটি গৌরবময় যুগ। তিনি দানশীল ছিলেন এবং ইস্‌লামের সাম্রাজ্য বিস্তারে তাঁহার একান্ত আগ্রহ ও যত্ন ছিল। তাঁহার সময় নানাস্থানে বহু মস্‌জিদ নির্ম্মিত হইল, দামেস্কাসের বিখ্যাত মস্‌জিদ তাঁহারই কীর্ত্তি। জেরুজালেম ও মদিনার মস্‌জিদ তাঁহারই যত্নে বিশেষভাবে চারুশিল্পে বিভূষিত হয়। খলিফা অনেক বিদ্যালয় ও চিকিৎসালয় স্থাপন করেন। রাজ্যের ধনভাণ্ডার হইতে অক্ষম ও দরিদ্রগণকে সাহায্য করা হইত। অন্ধ ও আতুরদের জন্য বিশেষ ব্যবস্থা ছিল। অনাথ বালকবালিকাদের জন্য অবৈতনিক শিক্ষার ব্যবস্থা ছিল। তাহারা বিনা বেতনে লেখাপড়া করিতে পারিত। কুষ্ঠ-রোগীদের জন্য চিকিৎসালয় স্থাপনও তাঁহার একটি প্রধান কীর্ত্তি। শিল্পের উন্নতির জন্য বিশেষ সাহায্য করা হইত। সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য সীমান্তে দুর্গ নির্ম্মিত হয়। তিনি নানা দিক্ দিয়াই সাম্রাজ্যের উন্নতির জন্য অর্থ ব্যয় করিয়াছিলেন।

সোলেমান্—(৭১৫-১৭ খৃঃ অঃ)

অলীদের পর তাঁহার ভ্রাতা সোলেমান খলিফা হ'ন। খলিফার আসন গ্রহণ করিয়াই তিনি ইরাকের সমস্ত বন্দীদিগকে মুক্তি প্রদান করেন। দুর্দ্দান্ত হেজাজের অত্যাচার-পীড়িত বহু মুসলমানদের উদ্ধার করেন। কিন্তু আশ্চর্য্য এই যে, মুসা ও তারেখের সঙ্গে সদ্ব্যবহার করেন নাই। এই দুই মুসলিম বীরের শোচনীয় মৃত্যুর জন্য সোলেমান যথেষ্ট পরিমাণে দায়ী, তিনি কনস্তান্তিনোপলে অভিযান প্রেরণ করেন। কিন্তু তাঁহার খাদ্যসামগ্রী ব্যবস্থার অনবধানতায় এবং সৈন্য সুপরিচালনার অভাবে সৈনিকেরা বিশেষভাবে নির্যাতন ভোগ করে ও অকৃতকার্য্য হয়।

ওমর—(৭১৭-২০ খৃঃ অঃ)

ওমরের চরিত্র অতি পবিত্র ছিল। গল্প আছে, একদিন নমাজের সময় তাঁহার চক্ষু হইতে অবিরল অশ্রুধারা বহিতেছিল, তাঁহার সাধ্বী স্ত্রী ফতিমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "তোমার চক্ষুতে অশ্রু কেন?" প্রশ্নের উত্তরে ওমর বলিলেন, "খোদা আমাকে মুসলমানদিগের উপর শাসন-ভার অর্পণ করিয়াছেন কিন্তু যখন ভাবি যে, কত দুঃস্থ, নিরন্ন দিন যাপন করিতেছে, কত আর্ত্ত অচিকিৎসিত রহিয়াছে কত কাঙাল বস্ত্রহীন রহিয়াছে, তখন আমি আর অশ্রু-সংবরন করিতে পারি না। পরলোকে খোদাকে কি উত্তর দিব? আমার দিবার মত কোন উত্তর নাই।"

তাঁহার সময় মিশর হইতে ৪,০০০ সৈন্য কনস্তান্তিনোপলে প্রেরিত হয়, খাদ্যের অভাবে ও রসদ সরবরাহের অভাবে সৈন্যগণ খুব অসুবিধা ভোগ করে, প্লেগে প্রায় সমস্ত সৈন্য বিনষ্ট হয়। স্পেনে বিদ্রোহ উপস্থিত হয়; অবশ্য আবুসামা সেই বিদ্রোহ দমন করেন। স্পেনের আদমসুমারী গ্রহণ করা হয়। তাঁহার লিখিত বিবরণ হইতে স্পেন দেশের তদানিন্তন বহু ভৌগোলিক তথ্য জানা যায়।

লাঙ্গুডক্ ও প্রেভেন্স প্রদেশেও বিদ্রোহ হয়। অবশ্য খৃষ্টানগণ পরাজিত হইয়াছিলেন। কিন্তু কিছুকাল পরে টুলুর যুদ্ধে মুসলমানগণ খৃষ্টানদের কাছে পরাজিত হইয়াছিলেন। মুসলমানগণ এই যুদ্ধে পরাজিত না হইলে মধ্যইউরোপে মুসলমান সাম্রাজ্য স্থাপিত হইতে পারিত। মোটের উপর রাজ্য-বিস্তারের দিক দিয়া খলিফা ওমর ওম্মিয়া-বংশের কোন সহায়তা করিতে পারেন নাই, অধিকাংশ সময়ই তিনি ধর্ম্মচিন্তা ও ধর্ম্ম-কার্য্যে ব্যয় করিতেন। তাহাতে রাজকার্য্যের দিকে বিশেষ মনোযোগ দিতে পারেন নাই। তাঁহার দুর্ব্বলতার সুযোগ লইয়া আব্বাসীয়গণ ওম্মিয়া-বংশের বিরুদ্ধে প্রথম ষড়যন্ত্রের সূচনা করে এবং ওমর আততায়ীর হস্তে গুপ্তভাবে নিহত হ'ন।

দ্বিতীয় এজিদ—(৭২০-২৪ খৃঃ অঃ)

এই সময় হইতে ওম্মিয়া-বংশের গৌরব বহু ভাবে ক্ষুণ্ণ হইতে আরম্ভ হয়। দামাস্কাসে জাতি-

কলহ, অফ্রিকা ও স্পেনে ইয়ামন এবং মোজারাত-দিগের (Yamainte & Modharite) বিবাদ বিরাট আকার ধারণ করে, আদর-বৈজানের অভিযান বিশেষভাবে প্রতিহত হয়। ট্রানস্-অক্সিয়ানা (Trans oxiana) দেশের প্রজাকুল মুসলিম শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণা করে। তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফা ওমরের প্রবর্ত্তিত শাসন-রীতি প্রত্যাহার করা হইল। একমাত্র ইরাকে ও এশিয়ামাইনরে ক্ষুদ্র দুই একটি যুদ্ধে মুসলিম সৈন্য জয় লাভ করে।

দ্বিতীয় এজিদের রাজ্য শাসন করিবাব যোগ্যতা তেমন ছিল না, কাজেই এই সুযোগে ষরযন্ত্র আরও প্রবল আকাব ধাবণ করিল। এই ষরযন্ত্র হজরত মহম্মদের খুল্লতাত আব্বাসের বংশধরদিগকে কেন্দ্র করিয়া গড়িয়া উঠিল। হজরত মহম্মদের স্ববংশ লুপ্ত হইলে পুরাতন পন্থিগণ আব্বাস-বংশীয়-গণকে খিলাফত প্রদান করিয়া প্রচীন ধারাব প্রবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিলেন।

হেশাম—(৭২৪-৪৩ খৃঃ অঃ)

ইনি আবদুল মালিকের অন্যতম পুত্র। মানুষ হিসাবে হেশাম বেশ ভাল ছিলেন। ইসলামকে ধর্ম্মের ভিত্তিতে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে তিনি যত্নবান ছিলেন। কিন্তু ওম্মিয়া-বংশের খ্যাতি ও যশঃ তাঁহার পূর্ব্ববর্ত্তী খলিফাগণ এমন ভাবে নষ্ট করিয়া গিয়াছিলেন যে, ওম্মিয়া-বংশের গৌরবোদ্ধার প্রায় অসম্ভব হইয়া উঠিয়াছিল। তাহার উপর হেশামের নির্ব্বাচিত প্রাদেশিক শাসন-কর্ত্তা ও কর্ম্মচারীগুলি প্রায়ই অযোগ্য এবং হেশাম ইয়ামনবাসীদিগের প্রতি প্রায়ই পক্ষপাতিত্ব প্রদর্শন করিতেন, ফলে কোরায়েশগণ বিশেষভাবে ক্ষুব্ধ হ'ন। সুতবাং কোরায়েশদিগের পরোক্ষ প্রতি-দ্বন্দ্বিতা আব্বাসীয় ষরযন্ত্রের বিশেষ অনুকূল হয়। কুফা ও ইরাকে বিদ্রোহ ভীষণ আকার ধারণ করে, এই বিদ্রোহ দমন করিতে হেশামকে বহু বেগ পাইতে হয়। পরিশেষে হোসেনের পৌত্র জায়েদ নিজেকে খলিফা বলিয়া ঘোষণা করে। জায়েদ ঘটনাচক্রে একটি অলক্ষিত তীরের আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন।

হেশামের সময় খোরাসানে বহু বিবাদ বিসম্বাদ হয়। হেশাম একাধিকবার তাঁহার নির্ব্বাচিত শাসনকর্ত্তাকে পদচ্যুত করেন এবং কিছুকাল পরে তাহাদিগকে পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করেন। সুতরাং এই অব্যবস্থার জন্য কর্ম্ম-চারীরা হেশামের উপর বিশ্বাস হারাইয়া ফেলে। তাঁহার সময় ভারতবর্ষের সিন্ধুদেশ মুসলমানদের হস্তচ্যুত হয়। ইহার পর মুসলমানগণ ভারতে সাধারন বণিক ও ধর্ম্মজিবীরূপে বাস করিতে থাকেন। প্রায় ৩০০ বৎসর পরে আবার তুর্কগণ ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম-সীমান্ত-পথে ইসলাম রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। এই ৩০০ বৎসর মুসলমান-রাজ্য বিস্তার না করিলেও সিন্ধুদেশে মুসলমান-বসতি বৃদ্ধি পাইল এবং সুফী-ধর্ম্ম প্রচাবিত হইল।

এশিয়া মাইনরের দিকে হেশাম বিশেষ কোন উল্লেখযোগ্য জয়লাভ করেন নাই। আরমেনিয়া ও কাস্পিয়ান সাগবের প্রান্তেও তাঁহার সৈন্যগণ আত্মরক্ষা ছাড়া আর কোন গৌরবলাভে সমর্থ হয় নাই। আফ্রিকা দেশে বার্ব্বারগণ ইসলামকে বহুভাবে বিপর্য্যস্ত করেন। ফলে খলিফার সঙ্গে ইসলামের বন্ধন শিথিল হইয়া পড়ে।

স্পেনদেশের দূরত্ব, ক্রমাগত শাসন-কর্ত্তার পরি-বর্ত্তন এবং তদ্দেশীয় বার্ব্বার বিদ্রোহ, রাজ্য-বিস্তারের দিক্ দিয়া ইসলামের একটি নূতন সমস্যার সূচনা করিল। হেশামের শাসনকর্ত্তা আম্বাস্ পিরানিজ পর্ব্বতশ্রেণী অতিক্রম করিয়া কারকাসনে এবং নিমেস্ (Corcessone and Nimes) জয় করে। ফরাসীদেশের দক্ষিণ সীমান্ত বিজিত করে. কিন্তু ইহারই কিছুকাল পরে আম্বাস্ নিহত হ'ন। আম্বাসের পরবর্ত্তী শাসন-কর্ত্তা আবদুর রহমান ফ্রান্সের দক্ষিণ সীমান্ত পর্য্যন্ত অধিকার করেন—গাস্কনি, বড়্দো এবং লয়াড্ (Gascony, Bourdeaux and the Lyod) নদীর তীর পর্য্যন্ত মুসলিম-বাহিনী পরিচালনা করেন। কিন্তু শীঘ্রই চার্লস্ মারটেল্ (Charles Martel) পইটৌ (Poitoe) এবং টুরের (Tour) যুদ্ধে আবদুর রহমানকে হত্যা করিয়া খৃষ্টান ধর্ম্ম এবং ইউরোপকে মুসলমানের আধিপত্য হইতে রক্ষা করেন (৭৩২ খৃষ্টাব্দে)। ইহার দুই বৎসর পরে আবার শাসনকর্ত্তা আক্বা-বীন-হেজ্জাজ পুনরায় ফ্রান্স আক্রমণ করিয়া বার্-গণ্ডি (Burgundy), লিঅন্স (Lyons) অধিকার করেন এবং রোন্ নদীর সীমান্ত পর্য্যন্ত লুণ্ঠন করেন।

পুনরায় চার্লস্ মার্টেল্ ইউরোপের ত্রাণকর্ত্তারূপে অবতীর্ণ হইয়া মুসলমানদিগকে পরাজিত করিয়া ইউরোপকে মুসলিম কবল হইতে উদ্ধার করেন।

এই সময়ে খারেজীগণ স্পেন, মরকো এবং টিউনিস (Tunis) দেশের বার্ব্বারদিগকে ওম্মিয়া খিলাফতের বিরুদ্ধে প্ররোচিত করে। বার্ব্বার-বিদ্রোহ ঐসব দেশে খিলাফতের প্রাধান্য বহুভাবে ক্ষুণ্ণ করে। টুরের যুদ্ধ অপেক্ষা বার্ব্বার-বিদ্রোহ ওম্মিয়াদিগকে বেশী ক্ষতিগ্রস্ত করে।

মারোয়ান

ইহার কিছুকাল পরে হেশামের মৃত্যু হয় এবং ওম্মিয়া-বংশ হেশামের পর দশ বৎসর রাজত্ব করেন। সেই দশ বৎসরে চারিজন খলিফা হয়। প্রথম দুই বৎসরে তিনজন, এবং সর্ব্বশেষ খলিফা মারোয়ান ইব্রাহিমকে হত্যা করিয়া সিংহাসন অধিকার করেন। ওম্মিয়াবংশে তখন গৃহ-বিবাদ, রাজ্য-লোভ, চরিত্রহীনতা, নিষ্ঠুরতা প্রভৃতি বহু দোষ সংক্রামিত হইয়াছিল। রাজ্যের বিভিন্ন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তাদের বিদ্রোহ, অধিনস্থ জাতির ভিতরে অসন্তোষ, অন্যদিকে আব্বাসিয়া-নেতা আবু মুসলিমের প্ররোচনা, খারেজীগণের ষড়যন্ত্র সকল দিক দিয়াই মারোয়ানকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল। মানুষ হিসাবে মারোয়ান ভালই ছিলেন। ষাটবৎসর বয়সে তিনি রাজত্ব আরম্ভ করেন এবং ছয় বৎসর রাজত্ব করেন। তাঁহার ধৈর্য্য, অধ্যবসায় এবং কর্ম্ম-ক্ষমতা যথেষ্ট ছিল। কিন্তু তাঁহার দুর্ভাগ্য যে, তিনি ওম্মিয়া-বংশের লোক ও তাঁহার রাজত্বকালে ওম্মিয়া-বংশের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও তীব্র প্রতিহিংসা-স্পৃহা সমস্ত মুসলমান-জগৎ ব্যাপিয়া চলিয়াছিল এবং ফরাসীদেশের বুর্বো-বংশের ষোড়শ লুইয়ের মতন মারোয়ানকেও তাঁহার পূর্ব্বপুরুষগণের অক্ষমতার ও পাপের প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইল। প্যালেষ্টাইন, সিরিয়া, কুফা, পারস্য প্রভৃতি দেশে খারেজী ও আব্বাসীয়াগণের রীতিমত ষড়যন্ত্র ও রাজ্য-প্রতিষ্ঠার প্রচেষ্টা চলিতে লাগিল, এশিয়ামাইনরে গ্রীকগণের ও অন্তর্ব্বিরোধের সুযোগে আফ্রিকায় বার্ব্বার জাতি পূর্ব্ব-শক্রতা আরম্ভ করিল। এই দুর্ভাগ্যের সময় স্পেনদেশ ওম্মিয়া খলিফাদের হস্তচ্যুত হইল।

এই অন্তর্ব্বিরোধ সর্ব্বাপেক্ষা প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল—খোরাসানে; এবং এই আন্দোলনে ইসলামের প্রায় সমস্ত প্রধান ব্যক্তিরাই সংশ্লিষ্ট ছিলেন। ওম্মিয়া-বংশের নৃশংসতাও অক্ষমতার জন্যই ওম্মিয়া-বংশ সকলের সহানুভূতি হারাইয়া ফেলিয়াছিল। ওম্মিয়াদের প্রতি অসন্তোষ কেন্দ্রীভূত হইল খোরাসানে। খোরাসানে যে-সমস্ত আরব বাস করিতেছিল, তাহারা প্রায়ই পারসী মুসলমানদের সঙ্গে বিবাহ সম্বন্ধ করিয়া পারসী সামাজিক রীতিনীতি ও জীবন ধারা গ্রহণ করিয়াছিল। সেই কারনেও খোরাসানি আরব এবং ওম্মিয়া আরবদিগের ভিতরে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ও প্রতিযোগিতা ছিল। সুতরাং খোরসানি আরবগণ আব্বাসিয়া ষড়যন্ত্রে বিশেষভাবে যোগ দিল এবং খোরসানে আব্বাসীয়া ষড়যন্ত্রের কেন্দ্র স্থাপিত হইল। এই ষড়যন্ত্রের নেতা হইলেন, আব্বাসীয়া ইব্রাহিমের ক্রীতদাস আবু মুসলিম। মারোয়ান এই ষড়যন্ত্রের আভাস পাইয়া ইব্রাহিমকে কারাগারে নিক্ষেপ করিলেন এবং সেখানে খুব সম্ভব বিষ-প্রয়োগে তাঁহাকে হত্যা করা হয়। ইব্রাহিমের হত্যার পর আর আব্বাসীয়া ষড়যন্ত্র গুপ্ত রহিল না। আবু মুসলিম প্রকাশ্যভাবে ওম্মিয়া বংশের বিরুদ্ধে অভিযান করিলেন। তাঁহার সেনাপতি কাটাইবা যুদ্ধ করিয়া কুফা জয় করিল। ইহার কিছুকাল পরে মেসোপোটেমিয়ার নিকট শাহরাজের যুদ্ধে (৭৪৯ খৃষ্টাব্দে) মারোয়ানের পুত্র আবদুল্লা পরাজিত হইলেন। এবার মারোয়ান স্বয়ং অগ্রসর হইলেন, সারের যুদ্ধে পরাজিত হইয়া মারোয়ান মিসরে পলায়ন করেন। সেখানে মারোয়ান্‌কে অনুসরন করিয়া হত্যা করা হয়। মারোয়ানের মৃত্যুর পর ইব্রাহিমের ভ্রাতা আবু আব্বাস খিলাফতের সিংহাসনে আরোহণ করেন।

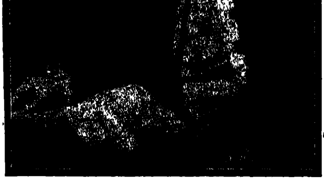


কাপ্তেন কুক্

২০৯৮ পৃষ্ঠার পর

অষ্ট্রেলিয়া মহাদেশের নাম তোমরা জান। পৃথিবীর ছয়টি মহাদেশের মধ্যে এইটি হইতেছে সব মহাদেশের অপেক্ষা আকারে ছোট। অষ্ট্রেলিয়া লইয়া পৃথিবীতে এখন ছয়টি মহাদেশ।

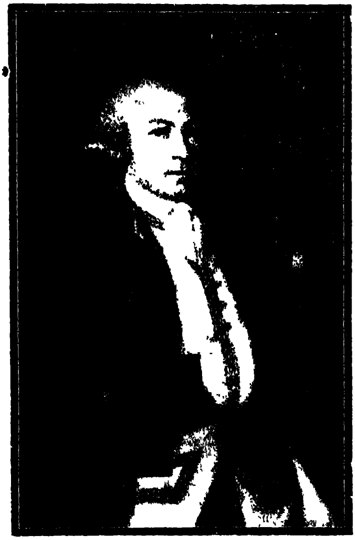
এই মহাদেশ আবিষ্কারের সঙ্গে কাপ্তেন কুকের (Cook) নাম অমর হইয়া আছে ইয়র্কসায়ারের অন্তর্গত একটি ছোট গ্রামে ১৭২৮ খৃঃ অঃ যখন জেমস কুক জন্মগ্রহণ করেন, তখন কেহ ভাবিতেও পারেন নাই যে একদিন এই শিশু পৃথিবীর মধ্যে একজন শ্রেষ্ঠ দুঃসাহসিক আবিষ্কারক রূপে পরিচিত হইবেন। কুকের পিতা ছিলেন কৃষক। চাষ-বাস করিয়া পরিবার প্রতিপালন করিতেন। ছেলেবেলা লেখা-পড়াও তেমন কিছু হয় নাই, গ্রাম্য বিদ্যালয়ে মোটামুটি লিখিতে-পড়িতে ও সহজ সহজ অঙ্ক কষিতে মাত্র শিখিয়াছিলেন। বারোবৎসর বয়সের সময়ে গ্রামের কাছাকাছি একটি মাছের বন্দরের এক দোকানদারের দোকানে কিছুদিন কেনাবেচা সম্বন্ধে শিক্ষানবীশি করিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে এই কাজ ভাল লাগিল না। বালক জেমস্ কুকের কানে আসিয়া পৌছিয়াছিল সাগরের ডাক। বন্দরের কাছেই সমুদ্র। সমুদ্র দেখিয়া তাঁহার মনেও সমুদ্রের বুকে ভাসিতে ভাসিতে দেশ-দেশান্তরে যাইতে ইচ্ছা



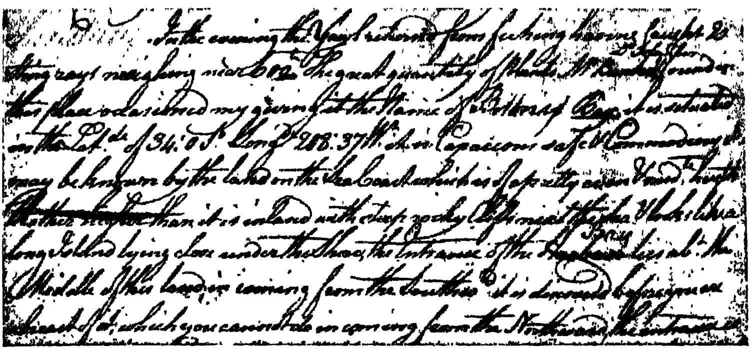
কাপ্তেন কুক্

তাই দোকান ছাড়িয়া হুইটবি (whitby) সহরে আসিয়া এক জাহাজের নাবিক হইলেন। তাঁহার বয়স যখন মাত্র সাতাশ বৎসর, তখন তিনি জাহাজের Mate অর্থাৎ জাহাজের অধ্যক্ষেরই নীচের কর্ম্মচারীর পদ লাভ করিলেন।

ফরাসীদের সহিত যখন ইংরাজের যুদ্ধ বাধিল, সে সময়ে কুক নৌ-সৈন্য দলে নাম লিখাইলেন। তাঁহার ছয় ফিট দীর্ঘ সবল দেহ, তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এবং প্রশস্ত ললাট দেখিয়া জাহাজের কাপ্তেন হিউ প্যালিসার (Captain Hugh Palliser) তাঁহাকে সাদরে গ্রহণ করেন। এসময় হইতে কুকের খুব তাড়াতাড়ি পদোন্নতি হইতে আরম্ভ হইল। কুকের কাজ করিবার শক্তি, বুদ্ধি-ও বিবেচনা এবং সমুদ্র সম্বন্ধে অভিজ্ঞতার দরুণ মাত্র চারবৎসর পরেই তিনি জাহাজ পরিচালনায় ভার পাইলেন, এককথায় তিনি Navigator বা ক্ষেপণিক হইলেন। ত্রিশবৎসর বয়সে মার্কু-ইরি (Mercury) নামক একখানা রণতরীর পরিচালন ভার তাঁহার উপর পড়িল। এই জাহাজে যে নৌ-সৈন্যদল ক্যানাডাতে ফরাসীদের সহিত যুদ্ধ করিতে যাইতেছিল, তাহাদের



সেনাপতি ছিলেন—স্যার চার্লস সাণ্ডার্স (Sir Charles Saunders) কাপ্তেন কুক্ ওরলিয়ান্স (Isle of orleans) দ্বীপ ও আমেরিকার মধ্যবর্ত্তী প্রণালীর মধ্য দিয়া জাহাজ চালাইয়া সেণ্ট লরেন্স (St. Lawrence) নদীর ভিতর দিয়া চলাচলের ভার পাইয়াছিলেন—তিনি নিজের প্রাণের জন্য কোনরূপ মায়ামমতা না করিয়া এই কাজ অত্যন্ত সন্তোষজনকরূপে সম্পন্ন করেন।—কুইবেকের যুদ্ধে কাপ্তেন কুক্ জেনারেল উল্ফ্‌কে (General Wolfe) বিশেষরূপে সাহায্য করিয়াছিলেন। একবার ফরাসীদের কথায় কতকগুলি দেশীলোক (ইণ্ডিয়ান্) যে ক্যানোতে চড়িয়া কুক্ তীরে যাইতে-ছিলেন, তাহা লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুড়িয়াছিল—তাহাদের উদ্দেশ্য ছিল কুককে মারিয়া ফেলা। কুক কিন্তু এইরূপ বিপদের মুখে পড়িয়া ও দমিলেন না, তিনি তাড়াতাড়ি



কাপ্তেন কুকের হস্তলিপি

ওর্লিয়ান্‌স দ্বীপের দিকে তাঁহার নৌকা চালাইয়া দিলেন এবং তীরে—পৌঁছিবামাত্র লাফাইয়া পড়িলেন। কিন্তু সেখানে তাঁহাকে আক্রমণ করিবার জন্য একদল ইণ্ডিয়ান প্রস্তুত ছিল। তিনি যেমন তীরে নামিলেন, অমনি তাহারা তাঁহাকে ঘিরিয়া ফেলিল। কুক্ দমিবার লোক ছিলেন না, এইরূপ অতর্কিত আক্রমণের মধ্যে অসীম সাহসিকতার সহিত বিপদের হাত হইতে মুক্তিলাভ করিলেন। এইরূপ নানাস্থানে যাতায়াতের মধ্যেও অবসর সময়ে তিনি পড়াশুনার চর্চ্চা করিতেন। ঐসময়েই তিনি জরিপের কাজ শিক্ষা করিয়া বিশেষ দক্ষতা লাভ করিয়াছিলেন। তাঁহার এই বিষয়ের নৈপুণ্যের পরিচয় পাইয়া কর্ত্তৃপক্ষ তাঁহাকে নিউফাউণ্ডল্যাণ্ড (Newfoundland) এবং ল্যাব্রাডোরে (Labrador) জরিপ করিবার ভার দিয়াছিলেন।—কুক্ কয়েকবৎসরকাল এই কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া অত্যন্ত নিষ্ঠার সহিত তাহা সম্পন্ন করেন। অবসর সময়ে চিত্ত বিনোদনের জন্য তিনি জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও অঙ্কশাস্ত্র লইয়াও আলোচনা করিতেন—এসময়ে তাঁহার জীবনে এক শুভ মুহূর্ত্ত আসিয়া উপস্থিত হইল।

১৭৬৮ খৃঃ অঃ লণ্ডনের রাজকীয় ভৌগোলিক সমিতি (Royal Geographical society) প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে এক অভিযান প্রেরণ করিতে মনস্থ করিলেন। সেসময়ে জ্যোতির্ব্বিদেরা বলিয়াছিলেন যে, শুক্রগ্রহ সূর্য্যকে অতিক্রম করিয়া চলিয়া যাইবে। জ্যোতির্ব্বিদ্‌গণ জানিয়াছিলেন যে, এই অভাবনীয় সংঘটনটি প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণ ভাগের (তাহিতি) দ্বীপ হইতে বেশ ভালরূপ পর্য্যবেক্ষণ করা যাইবে। রাজা তৃতীয় জর্জ্জ এই শুক্রগ্রহ পর্য্যবেক্ষনের জন্য "এণ্ডেভার" (Endeavour) নামক একখানি পর্য্যবেক্ষণ জাহাজ পাঠাইবার সঙ্কল্প করিলেন। কিন্তু এইরূপ গুরুতর কার্য্যের ভার গ্রহণ করিতে হইলে যোগ্যতম ব্যক্তির প্রয়োজন, সেই ব্যক্তির পক্ষে প্রথমতঃ জ্যোতির্ব্বিদ্যা সম্বন্ধে জ্ঞান এবং নৌ-বিদ্যা সম্বন্ধেও অভিজ্ঞতা থাকা আবশ্যক।—রাজকীয় নৌ-বিভাগের কর্ম্মচারী জেমস্ কুকই সেসময়ে একমাত্র এ'দুটি বিষয়ে অভিজ্ঞ ছিলেন। কাজেই এই অভিযানের নেতৃত্ব করিবার ভারও তাঁহার উপরই আসিয়া পড়িল।

কাপ্তেন কুক্ "এণ্ডেভার" জাহাজখানাকে এইজন্য আবশ্যকীয় সাজ-সরঞ্জামে সজ্জিত করিলেন। তারপর ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের আগষ্ট মাসে—প্রশান্ত-মহাসাগরের তা-হি-তি (Te-he-te) দ্বীপের দিকে যাত্রা করিলেন। এই জাহাজে আশীজন যাত্রী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে মিঃ ব্যাঙ্কস (Mr. Banks), পরে ইনি স্যার জোশেফ্ ব্যাঙ্কস (Sir Joseph Banks) নামে পরিচিত হইয়াছিলেন। ইনি বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার বিষয়ে সেকালে ইংল্যাণ্ডের উৎসাহদাতাগণের মধ্যে একজন প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। পরে স্যার যোসেফ ব্যাঙ্ক রাজকীয় ভৌগলিক সভার অধিনায়ক হইয়াছিলেন। এই জাহাজে সুইডেনের অধিবাসী বিখ্যাত উদ্ভিদ্‌বিদ পণ্ডিত ডাক্তার সোলাণ্ডারও (Dr Solander) একজন যাত্রী ছিলেন।

"এণ্ডেভার" জাহাজ প্লি মাউথ্ (Plymouth) হইতে ১৭৬৮ খৃষ্টাব্দের ২৬শে আগষ্ট রওয়ানা হইল, এবং ম্যাদেরিয়া (Maderia), টেনিরিফ্ (Tenerefe) প্রভৃতি হইয়া দক্ষিণ আমেরিকার দিকে চলিতে লাগিল। এই ভাবে চলিতে চলিতে ১৩ই নভেম্বর তারিখ রাইও-দে-জ্যানিরোর (Rio-de-Janeiro) বন্দরে নোঙ্গর করিল। সেখানকার পর্ত্তুগীজ শাসন-কর্ত্তা কিন্তু এই যাত্রীদলকে বড় একটা ভাল চক্ষে দেখেন নাই। তিনি কল্পনাও করিতে পারেন নাই যে, কেবলমাত্র জ্যোতির্ব্বিদ্যা-বিষয়ক পর্য্যবেক্ষণের জন্য এইরূপ একটা সৌখীন অভিযান এতদূর আসিতে পারে। সে লোকটা জ্যোর্ব্বিদ্যার ধার ধারিত না, কাজেই কাপ্তেন কুক্ যখন তাঁহার জাহাজ লইয়া ৮ই ডিসেম্বর তারিখ রাইও দে-জ্যানিরো বন্দর ছাড়িয়া চলিয়া গেলেন—তখন সে মনে করিল—এই দলের লোকগুলি হয় নির্ব্বোধ, নতুবা জলদস্যু।

টেরাডেল-ফিউগো (Tierradel Fuego) নামক একটি ক্ষুদ্র দ্বীপে ডাঃ সোলেণ্ডারের জীবন কিন্তু আশ্চর্য্যরূপে রক্ষা পাইয়াছিল। এই দ্বীপটি দক্ষিণ আমেরিকার একেবারে দক্ষিণ সীমান্তে অবস্থিত। মিঃ ব্যাঙ্কস, একদিন দশজন সহযাত্রীকে লইয়া ডাঃ সোলেণ্ডারের সহিত এই দ্বীপের অদ্ভুত অদ্ভুত তরুলতার সন্ধানে বহির হইয়াছিলেন। দ্বীপটি

পর্ব্বতময়। ক্রমে রাত্রি হইল। রাত্রির সঙ্গে সঙ্গে বরফ পড়িতে লাগিল এবং দারুন শীত পড়িল। ক্রমশঃ শীত এত বাড়িতে লাগিল যে, তঁহারা সেই দারুণ-শীতে নিদ্রাতুর হইয়া পড়িলেন। সকলেরই ঘুমাবার ইচ্ছা হইল। ডাঃ সোলাণ্ডার পূর্ব্বে সকলকে সতর্ক করিয়া বলিয়াছিলেন যে, বরফের মধ্যে এই দারুণ শীতে যদি কেহ নিদ্রা যান তাহা হইলে তাঁহার মৃত্যু অনিবার্য্য। যিনি নিদ্রা যাইবেন তাঁহারই উহা চিব-নিদ্রা হইবে। শীতে সকলে অত্যন্ত কাতর হইয়া পড়িলেন এবং তাড়াতাড়ি আগুন সংগ্রহ কবিয়া আগুণ জ্বালিবার জন্য একদল লোককে আগে আগে পাঠাইয়া দিলেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই, যিনি সকলকে নিদ্রা সম্বন্ধে সতর্ক করিয়া দিয়াছিলেন



দক্ষিণ সাগরের দ্বীপের পর্ব্বত

সেই ডাক্তার সোলাণ্ডার নিজেই নিদ্রালু হইয়া পড়িলেন। তাঁহাব এমন ঘুম পাইল যে, তিনি সঙ্গীদিগকে বলিলেন যে, আপনারা অগ্রসর হ'ন, আমি একটু ঘুমাইয়া লই, তারপর শীঘ্রই আপনাদের সঙ্গ ধরিব। তাঁহার সঙ্গীরা সকলে কত নিষেধ করিলেন, কিছুতেই কিন্তু ডাক্তার মহোদয় ঘুমের হাত এড়াইতে পারিলেন না। গভীর নিদ্রায় অভিভূত হইলেন। সৌভাগ্য বশতঃ অল্প একটু পরেই একজন অগ্রযাত্রী ফিরিয়া আসিয়া সংবাদ দিলেন—"অল্প দূরেই আগুণ জ্বালা হইয়াছে—সকলে চলুন।" তখন ডাক্তারকে অনেক কষ্টে ঘুম হইতে জাগান হইল, একরূপ তাঁহাকে আগুনের কাছে জোর করিয়া ধরিয়া লইয়া যাওয়া হইল, আগুনের তাপে তাঁহার নিদ্রার জড়তা দূর হইল। দুইজন নিগ্রোকে কিন্তু কোনরূপেই জাগান গেল না, তাহাদিগকে শত চেষ্টা করিয়াও আগুনের কাছে আনা গেল না।



ক্যানো—নৌকা

হতভাগোরা বোধ হয় সেইখানে অনন্ত আকাশের তলে তুষার-শয্যায় শুইয়া নিদ্রার মধ্য দিয়াই অনন্তনিদ্রায় অভিভূত হইয়াছিল! একথা নিশ্চিতভাবে বলা যাইতে পারে।

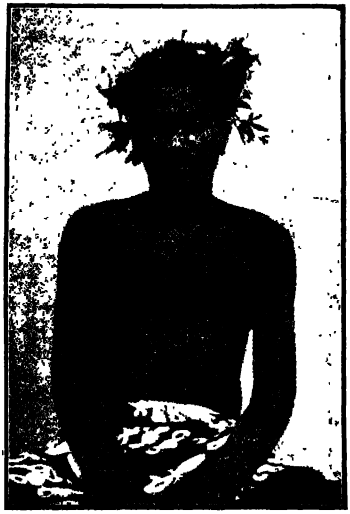
১৭৬৯ খৃষ্টাব্দের ১০ই এপ্রিল "এণ্ডেভার" মাতাবেই উপসাগরের তাহিতি দ্বীপে আসিয়া



আগ্নেয়গিরি

নোঙ্গর করিল। এখান হইতেই শুক্রগ্রহ পর্য্যবেক্ষণ করিবার সুযোগ হইবে। যাত্রীদল এইস্থানে তিনমাসকাল অতি আনন্দে অতিবাহিত করিয়াছিলেন। এ দ্বীপের লোকেরা কুকের প্রতি

অত্যন্ত ভাল ব্যবহার করিয়াছিল। জাহাজ যেমন নোঙ্গর করিল, অমনি দ্বীপবাসীরা তাহাদের 'ক্যানোতে' চড়িয়া গাছের ডালা উঁচু করিয়া ধরিয়া শান্তি বা সন্ধির ভাব দেখাইয়া জাহাজের কাছে আসিল। এই দ্বীপের লোকদের স্বভাব বেশ ভাল। ইহারা বেশ সরল ও শান্তিপ্রিয় কিন্তু তাহাদের প্রধান দোষ যে, লোকগুলি একেবারে পাকা চোর। এদেশের এক সর্দ্দার মিঃ ব্যাঙ্কসের হাতের বন্দুকটি দেখিয়া উহা পাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিল। কিন্তু বন্দুকটি হাতে লইয়া সে যেমন ঘোড়া (Trigger) টিপিল তাহাতে

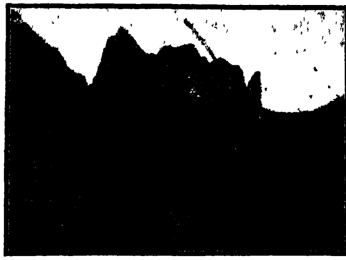


তাহিতি দ্বীপের মানুষ

তাহার এমন একটা ধাক্কা লাগিল যে, তাহাতেই তাহার বন্দুক লইবার সাধ মিটিয়া গেল।

এ দ্বীপের লোকেরা ছোট ছোট জিনিষ, যন্ত্র-পাতি যাহা কাছে পাইত তাহাই সুযোগ পাইলে চুরি করিত।

সমুদ্রের পাড়ে এই অভিযানকারীদের তাঁবু পড়িয়াছিল। তাঁহারা কোন দিন ঘুম হইতে জাগিয়া দেখিতেন—গায়ের কোটটি নাই, কোন দিন দেখিতেন গায়ের কম্বলখানা নাই, ঐ লোকগুলির কাছে সবই নূতন এবং অদ্ভুত বলিয়া মনে হইত বলিয়াই তাহারা ঐ সব জিনিষ পাইবার জন্য এইরূপ চুরি করিত। কাপ্তেন কুক্ কিন্তু ইহাদিগকে কিছু বলিতেন না, এমন কি নাবিকদের



তাহিতির একটি পর্ব্বত

প্রতি ও তাঁহার কড়া হুকুম ছিল যে, সেই দেশীয়দের প্রতি কোনরূপ দুর্ব্যবহার করিতে পারিবে না! একবার একজন নাবিক ইহাদের কতকগুলি তীর চুরি করিয়া ধরা পড়ায়, কুক্ তাহাকে বেত মারিয়া সাজা দিয়াছিলেন।

সে সময়ে তাহিতি দ্বীপের লোকেরা দেখিতে দীর্ঘাকার, গায়ের রঙ পীতাভ, এবং তাহাদের সাদা



সোসাইটি দ্বীপের লোকদের মাছ ধরা

শ্রেণীবদ্ধ দন্তশ্রেণী শরীরের শোভা বর্দ্ধন করিত। ইহারা দিনে তিনবার করিয়া স্নান করিত। সারা গায়ে উল্কি পরিত। তীক্ষ্ণ হাড় ও এদেশের এক রকম বাদামের তেলের সাহায্যে তাহারা উল্কি

পরিত। দ্বীপবাসীরা তাহাদের পরিবার উপযোগী মোটা কাপড় বুনিতে জানিত। বেতের কাজ ও নানা লতা-পাতা দিয়া তাহারা ঝুড়ি, ডালি—এই সব অতি নিপুণ ভাবে নির্ম্মাণ করিতে দক্ষ ছিল। একবার এই দ্বীপের রাণী 'এণ্ডেভার' জাহাজে আসিয়া কাপ্তেন কুকের সহিত দেখা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে, দুই পক্ষেই উপহারের আদান-প্রদান চলিয়াছিল। রাণী কাপ্তেন কুককে উপহার দিয়াছিলেন এক কাঁদি কলা ও একটা শূকর। কাপ্তেন কুক, রাণীকে উপহার দিলেন একটি পুতুল।

রাণী তাঁহার এই প্রিয় উপহার পুতুলটি লইয়া মহা আনন্দে যেমন তীরে নামিয়াছেন, অমনি এক সর্দ্দার আসিয়া ঐটি লইবার জন্য গোল বাঁধাইল। রাণী ও সেই সর্দ্দারের মধ্যে তুমুল ঝগড়া আরম্ভ



সামোয়া দ্বীপের একজন সর্দ্দার

হইল। শেষটায় কাপ্তেন কুক্ সেই সর্দ্দারকে, রাণীকে যেরূপ পুতুল দেওয়া হইয়াছিল, সেইরূপ আর একটি পুতুল উপহার দিয়া তবে ঝগড়া মিটাইতে পারিয়াছিলেন।

৩রা জুন শুক্ররবি-যুতি (Transit of Venns) জ্যোতির্ব্বিদেরা বেশ ভাল ভাবে পর্য্যবেক্ষণ করিতে পারিলেন। তারপর তাঁহারা তাহিতি-দ্বীপের নানা অংশ বেশ ভাল ভাবে দেখা-শুনা



নিউজিল্যাণ্ডের মেয়ে

করিয়া ১৩ই জুলাই তারিখ ঐ দ্বীপ পরিত্যাগ করিলেন। এই দ্বীপ ছাড়িয়া আসিতে তাঁহাদের সকলেরই খুব কষ্ট হইয়াছিল। এই দ্বীপের শোভা ও সৌন্দর্য্য,—তারপর এখানকার লোকদের সরল ব্যবহারেও তাঁহারা বিশেষ মুগ্ধ হইয়াছিলেন। পলিনেশিয়ার লোকেরা এই দ্বীপকে ওতাহিতি বলে। কিন্তু তাহিতি নামই প্রচলিত। ১৭৬৯ খৃঃ অঃ কাপ্তেন কুক্ এখানে আসিয়াছিলেন। সে কথা তোমরা জানিতে পারিয়াছ। এখানে অনেক আগ্নেয়গিরি আছে। সব চেয়ে উচুটি হইতেছে ৭,৩৪০ ফিট। এখানে কলা, চিনি, তুলা, কাফি কোকোয়া, রুটিফল (Bread-fruit) প্রভৃতি জন্মে। এখানকার প্রধান সহরের নাম পাপিতি (Papceti)! এই দ্বীপের পরিমাণ ফল—৬০০ বর্গ-মাইল। ফরাসী ও ইংরাজ ধর্ম্মযাজকেরা এ দেশের অধিবাসীদের মধ্যে খৃষ্ট-ধর্ম্ম প্রচার করিয়াছেন। এখানকার অধিবাসীদের সহিত ইংরাজ, ফরাসী,

ইহুদী প্রভৃতি নানাজাতির মিশ্রণ হইয়াছে। এই দ্বীপ লইয়া ফরাসী ও ইংরাজদের মধ্যে রক্তপাতও হইয়াছে অনেক। তাহিতিকে ভ্রমণকারীরা নাম দিয়াছেন দক্ষিণসাগরের স্বর্গ (South Sea Paradise)—এদেশটি ফুলে ফলে ভরা। অনেক যায়গায় গভীর বনে ও পর্ব্বতের নিবিড় প্রদেশে লোকের বসতি নাই।

কাপ্তেন কুক্ তুপিয়া (Tupia) নামে এদেশের একজন সর্দার ও তাঁহার ছেলেকে সঙ্গে আনিয়া-



লণ্ডন নগরে স্থাপিত কাপ্তেন কুকের প্রস্তর মূর্ত্তি

ছিলেন। এই দ্বীপের কাছাকাছি অন্যান্য দ্বীপ-গুলিতে আর তাহাদের যাওয়া হয় নাই।—কুক্ এই দ্বীপপুঞ্জের নাম দিয়াছিলেন সোসাইটী দ্বীপ (Society island)।

এই সকল দ্বীপের অধিবাসীরা সকলেই যে তাহিতি দ্বীপের লোকদের মত ভাল মানুষ ছিল তাহা নহে। একটি দ্বীপে তাঁহারা যেমন নামিতে যাইবেন অমনি সেখানকার লোকেরা সড়কি, বল্লম এসব অস্ত্র লইয়া তাহাদের আক্রমণ করিতে আসিল।– তখন বাধ্য হইয়া কুকের দলের লোকেরা তাহাদের মাথার উপর দিয়া গুলি ছাড়িয়া আত্মরক্ষা করিয়াছিলেন।

এখান হইতে তাহারা নিউজিল্যাণ্ডে (New-zeland) আসিলেন। সে কুকের আসিবার প্রায় ১২৫ বৎসর পূর্ব্বে টাসমেন্ (Tasman) নামে একজন ওলন্দাজ নাবিক এদেশে আসেন। তিনি কিন্তু এদেশের আয়তন, জনসংখ্যা এবং অন্যান্য বিষয়ে কোনও সংবাদ দিতে পারেন নাই।

কাপ্তেন কুক্ই সকলের আগে নিউজিল্যাণ্ডের সাগরের কূল উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বুঝিতে পারেন, নিউজিল্যাণ্ড দ্বীপের ভূ-ভাগ দুইটি দ্বীপে বিভক্ত। উত্তর দ্বীপ ও দক্ষিণ দ্বীপ। একটি জল-প্রণালী এই দ্বীপটিকে দুইভাগে বিভক্ত করিয়াছে।

১৭৬৯ খৃঃ অঃ ৭ই অক্টোবর তাঁহারা নিউজি-ল্যাণ্ডের তীর দেখিতে পাইলেন। তীরে নামিতে যাইবেন, অমনি দলে দলে দ্বীপের অধিবাসীরা তাঁহাদিগকে আক্রমণ করিতে ছুটিয়া আসিল। কাপ্তেন কুক্—যখন যেখানে গিয়াছেন, সেখানেই কোনরূপ অশান্তি বা যুদ্ধবিগ্রহ কিংবা দেশীয়দের প্রাণনাশ করিতে চাহেন নাই। এখানকার লোকেরা তাহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসিলে পর কুক্ আকাশের দিকে ফাঁকা আওয়াজ করিলেন। অন্যান্য স্থানের লোকেরা বন্দুকের আওয়াজ শুনিয়াই ভয়ে পলায়ন করিত, এখানে কিন্তু তাহা হইল না। অবশেষে একজন দেশীয় লোককে গুলি করিয়া মারিলে পর খানিকটা নিবৃত্ত হইল, কিন্তু অল্প খানিক পরেই দ্বীপের লোকেরা দল বাঁধিয়া ছুটিয়া আসিল। এজন্য নিউজিল্যাণ্ডের অনেক দেশীয় লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল।

হক্ উপসাগরের কাছাকাছি, একটি অন্তরীপের লোকেরা তুপিয়ার ছেলে তেয়োতাকে (Tayota) কাড়িয়া লইবার চেষ্টা করিয়াছিল, এজন্য কুক্ এই অন্তরীপের নাম দিয়াছিলেন—Kidna-pper's Point বা ছেলেধরা অন্তরীপ।

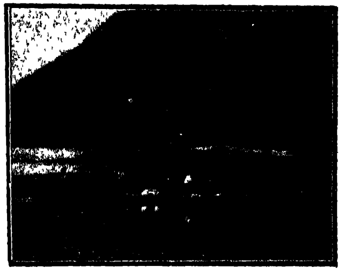
নিউজিল্যাণ্ডের অধিবাসীরা তাহাদের ক্যানোতে চড়িয়া 'এণ্ডেভার' জাহাজের যাত্রীদের সহিত বাণিজ্য করিতে আসিয়াছিল। জাহাজের নাবিকেরা জিনিষ কিনিবার জন্য দর-দস্তর করিতেছে, সেই সুযোগে কতকগুলি লোক তেয়োতাকে ক্যানোতে নামাইয়া লইয়া অতি দ্রুত নৌকা চালাইয়া দিল। নাবিকেরা যেমন টের পাইল, অমনি তাহারা চীৎকার করিয়া উঠিল—তাড়াতাড়ি গুলি ছুড়িয়া ছেলে-চোরটিকে মারিয়া ফেলিলে তবে তেওতা রক্ষা পাইল। তেওতাও



গীজার বা উষ্ণপ্রস্রবণ

এই গোলযোগের সুযোগ পাইয়া সাগরের জলে ঝাপাইয়া পড়িয়া সাঁতরাইয়া জাহাজের কাছে আসিলে, তুপিয়া তাহাকে টানিয়া জাহাজে তুলিয়া লইল।

ইহার পর প্রায় ছয়মাস কাল কাপ্তেন কুক্ উত্তর ও দক্ষিণ দিকের দ্বীপগুলি পর্য্যবেক্ষণ করিয়া কাটাইলেন। তাঁহারা নর্থ আয়রল্যাণ্ডে (North Island) আসিয়া দেখিলেন যে, এখানকার একদল অসভ্য অধিবাসীরা নরখাদক! এই অসভ্যেরা তাহাদের নিজ শত্রুদের মৃত দেহের মাংস খায়। তাহারা মানুষের মাথার খুলির বিনিময়ে অন্যান্য জিনিষ নিতে আসিয়াছিল। এমন কি 'ক্যানো'র জল সেচিবার জন্যও তাহারা মড়ার মাথার খুলি ব্যবহার করিত। কুক্ এই উপসাগরের নাম



হ্রদের বুকে

দিয়াছিলেন Cannibal Bay। এদেশের স্ত্রীলোকেরা তীক্ষাগ্র প্রস্তর দ্বারা আপনাদের শরীর ক্ষত-বিক্ষত করিয়া মৃত স্বামীর জন্য শোক-প্রকাশ করে। এখানকার নানা প্রকার বীভৎস ব্যাপার তাঁহাদের কাছে অদ্ভুত মনে হইলেও



উত্তর দ্বীপের দৃশ্য

এখানকার লোকেরা যে স্নেহ-মায়া-বিবর্জ্জিত এমন কথা বলা চলে না।

এই দ্বীপের অধিবাসীরা বেশ কর্ম্মঠ এবং নিপুণ-শিল্পী। ইহারা পাথর ও হাড় ঘষিয়া কুড়াল,—বাসী বা বাইস এবং বাটালি তৈয়ার করিত। তাহাদের এক একটা বল্লম লম্বায় ১০।১২ হাত হইত। কান ছেঁদা করা এদেশের একটি প্রধান

রীতি। সেই ছিদ্রের ভিতর পাখীর পালক, হাড় বা কাঠ ঢুকাইয়া রাখে। এই রীতি ঐ দিক্‌কার অন্যান্য দ্বীপেও দেখিতে পাওয়া যায়।



দ্বীপবাসীদের দেবতা

১৭৭০ খৃঃ অঃ কুক্ নিউজিল্যাণ্ড ছাড়িয়া পশ্চিমাভিমুখে অষ্ট্রেলিয়ার দিকে আসিলেন। সে



অষ্ট্রেলিয়ার একটি নদী

সময়ে অষ্ট্রেলিয়া নিউ হল্যাণ্ড (New Holland) নামে পরিচিত ছিল। তিন সপ্তাহ কাল সমুদ্র-পথে যাওয়ার পর ২৮শে এপ্রিল তারিখ তাঁহারা যে উপসাগরের কাছে নোঙর করিলেন, সেস্থানের নাম রাখিলেন Botany Bay (বোটানি বে) বা বোটানি উপসাগর কেন না এখানকার সাগর-তীরে নানাজাতীয় তরু-গুল্ম বিদ্যমান ছিল। ৬ই মে তারিখ তাঁহারা বোটানি বে ছাড়িলেন। চারি মাস কাল তাঁহারা ক্রমাগত উত্তরাভিমুখে যাইতে লাগিলেন। এখানে তাঁহারা কত অদ্ভুত



ক্যাঙ্গারু

অদ্ভুত গাছ দেখিলেন, কত অদ্ভুত অদ্ভুত প্রাণী যে দেখিলেন তাহার অবধি নাই। এখানেই তাঁহারা দেখিলেন নির্য্যাস-তরু (Gum trees), বা গঁদের গাছ শাখা-প্রশাখা বিস্তার করিয়া আছে। তাহার উপর শ্বেত পিপীলিকার মাটির তৈরী বাসা, এবং আশ্চর্য্য প্রাণী ক্যাঙ্গারু (Kangaroo) দেখিতে পাইলেন। তাহারা এক-স্থানে একটি ক্যাঙ্গারুকে গুলি করিয়া মারিলেন। তাঁহারা উহার মাংস খাইয়া দেখিলেন যে মাংস খাইতে নেহাৎ মন্দ নয়। এক যায়গায় তাঁবু গাড়িয়া

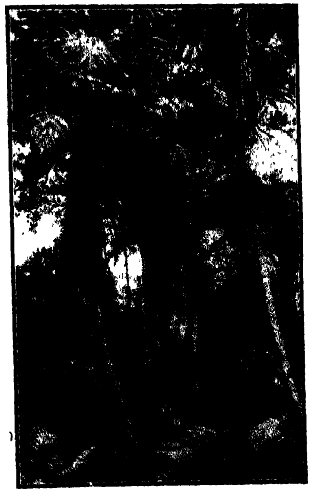
তাঁহারা মহাবিপদে পড়িয়াছিলেন। এক ঝাঁক মশা মেঘের মত অন্ধকার করিয়া আসিয়া তাঁহাদিগকে এমন করিয়া ঘিরিয়া ফেলিল যে, তাঁহারা তাড়াতাড়ি ঐ স্থান ত্যাগ করিয়া প্রাণ বাঁচাইলেন। নিউজিল্যাণ্ডের লোকদের চেয়ে এদেশের লোকেরা অনেকটা নির্বোধ, তবে এখানকার লোকেরা বেশ মিশুক। দেশী লোকেরা তাহাদের শরীর লাল ও সাদা রঙে চিত্রিত করে। কাপড় পরে না আর তাহারা গলায় এবং শরীরে কড়ি, শঙ্খ ও শামুক প্রভৃতির মালা পরে। একজন দেশীয় সর্দারকে একটি জামা দেওয়া হইলে পর, সে মহা সমস্যায় পড়িল। অনেকক্ষণ পর্যন্ত উহা হাতে লইয়া নাড়া চাড়া করিয়া শেষটায় উহা পাগড়ীর মত করিয়া মাথায় পরিল।

এই দীর্ঘ যাত্রার মধ্যে তাঁহারা তেমন কোনও বিপদে পড়েন নাই। তাঁহারা যখন অষ্ট্রেলিয়ার পূর্বোপকূল ধরিয়া উত্তরাভিমুখে যাইতেছিলেন, সে সময়ে হঠাৎ তাঁহাদের জাহাজ একটা জলমগ্ন পাহাড়ে ঠেকিয়া গেল। সেই আঘাতে জাহাজের তলা ছিদ্র হইয়া গেল। এই বিপদের সময়ে যাত্রীদল অত্যন্ত দৃঢ়তা এবং সতর্কতার সহিত, পুরাণো পাইল ও পশমের স্তূপ এবং জীর্ণ রজ্জুর শণ ইত্যাদি দিয়া 'এণ্ডেভার' জাহাজের ছিদ্র রোধ করিয়াছিলেন। এই ব্যবস্থার ফলে 'এণ্ডেভার' জাহাজ ডুবিল না। তারপর একটা অনুকূল বাতাসের প্রভাবে জাহাজ তীরে ভিড়াইয়া লইয়া তাঁহারা সম্পূর্ণ নিরাপদ হইয়াছিলেন।

এই ঘটনার পরও তাঁহাদের অনেক বিপদের মুখে পড়িতে হইয়াছিল। সে সমুদয় বিপদে কুক্ যেরূপ ধৈর্য্য, সাহসিকতা, এবং প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব ও বীরত্বের পরিচয় দিয়াছেন, তাহা বাস্তবিকই প্রশংসনীয়। চারি মাস পরে তাঁহারা জাভা বা (Java) যবদ্বীপে আসিলেন। বাটাভিয়াতে (Batavia) যখন অবস্থান করিতেছিলেন, তখন এস্থান ম্যালেরিয়া জ্বরের কেন্দ্রস্থান বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। জাহাজের নাবিকদের ও যাত্রীদের মধ্যে অনেকেই জ্বরে আক্রান্ত হইলেন। তাহিতি দ্বীপের অধিবাসী তুপিয়ার ছেলে, তেয়োতা সকলের আগে সেই ভীষণ জ্বরের আক্রমণে প্রাণ হারাইল। পুত্রশোকাতুর তুপিয়াও তাহার এক সপ্তাহ পরে সেই ভীষণ জ্বরে আক্রান্ত হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হইল। তারপর জাহাজের অস্ত্রচিকিৎসকের মৃত্যু হইল।

এমন দিন ছিল না, যেদিন একজন না একজন নাবিকের মৃত্যু না হইত। ছয় সপ্তাহের মধ্যে তাঁহাদের দলের ২৩ জন লোকের মৃত্যু হইয়াছিল। আর ৪০ জন লোক শয্যাশায়ী ছিল।

২৭শে ডিসেম্বর বাটাভিয়া পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারা ইংল্যাণ্ডের দিকে যাত্রা করিলেন। ১৭৭১ খৃঃ অঃ ১৫ই মার্চ্চ উত্তমাশা অন্তরীপে



তাহিতির একটি সাধারণ দৃশ্য

(Cape of Good Hope) আসিয়া পৌঁছিলেন। এখানকার মুক্ত নির্মল বায়ুতে রোগগ্রস্ত ব্যক্তিরা আরোগ্য লাভ করিয়াছিল। তাঁহারা যখন কেপটাউনে ছিলেন, সে সময়ে একজন ভদ্রলোক তাঁহার ছেলেমেয়েদের সহিত তাঁহাদের সহযাত্রী হইলেন। ভদ্রলোক সহর হইতে পনেরো দিনের পথ দূরে থাকিতেন। জাহাজে আসিলে পর তাঁহাকে যখন জিজ্ঞাসা করা হইল আপনি ছেলে-মেয়েদিগকে লইয়া আসিলেন কেন? তাহাদিগকে কোনও প্রতিবেশীর কাছে রাখিয়া আসিলেই পারিতেন। ভদ্রলোক মলিন মুখে বলিলেন—

আমার নিকটতম প্রতিবাসী ও আমার বাড়ী হইতে প্রায় পাঁচ দিনের পথ দূরে থাকেন। সে সময়ে কেপ কলোনির অধিবাসীরা এইরূপভাবেই বাস করিতেন। কুক্ ১৪ই এপ্রিল Capetown পরিত্যাগ করিয়া ১৭৭১ খৃঃ অঃ ১২ই জুলাই ইংল্যাণ্ডে প্রত্যাগমন করেন।

দেশে ফিরিয়া আসিয়া কুক্ যশের অধিকারী হইলেন। তাঁহাকে 'কাপ্তেন' (Captain) উপাধি-ভূষণে ভূষিত করা হইল। অতঃপর তিনি আরও দুইবার সামুদ্রিক অভিযান করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় যাত্রায় দক্ষিণ বৃত্ত (কুমেরু-বৃত্ত) অর্থাৎ Antarctic circle পর্য্যবেক্ষণের জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। কিন্তু দারুণ শীত, ঘন কুয়াসা এবং ভাসমান তুষার-শিলার (Icebergs—Floating rocks) জন্য নানারূপ বাধা বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছিল। এ যাত্রায় তিন বৎসরে কুক্ প্রায় ষাট হাজার মাইল সমুদ্র-ভ্রমণ করিয়াছিলেন।

১৭৭৫ খৃঃ অঃ এই সামুদ্রিক অভিযানের পর দেশে ফিরিয়া আসিলে পর তাঁহাকে আরও রাজ-



প্রশান্ত মহাসাগরের হাওয়াই দ্বীপের পুরুষ

সম্মানে ভূষিত করা হইয়াছিল। এ সময়ে তাঁহার একখানি ডায়ারি বা দৈনান্দিন লিপি পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছিল।

কুকের প্রাণে সাগরের ডাক প্রতিনিয়ত এমন ভাবে সাড়া দিত যে, কোন প্রকারেই তিনি দীর্ঘকাল দেশে থাকিতে পারিতেন না। ১৭৭৬



স্যাণ্ডউইচের মুখোশ পরা মানুষ

খৃঃ অঃ ১২ই জুলাই তারিখে পুনরায় সমুদ্র-যাত্রা করিলেন। এইবার তিনি প্রশান্ত মহাসাগর ও আটলান্টিক মহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী উত্তর দিকের একটি পথ আবিষ্কার করিবার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন।

এ যাত্রায়ও তিনি প্রশান্ত মহাসাগরের বুকে কয়েকটি দ্বীপের সন্ধান পাইয়াছিলেন। হাওয়াই, স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপ প্রভৃতি (Hawaiian এবং Sandwich Islands)। এ যাত্রায় তিনি সুমেরু বৃত্ত (Arctic circle) পর্য্যবেক্ষণ করেন।

১৭৭৮ খৃঃ অঃ নভেম্বর মাসে স্যাণ্ডউইচ্ দ্বীপে ফিরিয়া আসেন। তাহার পর ১৭৭৯ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে হাওয়াই দ্বীপ আবিষ্কার করেন। এই দ্বীপের লোকেরা বেশ শান্ত-শিষ্ট ছিল এবং কাপ্তেন কুক্ ও তাঁহার সঙ্গীদের প্রতি বেশ ভাল ব্যবহারই করিয়াছিল। দ্বীপের অধিবাসীরা দলে দলে হাজারে হাজারে তাহাদিগকে দেখিতে আসিল, জাহাজের চারিদিক বেড়িয়া সাঁতরাইতে লাগিল এবং ক্যানোতে চড়িয়া জাহাজের কাছে

আসিল। কুককে তাঁহারা রাজার মত অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

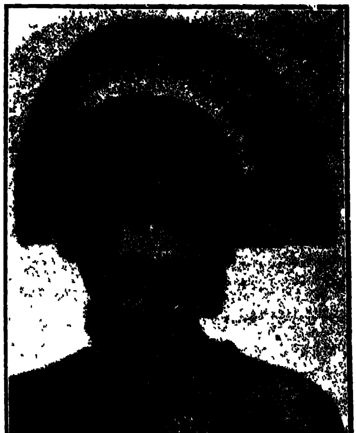
একদিন রাত্রিতে জাহাজের একখানি ক্ষুদ্র নৌকা চুরি হইয়া গেল। কুক্ সেই নৌকাখানি



ব্রিটিশ কলাম্বিয়ার ভ্যাঙ্কোবার দ্বীপের স্ত্রীলোক

ফিরিয়া পাইবার জন্য কয়েকজন সঙ্গীসহ তীরে অবতরণ করিলেন। প্রথমটায় বেশ বিনা গোলমালেই কাটিয়া গেল। হঠাৎ তাঁহার চারিদিকের লোকগুলি বিরোধী হইয়া দাঁড়াইল। অল্প একটু দূরে সরিয়া যাইতে পারিলেই তাঁহারা নিরাপদ হইতে পারিতেন, সঙ্গীদিগকে আদেশ দিবার জন্য যেমন তিনি মাথা ফিরাইয়াছেন, অমনি পেছন হইতে অসভ্য অধিবাসীরা সম্পূর্ণ অতর্কিতভাবে তাঁহাকে আক্রমণ করিয়া নিহত করিল। এইভাবে কুকের ন্যায় একজন সাহসী নাবিকের মৃত্যু হইল। ১৭৭৯ খৃঃ অঃ ১৪ই ফেব্রুয়ারী তারিখ এই দুর্ঘটনা ঘটে।

তাঁহার সঙ্গী নাবিকদের লিখিত বিবরণী হইতে জানা যায় যে, নয়জন নাবিক এবং একজন ল্যাফটেনান্টকে লইয়া কুক্ তীরে অবতরণ করেন। তিনি দ্বীপের রাজার শিবিরে গমন করিয়া রাজাকে জাহাজে আসিবার জন্য আহ্বান করিলেন। কুকের অভিপ্রায় এই ছিল যে, হারাণো নৌকা খানি ফিরিয়া না পাওয়া পর্য্যন্ত রাজাকে জাহাজেই রাখিয়া দিবেন। কুকের এই নিমন্ত্রণ ব্যাপারটাকে দ্বীপের অধিবাসীরা সন্দেহের চক্ষে দেখিল এবং তাহারা রাজাকে কুকের নিমন্ত্রণ প্রত্যাখ্যান করিবার জন্য পীড়াপীড়ি করিতে লাগিল। এইভাবে ঘটনা জটিল হইয়া দাঁড়াইল। তখন কাপ্তেন তাঁহার সঙ্গী নয়জন লোককে সমুদ্রের পাড়ে সার বাঁধিয়া দাঁড়াইতে আদেশ করিলেন। এবং গুলি ছুঁড়িবার জন্য প্রস্তুত হইয়া থাকিতে বলিলেন। এ সময়ে একটা আকস্মিক দুর্ঘটনা ঘটিয়া গেল। কুকের একজন সঙ্গী নৌকা হইতে নিক্ষিপ্ত একটা গুলিতে একজন সর্দ্দারের মৃত্যু হইয়াছিল। এই ঘটনায় দ্বীপের লোকেরা বিদ্রোহী হইয়া উঠিল, তাহারা তাহাদের ঢাল ও বল্লম লইয়া যুদ্ধ করিবার জন্য প্রস্তুত হইয়া তীরের



একজন দেশীয় রাণী

দিকে দলে দলে ছুটিয়া আসিতে লাগিল। তাহাদের এইরূপ উত্তেজিত ভাব দেখিয়া কুক্ সঙ্গীদিগকে গুলি করিতে আদেশ দিলেন। দুই একটি গুলি ব্যর্থ হওয়ার দরুণ দ্বীপের অধিবাসীরা অগ্রসর হইতে লাগিল। তাহাদের বল্লমের

আঘাতে ল্যাফটেনাণ্ট প্রাণ হারাইলেন। চারিজন নাবিকেরও মৃত্যু হইল। কুক্ সমুদ্রের তীরে আসিয়া নৌকা হইতে বন্দুক ছুড়িতে নিষেধ



হাওয়াই দ্বীপের লোকের চিংড়ি মাছধরা জাল

করিবার জন্য যেমন মুখ ফিরাইয়াছেন, অমনি পিছন হইতে একটা বল্লম আসিয়া তাঁহাকে বিদ্ধ করিল, তিনি সমুদ্রের জলে পড়িয়া গেলেন। কয়েক মুহূর্ত্ত মধ্যেই তাঁহার শেষ নিঃশ্বাস বাতাসের গায়ে মিলাইয়া গেল। তাঁহার মৃতদেহ অনেক ক্লেশে উত্তেজিত দ্বীপবাসীদের হস্ত হইতে উদ্ধার করিয়া সমুদ্রের অতল-নীরে সমাধিস্থ করা হয়।

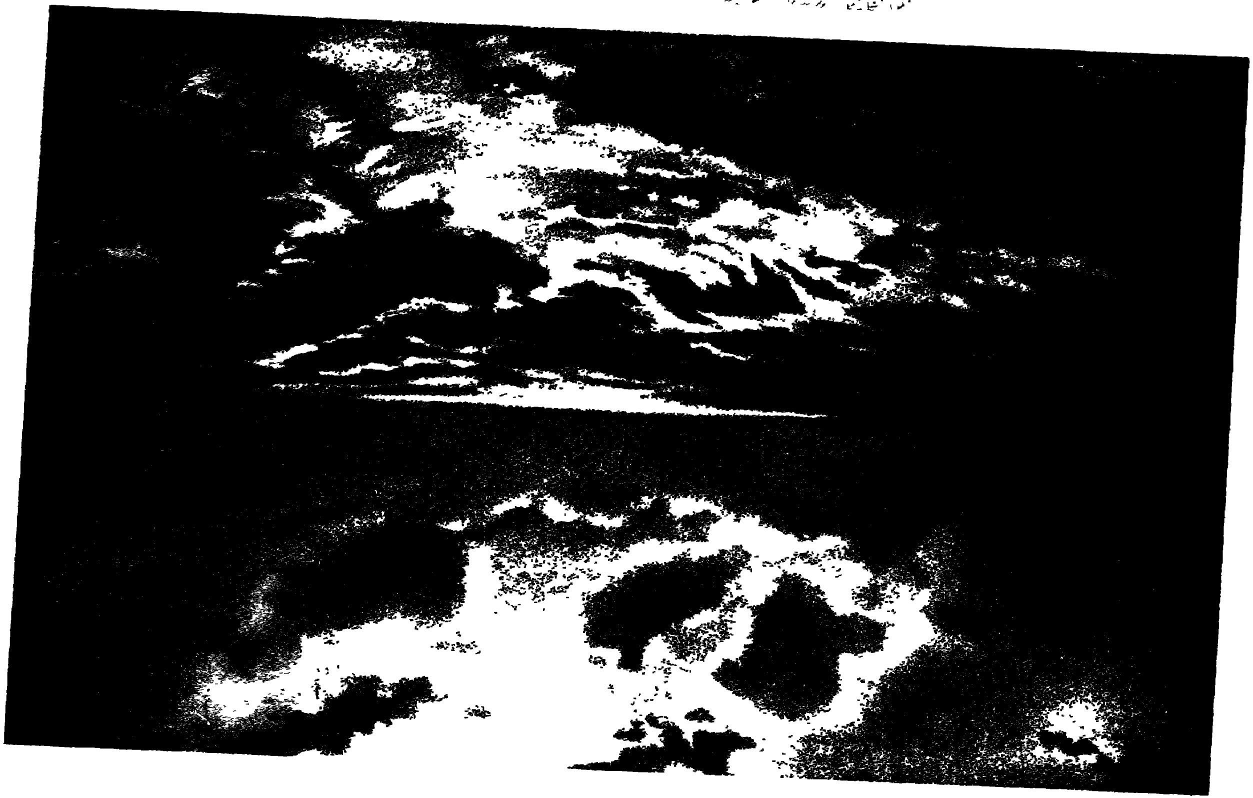
ইংল্যাণ্ডের আবিষ্কারকগণের মধ্যে ক্যাপ্তেন কুক্ অতি শ্রেষ্ঠস্থান অধিকার করিয়া আছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের দক্ষিণাংশে এমন স্থান নাই, যে দিকে তাঁহাব জাহাজ অগ্রসর না হইয়াছিল। তিনি মানুষের জ্ঞানের পরিধি বাড়াইয়া দিয়াছেন। অনেক অজানা দ্বীপের সন্ধান, অনেক অজানা সমুদ্রতীরের রহস্তময় কাহিনী তাঁহার অদম্য উৎসাহ ও উদ্যমের ফলেই জন-সমাজে প্রচারিত হইয়াছিল। অষ্ট্রেলিয়া প্রধানতঃ তাঁহাব জন্যই ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্ত হইতে পারিয়াছে।

কাপ্তেন কুক্ একজন দুঃসাহসী নাবিক ছিলেন। যেমন তাঁহার সাহস ছিল, তেমনি ছিল তাঁহার বুদ্ধি-বিবেচনা এবং পর্য্যবেক্ষণ শক্তি। নানা দেশ বিদেশে ভ্রমণ, নানা জাতীয় লোকের সহিত মেলামেশা, সহযাত্রীদের সুখ দুঃখের প্রতি লক্ষ্য



ট্যাসম্যানিয়ার নদী

রাখা—এসকল বিষয়ে তিনি একজন অসাধারণ ব্যক্তি ছিলেন। কুক্ যখন যে দ্বীপে গিয়াছেন, যে দেশে পৌছিয়াছেন, তখনই সে দেশের জরিপ করিয়াছেন। প্রশান্ত মহাসাগরের অন্তর্ভুত অনেকগুলি দ্বীপের বিবরণ, লোকজনের পরিচয়, জীবজন্তুর বিবরণ কুকের পূর্ব্বে কেহ প্রকাশ করিতে পারেন নাই। কাপ্তেন কুকের লিখিত জীবনী ও বিবরণী তোমরা পড়িও। সেই বইখানির নাম—'Book's voyages with a Life' —by M. B. Synge—এই বইখানিতে তাঁহার জীবন-কথা এবং ভ্রমণ বিবরণী দুই-ই আছে।





সিন্ধু-তরঙ্গ

২১৬৮ পৃষ্ঠার পর

গেল বারে তোমাদিগকে বুঝিয়ে দিয়েছি যে, মহাসাগরের বারিরাশিতে বিশুদ্ধ জল ছাড়া আরও কত কি পদার্থ আছে। রকম রকমের লবণ নানাজাতীয় বাষ্প, জলে মিশে রয়েছে ও আপন আপন কাজ করছে। তার উপর আবার জীবাণু সংক্রান্ত কত কি সূক্ষ্ম ব্যাপার নিত্য ঘটছে। সে সব কথা তলিয়ে বোঝবার বয়স তোমাদের এখনও হয় নাই। যতটা বোঝা দরকার, ক্রমশঃ বলব। তবে এই কথাটা এখনই জেনে রাখ যে অণুবীন বা অণুবীক্ষণের সাহায্য না পেলে সমুদ্রের অধিকাংশ জীব জন্তু ও গাছগাছড়ার রহস্য-ভেদ করা সম্ভব হ'ত না। তোমরা নিশ্চয়ই জান যে জীবের ও উদ্ভিদের প্রথম উদ্ভব হয়েছিল জলে। সেই আদিম যুগের প্রাণীজগতের সঙ্গে পণ্ডিতদের আজকের দিনে সাক্ষাৎ পরিচয় হচ্ছে প্রধানতঃ সমুদ্রের জলের মাঝে। ডাঙ্গায় আর সেকালের সেই এক-কোষ প্রাণী বা আদিম শৈবাল জাতীয় আগাছার বড় একটা দেখা পাওয়া যায় না। তাই সমুদ্রবিদ্যার আজ এত কদর! তা ছাড়া পুরাকালে যে সমস্ত বর্ম্মচর্ম্ম পরা জন্তু ডাঙ্গায় সর্ব্বত্র ঘুরে বেড়াত, তারাও একরকম লুপ্ত হয়েছে। গণ্ডার বা armadillo, তেলাপোকা বা ঘুরঘুরে পোকা, এই রকম দু-পাঁচটা আছে মাত্র। কিন্তু সাগরের জলে বর্ম্মাবৃত জীব, অতি-বৃহৎ থেকে অতি ক্ষুদ্র, কত যে আজও রয়েছে, তার ইয়ত্তা নেই। তাদের জন্ম-মৃত্যু গতিবিধি পর্য্যালোচনা করলে আমরা আদিম কালের স্থলচর জীবের কথা অনেক কিছু অনুমান করতে পারি, বুঝতে পারি। তার পর গাছপালার কথা ভাব। তোমরা নিশ্চয় জান যে আজকের কালে গাছ বলতে যা বোঝায়, আম, জাম, শাল, তমাল, তাল তা পুরাকালে ছিল না। তখন ছিল শুধু তৃণও শৈবাল জাতীয় আগাছা। অঙ্গার যুগে এই সমস্ত আগাছা বিশাল আকারের হয়েছিল। বিশাল হলেও কিন্তু তারা আগাছা জাতীয়ই ছিল, বৃক্ষ-জাতীয় নয়। তাদের ফল ফুল, আঁটি বীজ, কিছুই হত না। সাগর-গর্ভের উদ্ভিদের বর্ত্তমান কালেও এই দশা। আঁটি বা বীজের সঙ্গে তাদের কোন সম্পর্ক নেই—তারা জন্মায় পেঁয়াজের মত মূল বা Bulb হ'তে নয়ত Fern বা ঢেঁকি শাকের গায়ে যে রকম গুটী থাকে তাই হতে। সমুদ্র-গর্ভের এই সব গাছপালার কথা তোমাদিগকে পরে যথাস্থানে ভাল করে বলব। এমন সব অদ্ভুত অদ্ভুত বস্তু জলের তলায় দেখতে পাওয়া যায়, যাদের প্রথম দর্শনে চেনাই যায় না, প্রাণী কি, উদ্ভিদ, জীবন্ত পদার্থ কি জড়পিণ্ড, ঝিনুক-শামুক কি পাথর নুড়ি!

একটা কথা তোমাদের বেশ করে বোঝা চাই যে, কোন জীব বা উদ্ভিদ-বিশেষের মূর্ত্তি কি

রকম হবে, তার চাল-চলন ধরণ-ধারণ কি রকম হবে, কি রকমে সে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করবে, সেটা সম্পূর্ণ নির্ভর করছে তার আবেষ্টনের উপর। যারা ডাঙ্গায় চলা-ফেরা করে তাদের যেমন পায়ের প্রয়োজন, তেমনই আবার যারা আসমানে উড়ে বেড়ায় তাদের ডানার দরকার। তেমনই আবার যারা জলে সাঁতরে বেড়ায় তাদের হাঁসের মতন পা কি মাছের মতন লেজ ও পাখনার প্রয়োজন। কাজেই সাগর-গর্ভের জলজ-প্রাণীরা কি রকম আবেষ্টনের মাঝে জন্ম নেয় ও জীবন কাটায়, সেটার বিষয়ে তোমাদের স্পষ্ট ধারণা থাকা চাই। তাদের জলে নুন আছে, অক্সিজেন আছে, কার্ব্বনিক এ্যাসিড আছে, একথা তোমরা শিখেছ। কিন্তু এই জল সম্বন্ধে আরও অনেক কথা তোমাদের জানা চাই; কেন না ভেবে দেখ, শুধু অক্সিজেন ও কার্ব্বনিক এ্যাসিড বাষ্প থাকলেই যে জীবের প্রাণ বাঁচতে পারে, তা ত নয়! তার জীবন-ধারণের জন্য অল্প বিস্তর আলোরও দরকার। সাগরের অতল গর্ভে কতদূর আলো পৌঁছায়, তার উপর নির্ভর করছে কত নীচে অবধি জীব-জন্তু গাছগাছড়া দেখতে পাওয়া যাবে। তাই তোমাদের জানা দরকার হবে মহাসমুদ্র কোন্ জায়গায় কত গভীর, আর সেই গভীরতা কি উপায়ে, কি যন্ত্রের সাহায্যে মাপা যায়। তার পর, এ কথাও তোমাদের লক্ষ্য করতে হবে যে সমুদ্রের জলের কোথায় কত উত্তাপ, কোথায় কতখানা চাপ, জল স্থির কি চঞ্চল। এ কথা কেন বলছি, একটু বুঝিয়ে দিতে চেষ্টা করবো। মেরুপ্রদেশের তুষার শীতল জলে যে রকম জীব বা উদ্ভিদ দেখতে পাবে, বিষুবরেখার উত্তপ্ত জলে তা ত পাবে না! এ তফাৎ স্থলচর জীবদের মধ্যেও দেখতে পাবে। উষ্ণপ্রদেশের ভালুক কি হরিণ এক রকমের হয়, অতি-শীতল প্রদেশের হরিণ (Reindeer) বা ভাল্লুক (Polar Bear) আবার অন্য প্রকারের হয়। গরম সমতল দেশের চিতাবাঘ এক রকমের হয়, আবার উঁচু পাহাড়ের সাদা চিতা (Snow-Leopard) আর এক রকমের হয়। আবার প্রাণীর দেহের উপর কতটা চাপ বা ভার পড়ছে, তার উপর নির্ভর করে তার দেহের গঠন কেননা, ততটা চাপ সইতে পারে এমনতর শক্ত তার খোলসটা হওয়া চাই ত! সাগরের গভীর জলে এরকম অনেক জীব আছে, যাদিকে বাহিরে আনলেই তাদের দেহ তৎক্ষণাৎ ফেটে যায়, আর তারা মরে যায়। এই যে আমরা ডাঙ্গার প্রাণী, মানুষ, আমাদেরও নিয়ত কতখানা চাপ সহ্য করতে হয় তা কি তোমরা জান? আমরা ত সত্যি কিছু শূন্যে চলাফেরা করছি না। আমরাও বাস করি এক মহাসমুদ্রের তলায়। তবে সে বারি-সমুদ্র নয়, বায়ু সমুদ্র। পৃথিবীকে চারিদিকে ঘিরে আছে যে পঁচিশ ক্রোশ পুরু বায়ু-মণ্ডল, তারই ওজন আমাদের শরীরের প্রত্যেক অঙ্গের উপর সর্ব্বক্ষণ চেপে রয়েছে। দমকল লাগিয়ে কোন অঙ্গের উপরকার হাওয়াটা চুষে নিলে সে অঙ্গ তৎক্ষণাৎ ফুলে উঠবে, চামড়া ফেটে রক্ত বেরোতে থাকবে। বায়ুমণ্ডলের এক নিয়ম যে যত উপরে যাবে হাওয়া তত পাতলা হবে আর ওজন তত কমবে। ফলে খুব তাড়াতাড়ি যদি তুমি কোন উঁচু পাহাড়ে চড়ে যাও ত তোমার গা ফেটে রক্ত পড়বে, নিঃশ্বাস নিতে কষ্ট হবে, নানারকম অস্বস্তি বোধ করবে। বায়ুর মতন হালকা জিনিসের চাপেই যখন এতটা তফাৎ হয়, তখন জলের চাপ সহ্য করবার জন্য দেহ কতটা শক্ত হওয়া চাই তা সহজেই অনুমান করতে পার। তোমাদের মধ্যে যদি কেউ গভীর জলে ডুব দিয়ে থাক তা' হলে লক্ষ্য করে থাকবে যে তলার কাছে জল কি রকম চারিদিক থেকে চেপে ধরে। অতএব বুঝতে পারছ যে সমুদ্রের জীব বা গাছগাছড়াকে ভাল করে চিনতে জানতে হলে সমুদ্রগর্ভের অবস্থা সম্বন্ধে একটা পরিষ্কার ধারণা থাকা চাই!

এখন বল দেখি, মহাসাগর বললেই নোনা জল ছাড়া আর কি কথা সহজেই মনে আসে! ইংরেজ কবি বায়রণ সমুদ্রের বর্ণনা করিতে গিয়ে প্রথমেই লিখেছেন:—

"Roll on, thou deep and dark blue Ocean, roll."—আমাদের বাঙ্গলার কবি গেয়েছেন,

"ঘুমন্ত পৃথ্বীরে * * তরঙ্গবন্ধনে বাঁধি,
নীলাম্বর অঞ্চলে তোমার
সযত্নে বেষ্টিয়া ধবি···

আর এক কবি লিখেছেন:—

"সিন্ধুপারে গর্জ্জে ঢেউ দণ্ডমাত্র নয়কো স্থির,
নীচে পড়ে আছে অগাধ স্তব্ধ শান্ত সিন্ধুনীর।"



সিন্ধু-তরঙ্গ

বোয়ে, ত্রাস, উর্ব্বিশ্বারে   শ্রীনন্দলাল প্রতিদাস

তাহলে দেখ, মহাসিন্ধু বলতে প্রথমে মনে হবে তার সুন্দর নীল জল, তার পর মনে হবে তার উর্ম্মিমালা, তরঙ্গ-ভঙ্গ। এখন মুস্কিল হচ্ছে এই যে বিজ্ঞান ত কবিতা নয়, কবিতাও বিজ্ঞান নয়, আর আপাততঃ তোমরা শিখতে বসেছ বিজ্ঞান। সত্যি কথা হচ্ছে, সমুদ্রের জল কখনও নীল কখনও বা নীল নয়। যদি সর্ব্বত্র নীল হত, তা হ'লে শ্বেত সমুদ্র, কৃষ্ণসমুদ্র পীত সমুদ্র, লোহিত সমুদ্র, এসব নামগুলোও শোনা যেত না। শ্বেত সমুদ্র চিরতুষারময় তাই সত্যই শ্বেত, কৃষ্ণসাগর গভীর তাই যথার্থ তার রঙ্গ গাঢ় নীল। পীত ও লোহিত নামের মর্ম্ম পরে বলছি।

আবার দেখ, কবি যাই বলুন, সমুদ্রের উপরে ঢেউ আর নীচে স্তব্ধ শান্ত নীর, এ কথাতেও বিজ্ঞান সায় দেয় না। বিজ্ঞানের মতে মহাসাগরের নীর শুধু উপরে নয় তলা অবধি সর্ব্বত্র চঞ্চল, ক্রমাগত চলছে, ফিরছে, নড়ছে। আগে রঙ্গের কথা বলি শোন, তার পর জলের অবিশ্রান্ত চঞ্চলতার কথা তোমাদিগকে বোঝাব।

কাব্যের কল্পনা এই পর্য্যন্ত সত্য যে সমুদ্র যেখানে অগাধ, অতল, অর্থাৎ যেখানে জল এত গভীর যে তলা মোটে দেখা যায় না, সেখানকার রঙ্গ সুন্দর নীল। তবে এই নীল'ও পৃথিবীর সকল ভাগে এক রকমের নয়। যে জায়গায় জলে লবণের ভাগ কম, সেখানের নীল রঙ্গও একটু ফিকে। আবার যেখানে লবণ বেশী, সেখানে রঙ্গও গাঢ় নীল। এত গেল গভীর জলের কথা! কিন্তু যদি উপর থেকে তলা দেখা যায় তাহলে অন্য ব্যাপার। তখন লোনা জলের স্বাভাবিক নীল বর্ণের সঙ্গে তলার বালির সোনালী আভা মিশে জল দিব্যি সবুজ দেখায়! এই নীল বা সবুজের আভা আবার নানা স্থানে নানাবিধ। নীল বলতে কখন আসমানী রঙ্গ, কখন নীলকান্ত মণির রাগ, কখনও অপরাজিতার বর্ণ—কচিৎ কখনও আবার একেবারে বেগুনে। সবুজও তেমনি কচি পাতার কোমল রাগ থেকে আরম্ভ করে উজ্জ্বল ময়ূরকণ্ঠী রঙ্গ পর্য্যন্ত সকল রকম আভাই নজরে পড়ে।

কিন্তু জলের রঙ্গ যে শুধু গভীরতা কি নুনের পরিমাণের উপর নির্ভর করে, তা নয়। সমুদ্রের উপর অনেক জায়গায় দেখতে পাবে গাদা গাদা জলজ শৈবাল (Moss) ভেসে বেড়াচ্ছে। তার বর্ণ কতকটা সবুজ, কতকটা পাটকিলে, কতকটা বা সুন্দর লাল। এই ভাসন্ত শৈবালরাশির দরুণ আবার জলের রঙ্গ একেবারে অন্য রকম হয়ে যায়।

যেখানে অনেক পরিমাণে নদীর ঘোলা জল এসে সমুদ্রে পড়ছে, সেখানকার সমুদ্র জলের রঙ্গও ঘোলাটে হয়ে যাবে এ কথা সহজেই অনুমান করতে পার। এই কারণেই চীন উপকূলের সাগরের নাম পীত সাগর হয়েছে। লোহিত সাগরের নামকরণ কিন্তু হয়েছে দুই বিভিন্ন কারণে। প্রথম, ঐ সমুদ্রে রাশি রাশি শৈবাল ভেসে বেড়ায় বলে জলটা স্থানে স্থানে পাটকিলে দেখায়, দ্বিতীয় জলের কিনারায় বিস্তর প্রবাল থাকার দরুন কিনারার রঙ্গটা অনেক জায়গায় লালচে।

তোমাদের মধ্যে যারা প্রয়াগে গঙ্গা-যমুনা-সঙ্গম দেখেছ, কি গোয়ালন্দ ছাড়িয়ে পদ্মা-মেঘনার মোহানা দেখেছ, তারা প্রত্যক্ষ জান যে বিভিন্ন নদীর জলের রঙ্গ কত বিভিন্ন রকমের হতে পারে। যে জলে কাদা বেশী থাকে সেটা হয় সাদা, আর যাতে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম শ্যাওলা আগাছা ভাসছে সেটা হয় সবুজ-মত। এই অতি সূক্ষ্ম উদ্ভিদকণার জন্যই ত উত্তর মেরুপ্রদেশের সমুদ্রের রঙ্গ কোথাও কোথাও বেশ সবুজ।

আর একটা ব্যাপারের উপর নির্ভর করছে সমুদ্রের রঙ্গ। সমুদ্র বলতে ত একটা বিস্তীর্ণ জল-রাশি—পড়ে রয়েছে যেন একখানা মস্ত আয়না। এই আয়নাতে সদা সর্ব্বদা মাথার উপরের অনন্ত আকাশের ছবি প্রতিফলিত হচ্ছে। যখন সেই আকাশ নীল, তার প্রতিবিম্বও নীল, যখন আকাশ গোধূলিরাগে রঞ্জিত তখন সমুদ্রও অগ্নিবর্ণ। আবার যখন নভোমণ্ডল কালবৈশাখীর মেঘে ছেয়ে আসে, তখন সমুদ্রের রঙ্গও হয়ে যায় সীসের মতন ধূসর, জল যেন অধীর হয়ে ফুলতে থাকে, আকাশের সঙ্গে প্রচণ্ড তাণ্ডবে মাতবে বলে। তোমাদের ভিতর যারা চৈত্র-বৈশাখে পদ্মাবক্ষে যাওয়া আসা করেছ তারা সহজেই সমুদ্রের এই রুদ্র মূর্ত্তির ধারণা করতে পারবে। প্রবীণ মাঝি-মোল্লারা সমুদ্রের রঙ্গ দেখে আগের থেকেই বুঝতে পারে কখন ঝড় আসছে।

মহাসাগরের বুকে এই বিচিত্র রঙ্গের খেলা বড় চমৎকার জিনিষ। তাই একটু একটু করে

অনেক বেশী কথা বলা হয়ে গেল। আশা করি তোমরা নিতান্ত অধীর হও নাই। অন্য কথায় এখন আলোচনা করছি। জল তরল পদার্থ। তরল পদার্থ সহজেই চঞ্চল। জলের উপর সামান্য একটু হাওয়া লাগলেই ঢেউ ওঠে, এ তোমরা নিশ্চয় জান। নদীতে, পুকুরে, ডোবায়, এমন কি চৌবাচ্চায় এ ব্যাপার ত নিত্য দেখছ! এখন, এই যে আমাদের বায়ুমণ্ডল, এও ত এক মুহূর্ত্ত স্থির নয়! যত মন্দ মন্দই হক এর একটা গতি আছেই সারাক্ষণ। হয় ত ঠিক তোমার চারপাশে একটু কম, কিন্তু এক মাইল দূরে বেশী, দু'মাইল দূরে আরও বেশী, একশো মাইল দূরে হয় ত ঝড় বয়ে যাচ্ছে। এই বহমান হাওয়া সমুদ্রের উপর যেখানে লাগছে সেইখানকার জল নেমে যাচ্ছে, সঙ্গে সঙ্গে পাশের জলটা উঠে পড়ছে, তার পরের জল নামছে, তার পরেরটা উঠছে, এমনি করে জলে লহর খেলে যাচ্ছে। এই ব্যাপার চলেছে সর্ব্বক্ষণ, হাওয়ারও বিরাম নেই, ঢেউএরও বিরাম নেই। কখনও ছোট ছোট লহরমালা, কখন বিশাল তরঙ্গ। এখন, এই যে ঢেউএর নাচ, এর সম্বন্ধে এই কথাটী তোমাদের মনে রাখতে হবে যে জলটা উঠছে নামছে মাত্র, চলছে না। লম্বা রশি ধরে তোমরা দুজনে যদি তাকে নাচাও তাহলে এই রকম ঢেউ খেলান গতি স্পষ্ট দেখতে পাবে। দেখবে রশির উপর ঢেউ নেচে নেচে চলে যাচ্ছে কিন্তু সত্যি ত রশির কোন অংশ তার স্থান ছেড়ে এগিয়ে যাচ্ছে না। পুকুরের পাড়ে দাঁড়িয়ে লক্ষ্য কর, দেখবে যে জলের উপর ভাসন্ত শুকনো খড়-কুটো গুলো ঢেউএর সঙ্গে নাচছে বটে কিন্তু কোন দিকে এগিয়ে যাচ্ছে না।

স্রোতস্বতী নদীতে দেখবে সম্পূর্ণ অন্য ব্যাপার। সেখানে সমস্ত জলটা সারাক্ষণ তরতর্ করে বয়ে যাচ্ছে সমুদ্রের পানে, আর যা কিছু সেই স্রোতে পড়ছে তাও ভেসে চলেছে জলের সঙ্গে সঙ্গে। ঢেউ আর স্রোত তা হ'লে দুটো আলাদা জিনিষ। ঢেউ গুলো নাচে, স্রোতে বয়ে যায়। ঢেউএর উপর কোন জিনিষ একটু এগিয়ে যাচ্ছে যদি দেখ ত সে জলের টানে নয়, হাওয়ার ঠেলায়।

আচ্ছা, সমুদ্রের ঢেউগুলো কত বড় তার কোন ধারণা আছে তোমাদের? পুকুর না নদী দেখে সাগর-তরঙ্গের ধারণা হয় না। যারা পুরী ওয়ালটেয়ারে গেছ তারা ত আপন চোখেই দেখেছ। সাধারণ জোরে হাওয়া বইলে সমুদ্রে যে ঢেউ ওঠে তার মাপ তিন চার হাত। ঢেউ গুলো যখন চার হাত উঁচু হয় তখন তার বিস্তৃতি, অর্থাৎ একটা ঢেউএর চূড়া থেকে তার পরের ঢেউএর চূড়া পর্য্যন্ত অন্তর হয় প্রায় চল্লিশ পঞ্চাশ হাত। কিন্তু খোলা দরিয়াতে তিরিশ চল্লিশ হাত অবধি ঢেউ ওঠা কিছুই বিচিত্র নয়। মাঝ সমুদ্রে বড় জাহাজের গলুইএর উপর দাঁড়ালে বেশ বোঝা যায় যে প্রায় তিন তলার সমান উঠছি নামছি। আচ্ছা, সমুদ্রের বুকে এই যে অনবরত ঢেউএর নাচ হয়, এ কেন? ঢেউএর নাচ দেখতে বড় সুন্দর বটে, কিন্তু এর উপকারিতা কি কিছু নেই? নিশ্চয় আছে, প্রকৃতির কোন খেলাই অর্থহীন নয়। এই ঢেউএর ঝাঁপট মেরেই সমুদ্র তার সন্তান-সন্ততির জন্য বায়ুমণ্ডল থেকে ক্রমাগত অক্সিজেন ও কার্ব্বনিক এসিড বাষ্প টেনে নিচ্ছে।



হিরণ্য-হৃদয়

[জারমেণ-উপকথা]

২১৭৪ পৃষ্ঠার পর

কনরাড গরীব; তাহার সন্তান অনেকগুলি—সাতটি ছেলে, একটি মেয়ে। কনরাডের সন্তান-ভাগ্য প্রসন্ন হইলেও তাহার অর্থভাগ্য ছিল না। কি করিয়া পরিবারের অন্নসংস্থান করিবে—ভাবিয়া সে আকুল হইয়াছিল। একদিন সে সন্ধ্যার পর পর্য্যন্ত কাজ করিতেছিল। কাজ করিতে করিতে কনরাড স্ত্রীকে বলিল,—বল দেখি, ছেলেদের উপায় কি হবে? আমার অর্থ নাই যে, তাহাদিগকে বিদ্যা শিক্ষা দিই।

এমন সময় কে দ্বারে আঘাত করিল। কনরাড দরজা খুলিয়া দিবার জন্য উঠিয়া গেল। দ্বার মুক্ত হইলে এক বৃদ্ধ গৃহে প্রবেশ করিলেন। বৃদ্ধের দীর্ঘ শ্মশ্রু বরফের মত সাদা। তাহার পরিচ্ছদ হইতে হিমবিন্দু সকল ঝাড়িয়া ফেলিতেছিলেন। বৃদ্ধ বলিলেন—শুভ সন্ধ্যা! বাপু সকল, আজ রাত্রির মত আমাকে আশ্রয় দিতে পারিবে? বড় দুর্য্যোগ, ভয়ানক অন্ধকার পথ খুঁজিয়া পাইলাম না।

কাঙ্গাল কনরাড ও তাহার স্ত্রী সাদরে বৃদ্ধকে কুটিরে স্থান দিল। কিন্তু অনেক চেষ্টা করিয়াও তাহারা বৃদ্ধের আহারের আয়োজন করিতে পারিল না।

কনরাড বলিল,—আমি আহ্লাদের সহিত আপনাকে আহার দিতে পারিতাম, কিন্তু হায়, ঘরে কিছু নাই। ছেলেদের বড় ক্ষুধা পাইয়াছিল তাহারা সব আলু খাইয়া ফেলিয়াছে।

সৌভাগ্যক্রমে বৃদ্ধেরও আহারের প্রয়োজন ছিল না। উভয়ে আপনাদের তৃণশয্যার এক পার্শ্বে বৃদ্ধের শয্যা রচনা করিয়া দিল। তাহারপর শীঘ্রই সকলে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন প্রভাতে বৃদ্ধ গৃহস্থকে বলিলেন,—আমাকে একবার তোমাদের ছেলেগুলিকে দেখাও। তোমরা আমাকে বড় যত্ন করিয়াছ, আমি তোমাদের প্রত্যেক পুত্রকে একটি করিয়া উপহার দিয়া যাইব।

বৃদ্ধের কথা শুনিয়া স্বামী-স্ত্রী তাঁহাকে ছেলেদের নিকট লইয়া গেল। সাতটি ছেলে শয্যার উপর সারি সারি ঘুমাইতেছিল। বৃদ্ধ তখন পকেট হইতে একটা সোনার ডাঁট বাহির করিয়া মৃদুস্বরে কত কি মন্ত্র পড়িতে লাগিলেন। তাহার পর, লোকে যেমন সোনা দিয়া নানাবিধ জিনিষ তৈয়ার করে, তিনিও তেমনি সেই সোনার ডাঁট হইতে নানা প্রকার দ্রব্য গড়িলেন।

বড় ছেলের মাথায় একটি সোনার মুকুট রাখিয়া তিনি বলিলেন,—একদিন তুমি রাজা হইবে; দেখিও, কেহ যেন তোমার মুকুট চুরি না করে; সাবধান, তুমি যেন মুকুটটি হারাইও না।

দ্বিতীয় ছেলেকে একখানি সোনার তরবারি দিয়া বলিলেন,—এই তরবারি হস্তে পৃথিবী জয় কর। তারপর তৃতীয় ছেলেটির দিকে ফিরিয়া বলিলেন,—আমি তোমায় বর দিলাম, ।



এমন সময় দ্বারে কে আঘাত করিল···

গায়ক হইবে। এই বলিয়া তিনি ছেলেটিকে একটি সোনার বীণা দিলেন। চতুর্থ ছেলেটির নিকট গিয়া বলিলেন,—তোমার বাহু দুটি বলিষ্ঠ,, ঐ বাহুযুগলের সাহায্যে পরিশ্রম করিও। তোমার প্রচুর কাঞ্চন লাভ হইবে। এই বলিয়া তাহাকে একটা সোনার হাতুড়ী দিলেন। পঞ্চম শিশুকে বৃদ্ধ বলিলেন,—তুমি বণিক্ হইবে। এই বলিয়া তাহাকে এক তোড়া মোহর দিলেন। ষষ্ঠ শিশুকে বলিলেন,—তুমি নাবিক হইবে। তাহাকে একখানি সোনার জাহাজ দিলেন। তারপর তিনি সপ্তম বালককে বলিলেন,—তুমি কৃষক হইবে। নহিলে ইহারা সব খাইবে কি? এই বলিয়া তিনি তাহাকে একটি সোনার লাঙ্গল দিলেন। তারপর বৃদ্ধ চলিয়া যাইবার উপক্রম করিলে, কনরাডের স্ত্রী তাঁহাকে ধরিয়া রাখিল, এবং কাতর স্বরে বলিল,—আমরা ছোট জার্টির কথা একেবারে ভুলিয়া গিয়াছি, সে ঘরের ঐ কোণে ঘুমাইতেছে। এই অকর্ম্মণ্য ছেলেগুলো সব পাইল, সে কিছুই পাইল না। হে দয়াময় অপরিচিত! তাহাকেও দয়া করিয়া একটি উপহার দিন—একটা খুব সুন্দর জিনিষ! বৃদ্ধ গম্ভীর মুখে মাথা নাড়িয়া বলিলেন,—'তার কথা আগে মনে করা তোমার উচিত ছিল; এখন আর সময় নাই। সমস্ত সোনা আমি দিয়া ফেলিয়াছি। তা, তোমার ছোট খুকীকে দেখাও। যে কোণে মেয়েটি শুইয়াছিল, কনরাডের স্ত্রী বৃদ্ধকে সেখানে লইয়া গেল। খুকীর যেই ঘুম ভাঙ্গিয়াছে; সে অপবিচিতের মুখপানে চাহিয়া হাসিতে লাগিল। মেয়েটি এত সুন্দর, আর তাহার মা একটা উপহারের জন্য এমন কাকুতি-মিনতি করিতে লাগিল যে, বৃদ্ধ কিছু নাই বলিয়া দুঃখিত হইলেন।

বৃদ্ধ তাঁহার সব পকেট কত খুঁজিলেন, কিন্তু কিছুই খুঁজিয়া পাইলেন না। অবশেষে সোনার



খুকী অপরিচিত বৃদ্ধের দিকে চাহিয়া হাসিতে লাগিল

ডাঁটের একটা অতি সরু টুকরা পাওয়া গেল। বৃদ্ধ পুনঃ পুনঃ সোনার টুকরার পানে চাহিতে লাগিলেন। টুকরাটি এত ছোট যে, তাহাতে

একটা চাম্‌চে কি একটা অঙ্গুলিও নির্ম্মাণ করা যায় না। হঠাৎ বৃদ্ধ বলিয়া উঠিলেন,—ঠিক্ হইয়াছে, ঠিক্ হইয়াছে! আমি এই সোনায় একটা ছোট সোনার হৃদয় গড়িয়া খুকীকে দিব, সে তাহার ভাইদের চেয়েও ধনবতী হইবে।

এই বলিয়া তিনি একটা সোনার হৃৎপিণ্ড গড়িয়া মেয়েটির বুকের উপর রাখিয়া বলিলেন,—তুমি কখনও এটিকে হারাইও না।

পতি-পত্নী দুইজনে এই সব উপহারের জন্য বৃদ্ধকে ধন্য ধন্য করিতে লাগিল। তিনি উভয়ের কাছে বিদায় লইয়া চলিয়া গেলেন। সেই অবধি কেহ তাঁহাকে আর দেখে নাই।

জন্য রাশি রাশি পণ্য লইয়া আসিল। তাহার ভাই একটা বড় বাণিজ্য প্রধান নগরে বণিক্ হইয়াছিল। কেবল কারিকর ছেলেটি আর কৃষক ছেলেটি গ্রামের কাছে বাস করিতে লাগিল।

কিন্তু তাহার ছোট ভগিনীটি তাহার মাতা-পিতার কাছে রহিল। তাঁহাদের পীড়া হইলে সেবা করিতে লাগিল। প্রথমে কনরাড মরিল; তাহার পর কনরাড-গৃহিণীও মরিয়া গেল! পিতামাতার মৃত্যুর পর বালিকা কুটিরেই রহিল। অত্যন্ত পরিশ্রম করিয়া সকলের সাহায্য করিতে লাগিল।



জাট শণের এমন চিকন সূতা কাটিয়াছিল, যে সেগুলি রেশমের মত…

বড় ছেলেটি, যে রাজা হবে,—সে অনেক দূরদেশ ঘুরিয়া ঘুরিয়া একটা রাজ্য পাইল। নিকটে আর রাজ্য ছিল না। দ্বিতীয় বালকটি সাহসী সেনাপতি হইয়া যুদ্ধ করিতে চলিয়া গেল। ঘরে বসিয়া গায়ক ছেলেটির যশোলাভ হইল না। সে রাজাদের দরবারে গিয়া ভাগ্য-পরীক্ষা করিতে লাগিল। রাজ-দরবারে তাহার খুব আদর হইল। সেখানে তাহার খুব সম্মানলাভ ঘটিল। নাবিক ছেলেটি একটা জাহাজের কাপ্তেন হইয়া সমুদ্র-যাত্রা করিল, এবং তাহার সহোদরের

একদিন তাহার কারিকর ভাই কুটিরে আসিল। একটা ভারী হাতুড়ীর আঘাতে তাহার হাত ছেঁচিয়া গিয়াছিল। সে কাজ করিতে পারিল না—বড় যাতনা পাইতেছিল। জার্ট তাহার হাত বাঁধিয়া দিল, আর এমন শুশ্রূষা করিতে লাগিল যে সে শীঘ্রই সারিয়া উঠিল। ইহার অল্পদিন পরে তাহার কৃষক ভাই আসিয়া তাহার দুঃখ-কাহিনী বলিল। তাহার গোলা পুড়িয়া গিয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে বীজ-শস্য সব নষ্ট হইয়া গিয়াছে। লক্ষ্মী বোন ভাইয়ের জন্য প্রতিবেশীদের নিকট

শস্য ভিক্ষা করিতে লাগিল। সে আপদে-বিপদে সকলকে সাহায্য করিত বলিয়া সকলেই প্রসন্নচিত্তে তাহাকে শস্য দিল। গরীব কৃষক এই প্রকারে বিপদ হইতে মুক্ত হইল ও আবার তাহার ভাগ্য ফিরিল।

এই ঘটনার পর অধিক দিন যাইতে না যাইতেই আর দুই ভাই তাহার নিকট দুঃখে সান্ত্বনা লাভ করিতে ও পরামর্শ লইতে আসিল। কাপ্তেনের জাহাজ ডুবিয়া যাওয়াতে সওদাগরের সমস্ত পণ্য নষ্ট হইয়াছিল।

জার্টি চমৎকার সুতা কাটিতে পারিত। অনেক বৎসর ধরিয়া সে শণের এমন চিকণ সুতা কাটিয়াছিল যে, সেগুলি খাঁটি রেশমের ন্যায় ঝক্‌-ঝক্ করিতেছিল। জার্টি দুইভাইকে সেই সুতা দিল। তাহারা নগরে গিয়া সুতা বেচিয়া এত টাকা পাইল যে, আবার পূর্ব্বের মত ব্যবসায় চালাইতে লাগিল।



মুকুট ও বীণা দেখিয়া জার্টি তাহার সেজদাদাকে চিনিল

অনেকদিন তিন বড় ভাইয়ের কোন খবর নাই। একদিন রাত্রিতে একজন দীনহীন ক্লান্ত পথিক কুটিরের দ্বারে আঘাত করিল। তাহার কাছে একটা শীর্ণ পত্রমুকুট ও একটা ভাঙ্গা বীণা ভিন্ন তার কিছুই ছিল না। মুকুট ও বীণা দেখিয়া জার্টি তার সেজদাদাকে চিনিল। তাহার মুখে গভীর বিষাদের চিহ্ন—গান গাহিবার শক্তি তাহার আর ছিলনা। জার্টি ভাঙ্গা বীণা একজন নিপুণ কারিকরের কাছে লইয়া গেল। সে বীণাটি মেরামত করিয়া তাহাতে নূতন তার সাজাইয়া দিল।

আবার যখন বসন্ত আসিল, পাখীরা গান ধরিল, তখন পাখীর গানে গায়কের মনে আবার বীণা বাজাইয়া গান করিবার ইচ্ছা জাগিয়া উঠিল। সে বীণার তারে ঘা দিয়া সুর ভাঁজিতে লাগিল। দেখিল, বীণার নিক্কণ তেমনি মনোহর, কণ্ঠ তেমনি মধুর। না, বীণার ধ্বনি ও কণ্ঠস্বর পূর্ব্বাপেক্ষা আরও মনোহর—স্বর সপ্তক পূর্ব্বাপেক্ষা গাম্ভীর্য্যময় ও পুণ্যোচ্ছ্বাসে দৃপ্ত। গায়ক ভগিনীকে ধন্যবাদ দিয়া পূর্ব্বের মত তাহাকে একাকিনী রাখিয়া চলিয়া গেল। কিন্তু অধিকদিন তাহাকে একা থাকিতে হইল না। তাহার মেজ ভাই যুদ্ধে আহত হইয়া কুটিরে আসিল। তারপর কতদিন কতরাত্রি অবিরাম সেবার পর সে আরোগ্যলাভ করিল।

কিন্তু সকলের অপেক্ষা দুর্গতি হইল যে ভাই রাজা হইয়াছিল তাহার। সে সোনার মুকুট হারাইয়া রাজ্যভ্রষ্ট হইয়াছিল। প্রজারা রাজাকে তাড়াইয়া রাজ্যের বাহির করিয়া দিয়াছিল। কাজেই সেও ভগিনীর নিকট ফিরিয়া আসিল। জার্টি দাদার উপকার করিবার জন্য কত চেষ্টা করিল। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। কি উপায়ে সে দাদার উপকার করিতে পারিবে, তাহা ভাবিয়া পাইল না। ভাই আবার রাজা হইতে চায়; বোনের রাজ্য ত আর নাই যে দিবে। তাই সে রাজ্য খুঁজিতে বাহির হইল।

অনেক পথ ভ্রমণ করিয়া সে একটা নূতন দেশে আসিয়া পৌঁছিল এবং একটি সুন্দর বাগানের পাশ দিয়া চলিতে লাগিল। বাগানের দরজা খোলা ছিল। সে পথ ধরিয়া বাগানের ভিতর গেল, এবং একখানি আসনে বসিয়াই ঘুমাইয়া পড়িল। সে বড় ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল। যখন তাহার ঘুম ভাঙ্গিল, দেখিল, সম্মুখে একজন পুরুষ, তাহার মাথায় সোনার মুকুট ঝক্ ঝক্ করিতেছে। পুরুষটি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিল,

"হাঁ, গা তুমি কোথা হইতে আসিতেছ? কি চাও?" জার্টি ভয়ে ভয়ে বলিল—রাজা! আমার এক ভাই আছে, তিনি তোমার মত একজন রাজা ছিলেন, এখন তাঁহার রাজ্যও গিয়াছে মুকুটও গিয়াছে। আমি একাকিনী তাহার জন্য একটা নূতন রাজ্য খুঁজিতেছি। রাজা, সুন্দরী কোমলতাময়ী বালিকাকে দেখিয়া মুগ্ধ হইলেন। বলিলেন,—বেশ, সেটা শক্ত কাজ নয়; এই রাজ্যের পরে একটা রাজ্য আছে, সেখানকার প্রজারা একজন রাজা খুঁজিতেছে। কিন্তু তোমার ভাইয়ের একটা মুকুট—একটা সোনার মুকুট চাই ত?

জার্টি প্রফুল্ল মনে বলিল,—যদি কেবল তাই হয় আমি তাহাকে সাহায্য করিতে পারিব। যে বুড়া তাহাকে সোনার মুকুট দিয়াছিলেন, তিনি আমাকে সোনার একটি ছোট হৃৎপিণ্ড দিয়াছিলেন। আমি সেটি তাহাকে দিব। বোধ হয় ইহাতে সে একটা সোনার মুকুট গড়িয়া লইতে পারিবে। একথা শুনিয়া রাজা খুব আহ্লাদিত হইলেন।

—তবে এত দিন ধরিয়া যাহাকে খুঁজিতেছিলাম, তুমিই সেই কন্যা, তোমার কাছে স্বর্ণ-হৃদয় আছে। আমি আর কাহাকেও আমার রাণী করিব না সেই জন্যই এতদিন করিয়া আছি। কতকগুলি কন্যা আমাকে বলিয়াছিল তাহার সোনার হৃদয় আছে। কিন্তু আসিলে চাহিয়া দেখিয়াছি তাহাদিগের হৃদয় খাঁটি সোনার নয়। তুমি আমাকে তোমার স্বর্ণ হৃদয় দান কর। আমি সে হৃদয়খানি এমন যত্ন করিয়া রাখিয়া দিব, যে, তার কোনও অমঙ্গল হইবে না। আমি তোমার ভাইকে আমার পুরাণ মুকুটখানি দিব, এখনও সেটি ঝক্ ঝক্ করিতেছে; তবে মুকুটটি একটু নুইয়া গিয়াছে। এই কথা শুনিয়া বালিকা খুব আনন্দিত হইল এবং রাজাকে আপনার সোনার হৃদয়খানি দান করিল। রাজা আজীবন সেই হিরণ্য-হৃদয়টি যত্নে রাখিয়াছিলেন। কন্যার ভাই পুরানো মুকুট পাইয়া রাজা হইল।



ঘুম ভাঙ্গিলে সে দেখিল একজন পুরুষ—মাথায় সোনার মুকুট ঝক্ ঝক্ করিতেছে

ভগিনীর বিবাহের সময় সাত ভাই বিবাহ দেখিতে আসিল। বোনের প্রতি গভীর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিবার জন্য রাশি রাশি বহুমূল্য উপহার আনিল। বালিকার গায়ক ভাই হিরণ্য হৃদয়শালিনী-ভগিনীর বিবাহের সময় একটি অতি চমৎকার গান গাহিয়াছিল! বিবাহের ভোজসভা হইতে আসিবার সময় তাহারই মুখে আমরা এই গল্পটি শুনিয়াছি।



ইউরোপীয় দর্শনের কথা

১২৫০ পৃষ্ঠার পর

দর্শনের কথা বলতে গিয়ে তোমাদের কাছে খালি কতক-গুলি গোলমালের কথাই আগে বলেছিলাম, তোমরা হয়তো ভেবেছিলে যে এসব হ-য-বর-ল'য়ের দরকার কি? বেশ সোজাসুজি জীবন চলে যাচ্ছে, খাচ্ছি দাচ্ছি ঘুমোচ্ছি, তার মধ্যে এসমস্ত গোল টেনে এনে লাভ কি? কিন্তু এত সহজে দর্শনের হাত থেকে উদ্ধার পেলে মানুষ কি আর গত দু'তিন হাজার বছর শুধু শুধুই দর্শন নিয়ে এত মাথা ঘামিয়েছে? আর যারা সেসব বিষয় নিয়ে ঘেটেছে, তাদের বুদ্ধি তো আমাদের চেয়ে নেহাৎ কম ছিল না।

তবু ধর যে আমরা ঠিক করলাম যে আমাদের রাজত্বে দর্শনকে জায়গা দেবনা। যা দেখি, যা শুনি, যা ছুঁতে পাই, তাকে নিয়েই আমাদের চলবে, কিন্তু তা বললেই বা নিস্তার কই? ধর আমরা মোটরগাড়ী চালাই, বিজলী পাখায় হাওয়া খেতে ভালবাসি, কিন্তু মোটর গাড়ীর ইঞ্জিন ছোঁওয়া যায়, মোটরগাড়ী যে কেমন করে চলে, সেটাতো আর দেখা শোনা বা ছোঁওয়া দিয়ে বোঝা যায় না। * * * তাই অসভ্যদেশের জংলিমানুষ প্রথম যখন মোটরগাড়ী দেখে, তখন দেব, দৈত্য, দানব মনে করে উর্দ্ধশ্বাসে পালায়। অথচ না বুঝলে মোটরও তৈরী হত না, আমরাও চালাতে পারতামনা। তেমনি বিজলী পাখার বেলায়ও পাখাটা দেখতে পারি, ধরতে পারি, হঠাৎ বেকায়দায় তারে হাত দিলে বিজলীর ধাক্কা লেগে লাফিয়েও উঠতে পারি, কিন্তু কেবল তাই করলে তো আর পাখা চলতনা। তাই দেখা শোনা ছোঁওয়া গন্ধ শোঁকা—এগুলি যতই দরকারী হোকনা কেন, তার চেয়ে আর একটু বেশী এগোতে না পারলে জীবন চলেনা। এগোলেই কিন্তু পদে পদে বিপদ, তখন কি যে জানি এবং কি জানিনে, সে সব প্রশ্ন ওঠে, সত্য-মিথ্যা নিয়ে ধাঁধা লাগে, ভুলভ্রান্তির হিসেব রাখতে হয়—এক কথায় আমরা পুরোপুরি দর্শনের রাজ্যে গিয়ে পড়ি।

এত কথারও বোধহয় দরকার নেই। কারণ আমরা যে কি দেখি, কি শুনি, তা নিয়েও গোল বাঁধে, একথা তোমাদের নিশ্চয়ই মনে আছে। সন্ধ্যাবেলায় কলকাতার রাস্তায় একটা লোক সাইকেলে একটা বালতি ঝুলিয়ে চলেছে—তুমি দূর থেকে দেখলে যে জংলী বাইসন্ শিং উঁচিয়ে তোমাকে তেড়ে আসছে। তুমি যাবে হাওড়ায়;—আট নম্বর (ইংরিজি—8) বাস সেদিক যায়, তুমি তিন (3) কিংবা পাঁচ (5) যে বাসই আসছে, তাকে দূর থেকে দেখছ ঠিক আট। দূরে একটা লোক প্রাণপণে চেঁচাচ্ছে—জসীম, তোমার নাম "যতীন", তুমি তার ডাকে সাড়া দিয়ে

ঠিক তার কাছে গিয়ে হাজির হলে। একটা লোক তোমার কাছে রাজাবাজারের পথ জিজ্ঞেস করলে, তুমি তাকে পাঠিয়ে দিলে রাধাবাজারে।

এবিষয়ে একটা বেশ মজার গল্প আছে।— এক উঁচু পাহাড়ের মাথায় এক রাজা তাঁর প্রাসাদ বানিয়েছিলেন, প্রজারা খাজনা দিতে সেই পাহাড় বেয়ে যাবে বলে মাঝামাঝি পথে তিনি একটি সরাইখানা তৈরী করে দেন। যারা নীচে থেকে ওপরে উঠছে, সরাইতে এসে অত উঁচুতে উঠে তাদের লেগেছে ভারী শীত, তাই গরম কম্বল চাদর জড়িয়ে তারা সবাই আগুনের কাছে জটলা পাকাচ্ছে। এদিকে যারা খাজনা দিয়ে ফিরছে, তাদের অত নীচুতে নেমে গরম লেগে গেছে—কাপড় জামা খুলতে পারলেই তারা বাঁচে। বলতো সে সরাইখানাটা সত্যি সত্যি গরম না ঠাণ্ডা?

একটু ভাবতে বসলেই তার ধাঁধার আর অন্ত থাকে না। একটার পর একটা আমাদের বিশ্বাসগুলি সব ভেঙ্গে পড়ে, তখন আবার নতুন বিশ্বাসের জন্য হাঁতড়ে বেড়াতে হয়। এবিষয়ে আরো একটি উদাহরণ দিচ্ছি, তারপরে দেখা যাবে যে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন মানুষ এসব ব্যাপারে কি ভেবেছে।

আমি এখন টেবিলে কাগজ রেখে লিখছি— এর মধ্যে তো সন্দেহ করবার কিছুই নেই,— না রয়েছে? একটা নীল কাপড়ের গদিওলা চেয়ারে বসে, ছোট একটি বার্ণিশ করা গোল টেবিলের উপর কাগজখানি রেখেছি, পাশেই রাস্তায় কে যেন ঘষে ঘষে লোহা কাটছে। তার ঘ্যানঘ্যানানি শব্দে ঘর ভরে গেছে। কিন্তু ধর স্বপ্নেও তো এসবই হ'তে পারে, এবং স্বপ্নের মধ্যে স্বপ্নকে স্বপ্ন বলে জানা যায় না তাও তোমাদের নিশ্চয় মনে আছে। কিন্তু ধর এখন সত্যি সত্যিই জেগে আছি, এবং সত্যি সত্যিই টেবিলে কাগজ রেখে লিখছি। তাহলেও কি সন্দেহ শেষ হয়? টেবিলটা কি? সেই সম্বন্ধেই একটু ভেবে দেখা যাক্। দেখতে টেবিলখানি গোল, বাদামী রঙের চকচকে জিনিষ; হাত দিলে ঠাণ্ডা, শক্ত এবং বেশ পালিশ; টোকা মারলে একটু একটু খট্‌খট্ আওয়াজ দেয়। কিন্তু সত্য সত্যই কি টেবিল খানি গোল? একটু সরে দাঁড়ালেই তাকে মনে হবে চ্যাপ্টা, আরো একটু সরলে মনে হবে ত্যাবড়া। তাই ঘরের বিভিন্ন জায়গায় যদি ভিন্ন ভিন্ন লোকে দাঁড়ায়, প্রত্যেকের চোখেই টেবিলের চেহারার খানিকটা বদল হবে। তারপরে ধর টেবিলের রঙ। বলেছি যে তার রঙ বাদামী, কিন্তু সমস্ত টেবিলটাই কি সমান বাদামী? যেখানে আলো পড়েছে, সেখানটা মনে হবে রঙ চকচক করছে, আর যেখানে একটু ছায়া, সেখানে বাদামী রঙ ঘন হয়ে প্রায় কালোর কাছাকাছি এসে পড়েছে। আমরা যদি টেবিলটার চারিদিকে ঘুরি, তবে রঙগুলিও আমাদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরে বেড়াবে, একবার মনে হবে যে উত্তর দিকটার রঙ বড় গাঢ়, আবার মনে হবে, না, উত্তরে নয়, দক্ষিণের রঙ বেশী ঘোরালো। এখন কে বলবে যে কোন্‌টা টেবিলের সত্যিকার রঙ? আর কোন্‌টা তার সত্যিকার চেহারা? ঠাণ্ডা, পালিশ, আওয়াজ, সবগুলি নিয়েই এমনি গোল বাধানো যায়, শেষে সন্দেহ হয়, যে বোধ হয় টেবিল বলে কিছুই নেই, এ এক ভূতের ছায়াবাজি।



অসভ্য লোক মোটর দেখে ভয়ে পালাচ্ছে

মুস্কিলের কিন্তু তবু শেষ হয়নি। যে টেবিলের কথা এতক্ষণ বলেছি, সে হল সাধারণ অভিজ্ঞতার টেবিল, তার চেহারা আছে, রঙ আছে, "পদার্থ" আছে। কিন্তু বিজ্ঞানের রাজ্যে একবার

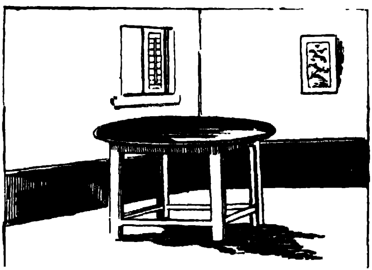


সরাইখানার দৃশ্য

পৌঁছলে সে সবের ও আর ঠিকানা থাকে না। বিজ্ঞানের মতে যাকে আমরা টেবিল বলি, তার প্রায় সমস্তখানিই ফাঁকা। আকাশে যেমন ফাঁকার মধ্যে তারাগুলি ছুটোছুটি করে বেড়ায়, তেমনি টেবিলের সে ফাঁকার মধ্যে কতগুলি বিদ্যুৎকণা ছুটোছুটি করে বেড়াচ্ছে। কিন্তু সে কণাগুলিকেও কি সত্যি সত্যি পাথর কুঁচির মত গুঁড়ো মনে করা চলে? শেষ পর্য্যন্ত তাহলে টেকে কি? একদিকে আমাদের পরিচিত শক্ত, গোলাকার রঙওয়ালা টেবিল, অন্যদিকে শূন্য আকাশের মধ্যে কতগুলি চঞ্চল ঢেউ, তাদের না আছে রঙ, না আছে চেহারা, না আছে কোন ধরবার ছোঁবার শুঁকবার দেখবার মতন গুণ। দেখা যায় না, শোনা যায় না, ধরা যায় না, ছোঁওয়া যায় না, শোঁকা যায় না—এমনি কতকগুলি প্রেতের ছায়ার মধ্যে আজ বিজ্ঞান আমাদের পৃথিবীকে মিলিয়ে দিয়েছে, বলছে যে আমাদের পরিচিত পৃথিবীর সব কিছু এই ভূতেরই খেলা!

বোঝবার জানবার চেষ্টায় আজ বিজ্ঞানের এই দশা। কিন্তু আদিমকাল থেকেই মানুষ এসব জিনিষ জানবার বোঝবার চেষ্টা করেছে—এক একটা কথা মাথায় এসেছে, আর ভেবেছে যে এবার কেল্লা ফতে, দুনিয়ার রহস্যের বুঝি এবার ঠিকানা মিলল। রহস্যের কথা উঠলেই আমরা ভাবি, বুঝি তেপান্তরের মাঠের মধ্যে রাজপুত্র একা চলেছে, মাথায় তার পাগড়ী, হাতে তার তলোয়ার। দূরে মাঠের শেষে কোথায় সোনার প্রাসাদে মতিমহলে রাজকন্যা ঘুমুচ্ছে, রাক্ষসে তাকে পাহারা দেয়, পায়ের কাছে তার মরণ-কাঠি, মাথার কাছে জীয়ন-কাঠি। এসব গল্প শুনি আর বিস্ময়ে চোখ বড় হয়ে ওঠে, বুকে খুসীর সঙ্গে ভয়ের দোলা লাগে।

আসলে কিন্তু বিস্ময়ের খোঁজে দেশ-বিদেশে যাওয়ার কোন দরকার নেই—ঘরের মধ্যে বসেই এত রহস্য জমানো যায় যে তারই ঠিকানা পাওয়া মুস্কিল, রোজকার চেনা টেবিল বদলে গিয়ে দাঁড়ায় প্রেতের নাচ। হয়তো বলবে যে এসব হ'ল পণ্ডিতের কথা, যে বিজ্ঞান জানে না, তার পক্ষে আর এর মধ্যে রহস্য কই? তোমাদের কথা মেনে নিলেও রোজকার জীবনে রহস্য খুঁজে



খানিকটা দূরের গোলটেবিল দেখাচ্ছে চেপ্টা

পাওয়া কঠিন নয়। ধর ঘরে বাতি জ্বাললাম। বাতিটা যে ধীরে ধীরে পুড়ছে, এটা সহজ কথা, কিন্তু পুড়ে বাতিটার হচ্ছে কি? দেখতে মনে হয় যে হাওয়ায় বাতি মিলিয়ে যাচ্ছে, কিন্তু

হাওয়ায় মেলাবার অর্থই বা কি? তার চেয়েও গোড়ার কথা মানুষের জন্ম-মৃত্যু। হাজার হাজার মানুষ জন্মাচ্ছে, মরছে। তারা আসছেই বা কোথায় থেকে, যাচ্ছেই বা কই? কেবল মানুষ বলে নয়, জীবজন্তু, গাছপালা সকলের বেলাতেই এই একই সুর এবং শেষের পালা।

এই মানুষ যখন এসব বিষয়ে ভাবতে সুরু করল, তখন এই সুর এবং তাহার অর্থ খোঁজাই হল তাদের প্রথম কাজ। কত আজগুবি গল্পই যে তখন সৃষ্টি হয়েছে, তার সীমা নাই। সকালে সূর্য্য ওঠে, কারণ এপোলো সাত ঘোড়ার রথ চালিয়ে সমুদ্র থেকে আকাশে লাফিয়ে ওঠেন, সন্ধ্যাবেলা আবার ঘোড়াগুলি রথ নিয়ে সমুদ্রের জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে, তাকেই আমরা বলি সূর্য্যাস্ত। তোমাদের মধ্যে যারা সমুদ্র বা বড় নদী দেখেছ, তারা জানে যে এ গল্পের অর্থ কি,—সকাল বেলায় মনে হয় যে জল থেকেই সূর্য্য উঠছে, সন্ধ্যাবেলা মনে হয় যে জলের মধ্যেই আবার সে ডুবে যাচ্ছে।

পাহাড়ে দেশের লোকেরা কিন্তু এসব সমুদ্র বা জলের গল্প গ্রাহ্য করেনি। তারা বলেছে যে সকাল বেলা বরফের চূড়োয় আগুন জলে ওঠে, তাই দেখে সূর্য্য টের পান যে ভোর হ'ল, অমনি তাড়াতাড়ি তিনি ঘোড়া ঠিক করে—আকাশে বেড়িয়ে পড়েন, সন্ধ্যাবেলা আবার ঠিক পাহাড়ের চূড়োর আগুন দেখেই পথ ঠিক করে বাড়ী ফিরে আসেন। অন্ধকারে পাছে সূর্য্য বনেজঙ্গলে পথ হারিয়ে ফেলেন, তাই রাত হলেও খানিকক্ষণ পাহাড়ের চূড়োয় আগুন জলতে থাকে।

তোমরা বলবে এসব তো হ'ল গল্প। গল্পতো বটেই কিন্তু গল্প, হলেই তো আর গল্প বলে জানা যায় না, গল্প বলে জানতে হলে গল্পের সঙ্গে সত্যের তফাৎ জানা দরকার। তোমাদের মনে আছে যে স্বপ্নের সঙ্গে স্বপ্নের মিল নেই বলেই আমরা স্বপ্নকে স্বপ্ন বলি, তেমনি গল্পের সঙ্গে গল্পের মিল না হলেই তাকে বলি গল্প। তা নইলে কেউ যদি বানিয়ে বানিয়ে এমন গল্প বলে যেতো যে কোনদিন তার মধ্যে কোন অমিল খুঁজে পাওয়া যায় না, তবে তাকে আমরা গল্প বলে জানতামই না, তাকে বলতাম সত্য।



তেপান্তরের মাঠে রাজপুত্র

ম্যাপে তোমরা গ্রীসদেশের ছবি নিশ্চয়ই দেখেছো—তাকে উর্দ্দুতে বলা হয় ইউনান। বাংলায় "যবন" বলে কথাটা আছে, তারও অর্থ ইউনান। গ্রীক শব্দ Ion (আইয়ন বা আয়ন) থেকেই ইউনান এবং যবন একথা দুইটীর উৎপত্তি। ম্যাপে দেখবে যে গ্রীস ইয়োরোপের মধ্যে থেকেও এসিয়ার একেবারে কাছাকাছি এসে পড়েছে—যেন কঙ্কাল-হাতের আঙ্গুল বাঁকিয়ে ইয়োরোপ এসিয়াকে ইসারা করছে। দেশ ভর্ত্তি সমুদ্র, আনাচে-কানাচে জলের ছড়াছড়ি।

পাহাড়ের গায়ে গায়ে জঙ্গল। নৌকা জাহাজ তৈরী করাও যেমন সহজ, চালাবারও তেমনি সুবিধা। তাই গ্রীসে বাণিজ্যের প্রসার হতে দেরী লাগেনি। দেশবিদেশের সঙ্গে ইউনানীরা বাণিজ্য করেছে, আর সে বাণিজ্যে যে কেবলমাত্র জিনিষপত্রের কেনা বেচা হয়েছে তা নয়, নানা রকম চিন্তা ভাবনারও বেসাতি তারা করেছে। দেশবিদেশের নানারকমের গল্প শুনলে কোন গল্পের উপরই আর তেমন বিশ্বাস থাকে না, থাকবেই বা কেমন করে? একজন বলছে যে সমুদ্রের বুকে রোজ সূর্য্য ঘুমোয়, আর একজন বলছে যে ওসব বাজে



এপোলো সাত ঘোড়ার রথ চালিয়ে আকাশে লাফিয়ে উঠেন

কথা, পাহাড়ের চুড়োর পেছনে সূর্য্যের প্রাসাদ, সেখানে সে রোজ সন্ধ্যায় ঘুমোতে যায়।

তাই ইউনানীরাই প্রথম এ সমস্ত গল্প অবিশ্বাস ক'রে পৃথিবীর সুরু এবং সবার সত্যি ইতিহাস বের করবার জন্য ব্যস্ত হয়ে ওঠে। থালিস বলে এক পণ্ডিত বল্লেন যে জল দিয়েই পৃথিবী তৈরী, জলেই তার শেষ হবে। পৃথিবীর সীমানায় সমুদ্র, অথই তার জল, সেই জল খানিকটা জমে পৃথিবী হয়েছে। বাকীটা জলই রয়ে গেছে। জল গরম করলে ধোঁয়ার মতন হয়ে যায়, ঠাণ্ডা করলে জমে বরফ, আর না গরম না ঠাণ্ডা রাখলে জলই থাকে। কাজেই জল নানা মূর্ত্তি নিতে পারে—পৃথিবীর অদল-বদলও তাই জলের নানা রকম মূর্ত্তির ফল।

আর একজন পণ্ডিত বল্লেন যে জল দিয়ে পৃথিবী তৈরী, এ হতেই পারে না কারণ গরম করলে জল উবে যায়, আর যা দিয়ে পৃথিবী তৈরী, তার বদল হতে পারে, কিন্তু তা উবে যাবে কেমন করে? হেরাক্লিটাস তাই বল্লেন যে আগুনই হ'ল পৃথিবীর মূল জিনিষ, কারণ আগুন সমস্ত জিনিষকেই ভস্মসাৎ করে ও নিজে টিকে থাকে। কেবল তাই নয়—আগুনের সঙ্গে মানুষের মনেরও মিল অদ্ভুত। মনে মনে আমরা এক মূহূর্ত্তের মধ্যে পেরু থেকে সমরখন্দে যেতে পারি। কলকাতায় বসে কামচকটকার কথা ভাবতে আমাদের কোন কষ্টই হয় না। তাই পৃথিবীর মূলে যে আদিম আগুন, মানুষের মন তারই এক একটি শিখা। আগুন যেমন চঞ্চল, সমস্ত জীবনও তেমনি অস্থির। ফল, লতাপাতা, গাছ, নদী সবই বদলাচ্ছে—এই বদলই হ'ল পৃথিবীর আসল কথা। হেরাক্লিটাশ বল্লেন যে কোন কিছুই দাঁড়িয়ে থাকে না, তাই নদীতে যে আমরা নাইতে নামি, সে নদীও প্রতিমুহূর্ত্তে বদলাচ্ছে, দ্বিতীয়বার নাইতে নামলে নদী তদ্দিনে নতুন হয়ে গেছে। তাই এক নদীতে দুইবার নাওয়া অসম্ভব! হেরাক্লিটাশ তো বলেছিলেন যে এক নদীতে আমরা দুইবার নামতে পারিনে, কিন্তু তার শিষ্যেরা তাতে সন্তুষ্ট নয়! তারা বল্ল যে এক নদী বলে কোন জিনিষ নেই,

প্রত্যেক মুহূর্ত্তে নদীর জল বদলাচ্ছে, প্রত্যেক মুহূর্ত্তে আমরাও বদলাচ্ছি। তাই নদী বলেও কিছু নেই, আমি বলেও কিছু নেই—রয়েছে শুধু একটা অশেষ বদলের ধারা। তাই তারা কথা বলা ছেড়ে দিল, কেবল আঙুল দিয়ে দেখাত কি তারা চায়। হেরাক্লিটাশের নাম হয়ে গেল কাঁদুনে দার্শনিক।

আর একজন দার্শনিকের কথা বলেই আজ শেষ ক'রব। হেরাক্লিটাশের মতেতো তুমি আমি আত্মা, সে হল অমর। পৃথিবীতে সব কিছু বদলাতে পারে, কিন্তু অঙ্কে যে সব সংখ্যা নিয়ে আমরা কারবার করি, তারা তো কখনো বদলায় না, তাই পাইথাগোরাস বল্লেন যে এসব সংখ্যাই পৃথিবীর গোড়ার কথা। দুইয়ে দুই যোগ করলে যে চার হয়, একথা কোনদিন কেউ অস্বীকার করতে পারবে না, তাই পৃথিবীর সমস্ত বদলের মধ্যেও এ সত্য অটুট। তাই মানুষের



সমুদ্রের ধারে থালিস দাঁড়িয়ে জল দেখছেন

বলে কিছু নেই, রয়েছে কেবল পৃথিবীময় অদল-বদলের ধারা। পাইথাগোরাসের সেকথা মনে লাগেনি—তিনি বল্লেন, আমি যে রয়েছি, একথা অস্বীকার করার উপায় নেই। প্রত্যেক মানুষের মনেই বেঁচে থাকবার ইচ্ছা রয়েছে—সে ইচ্ছা এল কোথা থেকে? তাই মানুষের যে মন বা আত্মাও এসব সংখ্যার মত—দুই তিন চার, এসব সংখ্যাকে পোড়ান যায় না, কাটা যায় না, ভাঙা যায় না—আত্মার বেলায়ও ঠিক তাই। মানুষের মন, আত্মার সংখ্যাগুলি এবং গানবাজনার সা-রে-গা-মা নিয়ে, তাই তিনি নতুন ভাবে পৃথিবীর অর্থ খুঁজিতে লাগলেন।



মঙ্গল গান

২২২৩ পৃষ্ঠার পর

চণ্ডীমঙ্গলের কথা তোমাদের কাছে পূর্ব্বে বলিযাছি। তাঁহাব কাবণ এই যে মঙ্গলচণ্ডীর পূজা একসময়ে এ দেশে খুবই প্রচলিত ছিল। কেহ বিদেশ যাত্রা করিতে হইলে কি অভীষ্ট-সিদ্ধির নিমিত্ত কোনও স্থানে যাইতে হইলে মঙ্গলচণ্ডীর আশীর্ব্বাদী নির্ম্মাল্য মাথায় না ঠেকাইযা বাহির হইত না। গুরুজনেরা ঐরূপ নির্ম্মাল্য সঙ্গে দিয়া দিতেন। কালকেতুর উপাখ্যান, লহনা-খুল্লনার কাহিনী, তখন কত লোকে মন দিয়া শুনিত, কত সুন্দব ভাবে বলিতে পারিত।

চণ্ডীমঙ্গল ভিন্ন আরও অনেক মঙ্গল কাব্য ছিল, তাহাদেব একটির নাম **ধর্ম্মমঙ্গল**। ধর্ম্মের পূজা এক সময়ে এদেশে অনেক লোকে করিত, এখনও পশ্চিমবঙ্গে রাঢ়দেশে অনেকেই করে। এই ধর্ম্মকে নিরাকার বলিয়াও কবি নির্দ্দেশ করিয়া গিয়াছেন, আবার সাকার ভাবেও দেখিয়াছেন। তাঁহাকে বলিয়াছেন কর্ত্তা, "করতার"।

ধর্ম্ম হতে বন্ধু ভবে কেবা আছ আর।
অন্তিম কালের সাথী হন করতার॥

ধর্ম্মকে কখনও লোকে নিরাকার বলিত, কখনও শিবরূপে দেখিত, শিবের বর্ণনা

করিয়া বলিত 'ধর্ম্মের বর্ণনা করিলাম; কখনও বলিত, তিনি ''নবীন নীরদ শ্যাম।" যে শাস্ত্র অনুসারে তাঁহার পূজা হইত। তাহার নাম ছিল হাকন্দপুরাণ। চণ্ডীর মাহাত্ম্য প্রচারের জন্য যেমন গন্ধর্ব্ব অপ্সরাকে মানুষ হইয়া জন্মগ্রহণ করিতে হইয়াছিল, ধর্ম্মের পূজা প্রচার করিবার জন্য তেমনই স্বর্গের নর্ত্তকী অম্বুবতীকে মানুষ হইতে হইয়াছিল। ইন্দ্র অম্বুবতীকে



অম্বুবতী ও বুড়ী

নাচিতে আদেশ দিলেন, অম্বুবতী স্নান করিয়া সাজিয়া আসিবে এমন সময় এক বুড়ী তাঁহার পথ আটকাইয়া বসিল; বুড়ী একেবারে থুরথুরে,, গা দিয়া খই উড়িতেছে, হাতে লাঠি, ঘনঘন কাশি উঠিতেছে,—মুখে একটিও দাঁত নাই,—তাহাকে দেখিয়া অম্বুবতী সরিয়া যাইতে বলিল। বুড়ী পথ ছাড়িয়া দিতে নারাজ—পথ তো পড়িয়াই আছে, সে-ই কেন না সরিয়া যাক। কথায় কথায় ঝগড়া, অম্বুবতী চলিয়া আসিবে, তাহার পায়ের জল গিয়া পড়িল বুড়ীর গায়ের উপর, বুড়ী অভিশাপ দিল। দেবসভায় নাচিতে তোর তাল কাটিয়া যাইবে। বাস্তবিকই তাল কাটিল। অম্বুবতী ভয়ে ধর্ম্মের শরণ লইল। ধর্ম্ম ইসারা করিলেন, দুর্গার কাছে—অভয়ার নিকট —যাও, তিনিই যে বুড়ী সাজিয়া পথ আটকাইয়া বসিয়াছিলেন। অম্বুবতীর স্তবে সুখী হইয়া অভয়া অভয় দিলেন,—বলিলেন, তোমার পিতার নাম হইবে বেণুরায়, মা মন্থরা—গৌড় দেশে জন্ম হইবে—তোমার ভাই হইবে গৌড়েশ্বরের পাত্র, এবং কর্ণসেনের সঙ্গে তোমার বিবাহ হইবে। অভয়া যেমন বলিয়া দিয়াছিলেন তেমন তেমন ঘটিল। বেণুরায়ের মেয়ে হইল, তার নাম রাখা হইল রঞ্জাবতী। অম্বুবতী রঞ্জাবতী হইয়া জন্মগ্রহণ করিল।

গৌড়েশ্বর ধর্ম্মপালের ছেলে তখন দেশের রাজা। তিনি মহাসমারোহে শিকার করিতে যাইবেন, এমন সময়ে তাঁহার চোখে পড়িল গোয়ালা সোমঘোষ; সে বেচারী খাজনা দিতে না পারায় এক বৎসর বন্দী হইয়া আছে। রাজা দেখিয়া পাত্রের অবিবেচনায় বিরক্ত হইলেন, সোমঘোষকে মুক্ত করিয়া দিলেন পাত্রকে বেশী বলিতে পারিলেন না—কারণ তাহার নাম মহামদ এবং সে হইল তাঁহার স্ত্রীর সহোদর, —রাণীর ভাই, সম্পর্কে শ্যালক। সোমঘোষ-কে কতদিন আদর যত্ন করিয়া রাজা তাহাকে বাড়ী পাঠাইলেন। ত্রিষষ্টির গড়ে কর্ণসেন ছিলেন। তাঁহার উপরে ভার রহিল সোমঘোষের নিকটে খাজনা আদায় করিয়া পাঠাইতে। সোমঘোষকে কর্ণসেন আদরে গ্রহণ করিলেন। সোমঘোষের পুত্র ইছাই। ইছাইয়ের ভবানীতে পরম ভক্তি তাঁহার

সাধনায় দেবী প্রীত হইয়া দর্শন দিলেন, আর ইছাইকে বর দিতে চাহিলেন, ইছাই একেবারে স্বাধীনতা চাহিলেন, অন্যান্য বরে গড়ে শ্যামারূপে ভবানীকে নিত্য দেখিতে চাহিলেন, ত্রিষষ্টির গড়ের নাম যেন অজয় ঢেকুর হয়,—শত্রুরা তাহাতে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিলেই নদীর জল যেন বাড়ে, আর শ্যামার হাতের খড়গ ভিন্ন অন্য কোনও উপায়ে যেন তাহার মৃত্যু না হয়।

বর পাইয়াই ইছাই প্রবল হইয়া উঠিল,—রাজাকে যে কর দিতে হইবে তাহা আর তাহার খেয়াল রহিল না,—সে স্বাধীন। কর্ণসেন যখন কর চাহিয়া পাঠাইলেন, তখন তাহাকে সে দূর করিয়া দিল, পিতা সোমঘোষ পুত্রের হাতে সকল দায়িত্ব দিয়া নিশ্চিন্ত। কর্ণসেন সৈন্য সামন্ত দিয়া তাহার ছয় ছেলেকে কর আদায় করিতে পাঠাইলেন, কিন্তু ইছাই ও তাহার সেনাপতি লোহাটা সকলকে মারিয়া তাড়াইল। কর্ণসেনের ছয় ছেলে লোহাটার হাতে মারা পড়িল! খবর পাইয়া ছেলেদের স্ত্রীরা অনুমৃতা হইল, অর্থাৎ স্বামীর মৃত্যুর সংবাদ পাইয়া প্রাণত্যাগ করিল, রাণী পুত্রশোকে বিষ খাইলেন, আর স্ত্রী পুত্র পুত্রবধূ সকল হারাইয়া কর্ণসেনের মাথা খারাপ হইয়া গেল।—এই নিদারুণ বিপদের কথা শুনিয়া গৌড়ের রাজা তাঁহাকে ডাকাইয়া পাঠাইলেন, সভায় আদর অভ্যর্থনা করিয়া বসাইলেন, এবং পরের দিন তাঁহার আবার বিবাহ দিবেন এই আশ্বাসও দিলেন। ঘটনাক্রমে রাজা সেদিন অন্তঃপুরে গিয়া রাণী ভানুমতীর নিকটে এক অতি সুন্দরী কন্যা দেখিতে পান, জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলেন সে-টা রাণীর ভগ্নী নাম রঞ্জাবতী, বিবাহ হয় নাই। পাত্র মহামদ ভগ্নী রঞ্জাবতীকে বড় ভালবাসিতেন,—হয়ত বুড়া কর্ণসেনের সহিত বিবাহে আপত্তি করিবে, তাই রাজা তাহাকে কামরূপে যুদ্ধ করিতে পাঠাইলেন, কিন্তু ব্রহ্মপুত্রে তখন বিষম বান, পাত্র কয়েকদিন অপেক্ষা করিয়া ফিরিয়া আসিলেন,—ইতিমধ্যে কর্ণসেনের সহিত রঞ্জার বিবাহ হইয়া গিয়াছে এবং তাহারা রাঢ়দেশে গিয়া পৌঁছিয়াছে। মহামদ সমস্ত খবর পাইয়া, রাগে আগুন হইয়া গেল,—ভগ্নীর বিবাহ দিবার তো তাহারই কথা, কিংবা পিতা বেণুরায়ের কথা, রাজার এখানে কোন্ অধিকার!

"রাজা সে রাজ্যের কর্ত্তা, ভেতের সে কে!" রাজাকে কিছু বলিতে না পারিয়া কর্ণসেনের উপর রাগ বাড়িতে লাগিল, সুবিধা পাইলেই রীতিমত শিক্ষা দিবে।

এদিকে রঞ্জা বিদেশে মা বাপ ও ভাইয়ের সঙ্গে কুটুম্বিতা রাখিতে চায়,—স্বামীর আপত্তি সত্ত্বেও তাঁহাকে অনেক বলিয়া কহিয়া নানা-রূপ ভেট দিয়া গৌড়ে পাঠাইয়া দিল। গৌড়েশ্বর মহাসমাদরে তাঁহাকে নিকটে বসাইলেন। পাত্রের নিকট এ দৃশ্য অসহ্য। সে গোপনে গৌড়েশ্বরকে বুঝাইল, যার স্ত্রী বন্ধ্যা, যে আঁটকুড়ে, সে তো পুন্নামক নরকে যাইবে, তাহার সঙ্গে এক আসনে বসিলে পুণ্য নষ্ট হইয়া যাইবে যে! কথা শুনিয়া কর্ণসেনের মাথা হেঁট হইল, রাজাও যখন আর তেমন আদর যত্ন করিলেন না, তখন তিনি নিতান্ত অপমান বোধ করিয়া বাড়ী ফিরিয়া গেলেন, রঞ্জাকে সকল কথা বলিলেন। স্বামীর এই অপমান রঞ্জার বুকে শেলের মত বাজিল,—সে পুত্রলাভের জন্য কঠোর তপস্যা করিতে চায়, এজন্য ধর্ম্মের পায়ে জীবন বলি দিতেও প্রস্তুত; শালে ভর দিয়া রঞ্জা মরিল,—তখন ধর্ম্ম সদয় হইয়া রঞ্জাকে দেখা দিলেন, হনুমানের পরামর্শ মতে তখন ঘোর ঝড়বৃষ্টির ব্যবস্থা করিয়া-ছিলেন,—আর সকলে পলাইয়া গেল, সে তিনজন সঙ্গিনী ছাড়িয়া গেল না তাহারা মায়া নিদ্রায় কাতর। ধর্ম্ম বর দিলেন।

রঞ্জা সুস্থ হইয়া বাড়ী গেল, তাহার পর যথা সময়ে বর অনুসারে ছেলে হইল,—নাম রাখা হইল লাউসেন।

রঞ্জার ছেলে হইয়াছে,—এ সংবাদে পাত্রের মনে যথেষ্ট হিংসা হইল, কারণ কর্ণসেনের কোনও কিছু ভাল হইবে তাহা সে সহ্য করিতে পারে না, ভগ্নীপতির সঙ্গে ভগ্নীর উপরও তাহার বিষম জাতক্রোধ। তাই সে সংবাদ পাইয়াই ছেলে চুরি করিতে এক দল চোরকে পাঠাইল। চোর চুরি করিতে পারিল বটে, তবে পথে বেনাবনে শিশুকে শোয়াইয়া ভাজাভুজা পোস্ত প্রভৃতি খাইতে লাগিল— ফলে শিশুকে আর তাহারা খুঁজিয়া পাইল না। পাইবেই কোথা হইতে? তাহাকে লইয়া যে ধর্ম্মঠাকুর সরিয়া পড়িয়াছেন— শিশুকে দেখিয়া তাঁহার এত ভাল লাগিয়াছে যে তাঁহার হাসিতে গিয়া মুখ হইতে কর্পূর খসিল— সেই মাটিতে পড়িয়া লাউসেনের মত আর একটী শিশুর আকার ধারণ করিল— নাম হইল তাহার কর্পূর; সে কর্পূরের মত সাদা, দেখিতে সুন্দর। লাউসেন কর্পূর দুই শিশুকে লইয়া বুড়া বামুনের বেশে ধর্ম্মঠাকুর গিয়া রঞ্জার নিকটে উপস্থিত—তাহাদিগকে দুই ভাইয়ের মত মানুষ করিতে উপদেশ দিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। চোরের দল গিয়া গৌড়ের পাত্রকে জানাইল যে তাহারা কথামত শিশুকে চুরি করিয়া আনিয়াছিল, ফিরিবার পথে কালীমার কাছে বলি দিয়াছে। পাত্র তাহা শুনিয়া নিশ্চিন্ত হইল—ভাবিল, আপদ বুঝি দূর হইয়াছে।

এদিকে লাউসেন বাড়িতে লাগিলেন। তাঁহার শিক্ষাদীক্ষার ব্যবস্থা সব ভাল করিয়াই হইল—ব্যাকরণ, অভিধান, অন্য শাস্ত্র, সব কিছু। মল্লবিদ্যা কি করিয়া শিখান যায়? বিশেষতঃ কর্ণসেন ইছাইয়ের কাছে যে অপমান পাইয়াছেন, তাহার শোধ লইতে হইবে—তাই লাউসেনকে যুদ্ধে পটু করা চাই। কুস্তীর ওস্তাদ কে হইবেন? ধর্ম্মঠাকুর হনুমানকে পাঠাইলেন, হনুমান বুড়া সাজিয়া আসিলেন, কানে সোণার মাকড়ি, হাতে সুন্দর বালা,—পরিচয় জিজ্ঞাসা করিলে বলিলেন,—

জাতি-কুল-নিবাস নিয়ম নাহি বায়।
এ মাথা বেচেছি রাম-জানকীর পায়॥
না মানি অন্যের আজ্ঞা প্রতাপ পৌরুষ।
অনুগত জনের কেবল আমি বশ॥



হনুমান লাউসেনকে কুস্তী শিখাইতেছেন

অনেক দিবস ছিল অযোধ্যা নিবাস।
অখিলে আমার নাম প্রভু রাম-দাস॥
যেখানে সেখানে থাকি মনের আনন্দে।
সুখ বাসি সংপ্রতি সতত সেতুবন্ধে॥

গুরুর যত্নে ও আশীর্ব্বাদে দুই ভাইয়ের তো মল্লবিদ্যা শেখা হইল। তাহার পর স্বয়ং দুর্গা পরীক্ষা করিতে আসিলেন, পরীক্ষায় তুষ্ট হইয়া বর দিতে চাহিলেন,—লাউসেন তাঁহার হাতের খড়্গ খানি আদায় করিয়া

লইল। ধর্ম্মদাস কর্ম্মী হনুমানের সঙ্কেত মত এবং বিশ্বকর্ম্মার সাহায্যে ফলা তৈয়ার করিল। তাহার উপর রামলীলা, কৃষ্ণলীলা মহাভারতের কথা, দশাবতারের মূর্ত্তি, কাঁচাসোনার কুঁচি দিয়া কত সব আঁকা,—সকলের আগে—পাত্রের কুকীর্ত্তি ও ভবিষ্যতের দুর্গতি—সবই তাহাতে থাকিল।

লিখিল ভারতবর্ষ হর্ষ হয়ে মনে।
যাহাতে জন্মিতে বাঞ্ছা করে দেবগণে।

যেমন খড়্গ, তাহার তেমনি ফলা। বিদেশ জয় করিয়া আসিবার আর কিছু বাধা নাই! দুই ভাইয়ে তখন পরামর্শ ছিল, গৌড় যাইতে হইবে, সকলের সঙ্গে পরিচয় করিতে হইবে, গৌড়ে সকলেই তো আপনার লোক, মাসী, মেসো, মামা—গৌড়ের রাজাকে ধরিয়া এই দেশ নিষ্কর করিয়া দিয়া আসিতে হইবে। রাজারাণীর তাহাতে ভারী অমত—রাণী রঞ্জাবতী ভাবিল, আর কিছুতে পুত্র বারণ মানিবে না, তাঁহাকে খোড়া করিয়া রাখিলে থাকিতে পারে—কাহাকেও না জানাইয়া বাপের বাড়ী হইতে শারঙ্গধল মল্লকে আনাইয়া লই, সে খোঁড়া করিয়া রাখিবে, প্রাণে মারিবে না—তাহাতে ছেলে আমার কাছেই থাকিবে। গোপন পরামর্শে শারঙ্গধলকে আনা হইল,—সে আবার পাত্রের কাছে শিক্ষা পাইয়া আসিল যে ভাগিনা লাউসেনকে আছাড়িয়া মারিয়াই ফেলিতে হইবে। শারঙ্গধলের সঙ্গে আরও পাঁচজন কুস্তীগীর আসিল। রঞ্জার সঙ্গে দেখা করিয়া তাহারা কালিন্দীর তীরে যেখানে দুই ভাই খেলিতেছে, সেখানে গিয়া উপস্থিত —কিন্তু কুমৎলব টিঁকিল না, তাহাদের প্রধান যারা তারা লাউসেনের হাতে মারা পড়িল, আর সব পলাইয়া বাঁচিল।

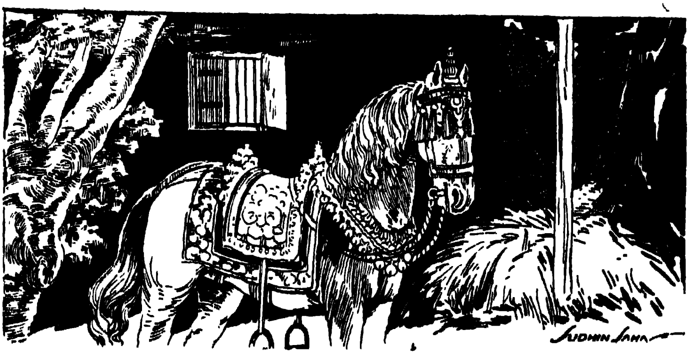
গৌড় যাইবার বাধা আর কিছু থাকিল না। কর্ণসেন ও রঞ্জাবতীকে অনুমতি দিতে হইল। পথে অনেক বিপত্তি। দেবসভার এক নর্ত্তক শাপে বাঘ হইয়া জলন্দা-ভূমিতে ছিল, নাম তার কামদল। কর্পূর যুদ্ধবিদ্যা শিখিলে কি হইবে, মনে বড় ভয়, তাহাকে গাছে বাঁধিয়া লাউসেন একাই বাঘ দেখিতে গেলেন, এবং বাঘকে ঘোরতর যুদ্ধে হারাইয়া বধ করিলেন। কর্পূরের কাছে আসিয়া তাহাকে অনেক ভরসা দিয়া



মুখে হাত দিয়া দেখিল নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা

লাউসেন বাঁধন খুলিয়া দিলেন, কিন্তু কর্পূরের ও বিশ্বাস হয় না,—মরা বাঘের কাছে গিয়া ভাল করিয়া উঁকি দিল, কাছে গিয়া নাকে মুখে হাত দিয়া দেখিল নিঃশ্বাস বহিতেছে কিনা,—তার পর মাটিতে হাঁটু গাড়িয়া বাঘের পেটে কিল মারিতে লাগিল, আর বলিল,—দেখ দাদা, কিলে বাঘ মারিয়াছি! ভাইয়ের বিক্রম দেখিয়া লাউসেনের মুখে আর হাসি ধরে না। পথে কি স্থধুই বাঘ,—কুমীরও ছিল। কুমীরের

সঙ্গে যুদ্ধ করিয়া লাউসেনকে মারিতে হইয়াছে। তারপর বাঘ ও কুমীরের চেয়েও মানুষ কখনও কখনও দুষ্ট হয়,—জামতি নগরে ও গোলাহাটে যত দুষ্ট লোক ছিল তাহাদের শিক্ষা দিয়া দুই ভাই রমতি নগরে আসিয়া পৌঁছিল। রমতি নগরের লোকে ভাই দুইটীকে খুব আদর করিয়া গ্রহণ করিল,—কিন্তু ফলায় আঁকা সমস্ত ছবি দেখিয়া পাত্রের বুঝিতে দেরী হইল না যে ছেলে দুইটী তাহারই ভাগিনেয়। কি করা যায়? ছাড়িয়া দিতে রাজী ছিল না—যে দণ্ডই হউক তাহা সে মাথা পাতিয়া লইতে প্রস্তুত ছিল; কিন্তু তাঁহারা রাত্রির অন্ধকারে গৃহত্যাগ করিয়া এক অশ্বত্থতলায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন, কোটালের লোকজন আসিয়া লাউসেনকে ধরিল, কর্পূর পলাইয়া ময়রার দোকানে আশ্রয় লইলেন, লাউসেনকে কারাগারে বন্দী করিলেও ধর্ম্মরাজের হুকুমে হনুমান গৌড়রাজকে সব কথা বলিয়া গেলেন,—লাউসেন মুক্তি পাইলেন, কর্পূরও আসিয়া জুটিলেন।



তারপর ঘোড়াকে সাজগোজ করা হইল

তখনই ফিরিয়া আসিয়া রাজার কাছে গিয়া পরামর্শ দিল যে দুই জন দুষ্টলোক কুমৎলবে সহরে আসিয়াছে; তাহাদের বধ করিতে হয়। রাজা বলিলেন, দুষ্টলোক হইলে দমন কর, কিন্তু সাবধান, ভাল লোকের ক্ষতি না হয়। এইটুকু অনুমতিই পাত্রের পক্ষে যথেষ্ট,—সহর কোটালের নাম ইন্দা-মেটে তাহাকে সঙ্কেত করিয়া পাঠাইয়া দিল। সে ঢোল বাজাইয়া রমতি সহরে সকলকে বিদেশীলোকদের সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিল। দুই ভাই যেখানে শুইয়াছিলেন, সেখানকার গৃহস্বামী তাঁহাদিগকে

কিন্তু মন্ত্রী মহামদ এত সহজে ছাড়িবার পাত্র নহে। সে নানারূপ আপত্তি আনিয়া জুটাইল,—বলিল, এই যদি রাজার ছেলে হয় তাহা হইলে নিশ্চয় হাতী মারিতে পারিবে,—ইহার কত শক্তি পরীক্ষা করা যাক্। হাতীর সহিত মানুষের যুদ্ধ হইল,—হাতী মারা পড়িল। পাত্রের মহা বিপদ,—এত করিয়াও শত্রু ধ্বংস হইল না! তখন সে বলিল আচ্ছা, যদি দৈবশক্তি থাকে, তাহা হইলে মরা জন্তুকে বাঁচাইতে পারিবে।—বাঁচাক্ তো এই মরা হাতীকে! লাউসেন হাতীর গায়ে হাত বুলাইতে লাগিলেন, মরা হাতী

বাঁচিয়া উঠিল। রাজা তাহা দেখিয়া ভারি খুসি, তাঁহার আর সন্দেহ মাত্র মনে রহিল না। পাত্রের অবস্থা তখন, যেন "জোঁকের মুখে চুণ!" তাহার বুদ্ধি জোগাইল,—যদি একবার কোনও মতে পুরস্কার বলিয়া আস্তা-বলে আগুীর-পাথর নামে একটা পাগলা ঘোড়া আছে, তাহা দেওয়া যায়, তবে বেশ হয়,—ভাগিনা মারিবার অন্য উপায় না দেখিলেও চলিবে, ঘোড়াই তাহাকে মারিবে। রাজা তো সর্ব্বদা মন্ত্রীর পরামর্শেই চলেন, তাঁহার ইচ্ছা বুঝিয়া লাউসেন বাজিশালে চলিলেন, আর সেই পাগলা ঘোড়াই বাছিয়া লইলেন।

অনুপম ঘোড়ার বরণ গঙ্গাজল।
চরণ চপল চারি ঈষৎ পিঙ্গল॥
ধলাপেট পিঠ নীলা লেজটী সুরঙ্গ।
কর্পূর বলেন দাদা এই যে তুরঙ্গ॥

তারপর ঘোড়ার সাজগোজ করা হইল।

মলিয়া ঘোড়ার অঙ্গ মলা করে দূর।
বিনাল ঘোড়ার ঘাড়ে বিচিত্র চিকুর॥
সপুরট পাটথোপা খুব তিন তায়।
রতন রঞ্জিত জীন পীঠে শোভা পায়॥
মরকত রজত হিরণ্য হীরাচুণি।
বিচিত্র বাজীর জীনে জ্বলে কত মণি॥
ঘোর ঘণ্টা ঘাঘর ঘুঙুর মনোরম।
গাঁথিল, গমনে যেন বাজে ঝম্ ঝম্॥
কপালে কনক চান্দা বিচিত্র করালি।
সজোর উজোর ডোর মুখে মুখ নালি॥
লম্বিত বাজীর গায় রূপার রিকিব।
অনুপম লাগাম বদনে বান্ধা জিব॥
হেমযুক্ত বসনে ঢাকিল সব অঙ্গ।
বাড়াল যোগাল এনে সাজায়ে তুরঙ্গ॥

ঘোড়া বশ মানিল, রাজা খুসী হইয়া ভাগি-নাকে দক্ষিণ ময়না জায়গীর দিলেন,—রাজার বিপদে আসিয়া সাহায্য করিতে হইবে। রমতি নগরে কালুডোম থাকিত, তাহার দেহে ভীষণ শক্তি, বাঁটুল দিয়া গাছের ডাল পাড়ে। দুই ছেলে শাকা-সুখা, স্ত্রী সনকা ও লখে,—যুদ্ধে কেহ কম নহে, সঙ্গে তের ঘর ডোম—লাউসেন রাজার অনুমতি লইয়া সকলকে চাকরি দিয়া দেশে লইয়া গেলেন।

পাত্রের হিংসা তবুও গেল না। কামরূপের রাজা,—নাম তাঁহার কর্পূরধল—তাঁহার পরামর্শমত গৌড় আক্রমণ করিতে আসি-বেন, গৌড়ের রাজা বিপদে লাউসেনকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সৈন্য সামন্ত লইয়া লাউসেন তো কামরূপের কাছে গিয়া হাজির কিন্তু ব্রহ্মপুত্রে বান ডাকিয়াছে, পার হইবার উপায় নাই। ধর্ম্মের কৃপায় এমন কাটারি লাভ হইল যে তাহা জলে ছোঁয়াইলেই বানে টান ধরে, দেখিতে দেখিতে জল কমিয়া যায়; দৈবশক্তি পাইয়া লাউসেন কামরূপে প্রবেশ করিলেন,—কোনও বাধা থাকিল না, কর্পূরধল বন্দী হইলেন, কিন্তু তাঁহার কন্যার সহিত লাউসেনের বিবাহ হইল। গৌড় ও কামরূপে বন্ধুত্ব রক্ষা পাইল---উভয় পক্ষে যে সব সৈন্য মারা গিয়াছিল, ধর্ম্মের কৃপায় তাহারা সকলে বাঁচিয়া উঠিল। কর্পূরধল নিজে গৌড়ে আসিয়া রাজার সহিত দেখা করিয়া গেলেন। বধূ কলিঙ্গাকে লইয়া লাউসেন দেশে ফিরিলেন,---পথে মঙ্গল-কোটের গজপতি রাজা তাঁহার কন্যা অমলাকে ও বর্দ্ধমানের রাজা তাঁহার কন্যা বিমলাকে লাউসেনের সঙ্গে বিবাহ দিলেন,---লাউসেন যখন দেশে ফিরিলেন, তখন তাঁহার তিন বিবাহ সঙ্গে তিন স্ত্রী!

পাত্রের এত সব কৌশল, কূটবুদ্ধি, সবই যে বৃথা যায়! ভাবিয়া ভাবিয়া সে আর এক বুদ্ধি স্থির করিল! হরিপালের রাজকন্যা কানাড়া বড় সুন্দরী, আর ধর্ম্মেও তাঁহার যথেষ্ট মতি। পাত্রের পরামর্শে গৌড়ের রাজা তাঁহাকে বিবাহ করিতে চাহিলেন। কোথা গৌড়, আর কোথায় হরিপাল।

হরিপালের রাজা অস্বীকার করিতে সাহস করেন না, আবার বুড়া বরের সঙ্গে বিবাহই বা দেন কি করিয়া! যদি বা ভয়ে ডরে বাপের মত হয় তো মেয়ের হয় না। কানড়া স্বয়ংবরা হইতে চাহিলেন, রাজা লোক-লস্কর লইয়া গড়ে পলাইয়া গেলেন, কানড়ার নিকটে শুধু ধুম্মুখা দাসী থাকিল। দাসী গৌড়রাজের শিবিরে এক লোহার তৈরী গণ্ডার লইয়া উপস্থিত,—কানড়ার প্রতিজ্ঞা, যে ব্যক্তি ওই গণ্ডার এক চোটে দুই খান করিবে তাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে। রাজা পাত্র সৈন্য সামন্ত ও লাউসেনে যুদ্ধ হইল—কিন্তু ঈশ্বরীর আদেশে ও ধর্ম্মের আশীর্ব্বাদে বিবাহ হইল—রাজপক্ষের সকলে প্রাণ ফিরিয়া পাইল।

এরারও পাত্রের উদ্দেশ্য ব্যর্থ হইল। তবু তাহার কূটবুদ্ধির শেষ নাই,—রাজাকে পরামর্শ দিল, লাউসেনকে ইছাই ঘোষ দমন করিবার জন্য পাঠান হউক। সেই যে ইছাই ঘোষ, যে দেবীর আদেশে অজয় হইয়া উঠিয়াছিল, যাহার হাতে কর্ণসেন ছয় ছেলে হারাইয়াছিলেন। অজয়ে তখন বান, কিন্তু যে উপায়ে লাউসেন ব্রহ্মপুত্র পার হইয়াছিলেন, সেই উপায়ে অজয়ও পার হইলেন,



কাটামুণ্ড তখনও 'ধর্ম্মের জয়' বলিতে ছাড়িল না।

কেহই পারিল না, ডাক পড়িল লাউসেনের। লাউসেন ধর্ম্মের আদেশে গণ্ডার দুই টুক্‌রা করিলেন; একটুক্‌রার উপর অন্য টুক্‌রা রাখিয়া তাহা আবার চারি খান করিলেন। স্বয়ংবরের সর্ত্ত না মানিয়া রাজা যখন পাত্রের পরামর্শে কানড়াকে জোর করিয়াই বিবাহ করিতে চাহিলেন, কানড়াও তাঁহার দাসী যুদ্ধে রাজপক্ষকে নির্ম্মূল করিলেন,—লাউসেনকে তখন কৌশলে অন্যত্র সরান হইয়াছে, সংবাদ পাইয়া লাউসেন ফিরিলেন, কানড়া তাহাতে এখন তো আণ্ডীরপাখর ঘোড়া রহিয়াছে। ইছাই ঘোষের সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ হইল,—এমন কি লাউসেনের প্রধান সহায় কালু বীর প্রাণ দিল,—ইছাইকে ভগবতী বর দিয়াছিলেন যে তাহার মাথা মাটিতে পড়িলে আবার ধড়ে আসিয়া জোড়া লাগিবে।—কিন্তু একবার লাউসেন যেমন ইছাইয়ের মাথা কাটিলেন, হনুমান অমনি তাহা লইয়া আকাশে উধাও। তবে এই যুদ্ধে লাউসেনকেও একবার প্রায় প্রাণ দিতে

হইয়াছিল, ধর্ম্মের অনুগ্রহে তিনি সকল বিপদেই রক্ষা পান।

পাত্র দেখিল, ধর্ম্মের অনুগ্রহে সকল অবস্থায় জয়, আচ্ছা, ভাগিনা বধ করিতে ধর্ম্মপূজাই করি না কেন? গৌড়ে ধর্ম্মপূজার বিস্তর আয়োজন হইতে লাগিল। নানা উপকরণ আনা হইল। অনেক অর্থ ব্যয়, অনেক পণ্ডিত দিয়া আয়োজন, কিন্তু ধর্ম্ম অন্তর্যামী তিনি উদ্দেশ্য বুঝিলেন, পাত্রের মতলব কি তাহা বুঝিতে তাঁহার দেরী হইল না। তিনি এমন জল ঝড়ের সৃষ্টি করিলেন যে সমস্ত আয়োজন পণ্ড। তখন আবার লাউসেনের ডাক পড়িল। ধর্ম্মের বরে লাউসেন অসম্ভব সম্ভব করিতে পারিলেন, কিন্তু এবার তাঁহার চরম পরীক্ষা। গৌড়ের রাজা ধরিয়া বসিলেন, সূর্য্য তো পূব দিকে উঠেন, তাঁহাকে পশ্চিমে উঠাইতে হইবে। এমন কথা কেহ কখনও শোনে নাই,—অসম্ভব কিছু বুঝাইতে গেলেই আমরা বলি, পূবের সূর্য্য পশ্চিমে উঠিবে। কিন্তু যিনি ধর্ম্মের পূজা করেন তাঁহার পক্ষে ইহাও কি অসম্ভব,—ভগবানের আশীর্ব্বাদে কি না হয়। তবে তাহার জন্য সেইমত চেষ্টা ও সাধনা করা দরকার। প্রাণপণ করিয়া লাউসেন ব্রত করিলেন, জঙ্গল কাটিয়া জমি পরিষ্কার করিলেন, তারপর যখন কিছুতেই কিছু হয় না, তখন নিজের পা কাটিলেন, হাত কাটিলেন, এমনভাবে সমস্ত শরীর নয় খণ্ড করিয়া ফেলিলেন, কাটামুণ্ড তখনও "ধর্ম্মের জয়" বলিতে ছাড়ে না। এই কঠোর সাধনা দেখিয়া ধর্ম্মের মনে দয়া হইল, অসম্ভবও সম্ভব হইল, পূর্ব্বের সূর্য্য পশ্চিমে উদয় হইল।

জীবনে বহুবার ধর্ম্মের করুণার পরিচয় দিয়া লাউসেন শেষে স্বর্গে গেলেন।

ঘনরামের ধর্ম্মমঙ্গলে লাউসেনের কাহিনী দেওয়া আছে, তোমরা বড় হইলে পড়িও, তাহাতে দেখিতে পাইবে সেকালে বাঙ্গালীর গায়ে জোর ছিল, বাঙ্গালী যুদ্ধ করিতে পারিত, কালুডোমের স্ত্রী লখার দেহে স্বামীর চেয়ে বেশী শক্তি ছিল, কানড়ার দাসী দুর্ম্মুখা একাই ভীষণ যুদ্ধ করিয়াছিল, আর দেখিও অনেক লোকে ধর্ম্মপথেই চলিতে চাহিত, অধর্ম্মের পথে পা দিয়া লাভ করিতে চাহিত না। ঘনরাম ছাড়া আরও কবি ধর্ম্মমঙ্গল রচনা করিয়াছেন, কিন্তু ঘনরামের বহি হয় তো সহজে পাওয়া যাইবে।

হাতে কোনো কাজ নেই, নওগাঁর তিনকড়ি
সময় কাটিয়ে দেয় ঘরে ঘরে ঋণ করি।
তক্তার খাট কিনেছিল, দু পয়সা খর্চা,
শোয় না সে হয় পাছে কুঁড়েমির চর্চা,
বলে, "ঘরে এত টাকা কিসের কি দামী
তাই কম খেয়ে খেয়ে দেহটাকে ক্ষীণ করি।"

— ॥ —

পাঠশালে হাই তোলে মতিলাল নন্দী,
বলে, "পাঠ এগোয় না যত কেন মন দিই।"
শেষকালে একদিন গেল চড়ি টঙ্গায়,
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাসালো মা গঙ্গায়,
সমাস এগিয়ে গেল, গেল ভেসে সন্ধি,
পাঠ এগোবার তরে এই তার ফন্দি ॥

— ॥ —

পাখিওয়ালা বলে, "এটা কালো রঙ চন্দনা।"
পানুলাল হালদার বলে, "আমি অন্ধ না;
কাক ওটা নিশ্চিত, হরিনাম ঠোঁটে নাই,"
পাখিওয়ালা বলে, "বুলি ভালো করে ফোটে নাই,
পারে না বলিতে বাবা, কাকা নামে বন্দনা ॥"

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর





হাতে কোনো কাজ নেই, নওগাব তিনকড়ি
সময় কাটিয়ে দেয় ঘরে ঘরে ঋণ করি।
ভাঙা খাট কিনেছিল ছ পয়সা খর্চ্চা,
শোয় না সে হয় পাছে কু ডেমির চর্চ্চা,
বলে, "ঘরে এত ঠাসা কিঙ্কর কিঙ্করী
তাই কম খেয়ে খেয়ে দেহটাকে ক্ষীণ করি।"



পাঠশালে হাই তোলে মতিলাল নন্দী,
বলে, "পাঠ এগোয় না যত কেন মন দিই।"
শেষকালে একদিন গেল চড়ি টঙ্গায়,
পাতাগুলো ছিঁড়ে ছিঁড়ে ভাসালো মা গঙ্গায়,
সমাস এগিয়ে গেল, গেল ভেসে সন্ধি,
পাঠ এগোবার তরে এই তার ফন্দি॥

পাখীওয়ালা বলে, "এটা কালো রং চন্দনা।"
পান্নুলাল হালদার বলে, "আমি অন্ধ না,
কাক ওটা নিশ্চিত হরিনাম ঠোঁটে নাই।"
পাখীওয়ালা বলে, "বুলি ভালো করে ফোটে নাই
পারে না বলিতে বাবা, কাকা নামে বন্দনা॥"







ছোটদের মেলা



সাগর খেলে শিশুর সাথে, হাসে সাগর-বেলা



পড়ার তাড়া



দুধের ধারা



গানের সর্দার



জল-খেলা



তরমুজ ভক্ষণ



জাল বুনা



পড়া ও খেলা

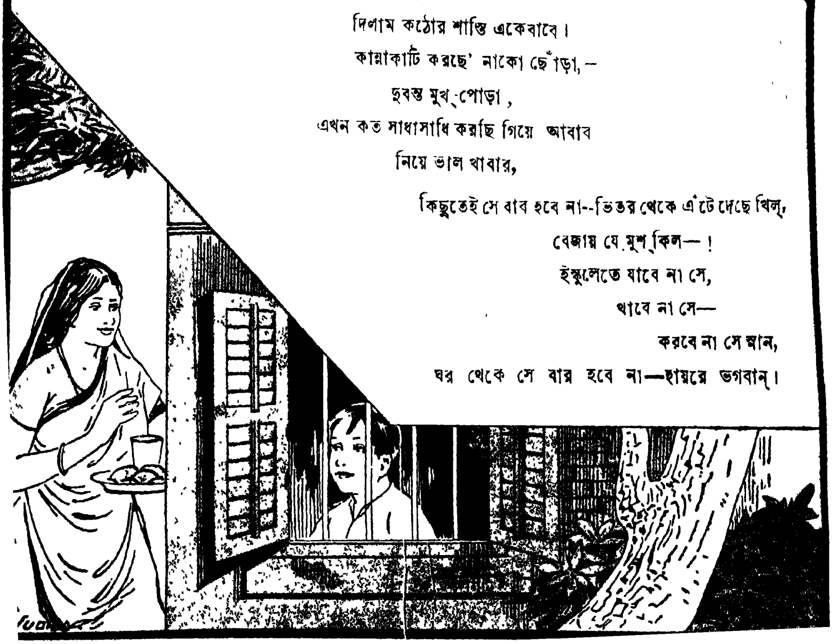


সুরের ঝঙ্কার

সর্বনাশ

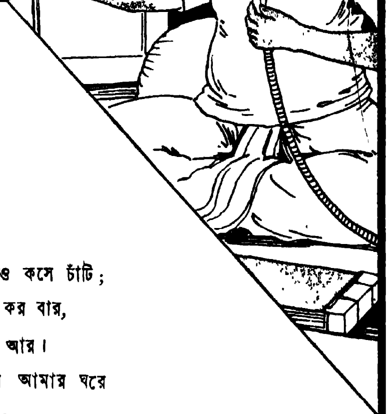


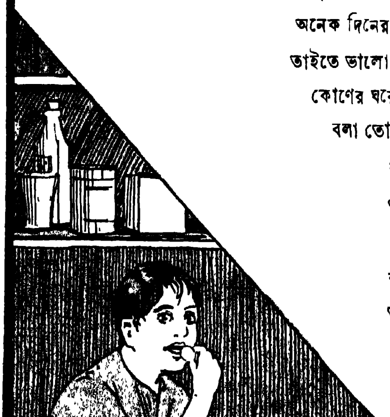
"পট্‌লা কোথায়— পট্‌লা কোথায়" কর্ত্তা বলেন হেঁকে ;
রান্নাঘরের থেকে
গিন্নী বলেন --"পট্‌লা ছোঁড়া হতচ্ছাড়া, পাজি,
তাইতে তারে আজি
শাস্তি দিয়ে বন্ধ করে, রেখেছি ঐ কোণের ছোট ঘরে ,
সকাল বেলা পড়ায় হেলা করে'
ছাদের উপর উড়াচ্ছিল ঘুড়ি,
দুষ্ট, তাহার জুড়ি
নাইক ত্রি-ভুবনে,—
বারে বারে মানা করি,—বাঁদর কি' তা শোনে !
তাইতে আমি রেগে
দৌড়ে গিয়ে বেগে
কোণের ঘরে বন্ধ করে তারে
দিলাম কঠোর শাস্তি একেবারে ।
কান্নাকাটি করছে' নাকো ছোঁড়া,—
দুরন্ত মুখ্-পোড়া ,
এখন কত সাধাসাধি করছি গিয়ে আবার
নিয়ে ভাল খাবার,
কিছুতেই সে বার হবে না--ভিতর থেকে এঁটে দেছে খিল্,
বেজায় যে মুশ্‌কিল— !
ইস্কুলেতে যাবে না সে,
খাবে না সে—
করবে না সে স্নান,
ঘর থেকে সে বার হবে না—হায়রে ভগবান্ ।

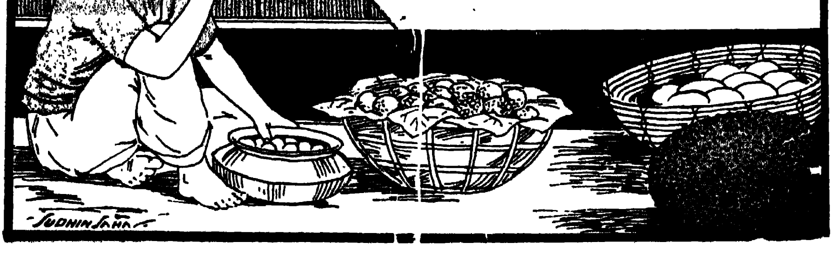




শাস্তি তারে দিতে গিয়ে শাস্তি পেলাম নিজে,
ব্যাপার খানা কি যে
বুঝে ওঠাই ভার,
পটলা ছোঁড়া কী জেদি আর কী কাষ্ঠ-গোঁয়ার!"
শুনে কথা কর্তামশাই—চক্ষু দুটি করে ছানা-বড়া
বলেন—"ওগো, যাওগো ছুটে ত্বরা—
সব যে হোল মাটি
দৌড়ে গিয়ে ছোঁড়ার মাথায় লাগাও কসে চাঁটি;
যেমন করেই পার তারে বাইরে কর বার,
উপায় নাহি আর।
ছেলে বেলার বন্ধু ক'জন আসবে আমার ঘরে
অনেক দিনের পরে,—
তাইতে ভালো খাবার এনে বাগবাজারের থেকে
কোণের ঘরে রেখেছিলেম ঢেকে,—
বলা তোমায় হয়নি সময় মত,
ব্যস্ত ছিলাম কত।
এতক্ষণে হয়তো লক্ষ্মী ছাড়া
খাবার গুলো সব করেছে সারা
বত্রিশটা রসগোল্লা,—পাক্কা ছসের টাট্‌কা মিহিদানা
তাইতো এখন শক্ত বেজায় ঘরের থেকে বাইরে তাকে আনা
এতটাকার খাবার
এতক্ষণে পেটুক-ছোঁড়া সব করেছে সাবাড়।"





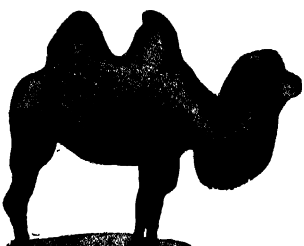




উটের পিঠে কুঁজ কেন?

২২৪০ পৃষ্ঠার পর

তোমরা বোধ হয় সকলেই উট দেখিয়াছ। নয় কি? যদি না দেখিয়া থাক তবে কলিকাতার আলিপুরের বা অন্য কোনও বড় সহরেব চিড়িয়াখানায় গেলেই এই প্রাণীটির সাক্ষাৎ লাভ করিতে পারিবে। উটের আর একটা জিনিষও তোমাদের মধ্যে যাহাবা ইহাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিয়াছ কিংবা ছবিতে দেখিয়াছ, তাহাদের চোখ যেটার উপর পড়িয়াছে, সেটা হইতেছে ইহাদের পিঠের বিশ্রী রকমের কুঁজটি। কোন কোন জাতের উটের পিঠে আবার দুইটি করিয়াও কুঁজ দেখিতে পাওয়া যায়। তাহা একটাই হোক আর দুইটাই হোক—উটের পিঠে এই রকম কুঁজ জন্মাইবার কারণ কি, তাহা তোমরা বলিতে পার কি? খুব সম্ভব পারিবে না। আমি তোমাদের কাছে এই প্রশ্নের উত্তর দিতেছি।



দুই কুঁজওয়ালা উট

তোমরা সকলেই জান যে, উট মরুভূমির জন্তু। এইজন্য ইহাদের এক নাম Ship of the Desert বা মরুভূমির জাহাজ। ইহারা সপ্তাহের পর সপ্তাহ জল এবং কোন খাদ্যদ্রব্যাদি গ্রহণ না করিয়াও মরুভূমির উপর দিয়া চলিতে পারে। ইহার অর্থ এই যে, উট তাহার শরীরের ভিতর তাহার অনেক দিনের খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ করিয়া নেয় এবং পথে ক্ষুধা পাইলে সঞ্চিত খাদ্যদ্রব্য আহার করিয়া ক্ষুধা নিবারণ করে। উট কোথায় তাহার খাদ্যদ্রব্য সঞ্চিত করিয়া রাখে তাহা জান? তাহার এই কুঁজের ভিতবে। সুতরাং এই খাদ্য দ্রব্য রাখিবাব জন্যই উটের পিঠে কুঁজের সৃষ্টি হইয়াছে। এই কুঁজটি উটের খাদ্যদ্রব্যের থলিয়া বিশেষ। ইহার ভিতর যে শুধু খাদ্যদ্রব্যই থাকে তাহা নহে, জলও সে এই থলির ভিতর এবং উদরের ভিতর সঞ্চয় করিয়া রাখে এবং বাহির হইতে উটের খাদ্যদ্রব্য পূর্ণ এই থলিটি উঁচু হইয়া থাকে ও আমরা বলি "ঐ দেখ উটের কুঁজ—কি বিশ্রী।" উটের কিন্তু আমাদের কথাতে কিছুই আসিয়া যায় না এবং কুঁজ না জন্মাইলে ইহাদের বাঁচা অসম্ভব হইত। যে উটের পিঠে যত বড় কুঁজ, সে তত অধিক দিন অনাহারে

থাকিতে পারে। অনাহারে থাকিতে থাকিতে কুঁজটি ক্রমশঃই ছোট হইয়া আসে। আবার ভালরূপে আহার ও বিশ্রাম পাইলে পিঠের কুঁজটি বাড়িয়া উঠে।

হাঁসের পালকে জল লাগে না কেন?

হাঁসকে পালে পালে পুকুরের জলের মধ্যে ডুব দিতে কিংবা সাঁতরাতে তোমরা সকল সময়েই

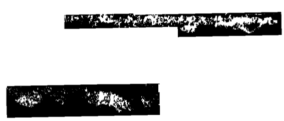


হাঁস

দেখিয়া থাকিবে। কিন্তু লক্ষ্য করিয়াছ কি যে, হাঁসের পাখনায় জল লাগিয়া থাকে না। কেন থাকে না, ইহার অনেক কারণ আছে। একটি কারণ এই যে, হাঁসের গায়ের পালকগুলি এত ঘন সন্নিবিষ্ট যে, তার ভিতরকার বায়ুর সহিত কোনরূপই জলের সংমিশ্রণ হয় না, এজন্য জলে সাঁতরাইলে কিংবা ডুবিলেও হাঁসের শরীর বেশ গরম ও শুষ্ক থাকে। এ উত্তরই যে একেবারে ঠিক্ হইল, তাহা নহে। প্রাণীবিদ্যাবিশারদেরা বলেন যে, হাঁসের শরীরের ল্যাজের দিকে অর্থাৎ পিছনের দিক্‌কার গঠনের মধ্যে একপ্রকার গ্রন্থি বা গণ্ড (Gland) আছে, সেই গ্রন্থি হইতে তেলের মত এক প্রকার স্নিগ্ধ পদার্থ নির্গত হইয়া হাঁসের পালকের উপর ছড়াইয়া পড়িয়া এমনভাবে পালকগুলি তৈলাক্ত করিয়া পিছল করে যে, কিছুতেই জল লাগিতে পারে না। তেলে জলে কখনও মেশে না এ কথাত তোমরা জান। কাজেই হাঁস কিংবা অন্যান্য জলচর পাখীদের পালকের স্তরে ঐরূপ গ্রন্থি থাকায় এবং ঐসকল গ্রন্থি হইতে তৈলাক্ত পদার্থ বাহির হওয়ার দরুণ তাহাদের গায়ে জল লাগিতে পারে না। এ কথাটি বুঝিতেও তোমাদের কোনও অসুবিধা নাই।

মেঘের উৎপত্তি কি প্রকারে হয়?

মেঘ হইতে বৃষ্টি পড়ে তাহা তোমরা জান। কিন্তু মেঘ কিসে হয়, তাহা তোমরা বোধ হয় জান না। তোমরা হয়ত দেখিয়া থাকিবে যে, যখন বাষ্পীয় পোত কিংবা এন্‌জিন চলে, তখন তাহা হইতে বাষ্প বাহির হয়। ঐ বাষ্প উপরে গেলে ধূসর বর্ণের মেঘের মত দেখায়, অর্থাৎ তোমরা ধোঁয়াটে গোছ জিনিষ দেখিতে পাও। আকাশে ধূলি না থাকিলে তোমরা এই ধোঁয়া দেখিতে পাইবে না। বিশুদ্ধ জলীয় বাষ্প ধূলি-বিহীন স্থানে উঠিলে তথায় ঐরূপ ধোঁয়ার মত দেখা যায় না, ইহাতে দেখা যাইতেছে যে, জলীয় বাষ্পকে মেঘে পরিণত হইতে হইলে তাহাকে ধূলি-কণার আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। বায়ুতে ধূলিকণা যত অধিক থাকিবে, মেঘ তত ঘন দেখাইবে। রৌদ্রের উত্তাপে সমুদ্র এবং অন্যান্য জলাশয়াদি হইতে জল অনবরত বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেছে, সেই বাষ্প আকাশে উঠিয়া তথায় ধূলিকণা অবলম্বন করিয়া প্রথমে মেঘে এবং অবশেষে বৃষ্টির আকারে পৃথিবীর উপর পড়ে।



মেঘের উৎপত্তি

ধূলিকণা অল্পাধিক পরিমাণে জগতের সকল স্থানেই আছে এবং সেইজন্য মেঘও সকল স্থানে রচিত হইতে পারে। কিন্তু মেঘ একস্থানে থাকে না। বাতাসের ঢেউয়ে ঢেউয়ে তাহারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে চলিয়া যায় এবং নানাস্থানে বৃষ্টিধারা

বর্ষণ করিয়া থাকে। কাজেই মেঘের সঙ্গে ধূলিকণারও সংস্রব আছে।

মেঘের কি কোন ওজন আছে ?

আমরা কথায় বলি 'মেঘের মত হাল্কা !' আর ইংরাজীতে বলিয়া থাকি 'as light as cloud' কোন জিনিষের লঘুত্বের কথা বলিতে হইলেই এইরূপ কথা বলিয়া থাকি। মেঘেরা কিন্তু হাল্কা নয়, ইহাদের বেশ একটা ওজন আছে। মেঘেরা জমাট বাঁধা জলের সমষ্টি, কাজেই একটা যে ওজন থাকিবে, সে তো স্বাভাবিক। তোমরা বলিবে, যদি তাহারা ভারিই হইবে, তবে আকাশের গায় কেমন করিয়া ভাসিয়া বেড়ায়। তাহার উত্তর শোন। মেঘেরা অমনি অমনি বিনা কাজে দুষ্ট ছেলেটির মত অলস ভাবে আকাশের গায়ে ভাসিয়া বেড়ায় না, তাহাদের গা হইতে সব সময়েই বিন্দু বিন্দু করিয়া বৃষ্টি পড়ে। কুয়াসার ভিতর হইতেও যে জল পড়ে তাহা তো তোমরা প্রত্যক্ষ ভাবেই অনুভব করিয়া থাক। পৃথিবী হইতে জল সূর্য্যের কিরণে আকাশে উঠিয়া বাষ্পের

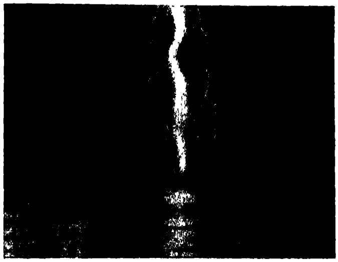


মেঘের কি কোন ওজন আছে ?

আকারে পরিণত হইতেছে—মেঘের সৃষ্টি হইতেছে এবং মেঘ হইতে ফোঁটা ফোঁটা করিয়া বৃষ্টির ধারা আবার পৃথিবীর বুকে ঝরিয়া পড়ে। পুঞ্জীভূত বাষ্পরাশির একটা গুরুত্ব আছে, কাজেই মেঘের ওজন যে থাকিবে, তাহা তো স্বাভাবিক।

যখন বিদ্যুৎ ও বজ্রাঘাত হয় তখন বিদ্যুতের আলো আগে দেখি কেন ?

তোমরা অনেকেই দেখিয়া থাকিবে যে, আকাশে যখন বিদ্যুৎ চমকায়, তার পরেই ভয়ানক শব্দ হয়। যাকে আমরা বাজ পড়া বা বজ্রপড়া বলি। তখন কিন্তু বিদ্যুতের আলো আগে দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার কিছু পরে গুরু গুরু করিয়া বজ্রের ধ্বনি



বিদ্যুৎ চমকাইতেছে

শুনিতে পাওয়া যায়। এরূপ কেন হয় ? যে আলো দেখ, তাহা বিদ্যুতের, যে শব্দ শোন, তাহাও বিদ্যুতের। দুই-ই এক সঙ্গেই হয়, তবে আমাদের চক্ষে দেখিতে ও কর্ণে শুনিতে সময়ের প্রভেদ হয় কেন ? কারণ এই, আলো যত বেগে ছোটে, শব্দ তত বেগে ছোটে না। আলো প্রায় তৎক্ষণাৎ দেখিতে পাই, কিন্তু শব্দ এক সেকেণ্ডে ১২০০ ফিটের বেশি যায় না। তাই শব্দ শুনিতে কিছু বিলম্ব হয়। আর একটা কথা মনে রাখিও যে, বাজ-পড়ার সময় সত্য সত্যই কিছু পড়ে না। বিদ্যুতের ঝিলিক্ লাগিয়া বাতাসটা হঠাৎ গরম হইয়া ছিটকিয়ে পড়ে, আর পরমুহূর্তেই সেই বাতাস ফিরিয়া আসিতে গিয়া ভয়ানক ঠোকাঠুকি লাগিয়া যায়, এই ঠোকাঠুকির শব্দকেই আমরা বজ্রপড়া বলি। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পৃথিবীর সব দেশের সাধারণ লোকের মধ্যে এমন একটা বিশ্বাস চলিয়া আসিতেছে, যে, বজ্র পড়া বলিতে সকলেই কিছু পড়ে বলিয়া মনে ভাবে। এ সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্পও শুনা যায়।

বৃষ্টির ফোঁটা যখন পড়ে তখন তা রেখাকার দেখায় কেন ?

বৃষ্টি যখন পড়ে তখন তা ফোঁটা ফোঁটা হ'য়েই পড়ে তাতে কোন সন্দেহ নেই। বৃষ্টির ফোটা যখন খুব ছোট আকারের হয়

তখন পড়বার সময় বাতাস তাকে বাধা দেয় বলে ফোঁটাগুলির নীচের দিকের গতি খুব কমে আসে। এই অবস্থায় তাদের আমরা পরিষ্কার বিন্দুরূপেই দেখিতে পাই। ইলসে গুঁড়ি পড়বার সময় আমরা এটা খুবই পরিষ্কার ভাবেই বুঝতে পারি। কিন্তু বৃষ্টির ফোঁটা যখন আয়তনে অপেক্ষাকৃত বড় হয় তখন সে খুব তাড়াতাড়ি নীচের দিকে পড়ে থাকে। এই তাড়াতাড়ি যখন আমরা চোখ দিয়ে দেখতে যাই তখন সেই দেখার মধ্যে আমরা একটা হাঙ্গাম বাধিয়ে বসি। তাতেই বৃষ্টিকে ফোঁটা ভাবে না পেয়ে আমরা পাই রেখাকারে। এই হাঙ্গামাটা কি তা এইবার তোমাদের বলছি।

যা কিছু আমরা দেখি তা প্রথমে আমাদের চোখের অক্ষিপটের (Ratina) উপর ছবি হ'য়ে পড়ে। ছবিটা উহার উপর বসে পড়লে পর সেখানে নানা রকমের রাসায়নিক ব্যাপার চলতে থাকে। এই রাসায়নিক ক্রিয়া, দৃষ্টি স্নায়ু দিয়ে আমাদের মস্তিষ্কের দৃষ্টিক্ষেত্রে (optic region) গেলে পরে আমাদের কাছে আলোর অনুভূতি জন্মে। অতএব এই রাসায়নিক ক্রিয়া যতক্ষণ রেটিনার ওপর চলতে থাকে ততক্ষণই আমরা আলো দেখি—এ বন্ধ হ'লেই আমাদের কাছে অন্ধকার বোধ হয়। বাইরের আলো এসে পড়লে পর অক্ষিপটের ওপর যে ক্রিয়া আরম্ভ হয় এই আলো সরে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই সে বন্ধ হয়ে যাওয়া উচিত। বাস্তবিক পক্ষে তা কিন্তু হয় না। বাইরের আলো সরে যাওয়ার পরও সামান্য আরও একটু সময় ধরে এই ক্রিয়া অক্ষিপটের ওপর চলতে থাকে। এই একটু বেশী সময় অবশ্য বাইরের দৃষ্টিতে খুবই কম—বোধ হয় এক সেকেণ্ড বিশ ভাগের একভাগ হবে কিনা সন্দেহ কিন্তু তা হলে কি হয়, আমাদের দেখার মধ্যে এর ক্রিয়া অনেক জায়গায় বেশ পাওয়া যায়। তোমাদের চলচ্চিত্র বা Bioscope দেখা হয়ত সম্ভবই হোত না যদি রেটিনাতে ছবিকে এইভাবে সামান্য একটুক্ষণ বেশী করে ধরে রাখবার এইরকম গুণ না থাকত। বৃষ্টির ফোঁটাকে রেখার রূপ দিতে অক্ষিপটের উপর এই গুণটিরই হাত রয়েছে।

ব্যাপার হয় এই। বৃষ্টির ফোঁটাটা তাড়াতাড়ি নেমে আসছে। আমাদের তাকে দেখবার সময় আমাদের রেটিনার ওপর তার প্রত্যেক অবস্থানের এক একটা ছবি তৈরী হচ্ছে। ছবিগুলো তৈরী হচ্ছে বটে, কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে মুছে যাচ্ছে না। তাই সব ছবিগুলোকেই আমরা প্রায় এক-সঙ্গেই দেখে নিই, আর আমাদের কাছে সব বিন্দুগুলো পর পর ভাবে একত্র হয়ে একটা রেখা হয়ে দেখা দেয়। অন্যপক্ষে ইলসেগুঁড়ি আস্তে আস্তে পড়ে তাই অক্ষিপটের ওপর তার কি ছবি হয় তা আগে যেতে যেতে পিছনের গুলো মুছে মুছে যায়। আর আমরা তখন পাই একটা ফোঁটাই নীচে নেমে চলেছে।

শরীরে ঝিঁঝিঁ ধরার মানে কি ?

অনেকক্ষণ একই ভাবে থাকবার পর যখন ক্লান্তি বোধ হয় তখন আমরা শরীরটাকে একবার নেড়ে চেড়ে নেই। এই সময় আমাদের হাতে পায়ে বিশেষ করে আমাদের শরীরের যে সব অংশ চাপা অবস্থায় ছিল সে সব জায়গায় যেন ছুঁচ ফুটছে এমন মনে হয়। একে বলে "ঝিঁঝিঁ ধরা।" "ঝিঁঝি ধরার" অনুভূতি আমাদের এতই সাধারণ যে সে তোমরা নিশ্চয়ই সকলে একাধিকবার অনুভব করেছ। কি কারণে এ হয় তা এইবার শোন। শরীরের কোনও অংশ অনেকক্ষণ একভাবে বা অন্য কোনও অঙ্গ দিয়ে চাপা থাকলে সেই অংশে যে শিরা ও উপশিরা থাকে তার মধ্যে রক্ত-চলাচলে বাধা পড়ে। এর ফলে হয় কি রক্ত অপেক্ষাকৃত কম যাওয়াতে সে সব জায়গায় যতটা উচিত ছিল ততটা পরিষ্কার হ'তে পায় না। কিন্তু যখন সে অঙ্গ থেকে চাপটা সরে যায় আর সেখানকার শিরা-উপশিরাগুলোর মধ্যে রক্ত-চলাচলের সব বাধা অপসারিত হয় তখন সেখান দিয়ে রক্ত বেগে বইতে আরম্ভ করে তাড়াতাড়ি জায়গাটাকে পরিষ্কার ক'রে দেবার চেষ্টা করে। রক্তে এই অস্বাভাবিক দ্রুত-সঞ্চালনের ফলে "ছুঁচ ফোটার" মত একটা অনুভূতি হয়।



মাযের আদর—শিম্পা



দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত

২১৮৬ পৃষ্ঠার পর

সমুদ্রগুপ্তের পর তাঁহার পুত্র দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত বিশাল গুপ্ত সাম্রাজ্যের অধিকারী হইযাছিলেন। সমুদ্রগুপ্তের বহুপুত্রের মধ্যে তিনিই সিংহাসনের যোগ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। সম্প্রতি কোনও কোনও ঐতিহাসিক অনুসন্ধানের দ্বারা সপ্রমাণ করিবার চেষ্টা করিয়াছেন যে সমুদ্রগুপ্তের অপর এক বয়োজ্যেষ্ঠ পুত্র পিতার নির্ব্বাচন অগ্রাহ্য করিয়া রাজ্য-অধিকার করিয়াছিলেন। ইঁহার নাম রামগুপ্ত। রামগুপ্ত রাজ্যশাসনের সম্পূর্ণ অযোগ্য ছিলেন। রাজ্যে নানারূপ বিশৃঙ্খলা হইতে আরম্ভ হইল। এমন কি সম্রাট বিদেশী শত্রুহস্তে পরাজিত হইলেন। তখন দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত দেশের কল্যাণের জন্য অযোগ্য ভ্রাতার প্রাণনাশ করিয়া স্বয়ং রাজ্যভার ও অগ্রজের পত্নীকে স্বীয় মহিষীরূপে গ্রহণ করিলেন।

চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে মালব ও সৌরাষ্ট্র গুপ্ত-সাম্রাজ্যভুক্ত হইয়াছিল। মালবদেশের উদয়গিরি পর্ব্বতের গুহায় সম্রাটের সান্ধি-বিগ্রহিক বীরসেন নামক ব্রাহ্মণ শিবপূজার নিমিত্ত একটি গুহা উৎসর্গ করিয়াছিলেন। বীরসেন তাঁহার খোদিত-লিপিতে বলিয়াছেন যে রাজা যখন পৃথিবী-জয়ার্থ আগমন করিয়াছিলেন তখন তিনি তাঁহার সহিত এদেশে আসিয়াছিলেন। ইহা দ্বারা প্রমাণ হইতেছে যে চন্দ্রগুপ্ত দিগ্বিজয়ের জন্য যাত্রা করিয়া মালব দেশে আসিয়াছিলেন। উদয়গিরির আর একখানি শিলালিপি হইতে প্রমাণ হইয়াছে যে দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালে ৪০১ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বেই মালব গুপ্ত-সম্রাট কর্ত্তৃক অধিকৃত হইয়াছিল।

মালব অধিকারের পরেই চন্দ্রগুপ্ত সৌরাষ্ট্রদেশ জয় করিয়াছিলেন। তোমাদের মনে থাকিতে পারে যে, মালব, সৌরাষ্ট্র ইত্যাদি প্রদেশে বিদেশী শকজাতীয় ক্ষত্রপ বংশের অধিকার ছিল। এই বংশের প্রসিদ্ধ রাজা রুদ্রদামা মালব, সৌরাষ্ট্র, কচ্ছ, রাজস্থান, সিন্ধু, কোঙ্কণ ইত্যাদি দেশসকলের উপর অধিকার করিয়া একটি বড় সাম্রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি অন্ধ্ররাজ শাতকর্ণীকে দুইবার পরাজিত করিয়াছিলেন। এই বংশের কয়েকজন রাজার নাম তিথি সহ তাঁহাদের মুদ্রায় অঙ্কিত পাওয়া গিয়াছে। শেষ নৃপতির নাম স্বামী রুদ্রসিংহ, তিনি

৩১০ শকাব্দে অর্থাৎ ৩৮৮ খৃষ্টাব্দে স্বনামে রজতমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন। আবার দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ৯০ গৌপ্তাব্দে (অর্থাৎ ৩১৯+৯০=৪০৯ খৃষ্টাব্দে) শকরাজগণের অনুকরণে নিজ নামে রৌপ্যমুদ্রা মুদ্রাঙ্কন আরম্ভ করেন। অতএব ৩৮৮ ও ৪০৯ খৃষ্টাব্দের মধ্যবর্ত্তী সময়ে মহারাজ রুদ্রসিংহের রাজ্য চন্দ্রগুপ্ত জয় করিয়াছিলেন।

শকবিজয়ের পরই চন্দ্রগুপ্ত 'বিক্রমাদিত্য' উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। তাঁহার মুদ্রায় 'বিক্রমাঙ্ক', 'শ্রীবিক্রম', 'বিক্রমাদিত্য', 'অজিতবিক্রম', 'সিংহবিক্রম' ইত্যাদি উপাধি পাওয়া যায়। এই সকল উপাধির মধ্যে 'বিক্রমাদিত্য' উপাধিই বিশেষ উল্লেখযোগ্য। এই উপাধি ভারতবর্ষে প্রাচীনকাল হইতেই প্রচলিত ছিল। পুরাকালে উজ্জয়িনীর এক রাজা শকদিগকে পরাজিত করিয়া বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন ও বিক্রমাব্দ প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন। গুপ্ত-বংশীয় সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তও এই শকারি বিক্রমাদিত্যের অনুকরণে শকজাতীয় ক্ষত্রপ বংশের রাজ্য নাশ করিয়া উজ্জয়িনী অধিকার করিয়াছিলেন ও বিক্রমাদিত্য উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন।

শকবিজয় সমাপ্ত করিয়া চন্দ্রগুপ্ত ইতিহাস-প্রসিদ্ধ পুরশ্রেষ্ঠ উজ্জয়িনীতে গুপ্তসাম্রাজ্যের পশ্চিম ভাগের রাজধানী স্থাপিত করিয়াছিলেন। তিনি পাটলিপুত্রকে ভুলিয়া যান নাই। 'কথাসরিৎসাগর' নামক গল্পগ্রন্থে তাঁহাকে পাটলিপুত্রের রাজা বলা হইয়াছে। চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা রাজকুমারী প্রভাবতীদেবীর বাকাটক-বংশীয় রাজা রুদ্রসেনের সহিত শুভ পরিণয়। সে সময়ে বাকাটকদের প্রভুত্ব নর্ম্মদা নদীর উপকূল হইতে কৃষ্ণা নদীর তট পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। কদম্ববংশীয় কুন্তলরাজ তাঁহার অধীনতা স্বীকার করিয়াছিলেন। অতএব চন্দ্রগুপ্তের সমকক্ষ না হইলেও বাকাটক-রাজ রুদ্রসেনের প্রতাপ নিতান্ত কম ছিল না। ইচ্ছা করিলে তিনি গুপ্তরাজের অনিষ্ট সাধন করিতে পারিতেন। নর্ম্মদা সীমান্তের রক্ষার জন্য বাকাটক রাজের মিত্রতা অতিশয় প্রয়োজনীয় ছিল। কূটনীতিকুশল চন্দ্রগুপ্ত এটা বুঝিতে পারিলেন ও রুদ্রসেনের সহিত স্বীয় কন্যা প্রভাবতী দেবীর বিবাহ দিয়া বাকাটক রাজের সহিত সখ্যসূত্রকে দৃঢ় করিলেন ও সঙ্গে সঙ্গে সাম্রাজ্যের দক্ষিণ সীমাকে নিষ্কণ্টক করিলেন।

দিল্লীর কুতবমিনারের নিকট মেহরৌলি নামক একটি গ্রাম আছে। এইস্থানে একটি লৌহস্তম্ভের গায়ে খোদিত লিপি পাওয়া গিয়াছে। এই লিপিতে 'চন্দ্র' নামক একটি বিজয়ী রাজার বিজয় বার্ত্তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হইয়াছে। এই চন্দ্র কে? তিনি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত না দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত? কিম্বা উভয় হইতে ভিন্ন অন্য কোনও বিস্মৃত রাজা? এই প্রশ্ন লইয়া পণ্ডিতদের মধ্যে মতভেদ চলিয়া আসিতেছে। মনে হয় যে তিনি দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত ভিন্ন অপর কেহ হইতে পারেন না। মেহরৌলি-লিপির চন্দ্রকে বঙ্গদেশে বিদ্রোহী শত্রুদলকে বিনাশ করিতে হইয়াছিল। ইহা হইতে মনে হয় যে 'চন্দ্র' সমুদ্রগুপ্তের পরবর্ত্তী কোন রাজা হইবেন। কারণ, সমুদ্রগুপ্ত প্রথম বঙ্গবিজয় করিয়াছিলেন। অতএব তাঁহার পরেই বঙ্গবিদ্রোহ সম্ভব। আবার 'চন্দ্র' সিন্ধুনদের সপ্তমুখ পার হইয়া বাহ্লীকদিগকে জয় করিয়াছিলেন। পঞ্জাবের পাঁচটি নদী ও কাবুল এবং কুনার নদী লইয়া সাতটি নদী। এই সাতটি নদীকে সিন্ধুনদের 'সপ্তমুখ' বলা হইয়াছে। পর পর সাতটি নদীকে পার হইয়া কাবুল, ও কপিশা হইয়া 'একাধিরাজ' চন্দ্র বাহ্লীক দেশে

আসিয়াছিলেন ও তথাকার নিবাসীদিগকে যুদ্ধে জয় করিয়াছিলেন। এই অসাধ্য সাধন সামান্য রাজার কর্ম্ম নহে। তিনি প্রথম চন্দ্রগুপ্ত হইতে পারেন না। সমুদ্রগুপ্তের সময়ের কোনও স্থানীয় রাজার দ্বারাও ইহা সম্ভবপর নহে। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত পিতা সমুদ্রগুপ্তের নিকট হইতে বিশাল সাম্রাজ্য উত্তরাধিকার-সূত্রে পাইয়াছিলেন। আবার মালব এবং সৌরাষ্ট্রদেশ জয় করিয়া পশ্চিম পয়োধি পর্য্যন্ত রাজ্যসীমা প্রসারিত করিয়াছিলেন। প্রথম চন্দ্রগুপ্ত বা অন্য কোনও সামান্য প্রাদেশিক রাজার পক্ষে যাহা অসাধ্য ছিল, তাঁহার পক্ষে তাহা সুসাধ্য ছিল। বাহ্লীক দেশে কুষণরাজ কনিষ্কের বংশধরের শাসন এখনও স্থায়ী ছিল। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে সমুদ্রগুপ্ত "দৈবপুত্র", "ষাহী", "ষাহানুষাহী" উপাধিধারী পঞ্জাব এবং কাবুল হইতে অক্সস নদী পর্য্যন্ত দেশসকলের রাজগণকে 'আত্মনিবেদন' করিতে বাধ্য করিয়াছিলেন। দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত কেবল আত্মনিবেদনের দ্বারা তুষ্ট হইতে পারেন নাই। তিনি এই সকল দেশ বিজিত করিয়া তাঁহাদিগকে সমূলে নষ্ট করিয়াছিলেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকালের আরও একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা চীনদেশী যাত্রী ফা-হিয়ানের ভারতবর্ষে আগমন। ফা-হিয়ান ৩৯৯ খৃষ্টাব্দে পুণ্যভূমি ভারতবর্ষে পদার্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল বৌদ্ধতীর্থ সমূহের দর্শন করা, বৌদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থ সকল সংগ্রহ করা ও ভারতের বিখ্যাত বিদ্যাপীঠসমূহে বড় বড় পণ্ডিতদের নিকট সেই সকল গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানার্জ্জন করা। তিনি এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন ও সৌভাগ্যের বিষয় নিজের ভ্রমণ-বৃত্তান্ত লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন। ফা-হিয়ানের মন ছিল কেবল ধর্ম্মের দিকে। তিনি অন্য বিষয়ে উদাসীন ছিলেন। তোমরা শুনিয়া বিস্মিত হইবে যে যদিও তিনি ছয় বৎসর যাবৎ চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যের নানাস্থানে ভ্রমণ করিয়াছিলেন তথাপি নিজের যাত্রা-বিবরণে রাজার নাম পর্য্যন্ত উল্লেখ করেন নাই! তবু তৎকালীন ভারতবর্ষের বিষয়ে তিনি যাহা কিছু লিখিয়াছেন, তাহা হইতেই আমরা চন্দ্রগুপ্তের সাম্রাজ্যের সামাজিক, ধর্ম্মবিষয়ক ও রাজনৈতিক অবস্থার বিষয় অনেক কিছু জানিতে পারি।

ফা-হিয়ানের বিবরণ হইতে জানা যায় যে সে সময়ে দেশের লোকের জীবন বেশ সুখ শান্তিময় ছিল, ভারত ধনধান্যে পূর্ণ ছিল। বিশেষ করিয়া মথুরা ও তাহার দক্ষিণের দেশ অতিশয় সমৃদ্ধিশালী ছিল। এই দেশকে মধ্যদেশ বলা হইত। প্রজারা রাজার জমি চাষ করিত আর শস্যের এক ভাগ রাজাকে খাজনা দিত। তাহারা যখন ইচ্ছা জমি ছাড়িয়া দিতে পারিত এবং যেখানে ইচ্ছা বাস করিতে পারিত। এ বিষয়ে তাহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন ছিল। কোথাও যাইবার জন্য সরকারী আজ্ঞাপত্রের দরকার হইত না। ভারতবাসীদিগকে নিজেদের পরিবারবর্গের নাম সরকারী খাতায় লিখাইতে হইত না। রাজা কখনও প্রাণদণ্ড দিতেন না। অপরাধের গুরুত্ব অনুসারে লঘু অথবা গুরুদণ্ড দেওয়া হইত। বার বার রাজদ্রোহ করিলে অপরাধীর দক্ষিণ হস্ত কাটিয়া ফেলা হইত। সরকারী অথবা নিজস্ব কর্ম্মচারীগণকে রাজা নিয়মিত রূপে বেতন প্রদান করিতেন। সমস্ত দেশে চণ্ডাল ভিন্ন অন্য কেহ জীব-হিংসা বা সুরাপান বা লশুন এবং পলাণ্ডু ভক্ষণ করিতে জানিত না। চণ্ডালেরা নগরের বাহিরে বাস করিত এবং নগরের ভিতর আসিবার সময় দুইটি কাষ্ঠখণ্ডে শব্দ করিতে

করিতে আসিত। এইরূপ শব্দ করিবার কারণ যাহাতে লোকে তাহাদের আসিবার বিষয় জানিতে পারে ও নিজেদের স্পর্শ-দোষ হইতে বাঁচাইতে পারে। কেহই শূকর বা কুক্কুট পালন করিত না। হত্যাগৃহ (জবাইখানা) বা মদের ভাটি কোথাও ছিল না। জীবিত পশু যথার্থ কোথাও বিক্রয় করা হইত না। মৎস্য-শিকার বা মৃগয়া নীচ জাতির ব্যাধেরাই করিত এবং তাহারাই মাংস বিক্রয় করিত। বাজারে ক্রয়-বিক্রয়ের কার্য্য কড়ির দ্বারাই হইত।

সমস্ত দেশে রাজারা এবং ধনী ও সাধারণ গৃহস্থেরা বৌদ্ধ ভিক্ষুদের থাকিবার জন্য বিহার নির্ম্মাণ করাইয়া দিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের ভরণ-পোষণের জন্য ক্ষেত্র, উদ্যান, পরিচারক এবং পশু ইত্যাদি দান করিয়াছিলেন। দানপত্রগুলি তাম্রপত্রে লিখিত হইত। রাজারা পুরুষানুক্রমে এই সকল দানপত্র মানিয়া চলিতেন। বিহার গুলিতে ভিক্ষুদিগকে ভোজন, পরিধেয় বস্ত্র ও বিছানা ইত্যাদি দেওয়া হইত। ভিক্ষুরা পরোপকার, ধর্ম্মগ্রন্থের অধ্যয়ন ও ধ্যানে ব্যাপৃত থাকিতেন। বর্ষাকালে আগন্তুক ভিক্ষুদিগকে আশ্রয় প্রদান করা হইত। অতিথি-সৎকারের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা হইত। বর্ষা অতীত হইলে উপাসকেরা (অর্থাৎ বৌদ্ধ গৃহস্থেরা) ভিক্ষুদিগকে প্রভূত দান করিতেন। চতুর্দ্দিক হইতে ভিক্ষুদের জন্য পেয় ও ভোজ্যসামগ্রী পাঠান হইত। ব্রাহ্মণ এবং অন্যান্য ধনী ব্যক্তিরা বস্ত্র এবং অন্যান্য আবশ্যক বস্তু বিতরণ করিতেন।

কান্যকুব্জ, শ্রাবস্তী ইত্যাদি জনপদ পার হইয়া ফা-হিয়ান পাটলিপুত্রে আসিয়া পৌঁছিয়াছিলেন। সে সময়ে পাটলিপুত্র মগধের রাজধানী ছিল। পাটলিপুত্র সমাজের ঐশ্বর্য্যগৌরবে অন্য কোনও নগর অপেক্ষা হীন ছিল না। অশোকের সময়ের অট্টালিকা এখনও কালের প্রভাব রোধ করিয়া দণ্ডায়মান আছে। মৌর্য্যরাজাদের প্রাসাদ দেখিয়া ফা-হিয়ান অবাক্ হইয়াছিলেন। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড প্রস্তরখণ্ড দ্বারা নির্ম্মিত এবং অশেষ প্রকারের কারুকার্য্য খচিত এই প্রাসাদ এতই বিস্ময়কর ছিল যে মনে হইত, ইহা বুঝি মানুষের দ্বারা নির্ম্মিত হয় নাই। বুঝি কোনও মায়াবী নিশাচর নিজের শিল্প-চাতুরীর পরাকাষ্ঠা দেখাইবার নিমিত্ত এই প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছিল। অশোকের দ্বারা নির্ম্মিত অনেক স্তূপ তখনও বিদ্যমান ছিল। মহাযান ও হীনযান সম্প্রদায়ের ভিক্ষুদের জন্য পৃথক্ পৃথক্ দুইটি বিহার ছিল। পাঁচ ছয় শত ভিক্ষু এই দুইটি বিহারে অবস্থান করিতেছিলেন। তাঁহাদের অগাধ পাণ্ডিত্যের খ্যাতি অনেক দূর পর্য্যন্ত ব্যাপ্ত হইয়াছিল। তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ শুনিবার জন্য দেশ-দেশান্তর হইতে জিজ্ঞাসুগণ আসিতেন। ফা-হিয়ান পাটলি-পুত্রে তিন বৎসর থাকিয়া সংস্কৃত শিক্ষা করিয়াছিলেন। বিনয়পিটকের সম্পূর্ণ গ্রন্থ তিনি অন্য কোথাও বিশেষ অনুসন্ধান করিয়াও পান নাই। কিন্তু পাটলিপুত্রে তিনি এই অলভ্য গ্রন্থ পাইয়াছিলেন।

দেশের লোকেরা অত্যন্ত দয়ালু ছিল। তাঁহারা পরোপকার করিতে সর্ব্বদাই ব্যস্ত থাকিতেন। স্থানে স্থানে অন্নসত্র স্থাপিত হইয়াছিল ও পথিকদের থাকিবার জন্য পান্থানবাস বা ধর্ম্মশালা নির্ম্মিত হইয়াছিল। রাজধানীতে গরীব-দুঃখীদিগকে বিনামূল্যে ঔষধ বিতরণ করিবার জন্য চিকিৎসালয় বা হাসপাতাল খোলা ছিল। রোগীদিগের তত্ত্বাবধানের জন্য এখানে সদাসর্ব্বদা একজন বৈদ্য থাকিতেন। এই চিকিৎসালয়ের

সম্পূর্ণ ব্যয়ভার নগরের কতিপয় দানশীল ধনবান ব্যক্তি স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছিলেন। এইরূপ সর্ব্বসাধারণের নিমিত্ত দাতব্য চিকিৎসালয় পৃথিবীর অন্য কোথাও ছিল না।

ফা-হিয়ানের বিবরণ পাঠ করিলে সেকালে ভারতের শাসন-ব্যবস্থা, সমাজ, শাসন ও রীতিনীতি সম্বন্ধে অনেক কথাই জানা যায় এবং মনে হয় সে সব দিনগুলি কতই না সুখের ও শান্তির ছিল! কি সুখেই না প্রজারা দিন কাটাইত! রাজা উদার, ধার্ম্মিক, প্রজারঞ্জক ছিলেন। প্রজারা রাজভক্ত, শান্তিপ্রিয় ও পরোপকারী ছিল। প্রজাদের উপর কখনও অত্যাচার হইত না। প্রজারা কখনও কর্ত্তব্যবিমুখ হইত না। তাহারা সুখে ও শান্তিতে জীবন যাপন করিত। তাহাদের স্বাধীনতায় কখনই হস্তক্ষেপ করা হইত না। তাহাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে পরিপূর্ণ স্বাতন্ত্র্য এবং স্বাধীনতা ছিল। জিনিষপত্র এত সুলভ ছিল যে কড়ির দ্বারাই ক্রয় বিক্রয়ের কাজ চলিয়া যাইত। জাতিভেদ ও অস্পৃশ্যতা অবশ্য সমাজ হইতে দূর হয় নাই।

দেশের লোকেরা সাধু-সন্ন্যাসীদের প্রতি শ্রদ্ধাবান ছিল। বৌদ্ধ-ভিক্ষুদের ভরণ-পোষণ দেশের লোকের দানশীলতার উপরই নির্ভর করিত। বৌদ্ধধর্ম্মের একটু অবনতি ও ব্রাহ্মণ ধর্ম্মের অভ্যুদয় আরম্ভ হইয়াছিল। কিন্তু ইহা এত ধীর গতিতে হইতেছিল যে ফা-হিয়ান তাহা বুঝিতেও পারেন নাই। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলবাস্তু ও পরিনির্ব্বাণ স্থান কুশীনগর জনশূন্য হইয়া গিয়াছিল। বুদ্ধগয়ারও জন-সংখ্যা অনেক কমিয়া গিয়াছিল। এইখানেই বোধিদ্রুমের তলদেশে গৌতম বুদ্ধ নির্ব্বাণ লাভ করিয়াছিলেন, সেই জন্য এই স্থানে বৌদ্ধদের মহাতীর্থ ছিল, কিন্তু ফা-হিয়ানের সময়ে ইহা চারিদিকে ঘন জঙ্গলে বেষ্টিত ছিল।

ফা-হিয়ান অঙ্গদেশের রাজধানী চম্পা হইয়া বঙ্গদেশের বিখ্যাত বন্দর তাম্রলিপ্তিতে বা তাম্রলিপ্তে পৌঁছিয়াছিলেন। তাম্রলিপ্তির আধুনিক নাম তমলুক। ইহা মেদিনীপুর জেলায় অবস্থিত। এইখানে ফা-হিয়ান দুই বৎসর থাকিয়া জলপথে সিংহল দেশে গিয়াছিলেন। সিংহলে বৌদ্ধধর্ম্মের বহুল প্রচার ছিল ও সেখানকার রাজা অতিশয় ধার্ম্মিক এবং শুদ্ধাচারী ছিলেন। সিংহল হইতে যাত্রা করিয়া ফা-হিয়ান যবদ্বীপে পৌঁছিয়াছিলেন। যবদ্বীপে (আধুনিক জাভা) এ সময়ে ব্রাহ্মণ-ধর্ম্মের প্রসার ছিল। যবদ্বীপে পাঁচ মাস থাকিয়া ফা-হিয়ান আর একটি জাহাজে আরোহণ করিয়া জলপথে নিজের জন্মভূমি চীনদেশে চৌদ্দ বৎসর পরে ফিরিয়া গিয়াছিলেন।

চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়ের রাজত্বকালে ভারতের শাসন ব্যবস্থা অতিশয় উত্তম ছিল। সম্রাট নিজে রাষ্ট্রস্বামী ছিলেন। তিনিই ছিলেন রাজ্যের হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। তাঁহার সাহায্যের নিমিত্ত কতকগুলি অমাত্য বা সচিব নিযুক্ত হইতেন। অমাত্যদের মধ্যে প্রধান ছিলেন—মন্ত্রী, সান্ধিবিগ্রহিক এবং অক্ষপটলাধিকৃত। এ কালের ন্যায় সৈনিক (military) এবং নাগরিক (civil) বিভাগ ভিন্ন ভিন্ন ছিল না অর্থাৎ একই পদাধিকারী ন্যায়বিভাগের উচ্চতম কর্ম্মচারী এবং সেনাবিভাগের প্রধান অমাত্য হইতে পারিতেন। যিনি মন্ত্রী, তিনিই আবার 'মহাবলাধিকৃত' হইতেন। প্রধান প্রধান অমাত্যেরা নিজ নিজ পদে উত্তরাধিকারী-সূত্রে নিয়োজিত হইতেন। চন্দ্রগুপ্তের মন্ত্রীর নাম ছিল শিখরস্বামী, তিনি ছিলেন একজন ব্রাহ্মণ। তাঁহার

সান্ধিবিগ্রহিকের নাম ছিল বীরসেন, ইনিই শিবপূজার নিমিত্ত উদয়গিরিতে একটি গুহা নির্ম্মিত করাইয়াছিলেন। বীরসেন নিজেকে "অন্বয়প্রাপ্তসাচিব্য" বলিয়া বর্ণনা করিয়াছেন অর্থাৎ তিনি উত্তরাধিকার-সূত্রে সচিব-পদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। বীরসেন রাজাকে কাহার সহিত যুদ্ধ করিতে হইবে বা কাহার সহিত সন্ধি করিতে হইবে—এই বিষয়ে পরামর্শ দিতেন। ইহাই ছিল সান্ধিবিগ্রহিকের কর্ত্তব্য।

ন্যায়বিভাগের উচ্চতম পদাধিকারীর নাম ছিল মহাদণ্ডনায়ক। পুলিশের উচ্চতম কর্ম্মচারীর নাম ছিল 'দণ্ডপাশাধিকৃত'। সাধারণ পুলিশের লোকের নাম ছিল 'দণ্ডপাশক'; 'চৌরোদ্ধরণিকের' কর্ত্তব্য ছিল চোর ধরা।

শাসনের সুবিধার জন্য গুপ্তসাম্রাজ্যকে কতিপয় ছোট বড় ভাগে বিভক্ত করা হইয়াছিল। এই ভাগগুলিকে 'ভুক্তি' বলা হইত; 'ভুক্তি'র শাসককে 'ভোগিক' 'ভোগপতি', 'রাজস্থানীয়' 'গোপ্তা', 'উপরিকমহারাজ' ইত্যাদি নামে অভিহিত করা হইত। এই পদে বিশেষ করিয়া রাজপুত্রদের নিযুক্ত করা হইত। একটি ভুক্তিতে অনেকগুলি 'বিষয়' অন্তর্ভুক্ত থাকিত। বিষয়ের শাসনকর্ত্তার নাম ছিল বিষয়পতি। এই বিষয়পতিকে রাজ্যশাসন সম্বন্ধে সাহায্য করিবার নিমিত্ত একটি সমিতি থাকিত। এই সমিতির সদস্য হইতেন প্রথম বা মুখ্য কায়স্থ অর্থাৎ লেখক, নগরশ্রেষ্ঠী, সার্থবাহ সওদাগর ইত্যাদি। বিষয়ের নীচেই ছিল গ্রাম। গ্রামের শাসন 'গ্রামিকের' অধীনে থাকিত। 'গ্রামিক' 'পঞ্চমণ্ডলী' অর্থাৎ পঞ্চায়েতের পরামর্শানুসারে গ্রামের শাসন করিতেন। গ্রামের মাতব্বর প্রজাদিগকে 'মহত্তর' বলা হইত। ইহাঁরা বয়োবৃদ্ধ হইতেন ও গ্রামের শাসনপ্রবন্ধ কিরূপ হওয়া উচিৎ সে বিষয় অনেক সুপরামর্শ দিতেন। তোমরা এখন বুঝিতে পারিতেছ যে গুপ্তকালীন শাসনব্যবস্থা কিরূপ সুগঠিত ছিল।

চন্দ্রগুপ্ত বিক্রমাদিত্যের সময়ে সংস্কৃত সাহিত্যের চরমোন্নতি হইয়াছিল। এইরূপ প্রবাদ আছে যে মহাকবি কালিদাস উজ্জয়িনীর রাজা বিক্রমাদিত্যের সভার নবরত্নের মধ্যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। অবশ্য এই প্রবাদের মূলে কিছু সত্য থাকিলেও ইহা সর্ব্বথা গ্রাহ্য হইতে পারে না, কারণ ইতিহাসের দ্বারা প্রমাণ হয় যে নয়জন বিদ্বান সকলেই সমকালীন হইতে পারেন না—কারণ নবরত্নের মধ্যে জ্যোতিষের আচার্য্য বরাহমিহিরেরও নাম আছে। তিনি তাঁহার পঞ্চসিদ্ধান্তিকা নামক গ্রন্থ ৫০৫ খৃষ্টাব্দে সমাপ্ত করিয়াছিলেন। কিন্তু চন্দ্রগুপ্তের রাজ্যকাল ৪১৪ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি সমাপ্ত হইয়াছিল। তাহা হইলেও প্রবাদটি একেবারে ভিত্তিহীন বলিয়া অগ্রাহ্য করা যায় না। রাজতরঙ্গিণী-কার কহ্লণ লিখিয়াছেন যে শকারি বিক্রমাদিত্য বিদ্বানদিগের আশ্রয়দাতা ছিলেন। তোমাদিগকে পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয় শকদের শত্রু ছিলেন ও তিনি বিক্রমাদিত্য উপাধিও ধারণ করিয়াছিলেন। অবশ্য বিক্রমাব্দের প্রতিষ্ঠাতাও একজন শকারি বিক্রমাদিত্য ছিলেন; কিন্তু কালিদাসকে এই বিক্রমাদিত্যের সমকালীন মনে করিবার পক্ষে বাধা অনেক। সুপ্রসিদ্ধ পণ্ডিতদের মতে কালিদাস দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের সভারই উজ্জ্বল রত্নস্বরূপ ছিলেন। কালিদাস 'রঘুবংশ' নামক কাব্যে রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন। আবার হরিষেণ সমুদ্রগুপ্তের দিগ্বিজয়ের বর্ণনা এলাহাবাদের স্তম্ভলিপিতে করিয়াছেন এতদুভয়ের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য

আছে। মনে হয় কালিদাস যেন রঘুর দিগ্বিজয় বর্ণনার ছলে সমুদ্রগুপ্তেরই দিগ্বিজয় বর্ণনা করিয়াছেন।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের ইতিহাস আলোচনা করিয়া দেখিলে কোন সন্দেহ থাকে না যে ভারতবর্ষ এই সময় উন্নতির চরম শিখরে আরোহণ করিয়াছিল। ভারতের বহির্বাণিজ্যও এই সময় অতিশয় বৃদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ভারতের সহিত রোমক সাম্রাজ্যের বাণিজ্য এত অধিক বৃদ্ধি হইয়াছিল যে রোমের সুবর্ণ মুদ্রা (দিনেরিয়স) এ দেশে সাধারণতঃ ব্যবহার হইত। গুপ্তরাজারা রোমের মুদ্রার অনুকরণে সুবর্ণ মুদ্রা মুদ্রাঙ্কন করাইয়াছিলেন, এই সকল মুদ্রাকে দীনার বলা হইত। তা ছাড়া চন্দ্রগুপ্ত ক্ষত্রপগণের অনুকরণে রজতমুদ্রাও প্রচলিত করিয়াছিলেন। এই সময় দেশ ধনে, মানে, গৌরবে সমগ্র এশিয়ার শীর্ষস্থান অধিকার করিয়াছিল।

দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের প্রধানা মহিষীর নাম ধ্রুবদেবী বা ধ্রুবস্বামিনী। ধ্রুবস্বামিনীর গর্ভে তাঁহার কুমারগুপ্ত ও গোবিন্দ নামে দুই পুত্র জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। পিতার মৃত্যুর পর কুমারগুপ্ত সিংহাসন লাভ করিয়াছিলেন। পিতার ন্যায় কুমারগুপ্তও অনেকগুলি উপাধি ধারণ করিয়াছিলেন। এই সকল উপাধির পরিচয় তাঁহার মুদ্রা হইতে পাওয়া যায়। 'মহেন্দ্র', 'মহেন্দ্রাদিত্য', 'সিংহ মহেন্দ্র', 'অজিত মহেন্দ্র', 'গুপ্তকুলব্যোমশশী', 'অশ্বমেধ মহেন্দ্র', ইত্যাদি উপাধি হইতে আমরা বেশ বুঝিতে পারি যে কুমারগুপ্ত প্রতাপে নিজেকে পিতার সমকক্ষ মনে করিতেন। এবং সত্যই কুমারগুপ্তের সময় গুপ্তবংশের প্রতাপসূর্য্য মধ্যগগনে দেদীপ্যমান ছিল।

কুমারগুপ্তের রাজ্যকালের শিলালিপি তথা মুদ্রার প্রাপ্তিস্থান হইতে সহজেই অনুমান করা যায় যে তাঁহার অধিকার সৌরাষ্ট্র হইতে বঙ্গদেশ পর্য্যন্ত অপ্রতিহত ছিল। তাঁহার প্রতিনিধিস্বরূপ তাঁহার অমাত্য চিরাতদত্ত পুণ্ড্রবর্দ্ধনভুক্তি অর্থাৎ উত্তরবঙ্গ শাসন করিতেন। রাজকুমার ঘটোৎকচগুপ্ত ৪৩৫ গুপ্তাব্দের কাছাকাছি অরিকিণ বিষয় (অর্থাৎ এরণ পূর্ব্ব মালব) শাসন করিতেছিলেন। বন্ধুবর্ম্মা নামক সামন্তরাজ দশপুরের (পশ্চিম মালবের) শাসক ছিলেন। কুমারগুপ্তের প্রধান সেনাপতির নাম পৃথিবীসেন। পৃথিবীসেনের পিতা শিখরস্বামী চন্দ্রগুপ্ত দ্বিতীয়ের প্রধান মন্ত্রী ছিলেন।

পিতামহ সমুদ্রগুপ্তের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া কুমারগুপ্তও অশ্বমেধ যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন ও তাহার স্মরণার্থ একপ্রকার সুবর্ণমুদ্রা অঙ্কিত করাইয়াছিলেন। এই মুদ্রার একদিকে অশ্বমেধের অশ্ব ও অপরদিকে চামর হস্তে প্রধানা মহিষীর মূর্ত্তি আছে।

কুমারগুপ্তের রাজত্বকাল ৪১৫ গুপ্তাব্দে প্রারম্ভ হইয়াছিল। তাঁহার সময়কার ছয়টি শিলালিপি পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রজতমুদ্রায় ১৩৬ গুপ্তাব্দ পর্য্যন্ত বর্ষ অঙ্কিত পাওয়া গিয়াছে। তাঁহার রাজ্যকালের অবসান ঐ বর্ষ অর্থাৎ ৪৫৫ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি হইয়াছিল।



মাছেরা কেন বোবা হইল?

(জাপানের গল্প)

২২৯৭ পৃষ্ঠার পর

তোমরা বুঝি ভাবিয়াছ, মাছেরা চিরকাল এমনি বোবা ছিল? তাহাদিগের মুখ হইতে একটি শব্দ, বা একটা কথাও বাহির হইত না?—তা নয়। মাছেরা কেমন করিয়া বোবা হইল, বলিতেছি, শোন।

পৃথিবীর সৃষ্টি হইবার পর, অন্যান্য প্রাণীদের মত মাছেদেরও মধুর কণ্ঠস্বর ছিল। পাখীদের চেয়েও মধুর স্বরে তাহারা গান করিতে পারিত। তাই লোকে সেকালে আত্মীয়স্বজনকে মধুকণ্ঠ পাখী উপহার না দিয়া মধুকণ্ঠ মাছ উপহার দিত।

অনেক দিন মানুষের কাছে থাকিতে থাকিতে মাছেরা যে শুধু আমাদিগের কথা বুঝিতে পারিত, তা নয়, চমৎকার কথা কহিতেও পারিত। কিন্তু এই কথা কহাই তাহাদিগের কাল হইল। কথা কহিতে হইলে খানিক বুদ্ধি থাকা চাই—কিন্তু মাছেদের তত বুদ্ধি ছিল না। তাহাদিগের যেমন বুদ্ধি অল্প, কথাও তেমনই বেশী বলিত। যে সকলের চেয়ে নির্বোধ, সেই সকলের চেয়ে অধিক কথা কয়।

সকাল হইতে রাত্রি পর্য্যন্ত মাছের চীৎকারে লোকে বিরক্ত হইয়া উঠিল এবং তাহাদিগের কথা বন্ধ করিবার জন্য চেষ্টা করিতে লাগিল। কিন্তু কিছুই ফল হইল না। যদি কখনও কোন পণ্ডিত লোক নির্জ্জন স্থানে বেড়াইতে বাহির হইয়া পুষ্করিণীর ধারে থাকেন, তাহা হইলে অমনি মাছেদের চীৎকারে তাঁহার গভীর চিন্তা কোথায় মিলাইয়া যাইত। শ্রান্ত শ্রমজীবি শীতল জলের ধারে শুইয়া মধ্যাহ্নে একটু আরামে ঘুমাইতে চাহিলে মাছেরা অবিরক্ষণ তাহাকে ঘুমাইতে দিত না। এক কথায় মাছেদের দৌরাত্ম্য অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল।

এখন মাছেদের রাজা জলমানব প্রতি মাসে একবার করিয়া তাঁহার প্রজা মাছেদের আপন প্রাসাদে ডাকিতেন। রাজার প্রাসাদ—স্ফটিকে গড়া, তাহার প্রাচীর ছিল না। কেবল সারি সারি স্তম্ভ। তাহাতে মাছেরা দরজা না খুলিয়া অনায়াসে ভিতরে সাঁতার দিয়া যাইতে আসিতে পারিত। দরজা খোলা মাছেদের পক্ষে বড় কঠিন কাজ। নাগবালা, ও জলপরীরাও প্রাসাদে আসিত, আনন্দে নাচিত, গাহিত। রাজা ও রাণী লাল প্রবাল ও সোনার সিংহাসনে বসিয়া তাহাদের নাচ দেখিতেন, গান শুনিতেন।

রাজপ্রাসাদে সকল রকম উপাদেয় খাদ্য,—মিষ্টান্ন, পায়স, পিঠা ও অন্য মিষ্টি মধুর সরবৎ নানা সুন্দর সুন্দর বাসনে সাজানো থাকিত। সেকালে মাছেরা এখনকার মত পোকা মাকড় খাইত না। জলের চেয়ে সরবৎই তাহাদের বেশী ভাল লাগিত। নাগবালারা ভাল নাচিতে পারিলে রাজা রাণী তাহাদিগকে মহামূল্য মুক্তা



সকল উপহার দিতেন। সব মণি-মাণিক্যের মধ্যে রাজার মণিময় আংটিটি সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর ছিল। রাজা সব সময় সেটি পরিয়া থাকিতেন। রাইন নদের সোনা দিয়া বামনেরা ঐ আংটি গড়িয়াছিল। কি দেবতা, কি মানুষ সকলেই আংটিটি পাইবার জন্য লালায়িত হইয়াছিল। রাজা জলমানব যে ঐ আংটির মালিক, একথা কেহ জানিত না। এটি বড়ই গোপনীয় কথা। উৎসবের পর মাছেদের যখন চলিয়া যাইবার সময় হইত, রাজা তখন মাছেদের এই গোপনীয় কথা সম্বন্ধে সাবধান করিয়া দিতেন। বলিতেন,—'যাইবা সব সাবধান মানুষের কাছে আমাদের গোপনীয় কথা বলিও না। পাতালে এই পুরীতে কত রত্ন আছে, জানিলে মানুষ আসিয়া সব লুটিয়া লইয়া যাইবে, স্ফটিকের পুরী ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তোমাদেরও অমঙ্গল ঘটিবে।'

মাছেরা বলিয়া যাইত, আমরা কাহাকেও কিছু বলিব না, কিন্তু কথা গোপন রাখা তাহাদের পক্ষে দায় হইয়া উঠিল।

একদিন আবার তাহারা রাজপ্রাসাদে ভোজ খাইয়া আসিল, এবং পরদিন প্রভাতে সকলে মিলিয়া ভোজের ধুমধাম ও জাঁকজমক সম্বন্ধে মহা গল্প জুড়িয়া দিল। মাছের দল একটা নির্ম্মল ঝরণার কাছে আসিয়া রাণীর পরিচ্ছদ সম্বন্ধে গল্প আরম্ভ করিল; তাঁহার দীর্ঘ কুঞ্চিত ঘাগরা পিছনে কেমন দুলিয়া দুলিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া লুটাইয়া লুটাইয়া যাইতেছিল, তাহার তারিফ করিতে লাগিল। কার্প ও পাইক মাছের ব্যবহারে ভোজ সভার সকলেই ভারি চটিয়া গিয়াছিল। ও দুটা ভারী বেয়াদব। মস্ত দেহ, গায়ে যথেষ্ট বল বলিয়া তাহারা সমস্ত খাদ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া নষ্ট করিয়াছিল।—পাইক, কার্প এবং বড়মানুষ স্যালমোন (Salmon) মাছের গল্পের আর অন্ত নাই। তাহারা এক ঠাঁই মিলিয়া মুখের অদ্ভুত ভঙ্গিমা করিয়া গল্পই করিতে লাগিল। মাছেদের গল্প ও বক্তৃতা বহুক্ষণ চলিল, শেষে চীৎকার করিতে করিতে তাহাদের সকলের গলা ভাঙ্গিয়া গেল।

ঠিক যে সময়ে তাহারা সভা শেষ করিয়া চলিয়া যাইতেছিল, সেই সময়ে একটি পল্লীযুবক সেইখানে উপস্থিত হইল। সে দাঁড়াইয়া কান



রাজার প্রাসাদ - স্ফটিকে গড়া

পাতিয়া শুনিতে লাগিল; খানিক মাছেদের তাকাইয়া তাকাইয়া দেখিল, তারপর অত্যন্ত বিস্মিতভাবে বলিল—'ও ! তোমরা সব কি বুদ্ধিমান। কি চমৎকার বক্তৃতাই করিতে পার। বোধকরি, তোমরা আমাকে আরও অনেক কথা শুনাইতে পার।'

এই কথায় মাছেদের হৃদয় গর্ব্বে ফুলিয়া উঠিল।

মাছেরা এক সঙ্গে বলিল, হাঁ, পারি, শুধু সুন্দর কথা নয় অনেক দরকারী কথাও আমরা বলিতে পারি।

একটা বুড়া পাইক মাছ,—তাহার মাথায় শৈবাল গজাইয়াছে—মাছেদের ডাক দিয়া বলিল, 'বাছারা। রাজা জলমানবের কথা যেন মনে থাকে।'

রাজা ... সেইমাত্র ... মাছেদের কথা ... শোনে নাই।

মাছেরা বলিল,—'... তা আমরা খুব জানি, কিন্তু ... আছে। ... খুব ... ভাল ... কিছু আনিয়াছেন, লোকে ... তা ... তোমার ... ।'

যুবক ... তাই শুনিয়া মাছেদের উপর রাগ হইল। ... সকল মাছকে ... চেঁচাইতে লাগিল। 'আমরা দুষ্ট নই, এমন কথা মুখে ... আমাদের এত ভালবাসেন যে, তিনি আমাদের সকলকে সোনা

বাড়ীর ... মাছেরা ... আহ্লাদে আনন্দে বলাবলি করিতে লাগিল,—'আমরা রাজার বাড়ী যাব, লোকে ... জানিতে পারিল, ... মানুষেরা আমাদের ভারি মান্য করিবে।'

যুবা আসিয়া তাহাদিগকে নমস্কার করিয়া বলিল, ... একবার ভাল করিয়া চাহিয়া দেখ। কেমন সুন্দর জিনিস তৈয়ার করিয়াছি।' ... মাছেরা তাড়াতাড়ি ... জালের মধ্যে প্রবেশ করিল; আর নড়িতে পারিল না। ... যুবার ... আসিয়া ... ।



কি চমৎকার বস্তু লাভ করিতে পার

মুক্তা ও প্রবালের প্রাসাদে নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া যান, আমাদের 'মানুষ?' আজটি দেখান।'

মাছেরা সকলে মিলিয়া মহাকোলাহল করিতে লাগিল। কিন্তু যুবা সাতা শুনিবার, ... শুনিয়াছিল। যুবা সাবধানে বলিল, 'বল কি ? তোমাদের এত আদর ? তবে তো তোমাদের খুব মান্য করা উচিত। তোমরা যদি অনিবার্য এখানে থা... ... আমি এই সংবাদের বদলে তোমাদের ... চমৎকার ব্যাপার দেখাইব।'

মাছেদের ... আর কাজ নাই, তাহারা সেই কথায় রাজি হইল। যুবা বাড়ী হইতে একটি বড় জাল আনিল। এখনও মাছেরা এ রকম জাল

তখন যুবা বলিল, 'দুষ্ট মাছেরা! কেমন এখন ধরিয়াছি। এখন সমুদ্রের রাজার বাড়ী দেখাইয়া দিতে হইবে। আমরা কিছু সোনা ও মুক্তা চাই।'

মাছেরা বলিল,—'তা হবে না।'

'হবে না? তা হইলে আমরা তোমাদের টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ভাজিব। এখন ঠিক ভাবিয়া কাজ কর।'

হতভাগা মাছেরা কি করিবে, ভাবিয়া পাইল না। টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া ভাজিবে, সে কেমন করিয়া হয়? মাছেরা ছটফট করিতে করিতে কাঁদাকাটা করিতে লাগিল।

কিন্তু পলাইতে পারিল না। শেষে ভয়ে রাজার বাড়ীর পথ দেখাইয়া দিতে সম্মত হইল।

এই সময় রাজা জলমানব দৃশ্য হইয়া দেখা দিলেন।

ভীত মাছেদের রাজা বলিলেন, "বিশ্বাস-ঘাতক। এমনি করিয়া প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হয়! কিন্তু তোদের শাস্তি দিতেছি। তোরা যখন কথার প্রকৃত ব্যবহার জানিস না তখন আজ অবধি তোরা বোবা হবি।"

এই বলিয়া তিনি জালখানি টুকরা টুকরা করিয়া ছিঁড়িয়া ফেলিলেন। মাছেরা লাফাইয়া জলে পড়িল। কিন্তু কি সর্বনাশ! তাহারা কত কথাই বলিতে চায়, কিন্তু কাহারও মুখে একটা কথা ফুটিল না। মাছেরা বোবা হইয়া রহিল।



ঘাতক। এমন করিয়া কি প্রতিজ্ঞা পালন করিতে হয়।

মাছেরা বোবা হইল বলিয়াইত তোমরা এত সহজে তাহাদের ধরিতে পার, নতুবা কি যে মুস্কিল হইত, তাহা একবার ভাবিয়া দেখ। ছোট একটি মাছকে ধরিতে গেলেও সে হয়ত চীৎকার করিয়া সব মাছদের ডাকিয়া তলস্থল বাধাইয়া দিত। আমাদের সৌভাগ্য ভাই, মাছেরা নিজেদের দোষেই নিজেদের বিপদ ঘটাইল। এজন্যই ত খাল বল, বিল বল, নদী বল, সমুদ্র বল, সর্ব্বত্রই হাজার হাজার লক্ষ লক্ষ মাছেরা বাস করিলেও গভীর নীরবতা বিরাজ করিতেছে। শুধু—তাহাদের চলা-ফেরা ও জলস্পন্দনের জন্য যে শব্দ হয়, সে শব্দ ছাড়া কোন একটা শব্দও শোনা যায় না। জলমানব কাজটা যে ভাল করিয়াছেন, সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই।

গাধার বুদ্ধি

(আরব্য উপন্যাস)

একজন খুব ধনী বণিক পশু-পক্ষীর ভাষা জানিতেন, কিন্তু তিনি তাহা কাহারো কাছে প্রকাশ করিতে পারিতেন না। করিলে তাঁহার নিশ্চিত মরণ এইরূপ ছিল বিধান। এজন্য কেহ জানিতও না যে তিনি পশুপক্ষীর কথা বুঝিতে পারেন।

একদিন বণিক্ তাঁহার গোশালার কাছে বসিয়া আছেন, সে সময় শুনিতে পাইলেন—বলদ ও গাধার মধ্যে কথা চলিতেছে। বলদ গাধাকে বলিতেছিল ভাই, তোমাকে দেখিলে আমার হিংসা হয়। তোমারত কাজ কর্ম্ম কিছুই নাই। সময় সময় শুধু আমাদের মনিব মহাশয়কে এখানে সেখানে লইয়া যাও এই মাত্র। তাছাড়া সারা দিন, দিব্য আরামে শুইয়া কাটাও। আর ভাই, আমার কথা দেখ, সারা দিন একটু সময়ও বিশ্রাম করিতে পাই না। ক্ষেত চাষ করিতে করিতে

প্রাণ যায়। লাঙ্গলের ভারে আর মজুরের প্রহারে অস্থির হইয়া পড়ি। সারাদিন ক্ষেতে হাড় ভাঙ্গা খাটুনির পর বাড়ী আসিয়া কি খাবার পাই, তাহাও ভালই—সামান্য কিছু কলাই। কোন রকমে সে সামান্য খাবার খাইয়া—ক্ষুধার জ্বালা মিটাইয়া পরে সারারাত্রি নোংরা বিচালির উপর শুইয়া কাটাই। —এজন্যই ভাই তোমাকে হিংসা না করিয়া আর পারি না।

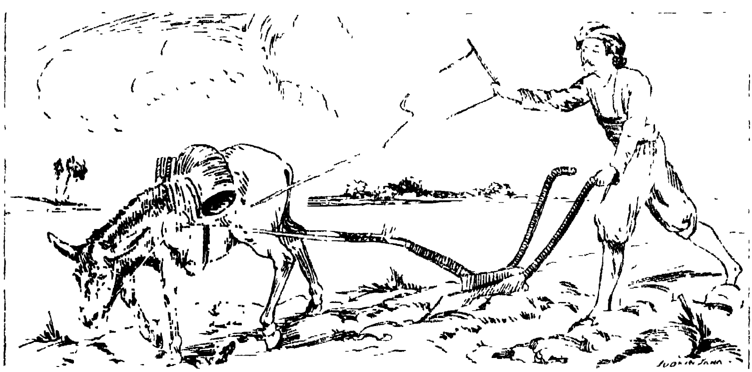
গাধা বলিল—ভাই, তোমাকে যে লোকে বোকা বলে, সে কথা বড় মিথ্যা নয়। তুমি নিজের দোষেই মানুষের হাতে এই অপমান সহ্য কর।—যদি তুমি একটু সাহসী হও, তাহা হইলে মানুষের কি এমন সাধ্য আছে যে তোমাকে যন্ত্রণা দিতে পারে?—তোমাকে যখন মজুর গোয়ালে বাঁধিতে আসে, তখন তুমি যদি শিং বাকাইয়া তাড়া কর, হাত পা ছুঁড়িতে থাক তাহা হইলে কি আর তোমাকে লাঙ্গলে যুঁতিতে পারে? তারপর ঐ কদর্য্য খাবারগুলি যদি না খাইয়া শুধু শুঁকিয়াই চলিয়া যাও তাহা হইলে মালিক নিশ্চয়ই তোমার খাবার জিনিষ বদলাইয়া দিবেন। তুমি ভাই, আমার কথা শুনিয়া একবার সেই অনুসারে কাজ কর, দেখিবে তাহা হইলে নিশ্চয়ই সুফল পাইবে।—

ষাঁড় বলিল—ভাই তুমি অতি সত্য কথা বলিয়াছ, আমি কাল হইতে তোমার পরামর্শ মত কাজ করিব।

পরের দিন সকাল বেলা চাষা ষাঁড়টাকে লাঙ্গলে যুঁতিয়া দিয়া ক্ষেতে লইয়া গেল। কিন্তু সেদিন সন্ধ্যার সময় ষাঁড়টাকে গোয়ালে বাঁধিবার সময় সে চাষাকে গুঁতাইবার জন্য শিং বাকাইয়া ছুটিয়া আসিল এবং খাবার না খাইয়া হাত-পা ছড়াইয়া শুইয়া পড়িল।

সকাল বেলা মজুর ষাঁড়টাকে এইরূপ ভাবে পড়িয়া থাকিতে দেখিয়া বণিকের কাছে যাইয়া সব কথা বলিল।

বণিক বুঝিতে পারিলেন যে ষাঁড়টা গাধার কথা শুনিয়া সেই ভাবে কাজ করিয়াছে। তখন তিনি তাঁহার মজুরকে বলিলেন,—তুমি আজ গাধাটাকে লইয়া যোয়ালে যুঁতিয়া দেও। মজুর



সারাদিন গাধাকে দিয়া ক্ষেত চাষ করিল

তাহাই করিল, সে সারাদিন গাধাকে দিয়া ক্ষেতে চাষ করিল, আর নির্ব্বোধ গাধার পিঠে এমন পিটুনি দিয়াছিল যে বেচারা গাধা চলিতে পারিতেছিল না, অতি কষ্টে কোন রকমে খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিয়াছিল।

এদিকে ষাঁড়ের মহা আনন্দ! সে গোয়ালে যে খাবার ছিল, সব পেট পুরিয়া খাইয়া সারাদিন বেশ আরাম করিয়া শুইয়া কাটাইল। এবং গাধা ফিরিয়া আসিলে কহিল—ভাই তোমার কথা মত কাজ করিয়া আমি বেশ আনন্দে দিন কাটাইয়াছি।

গাধা কিন্তু একটি কথাও বলিল না। রাগে তাহার সারা শরীর জ্বলিয়া যাইতেছিল, সে মনে মনে ভাবিতেছিল,—আমি নিজের দোষেই এমন

বিপদ ডাকিয়া আনিয়াছি।—যদি এ বিপদের হাত হইতে মুক্তি না পাই, তাহা হইলে আমায় মরিতে হইবে।—এইরূপ ভাবিতে ভাবিতে সে মড়ার মত পড়িয়া রহিল।

এদিকে বণিকের কৌতূহল হইল—ষাঁড় ও গাধার মধ্যে কি কথা হইতেছে তাহা জানিবার জন্য। তিনি গোশালার কাছে যাইয়া বসিলেন। তখন গাধা ও ষাঁড়ের মধ্যে কথা চলিতেছিল।—গাধা ষাঁড়কে বলিল—ভাই, কাল যখন তোমার খাবার আসিবে তখন কি করিবে বলত?—ষাঁড় বলিল, তোমার পরামর্শ মত কাজ করিব।

গাধা বলিল—সর্বনাশ! অমন কাজটি করিও না। আজ সন্ধ্যার সময় আমি যখন বাড়ী ফিরিতেছিলাম, তখন শুনিলাম ঐ বণিক মহাশয় বলিতেছেন যে, কাল যদি ষাঁড়টা [illegible] না খায়, তবে আর মিছামিছি উহাকে রাখিয়া ও আর কোন লাভ নাই, উহাকে মারিয়া ফেলিও।—কি করি বল, তুমি আমার বন্ধু, তাই এই গোপন কথাটি বলিলাম।—কাজেই, কাল সকালে, আর তুমি কোন গোলমাল করিও না, তবে যেমন খাবার আনিবে, অমনি খাবার খাইও, আর দৌড় [illegible] চারিদিকে বাহিরে তেমনি [illegible]।—জীবন প্রাণের চেয়ে আর কোন বড় জিনিষ পৃথিবীতে নাই।—

গাধার এই কথা শুনিয়া বণিক উচ্চহাস্য করিয়া উঠিলেন। এবং আপনার মনে বলিতে লাগিলেন—লোকে বলে গাধার মত বোকা নাই। এখন দেখিতেছি—সে কথা ঠিক নয়। গাধার পেটে বেশ বুদ্ধি আছে। একজন্য আমরা এই [illegible] জানিলাম [illegible] গাধার কথা।

কে বড়? তরবারি—না কলম?

একজন বীরপুরুষ অনেকবার যুদ্ধে গিয়াছিলেন। কিন্তু লোকটি ছিলেন বড় অহঙ্কারী। একদিন তিনি একজন পণ্ডিতের নিকট আসিয়া বলিলেন, মহাশয়, আপনার কলমটি দিন ত, আমি আমার বীরত্বকাহিনী সব লিখিয়া রাখি। পৃথিবীর লোকেরা পড়িয়া অবাক হইয়া যাইবে। আর আমার নাম করিয়া ধন্য হইবে।

সেকালে লোকে হাঁসের পালক দিয়া তাহার গোড়ার দিকটা কাটিয়া লইয়া লিখিবার কলম তৈরী করিত। কিন্তু পণ্ডিত মহাশয় গর্বিত বীরের কথা শুনিয়া তাহাকে একটি হাঁসের পালক দিয়া বলিলেন,—তুমি তোমার তরবারির ধার কর, বেশ তোমার তলোয়ার দিয়া কলম কাটিয়া তারপর তোমার বীরত্ব কাহিনী লেখ।

বীর তাহার তলোয়ার দিয়া কলম কাটিতে, একবার নয়, দুইবার নয়, বহুবার চেষ্টা করিল, কিন্তু কিছুতেই কলম তৈরী করিতে পারিল না, তখন সে বলিল, তলোয়ারের মত বড় জিনিষ দিয়া কলম কাটা যায় না।

সেদিন হইতে তাহার অহঙ্কার দূর হইল। সে বুঝিতে পারিল যে, তলোয়ার হইতে কলম বড়।



রঞ্জন-শিল্পের ইতিহাস

রং দেখিতে সকলেই ভালবাসে। নানা বর্ণের পোষাক-পরিচ্ছদ কে না ভালবাসে? পৃথিবীর যে দিকে দেখিবে সে দিকেই দেখিবে বর্ণের মাধুর্য্য। নীলবর্ণের আকাশ, সবুজ রঙ্গের গাছপালা, শাদা, নীল, ধূসর, লোহিত, বেগুনি কত বর্ণের ফুল ফল,—দেখিলে চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আর তোমারও যে কত বরণের বেশ-ভূষা পর সেও ত বড় কম নয়! কিন্তু আকাশের বর্ণ, সমুদ্রের বর্ণ, ফুল ও ফলের বর্ণ হইতেছে প্রকৃতির লীলা,—তাহাতে মানুষের কোন হাত নাই। সামান্য ঘাস, পাতার যে সবুজ-সুষমা, তারই বা তুলনা মিলে কোথায়? কিন্তু কৃত্রিম উপায়ে আমরা যে বর্ণের সৃষ্টি করিয়া আসিতেছি তাহাকে বলে রঞ্জন শিল্প। তোমাদের কাছে রঞ্জন শিল্পের ইতিহাস বলিব।

ইউরোপীয় বা পাশ্চাত্য পণ্ডিতগণের মতে এ পর্য্যন্ত বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া পৃথিবীর যাহা কিছু আবিষ্কৃত হইয়াছে এবং যাহা কিছু উন্নতি হইয়াছে তাহা সমস্তই তাঁহাদেরই প্রতিভা বলে হইয়াছে, এক কথায় আমাদের—প্রাচ্যদিগের অর্থাৎ এশিয়া-বাসীদের এ বিষয়ে গৌরব করিবার মত কিছুই নাই। তাহাদের এই সিদ্ধান্তের মূলে কতটুকু সত্য আছে, এবং উহা আমরা কোনরূপ তর্ক না তুলিয়া বিনা প্রতিবাদে গ্রহণ করিতে পারি কি না সে প্রশ্নের মীমাংসা বা আলোচনা করা বর্তমান প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নহে। ইউরোপের পণ্ডিতেরা নিজেদের জ্ঞান-গৌরব ঘোষণায় যতটা পক্ষপাতিত্ব প্রকাশ করুন না কেন, একটি বিষয়ের জন্য তাহারা আমাদের নিকট ঋণী, এই ঋণ তাঁহারা স্বীকার করিয়া থাকেন। সে বিষয়টি **রঞ্জন-বিদ্যা।**

রঞ্জন-কলার উৎপত্তি

কৃত্রিম উপায়ে সৌন্দর্য্য-বর্দ্ধনের প্রবৃত্তি কি সভ্য কি অসভ্য সকল জাতির মধ্যেই দেখিতে পাওয়া যায়। এই সৌন্দর্য্য বৃদ্ধির ইচ্ছা হইতেই রঞ্জন কলার প্রথম উৎপত্তি হইয়াছে। সে অতি প্রাচীন-কালে মানুষ যেমন সভ্য হইতে আরম্ভ করিল সঙ্গে সঙ্গেই নানা প্রকার গাছের পাতা নানাপ্রকার গাছের ফুল, বাকল, মূলের ক্বাথ এবং বিভিন্ন প্রকার ফলের রস দ্বারা অস্থায়ী রঞ্জনকার্য্য করিত। এই রঞ্জনের কাজ গৃহকার্য্যের মধ্যেই গণ্য ছিল। গৃহস্থ ঘরের মেয়েরা সূতা তৈরী করিত, এবং যেমন নিজ নিজ পরিবারের ব্যবহারের জন্য কাপড় বুনিত, তেমনি তাহারা ব্যবহারের জন্য বস্ত্রাদি স্বহস্তে রঞ্জিত করিতেন। এখনও নিউজিলাণ্ডের মাওরিদের মধ্যে এবং আরও অনেক আদিম অসভ্য জাতির ভিতর রঞ্জন প্রথা প্রচলিত আছে। কাপে রং স্থায়ী করিবার জন্য রঞ্জন উপকরণের সঙ্গে

হত, বন্ধকারী (Mordant) রূপে লৌহ বা ফিটকারী সংযুক্ত মৃত্তিকা মিশ্রিত করিয়া লওয়া হইত। এইরূপে সে অতি প্রাচীন কালেই রঞ্জন-কলার সৃষ্টি হইয়াছে।

রঞ্জন শিল্পের উৎপত্তি

রঞ্জন-কলা প্রকৃত শিল্পরূপে ভারতবর্ষেই প্রথম প্রতিষ্ঠা লাভ করে। বড় বড় পাশ্চাত্য ঐতিহাসিকেরা প্রমাণ দ্বারা স্থির করিয়াছেন যে অতি প্রাচীন কালে ভারতবর্ষে নানা প্রকার সুন্দর বর্ণে স্থায়ীভাবে রঞ্জন করিবার বিধি আবিষ্কৃত হইয়াছিল। এবং রঞ্জিত বস্ত্রাদি ভারতবর্ষে সর্বত্রই ও সর্বদাই ব্যবহৃত হইত। আমাদের দেশের প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে ইহার যথেষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়। হোমার, ষ্ট্রেবো, হেরোডোটাস্ প্রভৃতি লেখকগণও এই বিষয়ে উল্লেখ করিয়া গিয়াছেন। হিন্দুর দেবতাদের মধ্যে কেহ সর্বদা পীত বর্ণে রঞ্জিত পরিচ্ছদ পরিতেন বলিয়া **'পীতাম্বর'** আখ্যা পাইয়াছিলেন। যথা:—"চন্দন-চর্চ্চিত-নীল কলেবর **পীতবসন** বনমালী।" কেহ বা নীলবর্ণের পোষাক পরিতে ভালবাসিতেন—তাই তাঁহার নাম হইয়াছে **নীলাম্বর**। বৌদ্ধ শ্রমণেরা বা ভিক্ষুরা আজীবন পীতবর্ণের কৌপীন পরিতেন। এখনও বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ পীতবর্ণের পরিচ্ছদ পরিধান করেন। প্রাচীন কালে ভারতবর্ষের রঞ্জিত বস্ত্রাদি, বর্ণের স্থায়িত্ব এবং উজ্জ্বলতার জন্য পশ্চিমে পারস্য ও আরব হইতে পূর্ব্বে শ্যাম ও মলয় দ্বীপপুঞ্জ পর্য্যন্ত, অর্থাৎ এশিয়ার সমগ্র দক্ষিণাংশেই আদৃত এবং উচ্চ মূল্যে বিক্রীত হইত। ক্রমে ভারতবর্ষের রঞ্জিত দ্রব্যাদি আরব বণিকদিগের দ্বারা পারস্য ও আরব উপসাগরের পথে ফিনিসিয়া এবং মিশর দেশে প্রেরিত হইতে থাকে। এইরূপে অতি প্রাচীনকালে ভারতবর্ষ এবং মিশর দেশে বিশেষ লাভজনক একটি ব্যবসায় প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। পরে ভারতবর্ষ হইতে রঞ্জন উপকরণ সমূহ সংগ্রহ পূর্ব্বক ভারতের রঞ্জন-প্রণালী অনুকরণ করিয়া মিশরীয়গণ নিজেরা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিতে আরম্ভ করে। ঐতিহাসিক প্লিনি (Pliny) দুই হাজার বৎসর পূর্ব্বে, মিশরীরা কেমন করিয়া কি কি উপায়ে রঞ্জন-ক্রিয়া সম্পন্ন করিত—সে কথা লিখিয়াছেন।

রঞ্জন বিদ্যা বা রঞ্জনশিল্প কোনও সময়ে কোনও এক স্থানে সীমাবদ্ধ ছিল, এরূপ নহে; প্রত্যেক সভ্যজাতির প্রাচীন গ্রন্থাদি হইতে দেখা যায়, যে অতি প্রাচীন কাল হইতেই প্রত্যেক দেশে অত্যধিক মাত্রায় রঞ্জন কলার জ্ঞান ছিল।

এসিয়ার পশ্চিম প্রান্তে রঞ্জনশিল্পের উন্নতি ও অধঃপতন

খৃষ্ট জন্মের একহাজার বৎসরের পূর্ব্বে এসিয়ার অনেক পশ্চিম প্রান্তে ফিনিসিয়া দেশের টায়ার (Tyre) নামক সমুদ্রোপকূলবর্ত্তী জনপদ হইতে এক প্রকার বেগুনী রং আবিষ্কৃত হয় এবং অল্পকাল মধ্যেই টাইরিয়েন পারপল (Tyrian Purple) নামে চতুর্দ্দিকে সুখ্যাতি ও প্রতিপত্তি লাভ করে। উক্ত রঙের ব্যবসায়ে অল্পদিনের মধ্যেই টায়ার একটি সমৃদ্ধিশালী নগরীতে পরিণত হইয়া উঠে, এবং টায়ার ও সিডন (Sidon) নামক নগরদ্বয় বহুশতাব্দী পর্য্যন্ত সমৃদ্ধি এবং ধনগৌরবে সমগ্র পশ্চিম এসিয়ার আদর্শ স্থান ছিল। প্লিনি বর্ণনা করিয়াছেন, পূর্ব্বোক্ত ব্যবসায় টায়ার নগরে এতটা বিস্তৃতি লাভ করিয়াছিল যে ঐ স্থানে তৎকালে সাধারণ লোকের বাসের কোনও সুবিধা বা সম্ভাবনা ছিল না। প্লিনি এবং তৎসমসাময়িক লেখকগণ টাইরিয়েন পারপল দ্বারা বস্ত্রাদি রঞ্জন করিবার প্রণালী সুবিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়া গিয়াছেন। প্রাচীন মিশরে শক্তিরূপিণী আইসিস্ (Isis) দেবী ও ভৈরব অসাইরিস্ (Osiris) দেবের মন্দিরের সেবাইৎগণ নিজেদের পদমর্য্যাদা প্রকাশের জন্য টাইরিয়েন পারপল দ্বারা রঞ্জিত পরিচ্ছদ ব্যবহার করিতেন। পরবর্ত্তী সময়ে যখন রোমকগণ পূর্ব্বদেশ-সমূহ জয় করেন, তখন রাজকীয় বিধান অনুসারে ভূমধ্যসাগরের চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত রোম-সাম্রাজ্য মধ্যে একমাত্র রাজপরিবারস্থ বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ ব্যতিরেকে অপর সকলের পক্ষে 'টাইরিয়েন পারপল' দ্বারা রঞ্জিত পোষাক ব্যবহার করা নিষিদ্ধ হইয়াছিল। উক্ত কঠোর রাজবিধানই টাইরিয়েন পারপল শিল্পের অবনত এবং লুপ্ত হইবার অন্যতম কারণ। টায়ারের বণিকেরা নিজেদের অধীত বিদ্যা অন্য কাহারও নিকট ব্যক্ত করিতেন না। এইরূপে ক্রমে

ফিনিসীয়দের অধঃপতনের সঙ্গে উক্ত শিল্প সম্পূর্ণরূপে লুপ্ত হইয়া যায়। প্লিনি-বর্ণিত পদ্ধতি অনুসরণে বহুচেষ্টায় আধুনিক বৈজ্ঞানিকগণ "টাইরিয়ান পারপল" দ্বারা বস্ত্ররঞ্জন প্রণালীর পুনরাবিষ্কার করিয়া প্রমাণ করিয়াছেন যে, ইতিহাস বর্ণিত এত রঙ্গ উজ্জ্বলতা এবং স্থায়িত্ব উভয় কচিনিল সহযোগে ব্যবহৃত হইত।

আতাম্র (Pink) বা পদ্মবর্ণ (Rose-Red) কচিনিল দ্বারা সম্পাদিত হইত।

পূর্ব্বোক্ত কার্য্যের জন্য কখনও কখনও কচিনিলের পরিবর্ত্তে লাক্ষা ব্যবহৃত হইত। লাক্ষা দ্বারা রঞ্জনপ্রণালী সর্ব্বতোভাবে কচিনিলের ব্যবহারের মত। লাক্ষা ভারতবর্ষ হইতে সংগৃহীত হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইত।

প্রাচীনকালে ভারতবর্ষে কচিনিলের ব্যবহার

ইউরোপীয়গণ যদিও আমেরিকা আবিষ্কারের পর কচিনিলের নাম জ্ঞাত হন এবং মেক্সিকো (Mexico) হইতে কচিনিল আমদানী করিয়া প্রথম ব্যবহার করিতে থাকেন, ভারতবর্ষে কিন্তু বহুপূর্ব্বে কচিনিলের ব্যবহার প্রচলিত ছিল। 'রসার্ণব' এবং 'রসরত্নসমুচ্চয়' গ্রন্থে "ইন্দ্রগোপ" বা "ইন্দ্রগোপক" নামে কচিনিলের উল্লেখ আছে। এই উভয় গ্রন্থ তান্ত্রিক রসগ্রন্থ। আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের মতে 'রসার্ণব' দ্বাদশ শতাব্দীর এবং "রসরত্নসমুচ্চয়" ত্রয়োদশ শতাব্দীর গ্রন্থ। ইহা হইতে বুঝা যায় যে আট নয় শত বৎসর পূর্ব্বেও ভারতবর্ষে রঞ্জনকার্য্যের জন্য কচিনিল ব্যবহৃত হইত।

রক্তবর্ণ:—কচিনিল দ্বারা পশম (wool) সুন্দররূপে রঞ্জিত হইলেও কার্পাসের (cotton) উপর উহা ব্যবহার করা যায় না। কার্পাস বস্ত্রাদি রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিতে হইলে মঞ্জিষ্ঠা (madder) ব্যবহৃত হইত। অতি প্রাচীন কাল হইতে ভারতবর্ষে কার্পাস বস্ত্র রক্তবর্ণে রঞ্জিত করিবার নিমিত্ত ফিটকারী সহযোগে মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার চলিয়া আসিতেছে। মঞ্জিষ্ঠার ব্যবহার ক্রমে ভারতবর্ষ হইতে তুর্কি এবং গ্রীসে প্রবর্ত্তিত হয়, কিন্তু মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা বস্ত্ররঞ্জনপ্রণালী একমাত্র তুর্কি এবং গ্রীকরাই জানিতেন এবং ঐ ব্যবসায় সম্পূর্ণরূপে তাহাদেরই হস্তে ছিল। উক্তরূপ রঞ্জিত কার্পাস বস্ত্র একমাত্র পূর্ব্ব দেশ হইতেই পাওয়া যাইত বলিয়া উহা টার্কি রেড (Turkey Red) বা এড্রিয়ানোপল রেড (Adrianople Red) নামে অভিহিত হইত এবং বর্ত্তমান সময়েও প্রথমোক্ত নামেই প্রচলিত। অষ্টাদশ শতাব্দীর মধ্যভাগে বহু প্রলোভনায় কয়েকজন গ্রীক-শিল্পী ফ্রান্সে গমন করিয়া মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা বস্ত্ররঞ্জনপ্রণালী তথায় প্রবর্ত্তিত করেন। ১৭৬৫ খৃষ্টাব্দে ফরাসি গভর্ণমেণ্ট মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা বস্ত্ররঞ্জন প্রণালীর বিবরণ ক্ষুদ্র পুস্তকাকারে প্রকাশিত করিয়া শিল্পীদের মধ্যে বিতরণ করেন। কয়েক বৎসর পর পেপিলন (Papillon) নামক জনৈক ফরাসি-শিল্পীর নিকট হইতে বহু অর্থব্যয়ে ইংরেজ গভর্ণমেণ্ট উক্ত রঞ্জন-প্রণালীর বিষয় অবগত হন। পরবর্ত্তী কালে এই ব্যবসায় ইংল্যাণ্ডে বিশেষ উন্নতি লাভ করে।

কপিশবর্ণ (Brown):—পিচ কাষ্ঠ (Peach wood) সপান কাষ্ঠ (Sapan wood) এবং লিমা কাষ্ঠ (Lima wood) কপিশ বর্ণে বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য কখনও কখনও ব্যবহৃত হইত। ঐ কাষ্ঠসমূহ সাধারণতঃ মধ্য আমেরিকা, পূর্ব্বভারত-দ্বীপপুঞ্জ এবং মেক হইতে সংগৃহীত হইয়া ইউরোপে প্রেরিত হইত। কিন্তু পূর্ব্বোক্ত কাষ্ঠজাত রং সমূহ সূর্য্যালোকে অস্থায়ী বলিয়া উহাদের ব্যবহার অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। সপানকাষ্ঠ বঙ্গদেশে 'বকম' কাষ্ঠ নামে পরিচিত। বকম কাষ্ঠ অতি প্রাচীন কাল হইতে রঞ্জনকার্য্যের জন্য এদেশে ব্যবহৃত হইয়া আসিতেছে। প্রাচীন সংস্কৃত গ্রন্থাদিতে 'বকম' কাষ্ঠের উল্লেখ পাওয়া যায়। পূর্ব্বে ভারতবর্ষ হইতে প্রচুর পরিমাণে 'বকম' কাষ্ঠ ইউরোপে রঞ্জনকার্য্যের জন্য প্রেরিত হইত। তামিল ভাষায় বকমকাষ্ঠের নাম "সপ্পু"। "সপ্পু" শব্দ হইতেই সপান শব্দ হইয়াছে।

কার্পাস্ বস্ত্র কপিশ বর্ণে রং করিবার জন্য খয়েরও ব্যবহৃত হইত। উক্ত কারণে গড়ে প্রতিবৎসর ৩৬৲, ৯৬৲, ১০৬৲ টাকা মূল্যের খয়ের ভারতবর্ষ হইতে ইউরোপে প্রেরিত হইত। খয়ের পশমী বস্ত্রাদি রঞ্জনের জন্য উপযোগী নহে। কিন্তু অধুনা সৈনিকদের পোষাকের নিমিত্ত পশমের


বর্ণ-বিচিত্রা

উপর খাকি রং করিবার জন্য তুথ্যক (Copper Sulphate) সহযোগে খয়ের ব্যবহৃত হইতেছে।

কপিশ-পাটলবর্ণ (Brownish pink):—কেম-কাষ্ঠ (Cam wood) বার কাষ্ঠ (Bar wood) এবং সেণ্ডারস্ (Sanders wood) প্রভৃতি ব্যবহৃত হইত। নানা কারণে উহাদের ব্যবহারও অনেকটা সীমাবদ্ধ ছিল। এই সমস্ত কাষ্ঠ সাধারণতঃ আফ্রিকা হইতে সংগৃহীত হইত।

সেণ্ডার্স কাষ্ঠ রক্তচন্দনেরই নাম মাত্র। রক্তচন্দন কাষ্ঠ বহুকালাবধি রঞ্জনকার্য্যের জন্য এ দেশে ব্যবহৃত হইতেছে এবং পূর্ব্বে উক্ত কার্য্যের জন্য প্রচুর পরিমাণে কাষ্ঠ প্রতি বৎসর ইউরোপে প্রেরিত হইত।

পীতবর্ণ:—পীতবর্ণে বস্ত্র রঞ্জন করা অপেক্ষাকৃত সহজসাধ্য এবং উক্ত কার্য্যের জন্য সাধারণতঃ কুসুম ফুল, তুঁত, জাতীয় পূর্ব্বভারত দ্বীপপুঞ্জজাত একপ্রকার বৃক্ষ কাষ্ঠ (Old fustic) এবং আমেরিকার উত্তর প্রদেশস্থ দেবদারু জাতীয় একপ্রকার বৃক্ষের বল্কল (Quercitron Bark) ব্যবহৃত হইত। এস্থলে কাঁটাককাষ্ঠ ও হরিদ্রার নামও উল্লেখযোগ্য।

পিঙ্গলবর্ণ (Orange):—পিঙ্গলবর্ণে রেশমী বস্ত্র রঞ্জনের জন্য লটকান (Arnotto) ব্যবহৃত হইত। লটকানের আদিস্থান আমেরিকা, কিন্তু বহুকাল হইতেই ভারতবর্ষে লটকানের আবাদ চলিয়া আসিতেছে এবং প্রচুর পরিমাণে লটকান প্রতি বৎসর এদেশ হইতে পাশ্চাত্য দেশ সমূহে প্রেরিত হইত।

আরক্তনীলবর্ণ (Purple): লৌহসংযোগে মঞ্জিষ্ঠা দ্বারা কার্পাস রঞ্জিত হইত। পশম এবং রেশম রং করিতে হইলে মঞ্জিষ্ঠার পরিবর্ত্তে অবচিল ব্যবহৃত হইত।

নীলবর্ণ:—নীল (Indigo) দ্বারা সম্পাদিত হইত। ভারতবর্ষকে নীলের জন্মভূমি বলা যাইতে পারে। অতি প্রাচীনকালেও ভারতবর্ষে নীলের ব্যবহার জানা ছিল। ভারতবর্ষ হইতেই ইউরোপে নীলের ব্যবহার প্রচলিত হয়।

রঞ্জন-শিল্পে হরিৎ রংএর প্রভাব

হরিৎবর্ণ—(Green) উনবিংশ শতাব্দীর মধ্য পর্য্যন্ত প্রকৃত হরিৎবর্ণের কোনও রঞ্জন উপকরণ ইউরোপীয়দের জানা ছিল না। হরিৎ বর্ণে বস্ত্র রঞ্জন করিতে হইলে পীত ও নীল রং একত্র মিশ্রিত করিয়া লওয়া হইত। ঐ সময়ে হরিৎবর্ণের কতক গুলি কার্পাস বস্ত্র চীনদেশ হইতে ফরাসীদেশে প্রেরিত হয়। ফরাসিগণ বর্ণের সৌন্দর্য্য দেখিয়া মুগ্ধ হন এবং জানিতে পারেন যে ঐ হরিৎ রং নীল এবং পীত রং এর সংমিশ্রণ জাত নহে। সে সময়ে ইউরোপে অজ্ঞাত,—লো-কাও (Lo-kao) নামক চীনদেশজাত এক প্রকার মূল্যবান রঞ্জন উপকরণ ছিল। পরে কতকটা লো-কাও সংগৃহীত হইয়া ফ্রান্সে প্রেরিত হয়। কিন্তু বহু চেষ্টায়ও ফরাসি রাসায়নিকগণ উহা দ্বারা সুন্দররূপে রঞ্জন-কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারেন নাই।

কৃষ্ণবর্ণ:—পূর্ব্বে নীল, পীত এবং লোহিত এই তিন রং এর সংমিশ্রণে কৃষ্ণবর্ণের বস্ত্রাদি রঞ্জিত হইত। প্রকৃত পক্ষে তিন বার রং করিতে হইত, কাজেই সময় এবং ব্যয় সাপেক্ষ বলিয়া উক্ত প্রণালী ক্রমে লোপ পাইয়াছে। পরবর্ত্তী সময়ে হরিৎ কিংবা সে জাতীয় কোনও প্রকার কষায়িণ (Tannin) উপকরণ লৌহ সংযোগে এবং কখনও কখনও বা দুই তিন প্রকার বন্ধকারি (Mordant) সহযোগে ব্যবহৃত হইত। ভারতে কষায়িণ উপকরণের অভাব নাই।

দৃষ্টান্তস্থলে বলা যাইতে পারে, প্রতি বৎসর পঞ্চাশ লক্ষ টাকার অধিক মূল্যের হরিতকিই এদেশ হইতে বিদেশে রপ্তানি হয়। এ স্থলে নীল অথবা কালো রং করার জন্য মধ্য আমেরিকা জাত লগ্ কাষ্ঠ নামক এক প্রকার কাষ্ঠের (Log wood) ব্যবহার ও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।

পূর্ব্বে যাহা বলা হইয়াছে তাহা হইতে দেখা যায় যে, কৃত্রিম রং (Artificial dye-stuffs) প্রস্তুত প্রণালীর আবিষ্কারের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত ইউরোপীয় শিল্পিগণ রঞ্জন উপকরণের জন্য ভারতবর্ষ বা আমেরিকার অনেকটা মুখাপেক্ষী ছিল এবং অধিকাংশস্থলেই ভারতবর্ষে প্রচলিত রঞ্জন-প্রণালীরই অনুসরণ করিত।

আমরা দেখিতে পাইলাম, ইউরোপীয় শিল্পিগণ অতি অল্পসংখ্যক রঞ্জন উপকরণের ব্যবহার মাত্র জানিতেন। ভারতবর্ষে কিন্তু অতি প্রাচীন কাল হইতেই রঞ্জন কার্য্যের জন্য বহু প্রকারের প্রাকৃতিক উপকরণের ব্যবহার চলিয়া আসিতেছিল।



কোর্-আন

কোর্-আন মোছলমানের ধর্ম্মগ্রন্থ। তোমরা স্বয়ং অনেকেই মনে কর যে, হজরত মোহাম্মদই ইছ্লাম ধর্ম্মের প্রবর্ত্তক। কিন্তু তাহা নহে। তিনি ইছ্লাম ধর্ম্মের সংস্কারক মাত্র। হজরত মোহাম্মদের পূর্ব্বে ইছ্লাম ধর্ম্মের আরও বহু সংস্কারক বা প্রচারক পৃথিবীতে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্ম প্রচারের জন্য ভিন্ন ভিন্ন যুগে সেই সেই যুগোপযোগী ঈশ্বরের আদেশ উপদেশ সম্বলিত চারিখানি স্বর্গীয় গ্রন্থ চারজন প্রবর্ত্তকের নিকট অবতীর্ণ হয়। হজরত দাউদের নিকট "যবুর" হজরত মুছার নিকট "তৌরাৎ" হজরত ইছার নিকট "ইঞ্জিল" এবং হজরত মোহাম্মদের নিকট "কোরকান" অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই শেষোক্ত গ্রন্থের অন্যতম নাম "কোর্-আন"।

এই চারিখানি গ্রন্থে জগতে একেশ্বরবাদের বাণী প্রচার করিয়াছে। যখনই মানুষ অধর্ম্মাচরণ করিয়াছে তখনই একজন পয়গম্বর বা প্রবর্ত্তক অবতীর্ণ হইয়াছেন। এবম্প্রকারে মানবসমাজের ক্রমোন্নতির সঙ্গে সঙ্গে ঈশ্বর তত্তৎ যুগের প্রবর্ত্তকগণের মধ্যস্থতায় যুগোপযোগী উপদেশ বা ধর্ম্মের বিধান অবতীর্ণ করিয়াছেন। ইহারই ফলে চারিখানি স্বর্গীয় গ্রন্থ অবতীর্ণ হইয়াছে।

এই চারিখানি স্বর্গীয় গ্রন্থের মধ্যে হজরত মুছার (Moses) 'তৌরাৎ' এবং হজরত ইছার (Jesus) 'ইঞ্জিল' বর্ত্তমানে বাইবেল নামে কথিত। তৌরাৎ গ্রন্থকে বাইবেলের পূর্ব্বভাগ বা (Old Testament) এবং ইঞ্জিল গ্রন্থকে উহার শেষ ভাগ বা (New Testament) বলা হয়। এই দুই গ্রন্থও জগতে একেশ্বরবাদের বাণী প্রচার করিয়াছে। আমরা এই শেষ গ্রন্থ কোর্-আনের কথাই এখানে বলিব।

এই গ্রন্থ ৩০টী খণ্ডে এবং ১১৪টী অধ্যায়ে বিভক্ত। ইহা আরবী ভাষায় লিখিত এবং ঈশ্বরের দূত হজরত জেব্রিলের মধ্যস্থতায় খণ্ড খণ্ড আকারে হজরত মোহাম্মদের নিকট অবতীর্ণ হইয়াছিল। এই অবতরণ কার্য্য ২৩ বৎসরে সম্পন্ন হয়। যখনই যে অংশ অবতীর্ণ হইত তৎক্ষণাৎ তাহা খর্জ্জুর পত্রে লিখিয়া রাখা হইত। এবং হজরত মোহাম্মদের শিষ্যেরা পরক্ষণেই উহা কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিতেন। ইহার পূর্ব্ববর্ত্তী গ্রন্থগুলিও এই ভাবে খর্জ্জুর পত্র বা প্রস্তর ফলকে লিখিয়া রাখা হইত। তৌরাতের বাণীগুলি

আবার কখনও কখনও পেপাইরাস বৃক্ষের পত্রে লিখিয়া রাখা হইত। কারণ তোমরা জান, এই সকল যুগে কাগজের আবিষ্কার হয় নাই।

কোর-আনের বাণীগুলি তৎকালীন ঘটনাবলীর পারম্পর্য্য অনুসারে অবতীর্ণ হইত। হজরত মোহাম্মদের পর তদীয় তৃতীয় খলিফা হজরত ওছমানের সময় হজরত যায়েদবেনছাবেত প্রমুখ কতিপয় বিদ্বান ব্যক্তির সহায়তায় খর্জ্জুর পত্র হইতে বহু পরিশ্রমে ঐগুলি সংগৃহীত হয়। এবং দেশের সমস্ত হাফেজকে (যাঁহারা উক্ত বাণীগুলি কণ্ঠস্থ করিয়া রাখিয়াছিলেন) সমবেত লিখিত বাণীগুলির সহিত তাঁহাদের কণ্ঠস্থ বাণীগুলি মিলাইয়া দেখিয়া উহাদের বিশুদ্ধতা প্রমাণিত করা হয়। অতঃপর ঐগুলি পুস্তকাকারে লিখিয়া ধর্ম্মপ্রচারের জন্য দেশ বিদেশে পাঠান হয়। তোমরা জান তখনও ছাপাখানার আবিষ্কার হয় নাই। সুতরাং কোর-আনের যে প্রচার তাহা হাতে লিখিয়া সম্পাদন করিতে হইত। তখন ইছলাম দ্রুত গতিতে নানা দেশে প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। প্রত্যেক এই সমস্ত দেশে যে কোর-আন পাঠাইতে হইত তাহা হাতেই লিখিতে হইত। এখন তোমরা চিন্তা করিয়া দেখ যদি কোর-আনের মত বিরাট গ্রন্থখানার একটী কপি হাতে লিখিতে হয় তাহা হইলে তাহা কত শ্রমসাধ্য এবং সময়সাপেক্ষ হয়। এখনও তৎকালের হস্তলিখিত দুই খানা কোর-আন আমাদের দেশের কোন কোন স্থানে দেখা যায়। মুর্শিদাবাদের হাজারদুয়ারী ঘরের নাম তোমরা শুনিয়া থাকিবে। এই হাজারদুয়ারী ঘরে হজরত আলীর স্বহস্ত লিখিত একখণ্ড কোর-আন এখনও সযত্নে রক্ষিত হইতেছে।

যখন হজরত মোহাম্মদ আরবে ইছলাম ধর্ম্ম প্রচার করেন তাহার পূর্ব্বে তথাকার লোকেরা পৌত্তলিক ছিল। তাহারা বহু দেবদেবীর পূজা করিত। হজরত মোহাম্মদ যখন তাহাদিগকে মূর্ত্তিপূজা ছাড়িয়া সমস্ত বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ও পালনকর্ত্তা একমাত্র সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরের উপাসনা করিতে বলিলেন এবং আরও বলিলেন যে তিনি ঈশ্বরের প্রেরিত তত্ত্ববাহক বা রছুল, কোর্-আন সেই ঈশ্বরের নিকট হইতেই তাহার নিকট অবতীর্ণ, তখন দেশের পৌত্তলিকগণ এমনকি তাহার আত্মীয় স্বজনগণও তাঁহার উপর ক্ষেপিয়া উঠিল। এমনকি তাঁহাকে পাগল পর্য্যন্ত বলিতে লাগিল। এবং কোর্-আনের এই অপৌরুষেয়তে ঘোর সন্দেহ করিতে লাগিল। তখন সেই প্রসঙ্গে ঈশ্বরের বাণী অবতীর্ণ হইল "হে কোরেশগণ! আমি যে কোর-আন অবতীর্ণ করিয়াছি, তাহাতে যদি তোমরা সন্দিহান হও তাহা হইলে, আল্লা ব্যতীত, তোমাদের ইচ্ছানুযায়ী মানুষের সাহায্য লইয়া, এই অনুরূপ একটি অধ্যায় লইয়া আইস। তাহা হইলে তোমাদের সত্যতা প্রমাণিত হইবে।" অর্থাৎ তোমরা যদি মনে কর এই কোর-আন মোহাম্মদের স্বকপোলকল্পিত বাণী, তবে মোহাম্মদ ত নিরক্ষর, তোমরা বিদ্বানমণ্ডলী মিলিয়া এইরূপ একটি অধ্যায় লিখিয়া আন।

এইস্থানে কোরেশদের সন্দেহ দূর করিবার জন্য তাহাদিগকে একটি অধ্যায় লিখিয়া আনিতে বলা হইয়াছে। অন্যত্র ইহা অপেক্ষাও গুরুগম্ভীর স্বরে তাহাদিগকে কোর-আনের বাক্যের অনুরূপ একটী বাক্য লিখিয়া আনিতে বলা হইয়াছে। তখন আরবে অনেক বড় বড় কবি ও সাহিত্যিক ছিলেন কিন্তু কেহই কোর-আনের বাক্যের অনুরূপ একটি বাক্যও লিখিতে সমর্থ হন নাই। অবশেষে তাহাদের মধ্যে একজন বড় কবি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিয়াছিলেন যে "ইহা মানুষের বাণী নহে।"

তোমরা ইহা শুনিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইবে যে, তখনকার কবি ও বিদ্বানমণ্ডলীর মধ্যে এমনকি তৎপর এই ১৪০০ বৎসরের মধ্যে পৃথিবীর কোন বিদ্বান বা বিদ্বানমণ্ডলী কোর-আনের এই প্রতিযোগিতার আহ্বানে অগ্রসর হইতে সমর্থ হয় নাই।

ভাষার মাধুর্য্যে, রচনার লালিত্যে এবং ভাবের গাম্ভীর্য্যে, নীতির উদারতায় ইহার পরম শত্রুও ইহাকে স্বর্গীয় গ্রন্থ না বলিয়া পারে নাই। ইহা জগতের সাহিত্য-ভাণ্ডারে এক অতুলনীয় অবদান। ইহাতে যেমন বীররসের উন্মাদনা দেখা যায় তেমনি আবার করুণরসের মূর্চ্ছনাও দেখা যায়। ইহার দার্শনিক তত্ত্বগুলি এতই গভীর, এতই জ্ঞানোদ্দীপক যে, যতবারই পড়া যায় ততবারই ইহা নূতন বলিয়া প্রতীয়মান হয়। পাঠের আগ্রহ উত্তরোত্তর বর্দ্ধিত হইতে থাকে।

হজরত মোহাম্মদের পূর্ব্বে আরবদেশ অধর্ম্ম অনাচার, স্বার্থ ও উচ্ছৃঙ্খলতা'র লীলাভূমিতে পরিণত হইয়াছিল। কিন্তু কোর্-আন সেই উদার নীতির, সেই বিশ্বভ্রাতৃত্বের আবাহনে এই উচ্ছৃঙ্খল জাতিকে ইছ্‌লামের শান্তিময় ক্রোড়ে টানিয়া আনিতে পারিয়াছে—জগতে সাম্যবাদের পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিতে সমর্থ হইয়াছে।

স্ত্রীজাতি পূর্ব্বে ক্রীড়ার সামগ্রীরূপে গণ্য হইত। পিতার সম্পত্তিতে কন্যার অধিকার স্বীকার করা হইত না। কোর্-আনই প্রথম পিতৃসম্পত্তিতে কন্যার অধিকার ঘোষণা করিয়া সংসারক্ষেত্রে পুরুষ ও স্ত্রীর সমান অধিকার দান করিয়াছে—স্ত্রীজাতির সম্মান ও মর্য্যাদা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

কোর্-আনের মতে—

উচ্চনীচে, ধনীদরিদ্রে কোন ভেদ নাই। প্রত্যেক বিশ্বাসী পরস্পর ভ্রাতৃভাবাপন্ন। সুতরাং একে অপরের সাহায্য বা উপকার করিতে ধর্ম্মতঃ বাধ্য।

ঈশ্বর অনাদি, অনন্ত, নিরাকার। তাঁহার জনক, জননী বা পুত্র কলত্রাদি নাই। তিনি স্বয়ম্ভু। তাঁহারই আদেশমাত্র বিশ্বজগতের উদ্ভব হইয়াছে।

ঈশ্বর নিরাকার। সুতরাং তাঁহার কোন কল্পিত মূর্ত্তি প্রস্তুত করিয়া তাঁহার উপাসনা করা মহা পাতক।

ঈশ্বরের সৃষ্টির মধ্যে মানুষই শ্রেষ্ঠ। চন্দ্র সূর্য্য, মেঘ, বৃষ্টি, অগ্নি, বায়ু, গোরু, ঘোড়া, সাপ, বিচ্ছু, বৃক্ষলতা, প্রভৃতি প্রকৃতির যাবতীয় পদার্থই মানুষের সুখসাচ্ছন্দ্যের জন্য, মানুষের অধীন করিয়া সৃজিত। সুতরাং সকলেই মানুষ অপেক্ষা নিকৃষ্ট। অতএব উহাদের কেহই মানুষের উপাস্য নহে। কোনটীরই উদ্দেশে মানুষ স্বীয় মস্তক অবনত করিতে পারে না। সমস্ত বিশ্বজগতের স্রষ্টা সর্ব্বশক্তিমান ঈশ্বরই মানবের একমাত্র উপাস্য।

আত্মা অবিনশ্বর। মৃত্যুর পর পাপপুণ্যের ফলানুসারে আত্মা উর্দ্ধে বা নিম্নে অবস্থান করে। একদিন জগতের ধ্বংস হইবে। তখন সমস্ত আত্মা মহাবিচারের (কেয়ামতের) মাঠে একত্রিত হইবে। তথায় ঈশ্বর স্বয়ং পাপপুণ্যের বিচার করিয়া পুণ্যবান্‌কে স্বর্গে ও পাপীকে নরকে পাঠাইবেন। পুণ্যবান্ অনন্তকাল স্বর্গে বাস করিতে থাকিবে। মৃত্যুর পর জীবের আর পুনর্জ্জন্ম হয় না।

যাহারা এক ঈশ্বরে বিশ্বাস করে এবং সৎকার্য্য করে তাহারা ইহুদী হউক বা খ্রীষ্টান হউক, আর যে কোন ধর্ম্মাবলম্বী হউক ঈশ্বরের বিচারে মুক্তি লাভ করিবে। তবে ইছ্‌লামই এই মুক্তিলাভের সরল ও সোজা পথ।

মোছলমানদিগকে দৈনিক পাঁচবার নমাজ পড়িতে, বৎসরে একমাস রোজা রাখিতে এবং যাকাৎ দিতে হয়।

পূর্ব্ববর্ত্তী অপর তিনখানা স্বর্গীয় গ্রন্থও ঈশ্বরের বাণী; এবং সমস্ত তত্ত্ববাহকই ঈশ্বরের প্রেরিত; সুতরাং ঐগুলি গ্রন্থের শিক্ষাও ইছ্‌লামেরই পূর্ব্ব শিক্ষা মাত্র। হজরত ইব্রাহিমের প্রচারিত ধর্ম্মই মোছলমানেরা পালন করে।

যাহারা জগতের শান্তি নষ্ট করে ঈশ্বর তাহাদিগকে পছন্দ করেন না।

ধর্ম্মপ্রচারে বল প্রয়োগ একান্ত গর্হিত কার্য্য। সত্য আপনিই প্রকাশিত হইবে। যাহার পাপের ফল সেই ভোগ করিবে।

ক্ষমাই মানব-চরিত্রের মহত্ত্ব। কিন্তু যদি কেহ অনিষ্টকারীকে ক্ষমা না করিয়া প্রতিশোধ লইতে চায়, তবে তাহার ততটুকু প্রতিশোধ সে লইতে পারে।

দেশ-বিদেশের কথা



ইন্দো-চীন

২২৬৪ পৃষ্ঠার পর

ইন্দো-চীন বলিতে আমরা বহিভারত (Further India) কে বুঝি। ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ ; এবং আনাম লইয়া হইতেছে—ইন্দো চীন। এই দেশ কয়টি ভারতবর্ষের পূর্ব্বে এবং চীনদেশের দক্ষিণে অবস্থিত। একদিন ভারতবর্ষের বিজয়—অভিযান একয়টি দেশে বিস্তার লাভ করিয়াছিল। এখনও এই সব দেশে বেড়াইতে গেলে ভারতের সেই গৌরবের দিনের অনেক কিছু চিহ্ন দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান সময়ে ব্রহ্মদেশ ইংরাজের রাজ্য, শ্যাম স্বাধীন রাজ্য, আর আনাম ফরাসীদের সংরক্ষিত রাজ্য। এখন ইন্দোচীনে ফরাসীদের প্রতিপত্তি খুবই বেশী। কম্বোজ (Cambodia) আনাম (Anam) এবং লুয়াং প্রবং (Luang Probang বা Laos) এই তিনটি ফরাসীদের সংরক্ষিত রাজ্য (French Protection)এর মধ্যে কম্বোজ ও আনাম বেশ ক্ষমতাশালী।

এদেশের লোকেরা মোঙ্গোলিয়। পণ্ডিতদের মতে ইহারা চীনাদেরই বংশধর। রীতি-নীতি চলাফেরার মধ্যে চীনদের প্রভাবই বেশী। কিন্তু সংস্কৃতির (Culture) দিক্ দিয়া ইহারা ভারতীয়। হিন্দু ও বৌদ্ধধর্ম্ম এখনও এদেশে বাঁচিয়া আছে। অতি দূর পূর্ব্বদেশ বলিয়া অনেক দিন পর্য্যন্ত ইউরোপীয় জাতিরা এদেশের বড় একটা সংবাদ রাখিত না। এজন্যই ইন্দোচীনে চীন ও ভারতের শিক্ষা ও সভ্যতাই প্রভাব বিস্তার করিয়া আসিয়াছে

আনাম

প্রথমে আনামের কথা শোন। এই দেশটি পাহাড় পর্ব্বতে ভরা অসমতল। আনামের দক্ষিণ দিকে রেলপথ তৈরী হইয়াছে মাত্র। এজন্য দেশের নানাস্থানে ইচ্ছামত যাতায়াত করা যায় না। আনাম ফরাসীদের করদ রাজ্য বলিয়া ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ রাজাকে শাসনকার্য্যে সাহায্য করেন।

চম্পা—ইতিহাস

এক সময়ে আনামের খুবই গৌরব ছিল। দক্ষিণ আনামের চম্পা (Champa) এবং কোচিন-চীন বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিল। কিন্তু এখন সেই চম্পার নাম কেহই জানে না। এক সময়ে চম্পা ছিল ভারতের একটি প্রসিদ্ধ উপনিবেশ।

বর্ত্তমান কোচিন-চীন এবং আনাম প্রদেশ লইয়া প্রাচীন চম্পা রাজ্য গড়িয়া উঠিয়াছিল। কেন যে এদেশের নাম চম্পা হইল সে বিষয়ে অনেকে অনুমান করেন যে ভারতের বণিকেরা বা ঔপনিবেশিকেরা ভারতের চম্পারাজ্যের নাম অনুসারে তাহাদের উপনিবেশের নামও চম্পা রাখিয়াছিলেন। সেকালে ভারতের চম্পারাজ্যে ছিল ভাগলপুর জেলায়। তখন চম্পার বণিকেরা তাম্রলিপ্তি হইতে বাণিজ্য করিতে আসিতেন। তাদের পুনঃ পুনঃ আক্রমণের দরুনই সেকালের বিরাট চম্পারাজ্য ধ্বংস হয়। সেই ধ্বংসের উপর আনামীরা নূতন রাজ্যের প্রতিষ্ঠা করিয়া নাম দিলেন **আনাম**।

আনাম দেশটি পাহাড়-পর্ব্বতে ভরা। এদেশের দক্ষিণে শুধু রেলপথ আছে। সে রেলপথ রাজধানী হুয়ে (Hue) পর্য্যন্ত গিয়াছে। তা ছাড়া সারা দেশটিতে চলা ফেরার অনেক অসুবিধা রহিয়াছে। প্রাচীন চম্পারাজ্যের অনেক কীর্ত্তি এখনও দেখিতে



ডংডুয়েংর বাজার

এ-বাজারে- ॥, তামাক, মাটির জিনিষপত্র ; রেশম ও পশমের বস্ত্র, কাঁসা পিত্তল ও ধাতু নির্ম্মিত দ্রব্যাদি আমদানি হয়, ইন্দোচীনে ইহা একটি প্রসিদ্ধ বাণিজ্য কেন্দ্র-

বণিকদের জাহাজে চড়িয়া সেকালের ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা দেশ বিদেশে যাওয়া আসা করিতেন। বোধহয় খৃষ্টিয় প্রথম কিংবা দ্বিতীয় শতাব্দীতে চম্পার হিন্দু উপনিবেশের ভিত্তি এই ভাবেই গড়িয়া উঠিয়াছিল। ক্রমে এই উপনিবেশ বেশ বিস্তার লাভ করে এবং ত্রয়োদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত কোচীন-চীন হইতে বর্ত্তমান টঙ্কিন পর্য্যন্ত সমস্ত প্রদেশ তার অন্তর্ভূত হয়। সে সময়ে আনামীরা টঙ্কিনের উত্তর দিকে বাস করিত। পাওয়া যায়। সেকালের চম্পারাজ্য অমরাবতী, বিজয়, কৌঠার এবং পাণ্ডুরঙ্গ এই চারিটি ভাগে বিভক্ত ছিল। অমরাবতী ছিল বর্ত্তমান আনামের উত্তর ভাগে। রাজধানীর নাম ছিল ইন্দ্রপুর। অমরাবতী এখন কুয়াংনাম (Kwang nam) নামে পরিচিত। রাজধানী ইন্দ্রপুরীর ধ্বংসাবশেষ কুয়াংনামের নিকটবর্ত্তী ডং ডুয়ং নামক স্থানে অবস্থিত। সিংহপুর বর্ত্তমান তুরান (Tourane) বিজয় বর্ত্তমান—বিন্‌দিন (Binh Dinha)

কোঠার বর্ত্তমান খান-হোয়া (Khan-hoa)—ইহার বর্ত্তমান রাজধানীর নাম—না-ত্রাং (Nha-Trang)। পাণ্ডুরঙ্গ সেকালে কিছুদিনের জন্য সমস্ত চম্পার রাজধানী হইয়াছিল।

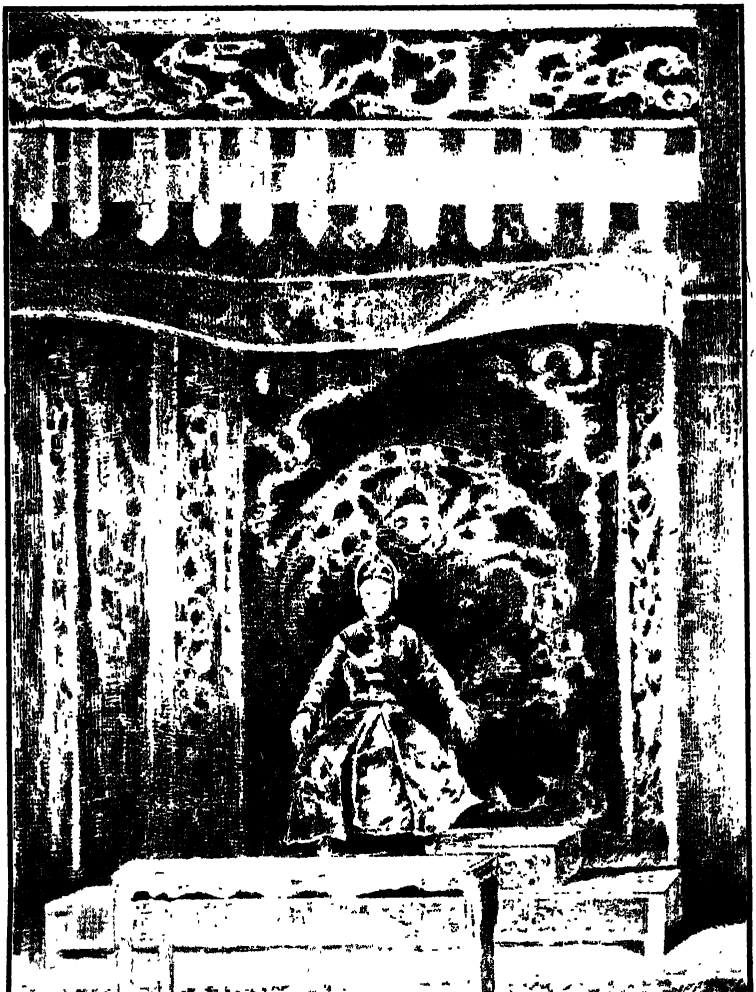
আনামের ইতিহাস জানিবার মত বটে। ফরাসীরা তাহাদের অধিকৃত ইন্দোচীনকে দুইটি ভাগে ভাগ করিয়াছেন—উত্তরে তর্নকিন্-টঙ্কিন আনাম ও কোচিন-চীন দক্ষিণে। টঙ্কিনের রাজধানী হ্যানয় (Hanoi)। আনামের রাজধানী হুয়ে (Hua) আর কোচিন চীনের রাজধানী হইতেছে সাইগন্ (Saigon)। কোচিন চীনের চৈনিক নাম হইতেছে চেঙ্গ চীন এবং কো চেঙ্গ-চীন (Cheng Chin and Ko Cheng Chin) এ-নামের উচ্চারণের অদল বদল প্রায়ই হইয়া আসিতেছে। এক সময়ে সারা দেশটাই এনামে পরিচিত ছিল, এখন কিন্তু তা নয়, এখন বর্ত্তমান কোচিন-চিন ও আনাম স্বতন্ত্র ভাবে পরিচিত।

পূর্ব্বপ্রান্তের সমুদ্রের তীরের এই সব দেশে এক সময়ে চামদের (Cham) ছিল অসাধারণ প্রতিপত্তি। কিন্তু এখন চ্যামেরা আত্মবিস্মৃত জাতি। চ্যামেরা এক সময়ে চম্পার হিন্দুরাজাদের শাসনাধীনে বাস করিত। সে সময়টা ও বড় কম নয় (অনুমানিক খৃঃ পূঃ ১৫০ হইতে ১৪৭০ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত)। বৌদ্ধধর্ম্ম চীন হইতে এদেশে আসিয়াছিল। এখন এখানে বৌদ্ধধর্ম্মের অতি হীন অবস্থা। তিব্বতীয় প্রভাবই বেশী। মুসলমান ধর্ম্ম এদেশে ১৩০০ খৃঃ অঃ হইতে প্রবর্ত্তিত হয়—চ্যামেরা অনেকেই মুসলমান।

এদেশের ইতিহাস মোটামুটিভাবে চীনদেশের সিন্ রাজবংশের সময় হইতে আরম্ভ করা যায়। (খৃঃ অঃ ২৪৯-২০৬) তখন দিগ্বিজয়ী নৃপতি শিহাংতি (Shi Hwangti) গিয়াও কি দেশের (তন্ কিন্ এবং আনাম) একচ্ছত্র সম্রাট হইয়াছিলেন। তারপর কত যুদ্ধ-বিগ্রহ চলিল—এক সময়ে টঙ্কিন্ ইউরাজ্যের অন্তর্ভূত হইয়াছিল। এদেশে চীনজাতির প্রভাব ও প্রতিপত্তি ১৮০১ খৃঃ অঃ পর্য্যন্ত বিদ্যমান ছিল। সম্ভবতঃ পঞ্চম শতাব্দী হইতে প্রভাবটা অনেক হ্রাস পায় এবং সেই সুযোগে হিন্দু রাজশক্তির আবির্ভাব হয়।

আনামের ইতিহাসের সহিত বাঙ্গলাদেশের ও বাঙ্গালীর সংস্রব আছে। এবিষয়ে একটি কাহিনী আছে। সে কাহিনীটি এই—একজন বাঙ্গালী বীর খৃষ্টপূর্ব্ব সপ্তম শতকে আনাম রাজ্যে গমন করেন। তাঁহার নাম 'লাক্-লোঙ্' (Lak long) ইঁহার মাতামহ নাগবংশীয় ছিল। আনাম দেশের বিবরণে আছে যে, ইনি তাঁহার জন্মভূমি 'বনলাঙ্' (Vanlang) পরিত্যাগ পূর্ব্বক এদেশে আসিয়া আনাম রাজাকে তাড়াইয়া দিয়া নিজে রাজা হ'ন। এখানে 'উকি' নামে এক রমণীকে তিনি বিবাহ করেন। তাঁহার এই রাজ্যের নাম ও তিনি দেন- 'বন লাঙ্' রাজধানীর নাম দেন "লোঙ্-চু"। ইঁহাদের সম্বন্ধে অনেক অদ্ভুত অদ্ভুত গল্প আছে। গল্পগুলি আর বলিলাম না। তবে সেই সমস্ত গল্প হইতে জানা যায় যে, 'বন্‌লাঙের' অধিবাসীরা 'বন্' বা 'বঙ' নামে পরিচিত ছিল। এই 'বন্' ও বঙ্গ অভিন্ন বলিয়াই বোধ হয়। এই 'বন্' বা 'বঙ' জাতি খৃঃ পূঃ তৃতীয় শতক পর্য্যন্ত আরামে রাজত্ব করে। আনাম-বিবরণে ইহাদের আঠার জন রাজার উল্লেখ মাত্র আছে। ইহাদের শেষ রাজাকে রাজ্যচ্যুত করিয়া ১৫৮ খৃঃ পূঃ শতকে 'থুক' রাজা হ'ন। লাক-লোঙ্ যিনিই হউন, ইনি যে বঙ্গদেশ হইতে আনামে গিয়াছিলেন, তাহা মানিয়া লইবার মত প্রমাণ জেরিনি প্রভৃতি পণ্ডিতেরা দিয়াছেন। এমনকি যখন আর্য্যগণ বাঙ্গালাদেশে আগমন করেন নাই, তখনও বাঙ্গালী বা বঙ্গজাতি ব্রহ্মদেশ, আরাকান, আনাম প্রভৃতি নানা দেশে গমন করিয়াছিল।

দ্বিতীয় শতাব্দীতে পরমেশ্বর নামে একজন হিন্দু রাজা চম্পা রাজ্য প্রতিষ্ঠা করেন। তৃতীয় শতাব্দীতে মুরাজার নাম পাই। তখন চম্পারাজ্যের রাজধানী ছিল পাণ্ডুরঙ্গ (Pandu-ranga)। প্রাচীন পাণ্ডুরঙ্গ এখন ফাম্-রাং নামে পরিচিত। পাণ্ডুরঙ্গ এক সময়ে সমস্ত চম্পারাজ্যের রাজধানী ছিল। এইখানেই চম্পার রাজারা আনামীদের সহিত রাজ্যরক্ষার জন্য শেষ যুদ্ধ করে। শিলালেখ হইতে জানা যায় পঞ্চম শতাব্দীতে ভদ্রবর্ম্মণ ধর্ম্ম মহারাজা পো-নগরে না-ত্রাং কোঠারে একটি মন্দির নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই সব মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এখনও আছে। এখানকার অনেক মন্দিরই এঙ্কোরভটের ও আগের তৈরী।



আনাম সম্রাট

চীন শাসকদের সঙ্গে চ্যাম রাজাদের যুদ্ধ বরাবরই চলিত। ৯৩১ খৃষ্টাব্দে আবার আনামীদের মধ্যে একটা জাগরণ দেখা দিল। দিন্‌বো-সাং (Din-Bo-Sangh) নামে একজন আনামী বীর আনামী রাজবংশের প্রতিষ্ঠা (৯৬৮—৯৭৫ খৃঃ অঃ) করেন। অবশ্য চীন সম্রাটের আনুগত্য স্বীকার করিয়া। এসময়ে চম্পারাজ্যের দুর্দ্দিন দেখা দিতে আরম্ভ করিল। কম্বোজিরা চম্পা রাজ্য আক্রমণ করিল, এসময়ে দ্বিতীয় ইন্দ্রদমন নামে মাত্র ছিলেন চম্পারাজ্যের রাজা। দশম ও একাদশ শতাব্দীতে আনামী রাজারা বেশ ক্ষমতাশালী হইয়া উঠিলেন। ১১৯০ খৃষ্টাব্দে—কম্বোজিয়েরা এদেশ অধিকার করিল।

ত্রয়োদশ শতাব্দীর শেষাশেষি চীন সম্রাট কুব্‌লাই খাঁ (১২৮৬ খৃঃ অঃ) যখন এদেশ আক্রমণ করেন, তখন আনামীরাও চ্যামেরা মিলিত-ভাবে দেশের স্বাধীনতা রক্ষার জন্য প্রাণপণ যুদ্ধ করিয়াছিল। ১২৮৬-১২৯০ খৃষ্টাব্দ—এই চারি বৎসরকাল মাত্র আনাম রাজ্য ছিল তাঁহার অধীন।

চীন দেশে যখন সিং রাজারা রাজত্ব করিতেছিলেন—সে সময়ে সম্রাট অঙ্গ-লো (১৪০৩-১৪২৫ খৃঃ অঃ)র রাজত্বকালে লিলোই নামে একজন আনামী বীর দেশের স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ করেন। কিন্তু ফল কিছুই হইল না, সিং সম্রাটের অধীনেই রহিয়া গেল। (১৪০৭-১৪১২ খৃঃ অঃ) এই পাঁচ বৎসরকাল চম্পারাজ্যে কোন গোলযোগ ঘটে নাই।

১৪৪৬ খৃঃ অঃ লে থান্‌তং শ্রীজয় রাজবংশের শেষ নৃপতির হাত হইতে রাজ্য কাড়িয়া লইলেন এবং পানবং বা পাণ্ডুরংয়ে রাজধানী স্থাপন করিলেন। এ-সময়ে সারা চম্পারাজ্যে একটা অরাজকতা ও অশান্তি চলিতেছিল। চ্যামেরা আনামীদের সঙ্গে মিশিয়া গেল। তাহাদের শেষ রাজা কম্বোজে চলিয়া গেলেন। এইভাবে চম্পারাজ্য লোপ পাইল।

লিলোই ১৪২৮ খৃষ্টাব্দে চম্পারাজ্য অধিকার করেন, সে কথা তোমাদের বলিয়াছি। ১৮০১ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই রাজবংশের প্রভাব ছিল। তারপর নানা যুদ্ধ-বিগ্রহে রাজাদের ও রাজবংশের পরিবর্ত্তনের মধ্য দিয়া আনাম এখন ফরাসীদের অধিকারভুক্ত হইয়াছে।

সাধারণ বিবরণ

আনামের ইতিহাস শুনিলে এইবার সে দেশের অন্যান্য কথা শোন। ভারতবর্ষের পূর্ব্বদিকে ইন্দোচীন উপদ্বীপ। দেশটি গ্রীষ্ম প্রধান। দেশের উত্তর দিকে বৃষ্টি বাদলের প্রকোপ খুবই বেশী। টঙ্কিন অঞ্চলের ঋতু পরিবর্ত্তন অনেকটা ভারতের মত।

এখানকার লোকের প্রধান খাদ্য ভাত। নীচু জমিতে ধানের চাস খুব বেশী পরিমাণে হইয়া থাকে। পার্ব্বত্য অঞ্চলে চা বাগান আছে। রবারের চাষ এখানে একটি লাভজনক ব্যবসায়। তা ছাড়া, পাট, তামাক, কফি প্রভৃতির চাষ হইয়া থাকে। এখানে অনেক তৈল কূপ রহিয়াছে। আনাম ও লাও—পার্ব্বত্য প্রদেশ। আনামের রাজধানীর নাম হুয়ে।

আনামের চ্যামেরা সংখ্যায় দিন দিনই কমিয়া আসিতেছে। এখনও তাহারা হিন্দুই রহিয়াছে। ইহাদিগকে বলে "জাত চ্যাম" (Jat Cham)। কোচীন চীন ও কম্বোজের চ্যামেরা অনেকেই ইস্‌লাম ধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছে, তাহাদিগকে বলে 'বানী চ্যাম' বা আস্‌লাম চ্যাম।'

চ্যামেরা মনক্মের (Mon Khmer) জাতির শাখা বিশেষ। কম্বোজীয়েরাও এই জাতির একটি শাখা। চ্যামেরা ছিল প্রাচীন কোচীন চীন ও আনামের আদিম অধিবাসী।—অনুমান খৃষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর শেষভাগে হিন্দু যবদ্বীপ হইতে জলপথে এসে এই দেশে উপনিবেশ বিস্তার করেন ও নূতন উপনিবেশের নাম দেন চম্পা। দেশের নামানুসারে দেশবাসীরাও ক্রমশঃ ঐ নামে পরিচিত হ'তে থাকে। চম্পার অধিবাসীরা হিন্দুধর্ম্মে দীক্ষা নেয় এবং ভারতীয় ঔপনিবেশিকেরা হ'ন তাদের দীক্ষা গুরু। তারা ভারতীয় সভ্যতায় দীক্ষালাভ ক'রে ক্রমশঃ ক্ষমতাশালী হ'য়ে উঠ্‌ল। তাদের ভিতর শিল্পী ও স্থপতির সৃষ্টি হ'ল। ভারতীয় লেখাপদ্ধতি তারা গ্রহণ করল ও ভাষাকে মার্জ্জিত ক'রে গড়ে তুল্‌লো। এদের ভাষায় বহু লোকের লেখা ও ধর্ম্মকথা পাওয়া গেছে। সে ভাষার উপর অবশ্য সংস্কৃতের খুবই প্রভাব দেখা যায়। কারণ সংস্কৃত ছিল বিজেতাদের দেবভাষা।



বানরের কথা

২১৭৯ পৃষ্ঠার পর

আমাদের ছেলেবেলার একটি গল্প বলিতেছি। চার্লস ডারুইন্ একজন মস্তবড় বৈজ্ঞানিক ছিলেন, তিনি বলিয়াছিলেন যে বানর হইতেই মনুষ্য জাতির উৎপত্তি। বানর, নরের অর্থাৎ মানুষের পূর্ব্ববর্ত্তী অবস্থা। বানর হইতে নর এবং বানরী হইতে নারী।—সে কালের কলেজের একটি ছেলে কলিকাতা হইতে এই নূতন জ্ঞান লাভ করিয়া গ্রামে আসিয়া গ্রামের লোকের কাছে তাহার এই জ্ঞানের কথা প্রচার করিল, গ্রামের লোকেরা বিজ্ঞানের বা জীববিদ্যার কতটুকুই বা সন্ধান রাখে, তাহারা কলেজের ছেলের মুখে এই নূতন ও আশ্চর্য্য কথা শুনিয়া রাগিয়া গেল! কি অদ্ভুত কথা! মানুষ কিনা, বানরের বংশ? পাগল না হইলে কি কেহ এমন কথা বলে?—কলেজের ছাত্রটির গ্রামে বাস করা দায় হইয়া উঠিল! সে গ্রামের পথে বাহির হইলেই—গ্রামের ছেলে বুড়ো সকলে তাহাকে বিদ্রূপ করিয়া বলিত—"ঐরে, বানরের বাচ্চা যাইতেছে।" সে যাহাই হউক না কেন, কথাটা কিন্তু একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দিবার মতও নয়। অস্থিসংস্থানবিদ্যার বলে—এই কথাটি বিশেষভাবে প্রতিপন্ন হইয়াছে, ইতর প্রাণীর মধ্যে বানরই মানুষের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী জাতি। জীবনী-শক্তির দিক্ দিয়াও ইহা সত্য। মানুষের মাংসপেশী যেমন, মর্কটেরও অবিকল সেইরূপ, শিরা, ধমনী, স্নায়ু, নাড়ী, পাকস্থলী এই সব! মানুষ যেমন মাতৃস্তন্য পান করে, মর্কটেও মায়ের বুকের স্তন্য চুমিয়া দুধ খায়। স্তন্যপায়ী জীব মাত্রেরই (Primates) শরীরের গঠন একই ছাঁচে গঠিত। বিশেষ করিয়া লাঙ্গুলহীন বানর (Ape), বানর (Monkey), হনুমান (Baboons) আমেরিকার উষ্ণমণ্ডলবাসী ক্ষুদ্রকায় কপি (Mar mo-set) কোন কোন জীব-বিদ্যাবিশারদ পণ্ডিতের মতে—Monkey বা বানর বলিতে লাঙ্গুলবিশিষ্ট বানরকেই বুঝায়।

বানরের মোটামুটি দুইটি বিশাল ভাগ। তাহার প্রথম ও প্রধান ভাগে লাঙ্গুলবিহীন বানর ও দ্বিতীয় বিভাগে লাঙ্গুলযুক্ত বানর। লাঙ্গুলহীন বানরের ইংরাজী নাম 'এপ্' (Ape), ইহারাই হইতেছে মানুষের নিকট জাতি। আর লাঙ্গুল বিশিষ্টদের নাম 'মঙ্কি' ও বাবুন (Baboon) লাঙ্গুলহীন বানরদের আমরা 'বনমানুষ' বলিতে পারি। গরিলা, ওরাংউটান, শিম্পাঞ্জী গিবন প্রভৃতি বানর, 'বনমানুষ' শ্রেণীর অন্তর্ভূত। এই লাঙ্গুলহীন উচ্চ শ্রেণীর বানরের আকারে প্রকারে মানুষের খুব নিকট সম্বন্ধ। উল্লুক বা হল্লুক ও উইয়োনাদিও এই শ্রেণীর। জীববিদ্যা সম্বন্ধে যাহাদের কিছুমাত্র জ্ঞান আছে তাহাদিকে একথা

বলা আবশ্যক যে মানসিক ও নৈতিক গুণ সমূহ বাদ দিলে মানুষও অন্যান্য দশ রকম জন্তু জানোয়ারের ন্যায় এক প্রকার জন্তু।

মানুষ নামক জন্তুর সহিত উপরোক্ত শ্রেণীর যথেষ্ট মিল আছে। ইহারা মানুষের ন্যায় একই প্রকারের রোগে আক্রান্ত হয়, মানুষের ন্যায় ইহাদেরও রাগ, ভয়, আনন্দ কৌতুহল প্রভৃতিতে মুখের ভাবের নানারকম পরিবর্ত্তন ঘটে। বানর ও মানুষের মধ্যে এইরূপ সাদৃশ্য দেখিয়া আধুনিক প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতেরা বানরকে মনুষ্য শ্রেণীভুক্ত করিয়া শ্রেষ্ঠজীব নাম দিয়াছেন। মানবাকৃতি বানরের মধ্যে গরিলা ও শিম্পাঞ্জী মানুষের নিকট জ্ঞাতি। শিম্পাঞ্জী ও গরিলার ছবি দেখিয়াই বুঝিতেছ যে গরিলা কি ভয়ানক জন্তু। আফ্রিকার নিবিড় অরণ্যে ইহাদের বাসস্থান :

১৫৯০ খৃষ্টাব্দে এণ্ড্রু ব্যাটেল (Andrew Battel) নামে একজন ইংরাজ নাবিক যখন আফ্রিকার পশ্চিম অংশে গরিলা দেখিতে পাইয়া দেশে আসিয়া বলেন যে—একটা ভীষণাকৃতি 'এপ্' (Ape) দেখিয়াছেন, তখন তাঁহার কথা কেহই বিশ্বাস করিতে পারেন নাই। কিন্তু ক্রমশঃ অন্যান্য ভ্রমণকারীরা ও যখন আসিয়া এই দুর্দ্দান্ত বনমানুষের কথা বলিলেন তখন আর কোনও সন্দেহ রহিল না।



গরিলার মুখ

গরিলাদিগকে তাহাদের দেশ আফ্রিকা হইতে জীবিতাবস্থায় ধরিয়া আনা বড় কঠিন কাজ। ইহারা অত্যন্ত হিংস্র প্রাণী। কলিকাতার যাদুঘরে গরিলার মৃতদেহ আছে। ইহাদের আকার অনেকটা মানুষের মতন। মানুষের মাথার সহিত ইহাদের মাথারও অনেকটা সাদৃশ্য আছে। পা

যদি ছোট না হইত তাহা হইলে ইহারা মানুষ অপেক্ষা অনেক বড় হইত। ইহারা দলবদ্ধ হইয়া



কালো বানরের মাথা 'এপ্'

বাস করে। পুরুষ গরিলা ও স্ত্রী গরিলা তাহাদের সন্তান-সন্ততি লইয়া একসঙ্গে আহারের অনুসন্ধানে



গরিলার বিশ্রাম

ঘুরিয়া বেড়ায়। রাত্রিকালে স্ত্রী গরিলা বৃক্ষের উপরে সন্তানগুলিকে লইয়া নিদ্রা যায়, আর পুরুষ গরিলা গাছের নীচে নিদ্রা যায়। গরিলা-শিশুরা ও বড় সহজ প্রাণীটি নহেন! বাচ্চা কাল



লণ্ডন চিড়িয়াখানায় গরিলা শিশু

হইতেই তাহাদের হিংস্র ভাবটি বেশ জাগিয়া উঠে।

শারীরিক বলে ও আকৃতিতে মানবাকৃতি বানরের মধ্যে গরিলা হইতেছে সব চেয়ে শ্রেষ্ঠ। ইহাদের কোন কোনটি উচ্চতায় প্রায় ছয় ফুট



গরিলার আক্রমণ

পর্য্যন্ত হয়। ইহাদের বলিষ্ঠ ও দৃঢ় অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া লোম, প্রশস্ত কপোল এবং

ধারালো দাঁত দেখিলেই উহাদের স্বভাবটি যে বড় মধুর নয়, বেশ হিংস্র ও ক্রূর তাহা চেহারা দেখিলেই বেশ বুঝিতে পারা যায়।

তারপর গরিলা শিকার করা বড় ভয়ানক



পুরুষ গরিলা—যৌবনে

ব্যাপার। প্রাণটি হাতে লইয়া তবে এ কাজে অগ্রসর হইতে হয়। কত সাহসী শিকারী যে গরিলা শিকার করিতে গিয়া বিপদে পড়িয়াছেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। ছবিতে দেখ, একজন ইংরাজ শিকারী বনের মধ্যে শিকার করিতে যাইয়া হঠাৎ একটি পূর্ণবয়স্ক গরিলার সম্মুখে পড়িয়া গিয়া একেবারে হতভম্ব হইয়া পড়িয়াছেন। কি যে করিবেন, কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। গরিলাটা কিরূপ ভীষণভাবে ছুটিয়া আসিতেছে তাহা ত দেখিতেই পাইতেছ।

গরিলাদের ইউরোপের জলবায়ু সহ্য হয় না। ইউরোপের কোন চিড়িয়াখানায়ই গরিলা বেশী দিন বাঁচে না। একবার জার্ম্মেনির একটি

চিড়িয়াখানায় একটি গরিলা আনা হয়, সেটি বেশ শান্ত শিষ্ট ছিল। সে প্লেট হইতে খাবার খাইতে শিখিয়াছিল। আর বেশ পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন থাকিত। তাহার খাবার জন্য পাশের ঘরে যে ফলমূল থাকিত, তাহার ইচ্ছা হইলে সে চুপি চুপি সেই ঘরে যাইয়া চুপড়ি হইতে ফল টানিয়া বাহির করিয়া খাইত। যদি সে সময়ে কাহাকেও দেখিতে পাইত, তাহা হইলে তৎক্ষণাৎ ফল ইত্যাদি ফেলিয়া দুই লাফে ঘর হইতে পালাইত। কখনও কখনও এইরূপ ভাবে ফল লইবার সময় সম্মুখের দরজাটা বন্ধ করিয়া দিত, ইহা হইতে বেশ বুঝা যাইত, তার কাজটা যে ভব্য সভ্য রকমের কিছু নয় তাহা সে বুঝিতে পারিয়াছে।

শিম্পাঞ্জী

শিম্পাঞ্জী ও পশ্চিম এবং মধ্য আফ্রিকাতে বাস করিয়া থাকে। অনেক পণ্ডিতের মতে শিম্পাঞ্জীর



শিম্পাঞ্জীর মুখ

এক শাখা ভারতবর্ষেও বাস করিত। শিম্পাঞ্জী দেখিতে ঠিক ছোট-খাট মানুষটির মত। মানুষের মত ইহাদেরও ভ্রূ আছে। ইহারা পরিবারবদ্ধ হইয়া বাস করিয়া থাকে। কখনও কখনও বা দুই চারিটি পরিবার একত্র হইয়া একসঙ্গে বাস করে। রাত্রিকালে নিদ্রা যাইবার জন্য ইহারা এক প্রকার ঘর নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। পূর্ব্বে পণ্ডিতেরা মনে করিতেন, গরিলাই মানুষের নিকটতম জ্ঞাতি, কিন্তু এখন তাঁহারা তাঁহাদের সেই মত পরিবর্ত্তন করিয়াছেন, তাঁহারা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন যে শিম্পাঞ্জীর মানসিক বৃত্তির দিক্ দিয়া শিম্পাঞ্জী গরিলা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ।

পোষা শিম্পাঞ্জীর চাল চলন দেখিলেই তাহাদিগকে বেশ বুদ্ধিমান জীব বলিয়াই মনে



শিম্পাঞ্জীর বাসা

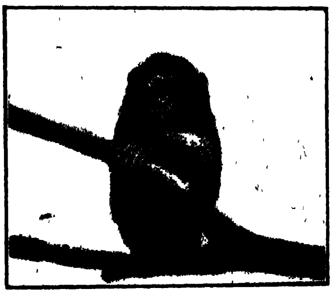
হয়। শিম্পাঞ্জীরা দুই শ্রেণীতে বিভক্ত। এক শ্রেণী কালো, আর এক শ্রেণীর মাথা গোল। প্রথম শ্রেণীর যে শিম্পাঞ্জীর কথা বলিলাম, তাহাদের সারা শরীর কালো বর্ণের লোমে আচ্ছাদিত। ইহাদের উপরের ঠোঁট লম্বা, কপোল প্রশস্ত ও নাসিকা চেপ্টা, কিন্তু ইহাদের চোখের দৃষ্টির সহিত মানুষের চোখের দৃষ্টির বেশ সাদৃশ্য আছে। শিম্পাঞ্জীর মুখের দিকে তাকাইলেই তাহাদের রাগ, ভয়, আনন্দ, কৌতুহল এবং মনের ভাবটি কেমন তাহা বেশ বুঝিতে পারা যায়। যখন ইহাদের আনন্দ হয়, তখন লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে মুচ্‌কি মুচ্‌কি হাসিতেছে।

শিম্পাঞ্জীরা গভীর বনে বাস করে। ইহাদের খাদ্য বনের ফল ও মূল। শিম্পাঞ্জীরা একা কিংবা



শিম্পাঞ্জী চা পান করিতেছে

দল বাঁধিয়া চলাফেরা করে। মাটির উপর দিয়া চলিবার সময় ইহারা হাত ও পা উভয়ই ব্যবহার করে। ইহারা অধিকাংশ সময়ই মৃত্তিকার উপরে কাটায়। আবার এক গাছ হইতে আর এক গাছে, এক শাখা হইতে অন্য শাখায়ও বেশ দ্রুত চলাচল করিতে পারে। বৃক্ষের উচ্চ শাখায় কাঠ পাতিয়া ইহারা বাসা নির্ম্মাণ করে, সেখানে



বিশ্রামরত শিম্পাঞ্জী শাবক

সন্তান প্রসব করে। শিম্পাঞ্জীরা মানুষ দেখিয়া ভয় পাইলেও বলে বিক্রমে ইহারা মানুষ হইতে বড় কম নহে। তেমন বলিষ্ঠ ব্যক্তিও গায়ের জোরে ইহাদের সমান নহে।



নির্ভীক চাহনি

শিম্পাঞ্জীকে শিশু অবস্থায় বন হইতে ধরিয়া আনিতে পারিলে ইহারা মানুষের বেশ পোষ মানে। কিন্তু দেখা গিয়াছে যে ইউরোপের জলবায়ু ইহাদের সহ্য হয় না। লণ্ডনের চিড়িয়াখানায় যতগুলি শিম্পাঞ্জী আনা হইয়াছিল, তাহার একটিও দীর্ঘকাল বাঁচে নাই। ক্ষয়কাশ রোগেই ইহারা মারা গিয়াছে। পোষা শিম্পাঞ্জীর বুদ্ধি, বিবেচনা ও অদ্ভুত অনুকরণ শক্তি সম্বন্ধে অনেক গল্প আছে। এখানে তাহার দুই একটি গল্প বলিতেছি।



গাছে গাছে চলাচল

হারব্রেম নামক বিখ্যাত প্রাণীতত্ত্ববিদ্ শিম্পাঞ্জীদের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিয়া বলিয়াছেন যে কোন

ব্যক্তি ইহাদের চরিত্র পর্য্যবেক্ষণ করিবেন, তিনিই মানুষের সঙ্গে ইহাদের তফাৎ কত কম তাহা দেখিতে পারিবেন। তাঁহার লিখিত একটি গল্প শোন। হাবত্রেমের বাড়ীতে একটি স্ত্রী-শিম্পাঞ্জী ছিল। সে একবার একটা বিড়ালের বাচ্চাকে পালিবার মৎলবে তাহার গায়ে হাত দেয়। বাচ্চাটি ভয় পাইয়া বানরটিকে নখ দিয়া আঁচড়াইয়া দেয়। বানরীটি কি করিল জান? সে আস্তে



দুই বন্ধু—শিম্পাঞ্জী ও ওরাংউটান

আস্তে বিড়ালটির নখগুলি উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দেখিল তারপর কামড়াইয়া নখগুলি ছিঁড়িয়া ফেলিল।

লণ্ডন নগরের চিড়িয়াখানায় তিন বৎসরের একটি শিম্পাঞ্জী ছুরির ফলা খুলিতে ও বন্ধ করিতে পারিত। মানুষের মত পেন্সিল দিয়া কাগজের উপর আঁকজুক করিতে ভালবাসিত। আর একটি শিম্পাঞ্জীর সম্বন্ধে গল্প আছে যে সে সোনা রূপার গড়া অলঙ্কার পরিতে ভালবাসিত। খাবার সময় টেবিলের উপর একখানা কাপড় বিছাইয়া লইত এবং তাহার জন্য নির্দ্দিষ্ট চেয়ারখানিতে বসিয়া খাবার খাইত। আবার কেমন মজা শোন, গ্লাস হইতে জল পান করিয়া এই বাবু শিম্পাঞ্জী মহাশয় আবার তোয়ালে দিয়া মুখ মুছিতেও শিখিয়াছিলেন।

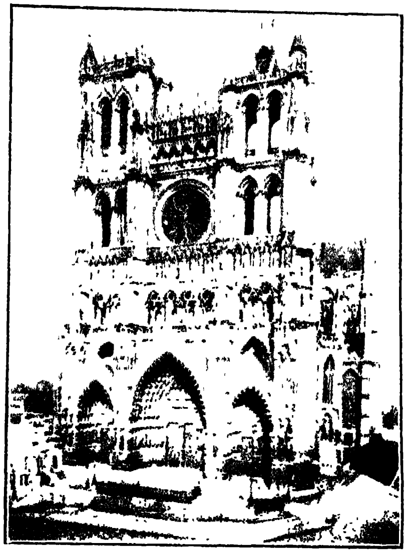
জীবজগতের মধ্যে বানরের সঙ্গে মানুষের যে শরীরগত কতটা সাদৃশ্য আছে, তাহা বোধহয় বেশ বুঝিতে পারিয়াছ। ডারুইনের আগে মোনবোড্ডো (Monoboddo) নামক একজন প্রাণীতত্ত্ববিদ্ পণ্ডিতও বানর হইতে নরের উৎপত্তি সম্বন্ধে দৃঢ় বিশ্বাস করিতেন। কেবল শরীরের দিক্ দিয়া নহে মানসিক ব্যাপারেও অনেক সময় ইহাদের সহিত মানুষের সাদৃশ্য দেখিলে বিস্মিত হইতে হয়। এখানে এসম্বন্ধে একটি গল্প বলিতেছি। এক জাহাজের কাপ্তেনের একটি পোষা বানর ছিল। বানরটির স্বভাব বেশ ভাল ছিল, এজন্য জাহাজের লোকেরা তাহাকে ভালবাসিত। কিন্তু তাহার দুষ্টামিও বড় কম ছিল না। জাহাজের একজন বিখ্যাত যাত্রীর একটা ছাগল ছিল, সে একদিন ছাগলটাকে দোহন করিবার চেষ্টা করে, কিন্তু সে বেচারা পাত্র কোথায় পাইবে? কাজেই একজন নাবিকের একটি টুপি চুরি করিয়া কাজ চালাইতেছিল, এমন সময়ে ধরা পড়িলে তাহাকে কাপ্তেনের কাছে লইয়া যাওয়া হইল। কাপ্তেন এজন্য এক সপ্তাহের জন্য বানরটাকে বন্ধ করিয়া রাখিতে আদেশ দিলেন, যে সকল নাবিকেরা তাহাকে ভালবাসিত সেই সমস্ত নাবিকদের কাছে সে কত রকমের আব্দারের অঙ্গভঙ্গী করিতে লাগিল কিন্তু কাপ্তেনের হুকুমে কেহই তাহার দিকে ফিরিয়াও চাহিত না। এইভাবে দুইদিন কাটিয়া গেল, তৃতীয় দিন প্রাতঃকালে সে সমুদ্রের জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিল। দেখিলে ত এই শিম্পাঞ্জীটির কেমন অভিমান!

এখানে আর একটি গল্প বলিতেছি। তোমরা জান, বানরেরা অত্যন্ত অনুকরণপ্রিয়। একবার একজন সৈন্যাধ্যক্ষের একটি প্রিয় বানর ছিল। একদিন তার স্ত্রী ভোজন গৃহ হইতে একটা অদ্ভুত শব্দ শুনিয়া ব্যাপার কি দেখিতে যান। বানরটা তাঁহার স্বামীর টুপি মাথায় দিয়া চশমা চোখে আর্ম চেয়ারের উপর বসিয়াছে; এবং খবরের কাগজ খুলিয়া সেটাকে যেন রাগের ভরে মাঝে মাঝে চাপড়াইতেছে আর একটা বিড়ালের দিকে চাহিয়া নানারকম মুখভঙ্গী সহকারে বিড় বিড় করিয়া কি বলিতেছে। কথাটা এই যে তাহার প্রভু কাগজে কোন উত্তেজনার কথা পাইলে যে স্বরে ও ভঙ্গীতে তাহা তাহার স্ত্রীকে শুনাইতেন, বানরটি তাহাই হুবহু নকল করিতেছিল।

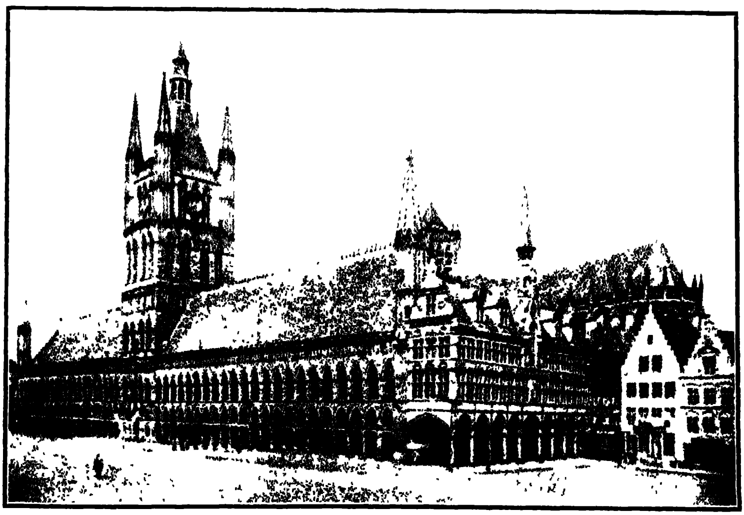
পৃথিবীর বিখ্যাত গীর্জ্জা



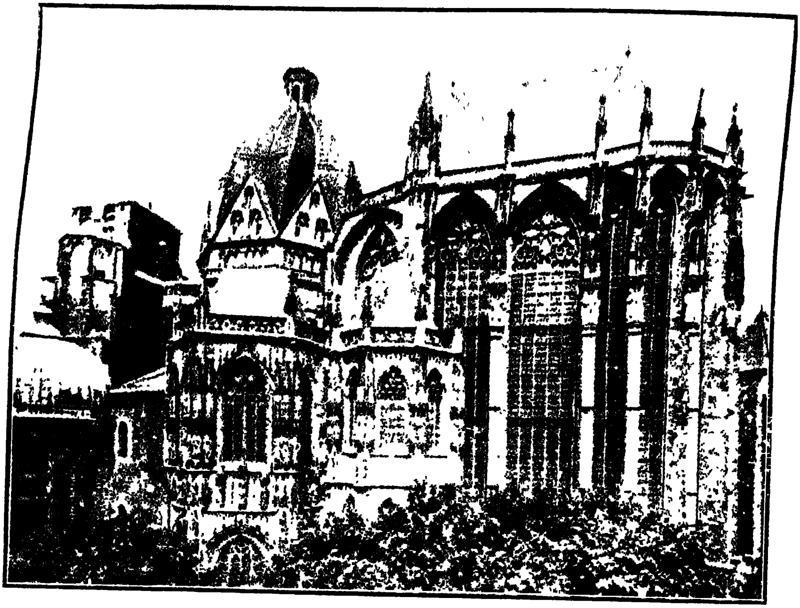
ক্যান্টারবেরী গীর্জা



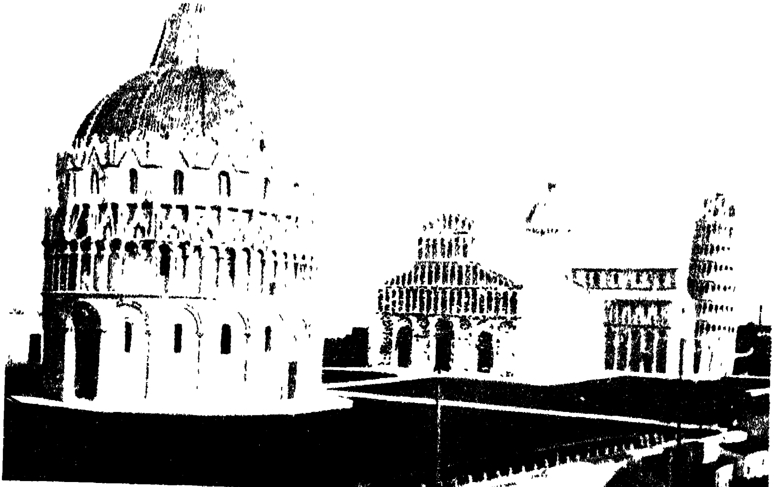
[illegible]



ক্লথ হল ও গীর্জা—বেলজিয়াম—ত্রয়োদশ শতক



অষ্টকোণ গীর্জা (Aix-la-Chapelle) [illegible]



পীসার গীর্জা—দ্বাদশ শতাব্দী



ভারতের পর্বত ও নদী—গঙ্গোত্রী

২২৪৯ পৃষ্ঠার পর

ভারতবর্ষে নদী অনেক। প্রত্যেক প্রদেশেই বেশ বড় বড় নদী আছে। তোমরা হিমালয় পর্ব্বতের কথা জানিলে, এই হিমালয়পর্ব্বত হইতে সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র এই তিনটি নদীর বহুসংখ্যক উপনদীর জন্ম হইয়াছে। ভারতবর্ষের মানচিত্রখানি একবার ভাল করিয়া দেখ, দেখিতে পাইবে যে হিমালয় পর্ব্বতের পাদদেশ হইতে দক্ষিণদিকে বিন্ধ্যপর্ব্বত পর্য্যন্ত এবং পূর্ব্বদিকে লুসাই ও নাগা পর্ব্বত হইতে পশ্চিমে কিরথর পর্ব্বত ও সুলেমান পর্ব্বত পর্য্যন্ত বিস্তৃত এক সমতল ভূমি বিদ্যমান রহিয়াছে। এই সমতল ভূমির নাম—গাঙ্গেয় সমতল প্রদেশ (Indo Gangetic Plain)। শস্যশ্যামল এই সমতল প্রদেশই ভারতের রত্ন-ভাণ্ডার। কোন দেশে এইরূপ বিস্তৃত সমতল ভূমি নাই। সিন্ধু, গঙ্গা, ব্রহ্মপুত্র—এই তিনটি বৃহৎ নদী রূপার মত সাদা জল বুকে করিয়া নাচিতে নাচিতে নানা শাখা-প্রশাখার সহিত মিলিত হইয়া ভারতের এই সমতল ক্ষেত্রকে সুজলা সুফলা ও শস্যশ্যামলা করিয়া তুলিয়াছে। দেশ বিদেশে যে অন্ন বিতরিত হইতেছে—সে এই সমতল ক্ষেত্র-জাত। প্রাচীনকালে আর্য্যগণ এই দেশের বনে-বনে তপোবনের নিভৃত ছায়ায় বসিয়া কত জ্ঞান আলোচনা করিয়াছেন। এই শ্যামল ভূমি হইতেই শিল্প, বাণিজ্য জ্ঞান ও ধর্ম্মের বাণী প্রচারিত হইয়াছিল। ভারতের যাহা কিছু শ্রেষ্ঠ দান তাহা এই সমতল ভূমি হইতেই দেশে দেশে বিতরিত হইয়া ভারতের গৌরব প্রকাশ করিয়াছে।

এখানে আর একটা কথা বলিতেছি। তোমরা সিমলা পাহাড়ের নাম শুনিয়াছ। এই সিমলা পাহাড় হইতে দিল্লী পর্য্যন্ত একটি উচ্চভূমি (Ridge) আরাবল্লী পর্ব্বতশ্রেণী পর্য্যন্ত বরাবর চলিয়া গিয়াছে, এই উচ্চ ভূমিটি গঙ্গা ও সিন্ধু নদীর মধ্যে থাকিয়া ইহাদিগকে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। এই যে ভূখণ্ড, তাহার পূর্ব্বেই গঙ্গা নদীর প্রবাহ ক্ষেত্র বা **গাঙ্গেয় সমতল**। এইবার গঙ্গানদীর কথা বলিতেছি।

গঙ্গা ভারতের পুণ্য নদী। গঙ্গার তীরে ভারতের শ্রেষ্ঠ তীর্থক্ষেত্র, প্রধান প্রধান নগর ও শত শত বন্দর ও সমৃদ্ধ পল্লী শোভা পাইতেছে। এই নদীর দৈর্ঘ্য ১,৫০০ মাইল। একটি তুষার-গহ্বর হইতে গঙ্গার উৎপত্তি, সেই উৎপত্তি স্থানের নাম **গঙ্গোত্রী**। গঙ্গোত্রী ১০,৩০০ ফিট উচ্চ। গঙ্গোত্রীর পথের শোভা অনুপম। সেই কোন্ সুদূর দেশের পর্ব্বতময় প্রদেশের নিভৃত তুষার-ক্ষেত্রে তাহার জন্ম। সেস্থানের কথাই এখন বলিব।

তোমরা যুক্তপ্রদেশে প্রয়াগে ও কাশী প্রভৃতি স্থানে গঙ্গার যে প্রসার দেখিতে পাও, গঙ্গোত্রীর পথে অর্থাৎ তাহার জন্মভূমির কাছাকাছি কিন্তু এইরূপ বিরাট শোভা ও বিস্তার নাই। সেখানে চঞ্চল বালিকার মত তার ভাব। কোথাও চঞ্চল, কোথাও স্থির, কোথাও ব্যাকুল, কোথাও গম্ভীর। গঙ্গোত্রীর কাছে অনেক স্থানেই গঙ্গার



গঙ্গোত্রীর পথে গঙ্গা

গতি একেবারেই প্রখর নয়, ধীর মৃদুমন্দ গতি। সেই পথে গঙ্গার কেমন শোভা, তাহা গঙ্গোত্রীর গঙ্গার দুই তীরের চিত্র হইতেই বুঝিতে পারিবে। গঙ্গোত্রীর পথের দৃশ্য বড়ই মনোরম। কোথাও মুক্ত উপত্যকা,



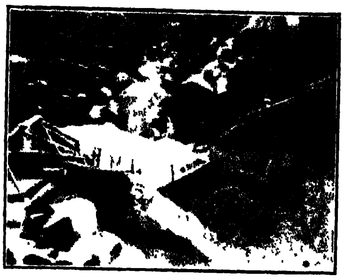
গঙ্গোত্রীর দক্ষিণ তীর

কোথাও পর্ব্বতশৃঙ্গে ঢাকা। পর্ব্বত-তরঙ্গ বহিয়া চলিয়াছে। গঙ্গোত্রীর চারিদিক বেড়িয়া বিচিত্র দৃশ্য বিদ্যমান। গঙ্গোত্রীর দক্ষিণতীরে একটি বেশ বড় মন্দির আছে। এক সময়ে এখানে একটি মাত্র মন্দির ছিল, এখন সেখানে ধর্ম্মশালা ও অনেক নূতন নূতন বাড়ী তৈরী হইয়াছে। দক্ষিণ



গঙ্গোত্রীর বাম তীর

তীরে একটি বেশ সমতল স্থান আছে। এখানে নদীর এপার ওপার হইবার জন্য একটি কাঠের তৈরী পুল রহিয়াছে, কিন্তু যখন বরফ গলিয়া গঙ্গার স্রোতোধারা প্রবল হইয়া উঠে, তখন কোথায় থাকে এই পুল! তখন গঙ্গার জলধারা



কাঠের পুল

ভীমবেগে নাচিয়া ছুটিয়া চলে। সত্য সত্যই—তখন প্রতীয়মান হয়ঃ—

থর থর করি কাঁপিছে ভূধর,
শিলা রাশি রাশি পড়িছে খ'সে,
ফুলিয়া ফুলিয়া ফেনিল সলিল
গরজি' উঠিছে দারুণ রোষে।

গঙ্গোত্রী হিন্দুদের একটি প্রধান তীর্থ। কিন্তু পথ নাই বলিলেই চলে। বদ্রীনাথে প্রতি বৎসর

অনেক গমনাগমন করেন, কিন্তু

গো-মুখী

প্রতি বৎসর বড় জোর দশ বারোজনের তীর্থযাত্রী যায় না। আর



যমুনোত্রী

তাঁহারাও বেশীর ভাগই সাধু সন্ন্যাসী। গোমুখীই হইতেছে গঙ্গার বা ভাগীরথীর প্রকৃত উৎস। এখানেই গঙ্গোত্রীর তুষার-নদীর অবসান হইয়াছে। গঙ্গোত্রীর এই তুষার নদীর পথের দুই দিকে কোথাও কোথাও হিমকিরীটমণ্ডিত গগনস্পর্শী শিখর, সেই



গৌরীকুণ্ড—গঙ্গোত্রী

তুষার-নিঃসৃত জলধারা বহিয়া চলিয়াছে—তাহার স্পর্শে উপত্যকাভূমি সিক্ত হইয়া উঠিতেছে, আবার সেই জলকণা কোথায় কোন্ অজ্ঞাত দুইটি পর্ব্বতের আড়ালে যাইয়া অদৃশ্য হইয়াছে। আবার কোথাও তুষারগিরি ভেদ করিয়া জলপ্রবাহ বিপুল বেগে সহস্র সহস্র হস্ত নিম্নে চলিয়া গিয়াছে। বামে, দক্ষিণে, সম্মুখে, পশ্চাতে ঊর্দ্ধে নিম্নে যে দিকে তাকাও, দেখিবে সর্ব্বত্র তুষারাকীর্ণ। তুষারাবৃত শৈলরাশির অন্তরালে আমাদের এই পৃথিবী একেবারে অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে। গঙ্গোত্রীর পথে যতই অগ্রসর হইবে ততই দেখিতে পাইবে—গঙ্গা ধবলগিরিশ্রেণীর উচ্চতম শৃঙ্গ হইতে জয়যাত্রা করিয়াছে। কোথাও সে পর্ব্বতের দেহ ভেদ করিয়া পাষাণস্তূপ বুকে



গো-মুখী

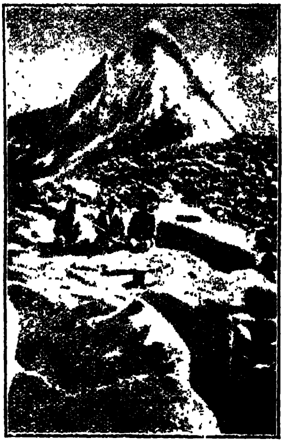
লইয়া ছুটিয়া আসিয়াছে, কোথাও বা নীরব নিথর ভাবে রজত-সূত্রের মত তার গতি। এই পথে নন্দাদেবী, ত্রিশূল, উদয়গিরি প্রভৃতি হিমাদ্রির চির সুন্দর ধবলশিখর চোখে পড়ে। এই সব



গঙ্গোত্রীর তুষার-নদীর পরিসমাপ্তি

ধবল চূড়ায় যখন অরুণ-জ্যোতিঃ ফুটিয়া উঠে—তখন মনে হয় কে যেন তাহাদের শিখরে জ্যোতিঃ-মুকুট পরাইয়া দিয়াছে। এই পথে অলকানন্দা

উপত্যকা সব্ব শোভার সার। এখানে গাছে গাছে ফুল। কোথাও কোথাও বহুস্থান ব্যাপিয়া প্রকৃতি এখানে পুষ্পশয্যা রচনা করিয়াছেন। যমুনা উপত্যকা ও পুষ্পসম্ভারে এবং সবুজ সৌন্দর্য্যে সুষমা-মণ্ডিত। যমুনোত্রীর উষ্ণ প্রস্রবণ বিশেষ বিখ্যাত। প্রসঙ্গক্রমে এইখানে **যমুনোত্রীর** কথা বলিলাম। যেখানে গঙ্গোত্রীর পথের তুষার নদীর পরিসমাপ্তি, সেখানে একটি ছোট কুণ্ড আছে। কুণ্ডটির নাম **গৌরীকুণ্ড**। কুণ্ডের জল যেমন পরিষ্কার তেমনি উষ্ণ ও



উদয়গিরি—গঙ্গোত্রী

আরামপ্রদ। তুষার নদীর যেখানে শেষ হইয়াছে, সেস্থানে বৃহদাকার একটি গহ্বর, সেই গহ্বর বা মুখকেই গো-মুখের আকৃতির মত দেখিতে বলিয়া উহার নাম হইয়াছে, **গো-মুখ** বা **গো-মুখী**। এই গোমুখ হইতে তুষারকণা তরলাকৃতি ধারণ করিয়া ক্ষুদ্র সরিতে পরিণত হইয়াছে। এই সরিত পর্ব্বতের অস্থিচূর্ণ বহন করিয়া গিরিদেশ অতিক্রম করিয়া বহুল সমৃদ্ধ নগর ও জনপদের মধ্য দিয়া সাগরোদ্দেশে প্রবাহিত হইয়াছে।

গঙ্গোত্রীর তুষার নদী দৈর্ঘ্যে প্রায় কুড়ি মাইল হইবে। তুষার-কণার প্রতিনিয়ত মিশ্রণের ফলে গোমুখীর গঙ্গার জল অত্যন্ত শীতল। গোমুখীর দেড়ক্রোশ দূরবর্ত্তী একটি উচ্চ শৃঙ্গে আরোহণ করিলে তুষার নদীর দৃশ্য অতি সুন্দরভাবে নয়ন সমক্ষে প্রতিভাত হইয়া উঠে। ঐ পর্ব্বত শৃঙ্গটির



স্বর্গারোহণ—গোমুখী

উচ্চতা হইবে প্রায় ১৫,০০০ ফিট। এই পর্ব্বত শ্রেণীর একটি শিখরের নাম উদয়গিরি। উদয়গিরি শিখরে আরোহণ করিলে পর গঙ্গোত্রীর তুষার নদীর গতি-প্রবাহ তরল রজতধারার মত দেখিতে পাওয়া যায়। কোথাও কুজ্ঝটিকায় আচ্ছন্ন গিরিশিখর, যেমন কুজ্ঝটিকা সরিয়া গেল, অমনি শুভ্র গিরিশৃঙ্গ ঝলমল করিতে থাকে। উদয়গিরির পূর্ব্বোত্তর দিকে **স্বর্গারোহণ শৃঙ্গ** দেখা যায়, এই পথেই একদিন পাণ্ডবেরা মহাপ্রস্থানের পথে অগ্রসর হইয়া যুধিষ্ঠির ব্যতীত সকলে মৃত্যুকে আলিঙ্গন



গোমুখী হইতে স্বর্গারোহণের দৃশ্য

করিয়াছিলেন। উদয়গিরির দক্ষিণ পূর্ব্ব দিকে কয়েকটি উচ্চ তুষার শৃঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ঐ পর্ব্বত শিখরের নাম—**বৈজয়ন্তী**। কিন্তু উদয়গিরি

শিখর হইতে দক্ষিণদিকে দৃষ্টিপাত করিলে তুষার নদীর যে অনুপম দৃশ্য দেখা যায় তাহা বস্তুতঃই অতুলনীয়। মনে হয়, যেন একটী শ্বেত অজগর সর্প আঁকিয়া বাঁকিয়া হিমালয়ের উচ্চশিখর হইতে সমতল ভূমির দিকে চলিয়াছে। আর দূরে দূরে ২৩,০০০ ফিট উচ্চ ধবল তুষারশৃঙ্গ নীল আকাশের সহিত মিশিয়া গিয়াছে।—তারপর হরিদ্বারের পথে গঙ্গা সমুদ্রে মিশিবার জন্য অশ্রান্ত গতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে, সে গতির বিরাম নাই, সে গতির শেষ নাই। সে কথা পরে শুনিবে।

এখানে প্রসঙ্গক্রমে যমুনোত্রীর কথা একটু বলিব। পূর্ব্বে সামান্য একটু বলিয়াছি। মুশৌরী হইতে তিহিরির দূরত্ব ৪০ মাইল মাত্র। ধগু তিহিরি হইতে ২৬ মাইল দূরে অবস্থিত। ধগু হইতে দুইটি পথ দুই দিকে চলিয়াছে, প্রশস্ত ও সুন্দর পথটি চলিয়াছে গঙ্গোত্রীর দিকে, অপর সঙ্কীর্ণ পথটি চলিয়াছে যমুনোত্রীর দিকে। যমুনোত্রীর এই পথটি ক্রমশঃই খাড়াই হইয়া উচ্চ পর্ব্বতশ্রেণীর দিকে চলিয়াছে। এই পথের দুই দিকের দৃশ্যের গাম্ভীর্য্য ও সৌন্দর্য্যে সকলের চিত্ত মুগ্ধ হইয়া উঠে। পথের দুই পাশে ঘনবিন্যস্ত তরু শ্রেণী ও পুষ্পিত লতাপল্লবের মাধুরী নয়ন মন মুগ্ধ করিয়া থাকে। দুই দিকের পাহাড় অনেক সময় পরস্পর সংলগ্ন। শৈলশ্রেণী শৈবালে সমাচ্ছন্ন। এই সঙ্কীর্ণ গিরিপথে চলিতে চলিতে অবশেষে গাঙ্গনানি বা গঙ্গনানি (Gangnani) নামক স্থানে যমুনার সলিলধারা এই পথে উৎস পথে অগ্রসর হইয়াছে। এখানে একটি প্রকাণ্ড প্রস্রবণ আছে। প্রস্রবণের সলিলধারা মৃত্তিকা হইতে উৎসারিত হইতেছে, তাহার ফলে একটি ক্ষুদ্র কুণ্ডের আকারে পরিণত হইয়াছে। স্থানীয় লোকের ধারণা এই প্রস্রবণের জল গঙ্গানদী হইতে আসিয়াছে। কিছু দূরে যমুনাচটি এই চটি পুজার নামক গ্রামের কাছে অবস্থিত। এখান হইতে যমুনা পার হইলে পর যমুনোত্রীর দিকে যে পথ চলিয়া গিয়াছে, সে পথকে 'একপেয়েপথ' বলিলে অত্যুক্তি হয় না। এই পথের সৌন্দর্য্য অতি মনোরম। হিমালয়ের পর্ব্বতমূলে যমুনা বহিয়া গিয়াছে। দুইদিকে শ্যামল তরুশ্রেণী ও নানাজাতীয় উদ্ভিদ্ শোভা পাইতেছে। আর পথের দুইদিকেই অনেকগুলি জলপ্রপাত থাকায় এই পথের সৌন্দর্য্য বহুল পরিমাণে বৃদ্ধি পাইয়াছে। এই পথে কয়েক মাইল অগ্রসর হইলেই একটি কাঠের পুল পার হইলে পর আবার বামতীর ধরিয়া অনেকদূর চলিলে পর যমুনা ও অলকানন্দার স্ফটিকস্বচ্ছ নীল বারিরাশি যমুনার নির্ম্মল স্রোতোধারার সহিত মিলিত হইয়াছে। বর্ষার সময় অলকানন্দার জল কর্দ্দমাক্ত হইয়া পড়ে। যমুনার জল স্বভাবতঃই নির্ম্মল ও নীল।

খারশালি নামক স্থান হইতে যমুনোত্রী মাত্র চারি মাইল দূরে অবস্থিত। এখানে যমুনা অতি সঙ্কীর্ণকায়া কিন্তু স্রোতোধারা অত্যন্ত প্রখর। যতই যমুনোত্রীর কাছাকাছি আসা যায়, ততই বনশ্রেণী ঘনসন্নিবিষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যমুনোত্রীর একটু উপরে একটি উপত্যকা আছে। ঐ পথ অতি বিশ্রী রকমের, অতি কষ্টে ভীষণ খাড়াই বাহিয়া উপরে উঠিতে হয়। যমুনোত্রীর এই উপত্যকার উপর একটি ক্ষুদ্র মন্দির, ধর্ম্মশালা এবং যাত্রীদের থাকিবার জন্য তিন চারি খানি কুঁড়ে ঘর আছে। সম্প্রতি একটি নূতন মন্দির নির্ম্মিত হইয়াছে। এখানে অনেকগুলি উষ্ণ প্রস্রবণ আছে। সর্ব্বাপেক্ষা বিখ্যাত উষ্ণপ্রস্রবণটির নাম সূর্য্যকুণ্ড। যমুনোত্রীর উচ্চতা ৯,৯০০ ফিট।

[আমরা এই প্রবন্ধের চিত্রগুলির জন্য লাহোর বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক শিবরাম কাশ্যপের নিকট ঋণী। তিনি তাঁহার জীবিতকালে এই চিত্রগুলি ব্যবহার করিবার জন্য অনুমতি দিয়াছিলেন। তাঁহার জীবিতকালে 'শিশু-ভারতীতে' ইহা প্রকাশ করিতে না পাবায় একান্ত দুঃখের কারণ হইয়াছে। কাশ্যপ মহোদয় উদ্ভিদবিদ্যা সম্বন্ধে একজন বিশেষজ্ঞ সুপণ্ডিত ব্যক্তি ছিলেন; এবং তিনি এজন্য কয়েকবার হিমালয়ের দুর্গম অরণ্য প্রদেশে গমন করেন, সে-সময়ে তিনি এ সমুদয় আলোকচিত্র গ্রহণ করিয়াছিলেন।]



অগ্নির বিভিন্ন রূপ

২২৬৯ পৃষ্ঠার পর

আগুন সম্বন্ধে অনেক কথা প্রসঙ্গক্রমে বায়ু অধ্যায়ে বলা হইয়াছে। বাতাসে আগুন কেন জ্বলিয়া ওঠে, চুল্লী ও চিমনি কি কাজ করে, আগুন ঢাকিয়া দিলে বা তাহার উপর জল ঢালিয়া দিলে বা ক্ষীণ শিখার উপর ফুৎকার দিলে তাহা কেন নিবিয়া যায়, এই সকল ও বহুবিধ বিষয় সেই অধ্যায়ে আলোচিত হইয়াছে। দাহে সাধারণতঃ কি ঘটিয়া থাকে ও কাষ্ঠের দাহে কি কি বস্তু সৃষ্টি হয় তাহাও তোমরা জান। যদি মনে না থাকে তাহা হইলে 'বায়ু' প্রবন্ধটি আবার পড়িয়া লও।

এখন আমরা শিখা সম্বন্ধে আলোচনা করিব। অনেক দাহ্য বস্তু আছে যাহা উত্তাপে প্রথমে গ্যাস বা বায়বীয় অবস্থায় পরিণত হয়। জ্বলিত পলিতার মুখে তৈল এইরূপ গতি প্রাপ্ত হয় এই দহনশীল গ্যাস উত্তপ্ত অবস্থায় ঊর্দ্ধে উত্থিত হইতে থাকায়, উহার অগ্নি শিখারূপে প্রতীয়মান হয়। আকৃষ্ট বাতাসের আবর্ত্তে তাহা লেলিহান হইয়া দুলিতে থাকে। বিশৃঙ্খল আবর্ত্তে, দাহক্রিয়ার অসম্পূর্ণতায়, গ্যাসের কতকাংশ ভাঙ্গিয়া তাহার ভিতরকার অঙ্গার নামক পদার্থ ধূমরূপে বাহির হয়। চিমনির দ্বারা, আকৃষ্ট বাতাসের ও নির্গত উত্তপ্ত বাতাস ও অঙ্গারায় গ্যাসের প্রবাহ সুশৃঙ্খলিত হয়, দাহ ধূমহীন ও তেজীয়ান হইয়া ওঠে।

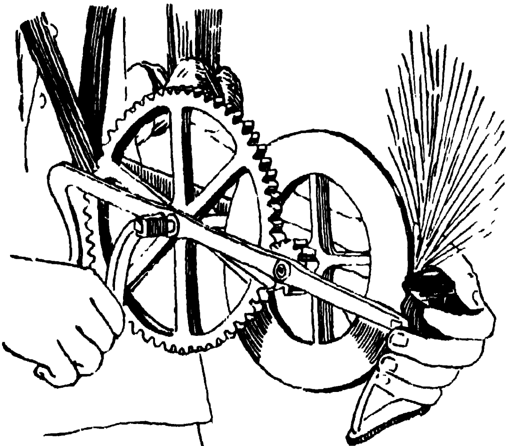
অঙ্গারকণার জন্য সাধারণ শিখার পীতবর্ণ হয়; অঙ্গারকণা উত্তপ্ত অবস্থায় সাধারণতঃ এই আভা বিকীর্ণ করে।

লক্ষ্য করিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে শিখার আকার উপর দিক সরু জিহ্বার মত। তাহার কারণ আর কিছুই নয়, গ্যাস যেমন যেমন বাহির হয়, তাহার যে স্তর বাতাসের সহিত স্পৃষ্ট, অর্থাৎ বাহিরের স্তর, সেই স্তরে প্রথমে দাহ আরম্ভ হয় ও সেইজন্য ভিতরের স্তরকে বাতাসের সহিত স্পৃষ্ট হইবার জন্য বাহিরের শিখার উচ্চতা অতিক্রম করিয়া আরও কিছু উপরে উঠিতে হয়; আবার আরও ভিতরের গ্যাসকে দ্বিতীয় স্তরের শিখার উচ্চতা অতিক্রম করিয়া আরও উপরে উঠিতে হয় এইরূপে সমস্ত শিখাটি নিম্ন হইতে ঊর্দ্ধদিকে সূচাগ্র হইয়া ওঠে। দীপের শিখা দেখিলে ইহা বেশ বুঝিতে পারিবে।

আরও একটি বিষয় শিখিয়া রাখ; যেখানে দাহ, মাত্র সেইখানে অগ্নি থাকায়, শিখার ভিতরটা অগ্নিগর্ভ হইতে পায় না। শিখার ভিতর একটি

কাঠি প্রবেশ করাইয়া ও তৎক্ষণাৎ তাহা বাহিরে আনিয়া দেখিলে দেখিতে পাইবে যে কাঠির যে অংশ শিখার সহিত স্পৃষ্ট ছিল, মাত্র সেই অংশই দগ্ধীভূত হইয়াছে, কিন্তু যে অংশ শিখার কেন্দ্রে ছিল তাহা দগ্ধীভূত হয় নাই। শিখার ভিতর একখানি কাগজ তাড়াতাড়ি প্রবেশ ও বাহির করাইয়া লইলেও, কাগজে গোলাকার দাহের দাগ পড়ে, বৃত্তের ভিতরটা দগ্ধ হইতে পায় নাই দেখা যায়। শিখা বিভিন্ন তাপবিশিষ্ট স্তর সমষ্টি।

দাহ্য পদার্থ কাহাকে বলে তাহা বুঝিতে পারিয়াছ। ইহারা মোটামুটি কয় রকমের তাহার

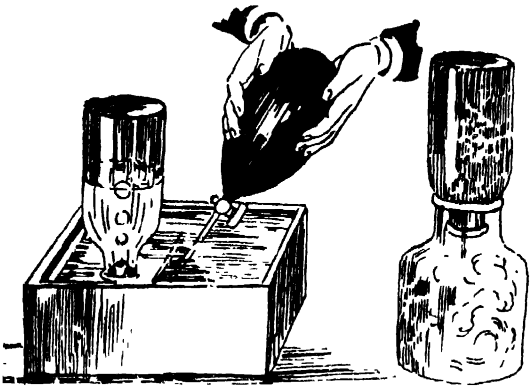


চক্‌মকির কল

দু'এক কথা এইবার বলা যাক। পদার্থ তিন প্রকারের—কঠিন, তরল ও বায়বীয়। কাঠ, কয়লা, খড়, কাগজ ও কাপড়—ইহাদিগকে কঠিন পদার্থ বলা হয়। এই সকল দাহ্য পদার্থের ভিতর কয়লা ব্যবহারে প্রথম স্থান অধিকার করে। কয়লার খ্যাতি কে না জানে? এঞ্জিন বলিলেই সঙ্গে সঙ্গে কয়লার ছবি মনে ফুটিয়া ওঠে। কয়লা যে কাঠ তাহা বোধ হয় তোমরা জান না। ইহা আদিম যুগের কাঠ; আদিম যুগের বিরাট গাছ গাছড়া মাটির নীচে পড়িয়া যুগযুগান্তরে কয়লা হইয়া গিয়াছে। কয়লার ইতিহাস, কয়লার উত্তোলন ও কারবার এক বিরাট ব্যাপার। তোমরা রাণীগঞ্জ, ঝরিয়া ইত্যাদি স্থানে কয়লার খনি দেখিয়াছ কি? নীচে পাতালপুরী; সেই পাতালপুরীতে যাইবার জন্য উপরের মঞ্চ হইতে যাইবার বন্দোবস্ত থাকে। পাতালপুরীর ভিতর যন্ত্রের দ্বারা কয়লা কাটা হয় ও শত শত লোক নানাবিধ কাজে ব্যস্ত থাকে। যাহাতে কোনও বিপদ না ঘটে কয়লার গ্যাসে আগুন না লাগিয়া যায়, ফাটাল দিয়া জল নির্গত হইয়া ভিতর প্লাবিত না করিয়া ফেলে, তাহার কত বন্দোবস্ত থাকে, কিন্তু তবুও সময় সময় ভয়ানক ভয়ানক বিপদ ঘটিয়া যায়। সম্প্রতি ঝরিয়া অঞ্চলে এইরূপ দুই একটি ভীষণ দুর্ঘটনা ঘটিয়া বহু লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

কয়লা ও কয়লার খনির কথা এখানে কিছুই বলা হইল না; তবে আগুন লাগা সম্বন্ধে এখানে একটি কথা বলা আবশ্যক মনে করি। খনির ভিতর প্রদীপ লইয়া গেলে অনেক সময় কয়লা হইতে নির্গত গ্যাসে আগুন লাগিয়া যায়। যখন আলোর জন্য মাত্র প্রদীপেরই বন্দোবস্ত ছিল, তখন একসময় এইরূপে অনেক অগ্নিকাণ্ড ঘটিয়াছে। একজন বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া দেখিলেন যে, খনিতে সচরাচর যে ভাবে গ্যাস থাকে, আগুনের ফিন্‌কিতে তাহা জ্বলিয়া উঠে না। তাই তিনি বড় একটি চক্‌মকির কল করিলেন। কলটি আর কিছুই নয়, কেবল একটি ইস্পাতের চাকা। এই ইস্পাতের চাকাটি অপর 'দাঁড়াদার' চাকার সহিত সংলগ্ন। 'দাঁড়াদার' চাকাতে হাতল আছে। সেই হাতলটি ঘুরাইলেই 'দাঁড়াদার' চাকাটি ঘুরিতে থাকে। একটি বালকের কোমরে এই কল বাঁধা থাকিত। দক্ষিণ হস্তে সে হাতল ধরিয়া চাকা ঘুরাইত, বামহস্তে একখানি চকমকির পাথর রাখিয়া সেই ইস্পাতের চাকার মুখে ধরিত। ইস্পাত ও পাথরের সংঘর্ষণে

আগুনের ফিন্‌কি বাহির হইত। ভয়াবহ জায়গায় খনিতে লোকে সেই আলোকে কাজ করিত। কিন্তু ইহাতেও বিপদ ঘটিত। ইহার নিবারণের জন্য মনিষী ডেভি (Davy) একরূপ প্রদীপ নির্ম্মাণ করেন যাহার দ্বারা হঠাৎ আগুন লাগিয়া যাওয়া প্রশমিত হইয়াছিল! ডেভি খনির গ্যাসটি প্রকৃত কি, কি কি পদার্থে ইহা সংঘটিত, ইহার গুণ কি, কি ভাবে থাকিলে ইহা প্রজ্জ্বলিত হয়, কি ভাবে থাকিলে ইহাতে আগুন লাগে না, নানারূপ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা তিনি ইহা স্থির করিয়া এক প্রকার প্রদীপ প্রস্তুত করিলেন। এইরূপ প্রদীপকে বিপদ নিবারক (safety lamp)



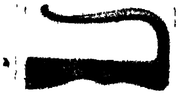
গ্যাস পরীক্ষা

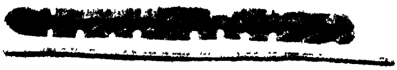
প্রদীপ বলা হয়। প্রদীপটি ঠিক একটি জালের খাঁচার মত; জালের আবরণী থাকায় জ্বলিবার কোন ব্যাঘাত ঘটিতে পায় না; জালের ভিতর দিয়া বাহিরের বাতাস ভিতরে ও ভিতরের দাহ্য উৎপন্ন গ্যাস বাহিরে আসিতে পায়, কিন্তু জালের জন্য, ভিতরে আগুন জ্বলিয়া উঠিলেও বাহিরে তাহা ফুটিয়া বাহির হইতে সমর্থ হয় না। ধাতব জাল তড়িৎ-তাপবাহ হওয়ায় অগ্নি সৃষ্ট স্থান গরম হইয়া উঠিতে পায় না; কাজেই দাহ্য গ্যাসের ভিতর এইরূপ প্রদীপ লইয়া যাইলেও কোন ক্ষতি হয় না। দাহ্য গ্যাস ভিতরে যাইয়া জ্বলিতে থাকিবে বটে, কিন্তু শিখা বাহিরে ফুটিয়া আসিতে না পারায়, বাহিরের গ্যাস তাহার জ্বলনাঙ্কের নীচেই থাকিয়া যায়। কাজেই বাহিরের গ্যাসে আগুন লাগিতে পায় না। দেখ, বিজ্ঞানবলে, কিরূপে মানুষ বিপদকে দূরে রাখিতে সমর্থ হইয়াছে। প্রদীপ শিখার উপর এইরূপ একখণ্ড জাল চাপিয়া ধর, দেখিবে শিখা জালের উপর ফুটিয়া উঠিতে সমর্থ হইবে না।

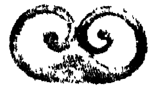
এতদিন পরে খনির গ্যাস পরাজিত হইল। কেবল পরাজিত হইল না, সেই ঘোর শত্রু দাস হইয়া, বাতির ভিতর প্রবেশ করিয়া আপনি পুড়িয়া মজুরদিগকে আলোক প্রদান করিতে লাগিল। ডেভির বন্ধুগণ তাঁহাকে বলিলেন,—"আপনি ইহার পেটেন্ট লউন, তাহা হইলে আপনি বড় মানুষ হইয়া যাইবেন।" ডেভি বলিলেন,—"আমার খাইবার পরিবার ভাবনা নাই। বেশী টাকাকড়ি হইলে আমার মনে উদ্বেগ জন্মিবে। ধন হইলে, আমার যশও বাড়িবে না, মনের সুখও বাড়িবে না।' যে সময়ে ডেভির ল্যাম্প সব কয়লার খনিতে ব্যবহৃত হওয়ায় কয়লার খনিতে আগুন লাগা প্রায় একেবারেই বন্ধ হইয়া গিয়াছিল।

তোমরা অশুই ইহা ভাবিও না যে ডেভির প্রদীপ লইয়া দাহ্য গ্যাসের ভিতর যতক্ষণ ইচ্ছা থাকিতে পারা যায়। ক্রমেই জাল গরম হইয়া উঠিলে তাহা শিখার বাহিরে আসা আর প্রতিরোধ করিতে পারে না। তবে প্রদীপের ভিতর দাহ্য গ্যাস জ্বলিতে আরম্ভ করিলেই, লোকেরা সাবধান হইয়া তৎক্ষণাৎ বাহিরে চলিয়া আসে ও প্রদীপাদি নিবাইয়া দিয়া খনিটিকে নিরাপদ করিবার তদ্বিরে প্রবৃত্ত হয়। আজকাল বৈদ্যুতিক আলোক হইয়া এইরূপ দীপের প্রচলন উঠিয়া গিয়াছে, কারণ বৈদ্যুতিক আলোক কাচের ভিতরে জ্বলে; তাহার জ্বলিবার জন্য তাহার কাচের গোলকে কোনও ছিদ্রাদি রাখিবার

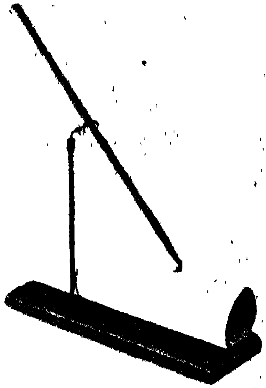
মানুষের আগুন সৃষ্টি


অগ্নি ইস্পাত—ইংল্যাণ্ড

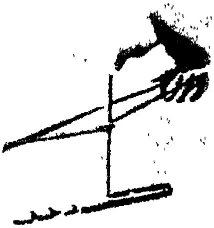

মধ্য আফ্রিকার অগ্নি যন্ত্র

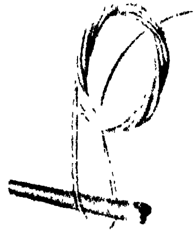

প্রাচীন অগ্নি ইস্পাত- চীন


অগ্নি প্রস্তর- নরওয়ে

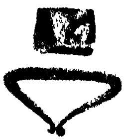

প্রশান্ত মহাসাগরের অগ্নি লাঙল


পারসিক অগ্নি ইস্পাত


এস্কিমোদের অগ্নি যন্ত্র

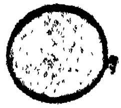

পাপুয়ার অগ্নি করাত


অগ্নি যন্ত্র


সিরিয়া


অগ্নি ইস্পাত—স্পেন


অগ্নি ইস্পাত জার্মান


আতস কাচ

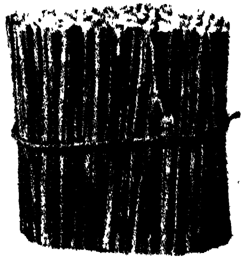

সুইস- আগুন ইস্পাত


রুশ আগুন ইস্পাত


আগুন ইস্পাত স্পেন


ভারত মহাসাগরের অগ্নি যন্ত্র


এস্কিমোদের অগ্নি যন্ত্র



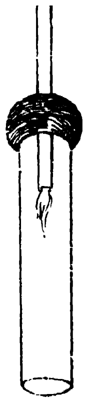

আলবেনিয়ান চকমকি

গন্ধক দিয়াশলাই- বিলাতি

গন্ধক দিয়াশলাই—ফরাসী

গন্ধক দিয়াশলাই চীন

প্রয়োজনই হয় না, দাহ্য গ্যাসের অগ্নিস্পৃষ্ট হইবার কোনও সম্ভাবনা থাকে না। ডেভির ল্যাম্পের পর একে একে আরও অনেক রকমের বাতি আবিষ্কৃত হইল যেমন (১) ঝুলাইবার উপযোগী, (১) প্রাচীরে লাগাইবার উপযোগী, (৩) মাথায় পরিয়া কাজ করিবার উপযোগী এইরূপ অনেক। এখানে তাহার চিত্র দিলাম।



প্রথম সেফটি ল্যাম্প

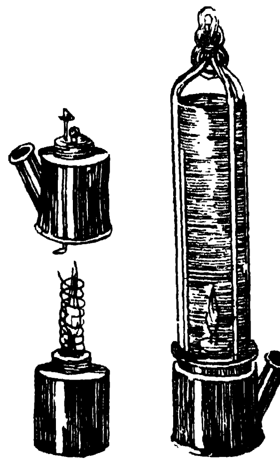
কঠিন দাহ্য বস্তুর আলোচনায় অনেক কথা বলিলাম, এখন অন্যান্য দাহ্য বস্তুর আলোচনা করা যাক্।

তরল দাহ্য বস্তুর ভিতর কেরোসিন তৈল একটি বিখ্যাত বস্তু। কেরোসিনও মাটির ভিতর পাওয়া যায়। যেস্থানে এই তৈলের খনি থাকে কূপের মত মাটির ভিতর গভীর ছিদ্র করিয়া এই তৈল বাহির করা হয়। নিষ্ক্রান্ত তৈল ঠিক কেরোসিন নহে, তাহাকে কাঁচা পেট্রোলিয়াম বলা হয়। নানাবিধ উপায়ে তাহা হইতে অনেক প্রকারের পদার্থ বাহির করা হয়। মোটর গাড়ীতে যে পেট্রোলিয়াম তৈল ব্যবহৃত হয়, তাহাও বেনজাইন, কেরোসিন, যন্ত্রাদি মসৃণ করিবার তৈল, ভেসেলিন, রাস্তা নির্ম্মাণ করিবার পিচ্ নামক ঘন বস্তু প্রভৃতি বহুবিধ পদার্থ কূপ নিষ্ক্রান্ত উপরি উক্ত কাঁচা মালের সংস্কারে পাওয়া যায়। এখানে এবিষয়ে আর কিছু বলা হইল না, তোমরা বড় হইয়া রসায়ন পুস্তকে অনেক কথাই শিখিতে পারিবে।

তিল, তিসি, নারিকেল ইত্যাদির তৈলও তরল দাহ্য বস্তুর উদাহরণ। কেরোসিনকে যদিও তৈল বলা হয় কিন্তু বিজ্ঞান ইহাকে তৈল বলে না; তবে দেখিতে তৈলের ন্যায় বলিয়া ইহাকে লোকে তৈল বলিয়া থাকে।

তৃতীয় প্রকারের অর্থাৎ বায়বীয় দাহ্য বস্তুর উদাহরণে কয়লার খনির গ্যাস বা কয়লা বা কাঠ হইতে মানুষ যে গ্যাস বাহির করে, তাহার দৃষ্টান্ত দেওয়া যায়। কোনও পাত্রের ভিতর কয়লা গরম করিলে তাহা পুড়িয়া ছাই হইয়া যায় না, তবে তাহা হইতে এক প্রকার দাহ্য গ্যাস বাহির হইতে থাকে। কয়লা হইতে এইরূপ ভাবে গ্যাস প্রস্তুত করিবার বড় বড় কারখানা আছে। অনেক সহরে গ্যাসের আলোর বন্দোবস্ত আছে। রাস্তার নীচে কলের জলের পাইপের মত পাতা থাকে, সেই নলে রাস্তার বিভিন্ন আলোকস্তম্ভে এই গ্যাস লইয়া যাওয়া হয় ও এই গ্যাস জ্বালাইয়া রাস্তা আলোকিত করা হয়।

কয়লা হইতে যে গ্যাস বাহির করা হয়, অবশ্য তাহাই সেইরূপ অবস্থায় ব্যবহৃত হয় না। পেট্রোলিয়ামের মত তাহাকে সংস্কৃত ও বিশুদ্ধ করা হয়। এখানেও এইরূপ সংস্কারে কাঁচামাল হইতে বহুবিধ বস্তু পাওয়া যায় তাহাদের কয়েকটি, যথা অ্যামোনিয়া, গন্ধক ইত্যাদি পদার্থ সমূহের নানাবিধ যৌগিক বস্তু, ন্যাপথালিন ও আলকাতরার নাম এখানে করা যাইতে পারে। অ্যামোনিয়া বা



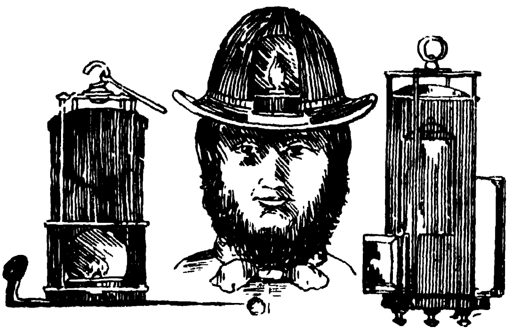
ডেভির প্রথম সেফটি ল্যাম্প

ন্যাপথালিন তোমাদের অপরিচিত নহে; গরম কাপড়ে যাহাতে পোকা না ধরে তাহার জন্য ন্যাপথালিন নিশ্চয়ই তোমাদের বাড়ীতে ব্যবহৃত হয়। আলকাতরাকে কে না চেনে? অনেকেই তাহা জানালা দরজা ও কড়িকাঠে ব্যবহার করে। তোমরা ইহাকে বোধ হয় একটি ঘৃণ্য বস্তু বলিবে।

কিন্তু জানিয়া রাখ, এই আল্‌কাতরা সত্যই স্বর্ণ-প্রসূ। রাসায়নিকের হাতে ইহা কামধেনু স্বরূপ। ইহা হইতে এত প্রকারের রাসায়নিক দ্রব্য রং, ঔষধ, গন্ধদ্রব্য ও বিস্ফোটক প্রস্তুত হইয়াছে যে তাহা গণনায় শেষ করা যায় না। এখনও ইহা হইতে কত না প্রকারেরই দ্রব্য প্রস্তুত হইতেছে ও কত না প্রকারেরই হইবে তাহা কে বলিতে পারে? এই রাসায়নিক কামধেনুর দুগ্ধে আমাদের সভ্যতা বস্তুতই বহুপ্রকারে পুষ্টিলাভ করিতেছে।

কোন্ বস্তুর দাহ হইতে কিরূপ তাপ পাওয়া যায় তাহার দু'এক কথা এখানে বলিয়া রাখা যাক্। এক গ্র্যাম ওজনের জলকে এক সেন্টিগ্রেড ডিগ্রি উত্তপ্ত করিতে যে তাপের প্রয়োজন হয়, বৈজ্ঞানিকেরা তাহাকে এক ক্যালরি বলেন। কোন্ প্রক্রিয়ায় কত তাপ পাওয়া গেল, তাহার পরিমাণ এই মাপকাঠি দিয়া করা হয়। সেই অনুসারে কয়েকটি পরিচিত বস্তুকে উদাহরণ লইয়া, প্রত্যেকটির এক গ্র্যাম দগ্ধ করিলে, কতটা তাপ পাওয়া যায় তাহার একটা মোটামুটি নির্দ্দেশ দিলাম।

একগ্র্যাম হাইড্রোজেন জ্বালাইলে ৩৪৫০০ ক্যালরী তাপ পাওয়া যায়, এক গ্র্যাম গন্ধক পোড়াইলে ২২০০, এক গ্র্যাম কেরোসিন পোড়াইলে ১০০০০, এক গ্র্যাম কাঠ পোড়াইলে ৫০০০, এক গ্র্যাম কয়লায় ৮০০০ ও এক গ্র্যাম স্পিরিট পোড়াইলে ৫০০০ ক্যালরি তাপ পাওয়া যায়, হাইড্রোজেনের দাহে অত্যধিক তাপ পাওয়া যায়, সেইজন্য অত্যধিক তাপ পাইতে হইলে বৈজ্ঞানিক অনেক ক্রিয়ায় হাইড্রোজেন শিখা ব্যবহৃত হয়।



নানারূপ সেফটি ল্যাম্প

তাপ বা দাহ সম্বন্ধে তোমাদের ধারণা নিশ্চয়ই এখন অনেকটা পরিষ্কার হইয়াছে। এই দাহ সম্বন্ধে লোকেদের মনে পূর্ব্বে এক অদ্ভুত ধারণা ছিল। এমন কি তখন পণ্ডিতেরাও ভাবিতেন যে দাহ্য পদার্থে একটি বিশিষ্ট বস্তু থাকে। সেই বস্তুটির নাম তাঁহারা ফ্লজিষ্টন দিয়াছিলেন। অনেক ধাতব বস্তুর ভস্ম, কয়লার সহিত উত্তপ্ত করিলে আবার সেই বস্তু পাওয়া যায়, ইহা দেখিয়া তাঁহারা ভাবিয়াছিলেন যে দাহে ফ্লজিষ্টন বাহির হইয়া যায়, ও ভস্মবৎ যাহা পড়িয়া থাকে তাহাতে কয়লা প্রভৃতি হইতে ফ্লজিষ্টন আনিয়া দিলে, ভস্ম ও ফ্লজিষ্টন মিলিয়া ধাতুটি পুনরায় উৎপাদন করে। কিন্তু ধাতু হইতে ধাতুভস্ম ভারি ইহা শীঘ্রই ধরা পড়িল। তখন তাঁহারা বলিয়া বসিলেন যে ফ্লজিষ্টন সাধারণ দ্রব্যের মত নহে, পৃথিবী তাহাকে আকর্ষণ করে না, বরং ঠেলিয়া ফেলিয়া দেয়, কাজেই ফ্লজিষ্টনহীন ভস্ম ফ্লজিষ্টন বিশিষ্ট ধাতু হইতে ভারি হয়।

অক্সিজেন আবিষ্কারের পর মনিষী ল্যাভয়সিয়ে নিজ পরীক্ষা বলে দাহের প্রকৃত তথ্য নিরূপণ করিয়া এই অদ্ভুত তথ্য উড়াইয়া দিলেন। দাহে বস্তু অক্সিজেনের সহিত যুক্ত হয় কাজেই যাহা কিছু প্রস্তুত হউক না কেন তাহা মূল বস্তু হইতে ভারি হইবে তাহাতে আর বিচিত্র কি?

আচ্ছা মোমবাতি পুড়িতে থাকিলে তাহা নিরুদ্দেশ হইতে থাকে, তাহা ত কই ভারী হইয়া উঠে না? কিন্তু মোমবাতির ভস্ম ত কঠিন পদার্থ নহে যে তাহা সহজে ধরিয়া দেখাইয়া দেওয়া যাইবে যে বক্রী বাতি ও ভস্ম পূর্ব্বেকার মোমবাতি হইতে ভারি হইয়াছে। মোমবাতির 'ভস্ম' অর্থাৎ দাহোৎপন্ন বস্তু অঙ্গারাম্ল গ্যাস ও জলীয় বাষ্প। তাহাদিগকে ধরিবার ঠিকমত উপায় করিলেই তাহা ধরা যায়, এবং এইরূপ ধরিলেই দেখিতে পাইবে যে বাতির যে অংশ পুড়িয়া গিয়াছে তাহা

হইতে ইহাদের সমষ্টির ওজন ভারি হইয়াছে। বিজ্ঞান শিক্ষার গোড়াতেই তোমরা এই সকল বিষয়ের পরীক্ষা দেখিতে পাইবে।

আগুনের ইতিহাসের দু'এক কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। মানুষ ধাপে ধাপে অগ্নি উৎপাদনের নানাবিধ উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। আজ সে অগ্নি উৎপাদনের জন্য সাধারণতঃ দিয়াশলাই ব্যবহার করে। ফস্ফোরস নামক বস্তু আবিষ্কৃত হইবার পর এই দীপশলাকা সৃষ্ট হয়। ফস্ফোরস সামান্য একটু উত্তাপে, এমন কি সাধারণ বাতাসের উত্তাপেই জলিয়া উঠে। দিয়াশলাই প্রস্তুত করিতে ইহা কাঠির মুখে মাখাইয়া, তাহার উপর শিরিষের সূক্ষ্ম আবরণ দেওয়া হয়। এই আবরণের জন্য ইহা বাতাসস্পৃষ্ট হইতে পায় না এবং কাজেই অক্সিজেন অভাবে জলিতে পায় না। কাঠিটি যদি বাক্সের গায়ে বা অন্য কোনও কর্কশ-গাত্র বস্তুর উপর ঘর্ষিত হয়, আবরণটি তৎক্ষণাৎ ছিন্ন হইয়া যায়। সঙ্গে সঙ্গে ঘর্ষণোত্তাপে উত্তপ্ত হওয়ায়; ফস্ফোরস জলিয়া ওঠে ও তাহার পর কাঠিটিও ক্রমে ধরিয়া ওঠে। আজকাল এই প্রকারের দিয়াশলাই-এর আর তত প্রচলন নাই। তবে, কিছুদিন পূর্ব্বে আমরা এই দীপশলাকাই ব্যবহার করিতাম।

দু'একটি বিশেষ কারণে এই দীপশলাকার প্রচলন বন্ধ হইয়াছে। ফস্ফোরসের ভাপ বিশেষ ক্ষতিকারক, দিয়াশলাই তৈয়ারি করিবার সময়, শ্বাস-প্রশ্বাসে অনবরত সেই ভাপ গ্রহণ করায়, প্রস্তুতকারকেরা দাঁত ও চোয়ালের কঠিন দুরারোগ্য রোগে আক্রান্ত হইত। তাহা ছাড়া এইরূপ শলাকা যে কোনও স্থানে ঘর্ষণে জলিয়া উঠিত সেই জন্য সর্ব্বদাই তাহাকে সাবধানে রাখিতে হইত। বাক্স হইতে তাহাকে বাহিরে রাখা নিরাপদ ছিল না। ফস্ফোরসের আর একটি প্রকার আছে, তাহা ক্ষতিকারক নহে ও সামান্য ঘর্ষণে তাহা জলিয়া উঠে না। আজ কাল যে দিয়াশলাই তোমরা ব্যবহার কর, তাহার বাক্সের গাত্রে কয়েকটি মসলার সহিত সেই অন্য প্রকারের ফস্ফোরসের প্রলেপ দেওয়া হয়। কাঠিগুলিতে অন্যান্য কয়েকটি মসলা থাকে, ফস্ফোরস মোটেই থাকে না। এই কাঠিগুলি কাজেই যেখানে সেখানে ঘষিলে জলিয়া ওঠে না। কিন্তু বাক্সের গাত্রে সেই নূতন রকমের ফস্ফোরসের প্রলেপের উপর ঘষিলে, ঘর্ষণের দাগে দাগে ফস্ফোরস রূপান্তরিত হইয়া সহজদাহ্য ফস্ফোরসে পরিণত হয় এবং সেই জন্য সঙ্গে সঙ্গেই অগ্নি উৎপন্ন হয়। কাঠির মুখের মসলা তৎক্ষণাৎ সেই অগ্নি নিজের উপর টানিয়া লয়। আমরা তখন মসলা মাখান কাঠিটি জলিয়া উঠিতে দেখিতে পাই।

লোহা ও চকমকি ঠুকিয়া আগুন বাহির করার কথা পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে। সিরিয়ম নামক একরূপ ধাতু আছে, তাহা বা তাহার মিশ্রণ লৌহকর্তৃক ঘর্ষিত হইলে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গের সৃষ্টি করে। চুরুট ধরাইবার জন্য যে ছোট ছোট অগ্নিযন্ত্র পাওয়া যায়, তাহা হইতে এইরূপে অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ সৃষ্ট হয়।

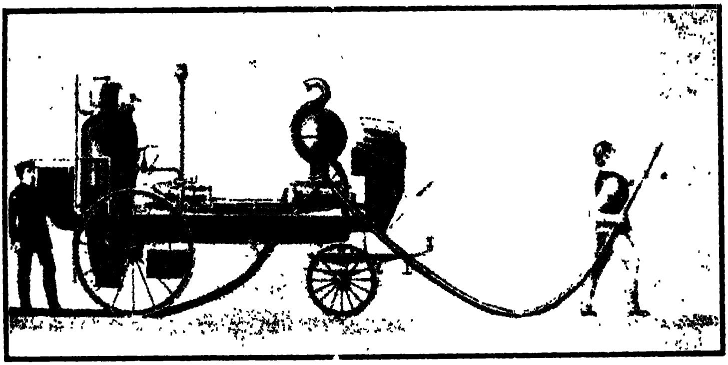
বিস্ফোরকে একরূপ সকল দাহক ও দাহ্য পদার্থ থাকে যে একবার জ্বালাইয়া দিলে আর রক্ষা নাই, ভীষণ বেগে অগ্নিকাণ্ড সাধিত হইয়া পড়ে। তাহাতে এরূপ দাহক পদার্থ থাকে যে সে জলিবার জন্য বাহিরের বাতাসের অপেক্ষা রাখে না। তাহার হঠাৎ জলিয়া ওঠায় ও হঠাৎ স্তূপাকার গ্যাসের সৃষ্টি হওয়ায় বাতাসে যে ঠেলাঠেলি পড়িয়া যায়, তাহাই আমরা প্রচণ্ড শব্দরূপে অনুভব করি। স্তূপাকার গ্যাস ক্ষুদ্র আয়তনে সৃষ্ট হওয়ায় তাহা অসীম শক্তিবলে ছড়াইয়া পড়ে। তোমরা 'বায়ু' অধ্যায়ে বিস্ফোরকের সহিত পরিচিত হইয়াছ; গোলাগুলি চালান হইতে পাহাড় পর্ব্বত উপড়িয়া ফেলা, সকল কার্য্যেই বিস্ফোরকের খেলা দেখিতে পাই।

আগুনের নামে বাজির কথা নিশ্চয়ই তোমাদের মনে জাগিয়া ওঠে। ইহাও একরকম বিস্ফোরক। বাজিতে গন্ধক, লোহাচুর প্রভৃতি দাহ্য পদার্থ ও পটাসক্লোরেট প্রভৃতি দাহক থাকে। জ্বালাইলেই ত্বরিৎ গতিতে জলিয়া ওঠে ও হরেক রকমের স্ফুলিঙ্গ চারিধারে বিক্ষিপ্ত হইতে থাকে। বাজির নানা প্রকারের গঠনের দ্বারা এই স্ফুলিঙ্গের বিক্ষেপ বিভিন্ন প্রকারের করা হয় ও তাহাতে নানা প্রকারের মসলা থাকায়, তাহা ইচ্ছানুযায়ী বিবিধ বর্ণের করিতে পারা যায়। বাজিতে অনেক দুর্ঘটনা ঘটে। তোমাদের মত ছেলে-মেয়েরা ত বাজি পোড়াইতে যাইয়া অনেক সময়

জীবনকেই বিপন্ন করিয়া ফেলো। একবার একটি বালক কতকগুলি ফটকা ক্রয় করে এবং তাহার মধ্য হইতে একটি ফটকা কৌতূহলবশতঃ মুখে দিয়া চর্ব্বণ করিতে থাকে, চর্ব্বণ করা মাত্র ফটকাটি ফাটিয়া যায়। বালকটির মুখে ভীষণ জখম হয়।

আগুন বড় ভয়ানক বস্তু। সামান্য অসাবধানে কি না কাণ্ডই হইয়া যায়। আমরা আগুন লইয়া যেন খেলা না করি। সেলুলয়েড নির্ম্মিত খেলনা ও বহুবিধ বস্তু আজকাল ঘরে ঘরে দেখিতে পাওয়া যায়, এই সেলুলয়েড একটি বিশেষ দাহ্য পদার্থ। আগুনের নিকট যেন ইহা লইয়া না যাওয়া হয়। পেট্রোল আর একটি দাহ্য পদার্থ; 'আগুন' এই মার্কা মারা জলভরা বাল্‌তি টাঙ্গান দেখিতে পাইবে। অন্য কাজে ব্যবহৃত হইয়া হয়তো সময়ে না পাওয়া যাইতে পারে, সেইজন্য এই বাল্‌তিগুলির তলদেশে এরূপ সূচ্যগ্র করা হয় যাহাতে টাঙ্গান ছাড়া তাহাদিগকে কোথাও বসাইয়া রাখিতে পারা যায় না। বড় বড় সহরে দমকল রাখা হয়। কোথাও আগুন লাগিলে দমকল চালকেরা ইহার দ্বারা আগুন নিবাইতে লাগিয়া যায়।

আগুনের উপর প্রচুর পরিমাণে অঙ্গারাম্ল গ্যাস ঢালিয়া দিলেও আগুন নিবিয়া যায়। তবে গ্যাসটি এত প্রচুর হওয়া চাই যে বাতাসের



প্রথম দমকল

আগুনের সংস্পর্শে তাহার ভাপ আসিবামাত্র, এমনকি দূরে আগুন থাকিলেও তাহা ধরিয়া ওঠে। কেরোসিনও প্রায় তদ্রূপ। তাহা ছাড়া কাপড, কাগজ, খড় ইত্যাদি আমাদের গাত্রে ও চতুর্দ্দিকেই শত শত দাহ্য পদার্থ রহিয়াছে। আমাদের সর্ব্বদাই মনে রাখা উচিৎ যে আগুন যেন অসাবধানে ব্যবহৃত না হয়।

এখন, আগুন নিবাইবার দু'এক কথা বলা যাক্। সাধারণ আগুন জল ঢালিয়া নির্ব্বাপিত করা হয়। জলে দাহ্যমান বস্তুকে ঠাণ্ডা করিয়া তাহার উত্তাপ জ্বলনাঙ্কের নীচে আনিয়া ফেলে এবং জলের আবরণ বায়ু হইতে পদার্থটির স্পর্শ ছিন্ন করিয়া দেয়। তোমরা অনেক রেল ষ্টেশনে আবর্ত্তে ও গরম হইয়া খানিকটা ভরিয়া যাইলেও বাকিটা যেন আবরণের মত হইয়া, বাতাস হইতে দাহশীল পদার্থের স্পর্শ ছিন্ন করিয়া দেয়। অঙ্গারাম্ল গ্যাস দাহক বা দাহ্য নহে ও বাতাস হইতে ভারি বলিয়া তাহা দাহ্য পদার্থের উপর চাপিয়া বসিতে পারে। ছোট খাট আগুন নিবাইবার জন্য আজকাল নানা প্রকার যন্ত্র পাওয়া যায়। এইরূপ এক আধটি যন্ত্র তোমরা হয়তো দেখিয়া থাকিবে; ইহাদিগকে প্রায়ই দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখা হয়। এইরূপ অনেক যন্ত্রে অঙ্গারাম্ল গ্যাস চাপিয়া রাখা হয় বা তাহা প্রস্তুত করিবার মসলা রাখা হয়। মাটির উপর এই যন্ত্রটি ঠুকিবামাত্র মসলাগুলি মিশ্রিত হইয়া পড়ে ও যন্ত্রের মুখ হইতে

তীব্র ধারায় এই গ্যাস বাহির হইতে থাকে। সেই ধারা তখন আগুনের উপর নিক্ষেপ করা হয়।

বর্ত্তমান সময় বৈজ্ঞানিক নিত্য নূতন আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে অগ্নি নির্ব্বাণের জন্য নানারূপ ব্যবস্থা হইয়াছে ও হইতেছে। কিন্তু পূর্ব্বে আগুন লাগিলে মানুষের কতই না বিপদ ছিল। কলসী কলসী জল ঢালিয়া নিবাইবার চেষ্টা করিতে হইত।

আজকাল আগুন লাগিলে বিশেষতঃ বড় বড় সহরে বিশেষ কোন অসুবিধা হয় না। সময়মত সংবাদ দিলেই দমকল ছুটিয়া আসে। এই দমকল মোটরকার বা হাওয়া গাড়ী দ্বারা পরিচালিত হইয়া থাকে। দমকলের গাড়ী পথ দিয়া ছুটিবার সময় বিপদ সূচক ঘন ঘন ঘণ্টা ধ্বনি হইতে থাকে। সে শব্দ শুনিয়া তোমাদের মত ছেলেমেয়েরা চুপ করিয়া থাকিতে পারে না, অমনি অগ্নি নির্ব্বাপক



লণ্ডন সহরের বিখ্যাত আগুন লাগিবার দৃশ্য

নিকটে কূপ বা পুষ্করিণী না থাকিলে নিবাইবার পক্ষে কোন সুযোগই মিলিত না। একবার লণ্ডন সহরে আগুন লাগিয়া সহরের অধিকাংশ স্থল সম্পূর্ণরূপে ভস্মীভূত হইয়া গিয়াছিল। সে সময়ে কি ভাবে সেকালের লোকেরা সেই বিরাট অগ্নি নির্ব্বাণের চেষ্টা করিয়াছিলেন, কি সব যন্ত্রপাতির ব্যবহার করিয়াছিলেন তাহা ছবি দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। প্রত্যেকটি জিনিষই উহাতে আছে।

হাওয়া গাড়ী (Motor Fire-Car) দেখিতে ছুটিয়া আসে। এই গাড়ীর ঘন ঘন, ঢন্ ঢনা ঢন্—ঢন্ ঢনা ঢন্ শব্দে জনসাধারণ বুঝিতে পারে যে কোথাও আগুন লাগিয়াছে। আগুন নিবাইবার জন্য বড় বড় সহরে যে অগ্নিনির্ব্বাপক বিভাগ আছে, তাহাকে অগ্নিবাহিনী—Fire Brigade বলে। এই বিভাগের লোকেরা অসাধারণ তৎপরতার সহিত আগুন নিবাইয়া ফেলে। খুব উচু বাড়ির উপর

দিকে আগুন লাগিলে ফায়ার ব্রিগেডের সঙ্গে যে সিঁড়ি থাকে সেই সিঁড়ি সংযোজিত করিয়া পাইপ



আগুন নিবানো হাওয়া গাড়ী

বা নল দিয়া অতি বেগে জল নিক্ষেপ করিয়া আগুন নিবাইতে থাকে। ছবিতে ইহা বেশ ভাল ভাবেই বুঝিতে পারিতেছ। ছবিতে দেখ ফায়ারব্রিগেডের দল স্থিতিস্থাপক নলের (Hose) সাহায্যে কিরূপ ভাবে বাড়ীটির আগুন নিবাইতেছে।

কলিকাতা ও ভারতবর্ষের বড় বড় সহরে ফায়ারব্রিগেড আছে। ইহারা টেলিফোনে সংবাদ পাইবামাত্র সেখানে ছুটিয়া যায় এবং অগ্নি নিবাইয়া দেয়।

প্রাকৃতিক অনেক বস্তুই সুব্যবহারে যেমন বন্ধুরূপে সাহায্য করে, সুবিধা পাইলেই তেমনি মারাত্মক শত্রু হইয়া ওঠে। আগুন তাহার চমৎকার দৃষ্টান্ত। তিলেকের অসাবধানতায় সে তোমাকে ধ্বংস করিয়া দিবে। তোমরা এই বস্তুটির প্রতি অবজ্ঞা দেখাইও না।

বাতি উল্টাইয়া বা অন্য কোন কারণে তৈল জ্বলিয়া উঠিলে তাহার উপর জল ঢালিলে কোনও ফল হয় না; কারণ তৈল হাল্কা বলিয়া ও তাহা জলের সহিত মিশ খায় না বলিয়া তাহা স্বচ্ছন্দে জলের উপর ভাসিতে ও জ্বলিতে থাকে। জল ঢালিলে, জ্বলন্ত তৈল চারিধারে ছড়াইয়া আরও অনিষ্ট সাধন করে। জ্বলন্ত তৈলের উপর প্রচুর পরিমাণে বালি ফেলিয়া তাহাকে নিবাইয়া দেওয়া হয়। বালির দ্বারা সকল রকম দাহই চাপিয়া ফেলিতে পারা যায়; সেইজন্য, বিশেষতঃ রসায়নাগারে প্রভূত পরিমাণে বালি রাখা হয়।

কাপড়ে বা জামায় আগুন লাগিলে পাগলের মত দৌড়াদৌড়ি করিলে, রক্ষা পাইবার কোন সম্ভাবনাই থাকে না; বাতাস পাইয়া আগুন ভীষণ হইয়া ওঠে। বরং কম্বল, শাল, কোট ইত্যাদি যে কোন বস্ত্র নিকটে পাওয়া যাইবে তাহার দ্বারা জোরে আগুনটাকে চাপিয়া দিবে। দরকার হইলে এইরূপ চাপা অবস্থায় মেঝের উপর গড়াইয়া নিবাইবার চেষ্টা করিতে হইবে। আগুন চাপিয়া নিবাইয়া দেওয়া ছাড়া এক্ষেত্রে আর কোনও উপায়ান্তর নাই।

নারিকেল তৈল ও চূণ মিশাইয়া ফেটাইয়া অগ্নিদগ্ধ স্থানের উপর প্রলেপ দিলে উপকার দর্শে।



সিঁড়ি লাগাইয়া উপরের আগুন নিবাইতেছে

অগ্নি সম্বন্ধে প্রত্যেকেরই সতর্ক থাকা আবশ্যক। আগুনের সহিত যুদ্ধ করিবার অর্থাৎ আগুন

নিবাইবার বিবিধ ব্যবস্থা কবে হইতে আরম্ভ হইল এবার সেই কথা শোন।

আগুনের অবস্থা বুঝিয়া আজকাল আগুন নিবাইবার নানারূপ ব্যবস্থা অবলম্বিত হইয়া থাকে। সাধারণতঃ জলই হইতেছে আগুন নিবাইবার প্রধান অবলম্বন, কিন্তু এমন অনেক আগুন আছে যাহা জল দিয়া নিবানো চলে না। সচরাচর আমরা তিন প্রকারের আগুন-লাগার কথা শুনিয়া থাকি ; (১) কাহারও বাড়ীতে আগুন লাগিলে, ফায়ার ব্রিগেডের সাহায্য ব্যতীতও উহা নিবাইতে পারা



হোসের সাহায্যে আগুন নিবাইতেছে

যায়। (২) বড় বড় বাড়ীতে বা কারখানায় আগুন লাগিলে ফায়ার এঞ্জিন (Fire Engine) ব্যবহার আবশ্যক। (৩) যেখানে পেট্রোল প্রভৃতি থাকে যেমন মোটর রাখিবার ঘর (Motor Garage), কিংবা যেখানে লক্ষ লক্ষ গ্যালন তরল দহনীয় পদার্থ থাকে সেখানে আগুন লাগিলে অগ্নি নির্ব্বাপক ফায়ার এঞ্জিনের প্রয়োজন।

সামান্য অসাবধানতার জন্য অনেক সময় আগুন লাগিয়া যায়। আজকাল আগুন নিবাইবার অনেক প্রকার যন্ত্রপাতি আছে (Chemical fire extinguishers) ঐসব যন্ত্রপাতি এমনি সুকৌশলে ও সহজে নির্ম্মিত যে তাহাদের ব্যবহার কৌশল জানা থাকিলে একটি বালকও অনায়াসে তাহার দ্বারা আগুন নিবাইতে পারে।

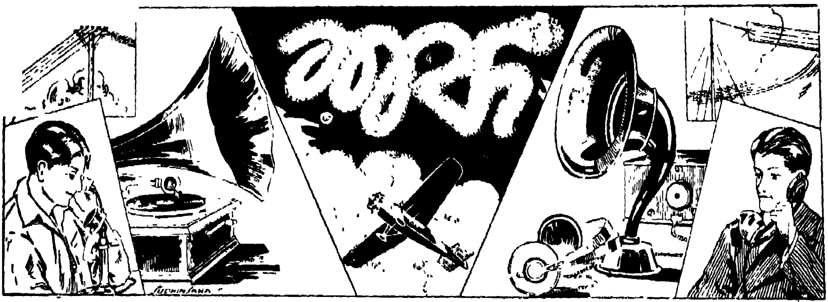
কিন্তু যেখানে পেট্রোল প্রভৃতি তৈল জাতীয় পদার্থ থাকে, সেখানে আগুন লাগিলে জল দিয়া তাহা নিবানো চলে না, কেননা জল তেলের উপর ভাসিতে থাকে। বরং তাহাতে আগুন আরও বাড়িয়া যায়। সেখানে রাসায়নিক দ্রব্যাদি সম্বলিত অগ্নি-নির্ব্বাপক যন্ত্রপাতির ব্যবহার একান্ত প্রয়োজনীয়। আজকালকার ফায়ার এঞ্জিনগুলির সহিত এই সব নূতন নূতন যন্ত্রপাতি থাকে।

লণ্ডন সহরের মোটর ফায়ার এঞ্জিনগুলি ৩৪০ ফিট উচ্চ পর্য্যন্ত হোসের সাহায্যে জল নিক্ষেপ করিতে পারে।

১৯২১ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লণ্ডনের অগ্নিবাহিনী গাড়ীগুলি ঘোড়ায় টানিয়া নিত, কিন্তু উক্ত সন হইতে ঘোড়ার বদলে বিদ্যুৎ ও পেট্রোল মোটরের সাহায্যে ফায়ারব্রিগেডের ফায়ার এঞ্জিনগুলি পরিচালিত হইতেছে। ঐ সঙ্গে আগুন নিবানোপযোগী সাজ সরঞ্জাম থাকে প্রচুর পরিমাণে। তোমরা ছবিতে বাড়ীর সঙ্গে সংলগ্ন যে সিঁড়িটি দেখিতেছ, এইরূপ এক একটি সিঁড়ির উচ্চতা হইবে প্রায় ৯০ ফিট, ইহাদিগকে ইংরাজীতে বলে Fire ladders। আমরা নাম দিতে পারি, আগুন নিবানো সিঁড়ি।

লণ্ডন সহরের ও কলিকাতা প্রভৃতি সহরের অগ্নিবাহিনী কোন স্থানে আগুন লাগিবার সংবাদ পাইলে চল্লিশ মাইল বেগে হাওয়া গাড়ী চালাইয়া সেখানে চলিয়া যাইতে পারে এবং আগুন নিবাইবার ব্যবস্থা করে।

যদি কোথাও অত্যন্ত ব্যাপকভাবে আগুন লাগে তাহা হইলে হেডকোয়ার্টার হইতে সহরের অন্যান্য অগ্নি বাহিনীর নিকট টেলিফোনের দ্বারা সংবাদ পাঠান হয়, অমনি তাহারা ছুটিয়া সেই অগ্নিস্থানে যাইয়া সমবেত হইয়া আগুন নিবাইবার সাহায্য করে এবং শীঘ্রই আগুন নিবাইয়া ফেলে। এক একটি নল ২০০ গ্যালন পরিমাণ জল নিক্ষেপ করিয়া থাকে।



সবাক্ চিত্র-রেখাবিস্তার-বৈষম্য-প্রথা

১৮৭০ পৃষ্ঠার পর

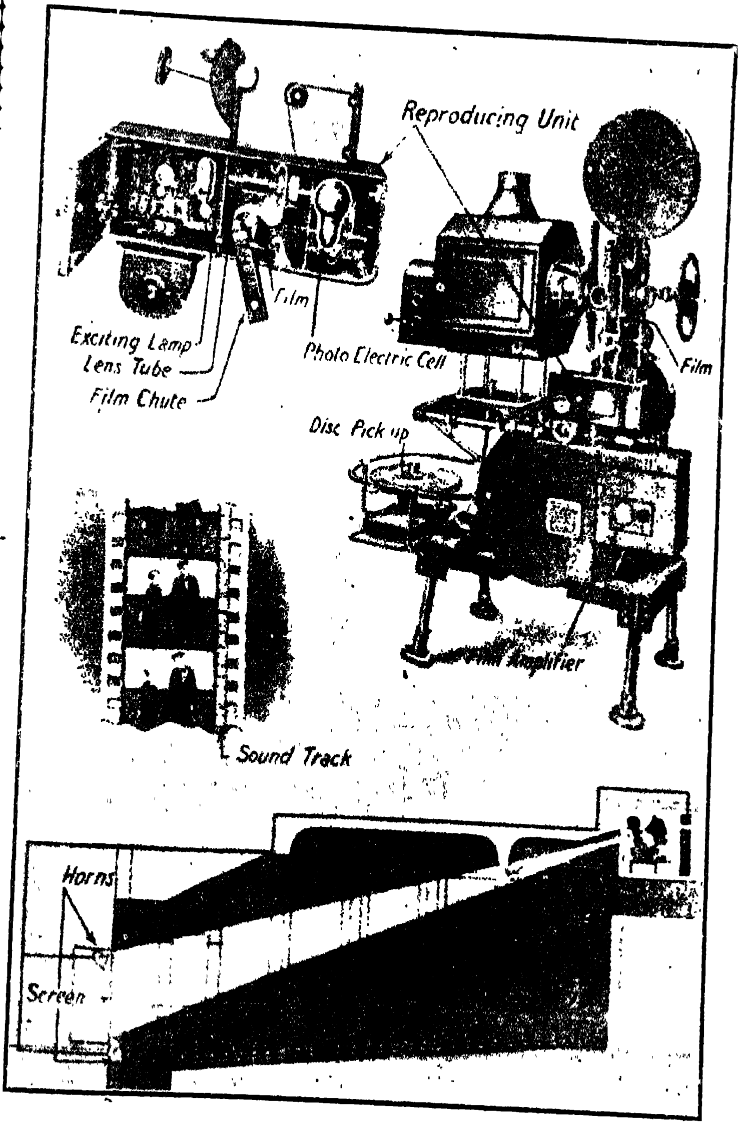
আলোক বৈষম্যের কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি (শিশু-ভারতী ১৮৫৮-১৮৭০ পৃষ্ঠা)। এখন রেখাবিস্তার বৈষম্যের কথাই বলিব। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে যে ফিল্মের উপর সবাক্ চিত্র তুলিবার সময়, চিত্রের পার্শ্বে শব্দের আলোকচিত্র গ্রহণ করা হয়। বায়ুতে যে শব্দতরঙ্গ বিস্তার হয় তাহাকে 'মাইক্রোফোনের' সাহায্যে বৈদ্যুতিক তরঙ্গে রূপান্তরিত করিয়া, ঐ বৈদ্যুতিক তরঙ্গ দ্বারা আলোকের বৈষম্য ঘটাইয়া ফিল্মের একপাশে ছবি লওয়া হয়। দ্বিতীয় প্রথায় আলোকরেখা আড়াআড়িভাবে বিদ্যমান থাকে এবং বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হইলে রেখার ও দৈর্ঘ্যের হ্রাস বৃদ্ধি হয়। ১৮৭০ পৃষ্ঠার (শিশু-ভারতী) ছবিতে দেখ আলোকরেখার বিস্তার বৈষম্য হইয়া ফিল্মের উপর সারি সারি গাছপালার মতন দেখাইতেছে। কিভাবে ছবি তোলা হয় এবং কেমন করিয়া রেখাবিস্তার বৈষম্য ঘটে তাহা 'শিশু-ভারতীর' ১৮৭০ পৃষ্ঠার দক্ষিণ দিকের চিত্রখানির দিকে লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

একটি বৈদ্যুতিক Bulb (বাতি), ক্ষুদ্র একটি ছিদ্রকে আলোকিত করিতেছে, ফিল্মের উপর পড়িবার পূর্ব্বে ক্ষুদ্র একটি দর্পণ হইতে প্রতিফলিত হইয়া তাহার পর নানাপ্রকার lens (পরকলা বা বীক্ষণ কাচ) এবং অবরোধকের বা ঢাক্‌নার (Shutter) ভিতর হইয়া ফিল্মের উপর গিয়া পড়িতেছে। ক্ষুদ্র দর্পণটি একজোড়া তারের উপর বসান থাকে। ঐ স্থানে চুম্বকও থাকে। মাইক্রোফোনের বৈদ্যুতিক তরঙ্গ উক্ত তারের মধ্যে প্রবাহিত হইলে, তারের সহিত দর্পণটি আড়াআড়িভাবে কাঁপিতে থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে আলোকরেখার বিস্তার বৈষম্য হইয়া ফিল্মের উপর সারি সারি গাছপালার মতন চিত্র উঠে। যে যন্ত্রের কথা বলিলাম, তাহার নাম হইতেছে—Oscullograph।

Fox Movietone Company আলোক-বৈষম্য প্রথার অনুসরণ করিয়া সবাক্ চিত্র তৈরী করেন। তাঁহারা ইউল্যাম্পের সাহায্যে দীপ্তির হ্রাস ও বৃদ্ধি করেন। কিন্তু Western Electric Company., ওয়েন্ট (wente) সাহেবের আলোক-কপাট ব্যবহার করিয়া দীপ্তির হ্রাস-বৃদ্ধি করাইয়া উপরোক্ত প্রথা মতে (variable density) শব্দ চিত্রের ফিল্ম তৈরী করেন।

রেখার বিস্তার-বৈষম্য প্রথাকে variable area method বলে এবং ইহা সাধারণের নিকট R. C. A. PhotoPhone method নামে পরিচিত।

ভারতবর্ষে আজকাল অনেকগুলি ফিল্ম কোম্পানী (Film Company) খুলিয়াছে। তাহার অধিকাংশই R. C. A. প্রথার অনুসরণ



সবাক্‌-চিত্র তুলিবার বিভিন্ন যন্ত্রপাতি

করেন। R. C. A. বলিতে কি বুঝায় জান? Radio Corporation America।

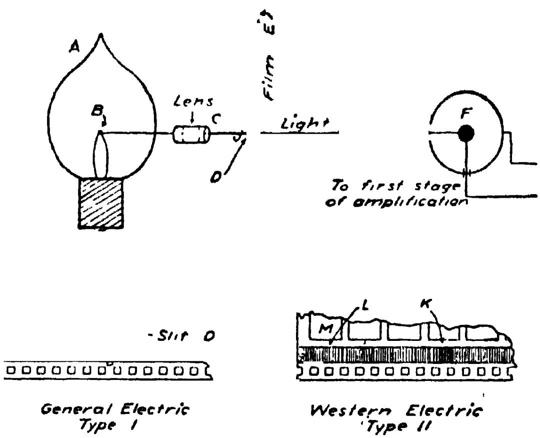
ফিল্ম হইতে কেমন করিয়া শব্দ হয়? ফিল্মের শব্দরেখা হইতে কেমন করিয়া পুনরায় শব্দের উৎপত্তি হয় ইহা একটি প্রধান আবিষ্কার বলিতে হইবে। বিজ্ঞানের দিক্ দিয়া দেখিতে গেলে ইহা একটি সামান্য আবিষ্কার; কিন্তু উহাকে আলোকচিত্র হইতে শব্দ বাহির করিবার কাজে লাগাইয়া, আমরা ফিল্ম হইতে গান এবং কথা শুনিতেছি। এই বৈজ্ঞানিক যন্ত্রের নাম হইতেছে Photo Electric cell—'ফোটো ইলেকট্রিক' সেল।



ফোটো ইলেকট্রিক সেল, এই যন্ত্রটি হইতেছে সবাক্‌চিত্রের প্রধান অঙ্গ

ইহার আকৃতি ঠিক্ বৈদ্যুতিক (Bulb) বাতির মত। বৈদ্যুতিক তরঙ্গ প্রবাহিত হইবার জন্য দুইটি তার ও বিদ্যমান আছে। তফাৎ এই যে বাতির (Bulb) কাচের উপর ভিতরের দিকে রৌপ্যের কণা ছড়ান থাকে। এবং উহা Potassium ধাতুর কণা দিয়া ঢাকা হয়। বাল্বের একধারে একটি এক ইঞ্চি পরিমাণ খালি যায়গা থাকে। বাহির হইতে বাতিটি দেখিলে খুব চক্‌চকে দেখায় 'ফোটো ইলেকট্রিক' বাল্বের ধর্ম্ম এই যে ইহার ভিতরে আলোক-রশ্মি ফেলিলে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ হয়। এবং যদি আলো কোনও প্রকারে হ্রাস-বৃদ্ধি হয়, তাহা হইলে অবিকল সেইভাবে বৈদ্যুতিক তরঙ্গ ও হ্রাস-বৃদ্ধি পাইবে।

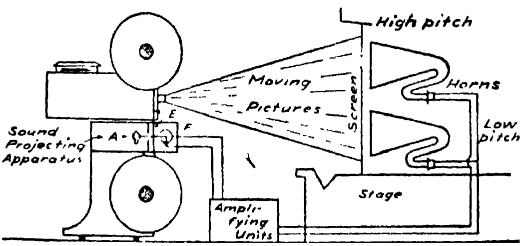
এখন বেশ বুঝিতে পারিতেছ যে ফিল্মের উপরের শব্দ চিত্র হইতে শব্দ বাহির করিতে হইলে ফিল্মের শব্দচিত্রের ভিতর দিয়া আলো ফেলিয়া সেই আলোক ফোটো ইলেকট্রিক বাল্বে গ্রহণ করিতে হইবে। এবং শব্দচিত্রের আলোক-বৈষম্যের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের হ্রাসবৃদ্ধি হইতে থাকিবে। উক্ত হ্রাসবৃদ্ধির মাত্রা অতি ক্ষীণ, সেইজন্য রেডিও এমপ্লিফায়ার (বিবর্দ্ধন যন্ত্র) দ্বারা বিবর্দ্ধিত করিয়া, সেই বৈদ্যুতিক তরঙ্গ, স্বর বিবর্দ্ধন যন্ত্রে প্রেরণ করা হয়। তখন আমরা সেই কথা বা গান শুনিতে পাই। চিত্রে দেখ ফিল্মের ভিতর হইয়া আলোক, ফোটো-ইলেকট্রিক বাল্বে পড়িতেছে। এবং অন্যচিত্রে দেখিবে পর্দ্দার পিছনে দুইটি স্বরবিবর্দ্ধক যন্ত্র ঝুলিতেছে, দুইটি একই সঙ্গে কথা বলে। একটি মোটা এবং অন্যটি উচ্চস্বরে ভাল কাজ করে। দুইটি একই সঙ্গে কথা বলিলেও কথার বিকৃতি হয় না। শব্দরেখা ফিল্মের একধারে থাকে এবং পাশেই অঙ্গভঙ্গীর দৃশ্য। যেমন যেমন অঙ্গভঙ্গ করিয়া অভিনেতা ঠোঁট নাড়িবেন, ঠিক্ সেই সময় পিছনে স্বর-বিবর্দ্ধক যন্ত্রে সেইরূপ কথা



ফিল্মের উপর শব্দচিত্রের ভিতর দিয়া বৈদ্যুতিক আলোক (B) ফোটো ইলেকট্রিক বাল্বে পড়িতেছে

বলিতেছে। চলচ্চিত্রে আমরা যাহা শুনিতে পাই—সেই শব্দ তরঙ্গের রূপ ফিল্মে আবদ্ধ করা হয়। শব্দ স্থিরীকরণ হইতেছে শব্দ তরঙ্গের আলোকচিত্র গ্রহণের প্রধান কর্ত্তব্য।

এখানে যেভাবে সবাক চিত্র তুলিবার কথা বলিলাম তাহা বর্ত্তমান আবিষ্কার এবং অভিজ্ঞতার ফল। পূর্ব্বে কিন্তু অন্যরূপে সবাক্ চিত্র তোলা হইত। সে সময়ে Film projecting (চিত্র পরিকল্পক যন্ত্র) সহিত একটি ইলেকট্রিক গ্রামোফোন সংযুক্ত থাকিত এবং উহার চাকতির সাহায্যে শব্দ গৃহীত হইত। এই প্রথায় অনেক ত্রুটি থাকে বলিয়া বর্ত্তমান পদ্ধতি অবলম্বিত হইয়াছে। উহাকে বলিত—ডিস্ক-রেকর্ডার-Disc-recorder।



সবাক্ চিত্রের যন্ত্রপাতি

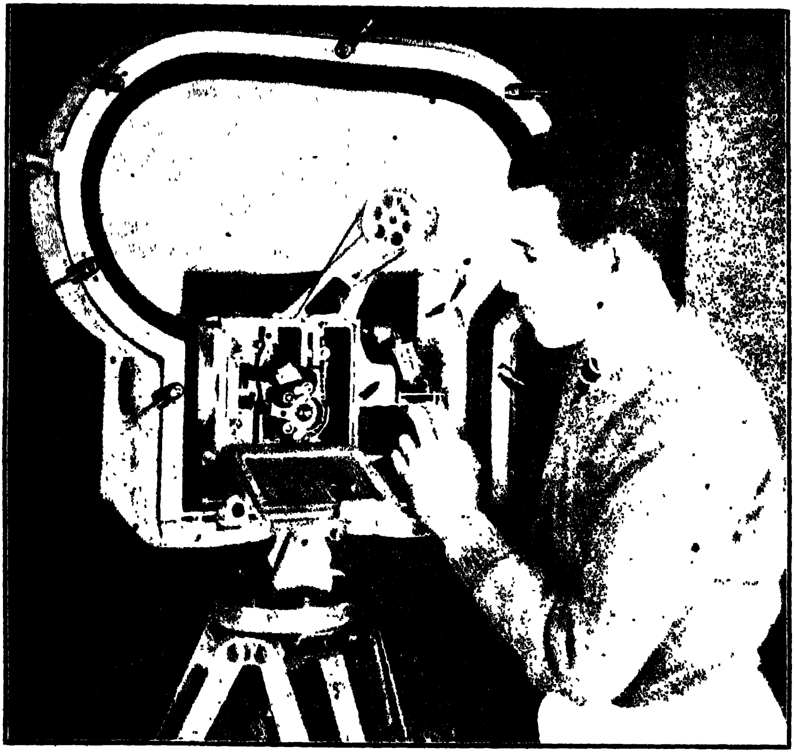
সবাক্চিত্র গ্রহণের Studio বা কারুকক্ষে যদি কখনও যাও তাহা হইলে দেখিতে পাইবে কত প্রকারের যন্ত্রপাতি সেখানে সাজান রহিয়াছে—আর সেই কারুকক্ষে কিরূপ নিস্তব্ধতা বিরাজমান—ইংরাজীতে যাহাকে বলে Deadness। কোনও চিত্র তুলিবার সময় কি চিত্র পরিচালক, কি দর্শকবৃন্দ সকলেই নীরবে কার্য্যাদি পর্য্যবেক্ষণ ও পরিচালনা করেন। কেননা মাইক্রোফোন (Microphone) যন্ত্রে সামান্য শব্দও গৃহীত হয়। তোমরা যে অনেক সময় সবাক্ চিত্রে হিস্ হিস্ শব্দ শুনিতে পাও, তাহা আর কিছুই নয় আর্কল্যাম্পের দরুন ঐরূপ হয়। এখন এই শব্দও যাহাতে না হয় তাহারও ব্যবস্থা করা হইয়াছে।

যদি কখনও Studioতে কোন একটি নাটকের দৃশ্য তোলা হইতেছে এইরূপ সময় যাইতে পার, তাহা হইলে দেখিবে যে শব্দযন্ত্রী (Recording Engineer) একটি কাচের জানালার ভিতর দিয়া চারিদিকে দেখিতেছেন এবং অভিনেতারা 'Set'এ অপেক্ষা করিতেছেন। লাল আলো (Red lamp) দেখাইয়া সকলকে সতর্ক করিয়া দেওয়া হইতেছে—যে এখনই দৃশ্য তোলা হইবে, কেহ যেন কোনরূপ শব্দ না করেন। ছবি তুলিবার ক্যামেরা (The picture Camera) ইলেকট্রিক মোটর দ্বারা নীরবে পরিচালিত হয় এবং শব্দগ্রাহী ক্যামেরা (Sound Camera) পাশের ঘরে থাকে, এবং তাহার সহিত ইলেকট্রিকের সাহায্যে 'আর্টিষ্ট'দের মাথার উপর শব্দের উৎপত্তি স্থানের নিকট 'মাইক্রোফোন' (Microphone) সংযুক্ত থাকে। যেমন একজন অভিনেতা কথা বলিতে আরম্ভ করেন, অমনি শব্দ-তরঙ্গের সাহায্যে গৃহীত হইয়া বৈদ্যুতিক অভিঘাত বলে—মাইক্রোফোনের টেলিফোনের সাহায্যে শব্দগ্রাহী কক্ষে Recording room পরিভ্রমণ করে বা যাইয়া উপস্থিত হয়। ঐ ঘরে শব্দযন্ত্রী (Recorder) উচ্চনিনাদী যন্ত্রের (Loud speaker) নিকট বসিয়া থাকেন, তিনি অভিনেতার স্বর শুনিয়া আবশ্যক মত শব্দ উচ্চ ও নীচ করিয়া থাকেন। এজন্যই দেখিতে পাও যে যেমন সকল সময়েই অভিনেতার অঙ্গভঙ্গীর দ্বারা স্বর-বিবর্দ্ধক যন্ত্রের সহিত যে কথা বাহির হইতেছে; তাহার সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য আছে।

এ সময়ে ছবি তুলিবার ক্যামেরা ছবি তুলিতে থাকে, যখন ছবি তোলা শেষ হয় তখন দুই প্রস্ত ফিল্ম তৈরী হয়,—একটি শব্দের, অন্যটি দৃশ্যের। ফিল্ম হইতে যখন ছবির পরিস্ফুরণ (Developed) করা হয় তখন দৃশ্যের চিত্রের কতকটা অংশ শব্দের ফিল্মের (Sound film) জন্য আচ্ছাদিত করিয়া রাখা হয়—পরে উহার সহিত শব্দের ফিল্ম জুড়িয়া

দেওয়ার জন্য। এ ভাবে যখন ফিল্ম তোলা শেষ হয়, তখন n :ative হইতে positiveএ পরিবর্ত্তিত করা হইয়া থাকে। ঐ সময়ে কাট ছাট ইত্যাদি প্রযোজকের ইচ্ছানুসারে সম্পন্ন হয়। ফিল্মের দৃশ্য তোলাকে ইংরাজীতে 'Shot' বা 'Shooting' a scene বলে।

জানিতে পারিতেছি ও শুনিতে পারিতেছি। মৌমাছির পাখার শব্দ, পায়ের শব্দ,—বজ্র-ধ্বনির ন্যায় উচ্চনিনাদী করা যাইতে পারে। কিছুদিন পূর্ব্বে একটি মহিলার হৃদ্‌যন্ত্রের ধুক্ ধুক্ শব্দ একটি বড় হলঘরে স্পষ্টভাবে শোনার ব্যবস্থা করা হইয়াছিল।



শব্দ লিবারক ক্যামেরা

কিরূপভাবে তোমরা ছবি দেখিবার সঙ্গে ছবির দৃশ্য ও কথা একই সঙ্গে শুনিতে পাও, সেকথা তোমাদের কাছে পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

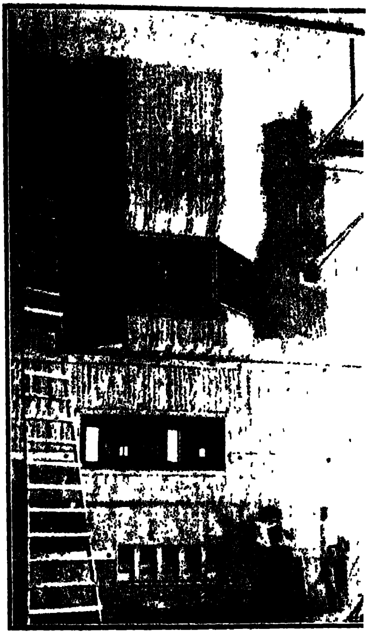
খোলা যায়গায় ও ছবি তুলিবার এবং শব্দ গ্রহণ করিবার ব্যবস্থা এখন হইয়াছে।

সবাক্ চিত্রের সাহায্যে আমরা অনেক কিছু

শিক্ষার দিক্ দিয়া বাণীচিত্রের প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী—বিশেষ ছাত্রদের পক্ষে জ্ঞান-লাভের সহায়করূপে সর্ব্বদাই ইহার আবশ্যকতা আছে। ইতিহাস, প্রত্নতত্ত্ব, চিত্রবিদ্যা, ব্যায়াম, সাঁতার, ক্রীড়া-কৌতুকও বিজ্ঞান শিখাইবার পক্ষে আমরা বাণী-চিত্রের (Talkies) সাহায্যে

অনেক কিছু শিখিতে পারি ও শিক্ষা দিতে পারি।

জাপান, ইংল্যাণ্ড, জার্ম্মেনি, ইটালি এবং ইউরোপ ও আমেরিকার প্রত্যেক দেশে ৮০-

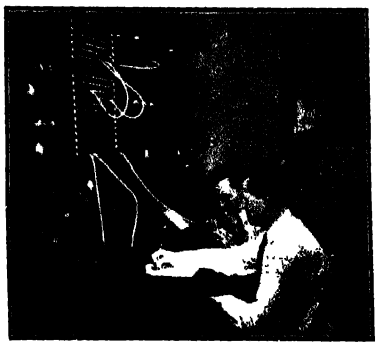


কারুকক্ষ, এখানে বাণী চিত্র গৃহীত হয়

চিত্রের সাহায্যে শিক্ষা দিবার ব্যবস্থা হইয়াছে। এ বিষয়ে বোধ হয় রাশিয়া সকল দেশের চেয়ে অগ্রণী। সে দেশে লোকশিক্ষার জন্য ছবি তৈরী হইয়া থাকে। রাশিয়ার গ্রামে গ্রামে, পল্লীতে পল্লীতে 'সিনেমার' সাহায্যে শিক্ষা দেওয়া হইয়া থাকে। শিক্ষা দিবার সুবন্দোবস্তের জন্য সেখানে সরকার হইতেই অনেকগুলি সিনেমা প্রতিষ্ঠান স্থাপিত আছে। দেশবিদেশের ইতিহাস, নিজ দেশের প্রাচীন গৌরবগাথা ও বর্ত্তমান ইতিহাস, শিল্প ও বাণিজ্য, সমাজ, কুটীর-শিল্প, যন্ত্রপাতি-নির্ম্মাণ, স্কুলের শিক্ষা প্রণালী, ইঞ্জিনিয়ারিং অর্থাৎ যত প্রকারে মানুষকে সুশিক্ষিত করা যাইতে পারে, সেই সেই বিষয়ের বিশেষ বিশেষ ছবি তোলা হয়। আমাদের দেশে কি সরকার, কি ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান, কেহই এদিকে উল্লেখযোগ্য কোন প্রচেষ্টা করেন নাই।

সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ভাবে চিত্র ও বাণী একসঙ্গে তোলা বড় সহজ ব্যাপার নহে। আমরা এক সময়ে নীরব চিত্র দেখিয়াই সন্তুষ্ট ছিলাম, কিন্তু এখন বাণীচিত্র দেখিয়া শুনিয়াও মনে মনে ভাবি ঐ যে কেমন একটা অনুনাসিক উচ্চারণ শুনিতে পাই, তাহা কবে দূর হইবে? দিন দিন এদিকে বৈজ্ঞানিকেরা যেরূপ মনোযোগী হইয়া উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছেন, তাহাতে এমন দিন আসিতেছে, যখন কোনরূপ ত্রুটিই ইহাতে থাকিবে না। সব দিক্ দিয়া স্বভাবের অনুকৃতি দেখিতে পাইব।

রঙিন চিত্র (Colour Films) তোমাদের কাছে বাণী-চিত্র সম্বন্ধে সহজ ভাবে অনেক কথাই বলিয়াছি। এইবার একটি নূতন বিষয়ের কথা বলিতেছি। বর্ত্তমান সময়ে সবাক্ চিত্রে যাহাতে বর্ণ বৈচিত্র্য প্রকাশ পাইতে পারে সেজন্য বিশেষ চেষ্টা আরম্ভ হইয়াছে। এইরূপ প্রচেষ্টার নাম Hillman Colourgravure। প্রথমতঃ সাধারণ ভাবে যেমন চিত্র গ্রহণ করা হয়, ঠিক সেই ভাবেই কারুকক্ষে ছবি তোলা হইয়া থাকে।



বিবর্দ্ধন যন্ত্র

সেই চিত্র পুনরায় বিশেষভাবে নির্ম্মিত ক্যামেরার সাহায্যে রঙিন হইয়া পর্দ্দায় প্রতিফলিত করা হয়। এইভাবে যাহাতে চিত্রের মধ্যে বিচিত্র বর্ণের সমাবেশ করিয়া উহার সৌন্দর্য্য শতগুণে বর্দ্ধিত

করা যায় তাহারই চেষ্টা চলিতেছে। প্রায় পঁচিশ বৎসর যাবত ইউরোপ ও আমেরিকার বিশিষ্ট বৈজ্ঞানিকগণ নিজ নিজ কারুকক্ষে (Studio) এই সম্বন্ধে গবেষণা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহারা চাহিতেছেন যাহাতে অল্প ব্যয়ে সুন্দরভাবে এইরূপ চিত্র পরিগৃহীত হইতে পারে। তাহারই চেষ্টা চলিতেছে।

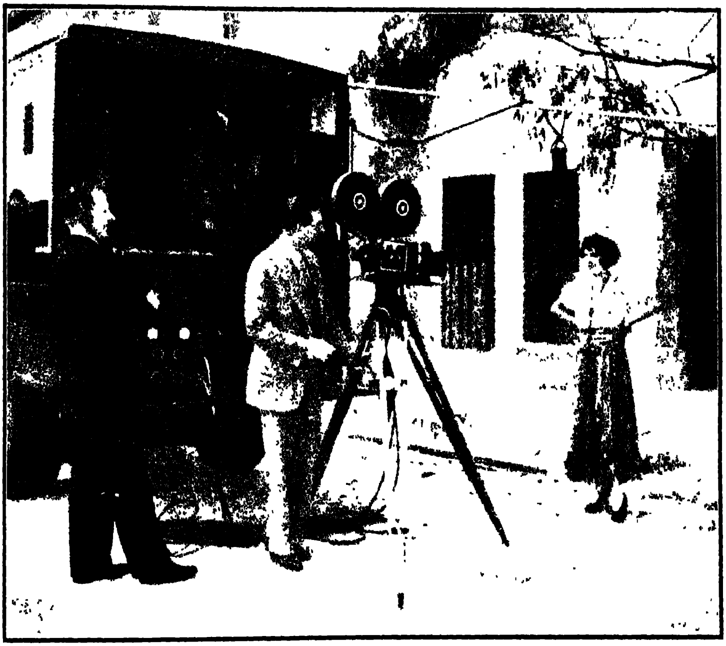


ছবি তোলা হইতেছে—("Shooting" A Scene)

চার্লস উরবান্ (Charles Urban) সাহেব ১৯১২ খৃষ্টাব্দে দিল্লীদরবারের রঙিন চিত্র প্রদর্শন করিবার পর হইতেই শত শত প্রকারের রঙিন চিত্র প্রদর্শনের (Colour Systems) আবিষ্কার হইয়াছে। অনেকে উরবান্ সাহেবের আবিষ্কৃত Kinemacolor রীতি পছন্দ করেন। কেহ বা Technicolor পছন্দ করেন। দুই তিন বৎসর পূর্ব্বে নিউইয়র্কের দুইজন বৈজ্ঞানিক লিওপোল্ড মেন্স এবং লিওপোল্ড গোড্‌ওস্কী এই সম্বন্ধে সবিশেষ আলোচনা করেন। রঙিন চিত্র প্রস্তুত করিবার পদ্ধতির মধ্যে যে তেমন কোনও বিশেষত্ব আছে তাহা নহে। ইহার বিশেষত্ব হইতেছে পরিস্ফুরণের (Develope) সমকালে। সে সময়ে রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় রঙ করা হয়। (Supplying the colour to the film itself by stencils or dye)। এজন্য চিত্রগ্রাহক যন্ত্র কিংবা প্রদর্শক যন্ত্রের প্রয়োজন নাই। বিখ্যাত 'কোডাক্' (Kodak) কোম্পানী তাঁহাদের কারখানাতে কোডোক্রোম নামে ছবি তুলিতেছেন। তবে বিশেষজ্ঞদের মতে এখন পর্য্যন্তও রঙিন চিত্রের গবেষণাগারেই পরীক্ষা চলিতেছে। ব্যবসায় হিসাবে কার্য্যকরী হইতে অনেক বিলম্ব রহিয়াছে:—"But after all

these years of experiment, colour, so far as the industry is concerned, is still in the laboratories)।

ভারতীয় চলচ্চিত্র সমিতি (Motion picture Society of India) নামে একটি প্রসিদ্ধ প্রতিষ্ঠান আছে। ভারতে বর্ত্তমানে সওয়া এগার কোটী টাকা মূলধন ফিল্ম ব্যবসায়ে খাটিতেছে। এবং এই ব্যবসায়ে প্রায় ২৫ হাজার লোক নিযুক্ত আছে। ভারতের বড় বড় ব্যবসায়গুলির মধ্যে ইহা সপ্তম স্থানীয়। ফিল্ম ব্যবসায়ের দ্বারা গভর্ণমেণ্ট যেমন লাভবান হইয়া থাকেন, তেমনি রেলওয়ে বিভাগ, এবং বিজ্ঞাপন প্রভৃতির দিক দিয়া অন্যান্য ব্যবসায়ীরাও লাভবান হইয়া থাকে। কেবল যে ব্যবসায়ের দিক্ দিয়া ইহার মূল্য আছে তাহা নহে, শিক্ষার প্রসারের দিক্ দিয়াও যে চলচ্চিত্রের যথেষ্ট মূল্য আছে সেকথা তোমাদের কাছে বলিয়াছি। সোভিয়েট রাশিয়ার কিভাবে



খোলা জায়গায় ছবি তোলা হইতেছে

ইহার সাহায্যে শিক্ষা বিস্তার করেন, তাহাও উল্লেখ করিয়াছি।

ভারতবর্ষে নানা প্রদেশে এখন অনেক Studio হইয়াছে। এক বাঙ্গলাদেশেই দশটি প্রতিষ্ঠান আছে।



তিরুবল্লুর

২১৮২ পৃষ্ঠার পর

ভারতের 'কুরল' তামিল ভাষার বেদ। আমরা এখানে 'কুরল' রচয়িতা মহাপুরুষ তিরুবল্লুর বিষয়ে আলোচনা করিব। তিরুবল্লুর নীচবংশে জন্মগ্রহণ করিয়াও আপনার কবিত্বশক্তি প্রভাবে এবং সাধুতার দ্বারা দক্ষিণ ভারতের লক্ষ লক্ষ লোকের নিকট পূজিত হইয়া আসিতেছেন।

তিরুবল্লুর জীবনী সম্বন্ধে বিশেষ কিছুই জানিতে পারা যায় না। কিংবদন্তী এই যে তিনি বল্লুর নামক অস্পৃশ্য জাতিতে জন্মিয়াছিলেন। বল্লুরেরা দক্ষিণ ভারতের নীচ জাতীয়দের মধ্যে পুরোহিতের কাজ করেন। "তিরু" শব্দের অর্থ শ্রেষ্ঠ, সেই অর্থে বল্লুর বংশের সাধুপুরুষ—তিরুবল্লুর। তাঁহার জন্ম সম্বন্ধে নানা কিংবদন্তী প্রচলিত। কেহ বলেন তাঁহার পিতা ছিলেন ব্রাহ্মণ এবং মাতা ছিলেন নীচবংশের। আবার কেহ বলেন তিনি মতুরাতে জন্মিয়াছিলেন। তারপর একজন নৌকার মাঝি তাঁহাকে লালন-পালন করেন। এই মাঝির কাজ ছিল বন্দরে কোন জাহাজ ভিড়িলে, জাহাজ হইতে মালখালাস করিয়া তীরে নামান। এই পার্টনির বাস ছিল মাদ্রাজে। "কুরলে" সমুদ্রের সম্বন্ধে বিশেষভাবে উল্লেখ দেখা যায়। এজন্য অনেকের মত তিনি ময়ালাপুরের অধিবাসী ছিলেন। ময়ালাপুরে কবি তিরুবল্লুর ও তাঁহার স্ত্রীর প্রস্তর মূর্ত্তি দুইটি মন্দিরে স্থাপিত আছে। সেই মন্দির দুইটি সেখানকার ব্রাহ্মণ-পল্লীতে অবস্থিত। প্রতি বৎসর চৈত্র, বৈশাখ মাসে সেখানে একটি মেলা বসে। সে মেলায় অনেক লোক আসে।

তিরুবল্লুর সঙ্গে নৌকাচালনার জন্য নানা দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, জৈন ও খৃষ্টান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বী ও বিভিন্ন জাতীয় লোকের সঙ্গে আলাপ পরিচয়ের সুযোগ ঘটায়, অনেক বিষয়েই তাঁহার অভিজ্ঞতা হইয়াছিল। সেকালে তামিল দেশের বিভিন্ন জাতি ও সম্প্রদায়ের মধ্যে কোনরূপ ভেদবুদ্ধি ছিল না। পরস্পরে ধর্ম্ম, সমাজ ও জাতিভেদের মধ্য দিয়াও বেশ একত্র সহিত বাস করিতেন। বিদ্বেষের আগুন সপ্তম শতাব্দী হইতে তামিল দেশে প্রজ্জ্বলিত হইতে থাকে।

তিরুবল্লুর জাতি ও পরিচয় সম্বন্ধে নানা বিভিন্ন মত চলিয়া আসিতেছে এবং ইহার একটি সঠিক মীমাংসা হওয়াও বড় সহজ নহে, তবে তিরুবল্লুর যে নীচজাতীয়া বেলালা রমণীকে বিবাহ করিয়াছিলেন একথা সত্য। এই নারীর নাম ছিল বাসুকী। বাসুকী পতিব্রতা নারী ছিলেন।

কবি তিরুবল্লুর ছিলেন—জনসাধারণের লোক, সহজ সরলভাবে জীবনযাপন করিতেন। সৎ ও সাধু ছিলেন, কর্ম্মঠ ছিলেন, আত্মনির্ভরশীল, ঈশ্বরপরায়ণ এবং সুরসিক ব্যক্তি ছিলেন। তাঁহার

সরল ও সরস ব্যবহারে সকলেই আনন্দ পাইতেন। যেখানে তাঁতী তাঁত বুনিত, যেখানে কৃষক চাষ করিত, যেখানে ধুপি কাপড় কাচিত, জেলে জাল বাহিত, শ্রমিক কাজ করিত, সেইখানে সে সকল দীন দরিদ্রের কুটিরের অধিবাসীদের সহিত আলাপ-পরিচয় ও চলাফেরা করিতে তিনি ভালবাসিতেন। কবির হৃদয়টী ছিল ফুলের মত কোমল—তিনি শিশুদের আনন্দ কোলাহলের মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া রাখিতেন। তাহাদের তিনি এত ভালবাসিতেন যে অনেক সময় তাঁহাকে শিশুগণ পরিবেষ্টিত হইয়া বাস করিতে দেখা যাইত। তাঁহার সঙ্গে দলে দলে শিশুরা বেড়াইতে ভালবাসিত, হাসিত ও খেলিয়া আনন্দ পাইত।

তিরুবল্লুর চরিত্রের প্রধান গুণ এই ছিল যে—তিনি কপটতা একেবারেই জানিতেন না। দয়া, সত্যবাদিতা, সরলতা ও নির্ম্মল চরিত্রে ভূষিত যাঁহাদের জীবন তাহাদিগকেই তিনি ভালবাসিতেন।

তিরুবল্লুর সন্ন্যাসী ছিলেন না। তিনি গৃহী ছিলেন। পশু, পক্ষী, কীট, পতঙ্গ প্রভৃতি জীবজন্তুর গতিবিধি এবং প্রকৃতির বিচিত্রতার সহিত তাঁহার বিশেষ ঘনিষ্ঠতা ছিল। নীল আকাশ, নীল গিরিশ্রেণী, বনানীর শ্যামল সৌন্দর্য্য তাঁহাকে মুগ্ধ করিত। অনেক সময়ই তিনি জনসাধারণকে সহজ ও সরল কথায় নানা গল্প বলিয়া সুন্দর সুন্দর উপদেশ দিতেন। একমেবাদ্বিতীয়ং—একমাত্র ঈশ্বরই ছিল তিরুবল্লুর উপাস্য। তাঁহার গ্রন্থে মূর্ত্তিপূজার বা পৌত্তলিকতার নামমাত্রও উল্লেখ নাই। হিন্দু ধর্ম্মের, বৌদ্ধ ধর্ম্মের এবং খৃষ্ট ধর্ম্মের যাহা কিছু উৎকৃষ্ট ও গ্রহণীয় তাহাই তিনি সযত্নে গ্রহণ করিয়াছিলেন। শুধু গ্রহণ নহে, সেই সমুদয় সার সত্যের মণি সংগ্রহ করিয়া সুন্দর একখানি মণিমালা গাঁথিয়া দিয়াছেন। তাঁহার চরিত্রের প্রধান বৈশিষ্ট্য এই যে তাহাতে গোঁড়ামি বলিয়া কিছুই ছিল না। শৈবধর্ম্মের লোকেরা, বৌদ্ধেরা জৈনেরা এবং খৃষ্টানেরা সকলেই তাঁহাকে আপনার জন বলিয়া মনে করিতেন।



তিরুবল্লুর

'কুরলের' কবি কোন বিশেষ জাতি বা সম্প্রদায়ভুক্ত ছিলেন না। ময়লাপুরের কুটিরে বসিয়া দিনরাত্রি সমুদ্রের গর্জ্জন শুনিতেন, তরঙ্গমালার ফেনিল উচ্ছ্বাস নিরীক্ষণ করিতেন, আর আপনার মনে তাঁত বুনিতেন। যে তাঁহার কাছে আসিত—ধনী, নির্ধন, দীন, দরিদ্র অবজ্ঞাত নীচ জাতি সকলকেই তিনি হাসিমুখে অভ্যর্থনা করিতেন।

অলস, বহুভাষী নিষ্কর্ম্মা, কপট ও চরিত্রহীন ব্যক্তিদিগকে তিনি অন্তরের সহিত ঘৃণা করিতেন এবং সযত্নে তাহাদের সঙ্গ পরিত্যাগ করিতেন। লোকজনের সহিত মেলামেশা করিয়া, তাহাদিগকে আপনার করিয়া, তাঁহার যে অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল, গৃহকোণবন্দী কোন দার্শনিকের পক্ষে সেইরূপ জ্ঞানলাভ সুদুর্লভ। কুরলের প্রত্যেকটি শ্লোক হইতেই ইহা বুঝিতে পারা যায়।

কুরল গ্রন্থে গৃহস্থের কর্ত্তব্য, সাধু-সন্ন্যাসীর কর্ত্তব্য, রাজকর্ম্মচারীদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে উপদেশ আছে। এক কথায় তামিল দেশের সর্ব্ববিধ কল্যাণজনক বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থখানা ১৩৩টি অধ্যায়ে পরিসমাপ্ত। জনপ্রবাদ আছে যে সংস্কৃতে যেমন বেদ রচিয়াছে তামিলদেরও সেইরূপ গ্রন্থ চাই, সেজন্যই তিরুবল্লুর কুরল বা এই তামিল বেদ রচনা করিয়াছেন।

কুরল—তিনটি প্রধান ভাগে বিভক্ত। সংস্কৃত শাস্ত্রকারেরা যেমন মানুষের জীবনের উন্নতির মূলে—ধর্ম অর্থ ও মোক্ষ এই তিনটিকেই প্রধান বলিয়া মনে করেন, তেমনি তামিলী ভাষায়,—আরাম (ধর্ম) পবর (অর্থ) ইন্‌বাম মোক্ষ হইতেছে, চতুর্থ পদার্থ। জীবনের লক্ষ্য বা উদ্দেশ্য এই চারিটি স্তরে বিভক্ত।

কুরলের মতে আদর্শ গৃহী হইবেন—কর্তব্যনিষ্ঠ, জীবিতের প্রতি সমাদর এবং মৃতের প্রতি শ্রদ্ধা কথা মনে না রাখিলে চলিবে না। সেই দেড় হাজার বৎসর আগের তামিল দেশের শাসন ও সমাজের বিষয় আমাদের স্মরণীয়। কুরলের মতে কি রাজা, কি ধনী, কি নির্ধন, কি গৃহস্থ তাহাদের উচিত নারীদের উপর কতকগুলি বিষয়ে সম্পূর্ণভাবে নির্ভর করা। (১) নারী গৃহকর্ত্রী হইবেন, গৃহস্থালীর সমুদয় ভার তাঁহার উপর অর্পিত হইবে। (২) গৃহ-ব্যয় নির্ব্বাহের উপযোগী অর্থ তাঁহার হস্তে ন্যস্ত করিবে। (৩) সতী নারী গৃহস্থের অলঙ্কার (৪) পুরুষের উন্নতি, পুরুষের সম্পদ ও গৌরব গৃহলক্ষ্মীর উপর নির্ভর করিয়া থাকে।

তিরুবল্লুর রাষ্ট্রীয়-নীতির কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—রাজা রাজকার্য্যে কখনও নারীজাতির



ময়লাপুরের বর্ত্তমান দৃশ্য

প্রদর্শন করা হইবে তাঁহার শ্রেষ্ঠ ধর্ম। শিশু-সন্তানেরা হইতেছে গৃহস্থের ঐশ্বর্য্য। স্নেহ ও দয়াকে সর্ব্বদা তিনি আশ্রয় করিয়া থাকিবেন। অতিথি ও অভ্যাগতের জন্য সর্ব্বদা তাঁহার দ্বার মুক্ত থাকিবে। অতিথিকে হাস্যমুখে অভ্যর্থনা করিবে। তাহার সহিত একত্র ভোজন করিবে।

বাক্যে ও ব্যবহারে সকলের প্রতি শিষ্টাচার প্রদর্শন করা গৃহীর শ্রেষ্ঠ ধর্ম। দাস, দাসী, রুগ্ন শিশু, গৃহকর্ত্রী সকলের প্রতি সম্মান ও শ্রদ্ধাপূর্ণ ব্যবহার করিতে কখনও বিস্মৃত হইও না। হিংসা দ্বেষ, ঘৃণা কটুবাক্য ব্যবহার ও দুর্জ্জনের সংসর্গ গৃহীর পক্ষে সর্ব্বদা পরিত্যাজ্য।

নারী জাতির প্রতি কবির কিরূপ মনোভাব ছিল, এখানে সেকথা বলিতেছি। এসম্বন্ধে একটা মত গ্রহণ করিবেন না। তিনি বহু বিবাহের বিরোধী ছিলেন। তাঁহার মতে সমাজে নারীজাতিকে উন্নত করিতে হইলে, সমাজ হইতে বহু বিবাহ দূর করিতে না পারিলে, নারীজাতির কল্যাণ অসম্ভব। সেকালের একজন নীচজাতীয় ব্যক্তির রচিত গ্রন্থে নারীজাতির প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ উক্তি বিশেষ গৌরবজনক বলিতে হইবে।

'কুরল' রচনার সময় হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত এই তামিল বেদ-গ্রন্থের সমাদর একটুও হ্রাস পায় নাই। তামিল দেশের সাহিত্যে, সমাজে ও দৈনন্দিন জীবনে প্রতিনিয়ত কুরলের উক্তিসমূহ উচ্চারিত হইয়া থাকে। 'কুরল' সে দেশের হিন্দু, বৌদ্ধ, খৃষ্টান ও মুসলমান সকলেরই প্রিয়।

ঐতিহাসিক ভি, ভি, এস, আয়ার (V. V. S. Aiyar) লিখিয়াছেন—ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বেও তামিল জমিদারের ছেলেদের কুরলের রাষ্ট্রনীতি অধ্যায়টি পড়ান হইত। যাহাতে তাঁহারা কুরলের লিখিত



তিরুবল্লুর মন্দির—ময়লাপুর

আদর্শ অনুসারে জমিদারী শাসন করিয়া আদর্শ জমিদার হইতে পারেন। এইজন্যই ঐরূপ পঠনার উদ্দেশ্য ছিল। প্রায় পনের শত বৎসরকাল যাবৎ তামিল ঐতিহাসিকদের মতে কুরল তামিল দেশের 'The ethical Bible of the Tamil people' নামে পরিচিত।

'কুরলের' এত আদর কেন? তাহার মূল কারণ মানবপ্রীতি। কুরলের কোথাও জাতিগত সমাজগত বা সম্প্রদায়গত কোন প্রাধান্য দেওয়া হয় নাই। সব মানুষ সমান, সব মানুষ ভাই, এবং বিশ্বের সমুদয় মানুষকে লইয়াই মানবজাতি, ইহাই হইতেছে 'কুরলের' মূলনীতি। এখানে আমরা কুরলের কয়েকটি উক্তি উদ্ধৃত করিলাম।

তিরুবল্লুর বাণী

নির্ব্বোধ কে? যে নির্লজ্জ, স্বার্থপর, অলস, অমনোযোগী, লঘুচিত্ত এবং নিষ্ঠুর, স্নেহ-মমতাহীন।

* * *

পুরুষ কে?—সাহস, দয়া, বীরত্ব, নির্ভীকতা, সরলতা এবং যিনি পরোপকারী, তিনিই প্রকৃত পুরুষ।

* * *

যাহার মাথা ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নত হয় না, সে কি মানুষ? ঈশ্বরের চরণে যিনি প্রণত নহেন, তিনি কেমন করিয়া কালসাগর সাঁতরাইয়া পার হইবেন?

* * *

বৃষ্টির ধারা জীবনধারা। সে ত জল নয়, জীবন। তাহারই স্পর্শে মরুভূমিতে ফুল ফোটে, তারই বরিষণে সবুজ শস্যে ধরণী হাসে, গাছে গাছে শ্যামল পত্রপল্লবের শোভা ও সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি পায়। বৃষ্টিধারা না পড়িলে যেমন পৃথিবীর শ্বাস অনিবার্য্য, তেমনি যার হৃদয়ে সরসতা নাই, সেখানে কি ধর্ম্মের বিকাশ হইতে পারে?

* * *

আজ নয়, কাল ধর্ম্মপথের পথিক হইব, ঈশ্বরের আরাধনা করিব, এমন কথা বলিও না, আজই তাঁহার স্মরণ লও, মরণ সে ত প্রতি মুহূর্ত্তেই তোমার দিকে উঁকি মারিয়া আছে।

* * *

পিতামাতার সেবা, পত্নী-প্রীতি, দাসদাসীর প্রতি মধুর ব্যবহার, সন্তান-বাৎসল্য, অতিথি-সেবা, আত্মীয় স্বজন পরিপোষণ—ইহাই হইতেছে গৃহস্থের ধর্ম্ম।

* * *

সাধ্বী পত্নী কে? যিনি স্বামীর আয়ের উপযোগী ব্যয় করেন, যিনি স্বামীর ধর্ম্মপথের সহায় এবং যিনি স্বামীকে ভালবাসেন ও শ্রদ্ধা করেন,



বাল্মীকীর মন্দির—ময়লাপুর

রোগে, শোকে, দুঃখে সান্ত্বনা দেন। গৃহস্থের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাঁহার পত্নী। সাধ্বী-পত্নীর মত শ্রেয় ও প্রেয় আর পৃথিবীতে তাহার কেহ নাই।

স্বামীর সম্পদ পত্নী—পত্নীর ভূষণ স্নেহের দুলাল পুত্র-কন্যা।

*　*　*

মানুষের সাধনার ধন শিশু। বাঁশীর স্বর তারই মন প্রাণ মুগ্ধ করে—যেখানে শিশুর কল-হাস্যের আনন্দের লহরী নাচিয়া বেড়ায় না। শিশুর রাজ্যে অমৃত বর্ষণ হয়, শিশুর সঙ্গ স্বর্গের পথ দেখাইয়া দেয়, তাহাদের কথায় স্বর্গের বীণা বাজে।

*　*　*

প্রেম ও ভালবাসা স্বর্গের সুধা। যে হৃদয়ে সঙ্গীত নাই, প্রেম নাই, ভালবাসা নাই, সে হৃদয় মরুভূমি।

*　*　*

ধন-সম্পদের গৃহস্থের প্রয়োজন শুধু অতিথি-সেবা ও দরিদ্রের সেবার জন্য। 'অনিচাম' (দাক্ষিণাত্য প্রদেশের পুষ্পবিশেষ) ফুল যেমন শুকিলেই ঝরিয়া পড়ে,—তেমনি যে গৃহের অধিবাসী, প্রার্থীর প্রতি, অতিথির প্রতি মধুর স্নেহময় স্বাগত দৃষ্টি করে না, তাহার গৃহে সমাগত অতিথির প্রাণও ম্রিয়মাণ হইয়া পড়ে।

*　*　*

বিনয়, শিষ্টাচার, মধুর বচন- এই ত্রিরত্ন যাহার আছে, সে ত সম্রাট,—আর সব ত বুদ্বুদ মাত্র, তার আর কিই বা মূল্য আছে?

*　*　*

মানুষের উপকার ভুলিতে নাই—কিন্তু অপকার ভুলিতে আছে। পরের কল্যাণে, পরের উন্নতিতে যাহাদের হৃদয় ভাঙ্গিয়া যায়, তাহারা কখনও পৃথিবীতে উন্নতি লাভ করিতে পারে না।

*　*　*

যে শুধু কথা বলে, কাজ করে না, সে কি মানুষ নাকি? তাকে মানবজাতির কলঙ্ক বলিতে পার।

*　*　*

জলের গতি যেমন তাহার স্থান অনুসারে হয়, এবং আকারের পরিবর্ত্তন ঘটে, তেমনি কোন্ মানুষ কেমন তাহা তাহার বন্ধু দেখিয়াই চেনা যায়।

চিন্তা করিয়া কাজ করা ভাল। কাজ করিয়া চিন্তা করা কিছু নয়।

'না'—পারিব না, এমন কথা কখনও বলিও না। এমন কোন কাজ পৃথিবীতে নাই, যে কাজ চেষ্টা, যত্ন ও পরিশ্রম দ্বারা সম্পন্ন হয় না। যারা পৃথিবীতে কাজ অসমাপ্ত রাখিয়া যায়, পৃথিবী তাহাদিগকে ভুলিয়া যায়, যাহারা কর্ম্মী তাহাদেরই পৃথিবী স্মরণ রাখে।

*　*　*

বিপদ আসিলে ধৈর্য্য হারাইও না,—হাসি মুখে বিপদকে বরণ কর। এমন বিপদ নাই যাহাকে ধৈর্য্য, শ্রম ও যত্ন দ্বারা জয় করা যায় না।

*　*　*

বাগ্মিতা বিধাতার দান,—এদান যে পাইয়াছে, সে অনেক বিপদ হইতে আত্মরক্ষা করিতে পারে। মানুষ যদি তোমার সহিত শত্রুতা করে, তাহার শত্রুতা করিতে যাইও না। প্রতিহিংসার দ্বারা হৃদয় জয় করা যায় না।

*　*　*

নিঃসঙ্গ অবস্থায় জীবনযাপনও ভাল, তবু অসৎ সংসর্গ ও অসৎ বন্ধুর সঙ্গ পরিত্যাজ্য।

*　*　*

সকল মানুষই জন্মকালে সমান থাকে, কিন্তু জীবনে শ্রম ও যত্ন দ্বারা নিজেকে উন্নত করে।

*　*　*

কুরলে এমন বিষয় নাই, যে বিষয়ে শিক্ষা ও উপদেশ না আছে। কৃষিকার্য্য সম্বন্ধে কবির উপদেশগুলি তাঁহার অভিজ্ঞতার ফল। কবি বলেন—মাতা বসুন্ধরা অলস কৃষককে দেখিয়া হাস্য করেন। চাষ-বাস শ্রমসাধ্য হইলেও মানুষের শ্রেষ্ঠ কর্ম্ম। যে কৃষক বাড়ী বসিয়া থাকে, ক্ষেতে কাজ করিতে যায় না, সে মনুষ্য সংজ্ঞার অন্তর্ভুক্ত হইবার অযোগ্য। এইরূপ অনেক সুন্দর সুন্দর কথা কুরলে আছে।

ঈশ্বর এক, এবং সমুদয় ধর্ম্মমত একই পথে একই লক্ষ্যে পরিচালিত, কুরলের এই সার সত্যটি সর্ব্বধর্ম্মসমন্বয়ের পথপ্রদর্শক। একজন নীচজাতীয় লোক যাহার জাতি এবং বংশ অজ্ঞাত, তাঁহার বিরচিত গ্রন্থের এই উচ্চ আদর্শ কত বড় গৌরবের তাহা স্মরণ করিলে মুগ্ধ হইতে হয়।



দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

[কবি গোবিন্দচন্দ্র রায় যমুনা-লহরী রচনা করিয়াছিলেন। এই সঙ্গীতটি সর্ব্বপ্রথমে কালীপ্রসন্ন ঘোষ সম্পাদিত ঢাকার 'বান্ধব' পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছিল। সে প্রায় ষাট বৎসর পূর্ব্বের কথা। গোবিন্দবাবু আগ্রা-প্রবাসী ছিলেন। কথিত আছে যে, এই অমর জাতীয় সঙ্গীতটি তিনি যমুনার তীরে বসিয়া রচনা করিয়াছিলেন। গোবিন্দবাবু প্রথমে কাশী প্রবাসী হন। পরে আগ্রা যাইয়া হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করেন, এবং মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত সেখানেই বাস করিয়াছিলেন। ইহাঁর রচিত 'যমুনা-লহরী', 'ভারত-বিলাপ' প্রভৃতি সঙ্গীত দুইটি বাংলা সাহিত্যক্ষেত্রে অমর হইয়া আছে। এই কবিতাটিকে লগ্না রাগিণীতে হিন্দুস্থানী ধরণে গান করা যাইতে পারে। চেকদের জাতীয় সঙ্গীতটির অনুবাদ করিয়াছেন সুকবি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র।]

যমুনা-লহরী


গোবিন্দচন্দ্র রায়

নির্ম্মল সলিলে, বহিছ সদা
তটশালিনী সুন্দর যমুনে! ও।
কত শত সুন্দর নগরী তীরে,
রাজিছে তটযুগ ভূষি ও।
পড়ি জল নীলে, ধবল সৌধ ছবি,
অনুকারিছে নভ অঙ্গন ও।
যুগ যুগ বাহী, প্রবাহ তোমারি,
দেখিল কত শত ঘটনা ও।
তব জল বুদ্‌বুদ্ সহ কত রাজা
পরকাশিল লয় পাইল ও।

কলকল ভাষে, বহিয়ে কাহিনী
কহিছ সবে কি পুরাতন ও।
স্মরণে আসি, মরম পরশে কথা,
ভূত সে ভারত-গাথা ও।
তব জল-কল্লোলে সহ কত সেনা
গরজিল কোন দিন সমরে ও।
আজি সব নীরব, রে যমুনে সব,
গত সত বৈভব কালে ও।
শ্যাম সলিল তব, লোহিত ছিল কভু
পাণ্ডব-কুরুকুল-শোণিতে ও।
কাঁপিল দেশ, তুরগ-গজ ভাবে
ভারত স্বাধীন সেদিন ও।
দেখিলে কি তুমি, বৌদ্ধ পতাকা
উড়িতে দেশ বিদেশে ও।
তিব্বত চীনে, ব্রহ্ম তাতাবে,
ভারত স্বাধীন সে দিন ও।
এ পয়ঃ পারে, কত কত জাতীয়
ভাতিল কত শত রাজা ও।
আসিল স্থাপিল, শাসিল রাজ্য
রচি ঘর কত পরিপাটি ও।
কত শত দুর্জ্জয়, দুর্গম দুর্গে,
বেড়িল তব তটদেশে ও।
নগর প্রাচীরে, ঘেরিল শেষে,
চির-যুগ সম্ভোগ আশে ও।
উপহসি সর্ব্বে, মানব গর্ব্বে,
কাল প্রবল চিরকালে ও।
গৃহ গড় পুঞ্জে, কতিপয় তুঞ্জে
রাখিল করি বিকলাকৃতি ও।
ঐ পুরোভাগে, ভগ্ন বিভাগে
গৃহবর শেষ শরীরে ও।

দেখিছ যে সব, উজ্জ্বল লেখা
সে গত যৌবন রেখা ও।
এর অলিন্দে, সুন্দরী-বৃন্দে,
মোগল নরপতি কেশরী ও।
বসি ও মর্ম্মরে, উল্লাস অন্তরে
শোভিত মোহনরূপে ও।
কভু এ গবাক্ষে, কৌতুক-চক্ষে
নিরখিত পরিজন লইয়ে ও।
নিম্ন প্রদেশে, সে গজ-যুদ্ধে
ভীষণ প্রাণ-বিনাশক ও।
কৈ? সব আজি, সময়-সমুদ্রে
মজ্জিত সহ শত আশা ও।
দেখিল শত শত, হ'লো কি নিবারিত
নিষ্প্রভ মনুজ-পিপাসা ও।
যে গৃহ-অঙ্গে বহুবিধ রঙ্গে,
বিখচিত ছিল মণিরাজি ও।
সে সব কালে, হায়! এক কালে
ঢাকিল লূতা-জালে ও।
ঐ তব তীরে, শুভ্র শরীরে
দণ্ডায়িত গৃহ-রাজ ও।
যার স্বরূপে, দিক দিক হ'তে
কর্ষিত মনুজ-সমাজে ও।
আহা! কত কাল, রবে এ জীবিত
তটিনি! তট তব শোভি ও।
ভূষণ হইয়ে, তব জল নীলে,
বাঞ্ছিত মন-অভিলাষে ও।
যদি এই শেষ, রবে সব শেষ,
জীবন স্বপন প্রভাতে ও।
তনু মম ক্ষয়িয়ে, দুখ শত সইয়ে
চরিছে লোক কি আশে ও?

দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

[এই সঙ্গীতটির রচয়িতা স্বনামপ্রসিদ্ধ সাহিত্য-রথী রায় কালীপ্রসন্ন ঘোষ বাহাদুর সি, আই, ই। ১২৮১ সনে ইহাঁর সম্পাদিত সুপ্রসিদ্ধ মাসিক পত্র 'বান্ধব' প্রকাশিত হয়। 'বান্ধবের' প্রতিপত্তি সর্ব্বজন বিদিত। বঙ্কিমচন্দ্রের 'বঙ্গদর্শন' ও 'বান্ধব' প্রায় একই সময়ে প্রকাশিত হইয়াছিল।]



কালীপ্রসন্ন ঘোষ

জননী জন্মভূমি স্বর্গ তুমি মহীতলে।
পূজিব পা-দুখানি আজি মোরা অশ্রুজলে।
আমরা অভাজন, জানি না মা কেমন
তবু মা পালিতেছ অন্নজলে রাখি কোলে।
নাহি মা অঙ্গে বল, সম্বল অশ্রুজল,
দিব তাই ভক্তি-ফুলে শ্যামল পদ-কমলে।
হৃদয়ের ছিন্ন তারে, ডাকি আজ মা তোমারে
হৃদয়ে ভাত' তুমি ফুল্ল শ্বেত শতদলে।

আশার স্বপন

[বঙ্গের শ্রেষ্ঠা মহিলা কবি কামিনী রায়ের রচিত এই কবিতাটি এক সময়ে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল। ইহাঁর রচিত 'আলো ও ছায়া' একখানি প্রসিদ্ধ গ্রন্থ। ইহা সর্ব্বজন সমাদৃত।]

তোরা শুনে যা আমার মধুর স্বপন,
শুনে যা আমার আশার কথা,
আমার নয়নের জল রয়েছে নয়নে
প্রাণের তবুও ঘুচেছে ব্যথা।
এই নিবিড় নীরব আঁধারের তলে
ভাসিতে ভাসিতে নয়নের জলে
কি জানি কখন কি মোহের বলে
ঘুমায়ে ক্ষণিক পড়িনু হেথা।
আমি শুনিনু জাহ্নবী যমুনার তীরে
পুণ্য দেবস্তুতি উঠিতেছে ধীরে,
কৃষ্ণা গোদাবরী নর্ম্মদা কাবেরী
পঞ্চনদ-কূলে একই প্রথা।



কামিনী রায়

আর দেখিনু যতেক ভারত-সন্তান
একতায় বলী জ্ঞানে গরীয়ান্
আসিছে যেন গো তেজোমূর্ত্তিমান্
অতীত সুদিনে আসিত যথা।

ঘরে ভারত-রমণী সাজাইছে ডালি,
বীর শিশুকুল দেয় করতালি,
মিলি যত বালা গাঁথি জয়মালা
গাহিছে উল্লাসে বিজয়-গাথা।

চেক

কোথা মোর ঘর? কোথা গৃহ কোণ মম?
শ্যামল মাঠের বুকের ভিতর দিয়া
যেথা মন্তবা নদী যায় প্রবাহিয়া,
উপলে উপলে উচ্ছল দুর্দ্দম
ঝর্ণা প্রবাহ যেথায় লম্ফভরে
ধায় দ্রুতবেগে, বসন্ত ফুল ফলে
ধরা'পরে যেথা স্বর্গরচনা করে,
—সেই নিরালায় শোভার পীঠস্থলে
পিতৃভূমি মোর 'বোহিমিয়া' লোকে বলে।
কোথা গৃহ মোর? কোথা আমি বাস করি?
জান কি তোমরা দেবতার প্রিয় দেশ,
মহাত্মাগণ দিব্য মূরতি ধরি'
থাকেন যেথায়, পুড়ে হয় নিঃশেষ
শত্রু-গর্ব্ব যাঁদের দৃষ্টিপাতে
বহ্নিদীপ্ত স্বাধীনতা গৌরবে?
মোরা চেক্‌জাতি সমাদৃত অবনীতে,
চেক্‌দের মাঝে মোর সনে দেখা হবে,
চিরঠাঁই সেথা লভি যেন এই ভবে।



আয়ার্ল্যাণ্ড

(মূর হইতে)

ধন্য ব্রায়েন্, গৌরব তার মনে রেখো,
রেখো মনে!
যদিও সে আজ শীতল কবরে 'মনোনিয়া'
শেষ রণে!

ফিরিবে না সে তো এ ভবনে আর
জয়তারা হায় ডুবেছে এবার!
সেই শৌর্য্যের আলোকে আবার
অই অসি ঝন্‌ঝনে—

দেশ-বিদেশের জাতীয় সঙ্গীত

জ্বলুক বহ্নি খড়্গে খড়্গে বিজয় লাভের পণে
শুধু ব্রায়েনের গৌরব-গাথা মনে রেখো,
বেখো মনে।
'মনোনিয়া' তোবে গড়িল যে ধাতা বিবিধ
বর্ণরাগে—



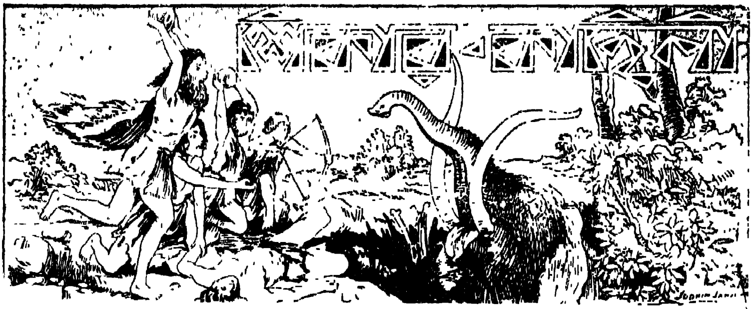
ইচ্ছা কি তাঁর, অত্যাচারীর চরণ সেথায়
জাগে ?
চাই মোরা শুধু চির স্বাধীনতা,
স্বপনেও যেন ভুলি না সে কথা,
স্বাধীনতা মোর স্বদেশ-দেবতা ;
বল্‌গে ওলন্দাজে—
দেশ-শত্রুরে তাড়াতে মোদের অনেক
রক্ত আছে,
তাব বিনিময়ে (হোক্ না ক্ষণিক) যাব না
কারার মাঝে।
মনে কব দেখি হতাহত সেই বিপুল
ক্ষিপ্ত জাতি
ছিল যাবা সেই ঘোর দুর্দ্দিনে ত্যজি দারা
সুত সাথী !
শ্যাম তৃণ-বীথি রক্তেতে লাল,
মরণের তরে নর পালে পাল
স্থির প্রতিজ্ঞ,—কত না কপাল
রয়েছে "ওশরী" ক্ষেতে !
কিসের শঙ্কা ? আয় তোরা সবে আজি
দুর্যোগ রেতে,
হোক্ বৃথা মরা, সেও ভাল এই অপমানে
বাঁচা হ'তে।

আগে চল্ আগে চল্ ভাই

চিরদিন আছি ভিখারীর মত
জগতের পথ পাশে,
যারা চ'লে যায় কৃপা চক্ষে চায়,
পদধূলা উড়ে আসে।

ধূলিশয্যা ছাড়ি উঠ উঠ সবে,
মানবের সাথে যোগ দিতে হবে,
তা যদি না পার, চেয়ে দেখ তবে
ওই আছে রসাতল, ভাই,
আগে চল্ আগে চল্ ভাই।

F. 9—30



আফ্রিকার বনে শিকার

পৃথিবীতে মানুষ যে সকলের শেষে আসিয়া জন্মিয়াছে, সে কথা তোমরা জান। যেদিন তাহারা পৃথিবীতে আসিল, সেদিন হইতেই তাহাদের বাঁচিবার জন্য যুদ্ধ চলিল। কি খাইয়া বাঁচিবে, কেমন করিয়া বাস করিবে, কি তাহারা পরিবে, এই সব নানা সমস্যা আসিয়া দাঁড়াইল। সেই অতি আদিকালে—সেই লক্ষ লক্ষ বৎসর আগে, আদি মানবেরা যখন গুহা-গৃহে বাস করিত তখন তাহাদের যুদ্ধ করিতে হইত বন্য জন্তুদের সঙ্গে। এ যুদ্ধ ত স্বাভাবিক। তখন ত আর লণ্ডন সহর, কলিকাতা সহর, বোম্বাই, মাদ্রাজের মত সহর ছিল না! আর এমন সুন্দর বাড়ী ঘরও ছিল না! তখন ছিল ঘন নিবিড় বন। সে বনে সূর্য্যের আলোও প্রবেশ করিতে পারিত না, আর সেখানে বাস করিত হিংস্রপ্রাণীরা আর সেকালের মানুষ। মানুষও বাঁচিতে চাহিত, আর হিংস্র প্রাণীরাও বাঁচিতে চাহিত, কাজেই দুই পক্ষেই আক্রমণ চলিত। মানুষের ত আর হিংস্রপ্রাণীদের মত বড় বড় দাঁত, ধারালো নখ ছিল না, পশুদের মত গায়ে খুব বেশী জোরও ছিল না, কাজেই তাহাদের গাছের ডালা, পাথর এবং অন্য প্রকারের হাতিয়ারের বা অস্ত্রশস্ত্রের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইত। হিংস্র জন্তুদের সঙ্গে যুদ্ধ করিবার প্রয়োজন মানুষের দুই কারণেই হইয়াছিল। প্রথমত: আত্মরক্ষা, দ্বিতীয়ত: খাদ্য। সেকালে ত আর চাষবাস তাহারা জানিত না, কাজেই বনের পশুপক্ষী শিকার করিয়া তাহাদের মাংস খাইয়া জীবনধারণ করিত। তারপর যুগের পর যুগ চলিতে লাগিল, মানুষ জঙ্গল কাটিয়া পল্লীর সৃষ্টি করিল, ঘরবাড়ী নির্ম্মাণ করিল, কাপড় পরিতে শিখিল, চাষবাস শিখিল, আগুন জ্বালিতে শিখিল, এইভাবে ক্রমশঃ তাহাদের শিক্ষা ও সভ্যতা বাড়িয়া উঠিল—এবং তাহার পরিণতিতে যে পৃথিবীর সর্ব্বত্র কত বড় বিরাট এক মনুষ্য সভ্যতা ও সুবিস্তৃত মানব জাতি গড়িয়া উঠিয়াছে তাহা ত তোমরা দেখিতেই পাইতেছ।

মানুষ যেমন সভ্যতার পথে অগ্রসর হইল, তেমনি তাহারা ক্রমশঃ নানা প্রকার অস্ত্রশস্ত্র আবিষ্কার করিল। আগ্নেয়াস্ত্র যেমন বন্দুক, কামান ইত্যাদির আবিষ্কার করিল, এখন ত দেখিতেই পাও যে লোকে বন্দুক লইয়া শিকার করে। এই শিকারের জন্য বা পশুবধের জন্যই দিন দিন সিংহ, ব্যাঘ্র, গণ্ডার, হস্তী, অজগর প্রভৃতির বংশ লোপ পাইতেছে এবং সভ্যতা ও মানুষের বংশ বৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে গভীর গহন বন নগরে পরিণত হইতেছে।

শিকার সেকালেও একটি আমোদজনক ক্রীড়া ছিল। প্রাচীন ভারতের নৃপতিরা গজপৃষ্ঠে ও অশ্বপৃষ্ঠে আরোহণ করিয়া শিকার করিতেন। সে সব শিকারের কথা তোমরা সংস্কৃত নাটকে ও সাহিত্যে পড়িতে পারিবে। সেকালে রাজারা বেশির ভাগ হরিণ বা মৃগ শিকার করিতেন বলিয়া

তাহাকে বলিত মৃগয়া। শিকার করিতে খুব সাহসিকতা, দক্ষতা এবং ক্ষিপ্রকারিতার প্রয়োজন। আমরা একে একে তোমাদের কাছে নানা দেশ-বিদেশের শিকারের গল্প বলিব।

আফ্রিকার বনে ডাক্তার লিভিংষ্টোন সাহেবের সিংহ শিকার

ডেভিড লিভিংষ্টোনের কথা তোমরা জান। (শিশুভারতী · ১৩২৯ পৃষ্ঠা) তিনি যখন দক্ষিণ আফ্রিকার মাবোৎসা (Mabotsa) নামক একটি গ্রামে বাস করিতেছিলেন, সে সময়ে সে গ্রামের লোকেরা সিংহের আক্রমণে ভয়ানক বিপদে পড়িয়াছিল। গ্রামখানি পাহাড়ে ঘেরা একটি সুন্দর শ্যামল উপত্যকার মধ্যে অবস্থিত ছিল। এই উপত্যকার চারিদিকের পাহাড়গুলি ছিল গভীর বনে ঢাকা। কাজেই এই গ্রামের লোকদের প্রায়ই সতর্ক থাকিতে হইত। কেন জান? ঐ বনে বাস করিত আফ্রিকার ভয়ানক বন্য হস্তী এবং আফ্রিকার হিংস্র সিংহ।

সিংহেরা রাত্রিকালে আসিয়া গ্রামের পালিত পশু সকল যেমন আক্রমণ করিত, তেমনি দিনের বেলাও নির্ভয়ে আসিয়া পশুর পালে পড়িত। গ্রামের লোকেরা কয়েকবার সিংহ তাড়াইতে গিয়াছে কিন্তু লোকগুলি ভীরু স্বভাবের বলিয়া দূর হইতেই সিংহের পাল দেখিয়া ফিরিয়া আসিয়াছে। এই গ্রামের বাক্তালা জাতীয় লোকগুলি বেচুয়ানা জাতির লোকদের সহিত তুলনায় অত্যন্ত ভীরুস্বভাবের, কাজেই প্রত্যহ সিংহের এইরূপ উৎপীড়ন সহ্য করিয়াও তাহারা ইহার প্রতিকার করিতে পারে নাই।



আদি মানবের আত্মরক্ষা

সিংহের পালের মধ্যে যদি একটা সিংহকে মারিয়া ফেলা যায়, তাহা হইলে পালের অন্যান্য সিংহগুলি সে গ্রাম ছাড়িয়া পালাইয়া যায়।

দিন দিন যখন সিংহের উৎপাত ক্রমশঃই বাড়িয়া চলিল, তখন লিভিংষ্টোন সাহেবও গ্রামের লোকদের সহিত মিলিয়া সিংহ-শিকারে চলিলেন।

লিভিংষ্টোন সাহেব লিখিয়াছেন,—"আমরা গিয়া দেখিলাম, একটা ছোট পাহাড়ের উপর সিংহগুলি

একটি মহিষকে অতি ভীষণভাবে আক্রমণ করিয়াছে। পাহাড়টি বন জঙ্গলে ঘেরা। আমাদের দলের লোকেরা বৃত্তাকারে পাহাড়ের দিকে অগ্রসর হইল। মেব্‌লো নামে একজন গ্রাম্য শিক্ষকের সহিত আমি পাহাড়ের নীচের সমতল ভূমিতে অপেক্ষা করিতেছিলাম, আমরা সেখান হইতে দেখিলাম যে, আমাদের কাছাকাছি ছোট শিলাস্তূপের উপর একটি সিংহ বসিয়া আছে,—শিকারের অতি উত্তম সুযোগ, একেবারে বন্দুকের নিশানার মধ্যে।

সাহসী নয় বলিয়া ভয়ে কিছুই করিতে পারিল না বরং তাহারা যেরূপ মণ্ডলী গড়িয়া দাঁড়াইয়াছিল সেই মণ্ডলীটি ভাঙ্গিয়া গেল। আবার যখন মণ্ডলী গড়া হইল তখন আমরা দেখিতে পাইলাম ঐ ছোট শিলাস্তূপের উপর আরো দুইটী সিংহ বসিয়া আছে। কিন্তু কি ভাবে গুলি করা যায় তাহাই সমস্যা হইয়া দাঁড়াইল। কেননা যদি গুলি করা যায় তাহা হইলে আগের সিংহটী যেমন আমাদের ছত্রভঙ্গ করিয়া পালাইয়া গিয়াছিল এই দুটী সিংহও



আদি মানব—শিকার প্রতীক্ষায়

মেব্‌লো সিংহটিকে যেমন দেখিল, অমনি তাহাকে লক্ষ্য করিয়া গুলি ছুঁড়িল। কুকুরকে ঢিল ছুঁড়িলে বা লাঠি ছুঁড়িলে সে যেমন খানিকক্ষণ সে যায়গাটা আঁচড় মারিয়া ও কামড়াইয়া শেষটায় ছুটিয়া পালায়—সিংহটাও সেরূপ করিয়া আমাদের উপর দিয়া অক্ষত দেহে লাফাইয়া পালাইয়া গেল।

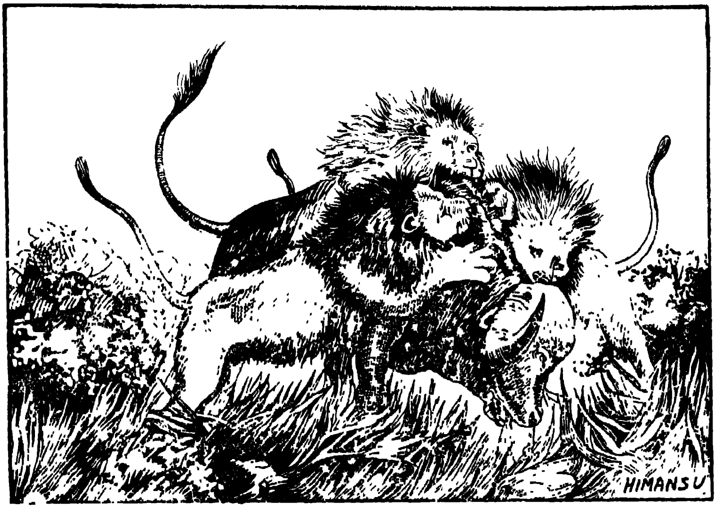
বাক্‌তলার লোকেরা যদি ঐ সিংহটাকে বল্লম ছুঁড়িয়া মারিত তাহা হইলে অতি সহজেই মারিয়া ফেলিতে পারিত, কিন্তু এই লোকগুলি তেমন

হয়ত সেই ভাবে ছুটিয়া পলাইবে। আর একটা ভয় ও ছিল, যদি গুলি লক্ষ্যভ্রষ্ট হয় তাহা হইলে কোন মানুষের গায়ের উপর লাফাইয়া পড়াও অসম্ভব ছিল না।

আমি এইরূপভাবে সব দিক বিবেচনা করিয়া গ্রামে ফিরিয়া যাওয়াই ঠিক করিলাম। ফিরিবার পথে যখন পাহাড়টি ঘুরিয়া আমাদের গ্রামের দিকে চলিয়াছি তখন দেখিতে পাইলাম আমার ঠিক সম্মুখে একটী ছোট পাহাড়ের উপর আর একটি

সিংহ বসিয়া আছে, আমার কাছ হইতে ৩০ গজের বেশী দূর হইবে না। সিংহটার সম্মুখে ছোট একটি ঝোপ ছিল, এমন সুযোগ কি ছাড়া যায়, আমি ঝোপের ভিতর দিয়াই সিংহটিকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলি ছুঁড়িলাম। আমার দলের লোকেরা চীৎকার করিয়া উঠিল,—'সিংহটা মারা গিয়াছে! সিংহটা মারা গিয়াছে।'

আর একদল লোক বলিয়া উঠিল—"অন্য একজন ও সিংহটাকে গুলি করিয়াছে, চল আমরা করে আর ঘেউ ঘেউ শব্দ করিতে থাকে সিংহটাও তেমনি আমাকে লইয়া খেলিতে লাগিল। তাহার এইরূপ আক্রমণে আমার মনে হইতেছিল যেন আমি স্বপ্ন দেখিতেছি এতটুকু ভয় কিংবা কোন যন্ত্রণা বোধ করিতেছিলাম না যদিও কি ঘটিতেছে না ঘটিতেছে সকলই আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। ক্লোরফর্ম দ্বারা রোগীকে অস্ত্র করিবার সময় রোগীর যেরূপ মনের অবস্থা হয়, জ্ঞান থাকিলেও অস্ত্রোপচারের যন্ত্রণা বোধ করে না, আমার



একটি মহিষকে আক্রমণ করিয়াছে

সিংহটার কাছে যাই।" আমি চাহিয়া দেখিলাম রাগে সিংহটার লেজ খাড়া হইয়া উঠিয়াছে। আমি লোকদিগকে বলিলাম "তোমরা একটু চুপ কর আমি গুলি ভরিয়া লই, আবার গুলি করিতে হইবে।" এদিকে যখন গুলি ভরিতেছিলাম তখন একটা বিকট গর্জ্জন শুনিলাম। চাহিয়া দেখিলাম সিংহটা আমার উপর লাফাইয়া পড়িতেছে, সিংহটা মুহূর্ত্তের মধ্যে আমার গলা ধরিয়া ফেলিল এবং আমার গলা কামড়াইয়া ধরিল। এই অবস্থায় সিংহ ও আমি দুইজনে মাটিতে পড়িয়া গেলাম। কুকুর যেমন ইঁদুর লইয়া খেলা অবস্থাটাও ঠিক সেইরূপ হইয়াছিল। আমার মাথার পিছনে সিংহটার থাবা ছিল, তাহার শরীরের ওজনে আমি নড়াচড়া করিতে পারিতেছিলাম না। কোন প্রকারে তাহার থাবাটার বোঝা হইতে মুক্ত হইতে পারি কি না আমি সেই দিকে বিশেষ করিয়া লক্ষ্য করিতেছিলাম। আমার এইরূপ শোচনীয় অবস্থা দেখিয়া মেব্‌লো প্রায় পনের গজ দূর হইতে সিংহটাকে লক্ষ্য করিয়া একটি গুলি ছুঁড়িল; কিন্তু তাহার দোনালা বন্দুকের দুটি গুলিই ব্যর্থ হইয়া গেল। সিংহটা তৎক্ষণাৎ আমাকে ছাড়িয়া দিয়া মেবলোকে আক্রমণ করিয়া

তাহার উরুদেশে কামড়াইয়া দিল। আর একজন লোক এই সময়ে সিংহটার দিকে একটা বল্লম ছুঁড়িয়া মারিল, এই লোকটিকে একবার আমি বুনো মহিষের আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলাম। সিংহটা এইবার মেবলোকে ছাড়িয়া আবার ঐ লোকটির গলা কামড়াইয়া ধরিল। এদিকে বন্দুকের গুলির আঘাতের ফল ফলিল। সিংহটি হঠাৎ মাটিতে পড়িয়া মরিয়া গেল। এই ঘটনা ঘটিতে মাত্র কয়েক মুহূর্ত সময় লাগিয়াছিল। আমার বাহুতে সিংহের আক্রমণের ফলে যে ক্ষত হইয়াছিল, তাহার দরুন আমি বিশেষ যন্ত্রণা বোধ

একদিন আমি লোকজনের হৈ চৈ ও গোলমাল হইতে দূরে থাকিয়া একটি গাছের ছায়ায় বসিয়া বিশ্রাম করিতেছি, এইরূপ সময় দেখিতে পাইলাম যে প্রায় আধ মাইল পথ দূরে উপত্যকার নিম্ন-ভাগে একটি হস্তিনী ও তাহার শাবক বিচরণ করিতেছে। শাবকটি ছোট নদীটির কাদামাখা জলে গড়াইতেছে, আর হস্তিনী তাহার বড় বড় কান দুইটি নাড়িয়া নাড়িয়া তাহাকে বাতাস দিতেছে। আমার দলের লোকেরা হস্তিনী ও তাহার শাবকটিকে দেখিয়া শিকারের জন্য ক্ষেপিয়া উঠিল এবং তাহাদের তীর বল্লম প্রভৃতি লইয়া



আমাকে আক্রমণ করিল

করিয়াছিলাম। এই ক্ষত সারিয়া গেলেও আমি মাঝে মাঝে বেদনার হাত হইতে মুক্তি লাভ করি নাই।

হস্তিনীর সন্তান-স্নেহ

আর একবার লিভিংষ্টোন সাহেব একটি সুন্দর পাহাড়ের ঢালু জমিতে শিবির স্থাপন করিয়া-ছিলেন। সে দেশের নদীকূলে হস্তিযূথ পালে পালে বিচরণ করিত। কাফ্রিরা হাতীর মাংস খায় এবং হাতী শিকার করিতেও তাহারা খুব আমোদ পায়। তিনি লিখিয়াছেন যে :—

সেই নদীর দিকে ছুটিয়া চলিল। আমি দূরবীণ দিয়া দেখিতেছিলাম, কিভাবে তাহারা শিকার করে।—লোকগুলি হস্তিনী ও তাহার শাবকের কাছাকাছি গিয়া হল্লা করিতে আরম্ভ করিয়া দিল।

তাহাদের চীৎকারে হস্তিনী ও তাহার শাবক জল খেলা ছাড়িয়া যেমন দাঁড়াইল, অমনি দলের লোক গুলি তাহাদের দিকে বল্লম ছুঁড়িয়া মারিতে লাগিল। হস্তিনী যতক্ষণ জীবিত ছিল ততক্ষণ সে শাবককে আড়াল করিয়া রাখিয়াছিল,—হস্তিনীর মৃত্যুর পরে, শাবকটি নিহত হইল। কি অদ্ভুত সন্তান স্নেহ!



বিশ্বসাহিত্য

আজব দেশে এ্যালিস্

২২১২ পৃষ্ঠার পর

[আজব দেশে এ্যালিস্ Alice in wonderland—নামক গল্পটি ছেলেমেয়েদের অতি প্রিয়। বর্ত্তমান যুগের কোন রূপকথাই তুলনায় ইহার কাছে দাঁড়াইতে পারে না। এই গল্পটি লিখিয়াছিলেন চার্লস লাটউইজ ডজসন (Charles Lutwidge Dodgson)। তাঁহার লুইস ক্যারল (Lewis Carroll) নামটিই কিন্তু সকলের পরিচিত। লুইস ক্যারলের তিনটি ছোট মেয়ে ছিল বড় প্রিয়। তাহাদের একটির নাম ছিল এ্যালিস্ (Alice)। এ্যালিস্ সকল সময়ে ক্যারলকে বলিতেন—একটা গল্প বল না? একদিন ক্যারল তার এই ছোট তিনটি বন্ধুকে লইয়া নদীর ধারে, ছোট বনের পাশে বনভোজন করিতে যাইয়া তাহাদের নিকট আজব দেশে এ্যালিসে'র (Alice in wonderland) গল্পটি বলেন। সেদিনকার সেই গল্পটি যে এ্যালিসকে উদ্দেশ করিয়া বলেন, পরে যখন উহা বইয়ের আকারে প্রকাশ করিলেন তখনও ঐ "Alice in wonderland" নামটিই রাখিয়াছিলেন। চার্লস' ডজসন ১৮৩২ খৃষ্টাব্দের ২৭শে জানুয়ারী ডারিসবেরি নামক স্থানে জন্মগ্রহণ করেন। রাগবি এবং অক্সফোর্ডে শিক্ষা লাভ করিবার পর তিনি কিছুদিন অঙ্কশাস্ত্রে অধ্যাপনার কার্য্য করে। ক্রাইষ্টচার্চ' কলেজের ডিনের মেয়ে এ্যালিস লিডেল ও তার দুইটি বোনের কাছে তিনি এই গল্পটি বলিয়াছিলেন। ১৮৬৫ খৃষ্টাব্দে "Alice in wonderland" ও ১৮৭১ খৃষ্টাব্দে তাঁহার লিখিত Looping Glan প্রকাশিত হইয়াছিল। এই বই দুইখানা পৃথিবীর সব দেশের ছেলেমেয়েদের অতি প্রিয় গ্রন্থ। ডজসনের বৈজ্ঞানিক গ্রন্থের নাম হইতেছে—Curious Mathematics and symbolic Logic। ১৮৯৮ খৃষ্টাব্দে এই জনপ্রিয় লেখকের মৃত্যু হয়। পৃথিবীর নানা ভাষায় Alice in wonderlandএর অনুবাদ হইয়াছে। বাঙ্গালা ভাষায়ও ইহার কয়েকখানি অনুবাদ আছে। এই গল্পটি সব দেশের ছেলেমেয়েরাই ভালবাসে। তোমাদেরও যে ভাল লাগিবে তাহা নিশ্চিত।



একদিন এ্যালিসের দিদি এ্যালিসের পাশে বসিয়া একখানা কি যেন বই পড়িতেছিলেন। কিন্তু সেই বইখানিতে না ছিল ছবি আর না ছিল ছড়া। দু'একবার উঁকি-ঝুঁকি মারিয়াও এ্যালিস্ যখন সেই বইখানির মধ্যে একটিও ছবি বা ছড়া খুঁজিয়া পাইল না তখন সে বিরক্ত হইয়া মনে মনে ভাবিল যে ঐরকম ছাইভস্ম বই আবার মানুষে পড়ে! তাহার দিদির হাতের বইখানির মধ্যে তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিবার মত কিছুই ছিল না। কাজে কাজেই সেখানে সে বেচারীর চুপচাপ বসিয়া থাকা ছাড়া আর কোনও উপায় ছিল না। একে সেদিন বেজায় গরম, তাহাতে আবার চুপচাপ বসিয়া থাকা! ইহাতে এ্যালিসের বেজায় ঘুম পাইতে লাগিল। ঘুমন্ত চোখে সে ভাবিতে লাগিল যে সে কি বেশ করিয়া একঘুম ঘুমাইয়া লইবে, না উঠিয়া পড়িয়া বাগান হইতে ফুল কুড়াইয়া তাহার মালা গাঁথিয়া গাঁথিয়া সেই দুপুর বেলাটা কাটাইয়া দিবে? এইসব ভাবিতে ভাবিতে সে ঘুমে ঢুলিতেছিল। ঠিক সেই সময়ে এ্যালিস্ দেখিল যে একটা খরগোশ তাহার কাছ দিয়া খুরখুর করিয়া হাটিয়া যাইতেছে। অবশ্য খরগোশ দেখিয়া আশ্চর্য্য হইবার আর কি আছে? কিন্তু বাস্তবিক এ্যালিস খুবই আশ্চয্য হইল, যখন সে দেখিল যে খরগোশটা একটা কোট প্যাণ্টালুন পরা সাহেব। তাহার উপর খরগোশটা আবার এ্যালিসের সম্মুখ দিয়া যাইতে যাইতে দিব্যি গম্ভীরভাবে তাহার ওয়েষ্টকোটের পকেট হইতে একটা চেনশুদ্ধ ঘড়ি বাহির করিয়া মাঝে মাঝে দেখিতেছিল আর বলিতেছিল, "হায় হায়! আমার বড্ড দেরী হ'য়ে যাবে! বড্ড দেরী হ'য়ে যাবে!" ঐরকম অদ্ভুত দৃশ্য দেখিয়া এ্যালিসের চোখ হইতে ঘুম ছুটিয়া গেল। কারণ ইহার আগে সে ওরকম পোষাক-পরিচ্ছদ পরা খরগোশ আর কখনও দেখে নাই।

খরগোশটা কোথায় যায় তাহা দেখিবার জন্য এ্যালিসের বড্ড কৌতূহল হইল। সেইজন্য সে উহার পিছনে পিছনে মাঠের উপর দিয়া ছুটিয়া চলিল। কিছুদূর গিয়া এ্যালিস্ দেখিল যে খরগোশটা ঝুপ্ করিয়া একটা প্রকাণ্ড গর্ত্তের মধ্যে লাফাইয়া ঢুকিয়া পড়িল। এ্যালিস্ও উহার সঙ্গে সঙ্গে নামিয়া গেল।

সেই গর্ত্তটা অনেকদূর পর্য্যন্ত সুড়ঙ্গের মত ক্রমশঃ ঢালু হইয়া নামিয়াছিল। সুতরাং এ্যালিস বহুদূর পর্য্যন্ত বেশ হাঁটিয়া হাঁটিয়াই নামিতেছিল। কিন্তু এক জায়গায় গিয়া গর্ত্তটা হঠাৎ কূয়ার মত নীচের দিকে এমনি খাড়াভাবে নামিয়া গিয়াছিল যে অন্ধকারে পা বাড়াইয়াই এ্যালিস্ ঝুপ্ করিয়া সেই খাড়া গর্ত্তের মধ্যে পড়িয়া গেল আর



বড্ড দেরী হ'য়ে যাবে

যায় কোথা! সে সোঁ সোঁ করিয়া ক্রমাগত নীচে নামিতে লাগিল। প্রথমটা এ্যালিস্ ভয়ানক ভয় পাইয়া গিয়াছিল। কিন্তু অনেকক্ষণ ধরিয়া নীচের দিকে পড়ার পরেও এ্যালিস্ যখন দেখিল যে যে সেই কূয়ার মত গর্ত্তটার নীচে পৌছাইল না তখন তাহার খানিকটা ভরসা হইল। ভরসা পাইয়া ঐরকম পড়ন্ত অবস্থায় শূন্যে থাকিয়া এ্যালিস নানান্ কথা ভাবিতে লাগিল। সে ভাবিল যে "হয় এই কূয়াটা খুবই গভীর আর নয়ত আমিই বোধ হয় খুব ধীরে ধীরে নীচে পড়্ছি। কিন্তু কোথায়

গিয়ে এই পড়ার শেষ হবে? আমি যে ক্রমাগত নীচের দিকে নেমেই চলেছি।" সে আবার ভাবিল যে, "গর্ত্তটা মাটি ফুঁড়ে একেবারে পৃথিবীর উল্টা দিক দিয়ে বার হয় নি ত! তাহলে কিন্তু মজাটা মন্দ হয় না।" পৃথিবীর উল্টা দিকের লোকজনেরা নীচের দিকে মাথা করিয়া কেমনভাবে পৃথিবীকে পা দিয়া ছুঁইয়া আছে, তাহা দেখিবার আগ্রহে সে খুবই আনন্দিত মনে পড়িতে লাগিল।

এই সব নানান্ রকমের উদ্ভট কল্পনা করিতে করিতে সে শেষকালে এক জায়গায় গিয়া থপ্ করিয়া পড়িল। ভাগ্যিস্ সেখানটায় খুব পুরু করিয়া শুক্না পাতা বিছানো ছিল! নহিলে এ্যালিসের আর সেদিন অত উঁচু হইতে ঐভাবে পড়িয়া বাঁচিতে হইত না। এ্যালিসের মোটেই আঘাত লাগে নাই। তখন তখনই সে গা ঝাড়িয়া ফস্ করিয়া দাঁড়াইয়া উঠিল এবং উপর দিকে চাহিয়া দেখিল যে উপরটা ভয়ানক অন্ধকার আর তাহার সামনেই একটা দীর্ঘ রাস্তা সোজা চলিয়া গিয়াছে। সেই সাদা খরগোশটা ঐ রাস্তার উপর দিয়া খুব ব্যস্তভাবে ছুটিয়া চলিতেছে। খরগোশটাকে দেখিতে পাইয়াই এ্যালিস্ আর মুহূর্ত্তমাত্র দেরী না করিয়া তাহার পিছু পিছু অনুসরণ করিল এবং দূর হইতে খরগোশটাকে আবার বলিতে শুনিল, "ওঃ! আমার বড্ড দেরী হয়ে যাচ্ছে।"

খরগোশের পিছনে ছুটিতে ছুটিতে এ্যালিস্ দেখিল যে সেই সোজা রাস্তাটা এক জায়গায় বাঁকিয়া গিয়াছে। সেই বাঁক ফিরিয়াই খরগোশটা যে কোথায় অদৃশ্য হইয়া গেল এ্যালিস্ তাহার কোনও সন্ধান পাইল না। কিন্তু সে সেই বাঁক ঘুরিয়া একটা ছোটখাট ঘরে গিয়া হাজির হইল। ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই সেই ঘরখানির সব দরজা বন্ধ হইয়া গেল।

ঐ ঘরের ভিতর অনেক আলো জ্বলিতেছিল। আর, ঘরের মধ্যে মেঝের উপরে একটা তিনপায়া কাঁচের টেবিলের উপর একটা ছোট সোনার চাবি পড়িয়াছিল। ঐ চাবিটি দেখিয়া এ্যালিস্ আশ্বস্ত হইয়া ভাবিল যে ঐ চাবি দিয়া নিশ্চয় সেই ঘরের কোনও না কোন দরজা খুলিতে পারা যাইবে। কিন্তু কোথায় কি? কোন দরজাই ঐ চাবি দিয়া খোলা গেল না। এ্যালিস্ কিন্তু তাহাতে না দমিয়া আবার প্রত্যেক দরজায় চাবি লাগাইয়া লাগাইয়া পরখ করিতে লাগিল যে দরজা খোলে কিনা। এবার হঠাৎ সে একটা ছোট্ট পর্দ্দার আড়ালে একটা নূতন দরজা লক্ষ্য করিল। ঐ চাবি দিয়া সেই দরজাটি সহজেই খোলা গেল। দরজাটি খুলিয়া ফেলিয়া সে দেখিল যে সেই দরজা হইতে একটা সরু রাস্তা বাহির হইয়া গিয়াছে। কিন্তু তাহা এতই সরু যে তাহা দিয়া বড় জোর একটা বড় গোছের ইঁদুর গলিয়া যাইতে পারে। হাঁটু গাড়িয়া বসিয়া পড়িয়া এ্যালিস্ সেই গর্ত্তটির মধ্যে চাহিয়া দেখিল যে ঐ ইঁদুরের গর্ত্তের মত সরু রাস্তাটি একটি অতি সুন্দর বাগানে গিয়া পৌঁছাইয়াছে। আর রং-বেরঙের অজস্র ফুল ফুটিয়া বাগানটিকে আলো করিয়া রাখিয়াছে। এ্যালিস্ ইহার আগে অত সুন্দর বাগান আর কখনও দেখে নাই। কাজে কাজেই সেখানে যাইবার জন্য তাহার খুব ইচ্ছা হইল। কিন্তু সে ঐ অতটুকু ইঁদুরের গর্ত্তের মত রাস্তা দিয়া যাইবে কেমন করিয়া?

এ্যালিস্ সেই ছোট দরজাটা দিয়া দু-একবার ভিতরে যাইবার চেষ্টা করিয়াছিল। কিন্তু বৃথা চেষ্টা! দরজা দিয়া তাহার মাথাটাই গলিল না। সুতরাং তাহার শরীরটা উহার ভিতর দিয়া গলা ত দূরের কথা! এইজন্য সে আবার টেবিলটার কাছে ফিরিয়া গেল এই আশায় যে আর কোনও দরজার চাবি হয়ত বা সে পাইলেও পাইতে পারে। এবার কিন্তু টেবিলের কাছে গিয়া সে যাহা দেখিল তাহাতে সে একেবারে অবাক্ হইয়া গেল। সে দেখিল যে টেবিলের উপরে একটা বোতল রহিয়াছে আর উহার গায়ে একটা কাগজে লেখা আছে "পান কর।" এ্যালিস্ এক চুমুকে ঐ পানীয়টুকু খাইয়া ফেলিল, কারণ সেই জিনিষটা মধুর মত দিব্যি মিষ্টিই ছিল।

কিন্তু কি সর্ব্বনাশ! সেই তরল পানীয়টুকু পান করার সঙ্গে সে ক্রমশঃ ছোট হইয়া যাইতে লাগিল। শেষকালে সে প্রায় দশ ইঞ্চিতে আসিয়া ঠেকিল। নিজেকে ঐ রকম ছোট হইয়া যাইতে দেখিয়া এ্যালিসের আনন্দও হইল খুব। সে ভাবিল যে এইবার সে নিশ্চয় ঐ দরজা দিয়া গলিয়া গিয়া সেই সুন্দর বাগানটায় পৌঁছিতে পারিবে। উল্লাসিত হইয়া এ্যালিস্ তাড়াতাড়ি

ছুটিয়া গিয়া সেই ছোট দরজাটা দিয়া গলিতে গেল। কিন্তু দরজার কাছে গিয়া সে দেখিল যে দরজাটা বন্ধ। এ্যালিস্ নিজেই তাড়াতাড়িতে উহা বন্ধ করিয়া দিয়া আসিয়াছিল এবং চাবিটাও আবার টেবিলের উপরে সেই বোতলের পাশে রাখিয়াছিল। চাবিটা ফের আনিবার জন্য সে টেবিলের কাছে গেল। কিন্তু টেবিলের উপরে সে নাগাল পাইল না। কারণ সে তখন অত্যন্ত ছোট হইয়া গিয়াছিল।

হতাশ হইয়া কি যে করিবে এ্যালিস্ তাহাই ভাবিতেছিল। এমন সময়ে টেবিলের তলায় একটা কাঁচের বাক্সের উপর তাহার নজর পড়িল। বাক্সটা খুলিয়াই সে দেখিল যে উহার মধ্যে একটা কেক্ রহিয়াছে। আর কেকের উপর রং করা চিনির হরপে লেখা রহিয়াছে '**খাইয়া ফেল।**"

এ্যালিস্ গোটা কেকটা খাইয়া ফেলিল। ও মা! এবার আবার এ কি ব্যাপার! কেক্ খাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সে যে ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল! নিজেকে ক্রমশঃ এই রকম করিয়া বাড়িতে দেখিয়া তাহার মজা লাগিল খুবই। কিন্তু অল্পক্ষণ পরেই তাহার মাথাটা ঠক্ করিয়া গিয়া একেবারে ছাদে ঠেকিল। তখন সে তাড়াতাড়ি সেই চাবিটা টেবিলের উপর হইতে হাতে তুলিয়া লইয়া দরজার কাছে গেল দরজা খুলিতে। কিন্তু দরজা খুলিলে হইবে কি? এবারে সে এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে তাহার একখানা হাতের চেটোও ঐ দরজা বা রাস্তা দিয়া গলিল না। হতাশ হইয়া বেচারী এ্যালিস্ কাঁদিয়া ফেলিল—তাহার চোখ দিয়া ঝর্ঝর্ করিয়া জল পড়িতে লাগিল। মনের দুঃখে এ্যালিস্ এতই কাঁদিয়াছিল যে তাহার চোখের জলে সেই ঘরের মেঝেতে প্রায় ইঞ্চি চারেক গভীর হইয়া জল জমিয়া গেল আর সেখানটা ছোট-খাট জলাশয়ের মত দেখাইতেছিল।

কিছুক্ষণ পরে এ্যালিস্ দূর হইতে কাহার যেন পায়ের খস্খস্ আওয়াজ শুনিতে পাইল, আওয়াজ শুনিয়া সে তাহার চোখ মুছিয়া চাহিয়া দেখিল যে সেই কোট্ প্যান্টালুন পরা খরগোশ সাহেবটি আসিতেছে। এবার খরগোশের বেশ-ভূষার ঘটা দেখে কে? চক্চকে ঝক্ঝকে সদ্য ইস্তিরি করা কোট প্যান্টালুন পরা ত আছেই, তাহার উপর আবার হাতে নূতন একজোড়া দস্তানা আর এক হাতে প্রকাণ্ড একখানা পাখা! ঐ খরগোশটা কি বকিতেই পারিত! এবারেও সে বকিতে বকিতে আসিতেছিল, "ওঃ! রাণী আমার উপর না জানি কি রকম চটেই গিয়েছেন এতক্ষণে! আমি বাস্তবিক অনেকক্ষণ তাঁকে আমার জন্য অপেক্ষা করিয়ে রেখেছি। আমার বড়ই দেরী হয়ে গেল!"

যাহা হউক, খরগোশটাকে দেখিয়া এ্যালিস্ খানিকটা আশ্বস্ত হইয়া ভাবিল যে উহাকে জিজ্ঞাসা করিলে এখান হইতে বাহির হইবার একটা উপায় মিলিবে নিশ্চয়। তারপর খরগোশটা এ্যালিসের কাছ বরাবর আসিতেই এ্যালিস্ বলিল, "ও মশাই! ও মশাই! দয়া ক'রে আমার একটা কথা শুনবেন!" এ্যালিসের সব কথা খরগোশটার কানে গেল কি না কে জানে, সে এ্যালিসের কথার শব্দ শুনিয়াই তিড়িং করিয়া মারিল এক দশহাত লাফ। তারপর তাহার হাতের সেই দস্তানা ও পাখা সেখানে ফেলিয়া রাখিয়াই একেবারে দে ছুট্।

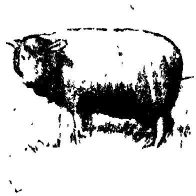
এ্যালিস্ অবাক হইয়া ভাবিল, "বা রে! মহা মুস্কিলেই পড়লাম ত আমি। এই আজব দেশের সবই দেখি অদ্ভুত।" কিন্তু আক্ষেপ করা বৃথা। কাজেই এ্যালিস্ উঠিয়া পড়িয়া সেই দস্তানা দুটো তুলিয়া লইল এবং পাখাখানা দিয়া দিব্যি আরামে বাতাস খাইতে লাগিল। বাতাস খাইতে খাইতে এ্যালিস্ দেখিল যে সে এবার ক্রমশঃ কেবলই ছোট হইয়া যাইতেছে। এ্যালিস্ যত বাতাস খায় আর তত ছোট হয়। শেষকালে সে এক হাত উঁচুতে আসিয়া ঠেকিল। তখন সে বুঝিল যে ঐ পাখার বাতাস খাওয়ার জন্যই সে ঐরকম ছোট হইয়া যাইতেছে। সেইজন্য তাড়াতাড়ি করিয়া সে ঐ পাখাখানা ও দস্তানা দুটাও ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিল। আর কিছুক্ষণ ঐ অদ্ভুত পাখার বাতাস খাইলে এ্যালিস্ ছোট হইতে হইতে একেবারে মাটির সঙ্গে মিশিয়া যাইত নিশ্চয়।

ছোট হইয়া এ্যালিস্ ভাবিল যে এবার সে নিশ্চয় ঐ ছোট দরজাটা দিয়া গলিয়া গিয়া বাগানের রাস্তা ধরিয়া বাগানে যাইতে পারিবে। সে তাড়াতাড়ি বাগানের দরজার কাছে গেল। কিন্তু এবারেও সেই বিভ্রাট। বাগানের দরজা বন্ধ অথচ চাবিটা সেই টেবিলের উপরেই রহিয়া গিয়াছে।

প্রাণীরা কি বলে?



[illegible]



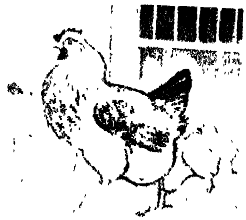
[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



[illegible]



হাঁস ডাকে প্যাঁক প্যাঁক



কাক ডাকে কা



[illegible]



প্যাঁচা বলে [illegible]





কোকিল ডাকে কুউ-কুউ-কুউ

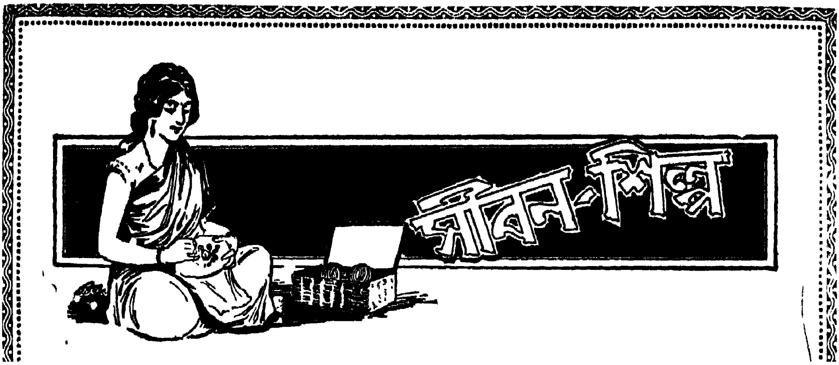
খিরক্ত হইয়া এ্যালিস্ মনে মনে গজ্ গজ্ করিতে করিতে টেবিলের দিকে তাড়াতাড়ি ফিরিতে গেল। ইহাতে হঠাৎ সে পা পিছলাইয়া সেই চোখের জলের লোনা পুকুরে পড়িয়া গেল।

অশ্রুজলের পুকুর ও তাহার ধারে পশুপাখীদের মেলা

জলে পড়িয়া গিয়া এ্যালিস্ তাহার খুব নিকটেই ছপ্ ছপ্ করিয়া ঝাঁপাই ছোড়ার একটা আওয়াজ শুনিতে পাইল। ইহাতে উৎসুক হইয়া এ্যালিস সাঁতার কাটিয়া কাটিয়া যেদিক হইতে আওয়াজ আসিতেছিল সেইদিকে গেল। কাছাকাছি আগাইয়া গিয়া এ্যালিস্ দেখিল যে কি একটা জন্তু যেন জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া ভাসিয়া রহিয়াছে। জন্তুটাকে দেখিয়া এ্যালিস্ ত প্রথমে সেটাকে একটা জলহস্তী বা বড় ভোঁদড় বলিয়াই মনে করিয়াছিল। কিন্তু পরক্ষণেই ভাল করিয়া চাহিয়া সে দেখিল যে ঐ জন্তুটা জলহস্তী বা ভোঁদড় নয়। ওটা একটা ইঁদুর! পাখার বাতাস খাইয়া এ্যালিস্ নিজে ছোট হইয়া গিয়াছিল তাই ঐটুকু পুচ্কে ইঁদুরকেও তাহার জলহস্তী বা ভোঁদড় বলিয়া প্রথমটায় ভ্রম হইয়াছিল।

ইঁদুর মহাশয়কে দেখিয়া এ্যালিস ভাবিল যে ওকে জিজ্ঞাসা করলে হয়ত বা এখান থেকে বার হবার একটা কোনও উপায় মিলবে। এখানে সবই যখন অদ্ভুত তখন ইঁদুরটা হয়ত বা আমার ভাষা বুঝ্লেও বুঝ্তে পারে। এই ঠিক করিয়া সে ইঁদুরটাকে জিজ্ঞাসা করিল, "ও ভাই মূষিক! এইখান থেকে বার হবার একটা উপায় আমাকে বাত্লে দিতে পার? এই লোনা জলে সাঁতার কাট্‌তে আর ত আমি পারি না।" এ্যালিস্ মনে করিয়াছিল যে ইঁদুরটা হয়ত সেই খরগোশটার মত তাহার কথা শুনিয়া তিন লাফ মারিয়া পালাইবে। সেইজন্য সে খুব সন্তর্পণে আস্তে আস্তেই কথা কয়টি বলিয়াছিল। ইঁদুরটা পালাইল না বটে, কিন্তু এ্যালিসের কথা শুনিয়া ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া তাহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। ইহাতে এ্যালিস্ ভাবিল যে ইঁদুরটা হয়ত তাহার কথা বুঝিল না। পরক্ষণেই এ্যালিসের মনে হইল, "এটা হয়ত ফরাসী ইঁদুর হবে তাই আমার ভাষা বুঝ্‌ল না।" এইবার এ্যালিস্ পড়িল মহা বিপদে। ফরাসী ভাষায় বিদ্যার দৌড় তাহার ত প্রথমভাগ পর্য্যন্ত। তাও আবার এখন তাহার কিছুই মনে পড়িতেছিল না। যাহা হউক, বহু কষ্টে প্রথম ভাগের প্রথম পাতার প্রথম বাক্যটি এ্যালিস্ ভাবিয়া পাইল। সে সেই কথাটি ইঁদুরকে জিজ্ঞাসা করিল, তাহার অর্থ—"এখানে কি বেড়াল পাওয়া যায় না?"

সেই কথাটা ইঁদুরের কানে যেমন যাওয়া অমনি ইঁদুরটা টপ্ করিয়া লাফাইয়া দশ হাত দূরে সরিয়া গিয়া ভয়ে ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। ইঁদুরটাকে ভয় পাইতে দেখিয়া এ্যালিস্ অপ্রতিভ হইয়া নিজের ভাষাতেই এবার বলিল, "ভাই! আমি একেবারে ভুলে গিয়েছিলাম যে তোমরা বেড়াল দেখতে পার না। তাই আমি অমন কথা বলে ফেলেছিলাম।" ইঁদুরটা কিন্তু এ্যালিসের কথা এবার বেশ বুঝিতে পারিল। সে তাহার গোঁফ ফুলাইয়া চোখ পাকাইয়া বলিয়া উঠিল, "আমার মত অবস্থা হ'লে তুমিই কি আর বেড়ালদের দেখ্‌তে পার্‌তে, না বেড়ালের নামে ভয় পেতে না? ইঁদুরটা ভয় পাইয়া এ্যালিসের কাছ হইতে সাঁতার কাটিয়া কাটিয়া কেবলই দূরে সরিয়া যাইতেছিল। কিন্তু এ্যালিস্ ইঁদুরটাকে অভয় দিয়া ডাকিল, "ভাই তুমি ভয় পেয়ে পালিয়ো না। আর আমি কখনও তোমার কাছে বিড়াল বা কুকুরের কথা বলবো না।" এ্যালিসের কাছ হইতে অভয় পাইয়া ইঁদুরটা তাহার কাছে ফিরিল। এ্যালিস্ তখন লক্ষ্য করিল যে ভয়ে ইঁদুরের মুখখানা তখনও একেবারে ফ্যাকাশে সাদা হইয়া গিয়াছে।



সায়া বা পেটীকোট তৈয়ারী

২০৫৬ পৃষ্ঠার পর

সায়া কাটিতে আরম্ভ করিবার পূর্ব্বে একটি মাপ লইতে হইবে। যে সকল মাপের প্রয়োজন তাহা নিম্নে দেখ।

লম্বা—এস্থানে কোমর হইতে পায়ের পাতা পর্য্যন্ত যতটা লম্বা হয়।

পাছা—পাছার চারিপাশে ঘুরাইয়া সকল স্থান।

কোমর—বুক বা ছাতির ন্যায় কোমরের চারিপাশ ঘুরাইয়া।

সায়ার কাপড়ের পরিমাণও ঠিক সেমিজের ন্যায় হিসাব করিবে। সায়া যত লম্বা হইবে সেই লম্বাব সহিত তিন ইঞ্চি বেশী যোগ করিলে যতটা লম্বা হইবে, সেই লম্বার ডবল অর্থাৎ দ্বিগুণ কাপড়ের প্রয়োজন।

তোমাদের পরিবারের ভিতরের কোন মেয়ের যেন একটি মাপ লইলে। তাহা হইল:—

লম্বা—৩৬ পাছা—৩২ কোমর—২৪

তাহা হইলে এখন দেখ কাপড়ের হিসাব হইবে লম্বা ৩৬ ইঞ্চি ইহার সঙ্গে আরও তিন ইঞ্চি যোগ করিয়া পাইলে ৩৯ ইঞ্চি। এখন এই ৩৯ ইঞ্চি লম্বা দুইখানা কাপড় লও। এই সায়ার সম্পূর্ণ ঘের হইবে ছাতির মাপের তিনগুণ; তাহা হইলেই দেখ যদি সামনা ও পিছন ভাগ আলাদা কর, তবে এক এক ভাগ চওড়া হইবে ছাতির মাপের দেড়গুণ। অথবা আরও একটা সোজা হিসাব করিতে পার; সায়ার ঘের হইবে লম্বায় ডবল; তাহা হইলেই দুই ভাগে চওড়া হইবে এক স্থানে ৩৬ ইঞ্চি করিয়া। কারণ লম্বার মাপ হইল ৩৬ ইঞ্চি।

যদি কাপড়ের বহর বা চওড়া কম হয়, তবে জোড় দিয়া লইতে হইবে। যেমন তোমাদের লম্বার মাপ আছে ৩৬ ইঞ্চি। কিন্তু কাপড়ের বহর আছে ৩০ ইঞ্চি। এখন বাকী ৬ ইঞ্চি কাপড়, এই ৩০ ইঞ্চি চওড়া কাপড়খানার সঙ্গে জুড়িয়া সেলাই করিয়া লইতে হইবে মনে রাখিও।

তাহা হইলে এখন আমরা ৩৬ ইঞ্চি চওড়া এবং ৩৯ ইঞ্চি লম্বা দুইখানা কাপড় লইলাম। ইহাদিগকেও ঠিক সেমিজের ন্যায় চওড়ার অর্দ্ধেক ১৮ ইঞ্চি করিয়া দুই ভাঁজ করিয়া ফেলিলাম। পরে কোমরের মাপ হইতে ৬ ইঞ্চি বেশী লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া করিয়া একখানা কাপড়ের পটি কাটিলাম।

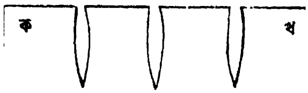
এখন চওড়া কাপড়কে প্লেট ভাঙ্গিয়া পটির মধ্যে ভরিয়া দিয়া সেলাই করিতে হইবে। তৈয়ারী সায়ার প্রতি তাকাইয়া দেখ, তবেই বুঝিতে পারিবে।

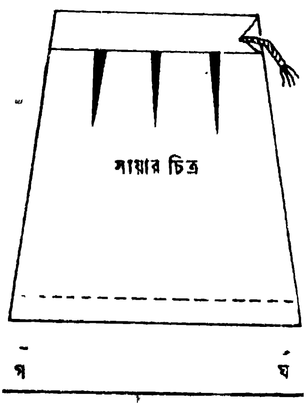
ক খ গ ঘ তোমাদের সায়ার ভাঁজ করা কাপড় বিছান আছে। ইহার লম্বা ক হইতে গ

সায়া বা পেটিকোট তৈয়ারী

৩৬+৩=৩৯ ইঞ্চি। ক হইতে খ, ও গ হইতে ঘ, ইহা লম্বার মাপ ৩৬ ইঞ্চির অর্দ্ধেক ১৮ ইঞ্চি।

তোমরা কোমরের মাপ ২৪ ইঞ্চি হইতে ৬ ইঞ্চি বড় অর্থাৎ ৩০ ইঞ্চি লম্বা ও ২ ইঞ্চি চওড়া করিয়া একটি পটী কাটিয়াছ। এখন ক ও খ ভাগকে কুঁচাইয়া বা প্লেট ভাঙ্গিয়া পটীর সমান কর। চেখের ন্যায় যে তিনটী দাগ কাটা আছে





উহা প্লেটের দাগ। ঐ দাগ প্লেট ভাঙ্গিয়া পটীর ভিতর দিয়া সেলাই করিয়া দাও, পরে তৈয়ারী পটীর ভিতরে ঐ কাপড় দিয়া সেলাই করিয়া ফেল। এই পটীর ভিতর তোমাদের ইজারে যেমন একটি দড়ি গলাবার জন্য ছিদ্র থাকে, তদ্রূপ একটি ছিদ্র রাখিয়া একটি ফিতা বা দড়ি গলাইয়া দাও। উহা দ্বারা কোমরে বাঁধিবে।

এখন সেমিজের ন্যায় ইহার উভয় পাশ সেলাই করিয়া জুড়িয়া ফেলিবে। তাহার পর নীচে যে ৩ ইঞ্চি বেশী কাপড় রাখিয়াছ উহা ভিতরে মুড়িয়া দিয়া, মুড়ি ভাঙ্গিয়া সেলাই করিয়া দাও। ইহাকে মুড়ি ভাঙ্গা সেলাই বলে। এখন তোমার তৈয়ারী জিনিষটা ঠিক তৈয়ারী সায়ার যে চিত্র আছে, তদনুরূপ হইল। মিলাইয়া দেখ।

অনেক সময় সায়ার নীচে ঝালরের ন্যায় লেস থাকে তখন আর পটী মুড়িয়া সেলাই করিবার প্রয়োজন হয় না। লেস্‌টীকে পটীর স্থানে জুড়িয়া কলে সেলাই করিয়া দিলেই শেষ হইল।

মুড়ি ভাঙ্গিয়া রুমাল তৈয়ারী

তোমরা পূর্ব্বে হেমষ্টীচ্ বা মুড়ি সেলাই কি করিয়া হয় তাহা দেখিয়াছ ও শিখিয়াছ। এই স্থানে সেই প্রণালীতে রুমাল কি করিয়া তৈয়ারী করা যাইতে পারে তাহাই বলিব।

রুমাল তৈয়ার করিতে একটু কড়া রকমের নয়নসুখ, লংক্লথ অথবা আদ্দির কাপড়ই প্রশস্ত। রুমালের কাপড় সকল সময়ই স্কোয়ার অর্থাৎ ইহার চারিধার ঠিক সমান চওড়া থাকে।

তোমরা ২০, ২২, কি ২৪ ইঞ্চি লম্বা ও একই রকম প্রস্থের একখানা কাপড় লও। পরে চারিপাশ হইতে দেড় ইঞ্চি পরিমাণ কাপড় দাগ দিয়া রাখ। পরে এই দাগের পার্শ্ব হইতে ভিতরের দিকে, চারিধার হইতে ৮ গাছি করিয়া সুতা তুলিয়া লও। সুতা তোলা হইয়া গেল; চারি পাশেই একটী লাইনের দাগ পড়িয়া গেল। এখন ঐ কাপড়খানার চারি ধারের কিনারা মুড়ি ভাঙ্গিয়া লইয়া, যে স্থান হইতে সুতা তুলিয়াছ, তাহার কিনারা পর্য্যন্ত আনিয়া লম্বা রানিং সেলাই দিয়া টাকিয়া রাখ। এইরূপ ভাবে তৈরী একখানি রুমাল দেখিলে তবেই বুঝিবে কি করিতে বলিলাম। এখন কিনারায় যে (Hem) বা মুড়ি ভাঙ্গিয়া রাখিয়াছ, তথায় সেলাই আরম্ভ করিতে হইবে।



বল দেখি কি?

[২০০০ পৃষ্ঠার পর]



এই কালো কালো টুকরাগুলি যদি বেশ বুদ্ধি করিয়া পর পর সাজাইতে পার, তাহা হইলে একটি মহাদেশ হইবে। তোমরা বাহির কর দেখি, সে কোন্ মহাদেশ?



শব্দের সন্ধান

৬১২ পৃষ্ঠার পর

মনে কর একজন লোক কথা কইতে কইতে চলে যাচ্ছে। সে যত দূর চলে যাবে তার কথাও তত আস্তে শোনা যাবে। অর্থাৎ এই থেকে এই তত্ত্বটা পাওয়া যায় যে শব্দ যতদূর থেকে আসে তার জোরও তত কম হয়ে আসে।

আমাদের দুইটা কান আছে। কোনও যায়গায় শব্দ উঠলে পরে সঙ্গে সঙ্গে আমাদের দুই কানেই তার ধাক্কা এসে লাগে। সাধারণতঃ হয় কি একটা কান অন্য কান থেকে একটু দূরে থাকে বলে দুই কানে ঠিক সমান জোরে শব্দ এসে লাগে না। যে কানের দিকে শব্দটা হয় সেই কানটাতে শব্দের ধাক্কার জোর বেশী হয় আর অপরটাতে অপেক্ষাকৃত কম হয়। দুই কানে এই যে শব্দের তীব্রতার তারতম্য তা আমরা অবশ্য কিছু শব্দের ভাবে ধরতে পারি না, কারণ এই তারতম্য অত্যন্ত অল্প হয়। কিন্তু যে স্নায়ু শব্দের সাড়া মস্তিষ্কে নিয়ে গিয়ে পৌঁছে দেয় সে এটাকে ঠিক ধরে ফেলে। এই স্নায়বিক সাড়া তারতম্য থেকে মস্তিষ্ক বুঝে নেয় যে শব্দটা কোন্ কানের দিকে রয়েছে। তারতম্য যদি খুব বেশী হয় তবে মস্তিষ্ক মনে করে যে শব্দটা একেবারে ডান বা বাঁ দিকে হচ্ছে, আর একেবারে না থাকলে পর বুঝে যে ঠিক সম্মুখে রয়েছে। মাঝামাঝি হলে বোঝে যে মাঝামাঝি কোনও যায়গায় শব্দ হচ্ছে। অতএব শব্দটা যদি দুই কানের সমান সমান দূর কোনও স্থান থেকে উত্থিত হয় তবেই হয় মুস্কিল। কান দুটো তখন সমান জোরেই শব্দটাকে গ্রহণ করে আর এ অবস্থায় দিক্‌নির্ণয়ের জন্যে আমাদের বিপদে পড়তে হয়। দেখা গেছে যে চোখ বোজা অবস্থায় মাথার ওপরে বা পিছন দিকে বা নাকের সামনে শব্দ হলে কোন্ শব্দটা কোথায় হচ্ছে আমরা সব সময়ে ঠিক ঠিক ধরতে পারি না।

এইখানে তোমাদের মানুষের ইন্দ্রিয়ের সূক্ষ্মতার দিকে একটু দৃষ্টি দিতে বলি। ২০ গজ দূরে বাঁ দিকের শব্দ আর ডান দিকের শব্দ আমরা অনায়াসে বলে দিতে পারি। অথচ বিজ্ঞানের কোনও যন্ত্র এখনও এমন সূক্ষ্ম হয়নি যে ২০ গজ দূরের কোনও সাধারণ শব্দের ৮ ইঞ্চি স্থান অতিক্রম করে তার মধ্যে ভাবের কতটা তারতম্য ঘটবে তা বলে দিতে পারে। অথচ আমি এমন লোক দেখেছি যে চোখ বাঁধা অবস্থায় শব্দিত বস্তুর এক ইঞ্চি পরিমাণ

স্থান পরিবর্ত্তন করাকেও ধরে ফেলেছে। অবশ্য শ্রবণেন্দ্রিয়ের এমন অদ্ভুত ক্ষমতাসম্পন্ন মানুষ সচরাচর পাওয়া যায় না, কিন্তু একজনের ক্ষেত্রেও এই অদ্ভুত সূক্ষ্ম ক্ষমতার কথা চিন্তা করলে সৃষ্টির অত্যাশ্চর্য্য বিষয়ে বিস্মিত না হয়ে পারা যায় না।

আমরা অনবরত চোখের পাতা ফেলি কেন?

আমাদের বাইরের অঙ্গগুলির মধ্যে চোখের মত প্রয়োজনীয় অঙ্গ বোধ হয় আর নাই। তাছাড়া এর মত কোমল অঙ্গও আমাদের খুব অল্পই আছে। এই জন্যে ইহার রক্ষার জন্য অনেক রকমের উপায় প্রকৃতি আপনা হ'তে করে দিয়েছে। আমাদের চোখের পাতা সেই চোখকে রক্ষা করবার একটা উপায় মাত্র। খুব ছোট একটা কাঁকর চোখে ঢুকলে আমাদের কি অবস্থা হয় তা আমরা সকলেই জানি। এই সব বাইরের বিপদ থেকে চোখকে অনবরত আমরা আবরিত করে রাখি, কাজে কাজেই আমাদের বার বার পাতা ফেলতে হয়। তাছাড়া আর একটা বিশেষ কারণে আমাদের চোখের পাতা ফেলতে হয়। আমাদের চোখ এমন সব জিনিষ দিয়ে তৈরী যে তাকে সব সময়ে ভিজিয়ে না রাখলে তা তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যায়। এইজন্যে চোখের কোণের কাছে কয়েকটা গ্রন্থি থেকে অনবরত জল বার হতে থাকে। আমরা চোখের পাতা বুজে বুজে সেই জলটাকে সমস্ত চোখের উপর সমান ভাবে ছড়িয়ে দিই। এই কাজটা আমাদের প্রায়ই করতে হয় কেন না এইভাবে চোখের উপর জলের যে পাতলা পর্দ্দাটা আমরা টেনে দিই তা বাতাস লেগে অনবরত শুকিয়ে যায়, কাজে কাজেই আমাদের বার বার চোখের পাতা ফেলতে হয়।

ট্রাম গাড়ীর নাম ট্রাম হইল কেন?

তোমরা কলিকাতা, বোম্বাই, দিল্লী, মাদ্রাজ প্রভৃতি সহরে ট্রাম গাড়ী দেখিয়া থাকিবে। এই গাড়ীর নাম ট্রাম হইল কেন জান? অনেকদিন আগে আউটরাম (Outram) নামে এক ব্যক্তি বলেন যে যদি রাস্তা সমতল ও প্রশস্ত করা যাইতে পারে, তাহা হইলে সেই পথের উপর দিয়া সহজেই চাকাওয়ালা গাড়ী চলাচল করিতে পারে। তাঁহার নির্দ্দেশমত পথ প্রস্তুত হইল এবং গাড়ীও চলিতে লাগিল। এই গাড়ীর পথ ও গাড়ীর নাম আউটরামের নাম হইতে হইল ট্রামের পথ (tramway) এবং গাড়ীর নাম হইল ট্রামের-গাড়ী (tramcar)।

ছাতা আবিষ্কার কে করিল?

কে প্রথম ছাতা আবিষ্কার করিল, সে কথা ঠিক্‌ভাবে জানা যায় না। চীনদেশের লোকেরা সে প্রায় শত শত বৎসর আগে ছাতার ব্যবহার জানিত। ভারতবর্ষের প্রাচীন ভাস্কর্য্যশিল্পে ছাতার ব্যবহার দেখা যায়। ইংল্যাণ্ডে জোনাস্ হ্যানওয়ে (Jonas Hanway) নামক এক ব্যক্তি সর্ব্বপ্রথম ছাতার ব্যবহার করেন ১৭৮৬ খৃষ্টাব্দে ইঁহার মৃত্যু হয়। যেদিন জোনাস্ ছাতা মাথায় দিয়া লণ্ডনের পথে বাহির হইয়াছিলেন, সেদিন লোকে তাঁহাকে ঠাট্টা ও বিদ্রূপ করিয়া ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিয়াছিল। এখন কিন্তু সব দেশের লোকেরাই ছাতার ব্যবহার করে। আর ছাতা যে কত রকমের আছে, তাহা তোমরা পথ চলিবার সময় একটু লক্ষ্য করিলেই দেখিতে পাইবে। আমাদের দেশে আগে তালপাতার ছাতা, বাঁশের তৈরী ছাতা, প্রভৃতির ব্যবহার ছিল, এখনও গ্রামদেশে আছে। জার্ম্মান দেশে এক প্রকার নূতন ছাতার প্রচলন হইয়াছে, সে ছাতার উপরে আবার জানালা থাকে, অবশ্য সে জানালা অত্যন্ত ছোট। ঘোর দুর্য্যোগের মধ্য দিয়া চলিবার সময় পথিক সেই জানালা দিয়া পথ চলিতে পারে, তাহাতে কোনও কষ্ট হয় না। ঐ জানালা অভ্র দিয়া তৈরী হইয়া থাকে। আজকাল পুরুষদের ছাতা ও মেয়েদের ছাতা নানা রকমের ও নানা ফ্যাসানের হইয়া থাকে। ছাতা যে আমাদের কত উপকারী জিনিষ তাহা তোমরা রৌদ্র ও বৃষ্টিতে ব্যবহার করিয়া ত প্রত্যহই বিশেষভাবে বুঝিতে পারিতেছ। ছাতার কারখানায় যাইয়া কেমন করিয়া ছাতা তৈরী হয় তাহা দেখিলে ইহার নির্ম্মাণ-কৌশল বুঝিতে পারিবে।